ঝিলডাঙার কন্যা

প্রচেত গুপ্ত

boierpathshala.blogspot.com

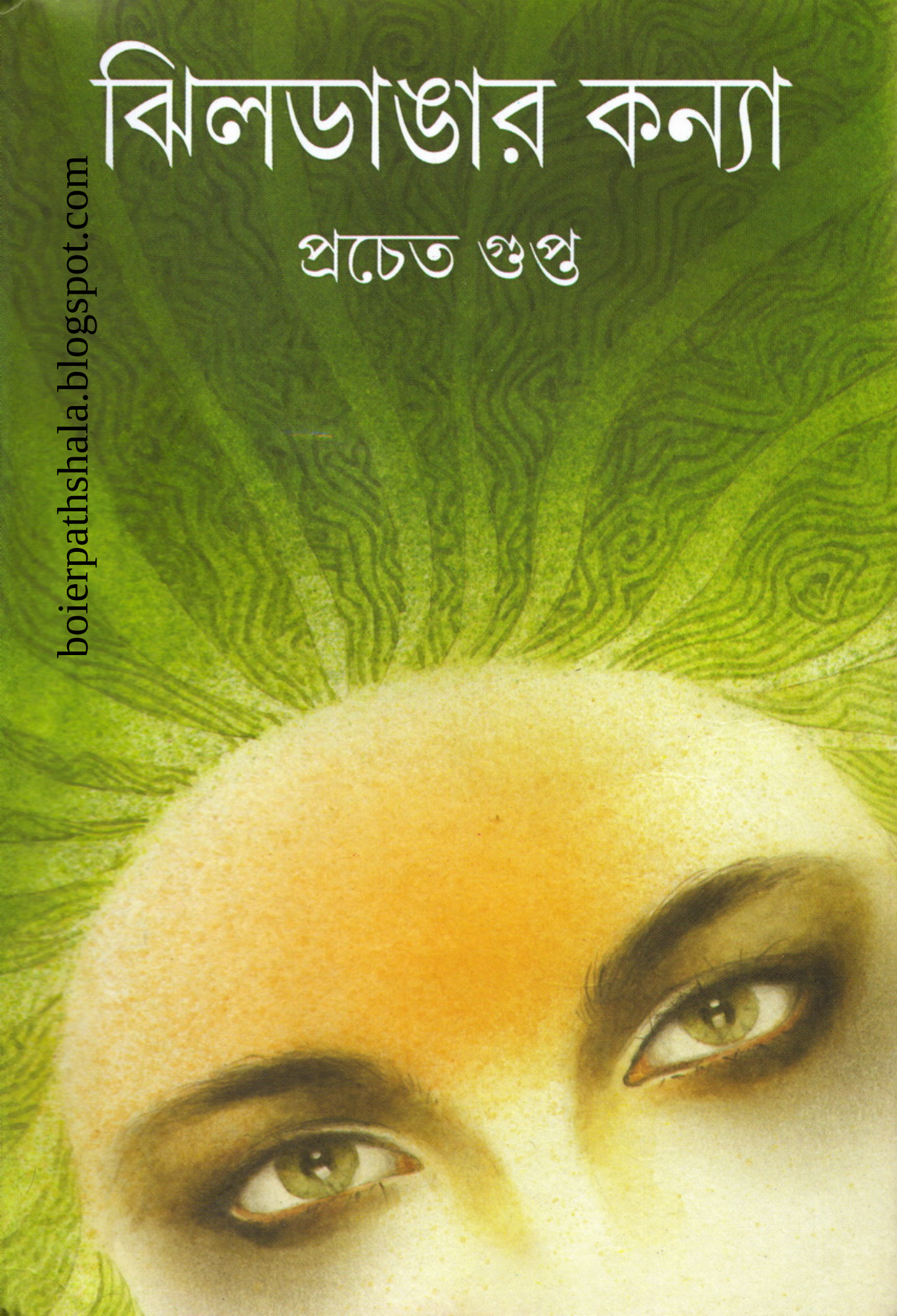

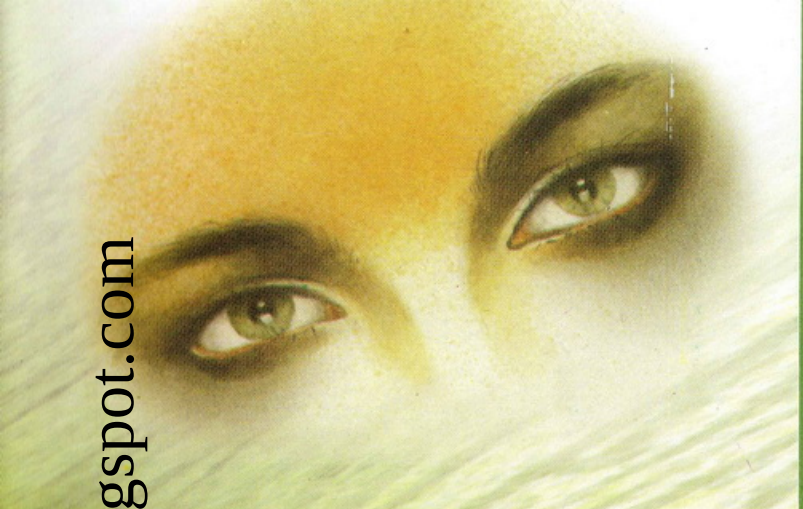

boierpathshala.blogspot.com

ঝিলডাঙা গ্রামের কন্যা ফুল এক আশ্চর্য বালিকা। ফুটফুটে এই মেয়ে নাকি বিপদের খবর আগাম বুঝতে পারে! এ কি কখনও সম্ভব? মানুষ কি কখনও বিপদের খবর আগাম পেতে পারে? ফুলের বাবা নিতাই এবং মা মালতী জানে মেয়ের অসুখ করেছে। ছুটে যায় শহরের চিকিৎসক সুদর্শন রায়ের কাছে। এরপর একদিকে ঝিলডাঙা গ্রামের হাতুড়ে চিকিৎসক গোপীনাথ, আদর্শবান স্কুল মাস্টার চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া, কুচক্রী পুলিশ অফিসার, নিষ্ঠুর গুণ্ডা কাদু, দেহপসারিনী শান্তি, অন্যদিকে শহরের মেয়ে কথাকলি, ঝলমলে তরুণ সোমনাথ, আধুনিকা পৃথা, টিভি কোম্পানির মালিক কমল মল্লিক, শরীরসর্বস্ব নায়িকা মোম, সংসারবিমুখ ব্রতীন, লোভী রাজনীতিক মানা সরকার সহ অজস্র চরিত্র। কখনও ছোঁয়া যায়, কখনও রহস্যময়। পাঠককে মুগ্ধ করে দেওয়ার যাদু জানেন লেখক প্রচেত গুপ্ত। এই সুদীর্ঘ উপন্যাসে আবার তার প্রমাণ মিলল।

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

Some say the world will end in fire, some say in ice,

Robert Frost

boierpathshala.blogspot.com

উৎসর্গ

শ্রী নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
শ্রীমতী সুষমা চক্রবর্তী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

ঝিলডাঙার কন্যা

boierpathshala.blogspot.com

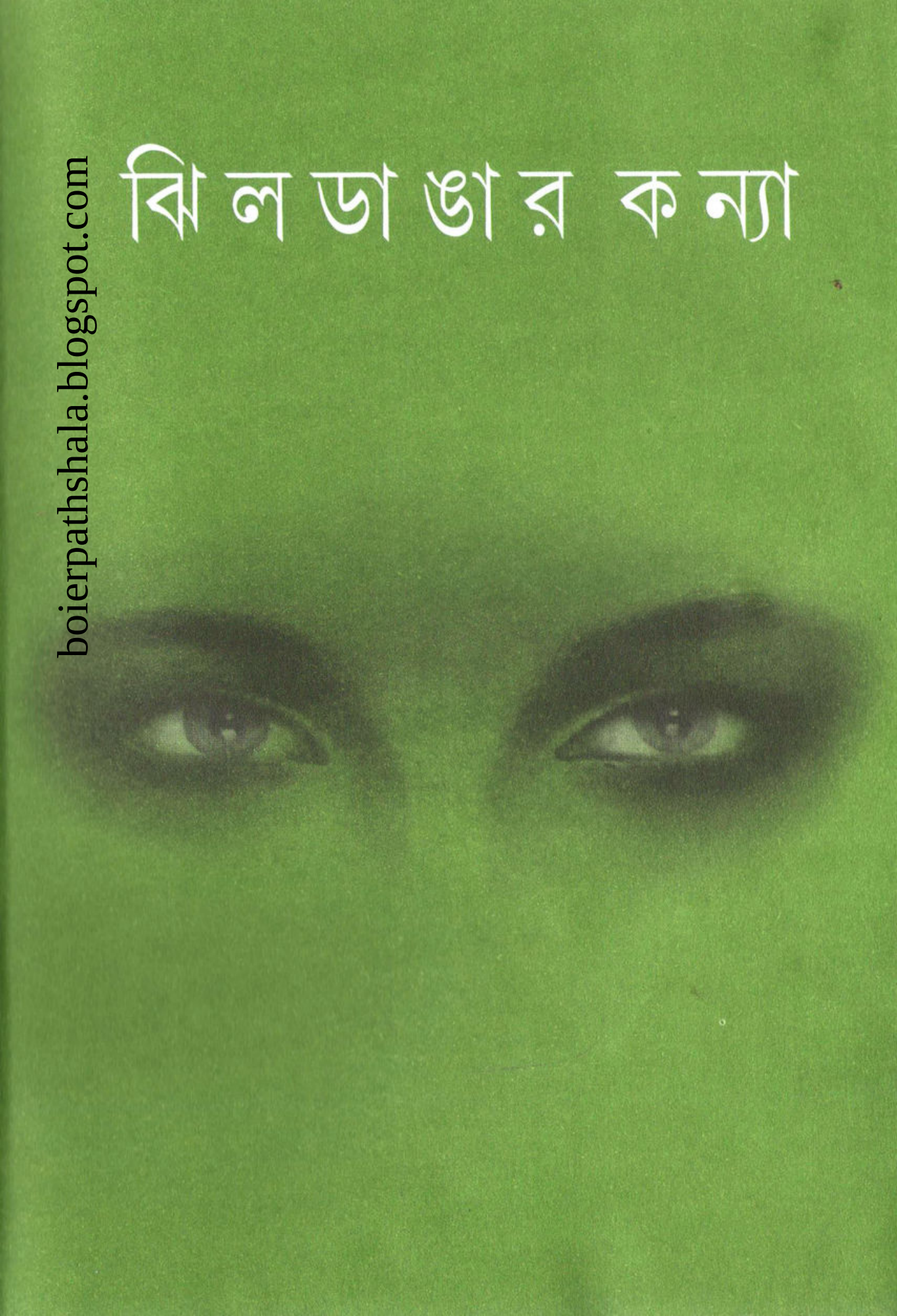

boierpathshala.blogspot.com

ঝিলডাঙার কন্যা

প্রচেত গুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

ঝিলডাঙার কন্যা
প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪১৬
তৃতীয় মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪১৮

—তিনশো পঞ্চাশ টাকা—

প্রচ্ছদপট ও অলংকরণ
দেবব্রত ঘোষ

JHEELDANGAR KANYA
A novel by Pracheta Gupta.
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.
10 Shyama Charan Dey Street, Kolkata 700 073

Price Rs. 350/-

ISBN : 978-81-7293-979-3

© মিত্রা গুপ্ত

। বিশেষ বিজ্ঞপ্তি।।

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও রকম পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনর্ব্যবহার বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শব্দগ্রন্থন
টেকনোগ্রাফ, ১/৯৮ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে পি. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ, ১৫২ মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

একটু বলে নিই

উপকার করলে মানুষ ক্ষতি করে জানি, কিন্তু উপকার না করলে? কস্মিনকালে আমি রোববার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের কোনো উপকার করিনি, করতে চাইও না। তবু সে দুম করে হঠাৎ একদিন আমার বিরাট ক্ষতি করে বসল। আমাকে ধারাবাহিক উপন্যাস লেখার আমন্ত্রণ জানাল। আমি একইসঙ্গে ঘাবড়ে যাই এবং সতর্ক হই। এই ছেলে তো ডেনজারাস। গল্প উপন্যাস লিখতেই আমার কালঘাম ছুটে যায়, কালঘাম ছুটে যাওয়ার পরও লেখা ঠিকমতো হয় না, আর এ যে একেবারে ধারাবাহিক লেখার আমন্ত্রণ! আমার বুঝতে বাকি রইল না যে অনিন্দ্য আমার খুব বড়ো ধরনের ক্ষতি চাইছে। ক্ষতিটা ঠিক কী? সে কি চায় আমি নাস্তানাবুদ হয়ে লেখালিখি চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিই? নাকি ভয়ংকর খারাপ কিছু লিখে নিন্দের বোঝা আরও বাড়াই? যাই হোক, আমি খুব শক্ত মনে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলাম। কিন্তু অনিন্দ্য তখন আমার ক্ষতি করার নেশায় মেতেছে। তাকে কে আটকায়? সে নানান ধরনের ছলচাতুরির ('ঠিক পারবে', 'দারুণ জমে যাবে', 'ছোটো লিখলেই হবে' ইত্যাদি) আশ্রয় নিল এবং আমাকে কীভাবে যেন লিখতে বসিয়ে ফেলল। 'রোববার' পত্রিকায় টানা ৬৬ সপ্তাহ ধরে আমি সেই উপন্যাস লিখেছি। আমার প্রথম ধারাবাহিক উপন্যাস। লিখতে লিখতে যতবার পাঠকের মতামত জেনেছি, প্রশংসা পেয়েছি, ততবার অনিন্দ্যর কথা মনে পড়েছে। লেখা শেষ হওয়ার পর যতবার টেলিফোন, চিঠি, মোবাইল বার্তায় অভিনন্দন পেয়েছি, অনিন্দ্যর কথা মনে পড়েছে। সে আমার এতবড়ো ক্ষতি চেয়েছিল। আমি অনিন্দ্যকে ভুলে যাব। কিন্তু 'ঝিলডাঙার কন্যা' তাকে কোনোদিনও ভুলবে না। সৃষ্টি কখনও স্রষ্টার মতো অকৃতজ্ঞ হয় না।

এই উপন্যাস লেখার সময়ে বহু পরিচিতজন পত্রপত্রিকা, বই, তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। আমি বহু পত্রপত্রিকা, বই, ওয়েবসাইটের সাহায্য নিয়েছি। লেখার মধ্যেই যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি তাদের নাম উল্লেখ করতে। বন্ধু দেবাশিস মুখোপাধ্যায়কে টেলিফোন করে মাঝরাতে জ্বালিয়েছি। সে খুবই বিরক্ত হয়েছে এবং পরদিন আমার অর্ডার মতো প্রয়োজনীয় বইটি হাতে করে নিয়ে এসে দিয়েছে। বলেছে, 'আর কখনও রাতে ফোন করবে না।' আবার রাতে ফোন

boierpathshala.blogspot.com

করেছি। পরদিন আরও বেশি বিরক্ত মুখে বই হাতে নিয়ে এসেছে। খ্যাতিমান শিল্পী দেবব্রত ঘোষ আমার এই বইয়ের প্রচ্ছদ করে দিয়েছে। এটা কোনো নতুন কথা নয়। এর আগেও সে আমার একাধিক বইয়ের প্রচ্ছদ করেছে। কিন্তু এই বইটির প্রচ্ছদ করতে হবে শুনে কেন জানি সে দীর্ঘদিনের জন্য পাহাড়ে পালিয়ে যায়। ভয় পেয়েছিলাম—সামান্য একটা প্রচ্ছদের জন্য সন্ন্যাসী হয়ে যাবে না তো? ফিরে এসে যে কী কাণ্ড করেছে সে তো প্রচ্ছদেই প্রমাণ মিলছে। ঠিক করেছি, সময় সুযোগ পেলে তাকে একদিন জিজ্ঞেস করব যে নিজের মনেই পাহাড়ের মতো রূপ সৌন্দর্য নিয়ে বসে আছে, তার আর নতুন করে পাহাড়ে যাওয়ার প্রয়োজন কী?

আর একজনের নাম বলতেই হবে। সে বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী। রোববার পত্রিকার কর্মী। বর্ণিনী হাসি এবং ধমকে বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা। মিষ্টি করে হেসে সে প্রথমে বিভ্রান্ত করে, তারপরেই কড়া ধরনের ধমক দিয়ে উপন্যাসের কিস্তি জমা দিতে বলে। তেমন উচ্চমার্গের লিখতে পারি না বলে করুণাবশত বর্ণিনী গোপনে নিয়ম ভেঙে আমাকে বহুবার সুবিধে করে দিয়েছে। তারিখ চলে যাওয়ার পরও লেখার কিস্তি জমা দিয়েছি বারবার। কীভাবে যেন সে ম্যানেজ করেছে। আর কেউ না জানুক, আমি জানি তার এই পক্ষপাত ছাড়া 'ঝিলডাঙার কন্যা' শেষ হত না। মাঝপথে থমকে যেত।

মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনার সবিতেন্দ্রনাথ রায়, মণীশ চক্রবর্তীকে প্রণাম এবং ধন্যবাদ জানানোর কোনো অর্থ হয় না। এই বইটি তৈরির সময় তাঁরা আমাকে সীমাহীন প্রশ্রয় দিয়েছেন। যাঁরা এত প্রশ্রয় দেন তাঁরা প্রতিদানে কিছু আশা করেন না।

প্রিয় পাঠক, আমি কোনো বড়ো মানুষ নই, খুব সামান্য একজন লেখক। আমার আশা আছে। আমি আশা করব 'ঝিলডাঙার কন্যা'কে আপনারা ভালোবাসবেন।

নভেম্বর ২০০৯ **প্রচেত গুপ্ত**

boierpathshala.blogspot.com

এক

লোকটা প্রশ্নের জবাব দিল না।

মাথা নামিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'ডাক্তারবাবু, আমার মেয়েটাকে বাঁচান।' বলার ভঙ্গিটা এমন, যেন সে নিজেই নিজেকে বলছে, 'মেয়েটাকে বাঁচান।'

সুদর্শন রায় একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর শান্ত গলায় আবার প্রশ্নটা করলেন। পাকা চুলের সৌম্যদর্শন এই মানুষটাকে শান্ত গলায় সুন্দর লাগে।

'আপনি কি জানেন নিতাইবাবু, আপনি কী বলছেন?'

নিতাই এবার মুখ তুলল।

'না ডাক্তারবাবু, আমি জানি না। জানি না বলেই এতদূর ছুটে এসেছি। আমাদের ঝিলডাঙা এখান থেকে পাক্কা আড়াই ঘণ্টার পথ। শুকনো সময় বলে আড়াই ঘণ্টা। বর্ষায় আরও বেশি লাগে। তখন রাস্তা থাকে খানাখন্দে ভরা। অবিশ্যি মল্লিকপুর পর্যন্ত যেতে পারলে একটা শর্টকাট আছে। বড়ো রাস্তা ছেড়ে হেঁড়ো, সাবুইপাড়া হয়ে যেতে হয়। তবে সে-পথ ভালো নয়। গাড়িঘোড়া কিছু যায় না। শুধু সাইকেল যায়, নইলে মাঠঘাট, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটা। আল ধরেও যেতে হয় খানিকটা। মাঝখানে খাল পড়ে। সাপ আছে। তবে জলের সাপ তো, ভয় নেই। জলের সাপে ভয় থাকে না। ভয় ডাঙার সাপে।'

সুদর্শন রায় বিরক্ত হলেন। রোগী হলে বিরক্ত হতেন না। রোগী বেশি কথা বললে ভালো। অসুখ ধরতে সুবিধে হয়। কিন্তু এই লোক রোগী নয়, রোগীর বাবা।

boierpathshala.blogspot.com

'আপনার কাছে কি আমি আপনার গ্রামের ইতিহাস, ভূগোল জানতে চেয়েছি?'

'না চাননি।'

'তবে বলছেন কেন?'

নিতাই কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'ভুল হয়ে গেছে ডাক্তারবাবু। আর বলব না।'

এমনিতেই চল্লিশোর্ধ্ব মানুষটার চেহারাতে একটা জড়োসড়ো ভাব আছে। গ্রামের গরিব মানুষের যেমন হয়। রোগা পাতলা, চোয়াড়ে মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সর্বক্ষণ সিঁটিয়ে আছে। ধমকে লোকটা আরও জড়োসড়ো হয়ে পড়ল। সুদর্শনবাবু এবার খানিকটা সহজ গলায় বললেন, 'ঠিক আছে, আসল কথায় আসুন। আপনি তাহলে মনে করছেন, আপনার বারো বছরের মেয়ে ঝড়ের খবর আগে বলতে পারে?'

'বারো নয়। বারো হতে এখনও তিন মাস বাকি আছে।'

'ও, তাহলে আরও ছোটো। এই বয়েসেই সে এসব পারে?'

'হ্যাঁ পারে। শুধু ঝড় না, বৃষ্টিবাদলাও পারে। গেল আশ্বিনে যে-বন্যা হল, সেটাও বলে দিয়েছিল। পনেরো দিন আগে বলেছিল। না, না পনেরো নয়, তেরো দিন আগে। মেয়ের মা, ক্যালেন্ডারে দাগ দিয়ে রেখেছে।'

'কী বলেছিল?' ডাক্তার রায় ভুরু কোঁচকালেন।

'বলেছিল, কুলাইতে বান আসবে। মাঠ ভরে যাবে। খেত, পথঘাট ডুববে। পুকুর ছাপিয়ে বাড়ির উঠোন পর্যন্ত জল আসবে, তবে ঘরে ঢুকবে না। ডাক্তারবাবু, কুলাই আমাদের গ্রামের পুব দিকে। নামেই নদী। জল নাই, সারা বছর শুকনা থাকে।'

ডাক্তার রায় কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। হাতের পেনটা টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে সুদর্শন রায় বললেন, 'আমি আপনাকে আবার একই কথা জিজ্ঞেস করছি। আপনি কি জানেন, আপনি কী বলছেন?'

নিতাই চোখ তুলল। ভয়-পাওয়া বড়ো বড়ো চোখ।

'না, ডাক্তারবাবু জানি না। বললাম তো, জানি না বলেই আপনার কাছে এসেছি। খুব ভয় লাগে। রাতে ঘুম ভেঙে যায়। দাওয়ায় গিয়ে বসে থাকি। কোনো কোনো দিন মালতীও উঠে আসে। পাশে বসে কাঁদে। আপনি আমাদের মেয়েটাকে বাঁচান।'

সুদর্শনবাবু উলটোদিকের চেয়ারে বসা নিতাইয়ের চোখের দিকে তাকালেন। মুখ দেখে মানুষ চেনা যায় না, কিন্তু মুখ দেখে মানুষ খানিকটা বোঝা যায়। এই

boierpathshala.blogspot.com

মানুষটাকে বুঝতে হবে। কেন সে এরকম একটা উদ্ভট কথা বলতে এতদূর ছুটে এসেছে? শুধুই কি মেয়ের অসুখ? নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে? কথায় আছে, গ্রাম দিকের মানুষজন সহজ সরল হয়। কথাটা পুরো সত্যি নয়। শহুরে মতলব, ধান্দাবাজি গ্রামের মানুষের মধ্যেও আছে। এখানে ডাক্তারি করতে এসে বেশ কয়েকবার সেরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। বাড়ি থেকে তাড়ানোর জন্য বউকে পাগল বানানোর কেস তো মাসে একটা-দুটো আসবেই। বেদম পিটিয়ে একেবারে 'রোগী' নিয়ে চলে আসে। একটা প্রেসক্রিপশন পেলেই হবে। ওষুধের দোকানে না গিয়ে আগে ছোটে উকিলের কাছে। পাগল বললে ডিভোর্স সহজ। পাগল মেয়েকে ঘরে রাখছি, টাকা দাও। সব মিলিয়ে খুব সাবধানে থাকতে হয়। নইলে ঝামেলায় পড়তে হবে।

সুদর্শনবাবুর ঝামেলা শুরু হয়েছে আজ সকাল থেকে। আসার সময় ট্রেনে সমস্যা হল। সিগন্যালে গোলমাল। হাওড়া ছাড়ার পরপরই গাড়ি দাঁড়িয়ে রইল ঝাড়া দেড় ঘণ্টা। বাকিটুকুও এসেছে নড়বড় করে। বিপদ এখানেই শেষ নয়। বানেরহাটে পৌঁছে দেখা গেল, আর এক সমস্যা। স্টেশনে রিকশা নেই! কাল রাতে ভাড়া নিয়ে লাস্ট ট্রেনের যাত্রীদের সঙ্গে রিকশাওলাদের মারপিট হয়েছে। তার জেরে রিকশা বন্ধ। রিকশাওলারা ভ্যান, ট্রেকার কিছুই চলতে দিচ্ছে না। সবাই হাঁটছে। ডাক্তার রায়কে স্টেশন থেকে সুমঙ্গলা ক্লিনিক পর্যন্ত হেঁটে আসতে হয়েছে। পথ কম নয়। শরীর যতই মজবুত থাকুক, একষট্টি বছর বয়েসে রোদে এতটা হাঁটা কষ্টের। একষট্টি শেষ হতেও বেশি দেরি নেই। আর মাত্র ক-টা মাস।

রোদে হাঁটতে হাঁটতেই ডাক্তার রায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আর নয়। এবার বানেরহাটে আসা বন্ধ করতে হবে।

এই ছোট্ট মফস্বল শহরে সুদর্শন রায় আসেন সপ্তাহে মাত্র একদিন। বুধবার। পয়সাকড়ির ব্যাপার নেই। রঞ্জনদের এনজিও সুমঙ্গলা নামের এই ক্লিনিকটা চালু করেছে পাঁচ বছর হয়ে গেল। দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে রোগী আসে। এর সঙ্গে একসময় সুনন্দারও যোগাযোগ ছিল। সে ওদের সঙ্গে কয়েকটা অনুষ্ঠানে গিয়েছে। স্ত্রী যুক্ত থাকায় কলকাতায় থেকেই রঞ্জনদের নানাভাবে সাহায্য করতেন সুদর্শনবাবু। স্যাম্পেলে পাওয়া ওষুধবিষুধ দিয়েছেন বিনি পয়সায়। তবে নিজে আসার ব্যাপার ছিল না। একদিন রঞ্জন চেপে ধরল।

'সপ্তাহে একটা দিন একটু ঘুরে যান স্যার। ক্লিনিকে সবাইকে এনেছি, শুধু সাইকিয়াট্রিস্ট কেউ নেই।'

'ওরে বাবা, এই বয়েসে অতদূরে গিয়ে চিকিৎসা করব? প্লিজ আমাকে

boierpathshala.blogspot.com

ছেড়ে দাও রঞ্জন।'

রঞ্জন বলল, 'আপনার থেকে অনেক কম বয়েসের ডাক্তারকে রিকোয়েস্ট করেছি। কেউ রাজি হচ্ছে না। অত দূরে বিনি পয়সায় বেগার খাটতে কে রাজি হবে? আসলে বয়স নয়, ইচ্ছেটাই ফ্যাক্টর। অথচ মাথা খারাপের রোগ নিয়ে এখনও পাড়াগাঁয়ে কী চলে ভাবা যায় না। বেশির ভাগ পেশেন্টকে পথেঘাটে ছেড়ে পালায় বাড়ির লোক। খুব বেশি হলে গাছের সঙ্গে বেঁধে ওঝা ডাকে। খুব খারাপ অবস্থা স্যার।'

সুনন্দা বলল, 'যাও না। সপ্তাহে তো মোটে একদিন। এরকম একটা ভালো জিনিস করেছে। সরকারি জায়গাগুলোর হাল তো জানোই। তা ছাড়া, রোজগার তো তোমার বন্ধ হচ্ছে না। হাসপাতাল, নার্সিং হোম, চেম্বার সবই তো রইল। একটা দিন না হয় ফ্রি সার্ভিস দিলে। দেখো, ভালো লাগবে।'

স্ত্রী-র অনুরোধ ফেলা কঠিন কোনো কাজ নয়। কিন্তু স্ত্রী-র 'গুডনেস' থেকে মুখ ফেরানো কঠিন। সুদর্শন রায় রাজি হলেন এবং সেই থেকে শুরু; আজও চলেছে। সুনন্দা মারা যাওয়ার পর শরীর মন, দুটোই ভেঙেছে, কিন্তু বানেরহাটে আসা থামাতে পারেননি সুদর্শনবাবু। তবে আর নয়। একসময় বেশ লাগত, একটা কাজ করছি, কাজ করছি মনে হত, এখন ক্লান্ত লাগে। ট্রেনের বদলে গাড়িতে এলে ধকল আরও বেশি। দিন দিন রাস্তার অবস্থা শোচনীয় হচ্ছে।

ডাক্তারবাবু নিতাইয়ের চোখের দিকে তাকালেন। না, লোকটার চোখ দেখে এখনই কিছু বোঝা যাচ্ছে না। শুধু একটা আতঙ্কের ভাব রয়েছে।

সুদর্শনবাবু বললেন, 'ঘটনা কতদিন আগে শুরু হয়েছে?'

'তারিখ মনে নেই, তবে সময়টা মনে আছে। গত শীতের গোড়ার দিকে ডাক্তারবাবু। কার্তিক মাসের নয় দশ হবে।'

'নয় না দশ? তাড়াহুড়ো করবেন না। ধীরেসুস্থে মনে করে বলুন।'

'মনে করেই বলছি। দশ তারিখ।'

'কী হল দশ তারিখ?'

'ফুল সেদিন বেলা করে ঘুম থেকে উঠল। আগের রাতে গায়ে জ্বর ছিল। সেই জ্বর শেষরাতের দিকে ঘাম দিয়ে ছাড়ে।'

'ফুল আপনার মেয়ের নাম?'

নিতাই দাঁত বের করে হাসল। আতঙ্কের ভাবটা খানিকটা যেন সরল মুখ থেকে। সম্ভবত পৃথিবীর সব বাবার বেলাতেই এই জিনিস ঘটে। সন্তানের নাম বলার সময় মুখ ঝলমল করে ওঠে।

boierpathshala.blogspot.com

'হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু, ফুল। ফুল মণ্ডল। তবে পাকা নাম নয়।'

'পাকা নাম নয় মানে! নামের আবার কাঁচা, পাকা কী!' ডাক্তার রায়ের গলায় বিস্ময়।

নিতাই উৎসাহ নিয়ে বলতে শুরু করে।

'জন্মের পর মেয়ের ঠাকুমা বললে, নাতনির নাম হবে ফুলের নামে। বাড়ির প্রথম সন্তানের নাম ফুলের নামে হলে বাড়ির মঙ্গল হয়। দ্বিতীয়জন হলে নাম দিতে হয় ঋতুর নামে। হেমন্ত, শরৎ, বসন্ত এইরকম। আর তিন নম্বর হলে হবে গিয়ে আপনার...'

সুদর্শনবাবু মুখ দিয়ে বিরক্তির আওয়াজ করে কঠিন গলায় বললেন, 'তারপর কী হল বলুন।'

নিতাইয়ের চোখমুখ দেখে মনে হল না, সে কঠিন গলার কারণ বুঝতে পেরেছে। সে আনন্দের সঙ্গেই মেয়ের নাম ইতিহাস বলে চলল।

'তারপর আর কী, মেয়ের মা বেঁকে বসলে। মালতী বললে, না, ফুলের নামে নাম হবে না। ফুলের নামে নাম হলে মেয়েদের কপালে শাশুড়ির লাথি ঝেঁটা জোটে। সে নিজেই নাকি তার সব থেকে বড়ো প্রমাণ। মেয়ের নাম দিতে হবে ঠাকুর দেবতার নামে। দুর্গা, লক্ষ্মী এইসব। আমি বললাম, আহা, বুড়ি বলছে এখন জুঁই, চাঁপা একটা কিছু দিয়ে দাও, পরে না হয় বদলে দেব। মালতী ঘ্যানঘ্যান করতেই লাগলে। এদিকে নাম ঠিক হওয়ার আগেই বুড়ি একদিন গেল পট করে মরে। সেই থেকে মেয়েকে আমরা শুধু ফুল বলে ডাকছি। পরে ভেবেছিলাম, একটা পাকা নাম দেব। সে আর হয়ে ওঠেনি। এখন তো এই ঝামেলা।'

কথা শেষ করে আবার দাঁত বের করে হাসল নিতাই। তারপর বলল, 'আচ্ছা, ফুল কি খুব খারাপ নাম ডাক্তারবাবু?'

সুদর্শন রায় বিরক্ত হতে গিয়েও হলেন না। সম্ভবত তিনি বুঝতে পারছেন, এই লোকের ওপর বিরক্ত হয়ে লাভ নেই। তিনি নীচু গলায় বললেন, 'না খারাপ নয়। দশ তারিখ কী হল, সেটা বলুন। ফুল কী করল?'

'ফুল ঘুম থেকে উঠে বললে, ঝড়জল হবে।'

'ঝড়জল হবে।'

নিতাই টেবিলের ওপর সামান্য ঝুঁকে পড়ল। গলা নামিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু ঝড়জল। সেইসঙ্গে বললে, ভয়ের কিছু নেই, খুব বড়ো কিছু হবে না। ঝড় হবে মোটামুটি, ঘর উড়বে না, তবে ঘরের চাল ভাঙবে।'

boierpathshala.blogspot.com

ডাক্তার রায় সোজা হয়ে বসলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন সামনে বসে থাকা মানুষটার দিকে। লোকটা কি নেশা করে? চোখের তলাটা ফুলে আছে না?

'কথাটা কাকে বলল নিতাইবাবু? আপনাকে?'

নিতাই শুকনো গলায় বলল, 'না, আমাকে নয়। মেয়ে আমার সঙ্গে বেশি কথা বলে না।'

'কেন? বলে না কেন?'

'আমাকে পায় কোথায়? আমি আর ক-টা সময় বাড়ি থাকি? জমিজমা নেই। অন্যের জমিতে কাজ পেলাম তো হল, নইলে মিস্তিরি মজুরের কাজ করি। গ্রামের বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়। ওই কথা ফুল তার মাকে বলেছিল।'

সুদর্শন রায় চোখ নামালেন। শুধু বদ মতলব নয়, পাড়াগাঁয়ের দিকে অনেক সময় বেশি নেশাভাং করা মানুষের একরকম হয়। কাছের লোকদের অপ্রকৃতিস্থ দেখে। এই মানুষেরও কি সেরকম হচ্ছে? নিজের মেয়েকে পাগল দেখছে? আর একটু শুনলে হয়তো বোঝা যাবে।

'তার মা কী বলল?'

'ঝড়ের কথা শুনে মেয়ের মা বললে, দুর গাধা, শীতে আবার ঝড়জল কীসের? দেখছিস না আকাশ কেমন ফ্যাটফ্যাট করে। মেয়ে বললে, তুমি দেখো মা, ঠিক বৃষ্টি হবে। জোর বাতাস দেবে। বাবা এলে দাওয়ার খুঁটিতে বেশি করে দড়ি দিতে বলবে। নইলে ওই খুঁটিও ভাঙবে। মেয়ের মা তখন চড় তুলে বললে, ওরে আমার বিরাট ঝড়জলের পণ্ডিত রে। বানিয়ে বানিয়ে কথা কইলে এবার চড় খাবি। মেয়ে তখন আবার বলল...'

সুদর্শন রায়ের ভুরু কুঁচকে গেল। বললেন, 'আবার বলল!'

'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। আবার বললে। বললে, দেখবে সত্যি কিনা। তারপর দু-দিন পরে...'

'কী হল দু-দিন পরে? বৃষ্টি হল?'

সুদর্শন রায় নিজেও এবার খানিকটা ঝুঁকে পড়লেন। টেবিলটা নড়বড় করছে। গঙ্গাকে বলতে হবে। গঙ্গা ক্লিনিকের পার্টটাইম ম্যানেজার কাম কম্পাউন্ডার কাউন্টারে বসে রোগীদের নাম লেখে। এক একজন করে ডাক্তারবাবুদের চেম্বারে পাঠায়। ছেলেটা ভালো। এই বানেরহাটেরই ছেলে। রঞ্জনরা দেখেশুনেই নিয়েছিল। টাকাপয়সা বেশি পায় না, তবে মন আছে। বিনি পয়সার রোগী দেখে খ্যাচখ্যাচ করাটাই স্বাভাবিক। গঙ্গা করে না। সমস্যা একটাই। ছেলেটার কবিতা লেখার অভ্যেস আছে। খুবই কাঁচা ধরনের কবিতা,

boierpathshala.blogspot.com

জেলার ছোটোখাটো পত্রপত্রিকায় মাঝেমধ্যে সেসব ছাপাও হয়ে যায়। আর সেটা হয় একটা বিরাট জ্বালাতনের ঘটনা। ক্লিনিকের ডাক্তারবাবুদের সেই পত্রিকা এক কপি করে উপহার দেয় গঙ্গা, আর মাঝেমধ্যেই এসে জিজ্ঞেস করে, 'ডাক্তারবাবু পড়লেন? কবিতা ভালো হয়েছে?'

নিতাই কাঁপা গলায় বলল, 'না, দু-দিন পরে বৃষ্টি হল না, শুধু আকাশে মেঘ এল। ভোরের দিকে অল্প অল্প মেঘ। ছানা কাটার মতো। সেই মেঘ সারাদিন ধরে চাপ বাঁধল, ঘন হল। শেষরাত থেকে শুরু হল বাতাস। ঠান্ডা শিরশিরানি বাতাস। বাতাসে জোর বাড়ল গিয়ে আপনার পরদিন, পরদিন বিকেলের পর। তারপর সন্ধে থেকে এল ঝেঁপে বৃষ্টি। গাঁয়ের লোক রেডিয়োতে খবর পেল, সমুদ্রের দিকে ঝড় হয়েছে, তিনদিন এই অবস্থা চলবে।'

সুদর্শন রায় চোখের চশমা খুলে টেবিলে রাখলেন। তাকালেন উলটোদিকের চেয়ারে বসে থাকা নিতাইয়ের দিকে। ময়লা ধুতির ওপর একটা নীল রঙের ফতুয়া পরেছে লোকটা। রং চটে সেই নীল ফ্যাকাশে মেরে আছে। রোদে পুড়ে গায়ের রং বাদামি। মনে হচ্ছে, কথা বলতে বলতে লোকটার চোখের আতঙ্ক শরীরেও খানিকটা নেমে এসেছে। মলিন ছাতার হাতলটা চেপে ধরে বসে আছে। এই ধরনের মানুষরা ছাতার হাতল চেপে ধরে ভরসা খোঁজে।

গলা খাঁকারি দিয়ে নিতাই বলল, 'ডাক্তারবাবু, রেডিয়োতে তিনদিন বললেও সেই ঝড়জল কিন্তু তিনদিন চলেনি। একদিনেই বাতাস কমল, বৃষ্টিও ধরল।'

'আর আপনার ঘরের ছাউনি? ছাউনি ভেঙেছিল?'

'না, ভাঙেনি। একদিকটা একটু হেলেছে মাত্র। কতদিনের পুরোনো বাঁশ। পয়সাকড়ির অভাবে সারাই হয়নি। তারপরে বৃষ্টির জোর ছিল খুব।'

ডাক্তার রায় দুটো পা টান টান করে ছড়িয়ে দিলেন টেবিলের তলায়। হাত জড়ো করে আঙুলগুলো দিয়ে নিজের চিবুকে টোকা মারতে মারতে বললেন, 'পরের ঘটনার সময়টা মনে আছে আপনার?'

'হ্যাঁ, মনে আছে। তখন সন্ধ্যা লাগব লাগব করে। ফুল সেই সময় বললে।'

'সেটাও কি ঝড়বৃষ্টির কথা ছিল?'

নিতাই এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'না, ডাক্তারবাবু। সেটা ঝড়জলের কথা ছিল না, ছিল আগুনের কথা।'

সুদর্শন রায় চমকে উঠলেন। কী বলতে চাইছে লোকটা? তার এগারো বছর ন-মাসের মেয়ে ঝড়বৃষ্টির মতো আগুনের কথাও আগাম বলতে পারে!

boierpathshala.blogspot.com

লোকটা কি রসিকতা করছে?

সুদর্শন রায় গঙ্গাকে দিয়ে দু-কাপ চা আনিয়েছিলেন। নিতাই কাপের দিকে তাকিয়ে সহজভাবে বলল, 'কিছু খাবার হবে ডাক্তারবাবু? ভেবেছিলাম বাস থেকে নেমে দোকানে ঢুকে খেয়ে নেব। তারপর ভাবলাম, থাক, দেরি হয়ে যায় যদি!'

সুদর্শন রায় গঙ্গাকে ডেকে টোস্ট আনতে দিলেন। টোস্ট পাওয়া গেল না। কচুরি পাওয়া গেল। কচুরি আর ছোটো আলুর তরকারি। তাও আলু কম, ঝোল বেশি। কচুরিও গরম নয়।

নিতাই গঙ্গার দিকে ফিরে বলল, 'ঠান্ডা-গরমে অসুবিধে নেই, পেট ভরলেই হবে।'

ডাক্তারবাবুর ঘরে বসেই অতি মনোযোগ সহকারে চারটে কচুরি খেল নিতাই। তরকারির ঝোল খেল ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে। গঙ্গার আপত্তি ছিল। সে চেয়েছিল বাইরে এসে খেয়ে নিক। চেম্বার নোংরা হবে।

'আপনি এদিকে আসুন। বাইরে টুল দিচ্ছি।'

সুদর্শনবাবু বললেন, 'থাক, এখানেই বসুক। তুমি বরং টেবিলে একটা পুরোনো খবরের কাগজ-টাগজ কিছু পেতে দাও গঙ্গা।' সুদর্শনবাবু লোকটাকে চোখের আড়ালে পাঠাতে রাজি নন। খাওয়া শেষ করে অনেকটা জল খেল নিতাই।

'এবার বলুন। আগুনের কথা কী বলছিলেন যেন।' ডাক্তার রায় বললেন।

নিতাই ঠোঁট থেকে জল মুছল।

'তখন মালতী বাজারে না কোথায় গিয়েছে। আমিও বেরোব বেরোব করছি। সন্ধের পর একটু ফটো-ভবার ওখানে যাই। রোজ যাই না। মাঝেমধ্যে যাই।

সুদর্শন রায় জামার কাঁধ থেকে ধুলো ঝাড়লেন। চিকিৎসকের পরিচ্ছন্নতা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চিকিৎসার অংশ। রোগীর মনে ভরসা আসে। আগে ব্যাগে একটা জামাও আনতেন। সুনন্দা দিয়ে দিত। আজকাল হয় না।

'ফটো-ভবা কে?'

নিতাই মুখ নামিয়ে বলল, 'বাজারের পাশে ইস্টুডিয়ো আছে। সেই কারণে ফটো-ভবা। তবে ফটো কিছু তোলা হয় না। সন্ধের পর একটু...'

'আপনি নেশা করেন? মদ?'

নিতাই লজ্জা পায়। মুখ নামিয়ে বলে, 'রোজ মদের পয়সা পাব কোথা

boierpathshala.blogspot.com

থেকে? মাঝেমধ্যে গাঁজাও খাই। তাও রোজ না, মাঝেমধ্যে। অল্প। বিশ্বাস করেন অল্প।'

ডাক্তার রায় হাত তুলে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। মেয়ে আপনাকে ডেকে আগুনের কথা বলল?'

'না ডেকে বলেনি। আমি দেখি ফুল ছটফট করে।'

'ছটফট! ছটফট করে মানে?'

'একবার বসে, একবার ওঠে। বারবার ঘর ছেড়ে দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। আমি ধমক দিলাম। বললাম, অ্যাই, ফুল কী হয়েছে? হ্যারিকেন জ্বেলে পড়ার বই নিয়ে বস। মেয়ে বললে, কিছু না। মা কই? আমি বললাম, কিছু না তো অমন ঘর বার করিস কেন? মেয়ে আবার বললে, বাবা, মা কই গেল? আমি বললাম, মা বাজারে গিয়েছে। তুই ভেতরে আয়। মেয়ে ঘরে এসে মাদুরে বসলে। কিন্তু বেশিক্ষণ পারলে না। একটু পরেই উঠে পড়লে। আমি আবার জোরে একটা ধমক দিলাম। এই অন্ধকারে বাইরে কোথায় যাস? মেয়ে বললে, বসতে পারি না, বাবা গরম লাগে। আমার কেমন যেন লাগল। সন্দেহ হল ডাক্তারবাবু।'

'সেটা কি গরমের সময় ছিল?'

'হ্যাঁ, গরমের সময় ছিল।'

ডাক্তার রায় চোখ সরু করে নিতাইয়ের দিকে তাকালেন। বললেন, 'তাহলে আপনার সন্দেহ হল কেন? গরমের সময় গরমই তো লাগার কথা। লাগবে না?'

নিতাই মাথা নেড়ে বলল, 'না লাগবে না। ওই সময়টায় ঠান্ডা বাতাস ছাড়ে। গাছগাছালির মাঝ দিয়ে সেই ঠান্ডা বাতাস যখন আমাদের বাড়ি পর্যন্ত আসে তখন আরও ঠান্ডা হয়ে আসে। তা ছাড়া ছটফট করার মতো গরম তখনও হয়নি। আমি মেয়েকে বললাম, এদিকে আয়। জ্বর এল কিনা দেখি। ফুল বললে, না জ্বর নয় বাবা, আগুনের তাতের মতো লাগে। হাত পায়ে জ্বালা জ্বালা করে। মনে হয় উনুনের পাশে বসে আছি। কথাটা আমার ভালো লাগল না। এ কেমন কথা? উনুনের পাশে বসে আছি কোনো একটা কতা হল? তবু আমি জোর করে হেসে বললাম, ও কিছু নয়। মা এলে বলিস, গা ধুয়ে দেবে। তবে খবরদার মাথা ভেজাবি না। ঠান্ডা লাগিয়ে তখন সত্যি সত্যি জ্বর বাধাবি। মেয়েটার আবার যখন তখন জ্বর বাধে। বড্ড দুবলা। দেখলে কে বলবে বারো বছর হতে চলল।'

নিতাই চুপ করল। ডাক্তার রায় ধৈর্য ধরতে পারছেন না। বললেন, 'তারপর?'

boierpathshala.blogspot.com

'সেদিন অনেক রাতে চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল ডাক্তারবাবু। ধড়ফড় করে বাইরে এসে দেখি, আকাশ লাল। আর অন্ধকারের মাঝে আগুন জ্বলেছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে।'

হাত তুলে উত্তেজিতভাবে বলল নিতাই। তার চোখ দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন এখনও সেই আগুন দেখতে পাচ্ছে!

সুদর্শনবাবু সোজা হয়ে বসলেন। তিনি নিজেও উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছেন না।

'সে কী! আগুন জ্বলছে! আপনার বাড়িতে আগুন জ্বলছে?'

'না, আমার বাড়িতে নয়। আগুন জ্বলছে খানিকটা দূরে। মাইতিদের গোডাউনে। ফট ফট করে বাতাসে আওয়াজ হয়। ধোঁয়ার গন্ধ, পোড়ার গন্ধ। অন্ধকারে কালো ধোঁয়ার দলা পাক মেরে মেরে ওঠে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা গ্রাম জেগে উঠল।'

ডাক্তার রায় আবার চেয়ারে হেলান দিলেন। নিজেকে শান্ত করলেন। বললেন, 'ওই সময় আপনার মেয়ে কী করছিল?'

নিতাই মুখ নামিয়ে টেবিলের কোনা খোঁটে। খুঁটতে খুঁটতেই নীচু গলায় বলল, 'কিছু করেনি, ঘুমোচ্ছিল। ডাক্তারবাবু, ঝড় বন্যার কতায় অত গুরুত্ব দিইনি। তবে আগুনের পর আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। ফুলের মা কান্নাকাটি শুরু করে দিল। গরিবের ঘরে এ-কী কাণ্ড? আমি ভাবলাম, গোপীনাথের কাছে যাই। ওকে গিয়ে বলি সব। যদি কিছু করতে পারে।'

'গোপীনাথ কে?'

'আমাদের গাঁয়ের ডাক্তার। একমাত্র ডাক্তার। পাস-টাস কিছু নেই; তবে চিকিচ্ছের হাত ভালো। তার কাছে যাব শুনে মালতী ঘাবড়ে গেল। বললে, ঘটনা জানাজানি হয়ে যাবে না তো? হয়ে গেলে সব্বোনাশ। সবাই বলবে মেয়েকে ভূতে পেয়েছে। সেই ভূত ছাড়াতে কালিকে ডাকবে।'

ডাক্তার রায় অস্ফুটে বললেন, 'কালী! আপনি কি কালীঠাকুরের কথা বলছেন?'

নিতাই বিড়বিড় করে বলল, 'না, কালি ওঝা। আমাদের গ্রামে ভূতে পেলে সাঁবুই থেকে তাকে খবর দিয়ে আনা হয়। সে ভূত তাড়ানোর চিকিচ্ছে করে। সেই চিকিচ্ছে ভয়ংকর। হারাধনের ঘটনার পর থেকে ঝিলডাঙায় এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

'হারাধন!'

boierpathshala.blogspot.com

ডাক্তার রায় নড়েচড়ে বসলেন। লোকটা একটার পর একটা চরিত্র বাড়াচ্ছে। গল্প বিশ্বাস করানোর জন্য এটা একটা কমন প্র্যাকটিস। অনেকেই এই পদ্ধতি নেয়। নিতাই নামের এই লোকটাও কি সেরকম কিছু করতে চাইছে?

মুখের কাছে হাত মুঠো করে নিতাই কাশল। কাশি ঠিকমতো হল না। তারপর বলতে শুরু করল।

'ডাক্তারবাবু, হারাধন আমাদের গাঁয়ের ছেলে। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের জোয়ান মদ্দ, তাগড়াই। সে ছিল গাছে ওঠায় ওস্তাদ। তরতর করে খেজুর গাছে উঠে যেত একটানে। হারামজাদা পায়ে দড়ি পর্যন্ত বাঁধত না। শীতের সময় রস নামাতে তাকে নিয়ে টানাটানি পড়ত। লাজুক স্বভাবের সেই ছেলের হঠাৎ যে কী হল, মাথা গেল বিগড়ে। সবাই বললে, ভূতে পেয়েছে। সেই ভূত হারার ঘাড়ে চেপে বসে মানুষজনকে বাঁশ পেটা শুরু করলে। যারে সামনে পায় তারেই পেটায়। ঘরে বাইরে কেউ বাদ নাই। নিজের বাপ-মায়েরেও মারে, পাড়া-প্রতিবেশীদেরও তাড়া করে। মুশকিল হল, এই কাণ্ড যে হারা সবসময় করত এমন নয়। যখন করত না তখন সে ছিল অতি ভদ্র। মাথা নীচু করে পথে হাঁটে। লোক দেখলে সরে পথ ছাড়ে। বয়স্কদের হাতজোড় করে বলে, আপনে ভালো আছেন? তখন কে বলবে, এই ছেলের মাথা বিগড়েছে? একদিন কাদু পড়ল হারাধনের সামনে।'

'কাদু? সে আবার কে?' ডাক্তার রায় ভুরু কুঁচকে বললেন। সত্যি মিথ্যে যাই হোক লোকটার গল্প বলার কায়দা ভালো।

কোনো প্রয়োজন ছিল না, তবু ঘাড় ঘুরিয়ে নিতাই পিছনে তাকাল। গলা একেবারে খাদে নামিয়ে বলল, 'সে অতি বদ লোক ডাক্তারবাবু। পারে না এমন কাজ নেই। সামনে ভালো সাজে, তলেতলে বিরাট হারামজাদা। টাকা প্রচুর। বাপের দু-দুটো চাল কল, একটা কোল্ডইস্টোরেজ আছে। পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগসাজোশ। পুলিশের সঙ্গেও দহরম-মহরম। বেনামে পাঁচটা গ্রামে জুয়ার আড্ডা চালায়।'

সুদর্শনবাবু নিজের মনেই বললেন, 'ওস্তাদ লোক।'

সেই কাদু একদিন পড়ল ভূতে পাওয়া হারাধনের সামনে। একবারে বাজারের মাঝখানে। বলা নেই কওয়া নেই। বাখারি তুলে হারা কাদুর পিঠে লাগাল কয়েক ঘা। এলোপাথাড়ি ঘা। তারপর সেই বাখারি মাথার ওপর তুলে করলে তাড়া। গোটা বাজার দৌড় করাল শুয়োরের বাচ্চাটারে। কাদুর জুতো গেল ছিটকে, জামা ছিঁড়ল, পায়জামাও খোলে খোলে অবস্থা। কোনোরকমে

boierpathshala.blogspot.com

দু-হাতে আঁকড়ে ছুটল। ডাক্তারবাবু, আপনি না দেখলে বিশ্বাস করবেন না, হারার সেই মূর্ত্তি যেন মানুষের ছিল না। ভয়ে কাদুর চ্যালাচামুণ্ডারাও পর্যন্ত কাছে যেতে সাহস পায় না। শেষ পর্যন্ত হারা যখন শান্ত হয় তখন দেখা গেল কাদুর হাত পা কিছু ভাঙেনি, তবে কেটে ছড়ে একাক্কার কাণ্ড। সবাই তো ভয়ে মরে। এবার একটা হবে কিছু। কাদু ছাড়বার পাত্র নয়। হলও তাই, পরদিনই কাদু সাঁবুই থেকে কালিকে খবর দিয়ে আনাল। কালি ওঝা। কালি বলল, ওই ছেলে আর ছেলে নেই। ভূত হয়ে গিয়েছে। ভূতের গায়ে আবার কাপড়চোপড় কীসের হে? ভালো করে বেঁধে, খোল সব।'

নিতাই চুপ করল। তাকিয়ে রইল শূন্যের দিকে। সে যেন কিছু দেখতে পাচ্ছে। ভয়ংকর কিছু। তারপর নীচু গলায় বলতে শুরু করল আবার।

'ডাক্তারবাবু, হারাধনকে নেংটা করে গোটা গ্রামে ঘোরানো হল সেদিন। কাদুর চেলারা পেছনে ক্যানেস্তারা বাজাল। বাজায় আর হ্যা হ্যা করে হাসে। বলে, ভূত তাড়ানোর বাজনা বাজাই। ভূত গেল কিনা জানি না, তবে ক্যানেস্তারার আওয়াজে গাঁয়ের সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। সারি দিয়ে দাঁড়াল রাস্তার ধারে। হারাধন গাধাটা প্রথমে বুঝতে পারেনি। দাঁত বের করে হাসছিল আর মাঝেমধ্যে হাতজোড় করে বলছিল, ভালো আছেন তো? ভালো আছেন তো আপনারা? তখনও নিশ্চয় ভূত ঘাড়ে। নইলে ওই অবস্থায় কেউ অমন কথা বলতে পারে? বলেন ডাক্তারবাবু পারে কখনও? পরে সেই ভূত নামতে লজ্জার কথা মনে পড়ল ছেলেটার। হাউ হাউ করে কাঁদছিল ডাক্তারবাবু। খুব কাঁদছিল। বারবার হাত দিয়ে মুখ ঢাকতে চেষ্টা করছিল। লজ্জা ঢাকতে চেষ্টা করছিল। পারছিল না। সেদিন বাজারে দাঁড়িয়ে কাদু নিজে ঘোষণা করল, এবার থেকে ঝিলডাঙায় কাউকে ভূতে পেলে তার এই চিকিচ্ছেই হবে। নেংটা চিকিচ্ছে। এটা যেন সবাই মাথায় রাখে।'

কথা শেষ করে মাথা নামাল নিতাই। একটু শিউরেও উঠল কি? হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। ফিসফিস করে বলল, 'তিনদিনের মাথায় হারাধন নিজেকে মারে। খেজুর গাছে দড়ি লাগিয়ে ঝুলে পড়ে। পাগল মানুষ। তার ওপর সে ছিল গাছে চড়ায় ওস্তাদ। নিজেকে মারতে সে যে গাছই বাছবে এতে আর আশ্চর্যের কী আছে। তাই না?'

ডাক্তার রায় চুপ করে রইলেন।

নিতাই বলল, 'তবু আমি গোপীনাথের সঙ্গে দেখা করি। সে লোক পাস না দিক, ভেতরে ভালো। দরজা বন্ধ করে বললে, তোমার কথা শুনে কিছু বুঝতে

boierpathshala.blogspot.com

পারি না নেতাই। তবে সমস্যা কঠিন। মাথারও হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। আমাকে দিয়ে কাজ হবে না। তুমি এক কাজ করো, বড়ো ডাক্তারের কাছে যাও। বলে আপনার এই জায়গার ঠিকানা দিলে। সাবধান করে বলল, চুপি চুপি যেও। শুনেছি কাদু বেটা নাকি আজকাল ভূতে-পাওয়া মানুষ খোঁজে। বলে গাঁয়ে অনেকদিন মশকরা হয়নি। ভূত পেলে মশকরা হবে। তুমি এখনই মেয়েরে নিয়ে যেও না নেতাই, জানাজানি হলে সন্দেহ হবে। তুমি একা যাও। ডাক্তার বললে, মেয়েকেও নিয়ে যাবে। ডাক্তারবাবু, একটু জল হবে?'

সুদর্শন রায় টেবিলের পাশে রাখা নিজের জলের গ্লাসটা এগিয়ে দিলেন। একটানে গ্লাস শেষ করে নিতাই তালুর উলটো পিঠ দিয়ে মুখ মোছে। কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মোছে।

'ডাক্তারবাবু মেয়েটা ভালো হবে তো? আজকাল হঠাৎ হঠাৎ ক্যানেস্তারা পেটানোর আওয়াজ পাই। চমকে চমকে উঠি। মালতী বলে, কী হল? আমি বলি কিছু না।'

এবার যেতে হবে। ডাক্তার রায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পেন, স্টেথো, প্যাড নিজের ব্যাগে পুরলেন। টেবিলের দিকে মুখ নামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর নরম গলায় বলতে শুরু করলেন।

'আপনারা কোথাও ভুল করছেন নিতাইবাবু। কোথায় ভুল করছেন আমি বুঝতে পারছি না, তবে ভুল করছেন এটা বুঝতে পারছি। আমি এখনও ঠিক জানি না, আপনার মেয়ের আদৌ কোনো অসুখ হয়েছে কি না? আমার মনে হচ্ছে, হয়নি। কতগুলো কাকতালীয় ঘটনাকে সুতোর মতো জুড়ে জুড়ে আপনারা একটা ধারণা তৈরি করেছেন। মনে করছেন সে বিশেষ একটা ক্ষমতার অধিকারী। যে-ক্ষমতা মানুষের নেই। থাকতেও পারে না নিতাইবাবু। কোনো মানুষের পক্ষেই প্রকৃতির বিপদ, বিপর্যয় আগাম বোঝা সম্ভব নয়। তাও বয়স্ক, অভিজ্ঞ মানুষ হলে একটা কথা ছিল। আপনি জানেন মাঠের চাষি অনেক সময় আকাশ দেখে বৃষ্টির কথা খানিকটা আঁচ করতে পারেন। কিন্তু তা কি মেলে? বেশিরভাগ সময়ই মেলে না। সমুদ্রে মাছ ধরার সময় জেলেরা হাওয়ায় হাত পেতে ঝড়ের পূর্বাভাস বুঝতে চান। বুঝতে পারেন না। পেলে ঝড়জলে নৌকো ডুবে এত মানুষ মারা যেত না। নিতাইবাবু, আপনাদের মেয়ে খুবই ছোটো। মাত্র বারো বছর বয়স। তাও হয়নি। এখনই সে আকাশ, বাতাসের কী বুঝবে? আপনারা ভুল করেছেন।'

নিতাই উঠে দাঁড়ায়। হাতদুটো জোড় করে বলে, 'আপনি বলছেন ফুলের

boierpathshala.blogspot.com

কিছু হয়নি? সত্যি কিছু হয়নি?'

আনন্দে লোকটার গলা ভিজে এসেছে কি?

সুদর্শন রায় উঠে দাঁড়ালেন। লম্বা চওড়া মানুষটার শরীরের ভেতরে ক্লান্তি থাকলেও বাইরে সে-ছাপ নেই। সবসময়ই উজ্জ্বল লাগে। এখনও লাগছে। তিনি সুন্দর করে হাসলেন।

'দেখুন ভাই, অসুখ হয়েছে যেমন চট করে বলা যায় না, তেমনি অসুখ হয়নি এটাও চট করে বলা যায় না। তবে আমি অনেকটাই নিশ্চিন্ত যে রোগীর বাবা, মা যদি বুঝতে পারে, এটা 'অসম্ভব' যা হয়েছে তা কোয়েনসিডেন্স মাত্র, মানে হঠাৎ মিলে গিয়েছে, তাহলে সমস্যার অনেকটাই সমাধান হয়ে যাবে। এই হঠাৎ মিলে যাওয়ার ব্যাপারটা পরপর অনেকবার হওয়ায় আপনারা বিচলিত হয়ে পড়েছেন। হয়তো সে আরও বলছে, কিন্তু সেগুলো মেলেনি। যেগুলো মিলছে না, সেগুলোকে হিসেবের মধ্যে আপনারা ধরছেন না। মনে হয় না, এরকম আর হবে। ঘটনাগুলো যত তাড়াতাড়ি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেন ততই ভালো। তারপর ওই কোন একটা গুণ্ডা ধরনের লোকের কথা বললেন না? ওই যে আপনাদের গ্রামে?'

'কাদু। কাদু ডাক্তারবাবু।'

'হ্যাঁ, ওই লোকটার প্রতি একটা ভয় আপনাদের সাবকনশাসে, মানে অবচেতন মনে কাজ করছে। তার ওপর ওই মাথা খারাপ ছেলেটির আনফরচুনেট ইনসিডেন্স। সেটারও একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সবটা মিলিয়ে তালগোল পাকিয়েছে।'

কথা শেষ করে ডাক্তার রায় টেবিল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। নিতাই বাঁ হাতের চেটো দিয়ে চোখ মোছে। বলে, 'ডাক্তারবাবু আমি কি ফুলকে একদিন নিয়ে আসব?'

ডাক্তার রায় নিতাইয়ের কাঁধে হাত রাখেন। সামান্য হেসে বলেন, 'মেয়েকে আনবেন কেন? সমস্যাটা তো ওর বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, ওর বাবা-মায়ের। ওর কাছে এটা একটা খেলা মাত্র। ক-দিন পরেই দেখবেন সে অন্য খেলা খেলছে। আমার মনে হয় কাউন্সেলিং যদি কিছু করতেই হয়, আপনাদের দুজনের করাই উচিত। আশা করি আপনি আমার কথায় ভরসা পেয়েছেন। বুঝতে পেরেছেন, এটা হতে পারে না। বাড়ি ফিরে আপনার স্ত্রীকে ভালো করে বোঝান। তারপরও যদি মনে করেন, অবশ্যই নিয়ে আসবেন। বুধবার আমি এখানে আসি। সেরকম হলে আমি আপনার স্ত্রীকেও বুঝিয়ে বলব।'

boierpathshala.blogspot.com

নিতাই লজ্জা লজ্জা মুখে হাসল। বলল 'এইটা হবে না ডাক্তারবাবু। ফুলের মা এখন এতটা পথ আসতে পারবে না। তার পেটে বাচ্চা!'

ডাক্তার রায়ের ভুরু আরও কুঁচকে গেল। প্রেগন্যান্ট অবস্থায় হরমোনের ব্যালান্সে অনেক সময় গোলমাল হতে পারে। সেই সময় নানাধরনের অস্বাভাবিক ধারণা তৈরি হওয়াটা আশ্চর্যের নয়। ফুলের মায়ের সেরকম কিছু হয়নি তো? সেটাই হয়তো স্বামীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। নেশার সময় চাপালে তো কথাই নেই। মহিলার সঙ্গে একবার কথা বলতে পারলে হত। তিনি খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবেই বললেন, 'না না থাক। আসতে হবে না।'

ঘর থেকে বেরিয়ে সুদর্শন রায় হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলেন। চারটে দশের গাড়িটা কি ধরা যাবে? গঙ্গাকে ডেকে বলে গেলেন, ভেতরে নীল ফতুয়া পরা যে মানুষটা বসে আছে, তাকে যেন আবার এক কাপ চা খাইয়ে তবে এখান থেকে ছাড়া হয়। পকেট থেকে কুড়ি টাকার একটা নোট বের করে তিনি গঙ্গার হাতে দিলেন।

গঙ্গা বলল, 'চায়ের জন্য কুড়ি টাকা!'

ডাক্তারবাবু মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'বাকিটা লোকটাকে দিয়ে দিও। বোলো সে যেন তার মেয়ের জন্য মিষ্টি-টিষ্টি কিছু কিনে নিয়ে যায়।'

গঙ্গা একইসঙ্গে অবাক এবং খুশি হল। অবাক হল এই কারণে যে আজ পর্যন্ত সুদর্শন রায় কোনো রোগীকে মিষ্টি খাওয়ার টাকা দেননি। অন্য কোনো ডাক্তার দিয়েছে বলেও তার জানা নেই। তবে খুশির কারণ অন্য। সে নীল ফতুয়ার সঙ্গে কথা বলতে চায়। চা খাওয়া মানে কিছুক্ষণ কথা বলা যাবে। এই লোক আজ সকালে এসে যখন নাম লেখায় তখন থেকেই গঙ্গার কৌতূহল তৈরি হয়েছে। রোগীর নাম জিজ্ঞেস করায় বুকের কাছে ছাতা ধরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, তার নাম লেখার দরকার নেই। সে রোগী নয়। রোগী তার মেয়ে। মেয়ের নাম ফুল। ফুল মণ্ডল। বয়স এগারো বছর ন-মাস। আর অসুখ? সেই প্রশ্নের উত্তরে লোকটা বলে, 'লেখেন অসুখ, ঝড়বাদলা এবং আগুনের আগাম খবর পাওয়া।'

তখনই গঙ্গা বুঝতে পেরেছিল, রোগী আসলে এই মানুষটাই। এই লোকের সঙ্গে কথা না বললে চলে?

হেঁটে ডাক্তার রায় যখন স্টেশনে পৌঁছলেন তখন চারটে দশের ট্রেন বেরিয়ে গিয়েছে। সন্ধে সাতটার আগে কলকাতা ফেরার কোনো গাড়ি নেই।

boierpathshala.blogspot.com

দুই

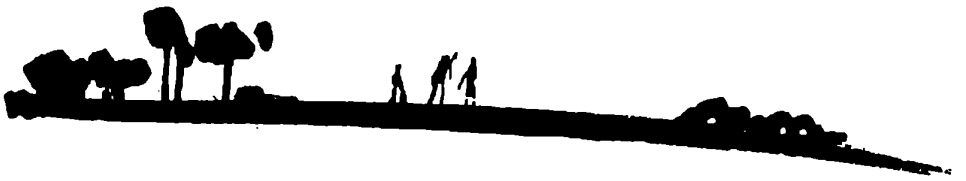

একেকটা চেহারা একেকটা কাজের জন্য। যে-চেহারা রাগারাগির তাকে হাসিখুশিতে মানায় না। মনে হয়, বাইরে যতই হাসুক না কেন, এই মানুষের ভেতরে ঘটনা অন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই এর চোখমুখ লাল হয়ে যাবে। তারপর এমন চেঁচামেচি জুড়বে যে সামলানো মুশকিল হয়ে যাবে। উলটোটাও আছে। ঠান্ডা ঠান্ডা চোখমুখের মানুষের মেজাজ গরম দেখলে অস্বস্তি হয়। মনে হয়, ঠিক হচ্ছে না। কোথাও যেন একটা গোলমাল রয়েছে।

কথাকলির চেহারার সঙ্গে ধমক একেবারেই খাপ খায় না। তবু কাচের ওপাশ থেকে কথাকলি মুখ তুলে ধমক দিল। তারপর বাঁ হাতে চশমা ঠিক করে, মাথা নামিয়ে কাজে মন দিল।

এই মেয়েটার চেহারায় একটা অন্যরকম সৌন্দর্য আছে। উগ্র কিছু নয়, চাপা সৌন্দর্য। ঝট করে চোখে পড়ে না, একটু সাজগোজ করলে বোঝা যায়। আজ যাচ্ছে। আজ কথাকলি পরেছে সবুজ রঙের শাড়ি, জঙ্গল-সবুজ। আঁচলটা গাঢ়। এইমুহূর্তে সেই আঁচল কোলের ওপর তুলে রাখা। মনে হচ্ছে, জঙ্গলের খানিকটা মেয়েটার কোলের ওপর দিয়ে চলে গেছে।

কথাকলি বলল, 'আপনারা যদি শান্ত হয়ে না দাঁড়ান, আমি কিন্তু এখনই নাম লেখা বন্ধ করে দেব।'

শুধু চেহারায় নয়, কথাকলি সত্যি সত্যি ধমক দেওয়ার মেয়ে নয়। সে শান্ত প্রকৃতির মেয়ে। কিন্তু আজ সে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারছে না। কথায় কথায় ধমক দিয়ে ফেলছে। এর পিছনে দুটো কারণ আছে। একটা বাইরের কারণ, অন্যটা ভেতরের। বাইরের কারণ হল, কথাকলি কখনও রিসেপশনে বসে না।

boierpathshala.blogspot.com

এই অফিসের রিসেপশনিস্ট নন্দিনী। পাউডার, লিপস্টিক মাখা শুধু মিটিমিটি অফিসের রিসেপশনিস্ট নয়, নন্দিনী ভিড় সামলানোর ব্যাপারে একজন এক্সপার্ট। এই কাজের জন্য সে মূলত দুটো পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যায়। কথা-পর্যায় এবং চুপ পর্যায়। কথা-পর্যায়ে সে কখনও চুপ করে যায়, কখনও বকাঝকা দেয়। আবার কখনও ভুরু কুঁচকে, কখনও তুলে, কখনও নাচিয়ে নন্দিনী তার বিরক্তি, ঘৃণা, প্রশংসা প্রকাশ করে। পাবলিক সেই মতো রিঅ্যাক্ট করে। এই কাজ সহজ নয়, বেশ কঠিন কাজ। সেই কঠিন কাজ নন্দিনী পারে বলে অফিসে সহকর্মীদের কাছে তার খ্যাতিও রয়েছে। তার নাম দেওয়া হয়েছে রিসেপশন পটিয়সী। রিসেপশন পটীয়সী থাকলে ভিড়ের দিনগুলোতেও কোনো চিন্তা থাকে না।

আজ সেরকম একটা ভিড়ের দিন। সিরিয়াল, মেগাসিরিয়াল, গেম শো, টক শো, জোকস, কম্পিটিশন-এর অনুষ্ঠানগুলোর জন্য নাম লেখা চলছে। অডিশনের নাম। অডিশনে পাশ করলে তবে ক্যামেরার সামনে চান্স জুটবে। সকাল থেকে লোক আসছে। কাউন্টারে ঠেলাঠেলি। নন্দিনী ভিড় সামলাচ্ছিল। কিন্তু একঘণ্টা যেতে না যেতে ছেলের স্কুল থেকে টেলিফোন এল। ছেলে মাথা ফাটিয়ে বসে আছে। খবর শুনে সব ফেলে ছড়িয়ে ছল ছল চোখে ছুটেছে নন্দিনী। শিউচরণ ট্যাক্সি ধরে দিয়েছে।

এটাই কথাকলির মাথা গরমের বাইরের কারণ। ভেতরের কারণটা অবশ্য অফিসের বিষয় নয়। এই মাথা গরমটা শুরু হয়েছে কাল। কাল সন্ধের পর, বাড়িতে ফিরে, রাগ সাধারণত সময় গেলে কমে। এই ক্ষেত্রে উলটো হয়েছে। যত সময় যাচ্ছে কথাকলির রাগ কম থেকে বেশির দিকে যাচ্ছে। রাতে ঠিক-মতো ঘুম হয়নি। বারবার ঘুম ভেঙে গেছে। মনে হয়েছে, কিছু একটা করা উচিত। কিন্তু কী করা উচিত কথাকলি বুঝতে পারেনি। এখনও পারছে না। ফলে মেজাজ আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

কাউন্টারের গায়ে সেলোটেপে সাঁটা লম্বা কাগজ। মাথায় লাল কালি দিয়ে বড়ো বড়ো করে লেখা, 'নোটিশ'।

সেই নোটিশ এইরকম—

বিয়েবাড়ির ভিড়—বুধবার সকাল ন-টা।

সিরিয়াস আলোচনায় চুপ করে বসে থাকা দর্শক—মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটে।

খারাপ পাড়ার মেয়ে—সোমবার সকাল এগারোটা।

ওঠবোস—বৃহস্পতিবার বেলা দুটোর পর।

boierpathshala.blogspot.com

কীর্তনের দল—দিন এবং সময় দুটোই পরে জানানো হবে।

জোক্‌সের অনুষ্ঠানে সার্বক্ষণিক হাসিমুখের দর্শক—শুক্রবার দুপুর তিনটের পর যে-কোনো সময়।

চোর ও গুন্ডা—শনিবার দুপুর আড়াইটে থেকে।

নোটিশের তলায় ছোটো হরফে লেখা, 'প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রার্থীর পাসপোর্ট সাইজ ফটো আবশ্যিক। মনে রাখবেন, এই অডিশন কেবলমাত্র মুখ দেখানোর জন্য নেওয়া হবে। কোনো ডায়লগ নেই। অডিশনে পাস করলে সুযোগ দেওয়া হবে। দয়া করে, তখন ডায়লগ চেয়ে বিরক্ত করবেন না।'

কাগজের নীচে লেখা—'মল্লিক টিভি প্রোডাকশন'। কমল মল্লিকের সই। সইয়ের পাশে ব্র্যাকেটে লেখা ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মল্লিক টিভি প্রোডাকশনের অফিস আহামরি না হলেও খারাপ নয়। এক কোণে বুক পর্যন্ত উঁচু কাচ ঘেরা কাউন্টার। দু-পাশে সোফা। আজ ঘর ভর্তি। খানিক আগে পর্যন্ত অনেকেই দাঁড়িয়ে ছিল। আপাতত ভিড় কিছুটা কমেছে।

শুরুতে একা বেশ নাকানি-চোবানি খেতে হয়েছে কথাকলিকে। এখন অবস্থা খানিকটা সামলেছে। কথাকলি নিজেও বুঝতে পারছে, সমস্যা শুধু ভিড় নয়। আসলে সে কাজে পুরো মনটা দিতে পারছে না।

মুখ না তুলে সে বললে, 'নেক্সট? পরের জন কে আছেন?'

ব্যাগ বগলে মাঝবয়সি যে-পুরুষটি কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল তার চোখে-মুখে টেনশন। রুমাল দিয়ে ঘন ঘন মুখ মুছছে।

কথাকলি লিখতে লিখতে বলল, 'নাম কী?'

মাঝবয়সি থতমত খেয়ে উত্তর দেয়, 'পূর্ণেন্দু। পূর্ণেন্দু মাইতি। শ্রীপূর্ণেন্দু মাইতি ম্যাডাম।'

'তিনবার বলছেন কেন?'

মাঝবয়সি ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'ভুল হয়ে গেছে ম্যাডাম।'

'বয়স কত?'

মাঝবয়সি এতে আরও ঘাবড়ে গেল। জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে বিড়বিড় করতে শুরু করল। তারপর মুখের সামনে ডান হাতটা তুলে কর গুনতে শুরু করে ছেলেমানুষের মতো। কিছুক্ষণের মধ্যে চোখমুখ লাল হয়ে গেল মানুষটার। বয়স মনে পড়ছে না। অথবা মনে পড়লেও জন্ম তারিখের সঙ্গে হিসেব মিলছে না।

এরকম খানিকক্ষণ চলার পর কথাকলি অধৈর্য হয়ে মুখ তুলল। বিরক্ত

boierpathshala.blogspot.com

গলায় বলল, 'কী হল? বলুন। নিজের বয়স মনে পড়ছে না?'

মাঝবয়সি এবার চোখমুখ উদ্ভাসিত করে উঠল।

'পড়েছে ম্যাডাম। ফর্টি ফাইভ। না, না ফোর ম্যাডাম। এই নভেম্বরে আমার বয়স ফর্টি থ্রি কমপ্লিট হচ্ছে।'

কথাকলি দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'আবার তিনটে ! উফ, একটা বলুন। তিনটে বয়স লেখা যাবে না। কোন প্রোগ্রামে টিক দেব?'

'ম্যাডাম, সব-কটায় দিন।'

কথাকলির ইচ্ছে করল চিৎকার করে ওঠে। সামলালো নিজেকে। যতটা সম্ভব শান্ত গলায় বলল, 'সব-কটায় হবে না। দুটোর বেশি নিয়ম নেই। চটপট করুন, ভিড় বাড়ছে। কীর্তন চলতে পারে? দেবো? নামও কম পড়েছে। হয়ে যেতে পারে কিন্তু।'

পূর্ণেন্দু মাইতি এবার দাঁত বের করে হাসল। এতক্ষণ ধমক শোনার পর সুন্দরী মেয়ের নরম গলা শুনে সম্ভবত সে খানিকটা লজ্জা পেল।

'তাই দিন। কীর্তন ভালো। একটা ধম্মকম্মের ব্যাপার হবে। টিভিও হল, আবার ধম্মও হল। তাই না? একটাই সমস্যা। গাইতে হবে না তো?'

বিরক্তির মধ্যেও কথাকলির হাসি পেল। হাসি চেপে সে বলল, 'না না। গাইতে হবে না। মেক আপ নিয়ে দলে থাকতে হয়। খুব বেশি হলে খঞ্জনি বা খোল ধরনের কিছু ধরিয়ে দিতে পারে। ফটো আছে?'

মাঝবয়সি উজ্জ্বল মুখে বলে, 'আছে ম্যাডাম, ফটো আছে, তবে একটা কথা ছিল!'

কথাকলি চমকে উঠল। কাল সন্ধেবেলা ব্রতীনও বলেছিল—

'একটা কথা ছিল কলি।'

কথাকলির ইচ্ছে করল বলে, 'কথা তোমার থাকতে পারে ব্রতীন, আমার নেই। সব কথা শেষ করার পর-ই আমি তোমাকে ছেড়ে চলে এসেছি। আর কথা ছিল বলেই তুমি এ-বাড়িতে হুট করে চলে আসবে!'

কিন্তু সে-কথা কথাকলি বলতে পারিনি। নির্লিপ্ত গলায় বলে, 'বলো। এখন বলবে?'

কথাকলিদের ড্রইংরুমের মেঝেটা সুন্দর। হলুদ মোজাইকে সাদা সাদা দাগ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বালিতে ঝিনুক ছড়ানো। সুনন্দা পছন্দ করেছিলেন। সুদর্শনবাবু ঠাট্টা করে বলছিলেন, 'ড্রইংরুম যদি সী বিচের মতো হয় তাহলে বেডরুমগুলো তো জলের মতো করতে হবে।'

boierpathshala.blogspot.com

ব্রতীন সেই মেঝের দিকে খানিকটা চুপ করে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আজ থাক। অন্য একদিন বলব। আজ বরং উঠি।'

কথাকলি বলল, 'বোসো, চা খেয়ে যাও। গোপালের মাকে বলছি।' সে ভেবেছিল, ব্রতীন বলবে, 'খাব না।' বলে উঠে দাঁড়াবে। ব্রতীন কিছু বলল না। উঠলও না। আগের মতো চুপ করে বসে রইল। কথাকলির অস্বস্তি হচ্ছিল। মানুষটা কি একইরকম বোকা রয়েছে? নাকি অন্য কোনো মতলব করেছে? দুটোর একটা তো বটেই। নইলে কেউ প্রায় এক বছর আগে ছেড়ে চলে আসা স্ত্রী-র বাড়িতে এভাবে হুট বলতে চলে আসতে পারে? নাকি আসা উচিত?

'চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে?'

ব্রতীন মাথা ঘাড় নাড়ে। বলে, 'অল্প কিছু হলে খেতে পারি।'

কথাকলি উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'ঠিক আছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর শোনো আমার কিছু কাজ রয়েছে। আমি এখন সেগুলো নিয়ে বসব। সত্যি যদি তোমার কিছু বলার থাকে সংক্ষেপে বলে ফেলতে পার।'

ব্রতীন ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'না না আজ নয়, অন্য একদিন বললেও হবে। জরুরি কিছু নয়। তুমি যাও কথা। কোনো অসুবিধে নেই। আমি চা খেয়ে চলে যাব।'

বহুদিন পরে ব্রতীনের মুখে 'কথা' শুনে কথাকলি সামান্য চমকে ওঠে। নিজেকে সামলায় দ্রুত। শান্তভাবে বলে, 'বোসো।'

কাচের ওপাশের লোকটা ব্যাগের হাতল মুখের কাছে তুলে কাশে। সত্যি কাশি নয়, বানানো কাশি। কথাকলি তাকায়।

'ম্যাডাম, কথাটা বলব?'

চোখমুখ কুঁচকে কথাকলি বলল, 'না, বলবেন না। আপনি অনেকটা সময় নিয়েছেন, এবার পরের জনকে আসতে দিন।'

মাঝবয়সি সরে না। বলে, 'চান্স পাবো তো ম্যাডাম? অনেকদিনের ইচ্ছে। আমার ইচ্ছে নয়, আমার স্ত্রী-র ইচ্ছে। বেচারি বাপের বাড়িতে বলে রেখেছে পর্যন্ত। বোঝেনই তো টিভিতে দেখানোর ব্যাপার।'

কথাকলি আর নিজেকে সামলাতে পারে না। ঝাঁঝের সঙ্গে বলে ওঠে, 'ভালো করেছেন। খুব ভালো করেছেন। এবার ঢাক পিটিয়ে বলতে বলুন। বলেছি তো, অডিশনে পাস করলে চান্স পাবেন। নেক্সট কে আছেন।'

মাঝবয়সিকে ঠেলে সরিয়ে কাউন্টারে এবার এক মহিলা এসে দাঁড়াল। কথাকলি আড়চোখে দ্যাখে কড়া বেগুনি রঙের শাড়ি। ব্লাউজের হাতে জরি

boierpathshala.blogspot.com

বসানো। মুখে গাদাখানেক পাউডার। এ তো শুধু পাউডার, নন্দিনী বলে অডিশনে নাম লেখানোর দিনগুলোতে অনেকে মুখে রং-টং মেখে আসে। গরমে ঘামে সেই রং গলে-টলে বিচ্ছিরি একটা কাণ্ড হয়।

পাউডার-মাখা মহিলা গড়গড়িয়ে বলতে শুরু করে।

'আমি আছি দিদি। মালা কর। বয়স বত্রিশ। আমার সঙ্গে আমার ননদও আছে। গীতা কর। উনিশ, ওনলি নাইনটিন ইয়ারস।'

কথা থামিয়ে এবার মহিলা কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে পড়ল। আড়চোখে তাকাল দু-পাশে। ঘাড় নামিয়ে নীচু গলায় বলল, 'দিদি, নোটিশে ওই যে খারাপ পাড়া লিখেছেন না, ওতে কি শুধু ব্রা পরতে হবে?'

কথাকলি চমকে উঠল। মহিলা এত সহজে 'ব্রা' কথাটা বলল, যেন কোনো ব্যাপারই নয়। অথচ আজও স্পষ্ট মনে আছে, প্রথমদিন তার জামা খোলা নিয়ে ব্রতীন কী কাণ্ডই না করেছিল। একটা পুরুষমানুষ যে নিজের ভাবী স্ত্রী-র জামায় হাত দিয়ে পাথর হয়ে যাবে কে ভাবতে পেরেছিল।

কথাকলি বলেছিল, 'কী হল?'

'কিছু হয়নি কথা।'

কথাকলি কাঁধ পর্যন্ত ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'কী কিছু হয়নি? খোল। নাও হুকটা ধরে খোল।'

ব্রতীন আমতা আমতা করে বলেছিল, 'খুলতে পারছি না।'

হাসি পেয়েছিল কথাকলির। এ আবার কী! হাসি লুকিয়ে বিরক্ত হওয়ার ভান করে বলে, 'সে-কী। খুলতে পারছ না কেন? উফ, তুমি না...আঙুলগুলো নাড়াবে তো।'

ব্রতীন নার্ভাস গলায় বলে, 'আঙুল নাড়াতে পারছি না। চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না।'

মুখে বিরক্ত হলেও কথাকলি মনে মনে সেদিন খুশি হয়েছিল। সে শুনেছে, যে পুরুষমানুষ প্রথমে ঘাবড়ে যায়, পরে তার পারফরমেন্স নাকি চমকে দেওয়ার মতো ঘটে। সে দুটো হাত পিঠের কাছে তুলে বলল, 'সরো তুমি। আমি খুলছি। এতেই হাত আটকে যাচ্ছে। বাকিটাতে কী হবে কে জানে। না, আমার কপালে দেখছি দুঃখ আছে।'

মহিলা কাউন্টারের ওপর শরীরটাকে আরও ছেড়ে বলল, 'দিদি, ব্রায়ের ব্যাপারে আমার কোনো অসুবিধে নেই। ভয় পাচ্ছে গীতা। বলছে, চেনাজানা কেউ দেখে ফেললে...আমি বললাম আরে গাধা, শুধু চেনা কেন? বড়ো

boierpathshala.blogspot.com

ডিরেক্টরও তো দেখতে পারে। টিভি থেকে কত হিরোইন হয়েছে। হয়নি? বলুন দিদি। আপনিই বলুন। এই যে রঞ্জাবতী, এখন এত নাম, প্রথমে কী করত? সিরিয়ালে ঝি হত। কলতলায় উবু হয়ে বসে বাসনে ছাই লাগাত। এখন হিরোর সঙ্গে গাছ ধরে নাচে। আমাদের গীতার চেহারা ছবিও ভালো।'

কথাকলি কঠিন গলায় বলল, 'ঠিক করে দাঁড়ান, কাচের ওপর অমন চাপ দিচ্ছেন কেন? ভেঙে যাবে যে।'

মহিলা ঠিক করে দাঁড়াল না, চাপ একটু কমাল মাত্র। তারপর অনুরোধ করার ঢঙে বলল, 'দিদি, গীতাকে ডাকব? ওই যে দাঁড়িয়ে আছে। ডাকব এখানে? ডাকি না। আপনি বুঝিয়ে বলেন। এই চান্স কেউ ছাড়ে। ডাকব?'

কথাকলি বুঝতে পারল, এই মহিলাকে বকাঝকা করে কোনো লাভ হবে না। শুধু একে নয়, এই যে কাউন্টারের সামনে এত মানুষ ভিড় করে আছে এরা কেউই অপমান গায়ে মাখতে চায় না। ঝেড়ে ফেলে দিতে চায় ধুলোর থেকেও অকিঞ্চিৎকরভাবে। ব্রতীনও কি এদের মতো? অপমান গায়ে মাখব না বলে কাল হুট করে এসে হাজির হয়েছিল?

বেগুনি-শাড়ির দিকে না তাকিয়েই কথাকলি ক্লান্ত গলায় বলল, 'না, ডাকবেন না। টিফিনের সময় হয়ে গিয়েছে।'

boierpathshala.blogspot.com

তিন

বন্ধ দরজার দিকে মুখ করে ব্লাউজে সেফটিপিন আটকাচ্ছে শান্তি।

ব্লাউজে সেফটিফিন আটকানোর কারণ হল, খানিক আগে কাদুর টানাহেঁচড়ায় ওপরের বোতামটা ছিঁড়ে পড়ে গেছে। শান্তি বোতাম খুঁজছে, কিন্তু পাওয়া যায়নি।

কাদু তাড়া দিয়ে বলল, 'কীরে এতক্ষণ লাগছে কেন। তাড়াতাড়ি কর। বললাম না কাজ আছে আমার?'

মাথা নীচু করে নিজের খোলা বুকের দিকে তাকিয়ে হিসহিসিয়ে উঠল শান্তি। 'তুমি কী মাইরি কাদুদা? শুধু বোতাম ছেঁড়োনি, নখ দিয়ে বুকের ওপরটা কেমন ছেলে দিয়েচ। মাগো, বাঘ নাকি? হি হি।'

মুখে যাই বলুক, মেয়েটার তরল গলা শুনে বোঝা যাচ্ছে, 'বুক ছেলে' দেওয়ার কারণে সে যথেষ্ট খুশি।

কাদু 'খ্যাক খ্যাক' ধরনের বিশ্রী আওয়াজ করে হাসল। খারাপ লোকদের দাঁত কালো হয়। কাদুর দাঁত সাদা। চকচকে। ঘরের আবছা অন্ধকারেই ঝলসে ওঠে। এটা কাদুর একটা প্লাস পয়েন্ট। যারা তাকে জানে না, তারা অনেক সময় এই দাঁত দেখে ভুল বোঝে। ভাবে দাঁতের মতোই কাদুর মনটা চকচকে। হাতড়ে মাথার পাশে রাখা সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিল কাদু। সিগারেট বের করে রাখল ঠোঁটে। ফের হাত বাড়াল লাইটারের জন্য। কাদুর সিগারেট, লাইটার— দুটোই দামি। মোবাইলও আছে। তবে এখানে টাওয়ারের খুব অসুবিধে, বেশিরভাগ সময়েই সিগনাল হয় না। যদি-বা হয়, ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়। তবু কাদু মোবাইল সঙ্গে নিয়ে বেরোয়। ঝিলডাঙায় এখনও এই যন্ত্রটির চল নেই। সঙ্গে

boierpathshala.blogspot.com

থাকলে, প্রেস্টিজ বাড়ে।

কাদু সিলিঙের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাঘ হলে কি আর শুধু আঁচড়াতাম? কামড়ও বসাতাম। এইরকম ঘ্যাঁগ করে।'

বলে মুখ হাঁ করে ঘাড় ঝাঁকাল কাদু। দাঁত দেখিয়ে হাসল।

শান্তি আদ্দেক মাথা ঘুরিয়ে বলল, 'কামড়াওনি নাকি? ডান পায়ের গোছটা দেখবে? শুধু গোছে। আর ওখানে? ওখানে কী কাণ্ড করেচ? বাপরে, আজ তোমার কী হয়েছিল কাদুদা? আমাকে শেষ করেচ একেবারে।' কথাটা বলে মুখ লুকিয়ে হাসল শান্তি। এটা একটা ফন্দি। 'এক্সট্রা' আদায়ের ফন্দি। কাজকর্মের শেষে এ-কথা বলতে পারলে সুবিধে। কাদুর মতো লম্পটরা খুশি হয়। মেয়েমানুষকে বিছানায় ঠেসে ধরেছিল জানলে ভেতরের শয়তানটা হাত বাড়িয়ে নিজের গলাতেই মেডেল পরায়, হাততালি দেয়। আর তখনই বলতে হয় 'এক্সট্রা' চাই। কথায় বলে, ঝোপ বুঝে কোপ। শান্তি বলে, কোপ বুঝে ঝোপ। গায়ে গতরে কোপ কেমন পড়েছে বুঝে টাকার জন্য ঝোপ ফেলা।

ঝোপে পা ফেলে কাদু আবার 'খ্যাক খ্যাক' ধরনের হাসল। চকচকে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল ফের।

শান্তি মিথ্যে রাগের ভান করে বলে, 'হাসবে না কাদুদা, ভালো হবে না বলচি। আমি কিন্তু রেগে যাব মাইরি। আজ একটা নোট বেশি দিতে হবে। কামড়ে দেওয়ার ফাইন। হ্যাঁ, এই বলে দিলুম।'

'বাপরে! কত ছেনালি জানিস শান্তি। টাকা বাগানোর কত রংঢং। হ্যাঁরে, লাইটারটা কই?'

সেফটিফিন আটকাতে সময় লাগল শান্তির। জামা ছোটো। ইচ্ছে করেই কাজে আসার সময় ছোটো জামা পরে সে। পার্টিকে গাধা বানানো। পার্টি ছোটো জামার কায়দা বুঝতে পারে না। ভাবে শরীর বড়ো। শান্তি মেঝেতে পড়ে থাকা শাড়িটা টেনে নিল। বলল, 'আমি কী জানি তোমার লেইটার কোতায়। আমি কি বিড়ি টানি।'

কাদু বলল, 'জানিস না মানে? চাইনিজ মাল, কলকাতা থেকে আনা।'

শান্তি দাঁড়িয়েছে বন্ধ-দরজার সামনে। শাড়ি পরতে পরতে বলল, 'কলকাতা থেকে আনা তো কী হয়েচে? কলকাতার মাল হারায় না বুঝি? ভালো করে দ্যাখ লিশ্চয় চাদরের তলায় আচে। যাবে কোথায়? মানিব্যাগ, ঘড়ি সব তো এক জায়গায় রাখলে।'

কাদু স্থির চোখে শান্তির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই ভালো করেই জানিস

boierpathshala.blogspot.com

শান্তি, এই সময় মানিব্যাগ, ঘড়ি, মোবাইল আমি ঘরে নিয়ে ঢুকি না। বাইরে মোহনদের কাছে থাকে। তোমাকে নিয়ে শালা শোব মানিব্যাগ সঙ্গে নিয়ে? খেপেছ? কাজ হয়ে গেলে দেখব তোমারও কাজ হয়ে গিয়েছে। মানিব্যাগ ফাঁকা।'

'চোর' বলায় শান্তির কিছু এসে গেল না। সে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'এবার থেকে তোমার শখের লেইটারটাও না হয় বাইরে রেখে এসো। ওটা আর বাদ দাও কেন?'

হাত তুলতে গিয়ে জামায় লাগানো সেফটিফিনে টান পড়ল শান্তির। ইস ভুল হয়েছে। জামাটা খুলে 'বাঘ'টার কাছে যাওয়া উচিত ছিল। অন্যদিন তাই যায়। একবারে সব খুলে উদোম হয়ে তবে বিছানায় যায়। আজ হারামজাদাটা সময় দিলে না। দরজা দিতেই টান মারলে এমন করে। শুধু টান? দুটো বুকেই নখ মেরেছে। শুধু বুকে? কোমরে, পাছায় ছেড়েছে নাকি? শালা হারামি। হাত তুলে অন্ধকারেই ক্ষত দেখতে চেষ্টা করল শান্তি। মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'শুয়োরের বাচ্চা, করার মুরোদ নেই এক পয়সা, শুধু ধামসাবে।'

কথাটা ঠিক। কাদুর এই অসুখের কথা ঝিলডাঙার অনেকেই জানে। তবু তার মেয়েমানুষ চাই। হয়তো এই কারণেই বেশি করে চাই।

মুখে হাসল শান্তি। বলল, 'কী জ্বলছে গো।' যেন 'জ্বলা'টাও একটা মজার ব্যাপার!

কাদু কনুইতে ভর দিয়ে আদ্দেক উঠে বসেছে। তার বুক পর্যন্ত চাদর টানা। ঠোঁটে সিগারেটটা না-জ্বলা অবস্থাতে ঝুলছে। সে পাশে রাখা তাকিয়ার দু-পাশে থাবড়া দিল। না, জিনিস নেই। গেল কই? লাইটারটা সত্যি ভালো। জ্বাললে বাজনা দেয়। জোরে কিছু নয়, হালকা বাজনা। চেনা সুর নয়, মনে হয় ইংলিশ বাজনা। মাথার কাছে লাল আলো টিপটিপ টিপটিপ করে চোখ মারে। এই ঝিলডাঙা গ্রামে তো দূরের কথা, আশেপাশে দশটা গ্রামেও কারও কাছে এই মাল নেই।

বিরক্ত গলায় কাদু বলল, 'অ্যাই শান্তি, ভ্যানতারা ছেড়ে আলোটা দে।'

'দেখছ না শাড়ি পরছি।

'শাড়ি পরছিস তো কী হয়েছে? তোর ভাশুর ঘরে বসে আছে নাকি? আলো দে বলছি।'

জোরে ধমক দিল কাদু।

'কী যে বলো না মাইরি। ভাশুর বসে...হি হি।'

boierpathshala.blogspot.com

শান্তি আদ্দেকটা শাড়ি বুকের কাছে জড়ো করে সরে এল। ঘরের কোনায় কমিয়ে রাখা হ্যারিকেনটা বাড়াল। বলল, 'আগুন দেব? সিগারেট ধরাবে?'

দিনের বেলা হ্যারিকেন জ্বালানোর কথা নয়। কিন্তু এই ঘরে জানলা দরজা দিলে অন্ধকার। মেয়েছেলের সঙ্গে থাকার সময় অন্ধকার কাদুর পছন্দ নয়। শুধু পছন্দ নয়, অন্য ব্যাপারও আছে।

প্রথম প্রথম শান্তি বলত, 'অন্ধকারই তো ভালো কাদুদা। থাক না। হেরিকেন দিয়ে কী হবে?'

কাদু মুখ ঝামটে বলে, 'চুপ কর। যা বলচি কর। হ্যারিকেনটা জ্বেলে সলতে কমিয়ে দে।'

শান্তি ঠোঁট কামড়ে হাসে, 'কেন তোমার বুঝি না দেখলে আশ মেটে না?'

কাদু ধমক মারে, 'চোপ। একটা কথা বলবি না। তোর শালা বেশি ফক্কুড়ি।'

তারপর থেকে আর এই প্রসঙ্গে যায়নি শান্তি। এইসব লোকের যত শখ থাকে তত ভালো। শখের জন্য বাঁধা পড়ে যায়। ভদ্দরলোকেরা জানে মেয়েছেলে বাঁধা হয়। কথাটা ঠিক নয়। আসলে বাঁধা পড়ে পুরুষগুলোই। এই লোকটা যেমন পড়েছে।

শান্তি আবার বলল, 'আগুন দেব?'

চোখমুখ কুঁচকে বিরক্ত কাদু বলল, 'দে।'

হ্যারিকেনের আলোয় কোনো লাভ হল না। বিছানার অবস্থা মারাত্মক। চাদর, তোশক, তাকিয়া লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। মেজাজ খারাপের মধ্যেও কাদুর ভালো লাগল। শান্তি মেয়েটা কায়দাকানুন জানে। একটু জানে না, বেশি জানে। কায়দাকানুন দিয়ে তার অক্ষমতাটা ঢেকে দেয়। একেবারে ওস্তাদ মেয়েছেলে না হলে বিছানার হাল এরকম হয় না। এই কারণেই তো অত দূর থেকে কাঠখড় পুড়িয়ে ওকে নিয়ে আসে। এই মেয়েকে ধরে রাখতে হবে। শুধু নিজের জন্য নয়, ধরে রাখতে হবে অন্য কারণেও। ভবিষ্যতে কাজে দেবে। সব মেয়েমানুষ শুতে পারে, কিন্তু কাজে দেয় না। এ দেবে। তবে বুঝতে দেওয়া চলবে না। বুঝলে মাথায় উঠে নেত্য শুরু করবে। মেয়েমানুষের সবরকম নেত্য ভালো, ঘোমটা, খেমটা, ফিল্মি, কিন্তু মাথায় উঠে নেত্য ভালো নয়।

কাদুর এই আস্তানা নিজের নয়, জবরদখলের আস্তানা। দখল খুব বেশিদিন হয়নি। বাড়িটা ঝিলডাঙা গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে, একটু বাইরে। সকলের চোখের আড়ালে। জায়গাটা কাদু ব্যবস্থা করেছে মাস কয়েক হল। গোপন

boierpathshala.blogspot.com

কাজকর্মের ব্যবস্থা। রাস্তা থেকে সরে একতলা এই বাড়ি পড়েছিল দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে। ভাঙাচোরা, বেওয়ারিশ। একসময় কলকাতার কোনো সেন না পাইনদের বাগানবাড়ি ছিল। চারপাশে গাছগাছালি আর শ্যাওলা ধরা পাঁচিল। এখানে সেখানে ভাঙাচোরা। ভেতরে মজা পুকুর। পানা ভর্তি। বাড়ি কবে বানানো হয়েছিল তা আজ আর মনে নেই ঝিলডাঙার কারও। তবে মালিকরা এখন আর আসে না কেউ। শোনা যায়, ভাগবাঁটোয়ারায় গোলমাল। পাড়াগাঁয়ের দিকে এরকম বাগানবাড়ি অনেক আছে। শরিকি ঝগড়ায় মালিক ছাড়া অনাথ হয়ে পড়ে আছে। এই বাড়িটাকে সবাই বলে ভূতের ডেরা। সেই 'ভূতের ডেরা'ই দখল নিয়েছে কাদু।

চেলারা বলেছিল, 'ভূতের ডেরায় ঢোকা কি ঠিক হচ্ছে দাদা?'

কাদু বলল, 'আমরাও শালা ভূত। ভূত না? হ্যা, হ্যা।'

সাপখোপ, চামচিকে তাড়িয়ে একটা ঘর মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছে। জমিদারি কায়দায় সেখানে মাটিতে টানা বিছানা লেগেছে। সাদা চাদর, তাকিয়া। শোওয়া, বসা, জুয়া, মদ, গোপন শলাপরামর্শ সবই এই তাকিয়ার ওপর। তবে যেদিন যেদিন ভেতরে কাদু শান্তিকে নিয়ে ঢোকে সেদিন বাইরে থেকে তালা ঝোলে। এটাই নিয়ম। ঘরের সামনে একফালি বারান্দা। মাথায় টিনের চাল। সামনে গাছের আগল আছে। চট করে কেউ দেখতে পারে না। সেই বারান্দায় কাদুর চালকলের ব্রাঞ্চ অফিসের সাইনবোর্ড। কালোর ওপর হলুদ দিয়ে লেখা— 'অন্নদা রাইসমিল, ঝিলডাঙা শাখা'। দুটো চেয়ার, একটা টেবিল। সব টিনের। ভাঁজ করে তুলে রাখা যায়। চেয়ারগুলো মোহন আর শোলের।

মোহন আর শোল কাদুর দুই হাত। চোখ, নাকও বটে। শিকার দেখে। না দেখতে পেলে গন্ধ শুঁকে বের করে। তারপর ধরে আনে গুরুর কাছে।

কাদু ভেতরে থাকলে শোল আর মোহন বাইরে পালা করে পাহারা দেয়, বন্ধ ঘরের চাবি নিয়ে বসে থাকে। ইশারা বলা আছে। 'কাজকর্ম' সেরে কাদু উঠে গিয়ে দরজায় তিনটে টোকা মারে। তখন তালা খোলা হয়। তার আগে নয়। এরকম একটা জায়গা কাদু খুঁজছিল অনেকদিন। পেয়ে যেতে একেবারে জাঁকিয়ে বসেছে।

শান্তি উবু হয়ে হ্যারিকেনের চিমনি সরাল।

কাদু মন দিয়ে দৃশ্যটা দেখতে লাগল। মেয়েটার শরীর ভালো। ঢলঢলে ভাব আছে। কাদু লক্ষ করে দেখেছে ঢলঢলে চেহারার মেয়েরা মূলত বোকাসোকা হয়। কিন্তু এই মেয়ে তাই নয়। এ ধুরন্ধর। চালাকি করার চেষ্টা আছে। এখনও

boierpathshala.blogspot.com

করছে।

শান্তি ঘরের কোণায় পড়ে থাকা কাগজ এনে পাকিয়ে আগুন লাগিয়ে নিয়ে এল কাদুর কাছে। কাদু মুখ বাড়িয়ে সিগারেট ধরিয়েই হাত দিয়ে শান্তির মুঠো করে ধরা শাড়ি চেপে ধরল।

'অ্যাই কী করছ? ছাড়ো, ছাড়ো। এটাও ছিঁড়বে নাকি?'

শান্তি চাপা গলায় বলে ওঠে। চোখে ভয়। কিছু কিছু বদ লোক অনেক কিছু পারে। কাদু তাদের দলের। শান্তি সাবধান হল। শালা কি বুঝে গিয়েছে?

কাদুর ঠোঁটে সিগারেট ঝুলছে। সে শান্তির মুখটাকে কাছে টেনে এনে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'ভালোয় ভালোয় মালটা ফেরত দিবি, না ব্যবস্থা নেব?'

শান্তি ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী বলছ কাদুদা? কী দেব?'

'বুঝতে পারছিস না?'

ঠোঁট থেকে সিগারেটটা হাতে নিয়ে শান্তির ডান বুকের দিকে তাক করে কাদু বলল, 'ওখানে শুধু নখ মেরেছি, এবার আগুন মারব। অভাগার কপাল পোড়ে, তোর বুক পুড়বে শালী। পোড়া বুক নিয়ে এই ব্যবসা করবি কী করে সেটা একবার ভেবে দেখেছিস? হ্যা হ্যা।'

চকচকে দাঁতও যে সময়ে সময়ে কত বিশ্রী হতে পারে, শান্তি বুঝতে পারল।

হাসি থামিয়ে কাদু আবার বলল, 'দে, ভালোয় ভালোয় লাইটারটা দিয়ে দে।'

কথা শেষ করে শাড়ি ছেড়ে দিল কাদু। শান্তি একটু সরে গিয়ে ব্লাউজের ভেতর হাত ঢোকায়। লাইটার বের করে এগিয়ে ধরে বোকার মতো হেসে বলল, 'উফ তুমি না মাইরি, একটু মজাও করতে দাও না! নাও ধরো, তোমার কলকাতার জিনিস। বুকে আগলে রাখ।'

কাদু বলল, 'গুড। নে, সিগারেটটা ধরিয়ে দে দেখি।'

শান্তি লাইটার টিপল। মাথার কাছে বিন্দুর মতো লাল আলো জ্বলে বেজে উঠল 'টিং টিং'।

শান্তি তার শাড়ি-টাড়ি ঠিক করে মাথার চুলে হাত বোলাল। এগিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে টোকা দেয়। একবার, দু-বার, তিনবার। মোহন তালা খুলতেই এক ঝলক গরম হাওয়া ঢুকল ঘরে। গনগনে দুপুরে হাওয়া। বাইরে রোদ। সেই রোদ দেখে প্রথমে চোখমুখ কুঁচকে হাত চাপা দিল শান্তি। তারপর মুখ ঘুরিয়ে কাদুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই রোদে তাড়িয়ে দিচ্চ? বিকেল পর্যন্ত

boierpathshala.blogspot.com

থেকে যাই না গো।'

কাদু হাত নেড়ে বলল, 'যা ভাগ, বললাম না কাজ আছে।'

শান্তি ঠোঁট বেঁকিয়ে এক পা এগিয়ে গেল।

দরজার ঠিক উলটো দিকেই একটা ঝাপসা চাঁপা গাছ। গাছটা বন্ধ্যা। ফুল দেয় না। তবে পাতার একটা গন্ধ আছে। হাওয়ার সঙ্গে সেই গন্ধ খানিকটা ভেসে এল। কড়া রোদে মিষ্টি গন্ধ। বেশ লাগে শান্তির।

কাদু হাত তুলে ইশারা করায় মোহন টাকা বের করে এগিয়ে ধরল শান্তির দিকে। শান্তি ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'কী হল, আরও একশো দেবে বললে না।'

কাদু ভুরু কুঁচকে ডান হাত মুঠো করে তুলল। এটাও সিগনাল। মোহন পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বের করে ফিসফিস করে বলল, 'যা পালা। সাবধানে যাবি, কেউ যেন না দ্যাখে।'

শান্তি ঠোঁট দুটো সরু করে আদর করার ভঙ্গিতে বলে, 'উঃ উঃ! কে কবে দেখেছে মাইরি?'

শান্তি উঠোন থেকে নেমে যেতে মোহন ঘরের ভেতরে ঢুকল। কাদু উঠে পায়জামার দড়িতে গিঁট পাকাতে পাকাতে বলল, 'মোহন, খবর ভালো তো?'

মোহন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত। তারপর বলল, 'না দাদা, খবর ভালো নয়।'

'খবর ভালো নয়' শুনে কাদুর ভুরু কুঁচকে গেল।

এ-কথা শুনতে সে অভ্যস্ত নয়। মোহন, শোলদের রাখাই হয়েছে ভালো খবর শোনানোর জন্য। কাদুর ইচ্ছে করল, মোহনের গালে একটা চড় লাগায়। আজ প্রথম নয়, এরকম ইচ্ছে কাদুর আগেও অনেকবার হয়েছে। কিন্তু কোনোবারই সে তা করে না। ঠান্ডা গলায় বলল, 'কেন? ভালো নয় কেন?'

হ্যারিকেনের আলোয় চুলটা ঠিক আঁচড়ানো যাচ্ছে না। এখানে একটা ব্যাটারির ব্যবস্থা করা যায় না এমন নয়, করা যায়। কী আর এমন খরচ। কিন্তু সেটা বোকামি হবে। এই বাড়িতে হঠাৎ আলো জ্বললে লোকের চোখে পড়ে যাবে। সেটা এখনই ঠিক নয়। ক-দিন পরে করতে হবে। আর একটু গুছিয়ে নেওয়ার পর তখন লোকের ভাবাভাবিতে কিছু এসে যাবে না।

মোহন বলল, 'শোল এসেছিল। সদানন্দ রাজি হচ্ছে না। বলছে, জমি ছাড়বে না। সেই বাপ-ঠাকুরদার গপ্প মারছে।'

গা-টা কেমন চ্যাটচ্যাট করছে। স্নান করলে ভালো হত। এ-বাড়িতে একটা ভালো বাথরুম থাকা উচিত। করলে কেমন হয়? শহরের মতো বাথরুম। কল,

boierpathshala.blogspot.com

শাওয়ার, ইংলিশ পায়খানা থাকবে। একটা বাথটাব থাকলে আরও ভালো। শান্তিকে নিয়ে একসঙ্গে স্নান করা যাবে। বাথটাবে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে শুয়ে থাকবে। শান্তি সাবান লাগাবে।

কাদু মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'জমি তো আমি নিতে চাইনি মোহন। জমি নিয়ে আমি কী করব? আমার কি জমিজমায় মন আছে রে পাগল। জমি সদানন্দরই থাকবে। সে-ই চাষবাস করবে। ফসলও কাটবে। শুধু কাটার পর ধানটা নিজের ঘরে না নিয়ে অন্নদা রাইস মিলে জমা দিয়ে আসবে। ব্যস এইটুকুই। নিজে না পারলে আমার মিল থেকে গাড়ি আসবে। বিনি পয়সায় তো জিনিস নিচ্চি না। দাম দিয়ে নেব। ধারবাকির কারবার কাদুর চোদ্দপুরুষ করে না। শুয়োরের বাচ্চাটাকে এই সামান্য কথাটুকু বুঝিয়ে বলতে পারলি না?'

মোহন মাথা নামিয়ে বলল, 'সবই বলা হয়েছে। তাও সদানন্দ রাজি হয়নি। শোল তিন দিন ধরে বুঝিয়েছে।'

কাদু তাকের একপাশ থেকে পাউডারের কৌটোটা নামিয়ে গলার কাছে উপুড় করল। না, গন্ধটা ভালো না। এ-ঘরে একটা ড্রেসিংটেবিলও দরকার। মেয়েছেলের আসা যাওয়ার ঘর। ড্রেসিংটেবিল ছাড়া মানায়? ওপরে বড়ো আয়না, নীচে পাউডার, সেন্ট, ওডিকোলন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শান্তি কাপড় ছাড়বে। তাকে ডবল দেখা যাবে। এক খরচে ডবল দেখার মজাই আলাদা।

'এইটাই হয়েচে মুশকিল। বুঝলি মোহন, এইটা হয়েচে মুশকিল। পাড়া গাঁয়ের মুখ্যুসুখ্যু মানুষ নিজের ভালো বুঝতে চায় না। ঘাড় ধরে বোঝালেও বুঝতে চায় না। তখন পাছায় লাথি মেরে বোঝাতে হয়। এই যে সেদিন রাতবিরেতে মাইতিদের গোডাউনটা পোড়াতে হল, সে কি আর এমনি এমনি? লোকটাকে এত করে বললাম, এত করে বললাম, কেন বেফালতু ঘরটা ফেলে রেখেচ বাবা? দিয়ে দাও। আমার অনেকদিনের ইচ্চে ঝিলডাঙায় একটা ভিডিও হল্ বানাই। ঝিলডাঙার লোকগুলোর জন্য কিছু করাও হল, আবার আমারও দুটো পয়সা হল। সদর থেকে হিট বই আনব। বইয়ের মাঝখানে মাঝখানে নাঙ্গা ছবি থাকবে। তার জন্য আলাদা পয়সা লাগবে না, ফ্রি। ইস্টিল, মুভি দু-রকম ছবিই দেখাব। তা কে শোনে কার কথা? হারামজাদা গোঁ মেরে বসে রইল। গোডাউন দিলে না। লাভটা কী হল? কোনো লাভ হল না। এখন থাক, পোড়া গোডাউন নিয়ে আঙুল চোষ। আমার কাছে এসেচিল। আমি বলেচি, পোড়া মাল নেব না। সারাইয়ের খরচায় পোষাবে না। মুখ শুকিয়ে চলে গেছে। আবার আসবে। এসে পায়ে ধরবে। তখন হাফ দাম দেব। তাও টাকা একবারে দেব না।

boierpathshala.blogspot.com

খেপে খেপে দেব। ভয় হচ্চে সদানন্দটারও সেরকম কিছু না হয়ে যায়। এই ধর ঘরবাড়ি পুড়ে মরে গেল।'

কাদু ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। অন্ধকার নামতে আর বেশি দেরি নেই। মোহন দরজায় তালা দিয়ে হ্যারিকেন নেভাল। বলল, 'শোল বলছিল, ওস্তাদ যদি পারমিশান করে কাল পরশু একটা ভালো দিন দেখে সদা-র পেটে মেশিন ঠেকিয়ে দেবে।'

চমকে উঠল কাদু। চকিতে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল।

'খবরদার না। ও কাজটিও করা চলবে না। গ্রামের মধ্যে ওসব একদম নয়। বলা যায় না, আজ বাদে কাল ইলেকশনে দাঁড়াতে পারি। তখন কী হবে? কেউ যদি হাত তুলে দেখায়? ইলেকশনে সব হয়, কিন্তু গায়ে কালি লাগানো যায় না। বুঝলি মোহন, একটা জিনিস ভাবছি। বড়ো জিনিস।'

'কী জিনিস গুরু?' মোহন একগাল হেসে বলল।

ইলেকশনের কথা শুনে মোহন উত্তেজিত। গলায় গদ্গদ ভাব এসে গেছে। দুজনে পাশাপাশি হাঁটছে। কাদু পায়জামা দু-হাত দিয়ে একটু তুলে সাবধানে হাঁটছে। এখনও কুয়াশা পড়ার সময় হয়নি। তবু সামনের আকাশে একটা আবছা পর্দার মতো। উনুনের কাঁচা ধোঁয়ায় এরকম হয়। উঠতে চায় না। থম মেরে থাকে। কুয়াশার মতো লাগে।

কাদু যেন খানিকটা আপনমনেই বলতে থাকে—

'একটা বড়ো বিজনেসের কথা ভাবছি। খুব বড়ো বিজনেস। নামলেই শালা কাঁচা পয়সা।'

'কী বিজনেস?'

কাদু নিজের মনেই হাসল। মুখ না ফিরিয়ে বলল, 'কেনাবেচার বিজনেস। কেনা অ্যান্ড বেচা। কিন্তু তার আগে মানা সরকারকে পাকড়াতে হবে। হারামজাদাকে না ধরতে পারলে এখানে এই ব্যবসা চালানো কঠিন। এ তোর ছুটকো ছাটকা জুয়োর বোর্ড, মালের ঠেক আর ব্লু চালানোর ভিডিও হল্ নয়। এক একবারে হাজার লাখের কারবার। এই কাজে অনেক কষ দরকার। হারামজাদা মানাটাকে আগে কষে বেঁধে ফেলতে হবে। নে মোহন, তাড়াতাড়ি পা চালা। একবার সদার ওখানে যাব।'

'আজই যাবে?'

কাদু মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'কেন অসুবিধে কীসের?'

মোহন আমতা আমতা করে বলল, 'না, অসুবিধে তেমন কিছু নেই। শোল

boierpathshala.blogspot.com

বলছিল বুড়োটা নাকি আজ মেজাজ তিরিক্কি করে আছে। ওর ছেলের বউ দু'বার ফিট গেছে।'

'ফিট গেছে!'

'হ্যাঁ, গোপীডাক্তার এসেছিল। গাধাটা প্রথমে কিছু পারেনি। শেষ পর্যন্ত জুতো শুঁকিয়ে জ্ঞান আনতে হল। তাও এমনি জুতোতে হয়নি, পুরোনো জুতো লেগেছে।'

কাদু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাপের মতো কুতকুতে চোখে গলা নামিয়ে বলল, 'খবর পাকা?'

'পাকা মানে, পুরো পাকা দাদা। শোল নিজে সেই সময় ওই বাড়িতে দাঁড়িয়ে। সবে সদার সঙ্গে কথা বলে বেরোবে বেরোবে করছে। এমন সময় শোনে হই হই কাণ্ড।'

কাদু তার নোংরা দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'তাড়াতাড়ি পা চালা মোহন। তাড়াতাড়ি পা চালা। জুতো শুঁকিয়ে কি আর মানুষের চিকিচ্ছে হয় রে? ওই মেয়ের ঘটনা অন্য।'

'কী ঘটনা?'

কাদু ধাঁতানি দিয়ে বলল, 'তুই জেনে কী করবি? চল, চল তাড়াতাড়ি চল।'

ওস্তাদের ধাঁতানি মোহন গায়ে নিল না। বোকার মতো হেসে লম্বা পায়ে হাঁটতে হাঁটতে মোহন বলল, 'ইস বাইকটা আনলে হত। কার কাছে যাবে? সদা?'

'না আগে, গোপীনাথ। গোপীডাক্তার।'

ডাক্তারের থাকে চেম্বার, ঝিলডাঙার গোপীনাথ ডাক্তারের আছে মুদিখানা। বাজারের একপাশে। দোকান খোলে সকাল সাতটায়, বন্ধ সেই রাতে। সে এই গ্রামের একমাত্র ডাক্তার। ডাক্তারি তার আসল ব্যবসা নয়। আসল ব্যবসা মুদিখানা। আজকাল আসল ব্যবসায় শুধু হয় না। সংসারে টানাটানি চলে। সাইডে একটা কিছু নিতে হয়। গোপীনাথ ডাক্তারি নিয়েছে। ডাক্তারির প্রধান অসুবিধে হল জায়গা। জায়গা ঠিকমতো না হলে হাজার ভালো চিকিৎসাতেও পসার জমবে না। গোপীনাথের সে অসুবিধে নেই। মুদিখানায় লোকজনের আসা যাওয়া লেগেই আছে। তেলটা, নুনটা বেচতে বেচতে চিকিৎসা চলে।

চিকিৎসাশাস্ত্রের সরকারি বেসরকারি কোনো ডিগ্রিই গোপীনাথের নেই। এতে সুবিধে হয়েছে। অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজি তিনটিই সে নিশ্চিন্ত মনে রোগীদের ওপর প্রয়োগ করতে পারে। খই, মুড়ির সঙ্গে দোকানে ওষুধও রাখে। বড়ো কিছু নয়, ছোটোখাটো সব ওষুধ। এখনও ইনজেকশন দিতে পারে

boierpathshala.blogspot.com

না, তবে ইচ্ছে আছে শিখে নেবে। কেউ কেউ তাকে সাবধান করেছে।

'দ্যাখ গোপী, ফোঁড়াফুঁড়িতে কিন্তু বিপদ আছে। মানুষ টেঁসে দিও না আবার।'

গোপীনাথ এ-কথায় পাত্তা দেয় না। মানুষ কি না পারে? সাগর পেরিয়ে চলে যায়, পাহাড় ডিঙিয়ে হাঁটা মারে। সে সামান্য ইনজেকশন পারবে না? বয়েসের কারণে হাত একটু যে কাঁপে না, এমন নয়, তার মানে এই নয় হাতের বদলে পায়ে সিরিঞ্জ ফুঁড়বে।

তবে যে যা-ই বলুক, ঝিলডাঙা থেকে কয়েক ঘণ্টার পথ ঠেলে বানেরহাটের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছোনোর আগে পর্যন্ত মোটামুটি চালিয়ে দেয় গোপীনাথ। গাঁয়ের লোকে এতেই খুশি। পাস করা বড়ো বড়ো ডাক্তার সব ফেল মেরে যায়, পটাশ পটাশ করে মানুষ মারে, তাহলে? পাস-না-করা ডাক্তার এর বেশি কী করবে? তবে চিকিৎসায় ধারবাকি রাখে না গোপীনাথ। চালে ডালে ছাড়লেও ডাক্তারের ফিজ থেকে ওষুধের দাম সবটাই তার নগদে কারবার। ধারের কথা বললে বিরক্ত হয়। ঠোঙায় মুড়ি দিতে দিতে বলে, 'আরে বাবা, এই সহজ কথাটা বুঝলে না হে? চাল ডালে হয় খিচুড়ি। চিকিচ্ছেতে কি খিচুড়ি হয়?'

'খিচুড়ি! চিকিচ্ছেতে আবার খিচুড়ি কী গো!'

মুড়ির ঠোঙায় ঝাঁকা মারতে মারতে গোপীনাথ বলে, 'সেটাই তো বলছি। চিকিচ্ছে হল একটা আলাদা জিনিস। মাথার বেদনায় একরকম তো পেটের বেদনায় আর একরকম। আবার বেদনা তোমার বুকে হলে সে-ব্যবস্থা অন্যরকম। চাল ডালের মতো দুটো বেদনা মিশালে চলে নাকি? তবেই বল, ধারবাকিটা রাখি কী করে?'

'কিন্তু টাকাপয়সার যে খানিক টানাটানি চলছে গো ডাক্তার।'

গোপীনাথ মুড়ির ঠোঙা দাঁড়িপাল্লায় তুলতে তুলতে বলে, 'এইটা তো লক্ষণ ভালো। টাকাপয়সা থাকলে তবেই তো তোমার টানাটানির খেলা জমে। না থাকলে কীসের টান? সবই তো ফক্কা। তাই না? তবে এবার ভাবছি তোমাদের জন্য ফুঁ চিকিচ্ছেটা শিখে নেব। নাও ধর।' ঠোঙা এগিয়ে ধরে গোপীনাথ।

'ফুঁ চিকিচ্ছে! সেটা আবার কী?'

গোপীনাথ রহস্যময় হাসে। সাদা খোঁচা খোঁচা দাড়ির ফাঁকে তার ফোকলা দাঁত বেরিয়ে পড়ে।

'হ্যাঁ, ফুঁ চিকিচ্ছে। এই চিকিচ্ছেতে তোমার ওষুধবিষুধ লাগে না। চোখ বুজে মাথায় ফুঁ দিলেই ব্যস। ওটাই ওষুধ। তবে বিদ্যেটা শিখতে হবে। যেমন

boierpathshala.blogspot.com

তেমন হলে চলবে না। তিনবার না চারবার, জোরে না ধীরে, সে-বিষয়ে তোমার আলাদা আলাদা কায়দাকানুন আছে। পাতলা পায়খানা বন্ধে য-টা ফুঁ, কোষ্ঠকাঠিন্যে তো আর তা দিলে চলবে না। শুনেছি সেই ফুঁয়ের সংখ্যা বেশি কিন্তু জোর কম।'

'তাই নাকি!'

ষাটে পা দেওয়া গোপীনাথ চোখ বড়ো করে বলে, 'নয়তো কী? অবশ্য জিনিস তোমার সস্তা হবে। খুবই সস্তা। তোমাদের মতো গরিবগুব্বোদের পক্ষে সুবিধে। ফুঁ-এর আর দাম কত? শুধু সাহস করে একবার শিখে নিলেই হল। তবে সে-সাহস গোপীডাক্তারের আছে। আছে কিনা বল? তুমিই বল হে।'

সেই 'সাহসী গোপীডাক্তার' দোকানের ভেতরেই কাদুকে বসবার মোড়া পেতে দিল। পাশে রাখা হাতপাখাটা একবার তোলে, একবার নামায়। হাওয়া কী দেবে? বুড়ো মানুষ হয়ে একটা সুস্থ সবল তাগড়া ছোকরাকে হাওয়া করা উচিত নয়। আর সেই ছোকরা যদি বদের বাসা হয় তাহলে তো আরও উচিত নয়। বরং পাখার হাতল দিয়ে কয়েকটা ঘা দেওয়া দরকার। বাজারে পাঁচটা মানুষ আসা যাওয়া করে। তারা যদি দ্যাখে, কাদুর মতো একটা নরকের কীটকে গোপীডাক্তার হাতপাখা দুলিয়ে হাওয়া করছে তাহলে সম্মানটা কি আর থাকবে? খুবই লজ্জার ঘটনা হবে। তবে কী, সব ক্ষেত্রেই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। এই ধরনের খারাপ মানুষরা হল গিয়ে সেই ব্যতিক্রম। এদের খাতির যত্ন করা লাগে। কখন মেজাজ বিগড়োয় ঠিক নেই। হারামজাদা গণেশটা এই সময় গেল কোথায়? একটু চা এনে দিতে পারত।

গোপীনাথ গদগদ গলায় বলল, 'বাবা কাদু, একটু মুড়কি খাবে? খাও, ভালো মুড়কি। গুড়ের নয়, চিনির জিনিস। একমুঠ্ মুখে ফেলে জল খাও।'

কাদু পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে। নিয়ম মতো তোলা পা নড়ার কথা। কাদুর দুলছে অন্য পা। দোকানের হ্যারিকেনের আলো তার মুখে পুরোটা পড়েনি, পড়েছে একদিকে। এটাও গোপী ডাক্তারের পক্ষে একটা সমস্যার বিষয়। মানুষের মুখ না দেখতে পেলে মেজাজ বোঝা যায় না। এই হারামজাদা মিনিট দশ হল চুপ করে বসে আছে। এটা ভয়ের। খারাপ কিছুর আগে সব থম মেরে থাকে। ছোবলের আগে সাপ, ঝড়ের আগে বাতাস, এমনকি মৃত্যুর আগে নিশ্বাস পর্যন্ত।

'দেব মুড়কি? দিই একটু?'

মুড়কি সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কাদু শান্ত গলায় বলে, 'ডাক্তার, তুমি

boierpathshala.blogspot.com

আছ কেমন?'

গোপীনাথ থতমত খেয়ে যায়। এই প্রশ্ন আশা করেনি। খারাপ লোকের কাছ থেকে ভালো প্রশ্ন ভালো কথা নয়। গোপীনাথ ঢোঁক গিলে, ফ্যাকাশে হাসে। বলে, 'ভালো আছি বাবা। খুবই ভালো আছি। ঝিলডাঙা এমন চমৎকার গ্রাম। মানুষগুলো এমন সুন্দর, ভালো না থেকে উপায় আছে?'

কাদু হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গি করল। বলল, 'ভালো তো থাকবেই। লাইসেন্স ছাড়া ডাক্তারির এমন চমৎকার ব্যবসা ফেঁদে রেখেছ, ভালো থাকবে না? মুখ্যুসুখ্যু মানুষকে বোকা বানাচ্ছ। ডাক্তারি ব্যবসা কি আর চাট্টিখানি ব্যবসা? বুঝলে গোপীনাথ লাইসেন্স ছাড়া সবকিছুই ভালো। এই ধর না, ওই যে মোহন, ওই যে তোমার দোকানের বাইরে এখন দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছ? ওই তো, আরে বাবা একটু মুখ বাড়িয়ে দ্যাখো না। ওই শালার কাছে একটা মেশিন আছে। ছোটো মেশিন। কিন্তু সেই রিভলভারও তোমার লাইসেন্স ছাড়া রেখেছি। ওই জিনিসও ভালো। পেটে একটা ভরলেই সাবাড়।'

গোপীনাথের গলা শুকিয়ে আসে। এই লোক কি তার সঙ্গে বড়ো ধরনের কোনো ঝামেলা করতে এসেছে?

'তারপর ধর মেয়েছেলে। লাইসেন্স ছাড়া কারবার করলে মেয়েছেলের টেস্ট হয় অন্যরকম। লাইসেন্স মেয়ের টেস্ট যদি হয় ঝাল, লাইসেন্স ছাড়ার হবে নোনতা নোনতা। হ্যা হ্যা। তবে কী জানো ডাক্তার, লাইসেন্স ছাড়া কাজকম্মে ঝক্কি আছে। কোনোভাবে ধরা পড়ে গেলে সমস্যা। পুলিশ তোমার পিছনে এতখানি ঢুকিয়ে বসে থাকবে। বসে বসে বিড়িই ফুঁকবে। তুমি যতই বল না কেন বের করবে না, ফুসফুস করে দারোগাবাবু বিড়ির ধোঁয়া ছাড়বে।'

হাতের অশ্লীল ইঙ্গিত করে কথা শেষ করল কাদু। ফের হাসল বিশ্রী আওয়াজে।

গোপীনাথ হাত তুলে ঘাড়ের ঘাম মুছল। বিড়বিড় করে বলে, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না বাবা। সমস্যাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

কাদু বকের মতো গলা বাড়িয়ে নীচু গলায় বলল, 'ডাক্তার, সদানন্দের ছেলের বউয়ের কী হয়েছে?'

মানুষের চোখের মণি যখন স্থির হয়, তখন দুটো চোখের মণিই স্থির হয়। একমাত্র শয়তানের বেলায় ঘটে অন্যরকম। তাদের একটা মণি থেমে থাকলেও অন্যটা নড়ে। গোপীনাথ দেখল, কাদুর বাঁ-দিকের চোখের মণি স্থির। অন্যটা পাক মারছে!

boierpathshala.blogspot.com

গোপীনাথ ভেবেছিল ঢোঁক গিলবে। হল না। আতঙ্কে থুতুও শুকিয়ে গেছে। যন্ত্রের গলায় বলল, 'ফিট গেছে। মৃগী রোগ হলে এমনটা হয়। ঘন ঘন ফিট যায়। নোংরা গন্ধ দিয়ে জ্ঞান ফেরাতে হয়।'

কাদু চাপা গলায় ধমক দিল।

'থাম, চুপ কর। ওসব মৃগী-ফৃগী নয়। সদা হারামজাদার ছেলের বউয়ের কী হয়েছে আমি ঠিক করব, তুমি নয়। আমি যা বলব কাল থেকে তুমি গাঁয়ে সে-কথাই রটাবে। বুঝেচ?'

'কী কথা?'

গোপীনাথ বলল বটে, তবে তার মনে হল না পুরো কথা মুখ দিয়ে বেরোল। ভয়ের সময় এরকম হয়। মানুষ কথা বলে, কিন্তু পুরো কথা বেরোয় না।

'সেটা বলতেই তো এতদূর এলাম গো ডাক্তার।'

কাঁদু নিঃশব্দে হাসল। অন্ধকারে তার নোংরা দাঁতগুলো দেখা গেল না। মনে হল, দাঁত, জিভ, ঠোঁটের বদলে খানিকটা অন্ধকার মুখে সাজিয়ে বসে আছে সে।

boierpathshala.blogspot.com

চার

এক-একটা সময় আসে যখন মানুষ নিজেকে দেখার থেকে দেখানোর উন্মাদনায় মেতে ওঠে। পাশের জন, সামনের জন, পিছনের জনকে ঠেলে, ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে আসতে চায়। বলতে থাকে— 'আমাকে দ্যাখ, আমাকে দ্যাখ, দয়া করে আমাকে দ্যাখ।' এখন সম্ভবত সেরকমই এক সময়।

হুড়োহুড়ি সামলে টিফিনের সময়েও উঠতে পারল না কথাকলি। আরও মিনিট কুড়ি বসে থাকতে হল তাকে। তারপর দ্রুত হাতে টেবিলে ছড়িয়ে থাকা কাগজপত্র, ফটো গোছাতে লাগল। এখনই প্রায় একশোর কাছাকাছি অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়েছে। আরও পড়বে। পাঁচটা পর্যন্ত সময় আছে।

শিউচরণ রিসেপশন খালি করে দিয়েছে। টিফিনের সময়টুকু কাউকে ভেতরে থাকতে অ্যালাও করা হয় না। হয় বাইরে গিয়ে চা-টা খেয়ে এসো বাপু, নয়তো অপেক্ষা কর কাচের দরজার বাইরে।

কথাকলি চশমাটা খুলে তার জঙ্গল-আঁচল দিয়ে কাচ মুছল। মাথাটা ধরব ধরব করছে। চা না খেলেই নয়। চায়ের নেশাটা আগে ছিল না। ব্রতীনের কাছ থেকে চলে আসার পর হয়েছে। কোনো কোনোদিন রাতে ঘুম আসতে চায় না। ছটফট করতে করতে উঠে পড়ে। ভাবে আলো জ্বেলে বই পড়বে। পড়তে গিয়ে দেখে, ইচ্ছে করছে না। অক্ষরগুলো শুধু চোখে পড়ছে, মাথায় ঢুকছে না। অথচ এমন একটা সময় গেছে যখন বই নিয়ে কী কাণ্ডই না করছে! মা যাতে বুঝতে না পারে, টর্চ জ্বেলে উপন্যাসের শেষ চার পাঁচ পাতা শেষ করেছে। টর্চের আলোও ঝিমিয়ে আসত। এখন বন্ধ বই কোলে রেখে মন খারাপ নিয়ে অন্ধকারে বসে থাকে। কখনও রান্নাঘরে গিয়ে চা বানিয়ে নেয়। খুব সাবধানে করতে হয়।

boierpathshala.blogspot.com

বাবা যেন কাপ ডিশ, চামচের আওয়াজ না পায়। পেলে তখন কিছু বলবে না, ঝামেলা করবে পরদিন। চিন্তিত মুখে বলবে, 'হ্যাঁরে কলি, কাল তোর ঘুম হয়নি না?'

'ওমা! ঘুম হয়নি কে বলল? চমৎকার ঘুম হয়েছে বাবা।'

'না কেউ বলেনি, আমি জেনেছি। নিজেই জেনেছি।'

'ভুল জেনেছ। একজন ডাক্তার হয়েও তুমি যে কেমন করে ভুল জানো! তুমি আমার চোখ দেখে বুঝতে পারছ না কেমন ফুলো?'

'ডাক্তার ভুল জানতে পারে, বাবা ভুল জানে না। তোর চোখ ফোলা ঠিকই, তবে ঘুমের ফোলা নয়।'

'দুর, এক ঘুমে রাত কাবার করেছি। অন্যদিন তাও একবার উঠি। বাথরুমে যাই, জল খাই।'

সুদর্শন রায় ঠোঁটের ফাঁকে হেসে বলেন, 'আমার কিন্তু অন্যরকম মনে হল রে।'

'অন্যরকম! কীরকম?' মিটিমিটি হেসে বলতে হবে কথাকলিকে।

'মনে হল, তুই ঘর থেকে বেরোলি, পা টিপে টিপে রান্নাঘরে গিয়ে চা বানালি। তারপর কাপে ঢেলে...।'

ধরা পড়ার অপরাধ সামলাতে তখন হালকা কথা বলতে হবে কথাকলিকে।

'স্বপ্ন দেখেছ। দুঃস্বপ্নের মতো একে বলে চা-স্বপ্ন।'

'কলি, আমাকে লুকোস না। শুধু কাল নয়, আমি জানি, আজকাল অনেক রাতেই তোর ঘুম হয় না।'

কথাকলি চুপ করে থাকবে। বাবা হেসে বলবে— 'এবার থেকে আমাকেও ডাকিস, আমিও তোর সঙ্গে চা খাব। বেশি রাতে বাবা-বেটিতে মুখোমুখি বসে চা খেতে কেমন লাগে দেখব।'

ব্রতীন কাল চা না খেয়েই চলে গেছে। গোপালের মা চা আর অমলেট নিয়ে গিয়ে দেখে মানুষটা নেই। ড্রইংরুম ফাঁকা।এতে কথাকলির চিন্তা আরও বেড়েছে। 'খাবো' বলে চলে যাওয়াটা কেমন কথা? এ মানুষ এরকম কাজ আগে কখনও করেনি। নিশ্চয় কোনো মতলব ছিল। কী মতলব?

ঘটনাটা কাউকে বলতে পারলে ভালো হত। ভেবেছিল বাবাকে বলবে। কিন্তু বাবা ফিরল অনেকটা রাত করে। বিকেলের ট্রেনটা মিস করেছে। তার ওপর আবার স্টেশন থেকে ক্লিনিক পর্যন্ত হাঁটা। রিকশা বন্ধ ছিল। কী বিচ্ছিরি

boierpathshala.blogspot.com

কাণ্ড। আজকাল যে-কোনো কিছুতে বন্‌ধ। কাজ না করে বিচ্ছিরি প্রতিবাদ। মানুষটাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। এই বয়েসে অতদূর যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। যতই সপ্তাহে একদিন হোক, পরিশ্রম তো। এবার থামা দরকার। কথাকলি কথাটা অনেকবার বলেছে। সুদর্শন রায় শুনতে চান না। হাজারটা যুক্তি দেখান।

'আসলে কী জানিস, গ্রামগঞ্জের দিকে মাঝেমধ্যে অদ্ভুত সব পেশেন্ট পাই। ইন্টারেস্টিং সব কেস। ওখানে সোশাল স্ট্রাকচারটা অন্যরকম। শরীরের মতো গরিব মানুষগুলোর মনের সমস্যাও শহরের থেকে একেবারে আলাদা। কলকাতায় বসে বুঝতে পারি না। একবার কী হল জানিস কলি, একজন পেশেন্ট এসে বলল, ডাক্তারবাবু আমার ঘরের ভেতর ধান ফলেছে। বৃদ্ধ মানুষের কথা শুনে আমি অবাক। লোকটা বলে কী! বললাম, কথাটার মানে কী! ঘরের মধ্যে ধান আবার কী? স্বপ্ন দেখেন? বৃদ্ধ বিরক্ত হয়ে বলল, স্বপ্ন কেন হবে? সত্যি সত্যি ধান। আমন ধান। চৌকাঠ ডিঙিয়ে সেই ধান এখন আমার তক্তাপোশের কাছ পর্যন্ত চলে এসেছে। তারা হাওয়ার দোল দেয়, কানাকানি করে। রাতে ওদের ফিসফাস শুনি। ধান পাকার সময় একধরনের গন্ধ হয় না? আমি সেই গন্ধ পাই। আমি ঘরে আল বানিয়েছি। সেই আল ধরে ঘুরে বেড়াই। আপনি চলুন, আপনিও ঘুরে বেড়াবেন। কোনো অসুবিধে নেই। সমস্যাটা একবার ভেবে দ্যাখ কলি। পরে খোঁজ নিয়ে দেখলাম, জমির সমস্যা। জমিজমা বেচেবুচে লোকটা কিছু টাকা পেয়েছিল, ছেলেরা সে-টাকাও হাতিয়েছে, তারপর থেকেই মাথার গোলমাল। এই জিনিস কি কলকাতায় পাব? অদ্ভুত না?'

কথাকলি বিরক্ত হয়। বলে, 'মাথা খারাপের সবটাই অদ্ভুত। কোনটা নয়? ওসব কথা ছাড় বাবা, আসলে মা মারা যাওয়ার পর তুমি গার্জেনলেস হয়ে পড়েছ। আর ওখানে কী এমন তোমার পেশেন্ট? শুনেছি লোকই তো আসে না। ওসব জায়গায় সাইকিয়াট্রিস্টের দাম আছে নাকি? ওখানে ওঝাগিরিই ভালো। জলপড়া, তুকতাকই ঠিক। কেউ যদি ঘরের মধ্যে আল বানিয়ে হাঁটে, পুকুর কেটে সাঁতার কাটে তাকে ওষুধ দিয়ে কিছু হবে ভেবেছ?'

সুদর্শন রায় গম্ভীর হয়ে যান।

'কথাটা ঠিক নয় কলি। গ্রামগঞ্জের মানুষ আমাদের মতোই ডাক্তার বদ্যির ব্যাপারে কনসার্ন। ট্রিটমেন্টের সুযোগ পায় না, কী করবে? ইচ্ছে থাকলেও কিছু করতে পারে না। সাপে কামড়ালে কিছু করার থাকে না, তো মাথার অসুখ। এখানে অন্য সমস্যাও আছে। তুই সেটা জানিস। টাকাপয়সার ব্যাপার থাকলে ছাড়তে একদিনও সময় লাগত না। বিনি পয়সার সার্ভিস বলেই ছাড়তে পারি

boierpathshala.blogspot.com

না। পয়সা নিলে যেমন রেসপনসিবিলিটি তৈরি হয়, না নিলেও হয়। সেটা যেন বেশি দায়িত্ব। একজন অলটারনেটিভ কাউকে না পেলে ছাড়ি কী করে? দু-একটা হলেও পেশেন্ট তো আসে। রঞ্জন অবশ্য বলেছে, ওরা খুব চেষ্টা করছে, নতুন একজন কাউকে ধরবে। মনে হচ্ছে শিগগিরই হয়ে যাবে।'

কথাকলি রাগ দেখায়। বলে, 'নাও, আবার তোমার লেকচার শুরু হল। আসলে কাজটা তুমি পছন্দ কর। তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু শরীরটাও তো দেখবে। অন্যের মন দেখবে, নিজের শরীর দেখবে না সেটা কেমন কথা?'

মুখে যা-ই বলুক কথাকলি জানে, কথাটা সত্যি। টাকাপয়সা ছাড়া অন্য জিনিসও থাকে। তার বেলাতেই হয়েছে। বাবার কাছে চলে আসার পর সময় কাটাতে সে প্রায় পাগলের মতো হয়ে উঠেছিল। একা বাড়িতে বসে থাকতে অসহ্য লাগত। বন্ধুবান্ধব ভালো লাগত না। একাই সিনেমায় যেত। মাঝপথে হল থেকে বেরিয়ে আসত নিঃশব্দে। কলকাতার পথে পথে অর্থহীন ভাবে হেঁটেছে কতদিন। এরপরই কাজ খুঁজতে শুরু করে। ছোটো বড়ো যে-কোনো কাজ। বাবাও আপত্তি করেনি। বরং বলেছিল, 'সেই ভালো। বাড়িতে একা বসে কী করবি? কাজের মধ্যে থাকাই ভালো। দেখ যদি কিছু পাস।'

শেষ পর্যন্ত কমল মল্লিকের এখানে যোগাযোগ হল। টিভির কিছুই জানত না কথাকলি। ঘষে মেজে এডিটিং-এর খানিকটা শিখে নিয়েছে। এখনও একা সবটা পারে না, তবে পাশে বসে অ্যাসিস্ট করে। মাইনেপত্র তেমন কিছু নয়। তবে সময় কেটে যায় বেশ। সব মিলিয়ে কাজটাও ইন্টারেস্টিং। এই কারণেই চালিয়ে নেওয়া। নইলে তার চাকরির কী দরকার? বাবার রোজগারে দুজনের সংসার চলে যেত হেসে খেলে।

কালকের ঘটনাটা শেষ পর্যন্ত বাবাকে বলা হয়নি। এখন মনে হচ্ছে, না বলে ভালোই হয়েছে। মানুষটা নতুন করে চিন্তায় পড়বে। ব্রতীনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির সময়তেই খুব ভেঙে পড়েছিলেন। সেটাই স্বাভাবিক ছিল। মা মরা মেয়ে। বিয়ের এক বছর ঘুরতে না ঘুরতে ফিরে আসা, ভেঙে পড়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মুখে কিছু বলেনি। শুধু বলেছিলেন, 'যে-রকম বুঝিস সেটা করাই ভালো। যদি মনে হয় পারবি না, তাহলে চলে আয়। জোর করে কিছু করতে যাওয়াটা ঠিক নয়।'

কথাকলির আজও স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন বলেছিল, 'বাবা, তোমার মানুষের মন নিয়ে কারবার, তোমরা অন্যের মনের কথা শোনও। আমি নিজের মনের কথা অনেকদিন শুনিনি। বরং তাকে জোর করে বোঝানোর চেষ্টা করেছি।

boierpathshala.blogspot.com

আর পারলাম না। একটা অকর্মণ্য, অলস, নিরাসক্ত মানুষের সঙ্গে গোটা জীবনটা কাটাতে আমি রাজি নই। সেদিন ভুল করেছি মানে এই নয় সারাজীবন ভুলটা আঁকড়ে বসে থাকতে হবে।'

সুদর্শন রায় ইচ্ছে করলে পুরোনো কথা তুলতে পারতেন। বলতে পারতেন, 'সেদিন তুমি এই কথাটা বুঝতে চাওনি কলি। তোমার মায়ের অনেক বারণ সত্ত্বেও বুঝতে চাওনি।' কিন্তু তিনি সেরকম মানুষ নন। অতীতের ভুল ধরিয়ে মেয়েকে কষ্ট দেওয়ার কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। মেয়ের প্রতি তাঁর ভালোবাসা গভীর। শুকনো হেসে বললেন, 'তাহলে আর কী? চলে আয়। ভালোই হবে। তোর মা চলে যাওয়ার পর থেকে বাড়ি ফিরে বড়ো একা লাগে।'

রিসেপশন ফাঁকা হতে যে-যুবক কাচের দরজা ঠেলে ঢুকল তার নাম সোমনাথ। শিউচরণ কাচের দরজা খুলে একগাল হেসে কপালে হাত দিয়ে সেলাম ঠুকল। সোমনাথও পালটা হাত ছোঁয়াল নিজের কপালে। অফিসের সবাইকেই ঢোকা বেরোনোর সময় সেলাম জানায় শিউচরণ। একমাত্র সোমনাথই তাকে পালটা সেলাম দেয়। শিউচরণ লজ্জা পেয়ে মোটা গোঁফের আড়ালে হাসে। বলে, 'কেয়া কর রহে সোমনাথদা?'

সোমনাথ গম্ভীর মুখে বলে, 'বদলা লে রহা হ্যায় শিউচরণ। জান কা বদলা জান, সেলাম কা বদলা সেলাম।'

সোমনাথ আজ জিনসের ওপর অফ হোয়াইট টি শার্ট পরেছে। গালে দিন কয়েকের না-কামানো দাড়ি। চুল আঁচড়ানো, কিন্তু চিরুনিতে নয়, হাতে। ফলে পুরোটাই এলোমেলো হয়ে আছে। লম্বাচওড়া ছেলেটাকে এমনিতেই সুন্দর দেখতে। আজ আরও ভালো লাগছে। একটা কেয়ারলেস ভাব।

কাউন্টারের সামনে পর্যন্ত এসে কাচে টোকা দিল সোমনাথ।

কথাকলি কাগজ রাখছিল ফাইলে। মুখ নামানো অবস্থাতেই ধমক দেয়, 'এখন হবে না। টিফিন শুরু হয়ে গেছে। এক ঘণ্টা পরে আসুন।'

সোমনাথ হাসি চেপে গম্ভীর গলায় বলল, 'ম্যাডাম, শুনলাম জিভ ভ্যাংচানোর জন্য আপনারা কিছু লোক খুঁজছেন। অডিশন দিতে চাই। আমি হলাম জিভ ভ্যাংচানো ওস্তাদ। এই যে দেখুন এইভাবে।'

কথাকলি ভুরু কুঁচকে মুখ তোলে। সোমনাথ সত্যি সত্যি জিভ বের করে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে হাসছে। কথাকলিও হেসে ফেলে।

'আরে, আপনি! আপনি কখন এলেন? ইস দেখেছেন কী কাণ্ড! আপনাকেও ধমক দিয়ে ফেললাম। আসলে ধমকাতে ধমকাতে অভ্যেসের মতো

হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, আজ রাতে ঘুমের মধ্যেও ধমকাব। সকাল থেকে যা চলছে।'

সোমনাথ হেসে বলল, 'খারাপ হবে না। ধরুন স্বপ্নে বস্‌কে পেলেন। তাকেও দিলেন এক ধমকানি।'

কথাকলি হাসতে হাসতেই বলল, 'ঠাট্টা হচ্ছে?'

সোমনাথ চোখ টানটান করে বলল, 'ব্যাপার তো ভয়ংকর মনে হচ্ছে ম্যাডাম। এডিটিং ফেলে আপনি এখানে? নন্দিনীদি কোথায়?'

'ব্যাপার সত্যি ভয়ংকর। ছেলের মাথা ফেটেছে শুনে নন্দিনীদি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছে। এখন আমি কাঁদছি। ওর হয়ে প্রক্সি দিচ্ছি। অডিশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন জমা নেওয়া চলছে। দেখুন অবস্থা, মানুষ একেবারে হামলে পড়েছে। কিছুই না, শুধু ভিড়ে মুখ দেখানো। তাতেই এই।'

সোমনাথ ফোঁস করে একটা দার্শনিক ধরনের নিশ্বাস ফেলল। বলল, 'মানুষ তো ভিড়েই থাকতে ভালোবাসে। একা থাকতে আর কে চায় বলুন ম্যাডাম?'

কথাকলি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। অফিসের এই ছেলেটাকে সে পছন্দ করে। সে কেন? কমল মল্লিক টিভি প্রোডাকশনের প্রায় সকলেরই পছন্দের ছেলে সোমনাথ। ছেলেটা অন্যরকম। হাসিখুশি, মজাদার শুধু নয়, সমস্যায় পড়লে ভরসাও করা যায়। কাজে সিরিয়াস আবার অলসও। কামাইয়ের জন্য যে কোনো ধরনের মিথ্যে বলতে পারে। একবার দশদিন না এসে ডান পায়ের পাতায় ক্রেপ ব্যান্ডেজ লাগিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাজির। কী ব্যাপার না মেট্রো থেকে নামতে গিয়ে সেন্ট্রাল স্টেশনে পা মুচকেছে। এক্সরেতে ধরা পড়েছে হেয়ার লাইন ফ্র্যাকচার। ডাক্তার বলেছে, একুশ দিন বেড রেস্ট। কাজের তাড়নায় দশদিনের মাথায় চলে এসেছে। প্রথমে মুখ কাঁচুমাচু করে কলিগদের 'আহারে উহুরে' শুনল। তারপর নেমে পড়ল কাজে। একসময় দেখা গেল ছেলে ব্যান্ডেজ-ট্যান্ডেজ খুলে দিব্যি ছোটাছুটি করছে! সবাই অবাক হলে গম্ভীর গলায় বলল, 'কাজের সময় ফ্র্যাকচার জুড়ে যায়। তোমরা বোধহয় জান না, নিজেকে ব্যস্ত রাখার সময় শরীর যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম অ্যাবসরভ করতে পারে, সেই ক্যালসিয়াম ভাঙা হাড়ের মাঝখানে... তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না, মেডিকেল সায়েন্সের বিষয়।'

এই তো এবার 'জ্বর হয়েছে' বলে সাতদিন ডুব দিয়েছিল। চোখ মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, জ্বর না ছাই। ডাহা মিথ্যে। ইচ্ছে করে দাড়ি-টাড়ি কামায়নি।

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

চুলে চিরুনি নেই। খোদ মালিক আজ লোক পাঠিয়ে ধরে এনেছে। এমনি এমনি আনেনি, কারণ আছে। মজার ব্যাপার হল, কলকাতায় টিভি প্রোডাকশন লাইনে যে ক-টা ছেলে কাজ জানে সোমনাথ তাদের একজন। এ-ছেলেকে না এনে উপায় নেই।

সোমনাথ হাত ছড়িয়ে বলল, 'শোনেননি?'

কথাকলি কৌতুক চোখে বলল, 'কী?'

'ওই যে—সকল লোকের মাঝে বসে/ আমার মুদ্রাদোষে/একা হতেছি আলাদা?/ আমার চোখে শুধুই ধাঁধা?/আমার পথেই শুধু বাধা?'

কথাকলি হেসে বলল, 'কাব্য ছাড়ুন, পথের বাধা না ফাঁকির বাধা বুঝতে পারবেন এবার। বস্ আপনাকে খুঁজছে। কী ব্যাপার বলুন তো? তিনবার ফোন করা হয়ে গেল! সোমনাথ এসেছে? সোমনাথ এসেছে? বাপরে। বিরাট পেয়ার।'

সোমনাথ ভুরু কুঁচকে বলল, 'তিনবার ফোন! এখনও তো সময় হয়নি। তিনটের পর আসতে বলেছিল।'

'সে জানি না। ক-দিন অফিসে আসেননি বলে বোধহয় মন কেমন করছে। কী করবেন? ভেতরে যাবেন, না, আগে এখানে এক কাপ চা খেয়ে নেবেন? কমল মল্লিক যখন নেমন্তন্ন করে ধরে এনেছে তখন নিশ্চয় পোলাও কালিয়া খাওয়াবে।'

সোমনাথ ঘুরে এসে কাউন্টারে ঢুকল। চেয়ার টেনে বসে বলল, 'খাওয়াতে পারে। কে জানে হয়তো ফাঁসির খাওয়া। তবে এখনই আমি ভেতরে যাব না। আপনি যান। আমি বরং চা খেয়ে ফাঁকা রিসেপশনে বসে একটু ঘুমিয়ে নিই। শুনেছি ফাঁসি খুবই ধকলের একটা জিনিস। যে-কোনো বড়ো ধকলের আগে ঘুম দরকারি।'

কথাকলি ইন্টারকমে ক্যান্টিনে চায়ের কথা বলে সোমনাথের মুখোমুখি বসল।

'এতদিন ডুব মেরে কোথায় ছিলেন? মোবাইল ছেড়ে দিয়েছেন নাকি?'

'ছাড়িনি, ছাড়ব ছাড়ব ভাবছি। আপাতত সুইচ অফ।'

কথাকলি খিলখিল করে হেসে বলল, 'সুইচ অফ করে লাভ কী হল? বস্ তো সেই বাড়িতে লোক পাঠিয়ে ধরে আনল।'

সোমনাথ হেসে বলল, 'সেটা জানলে বাড়ির সুইচও অফ করে রাখতাম। ওসব বাদ দিন, দেখছিলাম পুলিশের মতো ধমকধামকও দিতে শিখে গেছেন। শান্তশিষ্ট মানুষের এ কী অবস্থা! এবার হাতে একটা লাঠি নিলেই ব্যস। বলেন

boierpathshala.blogspot.com

তো ব্যবস্থা করি। আমার এক আত্মীয় লালবাজারে আছে। চাইলে একটা লাঠি দিয়ে দেবে। জানেন তো, পুলিশের লাঠি সাংঘাতিক জিনিস।'

পুলিশের কথায় কথাকলি নড়েচড়ে বসল। আচ্ছা, পুলিশের কাছে গেলে কেমন হয়? ছেড়ে আসা স্ত্রী-র কাছে কোনো লোক ঘুরঘুর করলে তার বিরুদ্ধে পুলিশে যাওয়া যায় না?

চা এসে গেছে। অফিসের চা সাধারণভাবে খারাপ হয়। এই অফিসে চা ভালো। কথাকলি কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'কানঘুষোয় শুনলাম, বস্ চিন্তায় পড়েছে। গভীর চিন্তায়। কয়েকটা প্রোগ্রাম নাকি চ্যানেলগুলো থেকে বাতিল হয়ে ফিরে আসছে। মনে হয় সেই কারণে আপনাকে তলব।'

সোমনাথ ভুরু কুঁচকে বলল, 'প্রোগ্রাম ফিরে আসছে! কেন? কোন্ প্রোগ্রাম?'

কথাকলি আঁচল তুলে মুখ মুছে বলল, 'আমি কী করে জানব? বড়োদের কথা। যেটুকু শুনেছি বললাম। অত বৃত্তান্ত জানি না। কম্পানি টিকলেই হল, আমরা ঠিক সময় মাইনে পেলেই খুশি।'

সোমনাথ অন্য প্রসঙ্গে গেল। হেসে বলল, 'বাপরে নোটিশে দেখলাম, অডিশনের কী সব সাবজেক্ট! চোর, গুন্ডা, বদমাইশ। আচ্ছা, ওই ওঠবোসটা কী ব্যাপার?'

কথাকলি মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে বলল, 'ওঠবোসের অডিশন।'

সোমনাথ অবাক হয়ে বলল, 'ওঠবোসের অডিশন! মানে?'

'শুনেছি একটা প্রোগ্রাম হবে, ওই গেম শো ধরনের কিছু। সেখানে শাস্তি হল কান ধরে ওঠবোস। ক্যামেরার সামনে কান ধরে ওঠবোস করতে হবে। সেই ওঠবোস করতে কত অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়েছে জানেন?'

'কত?' সোমনাথ অবাক গলায় বলল।

'সাঁইত্রিশটা। থার্টি সেভেন। ক্যান ইউ ইমাজিন? অডিশনে যারা ভালো ওঠবোস করবে, তাদের চান্স হবে। টিভিতে মুখ দেখানোর পাগলামিটা একবার বুঝুন।'

'আমার বুঝে কাজ নেই, আপনারা বুঝুন। এই পাগলামির মধ্যে বেশিদিন থাকলে আমিও পাগল হয়ে যাব। তখন আর শুধু ক্যামেরার সামনে নয়, রাস্তার মোড়ে গিয়ে ওঠবোস করতে হবে।'

সোমনাথ ভেবেছিল কথাকলি এ-বিষয়ে কিছু বলবে। বলল না। চুপ করে চা খেতে লাগল। তাকে খানিকটা অন্যমনস্ক লাগছে।

boierpathshala.blogspot.com

'কী ব্যাপার বলুন তো কথাকলি? এনিথিং রং? আপনার বাবার শরীর ভালো তো?'

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল কথাকলি। চা খেল। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'সোমনাথবাবু, একটা কথা বলব? কিছু মনে করবেন না তো?'

'কী?'

'আমাকে একবার পুলিশের কাছে নিয়ে যেতে পারবেন? ওই যে আপনার কে চেনা আছে বললেন।'

সোমনাথ চোখ কপালে তুলে বলল, 'পুলিশ! পুলিশের কাছে গিয়ে আপনি কী করবেন! আপনার আবার কী হল? বাড়িতে ডাকাত পড়েছে?'

কথাকলি ঠোঁট কামড়াল। ব্রতীনকে ডাকাত ভাবতে তার অস্বস্তি হচ্ছে। বোকা মানুষ কখনও চোর ডাকাত বা সাধু সন্ন্যাসী হতে পারে না। সোমনাথকে হুট করে পুলিশের কথাটা বলা ঠিক হল না। ছেলেমানুষি হয়ে গেল। এখন লজ্জা করছে। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'না, না সেরকম নয়।'

সোমনাথ কথাকলির দিকে তাকিয়ে রইল। মুখ দেখে তার কেমন যেন মনে হল। ঠিক সন্দেহ নয়, তবে মেয়েটা কিছু লুকোচ্ছে।

'তাহলে কীরকম?'

কথাকলি জোর করে হাসল। বিষয়টাকে সহজ করে ফেলতে হবে।

'আমার বাড়িতে ডাকাতি করার মতো কী আছে? টাকাপয়সা, হিরে-জহরত কিছুই তো নেই।'

সোমনাথ দু-হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল। হাসতে হাসতে বলল, 'ডাকাত কি শুধু টাকাপয়সা নিতে আসে ম্যাডাম? ডাকাতির আরও কত কী থাকে। যাক, সিরিয়াস কিছু হলে বলবেন, পুলিশের কাছে নিয়ে যাব।'

কথাকলি চমকে উঠল। ডাকাতির আরও অনেক কিছু আছে? কই সে তো এরকম ভাবে আগে ভাবেনি! এখনও কি ভাবতে পারছে?

কথায় আছে, প্রেমের প্রথম আর শেষ এই দুটো দিনের কথা চট করে কেউ ভোলে না। অথচ এই প্রক্রিয়া দুটি সর্বদাই হয় দীর্ঘ। এর মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট করে দুটো দিন বাছা অসম্ভব। এতে হয় গুলিয়ে যায়, নয় ভুল হয়। তবু হয়তো শেষপর্যন্ত সকলেই ভেবেচিন্তে পছন্দমতো একটা করে দিন বেছে রাখে। ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই নয়।একেবারে বাছতে না পারলে কেউ বলে 'লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট' অথবা 'হঠাৎ সেদিন জানতে পারলাম...।'

কথাকলিকে সেরকম কিছু করতে হয় না। ব্রতীনের সঙ্গে প্রথম দিনটা তার

boierpathshala.blogspot.com

স্পষ্ট মনে আছে। তার কারণ ব্রতীন নয়, কারণ তার বাবা।

সেটা ছিল ডাক্তার সুদর্শন রায়ের জন্মদিন।

শীতের সময়। জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ। কলকাতায় হি হি করে কাঁপার মতো শীত সহজে পড়ে না। হাফ হাতা সোয়েটারে সিজন চলে যায়। খুব বেশি হলে গায়ে একটা হালকা চাদর। সেবার ঠান্ডা পড়েছিল জাঁকিয়ে। বালিগঞ্জে বসে জাঁকিয়ে ঠান্ডা উপভোগ করার মজাই আলাদা। সকাল থেকেই কথাকলির মন ফুরফুরে।

এ-বাড়িতে তিনজনের কারও জন্মদিনেই বড়ো কোনো অনুষ্ঠান হয় না। দিনেরবেলাতে তো কথাই নেই, রাতে খানিকটা সময় পাওয়া যায়। মেয়ের জন্মদিনে বাইরে কোথাও ডিনার, কর্তা-গিন্নির বেলায় বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া। একটা দুটো স্পেশাল মেনু হল, ব্যস। এটুকুই সেলিব্রেশন।

মা সকালে বলল, 'গতবার দই-কই করেছিলাম, এবার চিংড়ি মাছ করব। তোর বাবা চিংড়ি মাছ ভালোবাসে।'

কথাকলি বলল, 'তুমি করবে না মা, আমি করব। আমি একটা নতুন প্রিপারেশন শিখেছি প্রন কোলাপুরি।'

মা চোখ কপালে তুলে বলল, 'প্রন কোলাপুরি! সেটা কী? তুই পারবি? তুই রান্নার কী জানিস?'

'কিছু জানি না, তবু করব। করে বাবাকে চমকে দেব।'

'ভালো দিকে চমকাবি, না খারাপ দিকে?'

'মনে হয়, খারাপ দিকে। তুমি বরং মা রেসিপিটা একটু শোন। শুনে বল ঠিক হচ্ছে কিনা। রান্না ঝুলে গেলে বলব, মা বলেছে। ভালো হলে ক্রেডিট আমার।'

'থাক, তোমাকে আর রেসিপি শোনাতে হবে না।'

কথাকলি মায়ের হাত ধরে জোর করে খাটে বসাল। হেসে বলল, 'শুভদিনে নো ঝগড়া। তুমি শোনো তো। চিংড়ি মাছের সঙ্গে নারকোল কোরা আধ কাপ, পিঁয়াজ দুটো সরু করে কাটা, দু-চায়ের চামচ পোস্ত, শুকনো লঙ্কা পাঁচটার মতো, হলুদ এক চামচ।'

বাবা কথা দিয়েছিল, চেম্বার সেরে তাড়াতাড়ি ফিরবে। খুব বেশি হলে আটটা। কথাকলি জানত, বাবা যখন আটটা বলেছে, দশটার আগে কোনোমতেই নয়। উঠি উঠি সময়ে আরও দুজন পেশেন্ট আসবে এবং তারা কথা থামাতে চাইবে না। সুতরাং রান্নার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। বিকেলে কথাকলি

boierpathshala.blogspot.com

ঠিক করল সাজবে। বাবার জন্মদিন উপলক্ষে সাজগোজ। শাড়ি বাছল অনেকটা সময় ধরে। সুন্দর একটা কার্ডিগান বের করল। গলায় সুতোর কাজ। একবারে কাঁধ পর্যন্ত নেমে গেছে।

মা বলল, 'ইস এত আয়োজন করছিস, কয়েকজনকে আজ ডাকলে হত।'

'কেন? বাইরের লোকদের ডাকার কী হয়েছে? আমি সাজছি বাবার অকেশনে, এর মধ্যে অন্য লোক আসবে কেন? বাবার জন্য মেয়ে সাজতে পারে না?'

'সে ভালোই করেছিস, তোর বাবা দেখে খুশি হবে, তবে উনি যখন আসবেন ততক্ষণ কি আর তোমার সাজগোজ থাকবে ভেবেছ?'

'গরমের সময় হলে থাকত না, পাউডার গলে গলে পড়ত। শীত বলে থাকবে মনে হচ্ছে মা। এই শাড়িটা পরব? ঠিক আছে? তবে এখন নয়, একেবারে রান্না সেরে পরব। বাবা ঢুকতেই দরজা খুলে গান গেয়ে উঠব হ্যাপি বার্থ ডে। তুমিও জয়েন করবে।'

মা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'বয়ে গেছে, বাবা-মেয়ের আদিখ্যেতার মধ্যে আমাকে টানছ কেন?'

'বাঃ বিয়ের পর পর লুকিয়ে লুকিয়ে বাবাকে কত গান শোনাতে।'

মা-মেয়ে দুজনেই হেসে ওঠে।

সুদর্শন রায় যখন ফিরলেন সাড়ে সাতটাও বাজেনি। কথাকলির সাজগোজ তো দূরের কথা, সে পরে আছে খুবই সাধারণ একটা সুতির শাড়ি। নিছকই ঘরে পরার। গায়ে চাদর ছিল, সেটা খুলে রেখেছে। এই শীতেও রান্নাঘরের গরমে কপালে ঘাম জমেছে। দরজা খুলে বাবাকে দেখে বিরাট অবাক হল।

'তুমি! এখন!'

সুদর্শন রায় হেসে বললেন, 'শুধু আমি নয়, আমার সঙ্গে আরও একজন আছে।'

কথাকলি উঁকি মেরে দেখে সত্যি সত্যি বাবার গাড়ি থেকে আরও একজন নামছে। ড্রাইভার অনন্তবাবু মুখ সিঁটকে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, যাত্রীটিকে তার একেবারেই পছন্দ হয়নি। পছন্দ না হওয়ার মতোই। ছেলেটির গায়ে বিশ্রী ধরনের ফুলহাতা সোয়েটার। ঝুলের দিকে বড়ো। গলায় মাফলার। সেটার অবস্থা আরও শোচনীয়। এখন কেউ মাফলার পরে নাকি! তাও আবার এই বয়েসে। অনেকটা গামছার মতো ডোরাকাটা। চোখমুখে একটা গোবেচারা ভাব। ষাটেও সুদর্শনবাবুকে শীত কাবু করতে পারেনি, অথচ এই পঁচিশ ছাব্বিশ

boierpathshala.blogspot.com

বছরের ছেলেটিকে দেখে মনে হচ্ছে একেবারে সিঁটিয়ে গেছে। বোকা বোকা মুখ করে হাতে হাত ঘষছে। যেন বালিগঞ্জ নয়, এটা দার্জিলিঙের ম্যাল।

সুদর্শনবাবু যত্ন করে বললেন, 'এসো, এসো ব্রতীন, ভেতরে এসো।'

পায়ের কেড্‌স খুলে, ছেলেটি ঘরে ঢুকল সলজ্জ ভঙ্গিতে।

অনেকদিন ধরেই জন্মদিনের এই সময়টা হল পারিবারিক সময়। তিনজনে মিলে গল্প হবে, হাসি ঠাট্টা হবে। তারপর ডিনার। কথাকলি ঠিক করে রেখেছে, আজ হবে ক্যান্ডেল লাইট ডিনার। ডাইনিং-এর আলো নিভিয়ে মোমের আলোয় খাওয়া। মাকেও প্ল্যানটা জানায়নি। লুকিয়ে মোমবাতি কিনে এনেছে। এক ফাঁকে টেবিলে সাজিয়ে নেবে। আলো নেভানোর পর বাবা চমকে যাবে।

এরকম একটা সময় বাবা এই উটকোটাকে কোথা থেকে ধরে আনল? কেনই-বা আনল? রোগী-টোগি কেউ?

কারণ জানা গেল খানিক পরে।

বাড়ির ভেতর ঢুকে সুদর্শনবাবু চাপা গলায় বললেন, 'ছেলেটার নাম ব্রতীন, ব্রতীন একটা অন্যরকম ছেলে। ব্রিলিয়ান্ট বলতে পারিস। এন্ট্রান্সে স্ট্যান্ড করেছিল, ডাক্তারি পড়তে পড়তে আড়াই বছরের মাথায় ছেড়ে দিয়েছে।'

'ছেড়ে দিয়েছে!'

'হ্যাঁ দিয়েছে, তার নাকি মানুষ কাটাছেঁড়া পছন্দ হচ্ছিল না। তারপর নানান রকম কাজ করে এখন কোথায় যেন স্কুল মাস্টার হয়েছে। কসবার দিকে। তাও বড়ো কিছু নয়, ছোটোখাটো স্কুল। অথচ এই ছেলে ডাক্তার হলে অনেকের পকেটে টান পড়ত।'

কথাকলি খুবই বিরক্ত। এক তো সাজগোজ কিছুই হয়নি। রান্না বাকি। তার ওপর বাইরের একজন এসে হাজির। আজ 'নো ঝগড়া ডে' হলেও তার ইচ্ছে করল, বাবার সঙ্গে খুব একচোট ঝগড়া করি। মা ভুল কিছু বলে না, মানুষটার সত্যি সত্যি কাণ্ডজ্ঞান নেই।

কথাকলি কঠিন গলায় বলে, 'তা বলে আজই বাড়িতে নিয়ে এলে? আর কোনো দিন পেলে না?'

সুদর্শনবাবু লাজুক মুখে বললেন, 'আস্তে বল, শুনতে পাবে। ব্রতীন বাড়িতে আসেনি, এসেছিল আমার চেম্বারে। হঠাৎ এসে হাজির। আমি তো হাঁ। বললাম, ব্রতীন তুমি! কোথায় ছিলে এত বছর? বলল, বাইরে স্যার। আজ আপনার জন্মদিন, আপনাকে প্রণাম করতে এসেছি। বোঝ কাণ্ড! মনে রেখে আমার জন্মদিন বলে এসেছে! ছাত্র তো কম পড়াইনি আমি, জন্মদিন-টন্মদিন কে

boierpathshala.blogspot.com

মনে রাখে বল দেখি? আমিই লজ্জা পেয়ে গেলাম। এত লজ্জা যে ধরে নিয়ে সটান চলে এলাম। ভালো করিনি?'

কথাকলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ভালো করেছ। খুব ভালো করেছ। এবার গিয়ে বিদায় কর।'

'আহা ওভাবে বলছিস কেন? ওকে অন্তত এক কাপ চা খাইয়ে দে। মিষ্টি আছে? থাকলে দিস কিন্তু।'

মিষ্টি ছিল না, চা আর প্যাটিস নিয়ে কথাকলি নিজে এল ড্রইংরুমে। সে আসতে চায়নি। মাকে বলেছিল। তিনি হাত নেড়ে প্রস্তাব উড়িয়ে দিলেন।

'তোমার বাবার পাগলামি তুমি সামলাও। জীবনভর পাগলের ডাক্তার সামলাতে সামলাতে আমি হাঁপিয়ে পড়েছি। পাগল সামলাতে পারব না। আজ একজনকে এনেছে, পরের জন্মদিনে উনি দশজনকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসবেন। তখনও তুমি সামলাবে।'

বাধ্য হয়ে কথাকলিকেই ট্রে হাতে যেতে হল। যতই হোক জন্মদিনে বাবার ইচ্ছে। অন্যদিনের ইচ্ছে ফেলে দেওয়া যায়, জন্মদিনের ইচ্ছে ফেলা যায় না। তা ছাড়া ছেলেটাকেও একবার দেখা দরকার। মাস্টারের জন্মদিন জানা এবং মনে করে প্রণাম জানাতে আসা গল্পকথার মতো। এই ছেলে অতিরিক্ত বদ, নইলে বেশি রকমের ভালো। কোনটা একবার দেখা দরকার।

শীতে প্রায় কুঁকড়ে বসে চা খেল ব্রতীন। খাওয়ার ধরনটা গ্রাম্য। দু-হাতে কাপটা ধরে ঘন ঘন চুমুক দেয়। উস্ উস্ করে আওয়াজ করে। একই সঙ্গে হাসি এবং বিরক্তি গোপন করে উলটোদিকে চুপ করে বসে রইল কথাকলি। সে গায়ে চাদর জড়িয়ে এসেছে। সম্ভবত বেশি কুঁকড়ে যাওয়ার কারণটাও তাই।

'আপনি বাবার জন্মদিন মনে রাখলেন কী করে?'

কথাকলির প্রশ্নে খানিকটা ঘাবড়ে গিয়ে মুখ তোলে ছেলেটি।

'আমায় কিছু বললেন?'

আচ্ছা হাঁদা তো! ঘরে আর কে আছে যে তাকে প্রশ্ন করবে? না, লোকটা শুধু দেখতে বোকা নয়, সত্যিই বোকা। চোয়াল শক্ত করে নিজেকে সামলাল কথাকলি। শান্ত গলায় বলল, 'হ্যাঁ আপনাকেই করলাম। আজ বাবার জন্মদিন জানলেন কী করে?'

ছেলেটি এবার যেন অবাক হল।

'কেন? আমার চেনাজানা বড়ো মানুষদের ইমপর্টান্ট দিন আমার নোটবুকে তো লেখা থাকে। শুধু দিনক্ষণ নয়, কথাও থাকে।'

boierpathshala.blogspot.com

কথাকলি এবার একটু নড়েচড়ে বসল। গায়ের চাদরটা ঠিক করল। বাবাকে 'বড়ো মানুষ' বলছে! মনীষী ধরনের কিছু? বোঝাই যাচ্ছে, এই বোকাটা বাবাকে কেন মুগ্ধ করেছে।

'আমার বাবা একজন বড়ো মাপের মানুষ বলে আপনি মনে করেন?'

যুবক মাটির দিকে তাকিয়ে বলে, 'করি। বড়ো মাপ কিনা জানি না, বড়ো মন তো বটেই।'

কথাকলি ভুরু কুঁচকে বলল, 'কারণটা জানতে পারি?'

এ-কথার উত্তর না দিয়ে 'বোকা' ছেলেটি অদ্ভুতভাবে হাসল। কথাকলির মনে হল, সেই হাসিতে বড়ো সুন্দর একটা সারল্য আছে।

অতিথিকে সাধারণত খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে হয়। পীড়াপীড়ি না হলেও একবার, দু-বার তো বলতেই—'নিন, খেয়ে নিন।' এই ছেলেকে বলতে হল না। সে নিজেই প্লেট থেকে প্যাটিস তুলে কামড় দিল।

'আমি যখন ডাক্তারি পড়া ছাড়ি, তখন সবাই রে রে করে উঠল। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে মা দরজা দিলেন। আত্মীয়স্বজন বলল, মাথায় সমস্যা হয়েছে। বন্ধুরা রাতদিন বোঝাতে লাগল, কাজটা শুধু ভুল হচ্ছে না, ভয়ংকর ক্ষতি হচ্ছে। খুব অশান্তির মধ্যে পড়লাম। একটা জিনিস নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, অন্যরা সবাই বিরুদ্ধে।'

কথা থামিয়ে জলের গ্লাস তুলে লম্বা চুমুক দিল ব্রতীন। শুরু করল আবার। কথাকলি লক্ষ করল ছেলেটি শরীরে জড়োসড়ো ভাব কাটাতে পারেনি, তবে কথায় জড়তা নেই। অচেনা সুন্দরী তরুণীর সামনে বসে নিজের কথা বলতে অস্বস্তি হচ্ছে না।

'আপনি হয়তো ভাবছেন, নিজের কথা বলছি। তা নয়, আমি বলছি, আপনার বাবার কথা। এই ঝামেলার মধ্যে একদিন ডাঃ রায়ের কাছে চলে গেলাম। গিয়ে বললাম, স্যার আমি কি ভুল করছি? ডাক্তারি আমার ভালো লাগছে না। এত অসুখের মধ্যে আমি থাকতে পারব না। উনি বললেন, তুমি শুধু অসুখ ভাবছ কেন? চিকিৎসাশাস্ত্র তো অসুখের জন্য তৈরি হয়নি, তৈরি হয়েছে মানুষকে সুস্থ করার জন্য। আমি বললাম, তা হোক আমি পারব না। আমার মন চাইছে না। মানুষের কষ্ট দেখে আমি দুর্বল হয়ে পড়ছি।'

ছেলেটি আবার চুপ করল। মনোযোগ দিয়ে প্যাটিসের বাকিটুকু শেষ করল।

'বাবা কী বললেন?' অস্ফুটে জিজ্ঞেস করল কথাকলি।

boierpathshala.blogspot.com

'উনি হাসলেন। বললেন, মন যেটা চায় সেটাই করবে। জানবে সেটাই ভালো, সেটাই ঠিক। তোমার মন তো আর অপরিণত মন নয়। যথেষ্ট ম্যাচিওরড্। সে যা বলছে নিশ্চয় সবদিক বিচার-বিশ্লেষণ করেই বলছে। এই সিদ্ধান্তের ভালোমন্দ সব হিসেবও সে করে নিয়েছে।'

কথাটা বলার পর ছেলেটি মুখ তুলল। কথাকলির চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে আরও বোকার মতো হাসল। গাঢ় স্বরে বলল, 'এরপরেও কি ওনাকে একজন বড়ো মানুষ বলব না?'

কথাকলি কী বলবে বুঝতে পারে না। খানিকটা চুপ করে থাকার পর নীচু গলায় বলে, 'বাবা, একজন সাইকিয়াট্রিস্ট। তিনি তো মনের কথাই বলবেন। মনের ডিকটেট করা কথায় যদি মানুষকে সবসময় চলতে হয় তাহলে তো সর্বনাশ।'

'ওঁর জন্য একটা উপহার কিনেছিলাম। তাও অনেকদিন। ভেবেছিলাম, গিয়ে নিজের হাতে দেব। তারপর তো বাইরে চলে গেলাম। কাল রাতে নোটবইটা ঘাঁটতে গিয়ে দেখি আজ স্যারের জন্মদিন। ভাবলাম এই সুযোগে চলে যাই। বেশি কিছু নয়, সামান্য। একটা বই।'

কথাকলি অনুভব করল, সামনে বসে বোকা মানুষটিকে তার ইন্টারেস্টিং লাগছে।

'কী বই?'

যুবকটি লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল, 'ক্রাইং।'

'ক্রাইং! কান্না? গল্প উপন্যাস কিছু?'

ছেলেটি যেন কথা বলার আরও উৎসাহ পেল। সোফার সামনের দিকে সরে এসে বলল, 'না, গল্প উপন্যাস কিছু নয়, সত্যি কান্না। দ্য কালচারাল অ্যান্ড নেচারাল হিস্ট্রি অব টিয়ারস। টম ল্যুজের লেখা। বুক-ফেয়ারে হঠাৎ পেয়েছিলাম।'

কথাকলি হেসে অবাক গলায় বলল, 'বাঃ, এরকম কোনো বই আছে নাকি? জানতাম না তো! শুধু কান্নার ওপর!'

'কান্নার শারীরবৃত্তীয় আর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। কেন কান্না, কীসের কান্না থেকে শুরু করে শিল্প-সাহিত্যের কান্নার কথাও আছে। ওই বইতে আমি কান্নাহীন জগতের কথাও পড়েছি।'

কথাকলি চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'কান্নাহীন জগৎ!'

'কল্পনার কথা, উপকথার কাহিনি। আপনি পড়লে জানতে পারবেন। যে

boierpathshala.blogspot.com

কাহিনিতে কান্নার প্রবেশাধিকার নেই।'

কথাকলি অল্প হেসে বলল, 'আমি পড়ব। আপনাদের মতো করে বুঝতে পারব কিনা জানি না। বইটা কি আপনি বাবাকে দিয়ে দিয়েছেন?'

ছেলেটি মাথা নামিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'না, দিইনি। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় বইটা নিতে ভুলে গিয়েছি। মনে পড়ল স্যারের চেম্বারে পৌঁছোনোর পর। কী লজ্জার কথা বলুন তো। আসল জিনিসটাই ফেলে এলাম।'

কথাকলি ছেলেটিকে রাতে খেয়ে যেতে বলে। ক্যান্ডেল লাইট ডিনারের নরম আলোয় খেতে বসে সে জলের গ্লাস উলটে ফেলে নিজের বিশ্রী সোয়েটার ভিজিয়ে ফেলল।

এই ছিল কথাকলির প্রেমের 'প্রথম দিন'। এই মানুষকে কথাকলি দুম করে ডাকাত ভাববে কী করে?

boierpathshala.blogspot.com

পাঁচ

ঝিলডাঙায় ফিরতে নিতাইয়ের সন্ধে হয়ে গেল।

নিতাইয়ের ইচ্ছে ছিল ডাক্তারের ওখান থেকে বেরিয়ে ফুলের জন্য একটা জামা কিনবে। কিনে বাসে উঠবে। বাসস্ট্যান্ডের গায়েই দোকান। ছোটো দোকান, ফুটপাথের ওপর। আকাশ রঙের একটা ফ্রক পছন্দও হয়ে গেল নিতাইয়ের। ফ্রকের গায়ে সাদা ছিটে। বেশ আকাশে তারার মতো। কিন্তু দাম বড্ড চড়া। দর করবে যে তাও সম্ভব নয়। দামের আদ্দেক টাকাও তার সঙ্গে নেই। নেড়ে চেড়েও রেখে দিতে হল।

নিয়মমতো এই ঘটনায় মেজাজ খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা। নিতাইয়ের হল না। তার নিশ্চিন্তই লাগল। যাক, টাকাগুলো রয়ে গেল। ধনী মানুষের সমস্যা হল, জিনিস পছন্দ হয়, আবার তার জন্য টাকাও খরচ হয়। গরিবের এই সমস্যা নেই। তার শুধু পছন্দই হয়, খরচাপাতির চিন্তা থাকে না। নিতাইয়ের মনে হল, ভগবান অনেক ভেবেচিন্তে ব্যবস্থা করেছেন। ফ্রকের বদলে একটা ক্লিপ কিনে বাসে উঠল নিতাই। মাথার ক্লিপ, দেখতে সুন্দর। ওপরে একটা পাতার মতো। ফুলের মাথায় পাতা। কথাটা ভেবে মনে মনে হাসল নিতাই। হাসতে হাসতে বাসের সিটে মাথা রেখে ভাঙা রাস্তার দুলুনিতে একসময় ঘুমিয়েও পড়ল।

চারবারের বার নিতাইয়ের মাথা ঘাড়ের ওপর পড়ায় পাশের আধবুড়ো লোকটা খিঁচিয়ে ওঠে।

'কী হে শলীল-টলীল খারাপ নাকি? গায়ের ওপর পড় কেন?'

ঘুম জড়ানো চোখ খুলে নিতাই এক গাল হাসে। বলে, 'শরীর খারাপ নয়, [illegible]র সম্পর্কে একটা সু-সংবাদ আছে তাই অনেকদিন পর নিশ্চিন্তে ঘুমোই।'

boierpathshala.blogspot.com

আধবুড়ো চোখ কপালে তুলে বলল, 'সু-সংবাদ! বিয়ে শাদি?'

'না, বিয়ে সাদি নয়, অন্য সুসংবাদ। আপনের হলে আপনেও ঘুমোতেন।'

আধবুড়ো একইরকম দাঁত খিঁচোনো ভঙ্গিতে বলে, 'ঘুমোতাম ঠিকই, তবে অন্যের গায়ে পড়তাম না। সোজা হয়ে বোসো দেকি বাপু।'

নিতাই আবার খুব দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ল এবং তার মাথা পড়ল পাশের মানুষটার ঘাড়ের ওপর।

পাড়াগাঁয়ের মানুষ এখনও শোকে আর আনন্দে একই কাজ করে। পুজো দেয়। স্বামীর মুখে ডাক্তারের কথা শুনে মালতীর এত আনন্দ হল যে সে কাজকর্ম ফেলে ছুটল পুজো দিতে। তার মেয়ের কোনো অসুখ নেই! সত্যি কোনো অসুখ নেই! যা শুনেছে, যা বুঝেছে তার সবটাই মনে মনে বানানো! ঠাকুর। ঠাকুর। তাও তো পুরোটা শোনা হল না। কোনোরকমে ঘরে ছাতা আর ব্যাগটা নামিয়েই মেয়ের বাপে বলল, 'দাঁড়াও একটু ঘুরে আসি।'

মালতী বলল, 'এখনই? আগে তো সবটা বলবে।'

নিতাই তাড়াহুড়ো করে বলল, 'বলব বাবা বলব, রাতে সব গুছিয়ে বলব। ডাক্তারবাবু বড়ো ভালো মানুষ গো মালতী। মানুষ যে এমন হয় আমার জানা ছিল না। আমাকে যত্ন করে খাওয়ালে পর্যন্ত। যাক, আগে ভবার দোকানে একটা চক্কর মেরে আসি।'

'আজ না গেলে হত না?'

নিতাই ফিরে দাঁড়িয়ে বউয়ের থুতনিতে হাত ছুঁয়ে বলল, 'আজ একটা শুভদিন, আজ না গেলে হয়। চিন্তা কোরো না, বেশি নয়, এই একটুখানি।'

আঙুল দিয়ে মাপ দেখিয়ে নিতাই তড়বড় করে নেমে গেল উঠোনে।

নিতাই বেরিয়ে যেতেই মালতীও ঠিক করল, পুজো দিয়ে আসবে। এমন একটা খবরের পর পুজো না দিলে ঠাকুর রাগ করবেন। যা করার তিনিই তো করেছেন।

রুটির বেলুন চাকি সরিয়ে উঠে পড়ল মালতী। মেয়েটা ঘরে ঘুমোচ্ছে। ঘুমুক। ছিটকিনি তুলে গেলেই হবে। যাবে আর আসবে।

বাজারের কাছেই শনিমন্দির। পুরুত লোকটা সুবিধের নয়। আসল নাম কেউ জানে না, ঝিলডাঙার সবাই নেপু বলে ডাকে। সকাল থেকেই মদ গাঁজা খায়। প্রণামীর থালা থেকে টাকাপয়সা সরায়। সারাক্ষণ ঝিমোয়, শুধু মেয়ে-বউ পুজো দিতে এলেই ড্যাবড্যাব করে শরীরের দিকে তাকাবে। কিছু বলা যাবে না। নেপু হল কাদুর চেলা।এখানে কাদুর চেলাদের কিছু বলতে যাওয়া বিপদ। কোন

boierpathshala.blogspot.com

ঝামেলায় ফেলে ঠিক নেই। নেপু শুধু পুরুতঠাকুর নয়, চুরি ডাকাতিও নাকি করে। ফুলটাইম নয়, পার্টটাইম চুরি ডাকাতি। এদিকে এরকম ব্যবস্থা আছে। ডাকাতির দলে লোক কম পড়লে ডাক পড়ে। অসুবিধে কিছু হয় না, সকাল সন্ধে মন্দির সামলিয়ে রাতে সিঁদ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

পুজো বাবদ মালতীর দশ টাকার নোট দেওয়া দেখে ভুরু কোঁচকালো নেপু।

'কী হল গো মেয়ে? মানত নাকি?'

মালতী গায়ের কাপড় ভালো করে জড়িয়ে নিল। বুক, পাছা তো দেখেই, হারামজাদা কাঁধ, গলাও বাদ দেয় না। মাটিতে গড় হয়ে প্রণাম করলে মাথার কাছে ঠায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। ফাঁকফোঁকরে চোখ পাতবে। মালতী গম্ভীরভাবে বলল, 'তুমি ফুলের নামে পুজো নাও দেখি ঠাকুরমশাই। বেশি করে পেসাদ দিও।'

মালতীর চুল ভেজা। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে কলতলায় গিয়ে মাথায় কয়েক ঘটি জল ঢেলে তবে মন্দিরে এসেছে।

নেপু চোখ নাচিয়ে বদ হাসি হেসে বলল, 'সে না হয় দুটো বাতাসা তুমি বেশিই নিলে, তা বলে এত খরচা! অ্যাঁ? তোমার হল কী গো মালতী?'

কথাটা সত্যি। সংসারে যা ভয়াবহ অবস্থা তাতে দশ টাকার পুজো সহজ কথা নয়। কিন্তু এই সুখবরে মালতী নিজেকে সামলাতে পারেনি। হাতের কাছে যা ছিল নিয়ে চলে এসেছে। অত বড়ো ডাক্তার কিনা বলেছে, ফুলের কোনো অসুখই নেই! সবটাই মনের ভুল! বাবা, মায়ে মন শক্ত করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এ তো ভারি সুন্দর চিকিচ্ছে! ওষুধবিষুধ কিছু নেই, শুধু মন শক্ত করা! তাও আবার মেয়ের নয়, মেয়ের বাপ-মায়ের। বা রে, এ কি চাট্টিখানি জিনিস হল? প্রথমে তো ফুলের বাপের কথা বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

'তুমি ঠিক বলছ তো গো? ডাক্তারবাবু ওই কথা বললে!'

নিতাই ভারিক্কি ভাব নিয়ে বললে, 'আরে বাবা বলছি তো। ডাক্তারবাবু ওই কথাই বললে, শুধু বলল না, একেবারে হেসে উড়িয়ে দিলে। বললে, মাথার গোলমাল আপনের মেয়ের নয়, গোলমাল আপনেদের।'

মালতী বড়ো করে হাসল। মাথার গোলমাল কোনো ভালো কথা নয়। কিন্তু এখন ভালো লাগছে। সন্তানের বদলে নিজের মাথার গোলমাল শুনে তার ভারি ভালো লাগছে। যেন এটা একটা বিরাট প্রশংসা পেয়েছে।

নেপুর মন থেকে সন্দেহ যায়নি। পুজোয় ফুল, জল ছিটোতে ছিটোতে

boierpathshala.blogspot.com

বলল, 'ঘটনাটা সত্যি করে বল দেকি, নেত্য লটারি পেল নাকি।'

মালতী লুকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষল। হারামজাদা। লটারি পাক আর গুপ্তধন পাক, তোর কী? তোর মতো চুরি ডাকাতির টাকা তো নয়। তোর মতো ছুকছুকেও নয়। কিন্তু মুখে এসব কথা বলা যায় না। শুধু এসব কথা নয়, মেয়ের রোগের কথাতেও খুব সাবধান থাকতে হবে। বেফাঁস কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া চলবে না।

'না না, সেরকম কিছু নয়। অনেকদিন ঠাকুরকে কিছু দেওয়া হয় না।'

নেপু হেসে বলল, 'দেবতার, বেশ বেশ, তোমাদের ভক্তি শ্রদ্ধে বাড়লে ঠাকুর দেবত্যে খুশি হন। আজকাল মানুষ যা হয়েছে, এক একটা পাপের পুঁটলি। পুঁটলি থেকে হাগা মুতের গন্ধ ছাড়ে। ভক্তি শ্রদ্ধে সব গেছে। নাও, এসো এদিকে সরে এসো, ফুলটা ধরো।'

মালতী সরে এলও না। দূর থেকে হাত বাড়াল। প্রসাদ দেওয়ার নাম করে বদটা গা ছোঁয়ার চেষ্টা করছে। ফুল-বাতাসা নিয়ে মালতী ছুটল বাড়ির দিকে। ফুল একা আছে। আজ বিকেল থেকে মেয়েটা যেন একটু ভালো আছে। বিকেলে ধুলোবালিতে খেলেছে। তারপর ক্লান্ত হয়ে ধুলোবালি মেখেই শুয়ে পড়েছে।

মালতী জোরে পা চালাল।

এলোমেলো পোশাক, উশকোখুশকো চুল, ধুলো-কাদা মাখা হাত পায়ে প্রকৃতি ছোটো ছেলেমেয়েদের ভারি সুন্দর করে সাজিয়ে দেয়। বাবা- মায়েরা বুঝতে চায় না। তারা সেই সৌন্দর্য নষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। পাটভাঙা জামাকাপড়, সাবান পাউডার, চিরুনি দিয়ে সেই এলোমেলো রূপ নষ্ট করে ভাবে, বাঃ মেয়ে আমার এতক্ষণে ঠিক হল।

মালতী বাড়ি ফিরে এসে সেই কাজটাই করল।

বাড়ির গেট পেরোতেই উঠোনের মতো। আসলে খানিকটা ফাঁকা জমি। শুধু মাটি। নিতাই একসময় ওইটুকু জায়গাতেই বেগুন, কপি, শিম লাগাতে গেল। একপাশে কঞ্চির মাচা বেঁধে কুমড়ো। কিছুই হল না। জমিটা খারাপ। এখন গরমে ফেটে থাকে, বর্ষায় কাদা কাদা। সেই উঠোন পেরোলে বারান্দা। বারান্দা না বলে মাটির দাওয়া বলাই ভালো। মাথায় একসময় ছিল টিনের চাল, মালতীর শ্বশুরমশাই মৃত্যুর আগে, টালির করে দিয়ে গেছেন। সেই টালির অনেকটাই নেই এখন। ফাঁক দিয়ে রোদ জল ঢোকে। তবে এমনি সময় দাওয়াটা কাজের। গরমে চাটাই পেতে শোওয়া-বসা হয়, শীতের দুপুরে রোদ পোওয়ানো। দাওয়া পেরোলে শোওয়ার ঘর বলতে একটাই। মেয়েকে নিয়ে তক্তপোশে শোয়

boierpathshala.blogspot.com

মালতী। মেঝেতে নিতাই। পাশের ছোট্টো ঘরটা রান্নার জন্য আলাদা করে রাখা। বাড়ির পিছনে ঝোপজঙ্গল। নিতাই ভেবে রেখেছে, হাতে পয়সা এলে আগে জঙ্গল হটাবে। তবে হাতে এখনও পয়সা আসেনি।

দড়ি বাঁধা গেট সরিয়েই মালতী দেখতে পেল, বারান্দায় হ্যারিকেনটা জ্বলছে। ঘুম থেকে উঠে পুতুল হাতে ফের খেলতে বসেছে ফুল।

মেয়েকে নিয়ে পড়ল মালতী। স্বামীর মুখে ডাক্তারের কথা শোনার পর থেকে মনে হচ্ছে, ফুলকে যেন নতুন করে ফিরে পেয়েছে। আবছা আলো আঁধারে ভাসা ভাসা চোখের মেয়েটার দিকে তাকিয়ে মনটা মায়ায় ভরে গেল। আহা রে, পাগল ভেবে কী অন্যায়টাই করেছিল। ইচ্ছে ছিল, কলতলায় নিয়ে গিয়ে মেয়ের মাথায় জল ঢালে, সাহসে কুলোল না। জ্বরজ্বারি হয়ে গেলে আর এক সমস্যা। ভেজা গামছায় গা হাত পা মুছিয়ে মালতী পরিষ্কার ফ্রক পরাল। তারপর কোলের কাছে বসিয়ে টেনে টেনে চুল বাঁধতে লাগল।

'উফ মা, লাগে।'

দাঁতে ফিতে চেপে মালতী বলল, 'লাগুক। ইস চুলের কী ছিরি করেচিস। কালই তোর বাবাকে বলে সোডা আনাব। ঘণ্টাখানেক ঘষলে যদি ময়লা মরে।'

'বাবাকে আর একটা জিনিস আনতে বলবে মা।'

ফুলের কোলের ওপর পুতুল। সেও পুতুলের চুল বাঁধছে। পুতুলের অবস্থা খুবই কাহিল। জামাকাপড় ছেঁড়া। হাত পা নড়বড়ে। তবে তাতে ফুল যত্নের কোনো খামতি দিচ্ছে না।

মেয়ের কথা শুনে মালতী বলল, 'আবার কী?'

'কিলিপ। মাথার কিলিপ।'

ফিতে নিয়ে চুলের গোছে লাগাতে লাগতে মালতী বলল, 'কিলিপ! তোর বাবা তো এনেছে!'

ফুল মাথা ঝাঁকিয়ে রাগ দেখিয়ে বলল, 'কী যে বল না তুমি, ওই কিলিপ তো আমার, পুতুলের জন্য একটা চাই না?'

মুখ টিপে হাসল মালতী। মেয়েকে ঝর্‌ঝরে দেখে মনটা খুব খুশি লাগছে। মনে মনে আবার ঈশ্বরকে প্রণাম জানাল সে।

'ওসব পুতুল-টুতুল ছাড়ো এবার, এখন থেকে ইস্কুলে যাবে। লেখাপড়া তো সব গোল্লায় গেছে।'

ফুল ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'আমি কী করব? তোমরাই তো যেতে দাও না। দাও?'

boierpathshala.blogspot.com

মালতী চুপ করে রইল। কথাটা ঠিক। মেয়ের স্কুল বন্ধ করেছে তারাই। সাহস হত না। সাহস শুধু শরীরের জন্য হত না এমন নয়, ভয় হত মেয়ে যদি বাইরে গিয়ে উলটোপালটা কিছু বলে বসে। মালতী-ই একদিন স্বামীকে বলল, 'এখন ক-টাদিন ইস্কুলে গিয়ে কাজ নেই।'

প্রথমটায় নিতাই আপত্তি করেছিল। তার অনেকদিনেরই ইচ্ছে, মেয়েটা লেখাপড়া শিখুক। তার নিজের তো কিছু হল না। মেয়ে লেখাপড়া করে যদি কিছু করতে পারে।

'ইস্কুল বন্ধ করাটা কি উচিত হবে? তোমার মতো মুখ্যু হয়ে থাকবে যে।'

মালতী ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, 'ইস, উনি একেবারে বিরাট পণ্ডিত এসেছেন। তুমি বুঝতে পারছ না, ফুল যদি গিয়ে হাবিজাবি বকে? তখন? তখন কী হবে?'

'কী হাবিজাবি বকবে?'

'ওই যে ঝড় হবে, জল পড়বে, আগুন ধরবে— ওইসব?'

নিতাই এবার বুঝল। মাথা নেড়ে চিন্তিত গলায় বলল, 'কথাটা ঠিক। সে বড়ো মুশকিলের ব্যাপার হবে। খবর ছড়াতে দেরি হবে না মোটে। ছোটো ছেলেপিলে সব, বাড়ি ফিরে কী বলতে কী বলবে ঠিক নেই। থাক, ক-টা দিন থাক। আমি গিয়ে বরং মাস্টারকে বলে আসব। কিন্তু বলবটা কী?'

'কী আবার বলবে, অসুখ করতে পারে না? বলবে পেটের ব্যামো।'

'পেটের ব্যামো! পেটের ব্যামোতে কতদিন ছুটি হয়?'

মালতী বিরক্ত হয়ে বলল, 'সে যা খুশি বল গিয়ে তুমি। মেয়েকে আমি এখন চোখ ছাড়া করছি নে কিছুতেই।'

পরদিনই নিতাই স্কুলে গেল। তবে পেটের রোগ বলল না, বলল অন্য কথা।

ঝিলডাঙার একমাত্র স্কুলটির নামের কোথাও 'ঝিলডাঙা' নেই। স্কুলের নাম হল 'কাটাখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়'। কেন কাটাখালি, কোথায় কাটাখালি কারও জানা নেই, তা নিয়ে মাথাব্যথাও নেই। স্কুল একটা আছে, ব্যস এই পর্যন্ত। ক্লাস ফোর পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা। ঘর মাত্র দুটি। একটিতে চাল আছে, অন্যটিতে নেই। ছেলেমেয়েরা কখন কোন্‌টিতে বসবে নির্ভর করে রোদবৃষ্টির ওপর। স্কুলের একমাত্র শিক্ষক চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া অবশ্য এতে চিন্তিত নন। তিনি চিন্তিত অন্য কারণে। স্কুলে বাথরুম নেই। আশেপাশের ঝোপঝাড়ে ব্যবস্থা। ছাত্রদের জন্য ডান দিক, মাস্টার যাবে বাঁ-দিকে। সমস্যা হল, এই কারণে একটু বড়ো হওয়া মেয়েরা স্কুলে আসতে চায় না। যাদের বাড়ি কাছাকাছি তারাই কেবল আসে।

boierpathshala.blogspot.com

দরকার পড়লে বাড়িতে ছুট লাগায়। চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া এই সমস্যাটি নিয়ে সদরে প্রতিমাসে একটি করে আবেদন পাঠান। তলায় সব ছেলেমেয়ের নাম লেখা। ওপরে বড়ো বড়ো করে লেখা থাকে—বাথরুমের আবেদন।

গত তিন বছর ধরে এই আবেদন চলছে। এখনও জবাব কিছু আসেনি। বছর দুয়েক আগে চিত্তরঞ্জনবাবু নিজে সদরে গিয়ে স্কুল দপ্তরে দেখা করেছিলেন। কাজ কিছু হয়নি, তবে চিত্তরঞ্জনবাবুর খারাপ লাগেনি। দপ্তরে নানা বিভাগ। কোনটা বইপত্র, কোনোটা টাকা পয়সা, কোনোটা ঘরদোর। স্কুলবাড়ি বিষয়ক অফিসার ভদ্রলোক হাসিমুখের মানুষ। চোখেমুখে একটা ফুর্তি ফুর্তি ভাব। কথা বলার সময় চেয়ারে বসে সর্বক্ষণ পা নাচালেন। সবথেকে বড়ো কথা হল, মানুষটার মধ্যে একটা দার্শনিক চিন্তা আছে।

'আরে মশাই দুনিয়াটাই একটা বাথরুম, মলমূত্রের ছড়াছড়ি, আপনি আর আলাদা করে বাথরুম বানিয়ে কী করবেন?'

'স্যার, মেয়েরা যদি বিদ্যালয়ে না আসে তাহলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ।'

'উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলে বিধেয় নিয়ে কাজ করুন। বিধেয় বোঝেন? বোঝেন না। আমিও বুঝতাম না। বিধেয় অতি জটিল বস্তু। এখন বুঝতে পারি।'

'স্যার বেশি কিছু নয়, খানকতক ইঁট দিয়ে ঘিরলেই হবে, আর মাথার ওপর একটা টিন। সামনেটা না হয় চট ফেলে ম্যানেজ করব।'

'এই তো আসল কথাটাই মুখ ফসকে বলে ফেলেছেন মাস্টারমশাই। ম্যানেজ করব। আমরা সকলেই ম্যানেজ করছি। ছলে বলে কৌশলে। আহার যেমন ম্যানেজ করছি, তেমন বাহারও ম্যানেজ করব। বাহার বুঝলেন?'

'স্যার, আমি কি আর একবার আসব?'

'অবশ্যই আসবেন। একশোবার আসবেন, থাউজেন্ডবার আসবেন। আসা-যাওয়ায় তো কোনো বাধা নেই, নো বেরিয়ার। জগৎজুড়ে শুধু যাতায়াত আর যাতায়াত। আজ আসি, কাল বিদায় নিই। আবার কাল আসি।'

এই পর্যায় অফিসার ভদ্রলোকে সম্ভবত ভাবে খানিকটা বিভোর হয়ে চোখ বুঁজে ফেলেন। চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া আবেদনের গোছা হাতে চুপিসাড়ে বিদায় নেন।

তবে তিনি হাল ছাড়েননি। মানুষটার দম আছে।

নিতাই যখন স্কুলে গেল মাস্টার তখন স্কুলের বাইরে চেয়ার পেতে বাথরুম আবেদনের নতুন খসড়া তৈরি করেছেন। তাঁর কেন জানি মনে হয়েছে, প্রতিবার এক বয়ানের কারণেই বাধা কাটছে না। এই সময় নিতাই গিয়ে মেয়ের কথা জানাল।

boierpathshala.blogspot.com

চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া চোখ পাকিয়ে বললেন, 'রোগটা কোথায়?'

নিতাই আমতা আমতা করে বলল, 'চোখে মাস্টারমশাই। ভাবছি বানেরহাটে নিয়ে গিয়ে একবার পরীক্ষা করিয়ে আনব। তারপর না হয়...'

'অবশ্যই আনবে, চোখ অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাকে হেলাফেলা করা অন্যায়। কিন্তু চোখই তো সব নয় বাপু। লেখাপড়ায় কানও লাগে। যতদিন চোখ না ঠিক হয়, ততদিন তোমার কন্যা বিদ্যালয়েই আসবে না এটা কেমন কথা? তুমি কি জানো ফুল পড়াশোনায় অতি মনোযোগী। অনেক সময় তার বুদ্ধি আমাকে বিস্মিত করে।'

মাস্টারের কথায় নিতাইয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'আপনার কৃপা।'

চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া চাপা গলায় ধমক লাগান।

'বোকার মতো কথা বোলো না নিতাই। বুদ্ধি কারও কৃপা নয়। মানুষ বুদ্ধি নিয়ে আসে তাকে চর্চা করতে হয়। মেয়ের দিকে নজর দাও। ঠিকমতো নজর দিলে ফুল লেখাপড়ায় অনেকদূর পর্যন্ত যাবে। যাও দ্রুত ওর চোখের চিকিৎসা করো।'

সেদিন নিতাইয়ের মুখে মেয়ের প্রশংসা শুনে মালতীও খুশি হয়েছিল। কিন্তু স্কুলে পাঠাতে সাহস পায়নি তারপরেও। এবার যাবে।

চুল বাঁধা শেষ হলে মেয়ের মাথায় প্লাতা ক্লিপ লাগাল মালতী। চোখে কাজল দিল। তাকিয়ে দেখল, মেয়ের চোখের মায়া যেন ছড়িয়ে পড়েছে সারা শরীরে। ভারি সুন্দর লাগছে। ফিসফিস করে বলল, 'বাবা ফিরলে দেখাবি।'

ফুল অবাক হয়ে বলল, 'কী দেখাব মা?'

মালতী হেসে মেয়ের থুতনি ধরে বলল, 'ওমা, বাবা ক্লিপ এনে দিল, সেটা মাথায় দিয়ে কেমন দেখাচ্ছে দেখাবি না?'

'বাবা যদি বকে?'

মালতী মেয়ের বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে আলতো কামড় দিয়ে কপালে টেনে চুমু দিল। বলল, 'না রে সোনা, আমরা তোকে আর কখনও বকব না।'

'ঠিক তো? বকবে না তো?'

'ঠিক।'

'না, একবার নয়, তিনবার বল।'

মালতী মেয়ের মাথাটা বুকের ওপর চেপে ধরে বলল, 'ঠিক ঠিক ঠিক। হল?'

boierpathshala.blogspot.com

ফুলের কিন্তু বাবাকে সাজ দেখানো হল না। নিতাই ফেরার আগেই মাথায় ক্লিপ লাগানো অবস্থায় সে ঘুমিয়ে পড়ল। তখনও তার বুকের কাছে ভাঙা পুতুল।

রান্না করতে করতে মালতী শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখের কোণ মুছল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, এই রোগা পাতলা মেয়েটাকে আর কোনোদিন বকা ঝকা করবে না। ভগবান যে সুস্থ করে ফিরিয়েছেন সেটাই অনেক। মালতী জোড় হাত কপালে ঠেকাল।

মারতে হল। রোগা পাতলা, মায়াভরা এই ছোটো মেয়েটাকেই খুব মারতে হল মালতীর। তবে ক-টা দিন পর।

boierpathshala.blogspot.com

ছয়

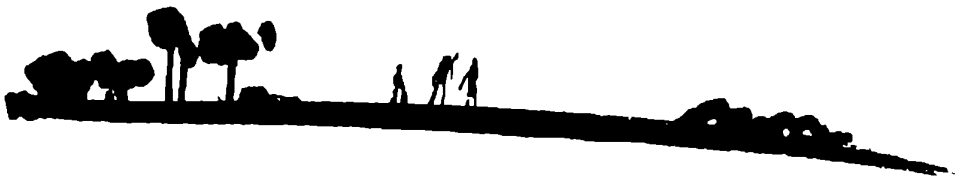

কমল মল্লিক সোমনাথের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। টেবিলের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'কেমন আছ সোমনাথ?'

টেবিলটা সুন্দর। হাত বোলানোর মতোই সুন্দর। এমনিতে যে বিরাট বড়ো কিছু, তা নয়। আসল হচ্ছে, টেবিলের ওপরটা। ইংরেজিতে যাকে বলে 'টেবিল টপ'। সেই 'টেবিল টপ'-এ রয়েছে হালকা নীল সানমাইকা। তার ওপর কাচ। এমনি কাচ নয়, জল কাচ। প্রথম যেদিন সোমনাথ জিনিসটা দেখে, তার মনে হয়েছিল, সত্যি সত্যি টেবিলের ওপর খানিকটা জল পড়ে আছে। সন্দেহ নেই, এ-জিনিস অনেক খুঁজে বের করতে হয়েছে। কাচের মতো জল হয়, জলের মতো কাচ পাওয়া কি সহজ কথা?

কমল মল্লিক আবার বললেন, 'কেমন আছ সোমনাথ? তোমার নাকি জ্বর হয়েছে, ফ্লু?'

সোমনাথ সাবধান হল। মিথ্যেটা জেনে ফেলেছে নাকি? ফেললে অবশ্য কিছু এসে যায় না। তার যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার, নেওয়া হয়ে গেছে। এখন শুধু মনটাকে শক্ত করে রাখা। আগে দেখা যাক মানুষটা কেন ডেকেছে। ফাঁক বুঝে নিজের কথাটা বলতে হবে। আরও একটা হয়। ওর কথা শোনার আগেই নিজের কথা বলে দেওয়া। কোনটা ভালো?

সোমনাথ গলায় সামান্য জোর এনে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার হয়েছিল। জ্বর, সঙ্গে কাশি।'

কমল মল্লিক চেয়ারে হেলান দিলেন। চেয়ার অবশ্য টেবিলের মতো সুন্দর নয়। বরং খারাপই বলা চলে। কাঠের ওপর পাতলা গদি। সেই গদির কভারও

boierpathshala.blogspot.com

খুব কিছু ভালো না।

'ঠিক হয়ে গেলেই ভালো। তবে কী জানো, ফ্লু অতি মারাত্মক জিনিস। মনে হয় সেরে গেছে, আসলে সারে না। ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকে।'

'আমার ভেতরে ঘাপটি মেরে নেই স্যার।' সোমনাথ গলা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে।

কমল মল্লিক হাসলেন। বললেন, 'না থাকলেই ভালো। তুমি একটা কাজ কর সোমনাথ, এই সময়টা ক-দিন বেশি করে ছোটো মাছ খাও। এই ধর, একটু মৌরলা খেলে, চারাপোনা, ছোটো তেলাপিয়াও খেতে পারো। ছোটো মাছ দুর্বল শরীরের জন্য খুবই উপকারী। ফসফরাস বেশি থাকে।'

কথা শুনেই সোমনাথ বুঝতে পারল, মানুষটা জ্বরের গল্পটা ধরে ফেলেছে। এখন খেলছে। পাকা লোক। পাকা লোক খেলতে ভালোবাসে।

সোমনাথ চোখেমুখে একটা নির্লিপ্ত ভঙ্গি আনবার চেষ্টা করে। সে যে আজ কঠিন মন নিয়ে এখানে এসেছে, সেটা শুরু থেকেই বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। মুখ তুলে বলল, 'আমার কথা বাদ দিন, আপনি কেমন আছেন? আপনার শরীর ভালো তো?'

কমল মল্লিকের জিভে যেন উত্তর দাঁড়িয়েই ছিল। হাত উলটে বললেন, 'কী করে ভালো থাকি বল? এই বিজনেসের অবস্থা তো জানোই। এভাবে আরও ক-টা দিন চললে, লোকসান চড়চড়িয়ে বাড়বে। তখন বাজারে আখের গুড় নিয়ে গিয়ে বসতে হবে। আখের গুড়ের এখন দাম কীরকম যাচ্ছে? খোঁজ নিয়ে রেখো তো। সব বাদ দিয়ে গুড় কেন চয়েস করলাম জানো? এমনি করিনি। পিছনে কারণ আছে। আসলে আমার দাদুর দাদু, কী বলে যেন? প্রপিতামহ? উনি তোমার ব্যবসা শুরু করেছিলেন এই গুড় দিয়ে। কলসি ভর্তি গুড় নিয়ে হাটে গিয়ে বসতেন। তবে আখের নয়, তাঁর ছিল ভেলি গুড়ের কারবার। সুতরাং রক্তে আমার গুড় আছে। হা হা।'

রোগা শরীর নিয়ে কমল মল্লিক হাসতে লাগলেন। খুব জোরে একেবারে ঘর ফাটিয়ে হাসি নয়, মোটামুটি ধরনের হাসি। হাসির সময় মানুষের শরীর কখনও কাঁপে, কখনও দোলে। সোমনাথ লক্ষ করে দেখেছে, হাসলে এই মানুষটার শরীর অল্প অল্প লাফায়। কোমরের ওপর থেকে লাফায়। আগেও এরকম হয়েছে।

লোকসানের কথাটা একেবারেই ঠিক নয়। 'মল্লিক টিভি প্রোডাকশন'-এর ব্যবসা এখন যথেষ্ট ভালো। শুধু লাভ নয়, টিভি জগতে মল্লিক টিভি এখন একটা

boierpathshala.blogspot.com

নামও বটে। ব্যবসায় ঝামেলাও কম। অর্ডার মতো অনুষ্ঠান বানিয়ে চ্যানেল-গুলোকে বিক্রি করে হাত ধুয়ে ফেল। আগে নাচ, গান, সিরিয়াল নিয়ে দরজায় দরজায় ঘুরতে হত। এখন রোজ একটা করে চ্যানেল বাড়ছে। আর ছুটতে হয় না, ওরাই থলি হাতে এসে বসে থাকে। ফটাফট মাল ওজন করে সেই থলিতে পুরে দাও। কেউ নিচ্ছে হাসি। কারও ঝোঁক কান্নাকাটিতে। মেনিমুখো ধরনের কান্না নয়, দমফাটা হাসির মতো চোখফাটা কান্না। কারও আবার জগাখিচুড়ি চাই। হাসি, কান্না, ক্রাইমের মিলিজুলি প্যাকেজ। অসুবিধে কিছু নেই। অর্ডার মতো ঠিক সময় সাপ্লাই দিলেই চলে।

অনুষ্ঠানের শুরু আর শেষে কোম্পানির নাম থাকে। প্রথমে পুরোটা, শেষে সংক্ষেপে 'কে টি পি'। কমল টিভি প্রোডাকশন। সেই 'এম টি পি' আবার ভেঙে চুরে, দলা পাকিয়ে একটা ছেলে, একটা মেয়ে, তারপর ক্যামেরার ছবি হয়ে পর্দায় মিলিয়ে যায়। লাইন ড্রইং-এর ওপর অ্যানিমেশনের কাজ। কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। কিন্তু রোজ দেখতে দেখতে দর্শকদের চেনা হয়ে গেছে। গোড়ায় মল্লিক টিভির স্টুডিয়ো, ক্যামেরা, মেশিনপত্র কিছুই ছিল না। এমনকি মানুষও নয়। সবটাই চলত ভাড়ায়। ফেলো কড়ি মাখো তেল টাইপের কাজ। জিনিসপত্র থেকে অভিনেতা, পরিচালক, ক্যামেরাম্যান সব ভাড়ায়। এখন কমল মল্লিক নিজেই অনেকখানি করে নিয়েছে। পার্ক স্ট্রিটের কাছে অফিস হয়েছে, স্টুডিয়ো হয়েছে। আধুনিক মেশিনপত্র এসেছে। কর্মচারীও বেড়েছে।

এই অবস্থায় 'চলছে না' বলাটা একেবারেই ঠিক নয়।

সোমনাথ ঠোঁটের কোণায় আলগা হেসে অবাক গলায় বলল, 'এটা কী বলছেন স্যার? মল্লিক টিভি চলছে না! প্রায় সব চ্যানেলেই তো আপনার কিছু না কিছু কাজ রয়েছে।'

কমল মল্লিক চোখে একটা তাচ্ছিল্য ভাব এনে বললেন, 'দুর দুর, ওগুলো আবার কাজ নাকি? হাবিজাবি সিরিয়াল, খানকতক গেম শো, কিছু নাচ-গান, মোটা দাগের কমেডি, ক্রাইমের নামে খানিকটা খুন আর কিডন্যাপের গপ্প। এগুলো কাজ হল সোমনাথ? কাজ হবে এমন, দেখলে ভিউয়ারের সাতদিন মনে থাকবে।'

'সে পার্টি যা চাইবে, আপনাকে তো তাই দিতে হবে। মোটা দাগ না রোগা দাগ তারাই ঠিক করবে।'

খানিকটা তর্কের ঢঙেই বলল সোমনাথ । এই মানুষের সব কথায় এখন আর তার 'হ্যাঁ' বলার দরকার নেই। কেন দরকার নেই সেই কথাটা শুধু মুখে

boierpathshala.blogspot.com

বলা বাকি এই যা। কীভাবে বলবে বুঝতে পারছিল না। সেই কারণেই জ্বরের গল্প ফেঁদে ডুব দিয়েছিল। ঠিক করেছিল ফোন করে জানিয়ে দেবে। ফোনটা হবে এরকম—

'স্যার, আমি সোমনাথ বলছি ।'

'হ্যাঁ সোমনাথ বল। তোমার নাকি শরীর ভালো নয়? কী হয়েছে? দেখলাম আসছ না ক-দিন।'

'জ্বর হয়েছে।'

'হবে না, ওয়েদারটা কেমন বিচ্ছিরি। ঠান্ডা গরম, গরম ঠান্ডা। আমারই তো পরশু ভোরে গলা খুসখুস করে তিনটে হাঁচি হল। যাক, সাবধানে থেকো। একেবারে শরীর ভালো করে তবে আসবে।

'শরীর ভালো করব স্যার, কিন্তু আমি আর যাব না।'

'মানে! সোমনাথ তুমি কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না।'

'কাজটা আমি ছেড়ে দিচ্ছি স্যার।'

'অন্য কোথাও জয়েন করছ নাকি? সোমনাথ আমি তো তোমাকে বলেছি, নেক্সট বড়ো কাজে তুমিই পরিচালক। ডিরেকশনের দায়িত্ব তোমার হাতেই ছাড়ব। আর দায়িত্ব বাড়া মানে টাকাও বাড়বে। আমার কথাটা বিশ্বাস হল না?'

'না, না, সেরকম কিছু নয়। টিভির কাজে আমার আর মন বসছে না। এক-একটা মেগাসিরিয়ালের কাজ করতে গিয়ে রাতে ঘুমোতে পারি না। ঘুমের মধ্যে ভয় করে। দুঃস্বপ্ন দেখে আঁতকে আঁতকে উঠি। মনে হয়, ক্যারেক্টারগুলো এক-একটা ড্রাকুলার মতো। কামড়াতে আসছে। নায়ক নায়িকা সবাই। সেদিন শ্বেতার মতো অমন সুন্দর মেয়ের পর্যন্ত দুটো বড়ো বড়ো দাঁত দেখলাম স্যার! শ্বেতা এখন টপ টেনে আছে। তার কেন দাঁত হবে?'

কমল মল্লিক টেলিফোনের ওপাশে হাসবে।

'ও কিছু নয়। তোমার আসলে চাপ পড়ছে। একই ধরনের কাজ করার চাপ। তুমি বরং সিরিয়াল-টিরিয়াল ছেড়ে কিছুদিন অন্য প্রোগ্রামের দায়িত্ব নাও। হালকা কিছু। এই ধর জোকস ধরনের কিছু। ছোটোদের কিছু নেবে? ইকড়ি-মিকড়ি প্রোগ্রামটা তো দেখতে পারো। দেখবে?'

সোমনাথ তখন বলবে—

'লাভ হবে না স্যার। গানের একটা প্রোগ্রামের পরও এক অবস্থা হয়েছিল। কানের মধ্যে তিনদিন টানা তবলা বেজেছিল। তালে বাজলেও তাও একটা কথা ছিল, সবটা বেজেছে বেতালে। বেতালে তিনদিন তবলা শোনা যে কী ভয়ংকর

boierpathshala.blogspot.com

স্যার, আপনাকে বোঝাতে পারব না।'

'ছেলেমানুষি কোরো না সোমনাথ। সবে কেরিয়ার শুরু করেছ। এখন এডিটিং করছ, কিছুদিন পরে বড়ো কাজও করবে। পরিচালক হবে।'

'আমার পরিচালক হওয়ার দরকার নেই স্যার। আমি সামনের মাসে বান্‌জা চলে যাচ্ছি।'

'কোথায়!'

'বান্‌জা স্যার। রাজস্থানে রিমোট একটা গ্রাম। জয়পুর থেকে ওয়ান টুয়েন্টি কিলোমিটার সাউথ ইস্ট । ওখানে আমার এক বন্ধুর পিসেমশাই পাহাড় কিনেছে।'

মানুষ পড়ে আকাশ থেকে, সোমনাথের কথা শুনে কমল মল্লিক পড়বে পাহাড় থেকে।

'পাহাড়! পাহাড় কিনেছে মানে? তুমি কি চাকরিবাকরি ছেড়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরবে ঠিক করেছ সোমনাথ?'

এবার সোমনাথ হাসবে। দেখানো হাসি নয়, শোনানো হাসি। দেখানো হাসিতে টেলিফোনে কোনো লাভ হয় না।

'ঘুরব না, মার্বেল পাথরের পাহাড় স্যার। সেই পাহাড় ভাঙা হবে।'

'পাহাড় ভাঙবে! সোমনাথ তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? পাথর ভাঙবে! আমি কি ঠিক শুনছি?'

সোমনাথকে ঠান্ডা গলায় বলতে হবে—

'ভাঙব না, ভাঙার হিসেব রাখব। কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গেছে। রোজ কতটা পাহাড় ভাঙা পড়ল, কতটা ডেসপ্যাচ হল, কতটা পরে ভাঙা হবে এইসব। মনে হয়, কাজটা পচা সিরিয়াল আর খেলো গেম শো-গুলোর থেকে বেশি ইন্টারেস্টিং হবে। এই কাজ আর বেশিদিন করলে আমি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাব।'

কমল মল্লিক ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলবে। দীর্ঘশ্বাস। বলবে, 'সোমনাথ তুমি পাগল হয়েই গেছ। খুবই খারাপ লাগছে। তোমার কি কোনো চেনা সাইকিয়াট্রিস্ট আছে? না থাকলে আমাকে বল। আই শ্যাল অ্যারেঞ্জ।'

দুঃখের বিষয় এই কথোপকথন হল না। তার আগেই ঝামেলা হয়ে গেল। কমল মল্লিক আজ সকালে খবর পাঠালেন, এখনই দেখা করতে হবে। আসব না আসব না করেও সোমনাথ এসেছে। কিন্তু কমল মল্লিক এখনও আসল কথা কিছু বলেননি। আসল কথার আগে সাত পাঁচ অন্য কথা বলছেন। অনেক সময় বাঘ,

boierpathshala.blogspot.com

সিংহ এরকম করে। শিকার মেরে রেখে চারপাশে ঘুরপাক খায়। ভাবে, মারা তো হয়েই গেছে, আর তাড়াহুড়ো কীসের? এবার আস্তে ধীরে খেলেই হবে। এই মানুষটাও কি সেরকম ভাবছে? ভাবলে ভুল করবে। এখানে এলেও মনকে শক্ত করে রেখেছে সোমনাথ। কাজ সে ছাড়বেই।

'কিছু খাবে সোমনাথ?'

কথাকলির নেমন্তন্নর কথাটা মনে পড়ে গেল। সত্যি সত্যি খাওয়াবে নাকি! হতেও পারে। মানুষটা হয়তো কাজ ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টা আঁচ করতে পেরেছে। এখন খাইয়ে-টাইয়ে প্যাঁচ মারবার চেষ্টা করছে।

'না থাক।'

'থাক কেন? দাঁড়াও স্যান্ডউইচ দিতে বলি। তুমি খেলে আমিও একটা খাই। চিকেন স্যান্ডউইচ খাও। জ্বরের মুখে ভালো লাগবে। একটু সস দিয়ে খাও। চিলি সস।'

'না স্যার, খাব না। পেট ভর্তি।'

'ঠিক আছে খাওয়া থাক। এসো দুজনে কফি নিই।'

সোমনাথ ভাবল এবারও না বলবে। চুপ করে রইল। কমল মল্লিক ইন্টারকমে ক্যান্টিনে কফির কথা বললেন। সোমনাথ বলল, 'স্যার, আমার একটা কথা ছিল স্যার।'

'একটা কেন? তোমার এক হাজার কথা শুনব। কিন্তু এখন নয়। এখন তুমি আমার কথা শুনবে। কেন তোমাকে ডেকে আনলাম সেই কথা। দাঁড়াও, তার আগে বাইরে একটু বলে রাখি। ওরা যেন কিছুক্ষণ ফোনগুলো না দেয়।'

নিজের মোবাইলটা সাইলেন্ট মোডে দিয়ে কমল মল্লিক কথা শুরু করলেন শান্ত ভঙ্গিতে।

'সোমনাথ, আমি এখন তোমাকে একটা গোপন কথা বলব।'

সোমনাথ চুপ করে রইল। এটা আবার কী খেলা? এটা তো সে ঠিক চিনতে পারছে না! মানুষটাকে গত পাঁচ বছর ধরেই দেখছে। তার ভালোমন্দ অনেক খেলাই দেখেছে। কিন্তু সব খেলা চিনতে পারেনি।

কমল মল্লিক সামান্য হাসলেন। পিওন কফি দিয়ে গেল। এই ঘরে কফির ব্যবস্থাও সুন্দর। টেবিলের মতোই সুন্দর। হলুদ রঙের ট্রে। পুরো হলুদ নয়, বাদামি হলুদ। চেহারাটা পাতার মতো। জল-টেবিলের ওপর সেই ট্রে একটা অন্যরকম এফেক্ট তৈরি করছে। ঝরা পাতার এফেক্ট। কমল মল্লিক কফির মগ টেনে নিয়ে বললেন, 'সোমনাথ, বহুদিন পরে আমরা একটা সমস্যার মধ্যে

boierpathshala.blogspot.com

পড়েছি। সমস্যা না বলে সংকট বলাই ভালো, ক্রাইসিস। এই ক্রাইসিস থেকে বেরোতে তোমাকে আমাদের দরকার।'

সোমনাথ চমকে উঠল। বিপদ আসছে। তার ঘাড়ে একটা বড়ো দায়িত্ব কিছু পড়বে। না, এখানে আসাটা ঠিক হয়নি। একসময় সিদ্ধান্ত নিয়েও ফেলেছিল, আসব না, আরও দু-দিন যাক। তারপরেও মনের ভেতরে খচখচ করল। শেষপর্যন্ত পৃথাকে জিজ্ঞেস করল। পৃথা তখন অফিসে। মোবাইলে ধরল তাকে। ফোন ধরেই বলল, 'তাড়াতাড়ি বল। খুব ব্যস্ত। আমাদের আই টি অফিসগুলো তোমাদের মতো নয় যে তিন ঘণ্টা ধরে লাইট আর সাউন্ড ঠিক করবে। তারপর শুটিং শুরু হবে।'

'কথা শুরুর আগেই তাড়াতাড়ি শেষ করতে বলছ!' রাগ করে বলল সোমনাথ ।

'আহা, রাগ কর কেন সোনা? আমাদের কাজই এরকম। সব কিছুতেই স্পিড। দুনিয়া এখন জেট স্পিডে চলছে। জেট স্পিডের বাংলা কী হবে? ঝড়ের গতি?'

সোমনাথ আরও বিরক্ত হল। বলল, 'তাহলে তুমি ঝড় নিয়েই থাক।'

পৃথা হেসে ফেলল। 'ঠিক আছে তাড়াতাড়ি বলতে হবে না। আস্তে আস্তে বল। সুর দিয়েও বলতে পারো। ব্যাকগ্রাউন্ডে বেহালা দাও, স্পিড কম হবে, একটা সেনটেন্স সন্ধে পর্যন্ত টানতে পারবে।'

রাগ চেপে সোমনাথ দ্রুত ঘটনা জানায়। তার থেকে দ্রুত উত্তর দেয় পৃথা।

'অবশ্যই যাওয়া উচিত। জরুরি বলে যখন ডেকেছেন, তখন না যাওয়াটা শুধু অভদ্রতা নয়, অন্যায়। তার থেকেও বড়ো কথা সোমনাথ, তুমি এখনও কাজটা ছাড়োনি।'

পৃথার কথা ঠিক মনে করেই চলে এসেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, না, ঠিক নয়। সম্ভবত সে আবার জড়িয়ে পড়ছে।

'স্যার, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

মগে চুমুক দিয়ে কমল মল্লিক সোমনাথের দিকে সরাসরি তাকালেন। ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি রেখে বললেন, 'সোমনাথ, আমি তোমাকে গুড়ের ব্যবসার কথা এমনি বলছিলাম না। তুমি শুনলে নিশ্চয় অবাক হবে, আমাদের তিনটে কাজ বাতিল হয়ে গেছে। তুমি ছুটিতে যাওয়ার আগেই একটা হয়েছিল। বাকি দুটো হয়েছে তারপর। সোমনাথ, কাজ বাতিল হয়ে ফিরে আসাটা চিন্তার

boierpathshala.blogspot.com

কারণ নয়। যে-কোনো ব্যবসাতেই হয়। খরচাপাতি করে জিনিস বানানোর পর রিজেক্ট হয়। সব ব্যবসা ভেলিগুড়ের মতো নয়। আমি সেটা নিয়ে টেনশন করছি না। রিজেক্ট মাল কীভাবে চালাতে হয় আমি জানি। টেনশনের জায়গাটা অন্য।'

সোমনাথের মুখ উশখুশ করছে। একটা সিগারেট খেতে পারলে হত। সে কফিতে শেষ চুমুক দিল। কমল মল্লিকও খাওয়া শেষ করে মগ তুলে রাখলেন 'ঝরা পাতা' ট্রের ওপর। তারপর আবার শুরু করলেন।

'প্রথমে ভেবেছিলাম, অন্য কোম্পানিগুলো পিছনে লেগেছে। যাতে চ্যানেল আমাদের রিজেক্ট করে। ভেবে নিশ্চিন্ত হই। এ-জিনিস আমি সামলাতে জানি। কিন্তু পরে চিন্তার বিষয় হল। তিনটে প্রোগ্রাম তিনটে আলাদা আলাদা চ্যানেল থেকে বাতিল হয়ে ফিরল। সবাই একসঙ্গে মল্লিক টিভির পিছনে লেগেছে এটা ভাবা বোকামি। তার মানে, সামথিং এলস। আরও কিছু আছে। আমি সেই আরও কিছুর খোঁজ নিলাম। কথা বললাম ওদের সঙ্গে। সমস্যা কোথায়? ওরা আমাকে সমস্যার কথা জানাল।'

হিসেব মতো সোমনাথের চুপ করে থাকা উচিত। তবু তার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'কী সমস্যা?'

কমল মল্লিক হেসে বললেন, 'সেটাই তো গোপন কথা। সিক্রেট। তোমাকে বলব বলে ধরে এনেছি।'

কমল মল্লিকের মুখে 'সিক্রেট' শুনে নড়েচড়ে বসল সোমনাথ। গোপন কথা! টিভির প্রোগ্রাম তৈরি নিয়ে গোপন কথা আবার কী? লোকটা নতুন কোনো প্যাঁচ তৈরি করছে? তাকে ধরে রাখবার প্যাঁচ?

কমল মল্লিক মুহূর্তখানেক চুপ করে থাকলেন। তারপর নীচু গলায় বললেন, 'ওরা সেক্স চাইছে সোমনাথ।'

'সেক্স!' সোমনাথ চমকে উঠল।

মল্লিক ভুরু কুঁচকে বললেন, 'হ্যাঁ, সেক্স। আমার সঙ্গে পরশু ঘুতুনিয়ার মিটিং ছিল।'

সোমনাথ অবাক গলায় বলল, 'ঘুতুনিয়া! ঘুতুনিয়া কে?'

'আরে বাবা, আলো চ্যানেলের মালিক। মিস্টার ঘুতুনিয়ার বদলে ওর নাম হওয়া উচিত ছিল মিস্টার ঘুঘুনিয়া। ঘুঘু লোক। কথায় কথায় দাদাভাই দাদাভাই করে। ব্যাটা পাঁচ বছরে চ্যানেল ভায়াবেল তো করেইছে, এখন লাভ করছে।'

সোমনাথ একটু লজ্জা পেল। বলল, 'ওহো মনে পড়েছে। এত চ্যানেল হয়েছে, প্রোপ্রাইটারদের নাম মনে রাখা কঠিন।'

boierpathshala.blogspot.com

কমল মল্লিক হাত তুলে বললেন, 'সেটাই স্বাভাবিক। আমারই গুলিয়ে যায়, আর তোমরা হলে ক্রিয়েটিভ পারসন, টাকা কার তা নিয়ে মাথাব্যথা করবে কেন? যাই হোক, ঘুতুনিয়াকে স্ট্রেট জিজ্ঞেস করলাম। ব্যাপার কী মশাই? এতদিন কাজ করছি, তারপরেও প্রোগ্রাম রিজেক্ট করছেন! প্রবেলমটা কোথায়? ঘুতুনিয়া বলল, দাদাভাই, আপনার প্রোগ্রাম ভালো, টেস্ট আছে, কালচার আছে, সোশাল কমিটমেন্ট ভি আছে। টি আর পিও ভালো। আমি বললাম, তাহলে তো হয়েই গেল, সবই ভালো। আর কী চাই? ঘুতুনিয়া বলল, দাদাভাই, আজকাল টি আর পি তে কী হয়? কিছুই হয় না। কোনো শালা বিশ্বাসই করতে চায় না। ভাবে জল মেরেছে। সবাই তাকিয়ে থাকে ট্যাম রিপোর্টের দিকে, অন্য চ্যানেলের সঙ্গে কমপারিজন। দাদাভাই আপনার প্রোগ্রামগুলো আজকাল ট্যাম রিপোর্ট ঝাড় খেয়ে যাচ্ছে। ট্যাম না দেখে অ্যাডভার্টাইজার এক পা নড়তে চায় না। এবার থেকে প্রোগ্রামে এক চিমটে সেক্স ছেড়ে দিন দাদাভাই। দেখবেন ভিউয়ারশিপ চড় চড় করে বাড়ছে। সোমনাথ, আমিও তোমার মতো অবাক হয়ে বললাম, সেক্স! প্রোগ্রামে সেক্স দেব মানে! ঘুতুনিয়া ব্যাটা দাঁত বের হাসল। বলল, বোঝেনই তো দাদা, বহুত পয়সা ইনভেস্ট হয়ে গেছে। অন্য চ্যানেলগুলো যদি বিজ্ঞাপন কেড়ে নিয়ে যায় তাহলে ধসে যাব। ইতিমধ্যে বাজারে রটে গেছে মল্লিক টিভির কাজ বড্ড ভেজ আছে। নিরামিষ। চারপাশে যা শুরু হয়েছে, তাতে নিরামিষ জিনিস বেচা খুব হার্ড। বেশি নয় দাদা, অল্প সেক্স ছাড়ুন। বিদেশে শুনেছি মারকাটারি কাণ্ড হয়। ফরাসি কোন চ্যানেলে নাকি নিউজের সময় স্ট্রিপটিজ চলে। খবরে যত এক্সাইটমেন্ট বাড়বে নিউজ রিডার তত কাপড় খুলবে। প্রথমে কোট-টোট পরে বসে, তারপর খুলতে থাকে। বড়ো বড়ো অ্যাক্সিডেন্টের খবর পড়বার সময় গায়ে শুধু আন্ডারগার্মেন্টিস। বাপরে! আমাদের তো ওসব চলবে না। বাঙালি মধ্যবিত্ত বাড়ির সকলের সঙ্গে বসে টিভি দেখে, অত কড়া জিনিস হজম হবে না। সাজগোজের পর সেন্টের মতো স্প্রে করে দিলেই হবে।'

সোমনাথ চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, 'অসুবিধে কোথায়? তাহলে তো সমস্যাটা জানাই হয়ে গেল স্যার। আপনিও সেন্ট ছড়িয়ে দিন। সত্যি তো, ঘুতুনিয়া ভুল বলেনি। আজকাল তো এসব আকছার হচ্ছে।'

কমল মল্লিক গম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন, 'কাজটা শুনে যতটা সহজ মনে হচ্ছে সোমনাথ, আসলে ততটাই কঠিন। অনেক কিছু গজ ফিতে দিয়ে মেপে করা যায়, কিন্তু এই জিনিস করা যায় কিনা আমার জানা নেই। শুনলে অবাক হবে, মল্লিক টিভির যে তিনটে প্রোগ্রাম চ্যানেলগুলো থেকে ফিরে এসেছে তার

boierpathshala.blogspot.com

মধ্যে একটা ছিল রান্নার সফটওয়্যার। চল্লিশ মিনিট ধরে রেসিপি শেখানো। কাজটা রাতুল করেছিল। রাতুলকে তো জানো? এখানে গোড়া থেকে আছে। ওকে ডেকে ঘুতুনিয়ার কথা বললাম। বেচারি তো আকাশ থেকে পড়েছে। রান্নায় নুন মিষ্টি দেওয়া যায়, সেক্স দেবে কোথা থেকে? আমি বললাম, কী করা যাবে, দরকার হলে রাঁধুনিকে বিকিনি পরিয়ে খুন্তি হাতে দাঁড় করিয়ে দাও। রাতুল শুনে থ। এঁচোড়ের ডালনার সঙ্গে বিকিনি কীভাবে মেশাবে বুঝতে পারছে না বেচারি। আমিও পারছি না। আমাদের 'সহজে ইংরেজি' প্রোগ্রামটাও আটকেছে। অথচ ওটার পিছনে বহুত পরিশ্রম আছে। স্ক্রিপ্টের সময় দু-দুজন ইউনিভার্সিটির টিচারের সঙ্গে কনসাল্ট করা হয়েছিল। ছোটো ছেলেমেয়েদের জন্য প্রোগ্রাম, ভুল কিছু হলে সর্বনাশ। এখন চ্যানেল বলছে, ওতেও ব্যবস্থা করুন। আমি বললাম, সেকি! ছোটোদের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, ওখানে আবার ব্যবস্থা কী! মিস্টার ঘুতুনিয়া হেসে বলল, ছোটোদের অনুষ্ঠান ছোটোদের দেখার দরকার কী দাদাভাই? ছোটোদের বাবা-মায়েরা দেখুক। বাবা-মায়েদেরও তো ইংলিশ লাগে, নাকি লাগে না? প্রোগ্রাম না হয় রাতের দিকে ঠেলে দেব। বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ার পর। আমি তো শুনে হাঁ। লেখাপড়ায় ওসব কোথা থেকে আসবে বল দেখি সোমনাথ! ঘুতুনিয়া নাছোড়বান্দা। বলল, এতেই নাকি স্কোপ বেশি আছে। বিদেশের ল্যাঙ্গুয়েজ পড়াতে পড়তে বিদেশ দেখান দাদাভাই। নাইট ক্লাব, সী বিচ্, হট্ ফিল্মের ক্লিপিংস। ইংরেজিও হবে, আবার সেক্সও হবে। বোঝো একবার।'

সোমনাথ হেসে ফেলল। বলল, 'ভদ্রলোকের মাথাটা একেবারে গেছে।'

কমল মল্লিক চিন্তিত মুখে বললেন, 'শুধু ওকে বলছ কেন সোমনাথ? মাথা সবার গেছে। চ্যানেল নাইনটি টু আমাদের যে পাইলটটা ফেরত পাঠিয়েছে, শুনলে তুমি আকাশ থেকে পড়বে। রবীন্দ্রসংগীতের ওপর কাজ। একেকটা একেকটা সিজন ধরে কাজ। বর্ষা আসবে বলে বর্ষার গান। অনেক ভেবেচিন্তে নাম ঠিক করলাম, মন মোর মেঘের সঙ্গী।'

সোমনাথ বলল, 'জানি স্যার, এডিট আমি করে গিয়েছিলাম।'

'তাহলে? তুমিই বল কাজ কীরকম হয়েছিল?'

'দারুণ স্যার। বাংলাদেশের আর্টিস্টও তো ছিল। আমরা অনেক খেটেখুটে গানের ফাঁকে বৃষ্টির স্টক লাগালাম।'

কমল মল্লিক হাত উলটে বললেন, 'এখন বেগড়া দিচ্ছে।'

সোমনাথ ভুরু কুঁচকে বলল, 'কেন? নাম পছন্দ হচ্ছে না।'

'নাম না, গান। গান পছন্দ হচ্ছে না।'

boierpathshala.blogspot.com

সোমনাথ অবাক হল। টেবিলের ওপর ঝুঁকে বলল, 'গান পছন্দ হচ্ছে না মানে! রবীন্দ্রসঙ্গীত?'

মল্লিক উত্তর না দিয়ে একটু হাসলেন। হাসিরই ঘটনা। চ্যানেল নাইনটি টু জানিয়েছে, 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' নাম বদলাবে না, কিন্তু গানের দৃশ্য বদলাতে হবে। বৃষ্টির স্টক দেখানো গান চলবে না, আউটডোর গান চাই। গায়িকাকে সত্যি সত্যি বৃষ্টিতে ভিজতে হবে। 'উতল ধারা বাদল ঝরে' অথবা 'এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে'-তে কীভাবে গায়িকা বৃষ্টিতে ভিজবে কে জানে। তা ছাড়া আর্টিস্টরা দুম করে ভেজাভেজির মধ্যে যাবেনই-বা কেন? শ্রাবণী সেন বা মিতা হককে এ ধরনের কথা বলতে গেলে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। কমল মল্লিক চ্যানেলের প্রোগ্রাম ডিরেক্টরকে এটা বলেননি এমন নয়। বলেছেন, বুঝিয়েই বলেছেন। সব শোনার পরও তারা বলল, বড়ো আর্টিস্টের কী দরকার? কোনো দরকার নেই। গান এক, সুর এক, সিজনও এক। শিল্পী বদলে নিলেই হল। যে ভিজতে রাজি সে গান করবে। যে রাজি নয় সে করবে না। সব মিলিয়ে খুবই জটিল অবস্থা। এই জটিলতা কীভাবে কাটবে?

কমল মল্লিক চিন্তিত ভঙ্গিতে জল-টেবিলে হাত বোলাতে লাগলেন। বোলাতে বোলাতেই বললেন, 'সোমনাথ জলে থাকতে হলে কুমিরের সঙ্গে শুধু বাস করতে হবে না, কুমিরের কথা শুনেও চলতে হবে। সে যদি ঝিম মেরে পড়ে থাকে আমাকেও ঝিম মেরে থাকতে হবে। সে যদি কারও ঠ্যাং কামড়ে ধরে আমাকেও ধরতে হবে। চ্যানেল এতদিন নীতিকথা চেয়েছে, আমি নীতিকথা দিয়েছি। এখন বলছে নুডিটি দাও, আমি তাই দেব। স্প্যাগেটি ব্লাউজ বা শর্ট স্কার্ট ছাড়া অ্যাঙ্করকে ক্যামেরার সামনে বসতে দেব না। তুমি কী বল?'

সোমনাথ চুপ করে রইল। সে কী বলবে? সত্যি সমস্যা কঠিন। একেই টিভি চ্যানেলগুলো আজকাল বেশিরভাগ প্রোগ্রামই নিজেরা বানাতে শুরু করেছে। সেই মতো কমবেশি প্রায় সকলেই সেটআপ তৈরি করে নিয়েছে। আউটসোর্সিং আর ক-টা হয়? এরপর যদি সেটুকুও বন্ধ হয়ে যায় লাইনটাই নড়বড়ে হয়ে যাবে। একেবারে মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো কিছু করতে না পারলে মুশকিল।

মল্লিক বললেন, 'সোমনাথ, আমি ঠিক করেছি, এই কাজের জন্য আলাদা লোক রাখব। সে স্ক্রিপ্ট রেডি হলে মরিচগুঁড়োর মতো জিনিস ছড়িয়ে দেবে। সেই জিনিস রাঁধুনির ডিপ কাট ব্লাউজ হবে, না বিকিনি হবে, নাকি কৃষ্ণসুন্দরী সাঁওতাল রমণীর মতো একেবারে উদোম গায়ে মাটির উনুনে রাঁধতে বসবে তার

boierpathshala.blogspot.com

মাথাব্যথা। তারপর শালা দেখব কে টেক্কা দেয়। এই লোকের স্যালারি ভালো হবে।'

জোরে হাসতে গিয়েও কমল মল্লিক নিজেকে সামলালেন। সোমনাথের ভুরু কুঁচকে গেল। মানুষটা কি টোপ হিসেবে তার জন্য এইসব ভাবছে? পৃথা শুনলে চমকে যাবে।

'পৃথা, একটা দারুণ খবর আছে।'

'কী দারুণ খবর? নিশ্চয় তোমার যোগব্যায়ামের টিভি প্রোগ্রাম কান ফিল্ম ফেস্টিভালে যাচ্ছে। যোগশ্রী ভীমপ্রসাদ আর তুমি হয়েছ ডেলিগেট। ভীমবাবু ওখানে 'আমাশয়ের প্রতিবিধান' নামে বিশেষ শো করবেন। তাই তো?'

'ঠাট্টা কোরো না পৃথা। খবর সত্যি দারুণ।'

'আচ্ছা, ঠাট্টা করছি না। তবে তাড়াতাড়ি বল। ব্যস্ত আছি। সামনে তিনটে কম্পিউটার খোলা। তিনটেই একসঙ্গে অপারেট করছি। আমার দুই কলিগ টিফিনে গেছে। আসলে প্রেম করতে গেছে। আমি ওদেরটাও প্রক্সি মারছি।'

'আমার একটা প্রোমোশন হয়েছে পৃথা।'

'প্রোমোশন! তোমার! কোথায়?'

পৃথার গলায় অবিশ্বাসের উচ্ছ্বাস।

'কোথায় আবার? আমার অফিসে। মল্লিক টিভি প্রোডাকশন।'

পৃথা বিস্মিত গলায় বলল, 'সেকি সোমনাথ! এই যে বললে, তুমি ওই কাজ আর করবে না! জ্বর বলে ডুব দিয়ে অন্য কাজ খুঁজলে। ওখানে আবার প্রোমোশন কীসের?'

'সে ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন মত বদলেছি। বলতে পারো বদলাতে বাধ্য হয়েছি। টাকাপয়সা বাড়ছে। তবে সেটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হল কাজটা খুবই ইন্টারেস্টিং।'

'ইন্টারেস্টিং কাজ!'

'হ্যাঁ। আর শুধু পাঁচটা প্রোগ্রাম বানানোর মতো থোড় বড়ি খাড়া নয়। ভাবনাচিন্তার স্কোপ আছে। আমি হয়েছি ডিরেক্টর। এমনি ডিরেক্টর নয়, ডিরেক্টর সেক্স।'

'মানে!' পৃথা আকাশ থেকে পড়বে।

'মানে কিছু নয়, কোম্পানির সেক্সের ব্যাপারটা এবার থেকে আমি দেখব।'

'কী বলছ তুমি! এনিথিং রং উইথ ইউ সোমনাথ? শরীর ঠিক আছে তো?'

সোমনাথ এবার হাসবে। জোরে নয়, 'হুঁ হুঁ' ধরনের হাসি। ভাবটা হবে,

boierpathshala.blogspot.com

এতদিন হাসি মশকরা করেছ, এবার বোঝো ঠেলা। হাসতে হাসতেই তাকে বলতে হবে, 'রং এর কী আছে পৃথা, সবটাই রাইট। সারাদিন নাক ডেকে ঘুমোবো। ফাইনাল স্ক্রিপ্টের সময় গিয়ে কনসোলে বসব। কনসোল জানো তো? এডিং সিস্টেম। আমার সঙ্গে থাকবে ঝুলি। ঝুলিতে বোঝাই থাকবে সেক্স। তুমি যদি বল, তোমার দেওয়া শান্তিনিকেতনি ব্যাগটাও নিতে পারি। ব্যাগ থেকে জিনিস বের করে করে বলব, নাও এটা লাগাও, উঁহু ওটা লাগাবে না, ওটায় মাপে গোলমাল, বরং এটা লাগাও। কাজ হয়ে গেলে আবার ঘুমিয়ে পড়ব।'

এরপরে পৃথা কী করবে? মোবাইল কি কেটে দেবে? নাকি সোমনাথের মাথার সমস্যা হয়েছে ভেবে, অফিস থেকে ছুটি নিয়ে চলে আসবে ট্যাক্সি ধরে?

কমল মল্লিকের কথায় ঘোর কাটল সোমনাথের।

'যাক, সে-লোক পরে খুঁজে বের করব। আপাতত তো নিজেদেরই সামলাতে হবে। মল্লিক প্রোডাকশনের গুড উইল বলো ব্যাড উইল বলো ফিরিয়ে আনতে হবে। একটা বড়ো অর্ডার হাতে এসেছে সোমনাথ। চ্যানেল নাইনটি টু-ই অফার দিয়েছে। বলল, দেখুন কাজ যদি ঠিকমতো করতে পারেন পয়সা কোনো ফ্যাক্টর নয়। প্রোগ্রাম ছোটো। মেরে কেটে তিন-চার মিনিটের। কিন্তু চলবে অনেকদিন। কাজটা করতে পারলে শুধু টাকার দিক থেকে লাভ নয়, একটা নতুন ট্রেন্ড তৈরি হবে।'

সোমনাথ খানিকটা কৌতূহলেই প্রশ্ন করে ফেলল—'কী প্রোগাম? নাচ-গান?'

'না, নাচ গান নয়। ওয়েদার।'

সোমনাথ অবাক হয়ে বলল, 'ওয়েদার'!

কমল মল্লিক চেয়ারে হেলান দিলেন। এই মানুষটা একজন 'ঠান্ডা মাথার লোক' হিসেবেই পরিচিত। অফিসের কেউই তাঁকে দুমদাম রেগে যেতে দেখেনি। ঠান্ডা মাথা এবং ভদ্রলোক। বকাঝকাও করেন শান্ত ভঙ্গিতে। সোমনাথ বুঝতে পারছে ঠান্ডা মাথার মানুষটার মধ্যে একটা ছটফটানি তৈরি হয়েছে।

'আবহাওয়ার পূর্বাভাস। আবহাওয়া অফিস থেকে ফোরকাস্ট নিয়ে প্রতিদিন সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে হবে। চ্যানেল টেলিকাস্ট করবে।'

এতটা বলে মল্লিক সামান্য ঝুঁকে পড়লেন টেবিলের ওপর। বললেন, 'সোমনাথ, এই কাজে তোমাকে আমার চাই। আই নিড ইউ।'

সোমনাথ থতমত খেয়ে বলল, 'আমি স্যার? আমাকে!'

কমল মল্লিক স্থির চোখে সোমনাথের দিকে তাকালেন। বললেন, 'হ্যাঁ,

boierpathshala.blogspot.com

তোমাকে।' এই পর্যন্ত বলে ডান হাতটা জল টেবিলের ওপর বাড়িয়ে সোমনাথের হাত ছুঁলেন।

'প্লিজ, তুমি না বোলো না।'

'কিন্তু আমি তো স্যার...।'

কমল মল্লিক হাত ছাড়লেন না। হাতের ওপর হাত রেখেই বললেন, 'কোনও কিন্তু নয়। চ্যানেল চাইছে ওয়েদারের কাজটা করুক মোম। মোম চ্যাটার্জি।'

সোমনাথ এবার নড়ে বসল।

মোম। টিভি স্টার মোম চ্যাটার্জি। গত তিন বছর ধরে নিজের বয়স উনিশে আটকে রেখেছে মেয়েটা। পত্রিকার ইন্টারভিউতে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলে, 'কথায় আছে কুড়িতে বুড়ি। তাই উনিশেই থমকে আছি ভাই।' উনিশ কেন, এখন বহু সিরিয়াল, টেলিফিল্ম তাকে ষোলো-সতেরোর কিশোরীর রোল পর্যন্ত দিচ্ছে। 'লাল আকাশের কান্না' নামের এক মেগায় মোম চ্যাট্টার্জি ফ্রক পরে, দুটো বেণী বেঁধে স্কুলে পর্যন্ত গেছে। ঘটনা ফ্ল্যাশব্যাক ছিল। নায়িকার স্কুল জীবন। শ্যামবাজারের মোড়ে ইভটিজারদের খপ্পরে পড়ল কিশোরী। তারপর পুলিশের কাছে গিয়ে ভিলেনকে ধরিয়ে দেওয়ার গল্প। পরে ভিলেনের সঙ্গেই প্রেম। কিন্তু সমস্যা হল সেই ছেলে ভয়ে প্রেমিকার হাত পর্যন্ত ধরতে চায় না। গল্প জমজমাট।

কাটা কাটা চোখমুখ আর ছিপছিপে শরীরের সবকিছু হিসেবের মধ্যে রাখতে জানে মোম। গায়ের রং খুব ফর্সা নয়, আবার ভীষণরকম কালোও নয়। শ্যামলার কাছাকাছি। এই রং বাঙালির পছন্দ। বাঙালির আর এক পছন্দের জিনিস হল ভাসা ভাসা চোখ। 'দেখছি কিন্তু দেখছি না' ধরন। মোমের সেই জিনিস আছে। মনে হয়, ভাসা চোখে এখনই লালনের গান গেয়ে উঠবে। গত কয়েক বছর ধরে টিভির জগতে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে এই মেয়ে। অভিনয়ের সঙ্গে শরীরের আবেদনে তুখোড়, কখন শরীরের কোন অংশকে ক্যামেরার সামনে তুলে ধরতে হয় সেই কেরামতি জানে। ইনডাস্ট্রির খবর হল, এই মেয়ে যে-কোনো সময় টিভি ছেড়ে বড়ো পর্দায় পালাবে।

সোমনাথ বলল, 'মোম চ্যাটার্জিকে নিতে চান সে-কথা তাকে বললেই হয়। এমন তো নয় যে সে বিনা পয়সায় কাজ করবে।'

কমল মল্লিক চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। টেবিল ঘুরে এসে দাঁড়ালেন সোমনাথের পাশে।

boierpathshala.blogspot.com

'বলা হয়েছে। কিন্তু মেয়ে রাজি হয়নি। রাজি হওয়া তো দূরের কথা, সে কথাই শুনতে চাইছে না। তার হাতে নাকি এখন তিনটে মেগা, সাতটা টেলিফিল্ম। পাইপ লাইনে আরও দু-একটা কী যেন হাবিজাবি রয়েছে। মুখের ওপর বলে দিয়েছে, ডেট দিতে পারবে না।' এই পর্যন্ত বলে কমল মল্লিক সোমনাথের আরও একটু কাছে সরে এলেন। বললেন, 'ওসব বাজে কথা। আসলে কোনোকালে মল্লিক টিভি ওকে পাত্তা দেয়নি, এখন প্রতিশোধ নিতে চাইছে। বড়ো হয়ে গেছে তো।'

সোমনাথ ভুরু কোঁচকালো। এরকম কিছু ঘটেছিল নাকি! মল্লিক টিভি মোম চ্যাট্টার্জিকে পাত্তা দেয়নি? কই তার জানা নেই তো!

সোমনাথের জানা না থাকলেও ঘটনা সত্যি। সোমনাথের সেই ঘটনা জানবার কথা নয়। তখনও সে এখানে আসেনি। শুধু পাত্তা নয়, কমল মল্লিক মোমকে একেবারে তাড়িয়েই দিয়েছিলেন। তখনও কোম্পানির এতটা রমরমা অবস্থা হয়নি। সবে ঘর ভাড়া নিয়ে বসা হয়েছে। হাতে অল্প কয়েকটা অর্ডার। একটা গানের কম্পিটিশন, একটা ছোটোদের কুইজ, দুটো গেম শো। সেই সময় 'গেম শো'গুলো একটু একটু করে টিভির পর্দায় আসতে শুরু করেছে। মল্লিক টিভি দাঁত কামড়ে চেষ্টা করছে জিনিসটার মধ্যে ঢুকতে। কমলবাবু চ্যানেলওলাদের কাছ থেকে প্রায় ভিক্ষে করে দুটো প্রোগ্রাম জোগাড় করেছেন। তার মধ্যে একটার নাম ছিল 'ছিঁচকাদুনে গৃহিণী'। কনসেপ্ট খারাপ নয়। কোন গৃহিণী কত বেশি ঘ্যানঘ্যান করে স্বামীকে কবজা করতে পারে তার ওপর কম্পিটিশন। কমল মল্লিকের জমা দেওয়া 'কনসেপ্ট' দেখে চ্যানেল ধরতে পারেনি 'ছিঁচ্‌কাদুনে গৃহিণী' ব্রিটিশ এক চ্যানেলের জনপ্রিয় শো 'ন্যাগিং হাউসওয়াইফ'-এর টুকলি। তারা রাজি হয়ে গেল। মল্লিক তো উঠে পড়ে অ্যাঙ্কর খুঁজতে শুরু করলেন। এসব প্রোগ্রাম অ্যাঙ্করের হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। সে গড়বড় করলে গোটা জিনিসটাই মুখ থুবড়ে পড়বে। ব্রিটিশ চ্যানেলে ন্যানি নামে একটা অল্পবয়সি মেয়ে কাজটা করে। সে এমন একটা অভিনয় করে যেন, ঘ্যানঘ্যানানি শিখছে। আগামী দিনে সে যখন বিয়ে-থা করবে স্বামীকে কীভাবে বাগে আনবে তার প্রশিক্ষণ। এতে একটা অন্য স্বাদও তৈরি হয়। মজা, ধমক, আবদার সব মিলিয়ে চল্লিশ মিনিট শো জমে ওঠে। মল্লিকও অল্পবয়সি মেয়ে খুঁজতে শুরু করল। টোকা যখন হচ্ছে, তখন সবটা টোকাই ভালো।

মল্লিক টিভির ছোট্ট অফিসঘরে ভিড় শুরু হয়ে গেল। রোজই কেউ না কেউ আসে। একদিন দুপুরে রোগা পাতলা ধরনের একটা মেয়ে এসে হাজির।

boierpathshala.blogspot.com

দেখেই অপছন্দ হল কমল মল্লিকের। লং স্কার্টের ওপর স্লিভলেস টপ পরেছে। চেহারায় আর যাই থাকুক, গৃহিণী হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। একেবারেই কলেজের মেয়ে মনে হচ্ছে।

'নাম কী আপনার?'

'মোম, মোম চ্যাটার্জি।'

'কাজ করেছেন কোনো? টিভির কোনো কাজে অভিজ্ঞতা আছে।'

'কমলদা, আমাকে আপনি আপনি করবেন না, কত ছোটো আমি, আপনি শুনলে লজ্জা লাগে।'

কথাটা বলে খিলখিল করে হেসে টেবিলে ঝুঁকে পড়ল তরুণী।

কমল মল্লিক ঘাবড়ালেন না। বিরক্ত হলেন। মুখের কাছে হাতের মুঠো তুলে গলা খাঁকারি দিলেন। এই লাইনে এ ধরনের মেয়ে সম্পর্কে তাঁর ধারণা ইতিমধ্যেই কিছু কিছু তৈরি হয়েছে। আবার বললেন, 'আপনি কোনো কাজ করেছেন?'

'না, এখনও করিনি, তবে অনেক কাজই করব কমলদা। কথা চলছে।'

'কী ধরনের কাজ?'

মেয়েটা গদগদ গলায় বলল, 'সীতাংশুদার সঙ্গে কথা চলছে। মনে হয়েছে এই মাসেই ফাইনাল হয়ে যাবে।'

কমল মল্লিক চিবুক তুলে বললেন, 'সীতাংশুদা! সীতাংশুদাটা কে?'

মোম চ্যাটার্জি ঘাড় হেলিয়ে হেসে বলল, 'ওমা! সীতাংশুকে চেনেন না? 'কোন সে আলো' সিরিয়ালের প্রোডিউসার কাম ডিরেক্টর। 'কোন সে আলো' তো এখন এক নম্বর। আপনি দেখছেন না?'

কমল মল্লিক গম্ভীর গলায় বললেন, 'না, আমি দেখছি না। যাই হোক, এখানকার কাজটা সম্পর্কে আপনার কোনো আইডিয়া আছে?'

মোম চ্যাটার্জি এই কথার উত্তর না দিয়ে ডান হাতের পাতাটা গলার কাছে নাড়াতে নাড়াতে বলল, 'উফ কী গরম! কমলদা এসি নেই?'

কমল মল্লিক বুঝতে পারলেন, এই মেয়ে শুধু ন্যাকা নয়, বেয়াড়াও। মুখ নামিয়ে বললেন, 'না এসি নেই। আপনি বরং একটা ফটো জমা রেখে চলে যান। অযথা গরমে কষ্ট পাবেন না।'

মোম চ্যাটার্জি এবার একটা কাণ্ড করল। ফট করে টপের ওপরের বোতামটা খুলে ফেলল। ভেতরের গোলাপি ব্রা উঁকি দিল। বাঁ হাত দিয়ে টেবিলে পড়ে থাকা খবরের কাগজটা তুলে উন্মুক্ত জায়গায় হাতপাখার মতো হাওয়া

boierpathshala.blogspot.com

করতে করতে মোম বলল, 'কমলদা, এমন বললে কিন্তু চলবে না। ফটো রেখে চলে যাও মানেই কেস গুবলেট। আপনি আমাকে একেবারে হ্যাঁ বলে দিন। আমি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যাই।'

কমল মল্লিক বুঝলেন এই মেয়ে শুধু ন্যাকা এবং বেয়াড়া নয়, অসভ্যও। তিনি কঠিন গলায় বললেন, 'এটা কীভাবে সম্ভব! আপনার অডিশন নেওয়া হয়নি, ভয়েস টেস্ট হয়নি, দুম করে হ্যাঁ বলে দেব?'

রোগা মেয়েটা চেয়ারে হেলান দিল। সরল ভঙ্গিতে বলল, 'অডিশন নিয়ে নিন। অসুবিধে কী? আপনাদের অডিশনরুমটা কোনদিকে?'

'অডিশন রুম!'

মোম কাঁধ তুলে বলল, 'বাঃ অডিশন রুম থাকবে না? সীতাংশুদার তো অফিসের সঙ্গে একেবারে লাগোয়া। ছোট্ট ঘর কিন্তু খুব কোজি। কিউট একদম। কী ঠান্ডা। একবার ঢুকলে বেরোতেই ইচ্ছে করে না।' একটু থেমে মেয়েটা চোখ নাচিয়ে বলল, 'একটা ডিভান আছে তো তাই বেরোতে ইচ্ছে করে না।'

কমল মল্লিকের মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। এইটুকু মেয়ে কাজ কী জানে না, কোজি ঘর জেনে ফেলেছে। অথচ কত চমৎকার চমৎকার সব মেয়ে ক-দিন ধরে আসা যাওয়া করছে। কেউ নাটক করে, কেউ টিভিতে দু-একটা কাজ করে ফেলেছে। কত সিরিয়াস। লেখাপড়াও আছে। একটি মেয়ে তো সত্যি সত্যি ছাত্রী। ইউনিভার্সিটিতে অভিনয় নিয়ে গবেষণা করছে। গবেষণার বিষয় গরিব দেশে টিভি অভিনয়ের প্রভাব। থিয়োরির কাজ শেষ, এখন হাতেকলমে অভিনয় করে দেখতে চায়। তার মাঝখানে এই মোম চ্যাটার্জিরা এসে লাইনটাকেই নোংরা করার চেষ্টা করছে। সবথেকে রাগের কথা হল এরা সবাইকে একরকম ভাবে। সবাই ওদের 'সীতাংশুদা'।

শুধু রাগ নয়, কমল মল্লিক অপমানিতও হলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কঠিন গলায় বললেন, 'আপনি এবার আসুন। আমার কাজ আছে।'

সরাসরি তাড়িয়ে দেওয়া। মোম চ্যাটার্জি গাল লাল করে সোজা হয়ে বসল। টপের খোলা বোতাম আটকে, ব্যাগে হাত রেখে থমথমে গলায় বলল, 'আমার ফটো? ফটোটা দিয়ে যাই?'

'লাগবে না। আমার এই কাজটার সঙ্গে আপনাকে ঠিক যাবে না। একেবারে ঘরোয়া প্রোগ্রাম, অ্যাঙ্করকেও সেরকম হতে হবে।'

মোম খানিকটা নাছোড়বান্দার ঢঙে বলল, 'সেটা তো অভিনয়। আপনি তো আমার অভিনয় দেখলেনই না।'

boierpathshala.blogspot.com

কমল মল্লিক দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'অভিনয়ই তো দেখলাম। যাক, আপনি আসুন।'

কমল মল্লিক মোম চ্যাটার্জিকে ভুলেই ছিলেন। এরকম চটুল, চটকদার মেয়েরা এ-লাইনে কতই না আসে। যুগ যুগ ধরে এই কাণ্ড চলছে। তখন টিভি ছিল না, থিয়েটার, সিনেমা ছিল। এরা নানাভাবে নিজেকে বেচবার চেষ্টা করে। কখনও কেনাকাটা হয়, কখনও হয় না। তারপর ভুস্ করে হারিয়ে যায় একদিন। এই মেয়েরও নিশ্চয় সেইরকম কোনো পরিণতি হয়েছে।

ঘটনা কিন্তু সেরকম ঘটল না। গত কয়েক বছর ধরেই কমল মল্লিক জানতে পারছেন সেদিনের তাড়িয়ে দেওয়া মোম চ্যাটার্জি এখন টিভি জগতে বিশেষ একটা নাম। দর্শকরা তাকে চায়। সে এখন স্টার।

সেই জানাটা এবার একেবারে নিজের ঘাড়ে এসে পড়েছে।

কমল মল্লিক সোমনাথের কাঁধে হাত রাখলেন। মুখ নামিয়ে নীচু গলায় বললেন, 'সোমনাথ, আমি খবর পেয়েছি, মোম মেয়েটা তোমার পরিচিত। কাছের কেউ নয়, তবে পরিচিত। এখন তুমিই ভরসা। যদি কেউ মল্লিক টিভির প্রোডাকশনে ওকে কাজ করাতে পারে সে তুমিই। আমরা এইরকম একটা ক্রুসিয়াল সময়ে দাঁড়িয়ে তোমার কাছ থেকে এইটুকু কি আশা করতে পারি না? ইতিমধ্যে প্রোগ্রাম ক্যানসেল হওয়ার খবরটা একটু একটু করে বাজারে ছড়াচ্ছে। আমাদের নাম নষ্ট হচ্ছে। এই সময় আমরা যদি একটা বাম্পার হিট না করতে পারি তাহলে সত্যি গুড়ের কলসি নিয়ে বসা ছাড়া পথ থাকবে না। প্লিজ সোমনাথ।'

সোমনাথ চমকাল না। এটাই কমল মল্লিকের কায়দা। মানুষকে কীভাবে জড়িয়ে নিতে হয় জানে। এখন সে কীভাবে বলবে 'পারব না'? তার থেকেও বড়ো কথা হল মোম নামের মেয়েটি যে তার পরিচিত এই খবর ফাঁস হল কী করে?

সোমনাথ আমতা আমতা করে বলল, 'স্যার, পরিচয় খুবই সামান্য। আমার দুর সম্পর্কের এক বোনের সঙ্গে একসময় পড়ত। সে অনেক বছর আগের কথা। এখন আর মনে করতে পারবে না।'

কমল মল্লিক উত্তেজিত হয়ে প্রায় ঝুঁকে পড়লেন। বললেন, 'দ্যাট ইজ এনাফ। ওতেই হবে। সময় পেয়ে যাবে। সোমনাথ আগে তুমি প্রোগ্রামটার একটা কনসেপ্ট ভেবে ফেল। মারকাটারি ভাবনা। এমন স্ক্রিপ্ট যেন মোমের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। তারপর তো টাকা আছেই। মনে রেখো, এটা শুধু একটা

boierpathshala.blogspot.com

প্রোগ্রাম নয়, আমাদের পুরোনো জায়গায় ফিরে আসার প্রশ্ন।'

'কিন্তু আমি যে স্যার আজ চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলতে এসেছিলাম।' অসহায় গলায় বলল সোমনাথ।

'এটা চাকরি বলে ধরছ কেন? জাস্ট টু হেল্প আস। বন্ধুকে বন্ধুর সাহায্য।'

সোমনাথ চেয়ারে গা এলালো। বুঝতে পারছে, আপাতত হেরে গেছে সে। অন্তত এই মুহূর্তে তার মল্লিক টিভি ছাড়া হচ্ছে না। ক্লান্ত গলায় বলল, 'ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করব।'

কথাটা বলেই সে বুঝতে পারল, কাজটা ঠিক হল না। মোম চ্যাটার্জিকে বাগে আনা যে সহজ কথা নয়, তার খাঁই খুব বেশি। এই লাইনে সকলেই এখন এটা জেনে গেছে।

boierpathshala.blogspot.com

সাত

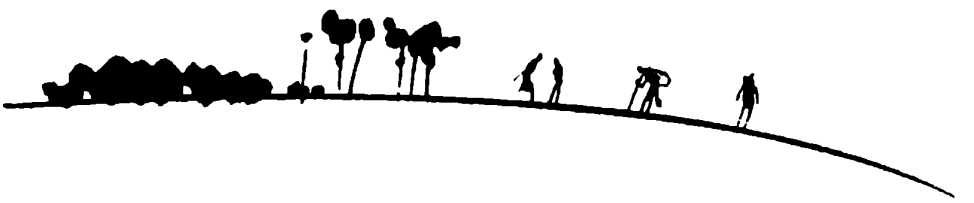

'তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি,
সেই পুরাতন প্রেম যদি এক কালে
হয়ে আসে দূরস্মৃতি কাহিনি কেবলি—
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে
তবু মনে রেখো...'

মাঝপথেই সুদর্শন রায় বই বন্ধ করলেন। ভাঁজ করা বই পাশের টেবিলের ওপর রেখে পা দুটো ছড়িয়ে দিলেন সামনে। তাঁর মনটা আজ অস্থির। কবিতাও ভালো লাগছে না।

সুদর্শনবাবু যেদিন একটু আগে বাড়ি ফেরেন, হাত মুখ ধুয়ে, পোশাক বদলে সোজা চলে আসেন এই বারান্দায়। দোতলার এই বারান্দাটা সুনন্দাদেবী নিজের মনের মতো করে বানিয়েছিলেন। আর্কিটেক্ট ছেলেটি বাড়ির নকশা দেখানোর পর তিনি নাক কোঁচকালেন।

'ব্যালকনিটা আপনি আর একটু বড়ো করুন ভাই। সাউথের এদিকটা ফাঁকাই থাকবে। আলো বাতাস আসবে।'

ছেলেটি তখনই ইরেজারে পুরোনো দাগ মুছে নকশা বদলিয়ে দেয়। সুনন্দাদেবীর পছন্দ হয় না তাও।

'না, আপনি আরও খানিকটা বাড়ান।'

'ম্যাডাম এতটা! আপনার বেডরুম তো ছোটো হয়ে যাবে।'

'হোক, বাড়িতে একটা ভালো বারান্দা না হলে কেমন হবে? আপনি বাড়িয়েই দিন। চিন্তা করবেন না, ডাক্তারবাবুকে আমি বলে নেবো।'

boierpathshala.blogspot.com

সুদর্শনবাবু শুনে বলেছিলেন, 'ভালোই করেছ নন্দা। বাড়িতে খোলা জায়গা বড়ো থাকা দরকার। ছাদ, বারান্দা বড়ো না হলে মন বড়ো হয় না।'

সুনন্দা বললেন, 'রাখো তোমার মনের ডাক্তারি। ওটা হবে আমাদের দুজনের বসার জায়গা। সকালে বিকেল বসে চা খাব।'

সুদর্শনবাবু হেসে বললেন, 'বসে চা! বসে চা খাওয়ার সময় কোথায় আমার?'

সুনন্দাদেবী রাগ দেখালেন, 'তোমায় খেতে হবে না, আমি একাই খাব। দ্যাখো না কেমন সুন্দর করে সাজাই। তখন চাইলেও ওখানে পা দিতে দেবো না।'

আলাদা করে সাজাতে হল না। তৈরি হওয়ার পর দেখা গেল, বারান্দা আলো, বাতাস আর সামনে বড়ো কৃষ্ণচূড়া গাছটা নিয়ে নিজেই সেজে নিয়েছে। তার ওপর চলল সুনন্দাদেবীর ফিনিশিং টাচ। হ্যান্ডিক্র্যাফটস মেলা থেকে বেতের চেয়ার কেনা হল। ক্যানিং স্ট্রিট থেকে আলোর শেড। শেডটা কিনতে অনেক ঘোরাঘুরি হয়েছিল। কোনোটাই নাকি মনে ধরে না। শেষ পর্যন্ত গলির মধ্যে একটা ছোটো দোকানে পাওয়া গেল। সত্যি শেডটা দারুণ। ঠিক যেন পাখির দুটো ডানা! সাদা আলো বুকের মধ্যে নিয়ে দেয়ালে লেগে আছে।

এখানেই শেষ নয়, এন্টালির রথের মেলা থেকে বোগেনভিলিয়া এনে লাগানো হল বারান্দার ঠিক নীচটাতে। হলুদ বোগেনভিলিয়া। যে-ছেলেটা গাছ নিয়ে বসেছিল, সে তো লম্বা চওড়া দাম হেঁকে বসল। সুনন্দাদেবী আঁতকে উঠে বললেন, 'বল কী! সামান্য একটা বোগেনভিলিয়ার এত দাম!'

গাছওলা হেসে বলল, 'হলুদ ফুল দেবে দিদি, হলুদের ওপর সাদা ছিটছিট। গাছের দাম নাই, এই সাদা ছিটের জন্যই দাম।'

মাটিতে পুঁতে বোগেনভিলিয়া সুতলি দড়ি দিয়ে টেনে তোলা হল বারান্দার কার্নিশ বরাবর। সেই গাছ বড়ো হল। দেয়াল বেয়ে উঠে বারান্দায় উঁকি দিল।

একদিন সুদর্শন রায়ের চেম্বারে ফোন। তখনও মোবাইল আসেনি।

'কী হয়েছে?'

সুনন্দাদেবীর উচ্ছ্বসিত গলা—'ফুল হয়েছে।'

'ফুল!'

'হ্যাঁ গো বোগেনভিলিয়াটায় ফুল এসেছে। তুমি কখন আসছ? আজ তাড়াতাড়ি আসবে। তোমাকে ফুল দেখাব।'

সুদর্শনাবুর আসতে রাত এগারোটা পার হয়ে গিয়েছিল। জামা-টামা না

boierpathshala.blogspot.com

বদলেই আগে টর্চ জ্বেলে বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে ফুল দেখা হল। সত্যি ফুল এসেছে। তবে হলুদ, সাদা ছিটছিটের ফুল নয়। ফুলের রং গাঢ় বেগুনি।

সুদর্শনবাবু হেসে বললেন, 'ওই ছেলের গাছের দাম আরও বেশি নেওয়া উচিত ছিল। হলুদের থেকে মনে হচ্ছে এই রং বেশি সুন্দর।'

সুনন্দা তাও খানিকটা খুঁতখুঁত করেছিল।

'তা বলে, লোকটা মিথ্যে বলবে?'

সুদর্শনবাবু বললেন, 'আহ, মিথ্যে কেন ধরছ, হয়তো সে হলুদ ফুলই দিয়েছিল, গাছের মনে হয়েছে, এই বারান্দায় বেগুনিই বেশি মানাবে। তাই বেগুনি দিয়েছে। গাছপালা, প্রকৃতি নিজের মর্জিমতো চলে।'

সুনন্দাদেবী রেগে বললেন, 'তোমার সবটাতেই ঠাট্টা।'

সেই গাছ বহু বছর বেঁচেছিল।

আজ সুনন্দা নেই, কিন্তু বারান্দার সাজ নষ্ট হয়নি। কথাকলি নিজে দেখাশোনা করে। ক-দিন আগে মেয়েটা প্লাস্টিকের ব্যাগে একটা গাছ নিয়ে উপস্থিত। এখন এন্টালিতে মেলা বসে না। হলুদ বোগেনভিলিয়ার খোঁজে সে আলিপুরের নার্সারি পর্যন্ত হানা দিয়েছে। গাছ পাওয়া গেছে, দামও বেশি। পুরোনো জায়গাতেই গাছ পোঁতা হয়েছে। দড়ি দিয়ে মাথা তুলে দেওয়া হয়েছে ওপরে। সুদর্শনবাবুর স্থির বিশ্বাস, কলিও একদিন চেম্বারে ফোন করে ডাকবে। বলবে, 'বাবা, ফুল হয়েছে, তুমি তাড়াতাড়ি এসো।' সুদর্শনবাবু ঠিক করে রেখেছেন, সেদিনও রাত করে ফিরবেন। কাজ না থাকলেও বসে থাকবেন। তারপর রাতে টর্চ জ্বেলে ফুল দেখা হবে। দেখা যাবে, ফুলের রং এবারও হলুদ নয়, বেগুনি। গাঢ় বেগুনি! দারুণ হবে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে সুদর্শন রায় বুঝতে পারলেন, মনের অস্থিরতা বাড়ছে। কবিতাতেও মন বসছে না। অথচ মনোবিজ্ঞানের পরে কবিতাই তাঁর সবথেকে প্রিয় বিষয়। একটা সময় ছিল যখন কবিতা না পড়ে তিনি রাতে শুতে যেতেন না। সুনন্দাদেবী রাগারাগি করতেন।

'কী হল তোমার? রাতদুপুরে কী শুরু করলে বল তো? আলো নেভাবে না?'

সুদর্শনবাবু বই থেকে মুখ না তুলে বলতেন, 'প্লিজ আর একটুখানি, কয়েকটা লাইন। তুমিও শোন না। শুনবে?'

সুনন্দা পাশ ফিরে রাগ দেখিয়ে বলতেন, 'থাক, অনেক হয়েছে। আমি তোমার পেশেন্ট নই যে মাঝরাতে কবিতা শুনব।'

boierpathshala.blogspot.com

সুদর্শনবাবু স্ত্রী-র বারণ শুনতে পেতেন না। তিনি খাটে বসেই আবৃত্তি শুরু করতেন—

'...একদিন এ-জীবন সত্য ছিল, শিশিরের মতো স্বচ্ছতায়;
কোনো নীল নতুন সাগরে
ছিলাম—তুমিও ছিলে ঝিনুকের ঘরে
সেই জোড়া মুক্তো মিথ্যে বন্দর বিকিয়ে গেল হায়...।'

'শুনব না' বলেও সুনন্দা মুখ লুকিয়ে স্বামীর আবৃত্তি শুনতেন। মনে মনে ভাবতেন, পাগলের ডাক্তার না নিজেই একটা পাগল! তাই হবে। নইলে রাতদুপুরে এই কাণ্ড! ভেবে আনন্দ পেতেন। বুকের ভেতর তৃপ্তি হত। ডাক্তারের সঙ্গে যখন সম্বন্ধ হয়েছিল, সুনন্দা মুখ বেঁকিয়েছিলেন। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র মানেই কাঠখোট্টা। হয় ছুরি কাঁচি, নয় হাতুড়ি পেরেক। ডাক্তার হলে বেশি সর্বনাশ। খালি টাকার পিছনে ছোটা আর কঙ্কাল নিয়ে কারবার। বাবা বলেছিলেন, 'আরে বাবা, এ-ছেলে সেরকম নয়। সাইকিয়াট্রিস্ট। মন নিয়ে কাজ।'

'তাহলে তো আরও খারাপ বাবা। এমনি ডাক্তার শরীরের কঙ্কাল দেখে আর এ দেখবে মনের কঙ্কাল। তোমাদের জন্য মন কেমন করলে বলবে, ও কিছু নয়। অ্যাড্রিনলিনে সিক্রেশন কম হচ্ছে, তুমি বরং ডিনারের পর একটা ট্যাবলেট খাও।'

বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন।

'তাহলে তুই কী চাস। কেমন বর হলে তুই খুশি নন্দা?'

'মানুষ বর।'

'ডাক্তার কি মানুষ নয়?'

সুনন্দা ঝগড়ার গলায় বলেছিলেন, 'মানুষ, তবে বেশি মানুষ। আমার বেশি মানুষ পছন্দ নয়।'

এইরকম একটা সময় আলোচনার মধ্যে সুনন্দাদেবীর মা ঢুকে পড়েন। তবে যুক্তিতর্ক নিয়ে নয়, তিনি ঢোকেন ধমক নিয়ে। মেয়েকে ধমক দিয়ে বলেন, 'বেশি পাকামো না করে বিয়ের জন্য রেডি হও। আজ বিকেলে গয়নার ওখানে যাব। কানেরটা আমার পছন্দ হচ্ছে না, ওটা ভাঙিয়ে বড়ো একটা কিছু করতে হবে।'

দুঃখ নয়, তবে মনটা একটু থমকে রইল সুনন্দার। সত্যি তো স্বামী কেমন হবে? গম্ভীর? রাগি? সাত কথাতেও উত্তর দেবে না? বেশি বললে ধমক দেবে? তবে এই থমকে যাওয়া মনটা স্থায়ী ছিল মাত্র ফুলশয্যার রাত পর্যন্ত। তারপরেই

boierpathshala.blogspot.com

অন্যরকম। ফুলশয্যার রাতেই মনোরোগ চিকিৎসক তার নবপরিণীতা স্ত্রীকে চমকে দিলেন।

'এসো আমরা কবিতা পড়ি।'

'কবিতা!' সুনন্দা খাটের ওপর বসে ছিলেন মুখ নামিয়ে। দুটো হাঁটুর ওপর মুখ রেখে। স্বামীর কথায় চমকে মুখ তুললেন। মানুষটা বলে কী!

সুদর্শন স্মিত হেসে বলেছিলেন, 'কেন কবিতা তোমার ভালো লাগে না।'

'না মানে...আপনি!'

সুনন্দার চোখে বিস্ময়, গলায় বিস্ময়।

সুদর্শন হাসলেন। ঘরের তাকে রাখা বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে বললেন, 'কেন ডাক্তার কবিতা জানতে পারে না বুঝি?'

সুনন্দা লজ্জা পেল। তাড়াতাড়ি বলল, 'সে-কথা বলিনি, আপনি বুঝি কবিতাও লেখেন?'

'কবিতা সবাই লেখে। কেউ কাগজেকলমে, কেউ মনে মনে। তফাত একটাই, যে লেখে না সে বেচারি জানতে পারে না যে নিজেও একজন কবি।'

সুনন্দা মুগ্ধ গলায় বলল, 'আর আপনি?'

সুদর্শন তাক থেকে একটা পাতলা বই বের করে পাতা উলটোতে উলটোতে খাটের কাছে এলেন। হেসে বললেন, 'আমি কলমেও লিখি না, মনেও লিখি না। শুধু পড়ি। আচ্ছা বলো তো এটা কেমন?'

সুনন্দাদেবীর ঘোর লাগে। স্বামীর মুখে এত সুন্দর কথা! তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

নীচু গলায় সুদর্শন রায় পড়তে থাকেন—

'দেখা যায় একা একা অঘ্রানের জ্যোৎস্নায় আমি ও বকুল,
বকুলের ফাঁকটির চারধারে সরু সরু পাপড়ি ছড়ানো
অতি সোজা শাদা কথা যেন অবশিষ্টরূপে প'ড়ে আছে তবু—
তবু এ তো ডাল নয়, তবু এ তো পাতা নয়, এ হলো বকুল।'

পড়া শেষ হলে তিনি স্ত্রী-র চিবুকে আলতো হাত রাখেন। সুন্দর মুখখানা যত্নে তুলে ফিসফিস করে বলেন, 'বকুল, আমার বকুল...।'

সুনন্দা লজ্জা পান। খুবই লজ্জা পান। এতটাই লজ্জা যে স্বামীর করতল থেকে মুখ সরিয়ে নিতে ভুলে যান। নিজেকে সমর্পণ করেন।

এরপর থেকেই সুনন্দাদেবীর ধারণা বদলে যায়। ডাক্তার মানেই যে ছুরি কাঁচি আর ট্যাবলেট ক্যাপসুল নয় বুঝতে পারেন। অন্তত তার মানুষটা

boierpathshala.blogspot.com

অন্যরকম। কথাটা বললে সুদর্শনবাবু মিটিমিটি হাসতেন।

'আমার তো খুব ভয় করত বাপু।'

'ভয়! কীসের ভয়?'

'কীসের ভয় আবার, ডাক্তারবদ্যিদের সংসার হয় না। খালি কাজ, কাজ আর কাজ। আর সে-কাজের ধরনধারনও বিচ্ছিরি।'

সুদর্শনবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'বিচ্ছিরি!'

সুনন্দাদেবী বললেন, 'ওমা, বিচ্ছিরি নয়, জানো শিখার দিদির কী কাণ্ড হয়েছিল?'

'শিখা কে?'

'আমার বন্ধু। বেচারির বিয়ে হল আমার মতো, ডাক্তারের সঙ্গে।'

সুদর্শনবাবু হাসি লুকিয়ে বললেন, 'বেচারি! কেন বেচারি কেন? রাতে উঠে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেশার মাপত নাকি?'

সুনন্দাদেবী চোখ পাকিয়ে বললেন, 'না, প্রেশার মাপত না, ফোন আসত। সে ছিল বাচ্চার ডাক্তার। মাঝরাতে ফোন করত মায়েরা। ডাক্তারবাবু, বাবু খেতে চাইছে না। সেই সন্ধে থেকে চেষ্টা চালাচ্ছি। দুধে কি আর একটু জল দেব? ক-স্পুন দেব? দুই? তিন? বোঝো কাণ্ড। শিখার দিদি তো রাগ করে একবার বাপের বাড়ি পর্যন্ত চলে এল।'

সুদর্শনবাবু গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগলেন।

'ভাগ্যিস বাচ্চাদের ডাক্তার হইনি। হলে আমারও মাঝরাতে ফোন আসত। আমার পেশেন্টরা রাতে ঘুমোয়। না ঘুমোলেও অন্তত ফোন করে না।'

সুনন্দাদেবী ফোঁস করে বললেন, 'করলে আমিও পালাতাম।'

দু-দিন পরেই ফোন বাজল। তখন রাত ক-টা? একটার একটু এদিক-ওদিক। শুয়ে শুয়েই হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুললেন সুদর্শন।

'ডাক্তারবাবু, আমি অর্কপ্রভ। অর্কপ্রভ সেন। চিনতে পারছেন?'

সদ্য ঘুম ভাঙার কারণে সুদর্শনবাবু প্রথমটায় কিছুই বুঝতে পারলেন না। জড়ানো গলায় বললেন, 'বলুন।'

'ডাক্তারবাবু চিনতে পারছেন না? আমি আপনার পেশেন্ট। পরশুদিন যে গিয়েছিলাম। প্রেসক্রিপশন দেখে ফোন করছি।'

মাঝরাতে 'পরশুদিন গিয়েছিলাম' বললে ডাক্তারের পক্ষে রোগী চেনা মুশকিল। পরশুদিন অনেকেই গিয়েছিল। তবু পেশেন্ট শুনে সুদর্শনাবু নরম গলায় বললেন, 'বলুন অর্কপ্রভবাবু, কী হয়েছে?'

boierpathshala.blogspot.com

ওপাশের মানুষটা নিজের নাম শুনে স্বস্তি পেল যেন। গলা নামিয়ে বলল, 'একটা সমস্যা হয়েছে বলে এত রাতে আপনাকে ফোন করছি। দুঃখিত, কিছু মনে করবেন না।'

'কী সমস্যা?'

'বড়ো কিছু নয়, ছোটো প্রবলেম।'

সুদর্শন রায় এবার অধৈর্য হলেন। গলার আওয়াজে তাঁর খানিকটা সন্দেহও হল। তিনি শান্ত গলায় বললেন, 'অর্কপ্রভবাবু, আপনার আশেপাশে বাড়ির কেউ আছে?'

'খেপেছেন? বাড়ির কেউ থাকলে আপনাকে ফোন করতে দিত? সবাই ঘুমোচ্ছে, লুকিয়ে লুকিয়ে ফোন করছি।'

সুদর্শনবাবু পাশ ফিরে দেখলেন, সুনন্দার ঘুম ভেঙে গেছে। সে শুয়ে আছে চোখ খুলে।

'ঠিক আছে বলুন।'

ওপাশের মানুষটি শান্ত গলায় বলল, 'ডাক্তারবাবু, খানিকক্ষণ আগে আমি মারা গেছি। আমাকে খুন করা হয়েছে। জলে বিষ মিশিয়ে খুন।'

এতক্ষণে সুদর্শনবাবুর মনে পড়ল। এই পেশেন্ট সত্যি এসেছিল, তবে পরশু না তার আগের দিন এসেছিল সেটা মনে পড়ছে না।

'রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর বাথরুমে গেলাম। ফিরে এসে জল খেলাম। রোজই খাই। এক গ্লাস ঠান্ডা জল না খেয়ে ঘুমোতে পারি না। পেটে গ্যাসের মতো হয়। তবে আজ পুরোটা খেতে পারলাম না। আধ গ্লাস মতো খেলাম। জল খেতে খেতেই বুকে ব্যথা উঠল। বেশি ব্যথা নয়, মাঝারি ধরনের ব্যথা। হাত পা ঝিমঝিম করতে লাগল। আমি বিছানায় গিয়ে বসলাম, বুঝতে পারলাম কোলাপস করছি। করলামও। মিনিট দশেকের মধ্যে ফিনিশ। হাত থেকে গ্লাসটা পড়ে চুরচুর করে ভেঙে গেছে। আমার কথা যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তাহলে এসে দেখতেও পারেন। ঘরে কাচের টুকরো ছড়ানো আছে। আপনি না আসা পর্যন্ত আমি পরিষ্কার করতে দেব না। এটা আমার খুনের এভিডেন্স।'

সুদর্শনবাবু ক্লান্ত গলায় বললেন, 'ঠিক আছে অর্কপ্রভবাবু, আজকের রাতটা বাদ দিন, কালই আমি একটা কিছু ব্যবস্থা করব। এখন টেলিফোন ছেড়ে শুয়ে পড়ুন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ডক্টর, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এই খুনের পিছনে কারা জড়িত। অনেকদিন ধরেই চক্রান্ত চলছিল...।'

boierpathshala.blogspot.com

সুদর্শনবাবু রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

সুনন্দাদেবী বললেন, 'কে ফোন করেছিল? বিপদ কিছু?'

সুদর্শনবাবু আড়মোড়া ভেঙে বললেন, 'না, বিপদ নয় মারা গেছে।'

সুনন্দাদেবী শোয়া অবস্থা থেকে মাথাটা তুললেন।

'মারা গেছে! কে?'

'যিনি ফোন করেছিলেন তিনি নিজে। বললেন, তাকে জলে বিষ মিশিয়ে খুন করা হয়েছে।'

বিয়ের মাত্র অল্প ক-টা দিন হয়েছে, স্বামীর এ-কথার মানে বুঝতে পারলেন না সুনন্দাদেবী। তিনি ধড়ফড় করে উঠে বসলেন।

'কী বলছ হাবিজাবি! মারা গেছে তবু ফোন করছে?'

ঘরে নাইট ল্যাম্প জ্বলছিল। আবছা আলোতেই সুদর্শনবাবু স্ত্রী-র দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে বলল, 'তোমার শিখার দিদির হাজব্যান্ডকে মাঝরাতে বাচ্চার মায়েরা ফোন করে, আমাকে করে মৃত মানুষ। ডেড ম্যান।'

সুনন্দাদেবী স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'কী যা-তা বকছ, আমার ভয় করছে।'

'ভয়ের কিছু নেই নন্দা। এটা একটা অসুখ। একরকমের স্কিৎজোফ্রেনিয়া। সন্দেহের রোগ। প্যারানয়েড স্কিৎজোফ্রেনিয়া। প্যারানয়েড ডাউটও বলতে পারো। দীর্ঘদিন পেশেন্ট সন্দেহ করছিল তাকে বাড়ির লোক খুন করার জন্য চক্রান্ত করছে, আজ মনে করছে সত্যি সত্যি খুন করে ফেলেছে। এই সন্দেহের কোনো ভিত্তি নেই। কল্পনা থেকে তৈরি। অনেকক্ষেত্রে রোগীর কাছে কল্পনা আর সত্যির মধ্যে ডিফারেন্স থাকে না, এলোমেলো হয়ে যায়।'

সুনন্দা উত্তেজিত গলায় বললেন, 'তোমার লেকচার থামাও দেখি। মাঝরাতে মরা মানুষ ফোন করছে আর উনি লেকচার শুরু করলেন। কাল থেকে তুমি ফোন নামিয়ে শোবে।'

সুদর্শনবাবু স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'তা কী করে হবে? চিকিৎসক তো শুধু তার স্ত্রী-র বন্ধু নয়, বিপদে পড়া মানুষেরও বন্ধু। তাই না?'

'ঠিক আছে, তুমি রাত জেগে মরা মানুষের সঙ্গে গল্প কর, আমি বাবার ওখানে চলে যাব।'

সুদর্শনবাবু আকাশের দিকে তাকালেন। বিকেলের আলো পুরোটা ফুরোয়নি, চারপাশে কিছুটা রয়ে রয়ে গেছে। সল্টলেকের এদিকটা এখনও নির্জন। ছোটো ছোটো সুন্দর বাড়িঘরের গায়ে সবুজ গাছপালা। বারান্দায় বসে অনেকটা দূর

boierpathshala.blogspot.com

পর্যন্ত দেখা যায়। কাজের চাপ, স্ত্রী-র মৃত্যু, কথাকলির ফিরে আসার মতো ঘটনায় সুদর্শনবাবুর কাব্যচর্চা কমেছে, কিন্তু ছাড়তে পারেননি। এখন কোনো কোনো বিষণ্ণ বেলায় ব্যস্ত মানুষটাকে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ হাতে নিয়ে বসে আছেন। ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে ভুল করে স্ত্রীকে খোঁজেন। মন ভারী হয়ে আসে। একবার ভাবেন মেয়েটাকে ডেকে তুলি। দুজনে মিলে গল্প করে মনটা যদি ঠিক হয়। পরক্ষণেই ভাবেন, থাক, কে জানে কলি কত রাত পর্যন্ত জেগে ছিল। নিঃশব্দে স্টাডিতে চলে আসেন। এলোমেলো হাতে র‍্যাক ঘাঁটেন। তারপর একসময় আপনমনে পড়তে থাকেন—

'বাহির হতে দেখ না এমন করে,
আমার দেখ না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না...।'

বাইরে আলো ফোটে। কথাকলি ঘুম ভেঙে এসে চুপিসাড়ে দাঁড়ায় দরজার পাশে। প্রৌঢ়ে পা রাখা মানুষটা বুঝতেও পারেন না। তিনি পড়তেই থাকেন—

'... যে গন্ধ কাঁপে ফুলের বুকের কাছে,
ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে...।'

একসময় কলি ফিসফিস করে ডাকে—'বাবা।'

সুদর্শন রায় আজ ক্লিনিক থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন খানিক আগে। ফিরে এসে গীতাঞ্জলি খুলে বারান্দায় বসেছিলেন। কিন্তু মন চাইছে না। আজকাল মাঝেমধ্যে এরকম হচ্ছে, সুনন্দার কথা মনে পড়ে, মেয়েটার জন্য চিন্তা হয়। বয়স বাড়ছে, শরীরটা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। মেয়ের সামনে এসব তিনি কিছুতেই প্রকাশ করেন না। যতটা সম্ভব লুকিয়ে রাখেন। একেই মেয়েটার নিজের অবস্থা ভালো নয়। কাজকর্ম নিয়ে তাও বিপর্যয় খানিকটা সামলে উঠতে চেষ্টা করছে, এরপর যদি আবার বাবার সমস্যা শোনে তাহলে ভেঙে পড়বে। তবে আজকের মনের অস্বস্তির কারণ সম্পূর্ণ অন্য। রোগী দেখার পর মাথার ভেতর সেই রোগীকে নিয়ে বয়ে বেড়ানোর বয়স অনেকদিনই পেরিয়ে এসেছেন তিনি। একই ভাবে বানেরহাটের লোকটাকে বানেরহাটেই রেখে এসেছিলেন। কী যেন নাম? কী যেন? মনে পড়েছে, নিতাই। কেসটা অতি সহজ। এতই সহজ যে ওষুধ পর্যন্ত দিতে হয়নি। কিন্তু আজ সকাল থেকে মনের ভেতর খচখচানি শুরু হয়েছে। কোনো কারণ নেই, হঠাৎ শুরু হল। সুদর্শনবাবু একশোভাগ নিশ্চিত

boierpathshala.blogspot.com

ডায়াগনোসিসে কোনো ভুল হয়নি। রোগ মেয়েটার নয়, রোগ তার বাবা-মায়েরই। রোগ নয়, উদ্‌বেগ। অকারণ উদ্‌বেগ। উদ্‌বেগটা একজনের হলে সমস্যা হত। এখানে তাও নয়। কয়েকটা কো-ইনসিডেনসের ওপর দাঁড়িয়ে দুজনেই ভয় পাচ্ছে। তবু কেন জানি অস্বস্তিটা মাথা থেকে যাচ্ছে না। কেন?

মাথা ঠান্ডা করে সুদর্শনবাবু সোজা হয়ে বসলেন। না, এ-জিনিস প্রশ্রয় দেওয়ার কোনো কারণ নেই। একজন গ্রাম্য, অশিক্ষিত, সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ এসে নিজের মেয়ে সম্পর্কে কী দু-চারটে গালগল্প করল তা নিয়ে উথালপাতাল ভাবতে বসার কোনো যুক্তি নেই। হতে পারে মনটা আজ কোনো কারণে দুর্বল হয়ে আছে। দুর্বল মনে যুক্তিহীন চিন্তা বেশি হয়।

মনকে শান্ত করার জন্য বন্ধ-করা-বইটা আবার কোলের ওপর টেনে নিলেন সুদর্শন রায়। পাতা উলটোতে গিয়ে দেখলেন, লাভ নেই। পড়া যাচ্ছে না। আকাশের আলো শুধু নিজে চলে যায়নি, ফেলে যাওয়া বাকি আলোটুকু কুড়িয়ে নিয়ে গেছে।

চুপ করে অনেকক্ষণ বসে রইলেন সুদর্শনবাবু। থাকতে থাকতেই একসময় তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল—আচ্ছা, মানুষ কি সত্যি সত্যি আগাম নিজের বিপদ বুঝতে পারে না? জীবজগতের কেউ কি পারে? পশুপাখি? কীটপতঙ্গ? কেউ?

সুদর্শনবাবুর মন আবার অশান্ত হয়ে উঠল। তিনি উঠে পড়লেন।

boierpathshala.blogspot.com

আট

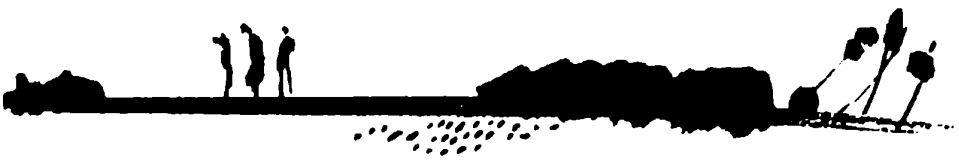

বনানীর দুটো হাতই ব্যস্ত।

তার ডান হাতে একটা কলা। বড়ো সাইজের মর্তমান কলা। সেই কলার আদ্দেক খোসা ছাড়ানো। ছাড়ানো খোসা পাপড়ির মতো পাশে নুয়ে পড়ে আছে। বাঁ হাতটা চড়ের ভঙ্গিতে মাথার ওপর তোলা। দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, ওই হাত যে-কোনো সময় নেমে আসতে পারে। নেমে এসেছেও।

মেঝের ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছে পাঁচ বছরের অর্ক। অর্কর চেহারার মধ্যে একটা নাদুসনুদুস ভাব। হাফ প্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জিতে সেই ভাব আরও চমৎকার ফুটে উঠেছে। এই ধরনের মিষ্টি চেহারার বাচ্চাদের হাসিখুশিতে ভারি মানায়।

অর্ক হাসছে না। সে কাঁদছে। তার দু-গাল দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। পড়বারই কথা। তার মা ইতিমধ্যে তার পিঠে দুটো চড় দিয়েছে। আরও লাগাবে বলে মাথার ওপর হাত তুলে তৈরি হয়ে আছে। অর্ক মুখ এগিয়ে মায়ের ধরে থাকা কলার ডগায় কামড় দিল। অর্কর খুদে খুদে দাঁতগুলোও সুন্দর। মুক্তোর মতো। মায়ের মতো দাঁত পেয়েছে সে।

বনানী চোখ পাকিয়ে নিজের সুন্দর দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'ও কী! ও কেমন খাওয়া হল? অ্যাঁ, কেমন হল? বড়ো করে কামড় দিতে জানো না? দুষ্টুমি করতে পারো, ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে পারো, কলায় কামড় দিতে পারো না? এবার কান ধরে খাওয়াব।'

অর্ক মুখে নেওয়া কলার টুকরো কোঁত করে গিলে ফুঁপিয়ে ওঠে। কান্নার সর্দি টেনে বলে, 'মা, আর খাব না।'

boierpathshala.blogspot.com

বনানী চোখ পাকিয়ে বলল, 'তোমার ঘাড় খাবে। তোমার চোদ্দপুরুষ খাবে। কলা শেষ করে পেঁপে খাবে। তারপর মুসোম্বির রস খাবে। তোমার দিদা রান্নাঘরে পাকা পেঁপে কাটছে। নাও, নাও বলছি।'

মায়ের ধমকে অর্ক ফুঁপিয়ে উঠল। হাত তুলে চোখের জল মুছল। ছোটোরা চোখের জল মোছার কায়দা জানে না। ছোটো ছোটো আঙুল দিয়ে ধেবড়ে দেয়। সারামুখে তখন কান্না মাখামাখি হয়ে যায়। অর্করও হল। এক মুখ কান্না মেখে ভয়ে ভয়ে সে কলায় আবার কামড় দিল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে কলা নয়, সে উচ্ছে খাচ্ছে। বনানী চড়ের হাত নামিয়ে কলার খোসা আরও নামাল।

অর্ক প্রতিদিনই ভাবে কান্নাকাটিতে মায়ের নিষ্ঠুর মন গলবে। খাওয়ানো বন্ধ করে মা বলবে, 'যাও, আর খেতে হবে না। মুখ মুছে এবার খেলা কর গিয়ে।' কিন্তু তা হয় না। তার মায়ের মন গলে না। ছেলে খাওয়ানোর ব্যাপারে বনানীর মন হল ইস্পাত-কঠিন মন। কোনোরকম নড়চড় সে বরদাস্ত করে না। ছেলে যদি কেঁদে ঘর ভাসিয়েও ফেলে তাহলেও তার কিছু এসে যায় না। সে সেই জলে ভাসতে ভাসতেই ছেলেকে খাওয়াবে।

অর্কর খাওয়া কাঁটায় কাঁটায় নির্দিষ্ট। খাবারও নির্দিষ্ট। সকালে দুধ-কর্নফ্লেক্স দিয়ে শুরু, ডিনারে পুডিং কার্স্টাড দিয়ে শেষ। সকালের আগেও ব্যবস্থা আছে। ভোররাতে ঘুম থেকে তুলে ছাতুর শরবত। একইভাবে রাতেও আছে ডিনারের পর ফিনিশিং টাচ। ঠিক বারোটায় এক কাপ গরম দুধে দু-চামচ চকোলেট ফেলে সেই ফিনিশিং টাচ দেওয়া হয়। ঘুমন্ত ছেলেকে টেনে বসিয়ে মুখের সামনে এক হাতে কাপ, অন্য হাতে শক্ত করে ঘাড় ধরা হয়। দিন-রাতের একটা বড়ো সময় ছেলে খাওয়ানোর জন্য ধরে রেখেছে বনানী। সে জানে ছেলের জন্ম দেওয়া সহজ, কিন্তু সেই ছেলেকে মানুষ করা সহজ কথা নয়। 'মানুষ' হওয়ার মূলমন্ত্র লুকিয়ে আছে খাদ্য খাদ্যে। খাবার শুধু শরীরের পুষ্টি নয়, মনেরও পুষ্টি। ছেলে বড়ো হবে, লেখাপড়া শিখবে, দশজনের একজন হবে—কিন্তু হবে কী করে? আকাশ থেকে? বুদ্ধি কি আকাশে ঝোলে যে গাছ থেকে আম পাড়ার মতো টপাটপ পেড়ে মাথায় ঢুকিয়ে পরীক্ষা হলে যাবে? লিকপিকে শরীর নিয়ে কে কবে অফিসার, ম্যানেজার, প্রফেসর হয়েছে? রোগাভোগা ডাক্তার, চিমসেপানা ইঞ্জিনিয়র, সিঁটকোনো ম্যনেজার দেখা যায়? জীবনে মানুষের মতো মানুষ হয়েছে যারা তাদের একেকজনের চেহারা মূর্তি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ভক্তি শ্রদ্ধা জাগে। অতএব কোনো ছাড় নেই বনানীর। নো কমপ্রোমাইজ। পরে হাত কামড়াতে রাজি নয় সে।

boierpathshala.blogspot.com

আজ অবশ্য নড়চড় হয়েছে, বাপের বাড়িতে আসতে গিয়ে দুপুরের ফ্রুটস্ বাদ গেছে। ট্যাক্সিতে আসতে কোনোরকমে ছানাটুকু খাওয়ানো হয়েছে।

উমাদেবী এক হাতে কাটা পেঁপের প্লেট, অন্য হাতে মুসোম্বি রসের গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। নাতিকে কাঁদতে দেখে ভুরু কোঁচকালেন।

'কী হয়েছে বাবু? কাঁদছ কেন?'

কেন কাঁদছি অর্ক বলতে পারল না, শুধু মুখ ভেটকে বলল, 'দিদু উ উ উ...'

মুখে কলার টুকরো থাকার কারণে সেই কাতর ডাক স্পষ্ট হল না।

বনানী ধমক লাগায়, 'চোপ। একদম চোপ।'

উমাদেবী বললেন, 'আঃ বনি, ছেলেটাকে মিছিমিছি মারধোর করছিস কেন?'

বনানী মায়ের দিকে মুখ তুলে বিস্মিত গলায় বলে, 'মিছিমিছি! মিছিমিছি মারছি? কী বলছ মা? দেখছ না এইটুকু একটা কলা খেতে ক-ঘণ্টা লাগাচ্ছে? দেখতে পাচ্ছ না? এসে থেকে যুদ্ধ শুরু করেছি। এক ঘণ্টা হতে চলল। এদের কী করতে হয় আমার জানা আছে, পিটিয়ে হাড় ভেঙে দিতে হয়।'

উমাদেবী টেবিলের ওপর প্লেট, গ্লাস রেখে গলায় বললেন, 'ছেড়ে দে, যখন ইচ্ছে হবে খাবে। এই তো বাড়িতে ভাত খেয়ে এসেছে। তারপর আবার ট্যাক্সিতে ছানা, ফের ঠেসেঠুসে গেলাচ্ছিস?'

'ছেড়ে দেব! এটা তুমি কী বললে মা? অর্কর চেহারাটা দেখেছ? হাড় গোনা যায়। আমি কাল রাতে ওর পিঠের হাড় গুনেছি। এইভাবে চললে ওর হবে? চলবে? দু-দিন বাদে বড়ো স্কুলে ভর্তির ব্যাপার আছে।'

'ভর্তির সঙ্গে কলা, পেঁপের কী সম্পর্ক?'

উমাদেবীর অবাক হওয়ার কথা নয়। মেয়ের মুখে এই ধরনের কথা তিনি আজ প্রথম শুনছেন না, নাতি জন্মানোর পর থেকেই শুনছেন। তবু তাঁর অবাক ভাব কাটেনি। শুধু অবাক নয়, তাঁর রাগও হয়। টেলিফোন করলেও বেশিরভাগ সময়টা ছেলের খাওয়ার কথা।

'মা, এখন কথা বলতে পারব না, খুব বিপদের মধ্যে আছি।'

'বিপদ! কীসের বিপদ?'

'কীসের আবার, অর্ককে নিয়ে বিপদ। ছেলে বিকেলে ছাদে খেলেধুলে আসার পর খানকতক লুচি ভেজে দিয়েছিলাম। ভাবলাম, ফুলকো লুচি গরম গরম আলুভাজা দিয়ে খেয়ে নেবে।'

boierpathshala.blogspot.com

উমাদেবী টেলিফোনের এ-প্রান্তে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললেন। তিনি মেয়ের বিপদ আঁচ করে নিশ্চিন্ত হলেন।

'বাবু খেল না তো?'

'আর বাবু বাবু কোরো না তো, নাতিকে নিয়ে আদিখ্যেতা থামাও এবার। ইচ্ছে করে টান মেরে বদটার কানদুটো ছিঁড়ে ফেলি। দুটো লুচি খেয়েই বলছে, আর খাব না। বোঝো একবার, বোঝো। মাথায় আগুন ধরে কিনা? সারা বিকেল অত ছোটাছুটি করলি, লাফালাফি করলি, ক্যালরি বলে কি আর তোর শরীরে কিছু বাকি আছে? সব তো ঘাম হয়ে ছাদে পড়ে গেছে। তুই মোটে দুটো লুচি খাবি? তুমি এখন ফোন ছাড়ো মা, আমার বকরবকর করার সময় নেই।'

বাপের বাড়িতে এলেও এক কাণ্ড মেয়ের। উমাদেবী লক্ষ করছেন, ব্যাপারটা যেন বাড়ছে বনানীর। অসুখের মতো।

বনানী মাথা নামিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'ভালো স্কুলে ভর্তির সঙ্গে কলা পেঁপের কী সম্পর্ক যদি জানতে তাহলে তোমার দুই ছেলেমেয়ের এই অবস্থা হত না।'

চেয়ারটাকে ফ্যানের তলায় টেনে এলেন বসলেন উমাদেবী।

'কী অবস্থা? কী খারাপ হয়েছে তোদের? ভালো বিয়ে হয়নি তোর? পাড়ার স্কুলে পড়ে সোমনাথই-বা মন্দ কী আছে? নিজের মতো কাজ করছে।'

বনানী ঠোঁটের কোণে বিদ্রুপের হাসি দিয়ে বলল, 'ওটা একটা কাজ? টিভির জন্য মাথামুণ্ডু প্রোগ্রাম তোলা একটা কাজ হল মা? তাও যদি খবর-টবর পড়ত, পর্দায় দেখাত একটা কথা ছিল। দু-পাঁচজনকে বলতে পারতাম। তা দেখাবে কেন? ভাইয়ের অমন খ্যাংরা কাঠির মতো হাত পা।'

উমাদেবী ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন, 'আমিও তোদের দুধ-কলা কম খাওয়াইনি। তবে তোর মতো পাগলামি করিনি। তাছাড়া, তাছাড়া...।'

'তা ছাড়া কী?'

বনানী মায়ের দিকে মুখ ফেরাল। সে ঝগড়ার জন্য প্রস্তুত।

'তা ছাড়া বলতে নেই সোমনাথ বা তোর, দুই ভাই বোনের চেহারা সৌন্দর্য কম কিছু নয়, সোমনাথটা একটু রোগার দিকে হলে কী হবে, দেখতে শুনতে যথেষ্ট সুন্দর। কথাটা আমি যে মা হয়ে বলছি না সেটা তুইও জানিস। আর তোর কথাটাই ধর না। একটার বেশি দুটো সম্বন্ধ দেখতে হয়নি। নির্মলের বাবা-মা একবারেই পছন্দ করেছিল। আশা করি সে-ঘটনা তুই ভুলে যাস নি।'

অর্ক আশা করেছিল, দিদিমার সঙ্গে ঝগড়ার কারণে মা কলার কথা ভুলে

boierpathshala.blogspot.com

গেছে। সে-আশা ব্যর্থ হল। বনানী ছেলের মুখে বাকি কলা ঠুসে দিয়ে উমাদেবীর দিকে ফিরল।

উমাদেবী প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, 'আহা করিস কী? করিস কী? কলার সঙ্গে ছেলেকে তো খোসাও খাইয়ে দিচ্ছিস।'

মায়ের কথায় পাত্তা না দিয়ে বনানী বলল, 'সেই সময় আর এই সময় এক নয় মা। এখন স্কুলে ভর্তির সময় ইন্টারভিউ হয় না। সি এ টি ক্যাট না বি এ টি ব্যাট জিজ্ঞেস করে না।'

'তাহলে কী করে? কলা খেতে বলে?'

'ঠাট্টা কোরো না। বাচ্চাদের এখন প্রথমেই ওয়েট মেশিনে তুলে দেয়।ওজন দেখা হয়।'

উমাদেবী নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, 'ওজন! ঠাট্টা আমি করছি না, তুই করছিস বনি?'

মুখের ভেতর আধখানা কলা নিয়ে গাল ফুলিয়ে আছে অর্ক। বনানী সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'গিলে ফেল শিগগিরই, গিলে ফেল বলছি, নইলে পিঠে কিল মেরে গেলাব। সেই কখন একটু ছানা খেয়েছে, তারপর পেটে এক ফোঁটা দানাপানি নেই আর উনি গাল ফুলিয়ে বসে আছেন।'

বনানী সত্যি সত্যি ডান হাতটা মুঠি পাকাতেই আতঙ্কিত চোখে অর্ক মুখের খাবার গিলে ফেলে।

'আজকাল নামি দামি স্কুলে ছেলেমেয়ের প্রপার ওয়েট না থাকলে অ্যাডমিশন হয় না। ইন্টারভিউই নেবে না তো ভর্তি। আরে বাবা, এখন শরীর স্বাস্থ্য হল সবার আগে। গাদাখানেক খাতা-বই বইতে হবে। তারপর তোমার টেনিস র‍্যাকেট আছে, ক্রিকেট ব্যাট আছে, গানবাজনা করলে গিটার আছে, করলে কেন, করতে তো হবেই, হাজারটা হান্ডি-মান্ডি নিয়ে স্কুল বাসে উঠতে হবে। তোমার প্যাংলা নাতি পারবে?'

মোটাসোটা অর্কর দিকে তাকিয়ে উমাদেবী বললেন, 'না পারলে না পারবে, মুগুর-ভাঁজা-স্কুলে ভর্তির দরকার কী?'

টেবিল থেকে প্লেট টেনে নিল বনানী। তাতে গোলাপি টুকটুকে পেঁপের টুকরো থরে থরে সাজানো। অর্কর ভয়ে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল।

বনানী মুখ দিয়ে 'চুক চুক' আওয়াজ করে বলল, 'হাবিজাবি জায়গায় লেখাপড়া শিখে আজ ভাইয়ের কী দুর্দশা, তুমি আর বাবা বুঝতে না পারো আমি তো বুঝতে পারছি।'

boierpathshala.blogspot.com

'দুর্দশা! সোমনাথের দুর্দশার কী দেখলি বনি? এই তো অফিস যাব না বলে ক-দিন বাড়িতে গড়াল, জ্বর বলে ফোন করে দিল, আজ ওর মালিক বাড়িতে একেবারে লোক পাঠিয়ে ধরে নিয়ে গেছে। দুর্দশায় থাকলে মালিক কখনও বাড়ি থেকে কর্মচারী ধরে নিয়ে যায়? কাজকম্ম জানে বলেই তো করে।'

'রাখ তোমার কাজ। ওই তো টিভির আণ্ডাগণ্ডা কাজ। সিরিয়ালের ডিরেক্টর হত তো বুঝতাম। লোককে বলতাম, বোম্বে গেছে। ওই কাজে তোমার মালিক ধরে নিয়ে গেলেই-বা কী ফেলে রেখে গেলেই-বা কী।'

'সে যে যা ভালোবাসে।'

'তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তুমি কিছুই বুঝতে চাও না। আমি ওই দুর্দশার কথা বলছি না, অন্য দুর্দশার কথা বলছি। ভাইয়ের জন্য সম্বন্ধ খুঁজতে গিয়ে নাজেহাল অবস্থা আমার। কাজের ছিরি শুনে মেয়ের বাপ-মা পালাচ্ছে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত একজন মোটামুটি ঠিক হয়েছে। সেই কথা বলতেই আজ ছুটে এলাম। এবার দেখা-টেখার ব্যাপারগুলো যদি সেরে ফেলা যায়।'

কথা থামিয়ে চামচে পেঁপের টুকরো তুলে ছেলের দিকে বাড়িয়ে ধরল বনানী।

'নে, হাঁ কর।'

অর্ক করুণ চোখে তার দিদিমার দিকে তাকায়। দিদিমা কি বাঁচাতে পারবে? মনে হয় না পারবে।

উমাদেবী আর এই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলেন না। থাকা সম্ভবও নয়। তবে পাত্রীর কথা শুনে তিনি উৎসাহিত হলেন। ছেলের যে এবার একটা বিয়ে দেওয়া দরকার তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই অনুভব করছেন। ছোটো, বড়ো, মেজো, সেজো কাজ যেরকমই করুক, এ-কথাটা ঠিক সোমনাথের মধ্যে একটা হচ্ছে, হবে গোছের ভাব এসেছে। বিছানায় শুয়ে গড়াচ্ছি তো গড়াচ্ছিই, আবার অফিসে কাজ করছি তো করছিই। একদিন, দু-দিন, তিনদিন হয়ে যাচ্ছে বাড়ি ফেরার নাম নেই। ফিরল ভাঁটার মতো বড়ো বড়ো রাত-জাগা চোখ নিয়ে। জিজ্ঞেস করতে বলল, 'এডিটিং-এ বসলে এরকমই হয়। দিনরাত কাজ চলে।'

উমাদেবী বললেন, 'মেয়ে কেমন?'

'ভালো নয়।' বনানী গম্ভীর মুখে জবাব দিল।

'ভালো নয় মানে!' উমাদেবী অবাক হয়ে বললেন, 'ভালো নয় তো দেখার কথা বলছিস কেন?'

'মেয়ে নাকি ভাইয়ের ছাইপাঁশ কাজের কথা শুনে খুবই উৎসাহী হয়ে

boierpathshala.blogspot.com

পড়েছে। এই মেয়েকে আমি কীভাবে ভালো বলব?'

বনানীর ডান হাতের চামচে পেঁপের টুকরো ছেলেবেলার স্পুন মার্বেল রেসের মতো ব্যালান্স করে ধরা। বাঁ-হাতে ছেলের কাঁধ ধরে দু-বার ঝাঁকুনি দিল সে। এটা বনানী মাঝেমধ্যে করে থাকে। ভর্তি কৌটোয় আরও জিনিস পুরতে হলে যেভাবে ঝাঁকুনি দিতে হয় সেই কায়দায় খাওয়ার সময় ছেলেকে ঝাঁকুনি মারে। আগের খাওয়া শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়ার টেকনিক।

উমাদেবী এবার ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'মেয়ে দেখতে শুনতে কেমন? ছবি এনেছিস?'

'এনেছি। তোমার জামাইয়ের এক কলিগের আত্মীয়। সম্পর্কে ভাইঝি না বোনঝি হয়। তোমার জামাই তো চেষ্টা কম করছে না। শালার জন্য ক-জন এমন করে বল?'

বনানীর এটা আরেকটা গুণ, সে নির্লজ্জের মতো স্বামীর প্রশংসা করতে পারে। উমাদেবী প্রশংসা গায়ে মাখলেন না। নির্মল একটা বউ-আঁকড়া-জামাই। বউ হ্যাঁ তো হ্যাঁ, বউ না তো না। ওরকম জামাইয়ের প্রশংসা গায়ে মাখা যায় না। তিনি গলা নামিয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে, তুই আবার সোমনাথকে কিছু বলিসনি তো? সে তো বিয়ের কথা শুনলে হয় খেপে যায় নয় হেসে উড়িয়ে দেয়।'

বনানী ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'খেপেছ? ভাইকে বলে মুখ ঝামটা খাব? তোমার জামাই বলেছে, একেবারে ঠিকঠাক করে তবে বলবে। তুমি তো জানোই মা তোমার জামাইয়ের আর কিছু ভালো না হোক, বুদ্ধি খুব ভালো।'

উমাদেবী খুশি খুশি গলায় বললেন, 'নির্মলের ওপর আমার সবসময়েই খুব ভরসা। আমার তো মাঝেমধ্যে আশ্চর্য লাগে ভেবে যে তোর মতো একটা বোকা মেয়ের সঙ্গে কীভাবে এতদিন সে রয়ে গেল। যাক, তোর ভাইয়ের সত্যি খুব তাড়াতাড়ি একটা বিয়ের ব্যবস্থা করা দরকার বনি। সে নাকি কাল তোর বাবাকে বলেছে, কলকাতার কাজকর্ম ছেড়ে পালাবে।'

'পালাবে!' বনানী মায়ের দিকে মুখ ফেরাল।

'হ্যাঁ, পালাবে। কোথায় নাকি সে কথা বলে নিয়েছে, জয়পুরের কাছে না কোথায় গিয়ে পাহাড় মাপামাপির কাজ করবে। কাজটা পেয়েও গেছে। সেখানে চলে যাবে।'

বনানী চোখ বড়ো করে বলল, 'সমু পাহাড় মাপবে! মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

উমাদেবী চুপ করে রইলেন। কথাটা সত্যি। দু-দিন আগে তাঁর স্বামী রাতে

boierpathshala.blogspot.com

এই ঘটনা জানিয়েছেন।

'মনে হচ্ছে, সমুর কোনো সমস্যা হয়েছে।'

উমাদেবী নির্লিপ্ত গলায় বললেন, 'ওর তো সমস্যা লেগেই আছে। নতুন আর কী হবে?'

'এটা সেরকম নয়, অন্যরকম কিছু। বলছে, টিভি-ফিভি ছেড়ে বাইরে কাজ নিয়ে চলে যাবে। কাজটাও বিদ্‌ঘুটে। পাহাড় মাপা না ভাঙার চাকরি।'

উমাদেবী বালিশের ওয়াড় পালটাচ্ছিলেন। কাজ থামিয়ে বললেন, 'সে আবার কী!'

'কী তো আমি বুঝতে পারিনি। বলেছি, পরে মাথা ঠান্ডা করে কথা বলব।'

উমাদেবী ঠিক করেছিলেন, স্বামীর ওপর বিষয়টা ছাড়বেন না। তিনি নিজেই ছেলের সঙ্গে কথা বলবেন। ঠান্ডা মাথায় নয়, গরম মাথায় বলবেন। যে-ছেলে স্কুল কলেজে বরাবর ভালো রেজাল্ট করে পাথর ভাঙার কেরিয়ার গড়তে চায়, তার সঙ্গে ঠান্ডা মাথায় কথা বলা যায় না। এখন মনে হচ্ছে, কথার থেকে হাতেকলমে ব্যবস্থা নেওয়াটাই উচিত। আর সেই ব্যবস্থা হল বিয়ে। বিয়ে দিয়ে ওই ছেলেকে আটকাতে হবে।

উমাদেবী গজগজ করে মেয়েকে বললেন, 'মাথা খারাপ হয়েছে কিনা জানি না, যা বলছে তাই তোমাকে জানালাম।'

বনানী কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'কবে থেকে পই পই করে তোমাকে বলছি, এবার একটা বিয়ের ব্যবস্থা কর, ব্যবস্থা কর, এখন হল তো?'

বাপের বাড়ির ওপর রাগে দুঃখে বনানী দ্রুত কয়েকটা পেঁপের টুকরো ছেলের মুখে গুঁজে দিল।

উমাদেবী হাত তুলে বললেন, 'আহা করছিস কী? ছেলেটা যে বমি করবে।'

'করুক। করলে আবার খাওয়াব।'

আবার খাবারের কথা শুনে অর্ক দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে আধো আধো গলায় বলল, 'না মা, আমি বমি করব না। সত্যি বলছি করব না।'

বলতে বলতে ঘর ভাসিয়ে বমি করল ছোট্ট অর্ক।

boierpathshala.blogspot.com

নয়

নিয়ম হল, নেতা বসবে ওপরে, দর্শনার্থীরা থাকবে নীচে। নেতা মুখ নামিয়ে তাদের কথা শুনবে। আবেদন, নিবেদন, নালিশ, তোষামোদ শোনার পর ইচ্ছে হলে কিছু বলবে, না হলে বলবে না। একসময় দুম করে উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াহুড়ো দেখিয়ে বলবে, 'আর নয়, আর নয়, বিরাট লেট হয়ে গেছে রে ভাই, বিরাট লেট হয়ে গেছে। জেলায় মিটিং আছে।'

আজকাল পার্টি পলিটিক্সে নেতাদের জেলা মিটিঙের খুব বাড়বাড়ন্ত চলছে। নেতারা সেইসব মিটিঙের কথা বলেনও খুব গর্বের সঙ্গে। শুনলে চট করে আর মুখের ওপর কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। সরে গিয়ে যাওয়ার পথ করে দেয়।

নেতা হলেও মানা সরকারের নিয়ম উলটো।

বাড়ির গেট খুলে ঢুকতেই উঠোনের পাশে তাঁর অফিসঘর। দরমার দেয়াল, টালির ছাদ। ঘরের কোণায় মাটির কুঁজো, বাঁশের গায়ে হ্যারিকেন। একপাশে ডাঁই করা পোস্টার, প্ল্যাকার্ড, পতাকা। অধিকাংশই ছেঁড়া। ঘরের মাঝ বরাবর মেঝেতে মাদুর পাতা। অতি সাধারণ বেতের মাদুর। সকালবেলা মানা সেই মাদুরের ওপর বসেন হাঁটু মুড়ে। দর্শনার্থীদের জন্য আছে চেয়ার, মোড়া, টুল। একপাশে জলচৌকি। ভিড় বাড়ার কারণে দরজার পাশে কাঠের বেঞ্চও লেগেছে দিন কয়েক আগে। ওসব ছেড়ে কেউ নীচে, মেঝেতে বসতে গেলেই মানা হাঁ হাঁ করে ওঠেন।

'আহা, করেন কী? করেন কী? নীচে বসেন কেন? আপনি অতিথি, আপনি বসবেন ওপরে।'

boierpathshala.blogspot.com

গাঁ-গঞ্জের লোক নেতাকে মাটিতে ফেলে ওপরে উঠতে লজ্জা পায়। মানা একরকম ঠেলেঠুলেই তাদের চেয়ার, টুল, চৌকিতে তুলে দেন। তারা বাধ্য হয়ে জড়োসড়ো ভাবে বসে। তবে শরীরের মতো কথাও জড়োসড়ো হয়ে যায়, আদ্দেকটাই গুলিয়ে ফেলে।

দলের ছেলেপুলেরা প্রথম প্রথম বিষয়টা ভালো চোখে দেখেনি। আপত্তি তুলেছিল।

'দাদা, এটা কেমন কথা? আপনি বসবেন মাটিতে, আর বাকিরা সবাই থাকবে আপনার ঘাড়ের ওপর! আমাদের একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার আছে দাদা। আপনি লিডার।'

জবাব না দিয়ে মানা মৃদু হেসেছেন।

ছেলেরা মাথা নেড়ে বলেছে, 'না না দাদা, এটা হতে পারে না। আপনার জন্য কালই চেয়ারের ব্যবস্থা করব। কলকাতা থেকে আনব। চেয়ারের ওপরে গদি থাকবে, তলায় চাকা। আপনি নড়লে চেয়ারও নড়বে। ছোটোলোকগুলার পায়ের কাছে আপনি কেন বসবেন?'

মানা হাত তুলেছেন। ঠান্ডা গলায় বলেছেন, 'শান্ত হ গাধারা, শান্ত হ। মনে রাখবি, মানুষই আসল, লিডার হল নকল। মহামানবদের জীবনী পড়বি, তাঁদের কর্মকাণ্ড জানবি। সারাজীবন ছোটোলোকদের পায়ের কাছে বসে তাঁরা সেবাধর্ম চালিয়েছেন। লেখাপড়া তো কিছু করলি না গাঁইয়া ভূতের দল, করলে জানতে পারতিস, নেতার আসন জনতার মনে। মনের উচ্চ আসনে। আমি যত তাদের পায়ের কাছে বসব মনের আসন তত উচ্চ হবে। অসুবিধে কী?'

'সুবিধে অসুবিধে জানি না দাদা, আমাদের খারাপ লাগে। মনে হয়, ওপরে বসা লোকগুলাকে ধরে ধরে চড় লাগাই। হারামজাদাদের ঘাড় ধরে মাটিতে নামাই টেনে।'

মানা সরকার মুচকি হেসে বললেন, 'ছি ছি, ও-কথা মনেও আনিসনি। ক-দিন যেতে দে, দেখবি কী হয়।'

'কী হবে?'

'দেখবি পাবলিক কেমন ঘাবড়ায়। তোদের মানাদার মাটির গল্প মুখে মুখে ছড়াবে। দশটা গাঁয়ে জানাজানি হবে। লোকে বলবে, বাপরে অত বড়ো লোকটার কোনো ঠাটবাট নাই গো, কেমন মাটির মানুষ দেখ দিকিনি! মাটিতে বসি বলে মাটির মানুষ। গদিতে বসলে হতাম গদির মানুষ। পলিটিক্সে গদির মানুষের কোনো দাম নেই। দাম মাটির মানুষের। এর ওপর আরও একটা মজা আছে।'

boierpathshala.blogspot.com

'মজা! দাদা, এর মধ্যে আপনি মজার কী পেলেন!'

'গাধা, দেখিস না ওপরে বসলে মানুষগুলো কেমন গুটিয়ে যায়। হাতে পায়ে গোটায় আবার চিন্তা-ভাবনাতেও গোটায়। যা বলতে আসে তার বেশিটাই ভুলে যায়। ওপরে বসে ওদের মনে একটা চাপ পড়ে, আমার চাপ কমে। মুখ্যুর দল এসবের কী বুঝবি তোরা? বরং একটা কাজ কর দেখি, আমার মাদুরটা পালটে দে।'

ছেলেরা উৎসাহ নিয়ে বলে, 'দামি কিছু আনব? ফরাশের ব্যবস্থা করি না দাদা? সাদা চাদর পেতে বসবেন। মাটিতে বসাও হল, আবার আরামও হল।'

মানা ধমক দিয়ে বললেন, 'আমি কি ফরাশের কথা বলেছি শুয়ার? নতুন মাদুরটার বদলে একটা পুরোনো ছেঁড়া-টেড়া কিছু হয় কিনা সেই চেষ্টা কর। পলিটিক্সে ছেঁড়া জিনিসের খাতিরই আলাদা। ছেঁড়া ধুতি, ছেঁড়া শাড়ি, ছেঁড়া ব্যাগের মতো আমার হবে ছেঁড়া মাদুর।'

দু-দিনের মধ্যে মাদুর বদল হয়েছে। পুরোনো এই মাদুরের অনেকটাই ছেঁড়া। একদিকে খোঁচা বেরিয়ে আছে ঝাঁটার মতো। মানা সরকার হাসি হাসি মুখে সেই ঝাঁটা-মাদুরে বসেন। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সকলের কথা শোনেন।

আজও বসে আছেন। তবে আজ তিনি অভাব-অভিযোগ শুনছেন না। আজ শুনছেন ধর্মের কথা। এই পরিকল্পনা মানার নিজস্ব। তিনি ঠিক করেছেন, ন-মাসে ছ-মাসে একদিন করে ঘণ্টাখানেক 'চিত্তশুদ্ধি' পালন করা হবে। সেই সময় রাজনীতি নয়, দলাদলি, দাবিদাওয়া নয়, শুধু ভালো ভালো কথা। গীতা, কোরান, বাইবেল থেকে পাঠ। এক-একদিন এক-একটা। ধর্ম শেষ হলে শুরু হবে মনীষীদের জীবনী। স্বামী বিবেকানন্দ থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, মহাত্মা গান্ধি, থেকে বিনয় বাদল দীনেশ। গ্রামের মানুষ মনীষী জীবন থেকে ধর্মে বেশি উৎসাহী। তাই ধর্ম দিয়ে 'চিত্তশুদ্ধি'-র কাজ শুরু হয়েছে।

তবে এখনই যে এই প্রোগ্রাম শুরু হবে, এটা ঠিক ছিল না। ঠিক হয়েছে দুম করে। ক-দিন আগে মানা সরকার জেলা থেকে ফিরলেন সুসংবাদ নিয়ে। সাধারণ সুসংবাদ নয়, অতি সুসংবাদ। দল তাঁকে সামনের পঞ্চায়েতে ইলেকশনে গুনে গুনে তিন গ্রামের ক্যান্ডিডেট বাছাইয়ের ভার দিয়েছে। তিনি যে নাম ঠিক করবেন সেগুলোই ফাইনাল। রাজনীতি কম দিন হল না, চুলে পাক ধরেছে। কলকাতা থেকে রং এনে লাগানোর পরও জুলপিতে দু-পাঁচটা সাদা উঁকি মারে। তবু মানা এতটা আশা করেননি। তিনি চেয়েছিলেন দুই, ভেবেছিলেন পাবেন এক। পেলেন একেবারে তিন! এর অর্থ দুটো। একটা নকল অর্থ, একটা

boierpathshala.blogspot.com

আসল অর্থ। নকল অর্থে দলে ক্ষমতা বৃদ্ধি হল, আর আসলটায় একলপ্তে কয়েক লক্ষ টাকা আয়ের নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা। পলিটিক্সে এক-একটা সময়ে এক-একটা বিজনেস দারুণ চলে। সিজনের ফলের মতো। আমের সময় আম, লেবুর সময় লেবু। ইলেকশনের সময় ক্যান্ডিডেট। এখন আবার বছরভর ইলেকশন। ছোটো, মেজো, সেজো সব আছে। সাইজ বুঝে টাকা। পঞ্চায়েতের মতো খুচখাচেও জেতা সিটে টিকিট পেতে চার থেকে পাঁচ লাখ দিতে আজকাল অনেকে রাজি। সেরকম হলে দর আরও বাড়ে। যেখানে গভর্নমেন্টের জল, কল, রাস্তায় টাকা আসছে সেখানে অ্যামাউন্ট চড়চড়িয়ে বাড়বে। ছয়, সাত পর্যন্ত উঠে যায়। সিট কঠিন হলে দুই-আড়াই লাখ টাকায় বন্দোবস্ত। এমনকী হারা জায়গায় দাঁড়াতে হলেও টাকা। লাখ দিয়ে কথা শুরু। ক্যান্ডিডেট তখন নেতার হাতে পায়ে ধরে। কান্নাকাটি করে বিশ, পঁচিশ হাজার কমায়।

'বাবাগো, ফয়দা তো নাই কিছু। সেই তো হেরে ভূত হব। এত টাকা চায়েন না।'

'তাহলে দাঁড়াও কেন? লোক তো কম নাই গা। বাছা ভোটের জন্য জিব দিয়ে লাল ঝরে কেন?'

'বাবাগো, দাঁড়াই নামডার জন্য। জিতলে যেমন নাম, হারলেও নাম। দেয়ালে লিখব, পোস্টারে ছবি ছাপব, ফেস্টুন হবে। হারার পরও দুটো বছর নামে নামে কেটে যাবে। আপনে অ্যামাউন্ট কমান বাবাগো। গরিবমানুষকে দল না দেখলে দেখবে কে?'

একটু কমালে ক্ষতি হয় না। সবমিলিয়ে ওপরে নীচে দেওয়া-থোওয়ার পরও হাতে অনেকটা থেকে যায়। পার্টিরও তো টাকা লাগে। আসবে কোথা থেকে? শহরের মতো প্রোমোটর তো নেই এখানে।

সেই সুযোগ এখন মানা সরকারের মুঠিতে। ক্ষমতা আর টাকার সুযোগ। ফুরফুরে মেজাজে বাড়ি ফিরেই ছেলেপুলেদের খবর পাঠালেন মানা।

'ব্যবস্থা কর গাধারা। প্রোগ্রাম শুরু হবে। কাল থেকেই হবে। জেলা থেকে হুড়ো দিয়েছে। মানুষের কাছে না গেলে এবার ইলেকশনে পাছায় লাথ খেতে হবে। আমি চিত্তশুদ্ধি নিয়ে মানুষের কাছে যাব।'

এই কারণেই আজ পড়া হচ্ছে গীতা। পঞ্চাননতলার জগদীশকে আনা হয়েছে। জগদীশ একসময় ছিল টোল পণ্ডিত। কলকাতার হাতিবাগানে ঘর ছিল। বুড়ো সাত সকালে আসতে গাঁইগুঁই করল। শেষ পর্যন্ত মানা সরকারের নাম শুনে রাজি হয়েছে, হাতে গীতা নিয়ে বাইকের পিছনে চেপে বসেছে।

boierpathshala.blogspot.com

সেই গীতা পাঠ চলছে। মানা বলে দিয়েছে, 'পণ্ডিতি ফলিও না জগদীশ খুড়ো। এমনভাবে বলবে চারটে মুখ্যুসুখ্যু মানুষ যেন বুঝতে পারে।'

জগদীশের কায়দা ভালো। প্রশ্ন উত্তরে কঠিন শ্লোকের মাহাত্ম্য বোঝাতে ওস্তাদ।

'যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ

পতঙ্গ পরিণাম চিন্তা না করে প্রদীপের আলোকেই সুখের হেতু মনে করে। তা পাবার ব্যাকুলতায় উড়ে গিয়ে পড়ে আগুনে এবং তাপদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে, সেইরূপ অজ্ঞানী মানুষ ভোগকেই সুখের কারণ মনে করে তাতেই লিপ্ত হয়। আর পরিণামে মহা দুঃখ প্রাপ্তি ঘটে। বিষয়সমূহকে সুখের হেতু মনে করে সেগুলি ভোগ করলে আসক্তি বৃদ্ধি পায়। আসক্তি থেকে কাম-ক্রোধাদি অনর্থের উৎপত্তি । ক্রমশ এর থেকে নানা ধরনের দুর্গুণ, দুরাচারের জন্ম। চারিধার দুষ্টে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন হল, এর সাজা কী? উত্তর অতীব সহজ। সাজা ভয়ংকর। জীবন পাপে পূর্ণ হয়ে যায়। ইহলোক এবং পরলোক জ্বালা যন্ত্রণায় ভরে ওঠে। এবার প্রশ্ন— অজ্ঞানী পুরুষ কেন এমন কাজ করে? উত্তর— বিষয় ভোগ অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর আর দুঃখময় ফলদায়ক, বিবেকহীন অজ্ঞানী পুরুষেরা এটি না জেনে এবং মেনে না নিয়েই আসক্তিযুক্ত...।'

একাগ্র চিত্তে গীতার বাণী শুনতে শুনতেই মানা সরকার মনে মনে সম্ভাব্য ক্যান্ডিডেটের নাম ঠিক করতে লাগলেন। মনে মনেই সেই লিস্টে কাটাছেঁড়া চলল। তিন মানে কম করে তেরো জনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। নিলামের মতো। দাম যে বেশি দেবে, টিকিট তার। আগে এই ধরনের কেসে ছেলেপুলেরাই কথা বলত। দরদাম চালাত। আসল লোক থাকত পিছনে। এখন আর ওসব ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। ক-টা হাবিজাবি কথার পরেই কাজের কথা।

'কী খবর ফণী, কাজকাম কেমন চলছে তোমার?'

'কোন কাজ বলচেন দাদা? দলের কাজ? নাকি ব্যবসাপাতির কাজ?'

'সবই বলছি। ব্যবসাও বলছি, দলও বলছি। দল না হলে তোমার ব্যবসা কোথায় বাপু? ব্যবসা না হলে আমার দলই-বা টিকবে কেমন করে?'

ফণী এক হাত জিভ বের করে, হাত কচলে হাসবে।

'হে হে আপনে দাদা সবই জানেন। দল তো মন দিয়ে করলুম, কিন্তু ব্যবসা পেলুম কই?'

এই সময় মাথা নাড়িয়ে বলতে হবে, 'এইটা ফণী ঠিক কথা হল না।

boierpathshala.blogspot.com

গতবার তুমি সাতটা রাস্তা, পাঁচটা কালভার্টের বরাত পেয়েছিলে। পাওনি? আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অর্ডার বের করেছিলুম। ঝামেলা কম হয়নি। কন্ট্রাকটরি তো চিঁড়ের মোয়া নয় বাছা যে বাড়ি বসে গুড় দিয়ে পাকালাম আর হয়ে গেল।'

'আপনের দয়া। দাদা, আপনে গরিবের মা-বাপ। আপনেকে দেখেই তো রাজনীতিতে এসেচি।'

'সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু তুমি করলেটা কী বাপু? সাত রাস্তাই তো এক বর্ষায় ধুয়ে সাফ। সাত সমুদ্দুর বানিয়ে ফেলেছ। ব্রিজগুলোর হাল তো তাকিয়ে দেখা যায় না। গোরুর গাড়ি উঠলেই নড়বড় করে।'

'দাদা, ওই টাকায় এর বেশি কী করব বলেন?'

'তা ঠিক, সবই যদি মাটিতে ঢালো, ঘটিতে কী রাখবে?'

'কী যে বলেন দাদা, মাটিরও তো দাম লেগেচে।'

'থাক ও-কথা। তোমার ঘটির খবর আমার জানা আছে। ফণী চুপিচুপি একটা কথা বলি, ভাবছি, এবার পঞ্চায়েতে তোমায় টিকিট দেব।'

এই কথা শুনে নিশ্চিত ফণীর চোখ কপালে উঠবে। সে বিশ্বাসই করবে না। চুরির পুরস্কার!

'আমায় টিকিড! যাঃ, আপনে ঠাট্টা করেন।'

'কেন? তোমায় নয় কেন? তোমার গাঁয়ে তুমি একটা ইমপর্টান্ট লোক। পাঁচটা লোক তোমায় চেনে, মানে। গ্রামের মানুষের জন্য সেবাধর্ম কর। কর না?'

এই পর্যায় থেকে ফণী বিশ্বাস করতে শুরু করবে। লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলবে, 'সে তো দাদা আপনেই জানেন। রাস্তা, টিউকল, কালভার্ট, ব্রিজ বানানো তো মানুষেরই সেবা।'

'তবে? বাপু ধানাইপানাই ছেড়ে এবার আসল কথায় এসো দেখি। খরচাপাতি কেমন পারবে?'

ফণী এবার এগিয়ে এসে হাঁটু চেপে ধরবে। ছলছল চোখে নীচু গলায় বলবে, 'যা লাগে দাদা, যত লাগে। টাকা নিয়ে আপনে ভাবেন না। আপনে শুধু টিকিটটার ব্যবস্থা করেন।'

'কাজটা কঠিন, কিন্তু তোমার মতো ভালোমানুষের জন্য কঠিন কাজও সহজ লাগে। তুমি লাখ পাঁচেকের ব্যবস্থা করে রাখ।'

মনে মনে ফণীর সঙ্গে সংলাপ সেরে আবার জগদীশে ফিরলেন মানা। জগদীশের ব্যাখ্যা চলছে—

'...কাম ক্রোধাদিতে বশবর্তী হয়ে মানুষ নীচ পশুরও অধমের মতো আচরণ

boierpathshala.blogspot.com

করে। আহার নিদ্রা, ভয়, মৈথুন ও কলহে প্রলুব্ধ হয়। পরমাত্মাকে ভুলে সে আর তখন নর থাকে না, হয়ে যায় নরাধম। পশুর থেকেও অধম..।'

'চিত্তশুদ্ধি' কর্মসূচি প্রথম দিন সংক্ষিপ্ত আকারেই শেষ করা হল। অফিসঘর ফাঁকা হলে, মানা সরকার বাছাই করা জনা চার পাঁচ ছেলেপুলে নিয়ে পরামর্শে বসলেন। ছেলেরা তো ঘটনা শুনে যেমন খুশি তেমন উত্তেজিত।

'আপনে নিজে একটায় দাঁড়ান না কেন দাদা? অসুবিধে কিছু নাই, আমরা আছি।'

'ওরে গাধা, পলিটিক্সে রাজার থেকে রাজা বানানোয় দাম বেশি। আমি হলাম রাজার রাজা।'

'অতসব বুঝিনে, আপনে নিজে একটায় লড়াই করেন।'

'না না তা হয় না। লোভ আমাদের মানায় না রে। জীবনটা উৎসর্গ করেছি মানুষের জন্য, নিজের জন্য নয়। গাধার দল, শুনলি না জগদীশ হারামজাদাটার কথা শুনলি না? লোভে মানুষ হয় পশুরও অধম। আমি আবার তো শুধু মানুষ নই, আমার একটা অন্য পরিচয়ও আছে। লোভে পড়লে আমার যে কী অবস্থা হবে কে জানে। জগদীশ বুড়োটা তো কিছুই বলে গেল না।'

'তামাশা শুনব না দাদা, কিছুতেই শুনব না, চান্স যখন এসেছে, ছাড়া চলবে না। দুটো সিট যাকে খুশি দিন, একটা আমাদের রইল। যদি রাজি না হন, তাহলে আমরা অনশনে যাব।'

ছেলেদের কথায় মানা সরকারের ভুরু কুঁচকে গেল। কথাটা খারাপ নয়। নেতা ভোটে দাঁড়াতে চায় না শুনে গ্রামবাসী অনশনে বসেছে। আহা! এই কথাটা তো মাথায় আসেনি। এমনটা হয়েছে কোথাও? চিত্তশুদ্ধির পরপরই এরকম একটা জিনিস চারদিকে সাড়া ফেলবে কেমন? মনে হচ্ছে তো খুবই ফেলবে। জেলা পর্যন্ত খবর ছুটবে। তাকে ডেকে পাঠানো হবে।

'ব্যাপার কী মানাবাবু? খবর পেলাম আপনার জন্য নাকি হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু হয়েছে?'

'কী করি বলুন দেখি? গাঁয়ের মুখ্যু মানুষকে যে বোঝাতে পারি না। আরে বাবা, দল ফেলে আমার কি ভোটে দাঁড়ানোর উপায় আছে? তা ছাড়া ওসব আমার ধাতে নেই।'

'তা বললে তো হবে না, পাবলিকের পাল্‌সটা তো বুঝতে হবে। মানুষ যদি চায়, আপনি আমি কী করব? মানুষের দাবিই আমাদের শেষ কথা। আপনি মনে মনে তৈরি হোন মানাবাবু, কালই মিটিং ডাকি।'

boierpathshala.blogspot.com

মানা সরকার হাত তুলে ছেলেদের বললেন, 'ঠিক আছে ঠিক আছে, তোদের কথা আমি শুনলাম। এবার একটু ভেবে দেখি। তোরা বরং, সাটেরগড় আর ঝিলডাঙার জন্য দুজনকে খুঁজে বের কর। দেখিস আবার ভিখিরি চাষাভুষো এনে হাজির করিসনি। মালদার পার্টি চাই। সাটেরগড়ের ফণী টাকাপয়সা করেছে কেমন? খোঁজ-খবর নে, নিয়ে আমায় জানা।'

ছেলেরা বলল, 'সে আমরা খোঁজ-খবর করে ফেলব। তবে আমাদের আবদার মনে রাখেন দাদা।'

ছেঁড়া মাদুর থেকে মানা সরকার উঠে পড়লেন। আর তখনই খবর এল ঝিলডাঙা থেকে কে যেন এসেছে। দেখা করতে চায়। অন্য কেউ হলে ভাগিয়ে দিতেন। ঝিলডাঙা শুনে মানা বললেন, 'লোকটাকে ভেতরে নিয়ে আয়।'

চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া হাতের দড়ি-বাঁধা ফাইলটা এগিয়ে দিল। ফাইলের অবস্থা ভালো নয়। বহুবার খোলা বন্ধের কারণে রং উঠে গেছে। তবে ওপরের লেখা পড়া যাচ্ছে। গোটা গোটা হরফে লেখা—

কাটাখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাথরুম বিষয়ক আবেদন।

মানা সরকার ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আপনি যে বললেন ঝিলডাঙা থেকে এসেছেন! এ তো দেখছি অন্য নাম।'

'আমাদের ঝিলডাঙায় স্কুলের নাম এরকমই।'

'কেন, এরকম কেন? ঝিলডাঙার স্কুলের নাম হবে ঝিলডাঙার নাম দিয়ে।'

চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া হতাশ ভাবে বললেন, 'ঠিকই বলেছেন। সেরকমটাই হওয়া উচিত। নাম বদলের জন্য আমি গভর্নমেন্টের কাছে কয়েকবার চিঠিও লিখেছিলাম, উত্তর কিছু পাইনি। তা ছাড়া স্কুলে কোনো নথিপত্র নেই যে সেখান থেকে নামের হিস্ট্রি জানব।'

'ঠিক আছে, এখন সমস্যা বলুন। চটপট বলবেন, আমার জেলা-মিটিং আছে। এখনই স্নান খাওয়া সেরে ছুটতে হবে।'

'আপনি যদি ফাইলটা একবারটি দেখেন মানাবাবু। অনেক চিঠিচাপাটি ঘোরাঘুরির পর আপনার এখানে এসেছি।'

মানা সরকার মৃদু হেসে বললেন, 'কেন এসেছেন? আমি তো ঝিলডাঙার কেউ নই। ঝিলডাঙার সমস্যা ঝিলডাঙার লোকেরা মেটাবে। আমার কী?'

চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া আমতা আমতা করে বললেন, 'শুনেছি, আপনি বললে, আশেপাশের অনেক গ্রামের কাজই হয়।'

মানা খুশি হলেন। সেই খুশি লুকিয়ে বিরক্ত মুখে বললেন, 'কে বলেছে?'

boierpathshala.blogspot.com

চিত্তরঞ্জন মাস্টার মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে বললেন, 'কাদু।'

মানা চোখ তুলে বললেন, 'কাদু? ওই যে যার চাল কল আছে?'

'হ্যাঁ, কোল্ড স্টোরেজও আছে। ওর কাছে গিয়েছিলাম, স্কুলের জন্য কিছু টাকাপয়সা যদি দেয়।'

চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে মানা বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। ওই লোকের রেপুটেশন তো ভালো নয় মাস্টার। শুনেছি জোরজুলুম করে।'

চিত্তরঞ্জন শুকনো হেসে বললেন, 'ভালো লোকেদের কাছে তো অনেক যাতায়াত করলাম। কিছুই তো হল না। তাই ভাবলাম...।'

মানা ফাইলের কাগজপত্র উলটোতে লাগলেন। শুধু হেডমাস্টারের চিঠি নয়, কাটাখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিজের হাতে লেখা চিঠিও আছে।

'কাদু টাকাপয়সা কেমন করেছে মাস্টার?'

'সে তো জানি না, তবে আছে এটা জানি। ঝিলডাঙার সবাই জানে। আমি তার কাছে টাকার জন্যই গিয়েছিলাম। বললে, স্কুলের ব্যাপার গভর্নমেন্ট করবে। আপনি বরং মানাবাবুর কাছে যান। আমি বললাম, মানাবাবু কী করবেন। কেনইবা করবেন, তিনি তো আর এখানকার কেউ নন। কাদু বলল, সে আবার কী কথা! লিডার মানুষ, তার আবার এখান ওখান কী? অনেক বড়ো জায়গায় চেনাজানা। উনি এক কলম লিখে দিলে সরকারের টনক নড়বে।'

মানা সরকার ছেলেমেয়েদের চিঠিতে মন দিলেন। কাদু সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার ব্যাপারটা মাস্টার যেন বুঝতে না পারে।

'বাঃ মাস্টার, আপনার বাচ্চাদের হ্যান্ডরাইটিং তো চমৎকার। আমিও একসময় পারতাম।'

হেডমাস্টার বিগলিত গলায় বললেন, 'শুধু হাতের লেখা নয়, মাথাও পরিষ্কার মানাবাবু। গরিব ঘরের ছেলেমেয়ে। খাওয়া-দাওয়াও জোটে না, অথচ মাথা দেখেন। চমকে যাবেন। মাঝেমধ্যে তো আমার মনে হয় খালি পেটে মাথা বেশি খোলে। ফুল নামে একটা মেয়ে আছে আমার ওখানে, অঙ্কে ভারি চৌখস। বেচারি চোখের অসুখে ক-দিন স্কুলে আসতে পারছে না।'

মানা স্কুল থেকে সরলেন।

'কাদু কি পার্টি পলিটিক্স কিছু করে নাকি?'

আবার কাদুর কথা ফিরে আসায় একটু থমকে চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া বললেন, 'পলিটিক্স? তা তো শুনিনি কখনও। তবে...।'

মানা সরকার খোলা ফাইল বন্ধ করতে করতে বললেন, 'তবে কী? সত্যি সত্যি লোক ভালো নয়?'

হেডমাস্টার মাথা চুলকোতে থাকেন। মানা হেসে বললেন, 'ভয় নেই মাস্টার, আপনাকে বলতে হবে না, কাদু কেমন লোক পুরোটা না হলেও আমি খানিকটা জানি। ভালো লোক সবসময় ভালো লাগে না, ভালো লোক দিয়ে সব সময় কাজও হয় না। তবে আপনার কাজটা হবে। আমি দেখব।'

চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া খুশি হয়ে চলে যাওয়ার পর, মানা সরকার বাড়ির দিকে যেতে যেতে ছেলেদের বললেন, 'ঝিলডাঙার কাদু সম্পর্কে খবর চাই। ভালো খবর নয়, খারাপ খবর চাই। যত খারাপ হবে তত ভালো। খারাপ লোকে ভোটে দাঁড়ালে জেতা সহজ হয়।'

মানা সরকার ঠিক করলেন, খুব শিগগিরই তিনি কাদুকে ডেকে পাঠাবেন। লোকটার টাকার জোর বাজিয়ে নিতে হবে।

ডেকে পাঠাতে হল না, কিছুদিনের মধ্যে কাদু নিজেই এসে উপস্থিত হল। মুখে গদগদ হাসি, হাতে এক বাক্স মিষ্টি। অল্প কথার পরই মানা সরকার জানতে পারলেন, তিনি যতটা চেয়েছিলেন, কাদু তার থেকেও বেশি খারাপ। অনেক বেশি।

মানা সরকার খুশি হলেন।

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

দশ

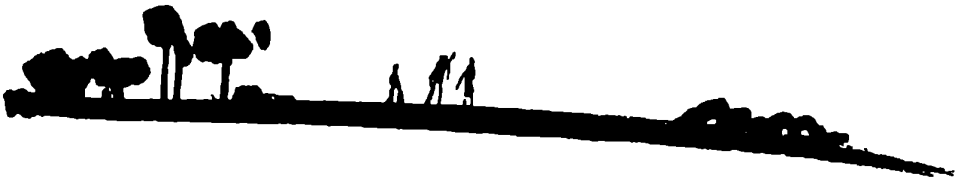

কাদু যা বলল তা ভয়ংকর।

গোপীনাথ শিউরে ওঠে। দোকানে হঠাৎ গরম বেড়ে গেল নাকি? তাই হবে। নইলে সে ঘামছে কেন? বাইরের ঘাম নয়, শরীরের ভেতরটা যেন দরদর করে ঘামছে। কোনোরকমে হাতের পাশে রাখা গামছাটা তুলে মুখ, ঘাড় গলা মুছল গোপীনাথ। মুছতে মুছতে বুঝল, ভেতরটা গরম হলেও হাতদুটো বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেছে। অতিরিক্ত ভয় পেলে বোধহয় এরকমই হয়। ভেতরটাকে গরম করে বাইরেটা ঠান্ডা মেরে যায়। চিকিৎসাবিদ্যেতে একে কী বলে?

একটু দূরে মোহনকে দেখা যাচ্ছে। দোকানের ঠিক উলটোদিকে কোণ করে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে। অন্ধকারে তাকে দেখাচ্ছে ভূতের মতো। মাঝে মাঝে বিড়ির আলোটা জ্বলে ওঠে। এত দূর থেকে বোঝার কথা নয়, তবু গোপী ডাক্তারের মনে হল; ব্যাটার কোমরের কাছটা সত্যি উঁচু। বন্দুক?

কাদু হাসতেই হাসতেই পা নাচাল। ভুরু তুলে বলল, 'নাও, ডাক্তার এবার কানে কানে বল দেখি, সদানন্দের ছেলেবউয়ের হয়েচেটা কী? দেকো আর কেউ যেন শুনতে না পায়। নাও বল।'

কাদুকে খুশি করতে গিয়ে গোপীনাথ হাসতে চেষ্টা করল, পারল না। আধ-মরা হাসি এসে ঠোঁটের কাছে আটকে গেল। লোকটা যা চাইছে তা মারাত্মক।

কাদু মুখটা এগিয়ে দিল। শীতল গলায় বলল, 'বল গোপীনাথ, দেরি কোরো না, বলে ফেল। আমার কিছু না, আমি অপেক্ষা করতে পারি। তোমার এই দোকানে বসে চা-মুড়ি খেতে পারি। দুটো মনের প্রাণের কতা কইতে পারি। কিন্তু গোলমাল পাকায় আমার এই মাতার ভিতরের শয়তানটা। তুমি তো ডাক্তার

boierpathshala.blogspot.com

মানুষ গোপীনাথ, মাতার ভিতরের শয়তান কত বড়ো হারামজাদা হয় তা তুমি জানো। জানো না এমন নয়। হারামজাদার ধৈয্যি বলে কিচ্ছু নাই। সব পারে, কিন্তু ছেনালি সহ্য করে না। খালি উশখুশ করে। মানুষের উশখুশ ভালো, শয়তানের উশখুশ ভালো নয়। নাও বল।'

গোপীনাথ জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। ঢোঁক গিলল দু-বার। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'সদানন্দের ছেলেবউয়ের মৃগি হয়নি, তাকে ভূতে পেয়েছে।'

কাদু চোখ সরু করে বলল, 'অমন মেশিনের মতো করে বল কেন ডাক্তার? যেন জোর করে বলচ। তোমায় যেন কেউ শিকিয়েচে। অমন বললে লোকের যে সন্দেহ হবে। নাও সহজভাবে বল। যেমনভাবে জ্বরজ্বারির নিদান দাও, তেমনভাবে ভূতের নিদান বল। ভূতে পাওয়া তো তোমার ছোটো অসুখ নয় হে, বড়ো মামলা।'

কথা শেষ করে আওয়াজ করে হাসতে লাগল কাদু।

শিউরে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলাল গোপীনাথ। আবার ঢোঁক গিলল। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। একটু জল খেলে ভালো হত। দরকার নেই, জল খেতে দেখে লোকটা যদি রেগে যায়? গোপীনাথ এবার গলা তুলে বলল, 'সদার পুত্রবধূকে ভূতে ধরেছে।'

কাদু পিঠ সোজা করল। চোখ পিটপিট করল। গোপীনাথের মনে হল, ভিতরের শয়তানটা দেখছে। শয়তানের চোখ অন্ধকারে বেশি দেখা যায়।

'বাঃ, গুড। কাল ঘুম থেকে উঠে যেন শুনতে পাই গ্রামে ভূতের খবর ছড়িয়ে পড়েছে। আর সেই খবর ছড়িয়েছে কোনো হেঁজিপেঁজি নয়, খোদ গোপীডাক্তার। ডাক্তার যদি ভূতের খবর বলে সবাই বিশ্বেস করবে। আমিও করব। তখন আমি কী করব? কী করব জানো ডাক্তার?'

আতঙ্কিত গোপীনাথ ঘাড় নাড়ল। কাদু আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'তখন আমি কালিকে খবর দেব। কালি ওঝা। ভূত তাড়ানোর ওস্তাদ। সে এসে ওই মেয়েছেলের ভূত তাড়াবে। তাই তো? আর কালি কেমন করে ভূত তাড়াবে তাও তো তোমার জানা আচে।'

গোপীনাথ মাথা নামিয়ে বসে আছে। কালো দাঁত বের করে উঠে দাঁড়ায় কাদু। দু-পা এগিয়ে আসে।

'তোমার ফুঁ চিকিচ্ছে কতদূর? আমি কিন্তু শিখে ফেলেচি। দেখি মাথাটা এদিকে দাও দেখি। দুটো ফুঁ দিই। আমার ফুঁ যার তার ফুঁ নয়, শয়তানের ফুঁ। এই ফুঁ মাথায় থাকলে রোগীকে কেউ ছোঁয় না। অসুখ-বিসুখও ভয় পায়। হ্যা হ্যা।

boierpathshala.blogspot.com

পুলিশের হাতে ধরাও পড়বে না, দোকানে আগুনও লাগবে না, এমনকি দিনদুপুরে বাজারের মাঝখানে দোকানে মদের বোতল পেয়েছি বলে আমার ছেলেরা তোমার দোকান ভাঙচুরও করবে না। ঠিক কিনা? হ্যা হ্যা।'

হুমকি দিয়ে বিশ্রী হাসতে থাকল কাদু। এটা হল কাদুর কায়দা। প্রথমেই হুমকি দিয়ে বসে না। কাজ খানিকটা এগোলে তারপর দেয়।

'ঝিলডাঙা গ্রামে ভূতে পাওয়ার সাজা কী মনে আছে তো ডাক্তার? হারাধনের কথা মনে পড়ছে? আহা বেচারি গাছে উঠত বড়ো ভালো গো। একেবারে হনুমানের মতো। ছেলেও ভালো ছিল। দেকা হলে হাতজোড় করে বলত, ভালো আচেন? আপনে ভালো আচেন?'

কাদু হাত জোড় করে অভিনয় করে দেখাল। যেন সে-ই হারাধন।

ঠান্ডা গরমের ব্যাপারটা বদলাচ্ছে মনে হয়। গোপীনাথের হাতের জমাট ঠান্ডা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। কপালে ঘাম জমেছে। গোপীনাথ গামছা তুলে ঘাম মুছল। এরা কি সদানন্দের পুত্রবধূকেও হারাধনের মতো কাপড় খুলিয়ে গ্রামে ঘোরাবে? এত ভয়ংকর!

কাদু চোখ নাচিয়ে বলল, 'মেয়েছেলে বলে খারাপ লাগচে তো ? আমারও লাগচে। কিন্তু উপায় তো কিছু নাই। দুনিয়াদারির নিয়মটাই এই, চিকিচ্ছেতে নারী পুরুষ সমান সমান। তুমি তো জানো। অসুখ হলে বেটাচেলে মেয়েচেলেকে তুমি কি আলাদা ওষুধ দাও? না দিলে কাজ হয়? ভূতে পাওয়া মানুষের গায়ে কাপড়-চোপড় রাখলে চলে না। উদোম অবস্থাতেই সে গাঁয়ে চক্কর দেবে। পেছনে আমার ছেলেরা কেনেস্তারা পিটবে। সেই আওয়াজে ভূত, শাঁকচুন্নি, বেহ্মদত্যি সব বাপ বাপ বলে পালাবে। সদার ছেলের বউ আবার সুস্থ হবে। তবে ভাবচি, জুতো শোঁকা ভূত তো, তাই বউটাকে যদি একটা জুতোর মালা-টালা পরানো যায়। যতই হোক মেয়েমানুষ বলে কতা। মায়ের জাত। সেটাও তো মাতায় রাকতে হবে। ওই মালায় লজ্জা খানিকটা ঢাকে এই আর কী। এই ধর, মালাটা রইল এতটা। এই পর্যন্ত।'

হাত দিয়ে মাপ দেখাল কাদু। গোপীনাথ চোখ নামাল।

'মুখ নামিয়ে আচো কেন ডাক্তার? তাকাও। মাপ ঠিক আছে কিনা বল। চিকিচ্ছেতে আবার লজ্জা কী?'

কাদু দোকান থেকে বেরিয়ে গেলে গোপীনাথ বসে রইল থম মেরে। খদ্দের এলে হয় হাত নেড়ে তাড়াল, নয় জিনিস দিল যন্ত্রের মতো। পয়সা নেওয়ার সময় গুনেও দেখল না।

boierpathshala.blogspot.com

'কী হল গোপী? মুড়ির বদলে চিঁড়ে ঢালো কেন?'

গোপীনাথ ঠোঙা ফেরত নিয়ে মুড়ি ঢালতে গেল। টিনটা গেল কই? অন্ধকারে হাতড়াতে হল বেশ খানিকটা। মাথার ভেতর সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

'কী হয়েচে বল দেখি, শলীল-টলীল খারাপ নাকি? দোকানের জিনিস খুঁজে পাও না যে!'

গোপীনাথ শুকনো হেসে বলল, 'মাথাটা ধরেছে। ও কিছু না।'

'বল কী হে! ডাক্তারের মাথা ব্যথা?'

রেডিয়ো বিশু এল ঘণ্টাখানেক পরে। ছেলেটার পান-বিড়ির দোকান ঠিক উলটোদিকে। বিশু নামের সঙ্গে 'রেডিয়ো' যুক্ত হওয়ার কারণ আছে। পান-বিড়ি বিক্রির পাশাপাশি বিশু টুকটাক যন্ত্রপাতি সারাইয়ের কাজ করে। তার মধ্যে রেডিয়ো আছে। এই কারণে নাম হয়েছে রেডিয়ো বিশু। দোকান রাত পর্যন্ত খোলা রাখে সে। ফাঁকফোঁকরে টুঁ মেরে যায় 'গোপীদা'র কাছে। কখনও ঘর সংসারের কিছু কেনাকাটা থাকে, কখনও ছোটোখাটো অসুখের চিকিৎসা করায়। আবার কোনো সময় অদরকারেও আসে। একটু গল্প করে যায়। অসুবিধে কিছু নেই, গোপীনাথের মুদির দোকানের সামনে দাঁড়ালে নিজের দোকানটা স্পষ্ট দেখা যায়। খদ্দের এলে ছুটে গেলেই হল।

'হারামজাদাটা কী বলতে এসেছিল গোপীদা?'

দোকানের সামনে বেরিয়ে থাকা কাঠের পাটাতনে বসে ফিসফিস করে বলল বিশু।

গোপীনাথ থমথমে মুখে বলল, 'কিছু না।'

বিশু গলা নামিয়ে বলল, 'কিছু না কী? অতক্ষণ ছিল। মোহনটাকেও দেখলাম। আমার দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ঘাপটি মেরে। একটা বিড়ি নিয়ে খেল।'

গোপীনাথ মুখ নামিয়ে বলল, 'বললাম তো কিছু না। বিরক্ত করিস না বিশু, শরীর ভালো নেই।'

বিশু চোখ সরু করে চাপা গলায় বলল, 'কী হয়েছে গোপীদা? কী লুকোচ্ছ?'

গোপীনাথ মুখ তুলে বিশুর দিকে তাকাল। বয়েসে ছোটো হলেও বিশুর সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেকটা বন্ধুর মতোই। এত বছর পাশাপাশি বসে কাজ-কারবার। সুখ-দুঃখের কথা হয়। গেল বর্ষার আগে ঘর সারাতে ছেলেটা তিনশো টাকা ধার নিয়েছিল, ছ-মাসেই শোধ দিয়েছে। শুধু টাকা দিল না, সঙ্গে একটা

boierpathshala.blogspot.com

রেডিয়ো দিল। ছোটোখাটো পকেট রেডিয়ো নয়, বেশ ধেড়ে সাইজের পুরোনো কালের জিনিস।

'ব্যাপার কী বিশু! এটা আবার কী!'

'সে কী গোপীদা রেডিয়ো চেনো না!' বলাই হাসল।

'মারব চড়। পেলি কোথা থেকে?'

'ওমা! রেডিয়োর দোকান রেডিয়ো পাব না? চিন্তা কোরো না, চুরি করিনি। বাতিল জিনিস। পড়ে ছিল অনেকদিন। ঠিকঠাক করে তোমাকে দিলাম। তুমি কাজ করতে করতে গান শুনবে। ঝিলডাঙাতে তো আর টেশন বেশি ধরা যায় না।'

গোপীনাথ লজ্জা পেল। বলল, 'দুর আমি আবার গান শুনব কী? একা মানুষ চিঁড়ে-মুড়ি আর অসুখ-বিসুখ নিয়ে থাকি।'

রেডিয়ো বিশু হেসে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি বরং চিকিচ্ছেই শুনো।'

গোপী ডাক্তার অবাক হয়ে বলল, 'চিকিচ্ছে! রেডিয়োতে আবার চিকিচ্ছে কী রে বেটা?'

'ওমা, চিকিচ্ছে নিয়ে রেডিয়োতে প্রোগ্রাম হয় না? জল ফুটিয়ে খান, সাবান মেখে চান করেন—কত কী বলে।'

গোপীনাথ জোরে হেসে ওঠে।

'দুর ওসব আবার চিকিচ্ছে নাকি ? ওসব জ্ঞানের কথা। চিকিচ্ছে দিতে পারে না, তাই জ্ঞান ঝাড়ে।'

মুখে যাই বলুক, বাড়িতে রেডিয়ো রেখে দিয়েছে গোপীনাথ। রাতে বাড়ি ফিরে মাঝেমধ্যে চালিয়ে দেয়। ভাত চাপিয়ে নব ঘুরিয়ে স্টেশন ধরে। পুরোনো দিনের বাংলা গান খোঁজে। কোনো কোনোদিন ঘসর ঘসর শব্দের ফাঁকে ভেসে আসে—ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে...। সব কথা আসে না। কোনোটা আসে, কোনোটা ভেসে ভেসে হারিয়ে যায়। বেশ লাগে।

গোপীনাথ বিশুর দিকে তাকিয়ে হিসহিসিয়ে বলল, 'ভেতরে আয়, কথা আছে।'

সবকথা শুনে চোখ বড়ো হয়ে গেল বিশুর।

'বল কী! কী হবে এখন?'

দোকানের ঝাঁপ নামাতে নামাতে গোপীনাথ বলল, 'কী হবে জানি না, তবে একটা কথা জানি যে করেই হোক কাদুকে আটকাতে হবে।'

বিশু চমকে উঠল। বিস্ফারিত চোখে বলল, 'আটকাতে হবে মানে!'

boierpathshala.blogspot.com

'না হলে কী হবে বুঝতে পারছিস না? হারাধনের কথা মনে নেই?'

'মনে নেই আবার? ঝিলডাঙার কেউ সে-ঘটনা ভুলতে পেরেছে? কিন্তু কাদুকে আটকাবে কী করে? এক যদি সদাদার ছেলের বউটাকে কোথাও লুকিয়ে ফেলা যায়।'

গোপীনাথ ভুরু কুঁচকে বলল, 'সেটা যে আমি ভাবিনি তা নয়, কিন্তু কাদু যদি জানতে পারে ঘটনা আরও মারাত্মক হবে।'

'পুলিশকে খবর দিলে হয় না?'

গোপীনাথ ক্লান্ত ভাবে হাসে।

'কাদু পুলিশকে কীভাবে হাত করে রেখেছে তুই জানিস না? হারাধনের বেলায় বাড়ির লোকেরা তো থানায় গেল। বড়োবাবু বললে, পাগল ছাগল মানুষ গাছে ঝুলেছে তো কী হয়েছে? ভালোই হয়েছে।'

বিশু উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আর কাদু হারামজাদা, ওইভাবে কাপড় চোপড় খুলিয়ে ঘোরাল যে?'

গোপীনাথ মুখ দিয়ে আওয়াজ করে বলল, 'তাও ওরা বলেছিল। পুলিশ শুনে মারতে আসে। বলে, পাগল নেংটা হয়ে ঘুরবে না তো তুমি আমি নেংটা হয়ে ঘুরব?'

বিশু খানিকটা চুপ করে থেকে বলল, 'গোপীদা তুমি যদি না বল? সদানন্দর ছেলের বউকে ভূতে ধরেছে এই কথাটা গাঁয়ে না ছড়াও যদি?'

জিনিসপত্র গোছগাছ করে উঠে পড়ল গোপীনাথ।

'চল, উঠি। শেষ পর্যন্ত সেটাই ভেবে রেখেছি। যদি দেখি কিছুই হল না, তাহলে আমি...কিন্তু তারপর কি আমি আর এই ঝিলডাঙায় থাকতে পারব? থাকতে দেবে ওরা? শুনলি তো, বলে গেল, এই দোকান শুধু ভাঙচুর করবে না, ভুয়ো ডাক্তার বলে পুলিশেও ধরিয়ে দেবে। তখন?'

বিশু এগিয়ে এসে গোপীনাথের ডান হাতটা ধরল। গোপীনাথ বাঁ-হাত দিয়ে সেই হাতের ওপর হাত রেখে সামান্য হেসে বলল, 'দরকার হলে তাই করতে হবে। গাঁ ছেড়ে যদি পালাতে হয় তাই পালাব। আমি জানি, আমি পালালে কাদুর দলবল এই দোকান পুড়িয়ে দেবে।'

'সেকি! কোথায় পালাবে? ও চিন্তা বাদ দাও গোপীদা। খালে থেকে কুমিরের সঙ্গে লড়াইতে আমরা পারব না। তুমি বরং...'

গোপীনাথ চাপা গলায় বলল, 'আমি বরং কী? মেনে নিতে বলছিস? কাদুর কথা মতো কাজ করব? তারপর কাল সকালে দেখব, ঝিলডাঙার ঘরের

boierpathshala.blogspot.com

বউ উদোম হয়ে পথে পথে হাঁটছে আর জানোয়ারগুলো পিছনে ড্রাম বাজিয়ে নাচছে? আমি এ-কাজ পারব না বিশু। সব পারব কিন্তু এটা পারব না। আমি ভীতু মানুষ, লড়তে না পারি পালাতে পারি। আমি পালাব, কিন্তু কিছুতেই বলব না সদানন্দের ছেলের বউকে ভূতে ধরেছে, সে একটা পাগল।'

'তুমি পালালে কি সদানন্দ বাঁচবে?'

'না, বাঁচবে না। ওরা সহজে ছাড়বে না। তবে আমার মনে শান্তি থাকবে, আমি তো জানব, জেনেশুনে এই পাপ আমি করিনি। ঝিলডাঙার মানুষ জানবে, গোপীনাথ ডাক্তার ভুয়ো হতে পারে, কিন্তু মেয়েছেলের সম্মানে হাত দেয় না। মানুষটা ভুয়ো নয়।'

কথা শেষ করে শুকনো হাসল গোপীনাথ।

বন্ধ দোকানে বসেও বিশু ভয় পেল। আবার অবাকও হল। গোপীডাক্তারের মুখে এমন কথা সে শোনেনি আগে। সামান্য চাল-ডালের দোকান একটা, সেইসঙ্গে হাতুড়ে চিকিৎসা। সেই মানুষটার মধ্যে এত জোর! ঝিলডাঙায় কম দিন হল না তার। গোপীডাক্তারকে চেনেও অনেক বছর। কিন্তু এমনভাবে চেনেনি কখনও। এদিক-ওদিক তাকাল বিশু। ফাঁকফোঁকর দিয়ে কেউ শুনছে না তো? চাপা গলায় বলল, 'ঠান্ডা হও গোপীদা। ঠান্ডা হও দেকি।'

'হাতে সময় কম। সদার বাড়ি যাব। গিয়ে রোগী দেখব। তার আগে জানতে হবে, কাদুর সঙ্গে তার গোলমালটা কীসের? সত্যি কিছু হয়েছে, নাকি ওই মেয়ের দিকে এমনি এমনি কুনজর পড়েছে হারামজাদার।'

বিশু বলল, 'দোকান বন্ধ করে আমিও তোমার সঙ্গে যাই গোপীদা?'

গোপীনাথ ডাক্তার বিশুর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'না, আমি যদি পালাই ঝড়ঝাপটা আমার ওপর দিয়ে যাবে। তুই এর মধ্যে জড়াসনি। আমি একা গিয়ে কথা বলি। দরকার হলে তোকে বলব।'

একাই কথা বলল গোপীনাথ। তার মুখে 'দরকারি কথা আছে' শুনে চাতালের একপাশে দুটো মোড়া এনে বসেছে সদানন্দ। ঝিলডাঙায় বিদ্যুৎ নেই। বিদ্যুতের খুঁটি আছে। তবে সদানন্দের বাড়ি হ্যাজাকের আলোয় বেশ ঝলমল করে। আজ সেই আলো মনমরা। বাড়ির বউ হঠাৎ অসুখে পড়েছে, মনমরা থাকাটাই স্বাভাবিক। জমিজমা বেশি থাকার কারণে সদানন্দ পয়সার দিক থেকে অবস্থাপন্ন, সেই কারণে দাপটও আছে। তবে সেও আজ মুষড়ে পড়েছে। অসুখ সাধারণ হলে অসুবিধে ছিল না। কিন্তু হঠাৎ 'ফিট যাওয়া' সাধারণ অসুখ নয়।

'বউমা আছে কেমন?'

boierpathshala.blogspot.com

'মনে তো হচ্ছে ভালো। ঘুমোচ্ছে।'

গোপীনাথ গলা নামিয়ে বলল, 'ঘুমোনো ভালো লক্ষণ।'

সদানন্দ বলল, 'খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েছি গোপী।'

'চিন্তা কোরো না। অসুখ ধরতে আমার ভুল হয়নি। রোগীকে তুমি কলকাতায় নিয়ে যাও। এর চিকিচ্ছে আছে।'

'এই অসুখ সারবে বলছ?' সদানন্দ আগ্রহ নিয়ে জানতে চায়।

গোপীনাথ সামান্য হেসে বলল, 'সারবে না মানে? বাপ সারবে। আজকাল ঠিক সময় ধরা পড়লে তোমার ক্যানসারও সেরে যায়। আসল হল ধরা। রোগ বুঝতে দেরি হলেই গোলমাল।'

সদানন্দ গোপীনাথের হাঁটুর ওপর হাত রেখে বলল, 'তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করলে গোপী।'

গোপীনাথ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'চিন্তার অন্য কারণ হয়েছে।'

গোপীর কথা শুনে সদানন্দ নড়ে বসল। ভুরু তুলে বলল, 'মানে!'

গোপীনাথ গলা নামিয়ে বলল, 'একটা কথা বল দেখি, কাদুর সঙ্গে তোমার গোলমালটা কী?'

সদানন্দ প্রথমটা ধরতে পারল না। পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'কাদু তো নয়, ওর চ্যালা মোহন না শোল, কী যেন নাম? ওর সঙ্গে ঝামেলা।'

গোপীনাথ যেন খড়কুটো পেল। যাক বাবা, তার মানে মেয়েমানুষের ওপর নজর নয়, গোলমাল অন্য কিছু। এটা একটা ভালো দিক। মেয়েমানুষের ওপর শয়তানের নজর সাংঘাতিক। অন্য গোলমাল চেষ্টা করলেও সামলানো যায়, এই গোলমাল সামলানো যায় না।

'ওই একই হল। কাদুও যা, ওর ছেলেপিলেরাও তাই। হয়েছেটা কী সেটা বলবে তো।'

সদানন্দ চিন্তিত গলায় বলল, 'তুমি কী করে জানলে ডাক্তার? শুয়ারের বাচ্চারা কথাটা ছড়িয়ে দিয়েছে নাকি?'

গোপীনাথ হাত তুলে বলল, 'আহা, আগে বল শুনি।'

'অন্য কেউ হলে বলতাম না, তোমাকে বলেই বলছি। ব্যাটা দালালরা ক-দিন ধরে ঘুরঘুর করছিল। খেতখেতির চাল নাকি সব ওদের মিলে তুলতে হবে। ওই যে বানেরহাটে যেতে পড়ে না? অন্নদা রাইস মিল। কাদুর বিজনেস। বেশি পয়সা নেয় আবার মাল চালানও করে। আমি বললাম, দেব না। ফসল

boierpathshala.blogspot.com

এবার ভালো হবে, যাদের সঙ্গে এতদিন কাজ করছি, তাদের বাদ দিয়ে তোদের কাছে যাব কেন? শালারা তাও পিছনে লেগে রইল। জোঁকের মতো।'

সদানন্দ চুপ করল। গোপীনাথের কাছে ঘটনা পরিষ্কার হতে শুরু করেছে।

'তুমি কী বললে?'

'বললাম, সবটা দেব না, খানিকটা দিতে পারি। কাদুর ব্যাপার বলেই ভেবেচিন্তে রাজি হয়েছি। লোক খারাপ, একেবারে না বললে অন্যভাবে ঝামেলা করতে পারে। শুয়ারের বাচ্চাগুলো তাতেও রাজি হল না। বলল, না, তোমাকে সবটাই দিতে হবে। আজ সকালেও এসেছিল। তখন বউমার ওই অবস্থা। পরিস্থিতিটা বোঝো একবার। মাথার ঠিক নেই, কী করব বুঝতে পারছি না। একবার মাথায় জল ঢালি, একবার বরফের জন্য সাইকেল চাপিয়ে বরফকলে লোক পাঠাই। তারপর তো তোমাকে ডাকলাম। কাদুর দালালটা দেখি তখনও বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। দিলাম এক ধমক। বললাম, দূর হয়ে যা। এক মণও ধান যাবে না তোদের মিলে। কাজটা ঠিক করেছি না?'

গোপীনাথ শান্ত গলায় বলল, 'না, ঠিক করোনি। ছেলে, ছেলের বউ নিয়ে গাঁয়ে থাক, ঘরে নাতি নাতনি আছে। কাদু কেমন লোক ঝিলডাঙার সবাই জানে।'

সদানন্দ উত্তেজিত গলায় বলে, 'কী করবে? মারবে? আমিও দেখে নেব।'

গোপীনাথ ঠোঁটের ফাঁকে হাসল। চোখ বুজে বলল, 'মারলে তো মিটেই গেল। খারাপ লোকেরা তার থেকেও বেশি কিছু করে। মারের থেকেও বেশি। তুমি বিচক্ষণ মানুষ। যা করবে সবদিক ভেবেচিন্তে করাটাই ঠিক।'

সদানন্দর স্ত্রী এসে গোপীনাথকে রাতে খেয়ে যাওয়ার কথা বলে গেল।

'বেশি তো কিছু নয়, চারটে ডাল ভাত মুখে দিয়ে যায়েন।'

গোপীনাথ বারণ করতে গিয়েও থমকে গেল। রাতে এখানে খাওয়া মানে, শুধু বাড়ি গিয়ে রান্নাবান্নার ঝামেলা থেকে মুক্তি নয়, খানিকটা সময়ও পাওয়া যাবে। সদানন্দকে বোঝানোর সময়। এই মুহূর্তে বাঁচার পথ একটাই। সদানন্দের চাল থাকবে কাদুর মিলে।

খেতে বসে সদানন্দ বলল, 'গোপীনাথ, ঝামেলা থেকে না হয় বাঁচব, কিন্তু পয়সায় কতটা লোকসান হবে সে-কথাটা একবার ভেবে দেখেছ?'

'তোমাকে তো বলছি, শুধু পয়সার লোকসান দেখলে চলবে না। তার থেকে বড়ো লোকসান সামলাতে হবে।'

সদানন্দ থম মেরে বাকি খাওয়া সারল। উঠোনে নেমে হাত ধুতে ধুতে

boierpathshala.blogspot.com

বলল, 'কী ব্যাপার বল তো? অন্যের বিষয়-আশয়ে তো তুমি নিজেকে কখনও জড়াও না, তোমার আজ হলটা কী?'

গোপীনাথ একটু চুপ করে থাকে। এবার শুধু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বোঝানো নয়, ঘটনা সরাসরি বলার সময় হয়েছে। সদানন্দ যদি রাজি না হয়, তাহলে উপায় ঠিক করতে হবে নিজেকেই । জিনিসপত্র গুছিয়ে কাকভোরে বের হলেও বানেরহাট পৌঁছোতে বেলা হয়ে যাবে। সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতা। যাদবপুরে মাসির এক ছেলে থাকে। তাও নিজের মাসি নয়। একটা রাত না হয় থাকতে দেবে, কিন্তু তারপর?

'এবাব বিষয়ে জড়িয়েছি। কাদু শয়তানটা সন্ধের সময় দোকানে এসেছিল।'

'তোমার দোকানে!' হাতে জলের ঘটি নিয়ে থমকে যায় সদানন্দ।

'হ্যাঁ, দেখলাম বউমার অসুখের খবর জানে। বলল...।'

'কী বলল?'

গোপীনাথ মুখ ফিরিয়ে পিছনদিকে তাকাল। কেউ কি আছে? না, নেই।

'বলল, গোপী, শুনলাম সদার ছেলের বউকে নাকি ভূতে ধরেচে? কালি ওঝাকে কালই খবর দিই? কথাটা তোমায় বলব না ঠিক করেছিলাম, হারাধনের কথা তোমার মনে আছে? কালি ওঝা কী চিকিচ্ছে করেছিল তার? মনে পড়ে? ভেবে দেখলাম, বিপদের কথাটা জানলে তুমি যা-ই ঠিক কর জেনেবুঝে করতে পারবে। আমার কর্তব্য আমি করলাম। আমাকে ভুল বুঝো না। চিকিচ্ছে ভুল করতে পারি, কিন্তু রোগ আমি ভুল ধরি না। তোমার বউমাকে আর যাই হোক তাকে ভূতে ধরেনি। সে পাগলও নয়।'

সদানন্দর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গোপীনাথ যখন অন্ধকার রাস্তা ধরল তখন সে জানতেও পারল না কয়েক গজ দূরে অপেক্ষা করে থাকা শোল তার সাইকেল ঘুরিয়ে নিল। কাদুর এই চেলা ফলো করার কাজে একেবারে ওস্তাদ। গোপীনাথের দোকান ছেড়ে চলে আসার সময় থেকেই তাকে ডিউটি দিয়ে গেছে কাদু। তার ধারণাই ছিল গোপীনাথ সদানন্দর কাছে যাবে। না গেলে খবরটা পৌঁছোবে। এটাই চেয়েছিল সে। সদানন্দকে ভয় দেখিয়ে দিতে। পাগল হলেও সত্যি সত্যি তো আর মেয়েমানুষকে উদোম করে গ্রামে ঘোরানো যেত না। গোপী কতটা দূর পর্যন্ত যায় সেটাই জানার ছিল। সেই কারণেই শোলকে ডিউটি দেওয়া। সেই থেকে গোপীনাথের পিছু ছাড়েনি শোল।

পরদিন ভূতে ধরার শাস্তি সদানন্দের পুত্রবধূকে পেতে হয়নি। সকাল দশটার কিছু আগেই সদানন্দ তার ধানের গোটাটাই অন্নদা রাইস মিলের জন্য

লিখে দিল। গোপীনাথ ডাক্তার সেই লেখাপড়ায় সাক্ষী হল। সে নিজে উদ্যোগ নিয়ে কাদুর অফিসে নিয়ে যায় সদাকে।

সইসাবুদের পর কাদু তার কালো দাঁত বের করে নোংরা হাসল।

'এই কাজটা গোপী, তুমি ঠিক করনি। ভূত-টূত কিছু নয়, আমাদের বউমার এই অসুখের চিকিচ্ছে আছে। আমি তো সদাকে বলছি, বউমাকে শহরে পাঠাও, চিকিচ্ছের খরচপাতি নিয়ে ভেবো না। আমি অ্যাডভান্স দেব। দয়ার টাকা তো নয়, তার মাল আমার কাছে আচে, রইল। কিন্তু এটা কী শুনলাম ডাক্তার? এটা তো ভালো জিনিস শুনলাম না। কাল রাতে তুমি নাকি বউমাকে ভূতে পেয়েচে বলে খবর চাউর করচিলে? ছি ছি। এইটা ঠিক না। তোমার কাছ থেকে এইটা আশা করি না। তুমি একটা ডাক্তারবদ্যি মানুষ। তোমার কথা বিশ্বেস করে ঝিলডাঙার নিয়ম মতো আমাদের বউমাকে যদি ভূতে পাওয়ার চিকিচ্ছে করাতে হত কী হত কাণ্ডটা! ইস, কালি ওঝা হারামজাদা আসত। এসেই বউটার কাপড়ে মারত টান। চি চি, ঘরের বউ ওইভাবে গ্রামে..চি চি...শরীরে কাপড়-চোপড় নাই...শুধু একটা জুতার মালা..। আমার তো এখন ইচ্ছে করে, তোমার গলায় এই মালা পরিয়ে ঝিলডাঙায় চক্কর খাওয়াই। যাক, যা ভুল করার করে ফেলেচ। তবে শাস্তি তো একটা পেতেই হবে বাপু। হবে কিনা? তুমিই বল। এক কাজ কর, বড়ো শাস্তির দরকার নাই, প্রথম অপরাধ। তুমি ছোটো শাস্তিই নাও। তোমার দোকানের সামনে আজ সারাদিন একটা জুতার মালা ঝুলিয়ে রাখ। নাও মালা নিয়ে যাও। পছন্দ মতো জায়গা দেখে নিজেই টাঙিয়ে দাও। অ্যাই মোহন ডাক্তারকে বাইকে করে নিয়ে যা। জুতোর মালা কোথায় ঝুলল দেখে এসে আমায় জানাবি।'

সারাদিন গোপীনাথের দোকানের সামনে জুতোর মালা ঝুলল। জ্বর হয়েছে বলে লজ্জা-অপমানে দোকান খুলল না গোপীনাথ।

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

এগারো

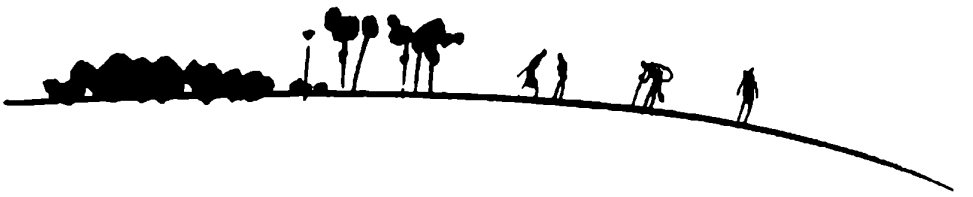

বহুদিন পর বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে একেকজন একেকরকম করে।

'চিনতে পারিনি' ভাব করে কেউ পাশ কাটিয়ে চলে যায়। কেউ হাউমাউ করে বাড়াবাড়ি ধরনের আদিখ্যেতা শুরু করে। কেউ সিনেমার নায়কের মতো বুকে জড়িয়ে ধরে। কেউ আবার শান্তভাবে ডান হাত বাড়িয়ে কায়দা করে বলে, 'কেমন আছিস?'

সলিল করল অন্যরকম। সে তার দুটো হাত দিয়ে ব্রতীনের ডান হাতটা চেপে ধরল। তাও আবার আঙুল বা কবজি নয়, চেপে ধরল কনুইয়ের কাছটা। যেন বন্ধু নয়, সে চোর পাকড়াও করেছে।

ব্রতীন হেসে বলল, 'আরে করিস কী? ছাড় ছাড়।'

সলিল চোখমুখ পাকিয়ে বলল, 'ছাড়ব মানে? কোনো ছাড়াছুড়ির কেস নেই। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট। একেবারে লকআপে ঢুকে তবে নিস্তার পাবি।'

ব্রতীন হাসল। ছেলেটা এখনও সেই আগের মতোই পাগলাটে রয়ে গেছে!

'ঠিক আছে, পুরোটা ছাড়তে হবে না, একটা হাত তো ছাড়বি রে বাবা। আমার লাগছে না?'

সলিল আরও মারমুখী হয়ে বলল, 'মজা আর কী? গতবার একটা হাত ধরেছিলাম, তাতে কী হল? দশ বছরের জন্য হাওয়া হয়ে গেলি। এবার তাই দুটোই ধরে থাকব।'

ব্রতীন হতাশ হল। হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। এই ছেলে এখনও পাগলই আছে। স্কুলে পড়বার সময় সলিল কতরকমের যে কাণ্ড করত তার ঠিক নেই। সবকটা মনে নেই, তবে তার মধ্যে একটা ছিল কালেকশন পার্ট।

boierpathshala.blogspot.com

সংগ্রহের নেশা। একদিন টিফিনের সময় ক্লাস এইটের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে বলল, 'বড়ো হয়ে আমি হব শ্রী শ্রীহরিশচন্দ্র কাপাডিয়া।'

বন্ধুরা সবাই চোখ গোল করে বলল, 'হরিশচন্দ্র কাপাডিয়া? সে আবার কে রে!'

সলিল ধমক দেয়, 'হরিশচন্দ্র বলছিস কী? শ্রী শ্রীহরিশচন্দ্র বল। উনি হলেন দ্য গ্রেট কালেকটর অব ইন্ডিয়া। আমাদের দেশে অত বড়ো সংগ্রাহক একশো বছরেও জন্মায়নি। আলিগড়ের কাছে ওনার নামে সেতু আছে জানিস? দ্য হরিশচন্দ্র ব্রিজ।'

বলে হাত দিয়ে শূন্যে ব্রিজ তৈরি করে দেখাল সলিল।

'তাই নাকি! কই এরকম তো শুনিনি কোনোদিন। আমার মামা তো আলিগড় ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। বলেনি তো কখনও!' সুকান্ত না প্রশান্ত কে যেন টিপ্পুনি কাটে।

দাঁত বের করে খিঁচিয়ে ওঠে সলিল, 'প্রফেসর হলেই সব জানতে হবে নাকি!'

'ঠিক আছে বাবা, হরিশবাবু কীসের সংগ্রাহক ছিলেন? স্ট্যাম্প?'

সলিল হো হো শব্দে প্রাণ খুলে হেসে উঠল। পেটে হাত দিয়ে বলল, 'স্ট্যাম্প! হি হি। স্ট্যাম্প! খেপেছিস? উনি আমাদের ক্লাস সিক্সের ভল্টু না নাইনের মনোহর যে স্ট্যাম্প জমাবেন? হি হি।'

'তবে?'

সলিল গম্ভীর গলায় বলল, 'সে অনেক কিছু। লম্বা লিস্ট। একদিন সময় করে বলবখন। তবে আমি ঠিক করেছি প্রথমটায় কোনো বিশেষ কিছুর মধ্যে আটকে পড়ব না। যা ইচ্ছে হবে সেটাই জমাব। ক-টা বছর পর থেকে ঝাড়াই বাছাই শুরু হবে।'

বন্ধুরা হাসি গোপন করে বলে, 'আমাদের দেখাবি তো?'

সলিল তার জামার ধুলো ঝেড়ে বলল, 'সরি, বছর দুইয়ের আগে কোনো চান্স নেই। সংগ্রহ হাতের মোয়া নয়, সময় লাগে। বছর দুইয়ের পর যদি একটা চেহারা পায় তবেই ডাকব তোদের। নইলে আরও অপেক্ষা করতে হবে।'

'সংগ্রহ' দেখা না গেলেও সলিলের স্কুলে নাম হয়ে গেল 'হরি'। হরিশচন্দ্র থেকে সংক্ষেপে হরি। সেই সলিল ওরফে হরি লেখাপড়া থেকে মন দ্রুত সরিয়ে নিয়ে গোটাটাই ঢেলে দিল সংগ্রহের কাজে। গরিব বাড়ির ছেলে। খরচাপাতির দিকে যেতে পারত না। স্ট্যাম্প, ফটো, মার্বেল গুলি যেটুকু যা কুড়িয়েবাড়িয়ে

boierpathshala.blogspot.com

পেত রাখত। বাকিটুকু হাবিজাবি সব। বিনিপয়সায় যা পাওয়া যায়। পাথরের টুকরো, গাছের ডাল, ফুলের শুকনো পাপড়ি। একবার স্কুলের কার্নিশ থেকে কাক না বকের ডিম নিতে গিয়ে বিরাট কেলেঙ্কারি হল। স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার মতো অবস্থা। হেডস্যার সলিলের বাবাকে ডেকে বলেছিলেন, 'আপনার সংগ্রাহক পুত্রকে স্কুলের সংগ্রহে রাখার কোনো প্রয়োজন দেখি না। আপনি দয়া করে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে আমাদের রক্ষা করুন।'

সেই সলিল এত বছর পরেও একইরকম মেজাজে রয়েছে! ব্রতীন খানিকটা মজাই পেল। বলল, 'তুই বদলাসনি।'

রাত বেশি হয়নি। আবার একেবারে কমও নয়। এসপ্ল্যানেডের এই দিকটায় এখনও লোক চলাচল যথেষ্ট। দোকান-টোকানের ঝাঁপ পড়তে শুরু করেছে সবে। ব্রতীন একটু আগে মিনিবাস থেকে নেমে পড়েছে উদ্দেশ্যহীনভাবে। সে ইচ্ছে করলে বাড়ির দিকে আরও কিছুটা এগিয়ে যেতে পারত। জানলার পাশে বসার জায়গাও পেয়েছিল। তবু তার বসে থাকতে ভালো লাগল না। মনে হল, হাঁটলে মনটা হয়তো কিছুটা শান্ত হবে। কথাকলির বাড়ি থেকে বেরোনোর পর থেকেই তার ভেতরে একটা অস্বস্তি শুরু হয়েছে। খচ্‌খচানির মতো। বারবার মনে হচ্ছে, কাজটা ঠিক হয়নি। এভাবে হুট্ বলতে চলে না এলেই হত। সেরকম হলে টেলিফোনে কথাকলিকে ধরা যেত। ভুল হয়েছে। তা ছাড়া ভুল সে একটা করেনি, দুটো করেছে। দুম করে ও-বাড়িতে চলে যাওয়ার থেকে সেটা আরও বিশ্রি। 'খাবো' বলেও না খেয়ে বেরিয়ে এসেছে সে। না খেয়ে শুধু নয়, আসার সময় কাউকে জানায়ওনি। এটা যে ইচ্ছে করে করেছে এমন নয়। কথাকলি যখন খাওয়ার কথা বলছিল, তখন কিছু না ভেবেই ঘাড় নেড়েছিল। তারপর ব্যাপারটা মাথা থেকে একেবারে বেরিয়ে যায়। কথাকলি ঘর থেকে চলে যাওয়ার পরপরই মনে হয়, তার এখনই এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। আর এক মুহূর্তও থাকা ঠিক নয়। অথচ এমন নয়, কথাকলি তাকে কোনোরকম অপমান করেছে। তাকে সময় দিয়েছে, বসতে বলেছে। খেতেও বলেছে। আর কী করবে? তবু ওর ওই শান্ত ভঙ্গি যেন ফিসফিস করে বলছিল, 'তুমি কেন এসেছ? কেন এসেছ এখানে?' মুখের কথা অনেক সময় তাচ্ছিল্য করলেও চলে। কিন্তু যে-কথা মুখের নয়, তাকে তাচ্ছিল্য করা কঠিন। মাথার ভেতর ঘুরতে থাকে।

এই কারণেই কাউকে না জানিয়ে ওই বাড়ি ছেড়ে দ্রুত বেরিয়ে আসে ব্রতীন। কিছুটা গিয়ে তার মনে পড়ে, আরে, সে খেতে চেয়েছিল না? চেয়েছিলই তো! ছি ছি। খাবার এনে দেখা যাবে, ঘর ফাঁকা। ইস বড্ড ছেলেমানুষি হয়েছে।

boierpathshala.blogspot.com

ফিরে গেলে কেমন হয়? গিয়ে কী বলবে? আমি ভুলে গিয়েছিলাম? আমাকে খেতে দাও।

হাতের সামনে যে-বাসটা পেয়েছে উঠে পড়েছে ব্রতীন। তারপরেও অস্বস্তিটা বাড়তে থাকে। মন শান্ত করবে বলে বাস থেকে নেমে পড়েছে। মন শান্ত হয়নি। ফুটপাথ ধরে অসংলগ্ন হাঁটতে হাঁটতে একটা সময় মনে হয়, এতবড়ো কলকাতা শহরে তার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। নিজেকে বড়ো একা লাগে তার। একা এবং অর্থহীন।

যাওয়ার মতো কোনো জায়গা নেই, এটা বোধহয় ঠিক নয়। কসবার যে ফ্ল্যাটটায় ব্রতীন এখন থাকে সেটা ছোটো হলেও দুচ্ছাই করার মতো নয়। কথাকলিরই পছন্দ করা। বিয়ের আগে আগে কেনা হল। কথাকলি চেয়েছিল, বাপের বাড়ির মতো একটা বড়ো বারান্দা থাকবে। বড়ো বারান্দাওলা ফ্ল্যাটের দাম এখন অনেক। স্কুল মাস্টারের সামান্য মাইনেতে অসম্ভব। তবে বারান্দা না পাওয়া গেলেও শোবার ঘরে একটা জানলা পাওয়া গেল।

কথাকলি বলল, 'থাক এখন, তুমি টিউশনি করে টাকা জমাবে, তারপর না হয় এটা বদলে বড়ো একটা ফ্ল্যাট নেব।'

ব্রতীন বিছানায় গড়িয়ে নিয়ে বলল, 'বাপরে, আবার টিউশন? চাকরি করতেই গায়ে জল আসে।'

কথাকলি বলল, 'তা বললে হবে কেন? সারাটা জীবন এই ঘরে পড়ে থাকব নাকি? ঠিক আছে তুমি না পারো, আমিই একটা চাকরিবাকরি খুঁজে নেব।'

সাংসারিক কেজো কথা থেকে সরে আসার জন্য ব্রতীন তাড়াতাড়ি বলল, 'তোমাদের বাড়ির মতো এই জানলার তলায় একটা বোগেনভিলিয়া পুঁতলে কেমন হয় কথা?'

কথাকলি একটু চুপ করে থেকে সামান্য হাসে। বলে, 'গাছ পুঁতে এ-বাড়িকে অন্যরকম করার দরকার কী? থাক না, এ-বাড়ি নিজের মতোই থাক।'

তারপরেও কথাকলি গাছ নিয়ে আসে। মোসাম্ভা। ছোট্ট বারান্দার টবে সেই গাছ ফুল দেয় আজও। গাছ ভরে যায়।

কথাকলি চলে আসার দিন সুদর্শন রায় গাড়ি পাঠিয়েছিলেন। সরু গলিতে গাড়ি পুরোটা ঢুকতে পারেনি। গলির মুখে দূরে দাঁড়ায়। ব্রতীন বলেছিল, 'টবটাও গাড়িতে তুলে দিই কথা?'

কথাকলি ক্লান্ত হেসে বলল, 'না এখানেই থাকুক। এসো আমরা বরং কিছুক্ষণ বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই।'

boierpathshala.blogspot.com

নাটকের মতো মনে হলেও, সেই বিকেলে সত্যি সত্যি ব্রতীন আর কথাকলি মোসান্ডা ফুলের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। একসময় কথাকলি চা করতে যায়। ব্রতীন বারণ করেছিল। কথাকলি শোনেনি। আসলে চা নয়, চা বানানোর ছুতোয় রান্নাঘরে গিয়ে কাঁদতে চেয়েছিল সে।

সেই কান্নার রান্নাঘর, বারান্দা, ফুল সবই এখনও আছে। তাহলে যাওয়ার জায়গা নেই ভাবছে কেন ব্রতীন? কথাকলি আর থাকে না বলে? হবে হয়তো। জায়গা মানুষের সঙ্গে বদলে বদলে যায়।

বাস থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতেই ঝগড়া শুনতে পেয়েছে ব্রতীন। রাস্তার ঝগড়া কানে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। অন্যমনস্ক থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু এই ঝগড়া অন্যমনস্ক ব্রতীনেরও কানে গেল। কারণ ঝগড়ার কথা ইন্টারেস্টিং।

'নিন, নিন অনেক হয়েছে এবার ছাড়ুন দাদা। দোকান গোটাব।'

'দাঁড়াও দেখি বাপু, বই তোমার চিরুনি, ক্লিপ, শায়ার দড়ি নয় যে তাড়া দিলেই হবে।'

'আপনি এমন করছেন যেন ফুটপাথে লাইব্রেরি খুলে বসেছি। এত ঘাঁটাঘাঁটির কী আছে? ছেঁড়া-ফাটা মাল অত হাতড়ালে চলে? বইয়ের মলাটগুলো যে খুলে খুলে যাচ্ছে মশাই।'

'ঘাঁটব না তো কী করব? বই কি শাড়ি, যে দু-আঙুলে মিহি করে পাড়ের কোয়ালিটি দেখব?'

'ফালতু কথা বলবেন না।'

'হান্ড্রেট টাইমস বলব। বেশ করব বলব। বই নিয়ে যখন বসছ, এভাবেই বেচতে হবে।'

ব্রতীন মুখ ঘোরায় এবং ফুটপাথের আধো আলো, আধো অন্ধকারেই বন্ধুকে চিনতে পারে।

আরে! সলিল না? সলিলই তো? গাল ভর্তি দাড়িতেও চেনা মুখ লুকোতে পারেনি। রাস্তার দিকে পিছন করে ফুটপাথের ওপর থেবড়ে বসে আছে। সামনে চাদরে ছড়ানো গাদাখানেক ছেঁড়াখোড়া, পুরোনো বই। সলিল দু-হাতে সেগুলো উলটেপালটে দেখছে, আর সমানে তর্ক চালাচ্ছে ছোকরা হকারের সঙ্গে।

'বিক্রিরও একটা তরিকা আছে হে। এমন ভাবসাব করছ যেন বই নয়, গোরুর ভুষি নিয়ে বসেছ।'

'জ্ঞান দেবেন না দাদা। লাস্ট ট্রেনের সময় হয়ে গেল, আর উনি আমায়

boierpathshala.blogspot.com

বিক্রির ফর্মুলা শেখায়!'

সলিল হাতে তোলা লাল মলাটের বইটা খুলে বলে, 'অবশ্যই ফর্মুলা আছে। ক্রয়বিক্রয় হল এই সময়ের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দু-দিন পরে ইউনিভার্সিটি কোর্স চালু হবে। বিক্রয়তে বি.এ., এম.এ. ডিগ্রি না থাকলে ফুটপাথে হকারির পারমিশানও জুটবে না তোমাদের।'

পিছনে দাঁড়িয়েই ব্রতীন হেসে ফেলে। দু-পা এগিয়ে সলিলের কাঁধে হাত রাখে। সলিল মুখ ফেরায়, তারপর একটা কথাও না বলে সটান উঠে দাঁড়িয়ে হাত চেপে ধরে ব্রতীনের।

সেই চেপে ধরা এখনও রয়েছে।

ব্রতীন বলল, 'কীরে এবার তো ছাড়বি? ওই দ্যাখ সত্যি সত্যি রাস্তার লোক হাঁ করে দেখছে। '

'দেখুক, যত খুশি দেখুক, চারপাশে ভিড় হয়ে যাক। চাইলে ফটোও তুলতে পারে। দুই ফ্রেন্ডের পুনর্মিলন কোনো অশ্লীল জিনিস নয়। লাস্ট কবে তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল? ক-বছর আগে? হাউ মেনি ইয়ারস?'

ব্রতীন হেসে বলল, 'তারিখ মনে নেই, তবে অন্য জিনিস মনে আছে।'

সলিল ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী মনে আছে?'

'তোর পাগলামি মনে আছে। লেনিন সরণিতে রেকর্ড হাতড়াচ্ছিলি। ফাটা রেকর্ড। তখন তোর চলছিল রেকর্ড কালেকশনের ফেজ। আমাকে কী লেকচার দিয়েছিলি সব মনে আছে। তুই নাকি নিকোলস না পিচবোর্ডের রেকর্ড খুঁজছিস। আমি তো শুনে থ। পিচবোর্ডের রেকর্ড! তখন একটা সাংঘাতিক তথ্য সাপ্লাই করেছিলি। মনে হয়, সেই তথ্যের জন্যই দিনটা মনে আছে।'

'কী তথ্য?'

'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী গানটা নাকি প্রথম ডিস্ক রেকর্ডে পাওয়া রবীন্দ্র-সংগীত। আর সেই রেকর্ড তৈরি হয়েছিল পিচবোর্ডে। আমি বাড়ি ফিরে কথাটা নোট করে রেখেছি। ইমপর্টান্ট কথা। কেমন?'

সলিল দাড়ির ফাঁকে বড়ো করে হেসে বলল, 'বিউটিফুল। ওয়ান্ডারফুল। এই না হলে ব্রতীন বোসের ব্রেইন? স্কুলে ফার্স্ট কি চাঁদু এমনি এমনি হতে?'

ব্রতীন এ-কথার উত্তর দিল না। বলল, 'আজও তোর সঙ্গে দেখা হল ফুটপাথে। শুধু ফুটপাথে নয়, এবারও তুই উবু হয়ে বসে আছিস। আমার মনে হয় পরেরবারও যখন তোর সঙ্গে দেখা হবে, তখনও তুই একইভাবে রাস্তায় বসে থাকবি। তুই কি এখনও কালেক্টর হওয়ার প্ল্যান কনটিনিউ করছিস? নাকি লাইন

boierpathshala.blogspot.com

বদলেছিস?'

সলিল বলল, 'মানে! লাইন বদলেছি মানে? মারব এক চড়। জেনে রাখবি ব্রতীন, আমি একজন বর্ন কালেকটর। জন্ম সংগ্রাহক।'

'কালেকটর অব্ ফুটপাথ?'

দুজনে একইসঙ্গে হেসে উঠল। সলিল ব্রতীনকে একপাশে টেনে নিল। হাত ছেড়ে গম্ভীর হওয়ার ভান করে বলল, 'আসল সংগ্রহ ধুলোবালি থেকেই হয়, কথায় আছে না যেখানে দেখিবে ছাই...।'

ব্রতীন বলল, 'তা এখন কী সংগ্রহের ফেজ চলছে আপনার? বই?'

সলিল গম্ভীর গলায় বলল, 'নো, বই নয়।'

ব্রতীনের একটু আশ্চর্যই লাগল। সলিলের পোশাকের অবস্থা যেন গতবারের তুলনায় আরও খারাপ হয়েছে। ঝলঝলে প্যান্টের ওপর যে-জামাটা পরেছে সেটা ঘি রঙের হতে পারে আবার সবুজও হতে পারে। রং এতটাই ফ্যাকাশে মেরেছে যে আধো অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা তার আর নেই। হয়তো আলোতে গেলে খানিকটা বোঝা যাবে। চুল দাড়ি উশকোখুশকো। তেল সাবানের বালাই পড়েনি অনেকদিন। কাঁধের ঝোলার অবস্থা তথৈবচ। সুতো ঝুলছে। গতবার কী যেন একটা চাকরির কথা বলেছিল, সেটা আছে না গেছে?

ব্রতীন একটু হেসে বলল, 'সেকি! বইয়ের সামনে বসে দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়া করছিস, বই কালেক্ট করছিস না তো কী করছিস?'

সলিল ভুরু নাচিয়ে বলল, 'মৌচাক কি মৌমাছির জন্য সংগ্রহ করা হয়? নাকি মধুর জন্য? আমিও সেরকম। মৌচাকের মধ্যে মধু খুঁজছি।'

নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল সলিল। ব্রতীনের বেশ লাগছে। মনটা যেন খানিকটা হালকা হচ্ছে।

'বাপরে, হেঁয়ালি শিখেছিস বটে। তুই অবশ্য চিরকাল ঘুরিয়ে পেঁচিয়েই কথা বলতিস। ব্যাপারটা কী?'

'ব্যাপার মারাত্মক। মারাত্মকেরও বেশি। আমার বাড়ি নিয়ে গিয়ে তোকে আমার লেটেস্ট কালেকশন দেখাব। পিলে চমকে যাবে। হার্ট কীরকম?'

'খুব দুর্বল, আমাকে আজ ছেড়ে দে। বরং ঠিকানাটা দে, ছুটির দিন দেখে একটা ফস করে চলে যাব।'

শুনল না সলিল। একরকম ঠেলেই ট্রামে তুলল। ট্রামের ঝিম ধরা আলোয় উজ্জ্বল হেসে বলল, 'দেখিস চন্দনা তোকে দেখলে কী কাণ্ড করে। রান্নাবান্না

boierpathshala.blogspot.com

চাপিয়ে একটা এলাহি ব্যাপার হবে মনে হচ্ছে। একটাই ভয়, এত রাতে বাজারে না পাঠায়।'

ব্রতীন সংকুচিত গলায় বলল, 'না, না, ওসব কিছু করিস না। এক কাপ চা খেয়েই বিদায় নেব।'

'বিদায় নেবে না থাকবে সে তো আমার হাতে নেই বাছাধন। পাকাড়ানোর সময় বললাম না, লকআপে ঢুকিয়ে আমার দায়িত্ব শেষ। তারপর আমার বউ বুঝবে।'

ডান হাতটা ব্রতীনের হাঁটুর ওপর রেখে সলিল বলল, 'তা ছাড়া অন্য একটা কারণ আছে।'

'অন্য কারণ!'

'হ্যাঁ, তোকে এই যে টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি তার অন্য কারণ আছে। আমি খবর পেয়েছি, তুই ডাক্তারি পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়েছিস। অন্য কোনো কারণে নয়, স্রেফ ভালো লাগছে না বলে ছেড়ে দিয়েছিস। এটা একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করেছিস। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বউকে দেখাব, ছেলেকে দেখাব। ক্যামেরায় যদি ফিল্ম থাকে তোর সঙ্গে ফটো তুলব। শালা, মুরোদ আছে বটে।'

ব্রতীন হেসে বলল, 'দুর, এর মধ্যে মুরোদের কী আছে? জীবনটা তো আমার। যা ইচ্ছে করার অধিকারও আমার। তা ছাড়া সবার যে সবকিছু ভালো লাগবে এমনটা তো কোথাও লিখে দেওয়া নেই।'

'ব্রত, তুই নিজেও জানিস যত ইজি কথাটা বলছিস, ঘটনা তত ইজি নয়। নিজের ভালো লাগার জন্যও মানুষ কতটা দূর পর্যন্ত যাবে তার গণ্ডি কাটা থাকে। যারা সেই গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে তারাই সত্যিকারের গ্রেট ম্যান। রকেটের মতো, মাধ্যাকর্ষণ ছেড়ে ভুস করে মহাকাশে চলে যায়।'

ব্রতীন 'হো হো' শব্দে হেসে উঠল। বহুদিন পর সে ট্রামে উঠেছে। ঘটাং ঘটাং আওয়াজ আর অলস দুলুনি বেশ লাগছে।

'তুই থামবি সলিল? এত সার্টিফিকেট দিলে কিন্তু এবার আমি নেবে যাব।'

'ব্রত, তোর ঘটনা শোনার পর থেকেই আমি ঠিক করেছিলাম, আবার যদি কোনোদিন দেখা হয়, কোনো ওজর আপত্তি শুনব না। ঘাড় ধরে বাড়ি নিয়ে যাব। চন্দনাকে দেখিয়ে বলব, দ্যাখ আমার হবি নিয়ে রাগারাগি কর, আর এরকম মানুষও আছে যে নিজের শখে অনায়াসে লাখ লাখ টাকার কেরিয়ার ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে।'

'আমার আবার কী শখ!'

boierpathshala.blogspot.com

'নিজের খুশিতে বাঁচার শখ। এটাও একটা কলেকশন। সংগ্রহ করতে হয়।'

ব্রতীন বাইরে তাকাল। এটা কোন রাস্তা? অন্ধকারে দুম করে চেনা যায় না।

'অনায়াসে পারিনি, অনেক লড়তে হয়েছিল। বাইরে ভেতরে দু-জায়গাতেই লড়তে হয়েছিল। আজ মাঝে মাঝে মনে হয় কাজটা ঠিক করিনি। যাক তোর কাজকর্মের কী খবর সলিল? চাকরি আছে না গেছে?'

এক মুখ দাড়িতে সুন্দর হেসে সলিল বলল, 'গেছে। গন। আমি এখন কমপ্লিট বেকার।'

এন্টালি মার্কেটের পিছনে সরু গলির ভেতর অনেকটা গেলে ঘর। এই খটখটে গরমেও কোথা থেকে যেন জল গড়িয়ে আসছে। গলির গায়ে লাগানো আলোতে আর যাই হোক অন্ধকার কাটে না। কোথায় যেন একটা বাচ্চা একটানা কাঁদছে। গলির চেহারাই বলে দেয়, এখানে কান্নাকাটি কোনো ঘটনা নয়।

বন্ধ দরজায় সলিলকে কড়া নাড়তে হল অনেকক্ষণ।

'এই হল চন্দনাকে নিয়ে সমস্যা। ছেলেকে নিয়ে মাঝেমধ্যে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে দরজা ধাক্কালেও শুনতে পায় না।'

'ছেলে কত বড়ো?'

'ক্লাস ফাইভ হয়ে গেল। তোর ছেলেপিলে কিছু আছে?'

ব্রতীন হেসে বলল, 'ও পাট নেই।'

'মানে।'

'মানে আর কী? নেই মানে নেই।'

'বউ?'

'নেই।'

বন্ধ দরজায় হাত রেখেই হেসে উঠল সলিল। বলল, 'তাহলে তুই হলি নেই-সম্রাট?'

ব্রতীনও হাসল। আরও খানিকটা পরে দরজা খুলল যে-বালকটি তার গা খালি। হাফপ্যান্ট। ঘরের বিবর্ণ আলোতেই দেখা গেল, ছেলেটি হাড়জিরজিরে ধরনের রোগা। তাকে একরকম ঠেলেই ভেতরে ঢুকে পড়ল সলিল।

'মা কই?'

ছেলে ব্রতীনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা, ও-ঘরে, শুয়ে আছে।'

সলিল ভুরু কুঁচকে বিরক্ত গলায় বলল, 'শুয়ে আছে! এই ভরসন্ধেতে শুয়ে আছে কেন?'

boierpathshala.blogspot.com

বালকটি নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'জ্বর হয়েছে।'

জ্বর হয়েছে শুনে ব্রতীন থমকে গেল। অসুখের বাড়িতে ফট করে আসাটা ঠিক হল কি? সলিল হাত ধরে টান দিল ঘরের ভেতর। তারপর দরজায় ছিটকিনি তুলতে তুলতে বলল, 'নে বোস। যেখানে খুশি বোস। ঠিক আছে খাটেই উঠে যা। আরাম পাবি।'

ঘরে 'আরাম' পাওয়ার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। ব্রতীন এক ঝলকে ঘর দেখে নিয়েছে। অবস্থা খুবই শোচনীয়। সলিলের পোশাকের মতোই টানাটানির ছাপ সর্বত্র। বেকার সংসারী লোকের ঘরের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। খাটে রংচটা চাদর। পায়ায় ইঁট দিয়ে খাট উঁচু করা। নিশ্চয় বর্ষায় ঘরে জল ঢোকে। ওপরে তোবড়ানো বালিশ। একপাশে টেবিল, জালের পাল্লা দেওয়া মিটসেফ, টিনের ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের ওপর যত্ন করে টেবিল ক্লথ। ভেতরে যাওয়ার দরজায় মাথা ছেঁড়া পর্দা ঝুলছে দৈন্যের সাক্ষী হয়ে।

সলিল ছেলের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বলল, 'হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? প্রণাম কর। আমাদের বেস্ট বয়। নাইনটি ইন অল সাবজেক্টস। একবার অঙ্কে একশোর মধ্যে পেল একশো এক।'

ব্রতীন লজ্জা পেয়ে বলল, 'দুর ওসব ছাড় তো।'

'কেন ছাড়ব কেন? ঘটনা মিথ্যে? সেবার তুমি একশোতে একশো এক পাওনি চাঁদু? হান্ড্রেড ফর ম্যাথস, ওয়ান ফর হ্যান্ডরাইটিং?'

সলিল মিটমিটে নিওন আলোর তলায় বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন বিরাট গর্বের কিছু ঘটেছে।

রোগা ছেলেটি প্রণাম করতে এগিয়ে এলে ব্রতীন তাকে টেনে নিল। ইস, ছেলেটার জন্য কিছু আনা উচিত ছিল। সলিল কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে রাখল খাটে।

'তুই বোস ব্রত, আমি চন্দনাকে গিয়ে খবর দিই। তুই এসেছিস শুনলে তার জ্বর বাপ বাপ্ বলে পালাবে। লাস্ট বয়ের বাড়িতে বেস্ট বয়—চাট্টিখানি কথা?'

সলিল ভেতরে চলে গেলে ব্রতীনের মনে হল, সলিল তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে। কিন্তু এই বাড়াবাড়ি থামানোর কায়দা তার এই মুহূর্তে জানা নেই। অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হচ্ছে না এলেই হত। আজ এরকম হচ্ছে কেন? বারবার ভুল হয়ে যাচ্ছে!

'তোমার নাম কী?'

'দীপ, দীপায়ন কর্মকার। তোমার নাম কী?'

boierpathshala.blogspot.com

ছেলেটি স্মার্ট। ব্রতীন নিজের নাম বলল।

'তুমি কোথায় পড়?'

'বাড়িতে।'

'বাড়িতে! কেন স্কুলে যাও না?' ব্রতীন খানিকটা চমকে উঠল। সলিলের অবস্থা এতটাই খারাপ?

দীপ মিটসেফের জালে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'যেতাম, গত মাস থেকে মা পাঠায় না।'

ব্রতীন চুপ করে থাকে। কী বলবে বুঝতে পারে না। বালকটি এবার ফিক করে হেসে উঠল। ব্রতীন অবাক হয়ে বলল, 'হাসছ কেন?'

বালক পিছনে ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আজ বাড়িতে ঝামেলা আছে তাই হাসি। হি হি।'

'ঝামেলা! কেন কী হয়েছে?' ব্রতীন পিঠ সোজা করে।

দীপ মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি চালিয়ে যেতে থাকে। মাঝেমধ্যে পিছন ফিরে তাকায়। যেন কেউ ঢুকলেই হাসি বন্ধ করবে। গলা নামিয়ে বলে, 'যেদিন যেদিন বাবা বাড়িতে লোক আনে সেদিন বাড়িতে খুব ঝামেলা হয়। মায়ে রাগে, চিৎকার করে। সোমবার বাবা এক বুড়োকে নিয়ে এল। সেই লোক চলে যাওয়ার পর মা রাতে দেয়ালে মাথা ঠুকল। হি হি।'

ব্রতীন পিঠ সোজা করে বসল। আচ্ছা, সমস্যায় পড়া গেল তো। এই ছেলে শুধু স্মার্ট নয়, ধুরন্ধরও বটে। মিথ্যে বলছে না তো? তাই হবে। দারিদ্র্য সহজেই মিথ্যে বলতে শেখায়। নইলে মায়ের মাথা ঠোকার গল্প বলতে বলতে কোনো বালক হাসতে পারে?

'মাকে বাবা এখন সাজতে বলবে। পাউডার, লিপস্টিক, শাড়ি, বেলাউজ। হি হি। তারপর আমি যখন ঘুমায়ে যাব, মাকে বলবে, চন্দনা একটা গান শোনাও। মা বলবে, শোনাব না। বাবায়ে বলবে, অবশ্যই শোনাবে, হান্ড্রেড টাইম শোনাবে। অতিথিরে গান শোনাবে না তো কারে শোনাবে? আমারে? এই নাও হারমোনিয়াম, নাও গান কর। গান চলার মাঝখানেই একসময় বাবা বলবে, তোমরা দুজনে বোসো, আমি ছুটে গিয়ে একপ্যাকেট সিগারেট আনি। যাব আর আসব। কিন্তু আসবে অনেক পরে... হি হি...।'

শিরদাঁড়া দিয়ে শীতল অনুভূতি বয়ে গেল ব্রতীনের। ঘরে লোক আনে সলিল!

boierpathshala.blogspot.com

বারো

'ম্যাজিক।'

'ম্যাজিক!' ব্রতীন অবাক গলায় বলল।

'হ্যাঁ, ম্যাজিক। তবে তুই ইচ্ছে করলে ম্যাজিক না বলে জাদুও বলতে পারিস। জাদুবিদ্যা। হাজার হাজার বছর আগের জিনিস। তখন ভেলকি বলা হত।'

কথা শেষ করে সলিল হাসল। সুন্দর হাসি। সেই হাসি ঘরের ম্লান আলোয় ঝলমল করে উঠল। ব্রতীন অবাক হল। এর পরেও এই ছেলে এত সুন্দর করে হাসে! সম্ভবত হাসি-ই হল মানুষের সেই জিনিস যা সবথেকে বেশি বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে। সে যা নয়, যেমন নয়, চারপাশে তার ছায়া তৈরি করে। যে দেখে সে জানতেও পারে না বাইরের সুন্দর হাসির মানুষটা ভেতর ভেতরে আসলে কতটা অ-সুন্দর হয়ে আছে।

ব্রতীন নীচু গলায় বলল, 'তুই ম্যাজিক শিখছিস?'

'দূর পাগল, ম্যাজিক শিখব কেন? ম্যাজিক কালেক্ট করছি, সংগ্রহ। প্রাচীন জাদুবিদ্যার কৌশল সংগ্রহ। রাজ্যের পুরোনো বইপত্তর থেকে ঘেঁটেঘুঁটে টুকে রাখি। ভোজবাজি, ছায়াবাজি, ভানুমতীর খেল—এইসব। আজও ফুটপাথে বসে ওই কাণ্ড করছিলাম। ম্যাজিকের বই খুঁজছিলাম। তবে একেবারে জলের দর না হলে কিনতে পারতাম না। পয়সা কোথায়?'

'তাহলে?'

ব্রতীন যে উৎসাহের সঙ্গে কথা বলছে এমন নয়। যা ঘটেছে তারপর আর [illegible] হোক এই ছেলের উৎসাহ নিয়ে কথা বলা যায় না। কিন্তু কিছু তো বলতে হবে। অন্তত এখান থেকে পালানো পর্যন্ত।

boierpathshala.blogspot.com

সলিল বলল, 'তাহলে আর কী? পথেই বসেই টুকে নাও চাঁদু। একবার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে এন্ট্রি নেওয়ারও চেষ্টা করেছিলাম। কলেজ, ইউনিভার্সিটির পরিচয় নেই, তার ওপর আবার ছেঁড়াখোঁড়া জামাকাপড়। গেট থেকেই তাড়িয়ে দিল। তবে ওদের তাড়ানোর কায়দাটা ভালো। লেখাপড়ার জায়গা তো। ভদ্রভাবে ঘাড় ধাক্কা দেয়। জামাকাপড়ের কথা বলে না, আইডেনটিটি চায়। ভদ্রলোকের আইডেনটিটি।'

সলিলের কোলের কাছে মলিন কয়েকটা ডায়েরি, খাতা, ছেঁড়া কাগজ ফ্যানের হাওয়ায় উড়ছে। খাটের তলার ট্রাঙ্ক টেনে বের করেছে এসব। বিছানার ওপর ছড়িয়ে বসেছে।

ইচ্ছে করছে না, তবু ব্রতীন হাত বাড়িয়ে ডায়েরিটা নিল। পাতা উলটোতে উলটোতে বলল, 'কী করবি এগুলো নিয়ে? এত ম্যাজিক লিখেছিস কেন?'

ব্রতীনের প্রশ্নে ভুরু কুঁচকে সলিল বলল, 'কিছুই করব না। ওনলি কালেকশন। ছেলের জন্য শুরু করেছিলাম, তারপর নিজেই ইন্টারেস্ট পেয়ে গেছি। এই দ্যাখ ডায়েরিটা বোঝাই হয়ে গেছে। তবে সব যে ক্লাসিকাল ট্রিকস এমন নয়। ইচ্ছে আছে, ব্ল্যাক ম্যাজিকেও হাত দেব। একটু-আধটু শুরুও করেছি। ব্ল্যাক ম্যাজিক কী জানিস?'

ব্রতীন মাথা নেড়ে বলল, 'সে আর একদিন শুনব'খন। আজ বরং উঠি সলিল। রাত হয়ে যাচ্ছে। অনেকটা যেতেও হবে।'

সলিল হাত বাড়িয়ে ব্রতীনের কাঁধটা ধরল। চোখ বড়ো করে বলল, 'যাবি মানে! খেপেছিস? আগে আমার কালেকশন দেখ। ট্রাম ভাড়া দিয়ে কি তোকে এতদূর এমনি এমনি টেনে আনলাম?'

কাঁধ থেকে সলিলের হাত সরিয়ে ব্রতীন শুকনো হেসে বলল, 'দেখব কী করে? তুই তো আর ম্যাজিশিয়ন নোস।'

'কে বলল নই? আমরা সবাই ম্যাজিশিয়ন। ম্যাজিক না জানলে বেঁচে আছি কী করে? ঘরদোরের হাল দেখে বুঝতে পারছিস না? কবে মরে ভূত হয়ে যেতাম।'

আওয়াজ করে হেসে উঠল সলিল। হাসতে হাসতেই বলল, 'দাঁড়া চন্দনা আসুক। আমার বউ তোর কথা শুনে দারুণ এক্সাইটেড। আমি বললাম, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ব্রতীনকে পালাতে দেব না, তুমি ছেলেকে খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে তবে এসো। আমি ততক্ষণ ভেলকির কালেকশন দেখাচ্ছি।'

চুপ করে রইল ব্রতীন। বউকে নিয়ে সলিল কত সহজে মিথ্যে কথাগুলো

boierpathshala.blogspot.com

বলছে! অভাব মানুষকে সহজেই মিথ্যে শেখায়, এতটা নীচেও কি নামাতে পারে? নামায় তো বটেই, নইলে সলিল এতদূর নামল কী করে? লোক ধরে এনে স্ত্রী-র ঘরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে! ভয়ংকর! অথচ পথে কিছুই বোঝা যায়নি। সেই ছেলেবেলার মতো হাসিখুশি, ফুর্তিবাজ। জোরে জোরে হাসছে, জগৎ সংসারের প্রতি একটা ডোন্টকেয়ার ভাব। তবে? এই নোংরা কাজে সে নামল কী করে? শুধুই কি অভাব? নাকি ভালো থাকার সাধ আহ্লাদ? গল্প উপন্যাসে এরকম হয়, বাস্তব জীবনেও এরকম ঘটে! ছোটো ছেলেটার মুখে ঘটনা শুনে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল ব্রতীনের। ইস, কেন রাস্তার মাঝখানে ডাকতে গেল সলিলকে? কেন সামান্য জোর করতেই চলে এল? এমন নয়, সলিল তার খুব কাছের কেউ। বন্ধু হিসেবেও সে ছিল অতি সামান্য। ছেলেবেলায় এমনটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বন্ধু থাকে অসংখ্য। সকলেরই থাকে। মন থেকে মুছেও যায় হেলাফেলায়। সলিলের বেলায় সেটা হয়নি। হয়তো সংগ্রহের স্বভাবই তাকে খানিকটা আলাদা করে রেখেছিল। দু-একবার দেখাও হয়ে গেছে। সবটা মিলিয়েই হারিয়ে যায়নি মন থেকে। তবে তার মানে এই নয়, সামান্য জোর করতেই একেবারে বাড়ি পর্যন্ত চলে আসতে হবে। সম্ভবত কথাকলির বাড়ির ঘটনা তাকে দুর্বল করে রেখেছিল। দুর্বল এবং অন্যমনস্ক। সলিলের হাত ছাড়াতে পারেনি। নাকি চায়নি? কে জানে, হয়তো সেটাই হবে। নিজেই ভেতরে খানিকটা হালকা হতে চাইছিল। সেই কারণেই যুক্তি হারিয়ে এখানে চলে আসা। কাজটা ঠিক হয়নি। একেবারেই ঠিক হয়নি।

আজ বারবার ভুল হচ্ছে কেন!

সলিলের ছেলেটা ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর ব্রতীন দরজার দিকে দেখেছিল। ছিটকিনি তোলা আলতো ভাবে। নিঃশব্দে উঠলেই পালিয়ে যাওয়ার পথ। আবার পালানো? কথাকলির বাড়ি থেকেও পালিয়ে এসেছে। থমকে গেল ব্রতীন। আর কত পালাবে?

আর ঠিক তখনই ছেঁড়া পর্দার আড়াল থেকে চাপা গলার ঝগড়া ভেসে এল। চমকে উঠল ব্রতীন। এই কি চন্দনার গলা? সলিলের বউ?

'যাব না...কিছুতেই যাব না। রোজ রোজ আমি পারছি না।'

'কী পারছ না? একটু বসবে, হাসবে, দুটো কথা বলবে। এর মধ্যে রোজ রোজের কী আছে?'

সলিলের গলায় হিসহিসানি।

'কী আছে জানো না তুমি? জানো না? নিজের বউকে সাজিয়ে

boierpathshala.blogspot.com

পুরুষমানুষের সামনে ঠেলে দিতে জানো আর এইটুকু জানো না।'

'অত ছি ছি দেখিও না। ক-টা টাকা ধার চাইবে তার জন্য ছি ছি করছ কেন? আমি তো টাকা নিয়ে নিচ্ছি না, ফেরত দিয়ে দেব।'

'ধার? লজ্জা করছে না বলতে? লোকে কি এমনি এমনি ধার দেয়... বদলে কী চায় জানো না? কী দিতে হয়। ভালো করেই জানো। আর জানো বলেই পালিয়ে যাও।'

সলিল কঠিন গলায় বলে উঠল, 'বাজে কথা বোলো না চন্দনা...এই তো তোমার চেহারা, কী চাইবে তোমার কাছ থেকে? মনে রাখবে বাজারে মেয়ে-মানুষের অভাব নেই। তারা তোমার থেকে ঢের ঢের সুন্দরী।'

'চুপ কর। চুপ কর...সংসার চালানোর মুরোদ নেই, রোজগার নেই, বউকে লোকের বিছানায় তুলে দিচ্ছ... ছেলে দেখছে...'

বলতে বলতে মেয়েটা যেন তীক্ষ্ণ গলায় কেঁদে ওঠে।

সলিল নীচু গলায় দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ন্যাকামি কোরো না...দুটো কথা বললে, একটু হাসি মশকরা করলেই বিছানায় ওঠা হয় না...সংসার আমার একার নয়। কথা বাড়িয়ো না....যা বললাম তাই কর, আমি গিয়ে বসছি...এখনই যেতে হবে না, মুখ-টুখ পরিষ্কার করে আসবে।'

'আমি মরে যাব, ঠিক একদিন গলায় দড়ি দেব।'

'তাই দিও। ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে চলে এসো। নইলে...'

'নইলে কী? মারবে তো? মারো...যত খুশি মারো। তোমার বন্ধু জানুক। আমি চিৎকার করব...পাড়ার লোক ডাকব...।'

সলিল ধমকে উঠল, 'চুপ চুপ বলছি। ব্রতীন যদি তোমার কান্নাকাটি শুনে চলে যায়, কপালে দুঃখ আছে চন্দনা। একটা কথাও যদি ও শুনতে পায়...শুধু তোমার নয়, তোমার ছেলেরও আজ বিপদ হবে। যা বলছি মন দিয়ে শোনো...।'

এরপর আর চলে যাওয়া যায় না। বিহ্বল ব্রতীন বসে রইল পাথরের মতো। এ সে কোন্ নরকে এসে পৌঁছোল?

এর পরপরই ঘরে এসে হাসিমুখে ম্যাজিকের খাতা খুলে বসেছে সলিল। যেন কিছুই ঘটেনি। কিছুই ঘটে না এ-বাড়িতে। ব্রতীন যতটা পারে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে। পুরোটা পারছে না। থেকে থেকে চোখমুখ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। নিজে থেকেই শরীরের মধ্যে একটা জড়োসড়ো ভাব চলে এসেছে। তবু সে চেষ্টা করছে সহজ হওয়ার। সলিল যেন বুঝতে না পারে সে ঘরের ভেতরের কথা শুনেছে। তার ছেলেটা কি সবাইকেই একইভাবে ইঙ্গিত দিয়ে যায়? ওইটুকু

boierpathshala.blogspot.com

ছেলে বোঝে কী করে! মায়ের অপমান সন্তান কি অপরিণত বয়েসেও বুঝতে পারে? নাকি তাকে দেখে আলাদা কিছু ভেবেছিল? যাই হোক, সলিল যেন কিছু ধরতে না পারে। নইলে কে জানে রাগারাগি করে হয়তো ভয়ংকর কোনো কাণ্ড ঘটাবে। নিজের স্ত্রীকে বাইরের লোকের কাছে ঠেলে দেওয়ার থেকেও ভয়ংকর কিছু আছে কি?

'আমার কালেকশনে এখন কতগুলো আগুনের ভোজবাজি আছে জানিস?'

কথাটা বলে সলিল মিটিমিটি হাসছে।

'আগুন!' ব্রতীন অবাক হল।

'আগুন না বলে অগ্নি বলাই ভালো। একটা ওল্ড স্মেল থাকবে। আমি অবশ্য নাম দিয়েছি অগ্নি বিষয়ক জাদু। ম্যাজিক উইথ ফায়ার। কথায় বলে না, আগুন নিয়ে খেলা?'

ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগল সলিল।

'ঘাবড়ে গেলি নাকি? এই দেখ, জলে অগ্নি, কাপড়ে অগ্নি, হস্ত মাঝে অগ্নি, অগ্নিকে বক্ষে ধারণ, অগ্নি দিয়ে লেখা, অগ্নি বিনা অন্ন প্রস্তুত। তবে সব থেকে ইন্টারেস্টিং কী পেয়েছি জানিস?'

'কী?'

ব্রতীনের মনে হচ্ছে তার সামনে বসা মানুষটা খানিকটা অসুস্থও। মানসিক ভাবে অসুস্থ।

'অগ্নি ভক্ষণ।'

'মানে!'

'মানে আর কী, আগুন খাওয়া। ফায়ার ইটিং। খেলাটা পেয়েছি, বজবজ লাইনের ট্রেনে। একটা বুড়ো হকার বই বেচছিল। চটি চটি বই সব। ভাগ্য, রান্না, অর্শের নিরাময়, সহজে দাম্পত্য সুখ। হঠাৎ দেখি, তার মধ্যে মুনিঋষিদের কেরামতি বলেও একটা ভ্যালুয়েবল জিনিস রয়েছে। হারামজাদা পাঁচ টাকা চাইল। অনেক দরাদরি করে শেষ পর্যন্ত দু-টাকাতে ম্যানেজ করলাম। উলটে দেখি এই মারাত্মক জিনিস, অগ্নি ভক্ষণ। বাড়ি ফিরেই সংগ্রহে ঢুকিয়ে নিয়েছি। দাঁড়া তোকে পড়ে শোনাই।'

ব্রতীন কিছু বলার আগেই মুখের কাছে ডায়েরি তুলে, পাতা উলটে পড়তে শুরু করে দিল সলিল। স্কুলের ছেলে যেন রিডিং পড়ছে।

'পরিমাণ মতো কর্পূর কি.আকরকরা বচ চর্ব্বণ করিয়া তাহার কয়েকটা গালের একপাশে রাখিতে হইবে। তাহার পর দেবদারু বা অ্যারারুটের কয়লার

boierpathshala.blogspot.com

অগ্নি মুখে রাখিলে মুখ পুড়িবে না। বলা আবশ্যক যে এক-একবার করিয়া মুখে ফেলিতে হইবে। যদি অধিক পরিমাণ অগ্নি মুখে এককালে ফেলিতে হয়, তবে পূর্বে রক্ষিত কর্পূরের রস গলাধঃকরণ ও চর্ব্বণ করিতে হইবে।'

সলিল মুখের সামনে থেকে ডায়েরি সরিয়ে চোখ নাচিয়ে বলল, 'কালেকশন কেমন?'

ব্রতীন কী বলবে বুঝতে পারছে না। সে মাথা নাড়ল। একটা কাজ করলে কেমন হয়? কিছু টাকা হাতে দিয়ে যদি উঠে পড়ে?

'তোর ছেলের জন্য কিছু আনিনি, এটা রাখ সলিল, কিছু কিনে দিস।'

খারাপ হয় না। পালিয়ে যাওয়ার এটাই একমাত্র উপায় মনে হচ্ছে। সলিলও নিশ্চয় কিছু মনে করবে না। টাকার জন্যই তো বাড়ি পর্যন্ত ধরে আনা। কিন্তু সঙ্গে কত আছে? দশ, বিশ, পঞ্চাশে কি ছাড়া পাওয়া যাবে?

সলিল নিজের মনেই পাতা উলটোতে উলটোতে বলল, 'দাঁড়া আরও একটা আছে। এটাও আগুন খাওয়া। এই তো পেয়েছি, নে শোন—প্রথমে তরল ইস্টরাক্স জিহ্বাতে মাখাইয়া জ্বলন্ত অঙ্গারে গন্ধকগুঁড়া মিশ্রিত করত অতি সাবধানে জিহ্বার উপর রাখিতে হইবে। আশ্চর্যের বিষয় উহাতে জিহ্বা পুড়িবে না। কিন্তু এই কার্যটি করিতে হইবে অতি সতর্কতায়। অন্যথায় মুখমণ্ডল পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক।'

ডায়েরি বন্ধ করে সলিল দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে হাসিমুখে বলল, 'মারাত্মক না?'

ব্রতীন বিড়বিড় করে বলল, 'হ্যাঁ, মারাত্মক।'

'ঠিক করেছি, আমার কালেকশনের যখন এগজিবিশন হবে তখন আগুনের ওপর একটা আলাদা সেকশন রাখব। কেমন হবে?'

ব্রতীন মাথা নামিয়ে বলল, 'ভালো হবে।'

সলিল ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী হয়েছে বল তো? তুই অমন গুটিসুটি মেরে গেলি কেন? ছোটো ঘর বলে অসুবিধে হচ্ছে?'

ব্রতীন তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাল। বলল, 'না না, তা কেন হবে? কী যে বলিস না তুই। তোর সঙ্গে একটা কথা আছে সলিল।'

'একটা কেন? হাজারটা কথা বল না। কে তোকে বারণ করেছে। কথার জন্যই তোকে ধরে আনা। সবার আগে বল, আমার কাজ দেখলি? বলেছিলাম না সাংঘাতিক? তখন বিশ্বাস করলি না।'

'কে বলল বিশ্বাস করিনি? বিশ্বাস না করলে কী আসতাম?'

boierpathshala.blogspot.com

সলিলের মুখ জ্বল জ্বল করে উঠল।

'বলছিস?'

এই ছেলের কাছ থেকে পালাতে গেলে মাথা ঠান্ডা করে পালাতে হবে। ব্রতীন মাথা ঠান্ডা করার চেষ্টা করল।

'তা নয় তো কী? তোর আগুনের কালেকশন তো দুর্দান্ত। এসব জিনিস হারিয়ে গেছে। ঠাকুর ভাসানের সময় দেখতাম প্রসেশনে ছেলে-ছোকরারা মুখে আগুন নিয়ে ছুড়ছে। তা বলে একেবারে গিলে বসে থাকা! বাপরে!'

সলিল গদগদ গলায় বলল, 'তুই বলছিস, অন্য কেউ হলে পাগল ছাগল বলত। এদেশে গুণী মানুষকে পাগল বলাটা একটা কমন ব্যাপার।'

ব্রতীন সোজা হয়ে বসল। বলল, 'সলিল, একটা কথা বলব, না বলতে পারবি না।'

সলিল খাটের গায়ে হেলান দিয়ে পায়জামা পরা পা দুটো সামনে ছড়িয়ে দিল। মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলল, 'একটা কেন? হাজারটা কথা বল। কিন্তু হ্যাঁ, না-এর প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না বাপু। তুমি যদি এখন বল, আগুন ভক্ষণের রেসিপিটা দাও বাড়ি গিয়ে প্র্যাকটিস করব, সরি রাজি হতে পারব না। সেটা একটা ডেনজারাস ব্যাপার হতে পারে।'

এই অবস্থাতেও ছেলেটা ঠাট্টাতামাশা করে কীভাবে! রাগ হচ্ছে, আবার সেই রাগ কেমন করে যেন সরেও যাচ্ছে। আশ্চর্য!

ব্রতীন তাড়াতাড়ি বলল, 'না না সেসব কিছু নয়, আগুন খেতে চাই না...।'

মাঝখানেই থেমে যেতে হল। ভেতরে যাওয়ার ছেঁড়া মলিন পর্দা সরিয়ে এক মহিলা ঢুকেছে। মহিলা না বলে তরুণী বললেও ভুল কিছু হবে না। কৃশকায় মেয়েটি গায়ে আঁচল জড়িয়ে আছে। হাতে চায়ের কাপ। সলিল বন্ধুর চোখ অনুসরণ করে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল। একগাল হেসে বলল, 'এসো চন্দনা, এসো। বাপ রে ছেলে সামলাতে এতক্ষণ লাগল?'

ব্রতীন উঠে দাঁড়াতে গিয়েও নিজেকে সামলাল। বন্ধুর স্ত্রীকে দেখে উঠে দাঁড়ানোটা একটা বাড়াবাড়ি হবে। মেয়েটি এগিয়ে এসে চায়ের কাপ রাখল চাদর চাপা দেওয়া ট্রাঙ্কের ওপর। ঘরে এটাই টেবিল।

সলিল খাট থেকে পা নামিয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, 'দিস ইজ ব্রতীন। আমাদের বেস্ট বয়।'

চন্দনা হাসল। হাত জড়ো করে বলল, 'নমস্কার, নিন চা-টা খেয়ে নিন।'

সলিল স্ত্রী-র দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বাসের ভঙ্গিতে বলল, 'শুধু হাত তুলে

boierpathshala.blogspot.com

নমস্কার! পায়ে গড় হওয়া উচিত।'

ব্রতীন বিরক্ত গলায় বলল, 'কী যা-তা বলছিস।'

সলিল খাটের ওপর ছড়ানো ডায়েরি, খাতা দু-হাতে জড়ো করতে করতে বলল, 'যা-তা বললেই হবে? জানো চন্দনা, এই হল সেই ছেলে যে ডাক্তারি পড়তে পড়তে তুড়ি মেরে ছেড়ে দিয়েছে। কেন? না বাবুর মানুষ কাটতে ইচ্ছে করছে না। বোঝ কাণ্ড। লাখ লাখ টাকার রোজগারের সুযোগে পদাঘাত। খবর পেয়ে তোমাকে বলেছিলাম না, ব্যাটা হয় ভগবান, নয় শয়তান।'

এতক্ষণ বাদে চন্দনা নামের মেয়েটি কথা বলল। নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'নিন, চা-টা খেয়ে নিন। জুড়িয়ে যাবে।'

ব্রতীন কাপটা নিতে নিতে বলল, 'এত রাতে আপনি আবার চা করতে গেলেন কেন?'

চন্দনা বলল, 'ছি ছি, সত্যি অনেক রাত হয়ে গেল। আপনি বরং বাদ দিন। চা খেতে হবে না। আমি ভাত বসিয়েছি, আপনি কিন্তু দুটো খেয়ে যাবেন।'

ব্রতীন দ্রুত কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'এটা বলবেন না, রাতে খেতে পারব না।'

সলিল উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখ পাকিয়ে বলল, 'কেন পারবি না? রাতে কি তুই খাস না? তা ছাড়া চন্দনা যে কষ্ট করে ভাত করল তার কী হবে? ফেলে দেবে? চালের দাম জানিস?'

চন্দনা এবার হাত তুলল। সহজ গলায় বলল, 'ওভাবে বলছ কেন? উনি নিশ্চয় খেয়ে যাবেন। গরিবের ঘরে একদিন খেলে জাত যাবে না। তবে আপনি ডাক্তারি ছেড়ে ঠিক করেননি।'

শুধু গলা সহজ নয়, ব্রতীন লক্ষ করল, মেয়েটির বলার ভঙ্গিও সহজ। এই ধরনের মেয়েরা বোধহয় এরকমই হয়। সব কিছু সহজভাবে নেয়।

সলিল অবাক গলায় বলল, 'কেন?'

'বাঃ, ডাক্তার হলে বন্ধুর মাথার চিকিৎসাটা তো করতে পারতেন। পয়সাকড়ি লাগত না।'

কথাটা বলে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে চন্দনা হাসল। ব্রতীনের হাত কাঁপছে। এতটা অভিনয়! কে বলবে খানিক আগেই এই মেয়ে ভেতরে কান্নাকাটি করছিল! মোড়া টেনে বেশ স্বচ্ছন্দেই বসেছে। যেন সবটাই খুব স্বাভাবিক। গায়ের শাড়িটা পাটভাঙা। সদ্য আলমারি থেকে বের করেছে। মুখে আলগোছে পাউডার। চোখে আবছা কাজলের মতো মনে হচ্ছে, ঠোঁটে লিপস্টিকও আছে কি? মুখ তুলে

boierpathshala.blogspot.com

দেখতে লজ্জা করছে ব্রতীনের।

'দেখেছিস তো; দেখেছিস তো ব্রতীন, আমাকে পাগল বলছে? তোকে বললাম না গুণের কোনো মর্যাদা নেই।'

চন্দনা চোখ তুলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে গালে হাত ঠেকাল। চোখ বড়ো বড়ো করে অভিনয়ের ঢঙে বলল, 'ওমা, কে বলল নেই! তোমার মানমর্যাদা দেখতে দেখতে তো আমার এই হাড়গিলে অবস্থা।'

কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে রয়েছে একটা আহ্লাদি ভাব। দাম্পত্যের আহ্লাদ!

সলিলও হাসতে হাসতে বলল, 'বেশি করে খাওয়া-দাওয়া কর, স্বাস্থ্য ঠিক হয়ে যাবে। এই তো একজন প্রায়-ডাক্তারকে পেয়েছ। ওর কাছ থেকেই বরং ডায়েটের একটা চার্ট নিয়ে নাও। ভয় নেই ফ্রিতে দেবে।'

বলতে বলতে খাটের পাশে ঝোলানো পাঞ্জাবিটা গায়ে গলিয়ে ফেলল সলিল। ব্রতীনের বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। ছেলেটা বলেছিল, 'বাবা ছুতো করে বেরিয়ে যাবে।'

'কোথাও যাচ্ছিস নাকি?'

সলিল হেসে বলে, 'খেপেছিস? বাড়িতে গেস্ট ফেলে কোথায় যাব? শীত শীত করছে বলে এটা গায়ে চড়ালাম।'

চন্দনা নরম গলায় বলল, 'তা বললে চলবে না, অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়েছ, এবার চট করে একবার মোড়ের দোকানটা থেকে ঘুরে এসো দেখি। দ্যাখো যদি খোলা পাও। কাল সকালের পাঁউরুটি লাগবে। ছেলে খেয়ে স্কুলে যাবে, টিফিনও দিতে হবে।'

ব্রতীনের মেরুদণ্ড দিয়ে শিরশিরানি বয়ে গেল। মেয়েটা এসব কী বলছে! ছেলের স্কুল, টিফিন— সবই তো বানানো! এই মিথ্যের কারণ একটাই। ঘর থেকে সলিলকে বের করে দিতে চাইছে। বাইরের পুরুষমানুষকে সুযোগ দেবে। এ কি শুধুই স্বামীর ভয় নাকি অন্য কিছু?

চায়ের কাপ রেখে ব্রতীন উঠে দাঁড়াল। সলিল ততক্ষণে ছিটকে সরে গেছে সদর দরজার কাছে। ছিটকিনিতে হাত দিয়ে বলল, 'তুই বোস ব্রতীন, আমি যাব আর আসব। তারপরে একসঙ্গে ডিনার। আগে ভাগে খেয়ে নিও না কিন্তু চাঁদু। মেনু কী চন্দনা? বেস্ট বয়ের জন্য স্পেশাল ডিশ কিছু করেছ?'

হাত তুলে কপালের টিপ ঠিক করতে করতে চন্দনা হেসে বলল, 'করেছি, বেগুন ভাজা। খেলে তোমার বন্ধুর গলা কুটকুট করবে।'

সলিল বেরিয়ে যেতেই ব্রতীন বুঝল সে একটা জালের মধ্যে পড়ে গেছে।

boierpathshala.blogspot.com

এই জালটা শুধু সলিল একা ফেলছে না, সঙ্গে তার স্ত্রীও রয়েছে। ভেতরে যতই কান্নাকাটি করুক, বাইরে সে এই নোংরা কাজের পার্টনার। হয়তো বাধ্য হয়েই পার্টনার। এই জাল কেটে তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরোতে হবে।

'আপনার বন্ধুটি কিন্তু সত্যি পাগল। কালেকশন কালেকশন করে কী কাণ্ড করেছে দেখুন। ঘরে আর জায়গা নেই। দুটো সুটকেস ছাদেও তুলে দিয়েছে। ভাগ্যিস বাড়িওলা এখানে থাকে না, থাকলে যে কী ঝামেলা হত। নিন খাটে এসে বসুন।'

কথা বলতে বলতেই ব্রতীনের বুক ছ্যাঁৎ করিয়ে, উঠে গিয়ে দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে এসেছে চন্দনা। মোড়া সরিয়ে খাটে উঠে বসেছে পা ঝুলিয়ে। তরল গলায় বলল, 'ও আপনাকে আগুন খাওয়ার গল্প শুনিয়েছে?'

কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে ব্রতীনের। চন্দনা কি এবার আরও মারাত্মক কিছু করবে? গায়ের কাপড় সরাবে? এত বড়ো বিপদে পড়তে হবে তার কল্পনাতেও ছিল না।

চন্দনা মুখে হাত দিয়ে হাই তুলল। আবার বলল, 'শোনায় নি?'

ব্রতীন কিছু বলল না। মাথা নাড়ল শুধু।

'দেখুন তো কী পাগলামি। লোক ধরে ধরে আগুন খাওয়ার গল্প করবে।'

'খাওয়া নয়, ম্যাজিক। ম্যাজিক কালেক্ট করছে। ছোটোবেলা থেকেই তো ওর সংগ্রহের নেশা।'

'ভালোই হয়েছে, ঘরে একটা কানাকড়ি নেই, ছেলে, বউকে এবার আগুন খাইয়ে রাখবে।'

ব্রতীন সতর্ক হল। মিলে যাচ্ছে। প্রথমে অভাবের কথা, এবার টাকা চাইবে। যা করার তার আগেই করতে হবে।

চন্দনা এবার ফস করে শাড়ির আঁচলটাকে কাঁধের ওপর ঠেলে তুলে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। রোগা ফর্সা হাত। ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বলল, 'কথাটা বিশ্বাস হল না তো? ঠিক আছে নাড়িটা টিপে দেখুন ডাক্তারবাবু, অবস্থা বুঝতে পারবেন। মেয়েমানুষের নাড়ি টিপলে সংসারের অভাব ঝোঝা যায়।'

ব্রতীন উঠে দাঁড়াল। পকেটে থেকে মানিব্যাগ বের করল। না, যে আশঙ্কা করেছিল সেটা ঠিক নয়। টাকা আছে। বেশি নয়, তবে আছে। খুচরোর পাশাপাশি দুটো একশো টাকার নোট উঁকি মারছে। ব্রতীন দ্রুত হাতে নোট দুটো বের করল।

'নিন, রাখুন।'

চন্দনা থতমত খেয়ে গেছে। বাড়ানো হাত সরিয়ে নিয়ে অবাক চোখে

boierpathshala.blogspot.com

তাকিয়ে আছে। ব্রতীন বানানো হাসি হেসে বলল, 'কী হল, ধরবেন তো? চিন্তা নেই, টাকাটা আমি দিচ্ছি না, এটা সলিলের-ই টাকা। মাস কয়েক আগে হঠাৎ একদিন ওর সঙ্গে মৌলালির ওখানে দেখা, পকেটে টাকা ছিল না, কী একটা দরকারে ধার নিয়েছিলাম।'

চন্দনা আমতা আমতা করে বলল, 'ওকে দিলে হত না?'

'না হত না। আপনার স্বামীকে চেনেন না? ছেলেবেলার বন্ধুকে ধার দেওয়া টাকা ফেরত নেওয়ার লোক ও? নিন, রাখুন।'

টাকাটা নিয়ে চন্দনা উঠে দাঁড়িয়েছে।

'আপনি চলে যাচ্ছেন? ও কিন্তু খুব রাগ করবে।'

দরজার কাছে গিয়ে ব্রতীন একটু হাসল। বলল, 'না, করবে না। টাকাটা দেবেন। কিছু বলার দরকার নেই।'

চন্দনা তাকিয়ে আছে স্থির চোখে। একেই কি বলে মুগ্ধ দৃষ্টি?

ব্রতীন দরজা খুলে বেরিয়ে এল দ্রুত পায়ে।

শুনশান, আলো ছায়া গলিটুকু মাথা নামিয়ে হনহন করে হাঁটল ব্রতীন। বারবার মনে হল, পিছনে দরজা খুলে এখনও দাঁড়িয়ে আছে চন্দনা। অপেক্ষা করে আছে জীবনের যাবতীয় সংগ্রহ নিয়ে। লজ্জা, গ্লানি, ক্লান্তির সংগ্রহ। অপেক্ষা করে দেখছে, আবার কখন তার স্বামী কোনো পুরুষ মানুষকে ধরে আনে।

লাস্ট বাস ধরে ব্রতীন বাড়ি ফিরল ঘোরের মধ্যে দিয়ে। তার মন খারাপ। খুব মন খারাপ। বাথরুমে ঢুকে অনেকটা সময় নিয়ে স্নান করল। তারপর বিছানায় পড়তেই ঘুম।

ঘুমের মাঝে বড় অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখল ব্রতীন। স্বপ্নের প্রথম পর্যায়টা ভালো, শেষটা ভয়াবহ।

কথাকলিদের বাড়ির সুন্দর ড্রইংরুম। কথাকলি তাকে নিজের হাতে খেতে দিয়েছে। দিয়েছে বড় যত্ন করে। বড়ো বড়ো কাঠের বাটি সাজানো টেবিলে। বাটির গায়ে রাজস্থানি কারুকাজ। লম্বা লম্বা হাতলের চামচ।

কথাকলি নরম হেসে বলল, 'নাও, খাও। ঠান্ডা হয়ে যাবে।'

'আমি এত কিছু খাব কী করে কথা?'

'ওরকম বললে শুনব না। সেদিন তুমি খেতে চেয়েও না খেয়ে পালিয়েছিলে, আজ ঠিক করেছি,আমি নিজে বসে থেকে খাওয়াব। পালাতে পারবে না।'

এরপরই স্বপ্নের ভয়াবহ অংশটা আসে।

দু-হাতে কাঠের বাটি তুলে ব্রতীন দেখল, ভেতরে কিছু নেই, শুধু আগুন! দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে।

কথাকলি আরও মিষ্টি করে হেসে বলল, 'ওমা, চমকে গেলে যে! তুমি তো আগুন খেতে পারো। তোমার বন্ধু তোমাকে আগুন খাওয়ার ম্যাজিক শিখিয়েছে না?'

ব্রতীন চামচে করে আগুন মুখে দিল। কথাকলি খিলখিল আওয়াজে হেসে উঠল।

সেই হাসি চন্দনার।

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

তেরো

কম্পিউটারের ওপর ঝুঁকে পড়ে রুপার্ট শেলড্রেকের গবেষণাটা আরও একবার পড়লেন সুদর্শন রায়। গবেষণা নয়, গবেষণার সংক্ষিপ্তসার।

বোগেনভিলিয়া বারান্দা থেকে উঠে এসে সেদিন স্টাডিতে চলে যান ডাক্তার রায়। কম্পিউটার খুলে দীর্ঘক্ষণ সাইট ঘাঁটেন। আসলে তিনি খুঁজছিলেন ইউনিভার্সিটি, গবেষণা কেন্দ্রের নাম। কারা এই ধরনের বিষয় নিয়ে কাজ করছে? মেল অ্যাড্রেস পেলেন গাদাখানেক। তার মধ্যে থেকে ঝাড়াই বাছাই করে চিঠি পাঠালেন দুটি জায়গায়।

দুটির উত্তরই এসেছে।

প্রথম উত্তরটা এসেছে লাস ভেগাসের নেভেদা প্রাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাদের অফিস সচিব উত্তর পাঠিয়েছেন। উত্তর সংক্ষিপ্ত।

ডাক্তার রায়,

আপনি কেমন আছেন? আপনার চিঠি পেয়েছি। কিন্তু এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট ভাবে বিষয়টি নিয়ে আমাদের হাতে কোনো তথ্য নেই। যেটুকু আছে তার বেশিটাই খুব কাঁচা ধরনের সমীক্ষা মাত্র। সেই সমীক্ষার ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছোনোর মতো অবস্থায় আমাদের ডিপার্টমেন্ট এখনও আসতে পারিনি। তবে আনন্দের কথা, আমাদের গবেষকরা আগামী এক বছরের মধ্যে এই বিষয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শেষ করতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তারপরেই আমরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। ভালো থাকবেন। শুভদিন।

দ্বিতীয় উত্তরটি পাঠিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার উইটওয়াটার স্ট্যান্ড ইউনিভার্সিটি। এদের 'স্কুল অব অ্যানিম্যাল, প্ল্যান্ট, ইনসেকটস অ্যান্ড

boierpathshala.blogspot.com

এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স'-এর ডিন অধ্যাপক জেকভ নিজে লিখেছেন।

অধ্যাপক জেকভের উত্তর দীর্ঘ। তবে সেখানে মূলত ভূমিকম্পের কথাই বেশি। কিছু আগ্নেয়গিরির ঘটনারও উল্লেখ আছে, তবে সেটা সংখ্যায় কম। জেকভ পৃথিবীর নানাধরনের ভূমিকম্পের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—

'এটা সত্য যে প্রকৃতির বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয়ের খবর অনেক পশুপাখিই আগাম জানতে পারে। বহুবারই এটা প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে ভূমিকম্পের আগে গৃহপালিত পশুদের আচরণ এবং অভ্যেস সম্পূর্ণ পালটে যায়।'

বিশ্ববিখ্যাত ব্রিটিশ প্রাণীতত্ত্ববিদ রুপার্ট শেলড্রেকের একটি গবেষণাপত্রের সংক্ষিপ্তসার নিজের উত্তরের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন জেকভ—

'শুধুমাত্র পশুপাখির অস্বাভাবিক আচরণ দেখে চিনের হেইচেং শহরের লক্ষাধিক মানুষ একবার ভূমিকম্পের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। ১৯৭৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সেই ভয়ংকর ভূমিকম্পে চিনের এই প্রাচীন শহরটি সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই ধরনের দৃষ্টান্ত বৈজ্ঞানিক কোনো সত্য প্রতিষ্ঠা করতে না পারলেও, এটা সত্য যে একে উড়িয়ে দেওয়াও অসম্ভব। মনুষ্যেতর প্রাণের কোনো কোনো ক্রোমোজোম তাদের এই ক্ষমতা দিয়েছে। মানুষ যা পারে না, পারতে গেলে যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, এরা তা নিজেরাই পারে।'

চিঠি পড়া শেষ হলে ডাক্তার রায় কম্পিউটার বন্ধ করে টেবিলেই বসে রইলেন। উঠে গিয়ে খানিকটা শুলে হয়তো ভালো হত। বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। কাল সকাল থেকে সামান্য জ্বর ছিল। দু-দিন ধরেই শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে। নার্সিং হোমে যাননি। সন্ধেবেলা জোর করে রাসবিহারীর চেম্বারে গিয়েছিলেন। তবে বেশি সময় থাকতে পারেননি। ঘণ্টাখানেক থেকেই চলে আসেন। এখন সেই জ্বর বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে। সঙ্গে হাত পায়ে ব্যথা। শরীরের দোষ নেই। সেদিন বানেরহাটের পরিশ্রমটা সত্যিই বেশি হয়ে গেছে। এই বয়েসে অতটা পথ রোদে হাঁটা ঠিক হয়নি। রিকশা নেই দেখে স্টেশন থেকেই ফিরে আসা উচিত ছিল। অচল ট্রেনে বসে থাকারও একটা ধকল আছে।

কথাকলি এই বিষয় নিয়ে তিনদিন ধরে বকাবকি করে চলেছে। আজও অফিসে বেরোনোর সময় বলে গেল।

'বাবা, আর একদিনও যদি তুমি ওই বানেরহাটে গেছ তোমার সঙ্গে আমার বিরাট ঝামেলা হয়ে যাবে।'

গায়ে বিছানার চাদরটা জড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন সুদর্শনবাবু। পড়ার মতো কিছু নেই। অভ্যেসে পাতা উলটোচ্ছিলেন। মেয়ের কথার জবাবে

boierpathshala.blogspot.com

বললে, 'ও কিছু নয়। একটু পরে উঠে গরম জলে এমন একটা স্নান দেব, দেখবি জ্বর পালানোর পথ পাবে না, আমাকে এসেই জিজ্ঞেস করবে। আমি বলব, সরি পালানোর পথ আমি জানি না, আপনি বরং আমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করুন।'

'জ্বর পালাবে কিনা জানি না, আমি কিন্তু পালাব বাবা। এরকম করলে এ-বাড়ি ছেড়ে সত্যি সত্যি পালাব এবার।'

অফিসের কাগজপত্র দ্রুত হাতে ব্যাগে ঢোকাতে ঢোকাতে কথা বলছে কথাকলি।

'আগে তাও দু-একটা কথা শুনতে, এখন একেবারে কন্ট্রোলের বাইরে চলে গেছ। কিছু বলতে গেলে হাসি ঠাট্টা করে উড়িয়ে দাও।'

সুদর্শনবাবু হাতের কাগজ সরিয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে, দ্বিতীয় শৈশব ফিরে পাচ্ছি। সেকেন্ড চাইল্ডহুড। টাইম গ্যাপের থিয়োরি জানিস তো? পুরোনো অনেক কিছু ফিরে আসে। এই যেমন মেয়ের মুখ দিয়ে মায়ের শাসন। চমৎকার লাগে। মনে হয়, আবার জ্বর বাধিয়ে শুয়ে থাকি আর মেয়ের বকুনি খাই।'

কথাকলি মুখ ফিরিয়ে হাসে। তারপর বাবার দিকে তাকিয়ে আঙুল তুলে বলে, 'থাক, অনেক আদিখ্যেতা হয়েছে। ওতে আমি আর ভুলছি না। আজ কোথাও বেরোবে না। গোপালের মা আজ দেশে যাচ্ছে। এই রে, মোবাইলটা কোথায় রাখলাম?'

ডাক্তার রায় চোখ তুলে বললেন, 'গোপালের মা দেশে যাচ্ছে? সর্বনাশ। রান্নাবান্নার কী হবে?'

মোবাইলের জন্য টেবিলের বইপত্র, খাটের বিছানা বালিশ সরাতে সরাতে কথাকলি বলল, 'বুড়ির আবার নাতনি হয়েছে। এই নিয়ে পাঁচ নম্বর। কাল দেখি বুড়ি ফিচ ফিচ করে কাঁদে। বাবা, একটু সরো তো, তোমার খবরের কাগজের তলাটা দেখি। আমি বললাম, কী হল গোপালের মা, নাতনি বলে কাঁদছ নাকি? বুড়ি চোখের জল মুছে কী বলল জানো বাবা? এই তো মোবাইল।'

'কী বলল?'

ডাক্তার রায় গভীর আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন। যদিও রান্নার মাসি তার নাতনি সম্পর্কে কী বলল তা নিয়ে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। আসলে মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে। বড়ো জানলাটা দিয়ে রোদ ঢুকে ঘরটাকে ভাসিয়ে রেখেছে। ব্রেকফাস্টের জন্য পুবের এই ঘরটা নির্দিষ্ট করেছে কথাকলি। বিয়ের আগেই ঠিক করেছিল। মাঝখানে ক-টা বছর সেই নিয়ম মানা যায়নি। হঠাৎ স্ট্রোকে সুনন্দার মৃত্যু, কথাকলির বিয়ে এবং ব্রতীনের সঙ্গে

boierpathshala.blogspot.com

ছাড়াছাড়ি—সবটা মিলিয়ে পুব পশ্চিম সবই লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন হল, কথাকলি আবার যেন খানিকটা করে সেসব ফিরিয়ে আনছে। মানুষ তো ফেরে না, তার ছুঁয়ে যাওয়া জায়গাগুলো যদি ফেরে। হয়তো সেই চেষ্টাই করছে মেয়েটা।

'গোপালের মা বলল, দুঃখে কাঁদি না, কাঁদি আনন্দে। চার পর্যন্ত সমস্যা নেই, কিন্তু পাঁচ নম্বরে মেয়ে হওয়া নাকি খুব কঠিন ব্যাপার। মায়ের খুব ভাগ্য না থাকলে হয় না। পাঁচ নম্বর মেয়ে খুব পয়মন্তর মেয়ে হয়। এতটাই পয়মন্তর যে তার ভাগ্য একেবারে উপচে পড়তে থাকে। সেই উপচোনো ভাগ্য নিয়ে তখন অন্যগুলো বাঁচে।.বোঝ একবার। উফ, ভাবতেও অবাক লাগে, এখনও দেশ গাঁয়ে কতরকম সংস্কার। তা বুড়ি বলল, সে যাবে নাতনির মুখ দেখতে। আমি বললাম, দুশো টাকা দিয়ে বললাম, যাও পয়া মেয়ের মুখ দেখে এসো। তবে দেরি কোরো না। রোববারের আগেই চলে এসো। মাসি এ-বেলার খাবার রেঁধে দিয়ে যাবে। দুপুরে বাস ধরতে না পারলে ওর নাকি ক্যানিং থেকে নৌকা মিস্। বলেছি, তাড়াতাড়ি রেঁধে খাবার হটকেসে রেখে যেও। তুমিও খেতে দেরি কোরো না বাবা। রাতে আমি না হয় এসে হোম সার্ভিসকে ফোন করে দেব। নাকি আমি রাঁধব?'

ডাক্তার রায় তাড়াতাড়ি বললেন, 'না, না, তুই আবার অফিস করে এসে রাঁধতে যাবি কেন? একটা কিছু খেলেই হবে।'

কথাকলি ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'যদি টোমাটো চিকেন করি? তুমি খাবে না তো? প্রমিস?'

ডাক্তার রায় গলা তুলে হেসে উঠলেন।

মেলে আসা জবাবে ডাক্তার রায় হতাশ হয়েছেন। তিনি ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরি চাননি। দুটো জায়গাতেই তাঁর প্রশ্ন ছিল, ঝড়বৃষ্টি, বন্যা ধরনের বিপর্যয় নিয়ে। যন্ত্র অথবা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছাড়া সত্যি কি এসবের পূর্বাভাস বোঝার কোনো ক্ষমতা জীবজগতের আছে? আগুন লাগবে— এমন কথা আগে থেকে কেউ কি জানতে পারে? জানতে পারলে কে পারে? কীভাবে পারে? শোনা যায়, প্রাকৃতিক বিপর্যয় নাকি আগাম এক ধরনের সিগন্যাল তৈরি করে। সবসময় নয়, কোনো কোনো সময়। টেলিগ্রাফের কোড যেমন ভেঙে ভেঙে বুঝতে হয়, এই সিগন্যালের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা। তবে এই কাজ মানুষ পারে না। খেপে ওঠা প্রকৃতির আগাম বার্তা ধরার ক্ষমতা যন্ত্র খানিকটা পারলেও মানুষ পায়নি। সেই ভাষা কোনো কোনো সময় একমাত্র পশুপাখিরাই নাকি বোঝে। এই

boierpathshala.blogspot.com

তত্ত্বের কি কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে? নাকি সবটাই শুধু অবজারভেশন? রুপার্ট শেলড্রেকের গবেষণার যে-সংক্ষিপ্তসার এসেছে সেখানে খানিকটা উত্তর পাওয়া গেছে। তবে তা শুধু ভূমিকম্প নিয়ে। ঝড়বৃষ্টির কথা কিছু নেই। শেলড্রেকের ব্যাখ্যা হল, ভূমিকম্পের ঠিক আগে, সম্ভাবনাময় বিপর্যয়ের এলাকা জুড়ে একটা তরঙ্গ বলয় তৈরি হয়। যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'সিস্‌মিক ইনডাকশন'। এই বলয় প্রাণীজগতের কেউ কেউ অনুভব করতে পারে। বুঝতে পারে ভয়াবহ কোনো বিপদ আসছে। তীব্র আতঙ্কে তারা অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করে।

এখন প্রশ্নটা হচ্ছে, ঝড়জলের ক্ষেত্রেও কি একই ঘটনা ঘটে? সেও কি সিগন্যাল ছাড়ে? বিপদ তরঙ্গ? ভয়ংকর সুনামির আগে সামুদ্রিক মাছ, কাঁকড়া, জলজপ্রাণীদের আচরণ কেমন ছিল? তারা কি কিছু আঁচ করেছিল? যতদূর মনে পড়ছে, এই বিষয়ে 'সিঙ্গাপুর মেরিন রিসার্চ সেন্টার' একটা কাজ করছে। ওদের ইমেল আইডিটা কী?

সুদর্শনবাবু আবার তাঁর কম্পিউটার চালু করলেন।

শীত শীত করছে। জ্বর মনে হয় বেড়েছে। প্যারাসিটামল জাতীয় কোনো ওষুধ খাওয়া উচিত। উঠতে ইচ্ছে করছে না। আবার একটানা বসে থাকতেও কষ্ট হচ্ছে। গোপালের মা কোথায়? সে কি দেশের বাড়ি রওনা দিয়েছে?

বকাঝকা দিয়ে মোবাইল খুঁজে কথাকলি অফিস বেরিয়ে যাওয়ার পর পরই ডাক্তার রায় স্টাডিতে এসে কম্পিউটার খুলে বসেছেন। একটু কফি পেলে বেশ হত।

নেট চালু করে 'মেরিন' সাইটে ঢুকলেন সুদর্শনবাবু, আর ঠিক তখনই দরজার কাছে এসে দাঁড়াল গোপালের মা। নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল।

বয়স্কা এই মহিলা কথাকলির মায়ের মৃত্যুর কয়েক মাস আগে এ-বাড়িতে কাজে ঢোকে। তারপর রয়ে গেছে। মানুষটা ভালো। প্রথমদিকে মূলত রান্নার দায়িত্বে থাকলেও, এখন সংসারের অনেকটাই তার হাতে ছাড়া হয়েছে। বাপ বেটির প্রতি বুড়ির একটা টান তৈরি হয়ে গেছে। বদ অভ্যেস বলতে একটাই। তবে সেটা বড়ো কিছু নয়। মহিলা একটু বেশি কথা বলে।

'ডাক্তারবাবু, একটা কথা ছিল।'

হঠাৎ ডাক শুনে ডাক্তার রায় সামান্য চমকে উঠলেন। মুখ না তুলে বললেন, 'ও তুমি। এখনও যাওনি গোপালের মা?'

'এবার যাব। ডাক্তারবাবু একটা কথা ছিল।'

boierpathshala.blogspot.com

কম্পিউটার পর্দায় চোখ রেখেই ভুরু কোঁচকালেন ডাক্তার রায়।

'আবার কথা কী? গোপালের মা, তোমাকে কতবার বলেছি না, ছুটিছাটার বিষয় তুমি কলির সঙ্গে কথা বলবে। রবিবার বলেছে, রবিবারই ফিরো কিন্তু। দেরি করলে বকুনি খেতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আরও একটা দিন তোমার ছুটি। আমি তোমার দিদিমণিকে ম্যানেজ করে দেব।'

গোপালের মা মাথার ওপর কাপড় টেনে নীচু গলায় বলল, 'ছুটিছাটা নয় ডাক্তারবাবু। একটা অন্য কথা ছিল।'

'এখন আমার একটুও সময় নেই। তুমি ফিরে এসো, তারপর তোমার কথা শুনব। তুমি বরং একটা কাজ কর। যাওয়ার আগে ঝটপট এক কাপ কফি করে দিয়ে যাও দেখি। কড়া করে করবে।'

'কফি এনেছি ডাক্তারবাবু। তবে কড়া নয়। দিদিমণি বলেছেন,আপনাকে কড়া কফি দেওয়া চলবে না। প্রেশার বাড়বে।'

ডাক্তার রায় মুখ তুলে তাকালেন। সত্যি গোপালের মা কফির কাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে! সম্ভবত এই কারণেই মহিলা এই সংসারে মানিয়ে গেছে। নইলে কফির কথা বুঝল কী করে? এও কি এক ধরনের সিগন্যাল? সবাই ধরতে পারে না, কেউ কেউ পারে?

হাত বাড়িয়ে কাপ নিয়ে ডাক্তার রায় বললেন, 'এবার তুমি যাও গোপালের মা। তোমাকে নৌকো ধরতে হবে।'

কথাটা বলে একটু হাসলেন। ঝকঝকে সল্টলেকের বাড়িতে বসে নৌকো ধরাবার কথায় হাসি তো পাবেই।

গোপালের মা গেল না। দরজার পাশে মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সুদর্শন রায় সতর্ক হলেন। বুড়ি পাঁচ নম্বর নাতনির গল্প জুড়ে না বসে। গলা তুলেই বললেন, 'কী হল?'

'ডাক্তারবাবু, একটা কথা ছিল।'

কড়া না হলেও কফি খারাপ হয়নি। গোপালের মা আগে কফি পারত না। তেতো করে ফেলত। কলির কাছ থেকে শিখেছে। কম্পিউটার পর্দায় ওয়েবসাইট সমুদ্র গবেষণার খবর খুঁজছে। পর্দায় বালি ঘড়ি ঘুরছে বনবন করে। সিঙ্গাপুরেরটা কোথায়? অন্য কেউ এই কাজ করেনি? নিশ্চয় করেছে। সুনামির মতো অতবড়ো একটা ঘটনা। কত বিষয়। সকলেই নিশ্চয় কমবেশি কাজ করেছে। তা ছাড়া জলের তলার জগৎও তো অনেক বড়ো, অনেক ছড়ানো। সেখানকার বিপর্যয় যেমন ভয়ানক তেমনি বৈচিত্রময়। যদিও কারণ সেই ভূমিকম্পই। শোনা

boierpathshala.blogspot.com

যায়, আন্দামানের কোনো কোনো দ্বীপের আদিবাসীরা নাকি সেদিনের সেই ভয়ংকর ঢেউ আসার আগেই উঁচু গাছে উঠে পড়েছিল। ঘটনা সত্যি কিনা প্রমাণ হয়নি। কিন্তু যদি সত্যি হয়? জীবজগতের পূর্বাভাস বোঝার ক্ষমতা মানুষও কি কোনো কোনো সময় অর্জন করে বসে?

'ডাক্তারবাবু।'

ডাক্তার রায় নিজের মনেই একটু হেসে ফেললেন। না, গোপালের মা সত্যিই নাছোড়বান্দা। গল্প শুনিয়েই ছাড়বে।

'আচ্ছা বল, তাড়াতাড়ি বলবে। দেখছ তো আমি কত ব্যস্ত?'

গোপালের মা এক পা এগিয়ে এল। গলা নামিয়ে বলল, 'সোমবার জামাইবাবু এসেছিল, সন্ধেবেলা।'

কী বোর্ডের ওপর হাত রেখেই মুখ ফেরালেন ডাক্তার রায়।

'কে! কে এসেছিল?'

গোপালের মা মাটির দিকে চোখ রেখে বলল, 'জামাইবাবু। জামাইবাবু এসেছিল। দিদিমণি তখনও বাসায় ফেরেনি। সেই সময় এল।'

ডাক্তার রায় অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন গোপালের মায়ের দিকে। কী বলছে ও! তিনি কি ঠিক শুনছেন?

'ব্রতীন! ব্রতীন এসেছিল!'

'হ্যাঁ। ঘণ্টি শুনে আমি নীচে গিয়ে দরজা খুললাম। খুলে দেখি জামাইবাবু। জামাইবাবু আমায় বলল, মাসি ভালো আছ? বাড়ির সবাই ভালো? আমি বললাম, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? গোপালের মেয়ে হয়েছে। দেশ থেকে পোস্টকার্ড এসেছে। গায়ের রং ফর্সা। চোখ টানা। এই মেয়ে পয়মন্তর বলে নাম রেখেছি পয়া। জামাইবাবু খুশি হয়ে বললেন, তাই নাকি! বাঃ খুব ভালো খবর। আমি বললাম, আসেন। দিদিমণি তো নাই। ডাক্তারবাবুও ফেরেন নাই।'

এতটা বলে গোপালের মা চুপ করল। ডাক্তার রায় খানিকটা যেন নিজের মনেই বললেন, 'তারপর?'

গোপালের মা মুখ তুলল। আঁচল দিয়ে ঘাম মুছল। তারপর বলল, 'জামাইবাবু বললেন, ঠিক আছে কোনো অসুবিধে নেই, আমি বসছি।'

বাড়ির রান্নাবান্নার কাজের লোককে এ-প্রশ্ন করা অর্থহীন এবং অনুচিত। তবু ডাক্তার রায় বিড়বিড় করে উঠলেন, 'কেন এসেছিল?'

বাড়িতে তৃতীয় কেউ নেই তবু গোপালের মা পিছন ফিরে তাকাল। যেন

boierpathshala.blogspot.com

সেও এই প্রশ্ন শুনবে বলে তৈরি ছিল না। অবাক হল। এক পা সরে গিয়ে বলল, 'তা তো জানি না ডাক্তারবাবু। দিদিমণি জানে।'

'কলির সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

বুড়ি একপাশে ঘাড় কাত করল। নীচু গলায় বলল, 'কথাও হয়েছে।'

ডাক্তার রায় মাথা নামালেন। তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। মেয়ে তাঁকে কিছু বলেনি! বাবাকে বোধহয় সব কথা বলা যায় না। বেচারি। মা বেঁচে থাকলে তার এই সমস্যা হত না। ব্রতীনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর থেকে মেয়েটা আত্মীয়দের থেকেও দূরে সরে গেছে। ফোন-টোনও করে না। কেউ করলে দু-একটা হুঁ হাঁ করে রেখে দেয়। হয়তো বিয়েটা জোর করে নিজের মতে করেছিল বলেই অপরাধবোধে ভোগে। সেদিন অনেকেই আপত্তি করেছিল। বিয়ের ঠিক তিন মাস আগে মানিয়ে নিতে পারছে না বলে অত ভালো চাকরিটা ছেড়ে দিল ব্রতীন। সুনন্দা শুনে আঁতকে উঠল।

'বলিস কী কলি! বিয়ের তো আর ক-টা দিন মাত্র বাকি? চাকরি ছেড়ে দিল!'

কথাকলি হেসে বলল, 'তাতে কী হয়েছে মা? বিয়ে তো ওর অফিসে হত না।'

'তা বলে বিয়ের আগে এভাবে কাজকর্ম ছেড়ে দেবে? তা ছাড়া এত ভালো একটা চাকরি। স্কুলটা ছাড়বার পর এরকম সুযোগ পাবে কেউ ভাবতেও পারেনি। ছেলে যতই ভালো হোক আজকাল এখানে চট করে ভালো কাজ পাওয়া যায় না। বাইরে যেতে হয়। সেই জায়গায় ফ্ল্যাট, গাড়ি। তুই-ই তো বলেছিস কোম্পানি ব্রতীনকে বাবুর্চি পর্যন্ত প্রোভাইড করবে। বলিস নি?'

'বিয়ের আগে চাকরি ছাড়ার বিষয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞা চালু হয়েছে নাকি? তা ছাড়া আমার বিয়ে বাবুর্চির সঙ্গে হচ্ছিল না মা।'

সুনন্দা এবার রেগে যায়। বলে, 'সবসময় চালাক চালাক কথা বলাটা কোনো গুণের নয় কলি। তুই কী মনে করছিস, আমি একটা বেকার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব?'

কথাকলি মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'না, মনে করছি না। কিন্তু কী করব বল মা? আমি যে বিয়েটা করছি।'

'তোর বাবা জানে? ছি ছি, একটা কাণ্ডজ্ঞান তো থাকবে।'

কথাকলি মায়ের দিকে ঘুরে বসে। শান্ত গলায় বলে, 'মা, ব্রতীনের চাকরিটা বড়ো ছিল, কিন্তু কাজটা বড়ো ছিল না। ছোটো ছিল। কাজের বড়ো একটা অংশ

boierpathshala.blogspot.com

দাঁড়িয়ে ছিল ঘুষের ওপর। ঘুষ নেওয়া নয়, ঘুষ দেওয়া। ও নিজেকে ফিট করতে পারছিল না। সবাই সব পারে না। পারাটা উচিতও নয়। চিন্তা কোরো না, ও খুব শিগগিরই আর একটা কাজ পেয়ে যাবে।'

কথাটা সত্যি। ব্রতীন কাজ পেয়ে গেল। বিয়ের আগেই পেয়ে গেল। আগেরটার মতো অত বড়ো নয়, তবে খারাপও কিছু নয়। কিন্তু সেটাও টিঁকল না। মাত্র তিনদিনের মাথায় প্রোডাকশনের সঙ্গে স্টকের হিসেব নিয়ে গোলমাল। খাতার সঙ্গে আসল হিসেব মিলছে না। কোম্পানির কর্তা ডেকে হেসে বললেন, 'মিস্টার, অত ছোটোখাটো বিষয় আপনি দেখবেন কেন? চোখ বুজে সই করে দেবেন। মাল তো আপনার নয়। মাল কোম্পানির। সই শুধু আপনার।'

সেদিনই চাকরি ছাড়ার চিঠিতে সই করে চলে এল ব্রতীন।

খবরটা শুনে মুহূর্তের জন্য কথাকলি একটু গম্ভীর হয়। দ্রুত নিজেকে সামলে হেসে বলে, 'বেশ করেছ। মেয়েদের কতরকম বর হয়। রোগা, কালো, মোটা, ফর্সা। আমার বর না হয় বোকাই হল।'

শেষ মুহূর্তেও সবাই বারণ করেছে। এই বোকা ছেলের সঙ্গে পাকাপাকি গাঁটছড়া বাঁধাটা মোটেও ঠিক হচ্ছে না। জলে ঝাঁপ দিচ্ছে মেয়েটা। অল্প জলে নয়, একেবারে গভীর সমুদ্রে। ওসব নীতি-টিতি বাজে কথা। জীবনটা সিনেমা নয় যে প্রেমে আর গানে কেটে যাবে। তা ছাড়া এ-ছেলের লক্ষণও ভালো নয়। ভালো হলে এভাবে পটাপট কাজ ছাড়ত না।

লক্ষণ ভালো কি মন্দ বলা যাচ্ছে না, তবে বিয়ের ছ-মাসের মধ্যে ব্রতীন আরও দুটো কাজ ছেড়ে বাড়ি ফিরল। প্রথমটা সরকারি। পরীক্ষা, ইন্টারভিউ দিয়ে পেয়েছিল। শুরুতে মাইনে তেমন নয়, কিন্তু পরে উন্নতির সুযোগ ছিল। সেখানে লাগল ইউনিয়নের সঙ্গে। ট্রান্সফারের ফাইল আটকে ঘেরাও হল। গোটা রাত ঘেরাও হওয়ার পর, ভোরে ফোন এল ওপর থেকে।

'আপনি তো মশাই খুব বেআক্কেলে লোক। স্টুডেন্ট লাইফে পলিটিক্যাল কানেকশন কী ছিল বলুন তো? ভেরিফাই করতে হবে দেখছি। গভর্মেন্টে একটা ক্যাওস বাধাতে চান নাকি? সাবোটাজ? জানেন এসব কেস যে-কোন দিকে টার্ন নিতে পারে। এখনই ফাইল ছাড়বেন।'

ফাইল এবং চাকরি দুটোই একসঙ্গে ছাড়ল ব্রতীন।

পরের চাকরিটা একেবারেই সামান্য। বেসরকারি অফিসে বসে সাধারণ যোগ-বিয়োগের কাজ। সুনন্দারও অসুস্থতার শুরু তখন থেকেই। অল্প অল্প বুকে ব্যথা। কথাকলি একদিন বাবাকে গোপনে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, ব্রতীনের এটা

boierpathshala.blogspot.com

কি কোনো অসুখ?'

ডাক্তার রায় চিন্তিত মুখে বলেছিলেন, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না রে মা। ঠিক বুঝতে পারছি না।'

কথাকলি খানিকটা আপনমনেই বলে, 'বাবা, আমার চিন্তা হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমি ভুল করেছি। ঠিকই ওসব নীতিটিতি বাজে কথা। আসলে ও কাজ করতে চায় না। এটা এক ধরনের আলস্য। আমার ভালো লাগছে না। আমার ভয় করছে বাবা।'

গোপালের মা মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম দিদিমণি আপনাকে বলেছে।'

ডাক্তার রায়ের ইচ্ছে করছে, গোপালের মাকে আরও দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করতে। ছেলেটা কতক্ষণ ছিল? কলি কি কথা বলেছে, নাকি চুপ করে বসে ছিল?

জিজ্ঞেস করতে হল না। গোপালের মা নিজে থেকেই বলল।

'দিদিমণি তো একটুও বসল না। ভেতরে এসে আমাকে বলল, মাসি চা দিয়ে এসো। আমি ভাবলাম, জামাই মানুষ শুধু চা দেব, এইটা কীরকম কথা? একটা ওমলেট করে দিই। চা, ওমলেট নিয়ে গিয়ে দেখি...।'

'কী দেখলে?'

'দেখলাম, চলে গেছে।'

এই পর্যন্ত বলে বুড়ি চুপ করল মুহূর্তখানেক। তারপর আবার বলল, 'ডাক্তারবাবু, যদি কিছু না মনে করেন, একটা কথা বলি।'

ডাক্তার রায় চুপ করে রইলেন। গোপালের মা গলা আরও নামিয়ে আনল।

'আপনি দিদিমণির সঙ্গে কথা বলেন। কথাটা আমার ছোটো মুখে বলা উচিত নয়। এই ক-দিন বলিনি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, না বলাটা অন্যায় হচ্ছে। আমি এসব বলেছি জানলে দিদিমণি রাগারাগি করবে। সে করুক গে, বকুনির ভয়ে সবসময় চুপ করে থাকা যায় না। ঠিকও নয়। বলেন উচিত? কথায় আছে, উচিত কথা বলতে গেলে দুইটা মুখ শুনতে হয়। মুখ না হয় শুনব। এইবাড়ির মানুষগুলোর জন্য আমারও একটা টান আছে।'

'কী বলবে সেটা বল গোপালের মা।'

'আজ সকালে ঘরে ঢুকে দেখি, দিদিমণি খাটে শুয়ে কাঁদে। খাট অগোছালো। রাতের বিছানা জমে আছে।'

boierpathshala.blogspot.com

'কাঁদে! কথাকলি কাঁদছিল?'

'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। চোখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদে।'

ডাক্তার রায় ভুরু কুঁচকে বললেন, 'হাত চাপা থাকলে বুঝলে কী করে কাঁদছে? তুমি তো চোখ দেখনি গোপালের মা।'

গোপালের মা সামান্য হাসল। যেন এতবড়ো শিক্ষিত মানুষের বোকামিতে সে কৌতুক বোধ করছে।

'মেয়েমানুষের কান্না মেয়েমানুষকে দেখে জানতে হয় না ডাক্তারবাবু। বাইরে কাঁদলেও দেখতে পায়, ভেতরে কাঁদলেও দেখতে পায়। যাক, আমি এখন চললাম। বাসের টেইম হয়ে যাবে।'

ডাক্তার রায় চুপ করে রইলেন। মনটা ভারী হয়ে গেল। মেয়ে কাঁদছে শুনলে বাবার মন ভারী হওয়াটাই স্বাভাবিক। কলি কাঁদবে কেন? ব্রতীনের বিষয়ে তার মন তো শক্ত। তাহলে সে কাঁদবে কেন? গোপালের মা বানিয়ে বলল না তো? অসম্ভব কিছু নয়। কান্নার কথা বললে ঘটনা অন্য মাত্রা পায়। তা ছাড়া অনেক সময় এই ধরনের মানুষ যেটা মনে করে সেটাই দেখতে পায়। হ্যালুসিনেশনের মতো। বুড়ির চোখটা, আইবল দুটো ভালো করে দেখলে হয়তো কিছুটা বোঝা যেত।

মুখ তুললেন সুদর্শনবাবু। হয়তো চোখ দেখার কারণেই দেখলেন, দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে গোপালের মা। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে মুখে 'চুক চুক' আওয়াজ করছে।

'কী হল?'

বুড়ি মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'ইস ঝড়বাদলা আসছে গো। খুব ঝড়বাদলা আসছে। ওই যে পিঁপড়ে ওঠে!'

মুহূর্তের জন্য চমকে উঠলেন ডাক্তার রায়। অস্ফুটে বলেন, 'পিঁপড়ে ওঠে!'

গোপালের মা মুখ ঘুরিয়ে অবাক চোখে তাকায়। এক গাল হেসে বলে 'উঠবে না! ওমা ডাক্তারবাবু, ঝড়বাদলার খবর আগে তো ওরাই পায়। সবার আগে পায়। খবর পেয়ে মাটি ছেড়ে ওপরে ওঠে, পালাতে থাকে। এই তো এসে দেখেন কেমন মুখে ডিম নিয়ে ছুট লাগায়। এর মানে বাদলার বেশি দেরি নাই। সর্বনাশ, আমার যে এখন কী হবে, দেশে গিয়ে আটকে না পড়ি। আপনে দিদিমণিকে জানিয়ে রাখবেন, গোপালের মা কিন্তু বলে গেল হ্যাঁ। তখন রাগারাগি করলে চলবে না।'

ডাক্তার রায় চেয়ারে বসে আছেন স্থির হয়ে। তাকিয়ে আছেন সামনে।

তাকিয়ে থাকলেও তাঁর দৃষ্টি শূন্য। আপনমনে বললেন, 'আগুন? আগুনের খবর পায় ওরা?'

গোপালের মা একগাল হাসল। বলল, 'আগুনের খবর পায় কিনা বলতে পারব না ডাক্তারবাবু, তবে বন্যার আগেই মাটি ছেড়ে ওঠে। দেশের বাড়িতে কত দেখেছি। আপনি দেখেন নি?'

সুদর্শন রায় বিড়বিড় করে বললেন, 'তুমি যাও গোপালের মা। তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। যাওয়ার সময় সদর দরজাটা ভালো করে টেনে দিয়ে যেও।'

গোপালের মা বেরিয়ে গেলে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন ডাক্তার রায়। ফিসফিস করে বললেন, 'পিঁপড়ে, পিঁপড়ে...।'

মানুষটার ধুম জ্বর এল সন্ধের মুখে মুখে।

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

চোদ্দ

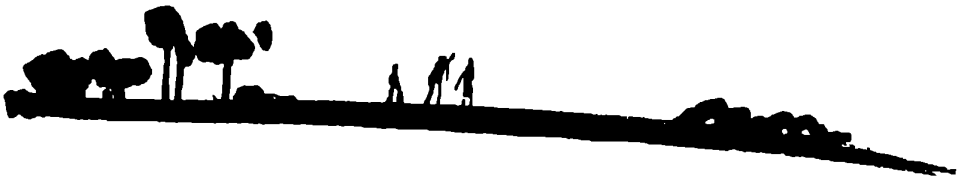

ফুলের বুদ্ধি দেখে চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া অন্যদিন খুশি হন, আজ হলেন বিস্মিত।

তিনি ক্লাসে তিনটে অঙ্ক দিয়েছিলেন। এতদিন ছিল শুধু যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের শিক্ষা। আজকের অঙ্কগুলো সবকিছুর মিশেল। এই অঙ্কে ভাগের পরে গুণ শেষ করে যোগ বিয়োগে ঢুকতে হবে।

বোর্ডে ঘসঘস করে অঙ্ক লিখতে লিখতে খুঁটিয়া মাস্টার হেঁড়ে গলায় বললেন, 'গুণধর ছেলেমেয়েরা আমার, অঙ্ক দেখে ঘাবড়ে যেও না বাপু। তিনটে দিলুম, পারলে ভালো, না পারলেও ক্ষতি কিছু নাই। মনে রাখবে, অঙ্ক হল মানুষের জীবনের মতো। শুধু সহজ পথে চললেই হয় না, কঠিন জিনিসও জানতে হবে। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগেই যে সব উত্তর মিলবে এমনটা নয়, যোগ-বিয়োগের মিকশ্চারও শিখতে লাগবে। সাহস ভরে চেষ্টা কর। অঙ্কের পথটা হল এমন একটা পথ যেখানে ঠিক ভুলটা সর্বদা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হল সাহস। সাহস করে এগিয়ে চলা।'

অঙ্ক কেউ-ই পারেনি। পারার কথাও নয়। জিনিস নতুন, তার ওপর কঠিন। কেউ খানিকটা এগিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। কেউ বসে শুধু পেনসিল চিবিয়েছে।

পেরেছে শুধু ফুল। তিনটের মধ্যে দুটো একেবারে ঠিক। যাকে বলে দশে দশ। একটুও গোলমাল নেই। লম্বা খাতার একদিকে মার্জিন। মার্জিনের পাশে গোটা গোটা হাতের লেখায় তরতরিয়ে এগিয়েছে মেয়েটা। কাটাখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাস্টারের কাছে এটা বিস্ময়ের কারণ নয়, বাকি ছেলেমেয়েদের থেকে এই মেয়ে যে বুদ্ধিসুদ্ধিতে এগিয়ে সে-খবর তার আগেই জানা আছে। অবাক

boierpathshala.blogspot.com

হওয়ার কারণ হল তিন নম্বর অঙ্ক। ফুল তিন নম্বরটা পারেনি, আর সেটাই তাকে চমৎকৃত করেছে।

মুচকি হেসে চিত্তরঞ্জনবাবু বললেন, 'কী হল দিদিমণি? এটা আটকাল কেন?'

এই স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের কোনো ইউনিফর্ম নেই। অজ পাড়া গাঁ-র স্কুলগুলোতে ইউনিফর্ম হয়ও না। এমনিতেই বাড়ি থেকে বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের পাঠাতে চায় না, তার ওপর যদি জামাকাপড়ের বোঝা চাপানো হয়, তাহলে হয়তো গ্রাম ছেড়েই পালাবে। তবু চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া একটা কাণ্ড করেছেন। এই কাণ্ড অদ্ভুত। তিনি ছেলেমেয়েদের বলেন, 'তোমরা বাপু যতটা পারবে সবুজ জামা, সবুজ ফ্রক পরে স্কুলে আসবে। যদি সবুজ না পাও তাহলে সবুজের কাছাকাছি হলেও চলবে। সবুজ কেন বললাম সেটা কি তোমরা জানো?'

ছেলেমেয়েরা চুপ করে থাকে। এর ওর মুখের দিকে তাকায় অবাক চোখে। তাদের এই মাস্টার যে খানিকটা খ্যাপা প্রকৃতির মানুষ সে-কথা অন্যরা না জানলেও তাদের জানা আছে। মানুষটা এরকম বলেই হয়তো এখানে মারধোরের ভয় আছে, মারধোর নেই। শাস্তির হুমকি হয়, কিন্তু সত্যি শাস্তি জোটে না। খ্যাপা না হলে এমনটা হয়? ছেলেমেয়েরা ভাবল, এই সবুজ রঙের জামা পরবার কথাও ওইরকম কিছু হবে।

চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া হুংকার ছাড়লেন, 'কি রে ফটকে, চুপ করে আছিস যে? সবুজের কথা কেন বলছি? উঠে দাঁড়া, স্ট্যান্ড আপ।'

ফটকে ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ায়। মাথা চুলকোতে থাকে। সত্যি তো! লাল, নীল, হলুদ, বেগুনি এত রং থাকতে সবুজ কেন?

চিত্তরঞ্জনবাবু ফোঁস করে মিথ্যে মিথ্যে রাগের নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'হয়েছে, খুব হয়েছে। বুদ্ধি বোঝা গেছে তোমার। মাথার চুল আর ছিঁড়তে হবে না। সবুজ হল নতুনের রং, তারুণ্যের রং। তারুণ্য কী জানিস? জানিস না। জানতাম জানবি না। গাধা কি আর তোদের এমনি বলি? গাছে যখন নতুন পাতা বেরোয় দেখিস কখনও?'

এই সহজ প্রশ্নে ছেলেমেয়েরা অতি উৎসাহের সঙ্গে মাথা নাড়ল। যেন 'গাধা' উপাধি পেয়ে তারা অতি খুশি।

চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া আবার বলতে শুরু করলেন, 'ছোট ছোটো সবুজ পাতা কেমন ঝলমল করে না? করে তো?'

boierpathshala.blogspot.com

ছেলেমেয়েরা গলা ফাটিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, মাস্টারমশাই করে, করে।'

'তোরাও হলি সেরকম। বয়েসে তরুণ না হলেও মনে একেবারে টাটকা, তাজা। ওরে হাঁদার দল, কবিগুরু রবি ঠাকুরের কবিতা আছে—ওরে আমার নতুন, ওরে আমার কাঁচা, পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা। বুঝলি?'

ছেলেমেয়েরা বুঝল না, কিন্তু আবার জোরে মাথা নাড়ল।

'তাই বলছি, বাড়িতে যদি সবুজ পোশাক থাকে গায়ে দিয়ে স্কুলে আসবি। গাঁয়ের লোক দেখে বুঝবে কাটাখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়ে, একেবারে সব টাটকা, তাজা বালক বালিকার দল।'

হাসান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মাস্টারমশাই, পুচ্ছ মানে কী?'

চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া চোখ পাকিয়ে বললে, 'এইটা জানিস না গর্দভ! ছ্যা ছ্যা। পুচ্ছ মানে হল লেজ। ইংরেজিতে বলে টেল।'

মানিক অবাক গলায় বলল, 'আমরা কীভাবে লেজ তুলে স্কুলে আসব? আমাদের তো লেজই নেই।'

চিত্তরঞ্জনবাবুও একটু চুপ থেকে গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগলেন। ছেলেমেয়েরা তার সঙ্গে যোগ দিল। মুহূর্তের মধ্যে গোটা স্কুল জুড়ে একটা আনন্দের শোরগোল পড়ে গেল যেন!

ছেলেমেয়েরা সবাই সবুজ পরতে পারে না। কেউ কেউ পরে। তাদের মধ্যে কারও আবার জামার রং উঠে এমন ফ্যাকাশে মেরে গেছে যে সবুজ, হলুদ আলাদা করার উপায় নেই। চিত্তরঞ্জনবাবু অবশ্য এতেই খুশি। এইটুকুই কম কী? ইউনিফর্ম ছাড়া তবু তো একটা কিছু হল।

ফুল নামের মেয়েটা যেমন আজ সবুজ কিছু পরতে পারেনি। সে পরেছে বেগুনি রঙের ফ্রক। তবে মাথার ওপর একটুখানি সবুজ আছে। সবুজ ক্লিপ। সেই ক্লিপসুদ্ধু মাথা নাড়িয়ে বলল, 'তিন নম্বর অঙ্কটায় কোথাও একটা গোলমাল আছে মাস্টারমশাই।'

'গোলমাল!'

ভুরু কোঁচকালেন চিত্তরঞ্জন।

ফুল বিড়বিড় করে বলল, 'হ্যাঁ, ভাগ আর গুণের কোথায় গোলমাল হয়েছে...দু'বার চেষ্টা করেও হল না। আমার ভুল নয়, অঙ্কে কোথাও...।'

মুখ ঘুরিয়ে বোর্ডের দিকে তাকালেন চিত্তরঞ্জনবাবু। ঘটনা তাই নাকি? হতে পারে। অঙ্ক তিনি মাথা থেকে তৈরি করে দিয়েছেন। তাড়াহুড়োতে ভুল হতেই পারে। কিন্তু তা বলে এইটুকু একটা মেয়ে ধরে ফেলবে! দ্রুত অঙ্কটা পড়তে

লাগলেন তিনি এবং শেষের দিকে আসতেই গোলমাল ধরা পড়ল। তবে গুণ, ভাগে নয়, ভুল হয়েছে চিহ্নে। বিয়োগের বদলে যোগ হবে। তাড়াহুড়োয় বিয়োগের পেট কাটা হয়নি।

চিত্তরঞ্জনবাবু মুগ্ধ হলেন।

এইটুকু মেয়ে এরকম পরিষ্কার মাথা পেল কোথা থেকে! ঝিলডাঙায় এমন মাথার ছেলেমেয়ে একটাও নেই। ঠিকমতো লেখাপড়া করাতে পারলে এই মেয়ে অনেক বড়ো হবে। কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব? বাপ-ঠাকুরদার পয়সা না থাকলে গাঁয়ের ছেলেমেয়েকে শহরে নিয়ে গিয়ে পড়ানো যায় না। যে দু-একজন পারে সেগুলো গল্পকথার মতো। গল্পকথা বলেই কাগজপত্তরে ফটো বের হয়। ইন্টারভিউ ছাপে। বেশিরভাগই আগাড়ে ভাগাড়ে পড়ে থাকে।

এই মেয়ের জন্য কি কিছু করা যায় না?

মাস্টার ফুলকে কাছে ডাকলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে নরম গলায় বললেন, 'তোর শরীর কেমন মা?'

ফুল জড়োসড়ো ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

'চোখের কী একটা ব্যামো হয়েছিল যেন? নিতাই সেদিন বললে, ক-দিন ছুটি চাই।'

চোখের ব্যামো! ফুল কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। বুঝবে কী করে? সে তো আর জানে না, তার বাবা স্কুল কামাইয়ের জন্য বানিয়ে বানিয়ে চোখের অসুখের কথা বলে গেছে।

চিত্তরঞ্জনবাবু হেসে বললেন, 'বাড়িতে ঠিকমতো পড়াশোনা করিস তো?'

ফুল দু-পাশে মাথা নাড়ল।

চোখ পাকিয়ে চিত্তরঞ্জনবাবু বললেন, 'সেকি! লেখাপড়া করিস না কেন? তোর বাবাকে যে বলেছিলাম, মেয়েটার ওপর নজর দিতে।'

ফুল একটু চুপ করে মাথা নামিয়ে বলল, 'জ্বর হয় মাস্টারমশাই।'

'ও কিছু নয়, গ্রামগঞ্জে জন্মেছিস, অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকবে। তার ওপর আবার গরিব ঘরের মেয়ে। পুষ্টি-সুষ্টি কম। কিন্তু তার জন্য পড়াশোনা বাদ দিলে তো চলবে না মেয়ে। অভাব অনটন, খরা বন্যা, অসুখ-বিসুখ নিয়েই আমাদের চলতে হবে। তাই তো?'

ফুল মাথা নাড়ল।

চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া খুশি হলেন। তিনি বিশ্বাস করেন, শিশুকাল থেকেই মানুষকে তার অবস্থান বুঝে নিতে হয়। অনেকেই হয়তো বলবে, এইটুকু মানুষকে

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

অভাব অনটন, অপুষ্টির কথা বলে কী লাভ? অবশ্যই লাভ। যে-গাছ জানে নিজের পায়ে দাঁড়াতে অসুবিধে, সে জন্মানোর পর থেকেই শক্ত কিছু ধরে ওঠবার চেষ্টা করে, যে-পশু জানে তার মুখের সামনে কেউ খাবার ধরবে না, খেতে হবে তাকে শিকার করে, সে শৈশব থেকেই শিকারের জন্য তৈরি হয়। মানুষও সেরকম। ধনীর সন্তান যদি দুধ ভাত চেনে, গরিবের ছেলেমেয়েদের চিনতে হবে শাক পাতা। বরং তাদের ঝামেলা বেশি। লড়াই কঠিন। তাই বোঝানোর পালাটাও শুরু হওয়া উচিত আগে থেকে। সবথেকে বড়ো কথা হল, এই মেয়ের মাথায় বুদ্ধি আছে। সাধারণ বুদ্ধি নয়, অন্যরকম বুদ্ধি। সাধারণ বুদ্ধিতে অঙ্ক ঠিক করা যায়। কিন্তু অন্যরকম বুদ্ধি না থাকলে এই বয়েসে অঙ্কের ভুল ধরা যায় না।

'তোর লেখাপড়া ভালো লাগে তো বাছা?'

ফুল চুপ করে রইল। সে বুঝতে পারছে না, মাস্টার তাকে আজ এত প্রশ্ন করছে কেন? ভয় ভয়ও করছে। তবে একটাই রক্ষে এই মানুষটাকে বেশি ভয় পেতে হয় না, একটু ভয় পেলেই চলে। ইনি রাগেন, আবার রাগ ভুলে যান।

তবে এটা সত্যি যে চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া যেন আজ ফুলের জন্য বেশি উৎসাহ বোধ করছেন!

'তোর কী পড়তে ভালো লাগে?'

ফুল মুখ তুলে তাকাল।

'অঙ্ক? নাকি ইতিহাস, ভূগোল? কোন বিষয়টা তোর পছন্দের?'

মাস্টারমশাইয়ের প্রশ্ন ফুল ঠিক বুঝতে পারছে না। পড়া মানে পড়া। তার আবার এটা ওটা কী?

'বিজ্ঞান ভালো লাগে না? সায়েন্স?'

ফুল ঘাড় কাত করে বলল, 'লাগে।'

চিত্তরঞ্জনবাবু যেন ডবল উৎসাহ পেলেন, 'গুড। খুব ভালো। সায়েন্স-ই হচ্ছে বিদ্যার আসল স্তম্ভ। মনে রাখবি মেয়ে, দুনিয়াদারি সবকিছুই বিজ্ঞান মেনে চলে। নিয়মের বাইরে, ব্যাখ্যার বাইরে কোনো কিছুরই এক-পা চলার উপায় নেই। এই যে আলো, এই যে বাতাস, এই যে তুই, আমি, এই যে তোর জ্বরজারি, এত ছেলেমেয়ে কেউ পড়তে ভালোবাসে, কেউ বাসে না—সবই বিজ্ঞান।'

শুধু ফুল নয় বাকি ছেলেমেয়েরাও চুপ করে ভাষণ শুনতে লাগল। বুঝছে না কিছুই, তবু শুনছে। মানুষটার আজ হল কী! ফুল একটা ভুল ধরে যেন গাছে

boierpathshala.blogspot.com

নাড়া দিয়েছে। ঝুপ ঝুপ করে ডালপাতা, ফুল পাতা সব খসে পড়ছে! তবে একটা ভালো, লেখাপড়া থেমেছে। একটু পরেই টিফিন।

চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া হাসি হাসি মুখে বললেন, 'বিজ্ঞানের কোন জিনিসটা পছন্দ তোর বল দেখি।'

ফুল অবাক হল। বিজ্ঞানের আবার কোনটা কী! বই তো মোটে একটাই। চিত্তরঞ্জনবাবুও বুঝলেন প্রশ্নটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। তিনি সহজ করার চেষ্টা করলেন।

'এই ধর গাছপালা, জীবজন্তু, মানুষ, জলবাতাস, সবই তো বিজ্ঞান, আলাদা আলাদা বিজ্ঞান। কেউ ধর ভালোবাসে গাছপালা, কারও পছন্দ মানুষের শরীর। সেই বিজ্ঞান পড়ে ডাক্তার তৈরি হয়। কেউ হয় বৈজ্ঞানিক। তেমনই বলছি, তুই কোনটায় আনন্দ পাস?'

ফুল মুহূর্তখানেক চুপ করে থাকল। তারপর মাথা নামিয়ে নীচু গলায় বলল, 'আমি আনন্দ পাই পোকামাকড়ে মাস্টারমশাই।'

'কী! কী বললি?'

'পোকামাকড়।'

'পোকা? ইনসেক্টস? পোকা পছন্দ করিস? বলিস কী রে ফুল! এত কিছু থাকতে তোর পোকা পছন্দ! অ্যাঁ! কোন্ পোকা? গুবরে নয়তো? হা হা।'

ফুল পিছন ফিরে বন্ধুদের দিকে তাকাল। তারপর লজ্জা লজ্জা গলায় বলল, 'সব পোকা নয়, পিঁপড়ে খুব ভালো লাগে।'

'পিঁপড়ে! শেষ পর্যন্ত সামান্য পিঁপড়ে!'

খুঁটিয়া মাস্টার এবার ঘর ফাটিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন। ছেলেমেয়েরাও হেসে উঠল।

কাটাখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিফিন নামেই টিফিন। ছাত্রছাত্রীদের খাওয়া-দাওয়ার তেমন কোনো বালাই নেই। দু-একজন রুটি-টুটি আনে বটে কিন্তু খাওয়ার সময় কই? হইচই করে খেলাধুলোতেই সময় কাটায়। মাসখানেক আগে, মিড ডে মিলের একটা ব্যবস্থা প্রায় করে ফেলেছিলেন চিত্তরঞ্জনবাবু। কিন্তু অনেকটা এগিয়েও সেই ব্যবস্থা ভেস্তে গেছে। বানেরহাটের আগে নবাবগঞ্জ বিদ্যামন্দির স্কুলের ছেলেরা মিড ডে মিলের খিচুড়ি খেয়ে অসুস্থ হওয়ার পরপরই গোটা ব্লকেই এই প্রকল্প আপাতত বন্ধ। সেই খিচুড়িতে আরশোলা ছিল।

এখানে তাই টিফিন মানে আর বিশুদ্ধ খাওয়ার সময় নয়, ছেলেমেয়েদের ছোটাছুটি, দুরন্তপনার সময়।

boierpathshala.blogspot.com

বারান্দার একপাশে বসে বন্ধুদের খেলার দিকে তাকিয়ে আছে ফুল। বোধহয় জ্বর আসছে। গা-টা কেমন করছে। ব্যথা ব্যথা। আবার নাও হতে পারে। অনেকসময় এরকম হয়, চোখ জ্বালা করে, গা ম্যাজ ম্যাজ করে, খানিকটা পরে ঠিকও হয়ে যায়। আজ কখন ঠিক হবে। মাথাটাও টিপ টিপ করেছে। পুরো মাথা নয়, কপালের ওপরটা।

এমন সময় রানি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে সামনে দাঁড়াল। বেণী দুলিয়ে বলল, 'অ্যাই ফুল, চল খেলবি।'

'না।'

'না কেন? চল না। আমাদের দল হচ্ছে না।'

'স্বপ্নাকে নে।'

রানি আরও জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'স্বপ্নাকে নেব না, ওর সঙ্গে ঝগড়া। তুই চ।'

কথা শেষ করে সে হাত বাড়িয়ে ফুলের ডান হাতটা চেপে ধরল। ফুল হাত ছাড়িয়ে বলল, 'আমার ভালো লাগছে না।'

এর ফাঁকেই পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ভবানী। ছেলেটার মুখটা সুন্দর, কিন্তু স্বভাবটা ঝগড়ুটে। মারপিটেও ওস্তাদ। স্কুলে রোজই বকুনি আর শাস্তি জোটে। যদিও তাতে ভবানীর কিছু এসে যায় না। সে মুখ পাকিয়ে বলল, 'ভালো লাগছে না হাতি। ফুল ওঠ বলছি।'

ফুল শান্ত গলায় বলল, 'আমার জ্বর আসছে।'

'কোথায় জ্বর? দেখি।'

রানি ফুলের গলার কাছে হাত দিল। তারপর বলল, 'এমা, কী মিথ্যুক রে। গা তো ঠান্ডা, জ্বর হলে বুঝি গা ঠান্ডা থাকে?'

ভবানী মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'ছেড়ে দে রানি, ও আমার সঙ্গে খেলবে না। বেশি ডাঁট হয়েছে।'

রানিও রেগে গেছে। নাক ফুলিয়ে বলল, 'ডাঁট হবে না? মাস্টারমশাই গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আহা উহু করলে আমারও অমন হত।'

ফুলের বিরক্তি লাগছে। খেলাধুলো যে তার অপছন্দের এমন নয়। তবু যেন আজকাল কোনো কোনো সময় একা থাকতেই তার বেশি ভালো লাগে। একা, চুপচাপ বসে বসে সময় চলে যায়।

ভবানী বলল, 'এক কাজ কর রানি, ফুলের জন্য গোটাকতক গুবরে পোকা ধরে আন। শুনলি না মাস্টারমশাইয়ের কাছে কেমন পোকার গপ্প করল? ও বরং

boierpathshala.blogspot.com

টিপিনের সময় গুবরের পোকার সঙ্গে এক্কাদোক্কা খেলুক।'

হাসতে হাসতে রানি আর ভবানী দুজনেই ছুট লাগাল। ফুলের রাগ হল, আবার লজ্জাও করল। ছি ছি, কেন সবার সামনে অমনভাবে পোকার কথাটা বলল? মোটেও উচিত হয়নি। ভবানীরা তো ঠাট্টা করবেই। এখন হাসছে, পরেও হাসবে। কে জানে, এবার থেকে স্কুলে হয়তো সবাই তাকে গুবরে বলেই ডাকবে। মাগো! আজকাল মাঝে মাঝে যে কী হয়! যা বলার নয়, বলে ফেলে। কেন বলে? ক-দিন ধরেই এমন হচ্ছে। ঝড়, বৃষ্টি, আগুনের কথা বলে মায়ের কাছে কত বকুনি-ই না খেতে হল। বারবার ভাবে আর বলবে না, কিছুতেই বলবে না। তবু কে যেন বলিয়ে নেয়! কে বলায়? মা বলে, 'পাগলের কথা।' তার ভেতরে সত্যি কি একটা পাগল আছে? সবার ভেতরেই কি পাগল থাকে? নাকি কেবল তার-ই আছে? সে-ই কি এসব বলে? মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করলে হত। মানুষটা অনেক কিছু জানে। মনে হয়, সবই জানে। তবে সবার সামনে নয়, জিজ্ঞেস করতে হবে আড়ালে, একা একা। সেই সময় কেউ যেন আশেপাশে না থাকে। নইলে আবার সবাই হাসাহাসি করবে।

ফুলের মাথা ব্যথা বাড়তে লাগল। সে ঘরে উঠে এল। বসল একটা কোণা বেছে। এদিকটায় আলো কম। আঃ! অন্ধকারে আরাম লাগে।

কাটাখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিয়ম হল টিফিনের পর তিনটে ক্লাস হবে। আজ একটাও হল না।

সদর থেকে লোক এসেছে। স্কুলে বাথরুম হবে। এই লোক নাকি সেই বাথরুমের জায়গা বাছবে। চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া বেজায় উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তিনি পড়াচ্ছিলেন জলবায়ু। মেঘ ও বৃষ্টিপাত। বৃষ্টিপাতের মাঝখানেই তিনি ছুটি ঘোষণা করলেন। ছেলেমেয়েরা হইহই করে স্কুল ফাঁকা করে দৌড় দিল।

চিত্তরঞ্জনবাবু বাইরে এলেন। সদর থেকে আসা লোকটির চেহারা সুবিধের নয়। সিড়িঙ্গে ধরনের রোগা। চোখ, ভুরু, নাক সব কিছুই কোঁচকানো। কোমরের প্যান্ট ঢল ঢল করছে। বারবার টেনে তুলতে হচ্ছে। সাইকেলটা হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে গেটের পাশে। ছেলেমেয়েরা স্কুল ফাঁকা করার পর সেই লোক ভেতর ঢুকল। সাইকেল উঠোনের একপাশে হেলান দিয়ে রেখে পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকে চাপা দিল দ্রুত। সম্ভবত বাথরুমের কারণে আসা বলে দুর্গন্ধে নাকে চাপা দিয়েছে। বাগানের জন্য এলে কী করত?

আনন্দে বিহ্বল চিত্তরঞ্জনবাবু গদ্গদ গলায় বললেন, 'আসুন স্যার, ভেতরে আসুন।'

boierpathshala.blogspot.com

কেরিয়ারে রাখা ব্যাগ হাতে নিয়ে বারান্দায় উঠে এসে গভীর সন্দেহের চোখে চারপাশে তাকালেন গন্ধবাবু।

'আপনি কে?'

'আমি? আমি চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া, এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্যার। যদিও স্কুলে মাস্টার বলতে আপাতত একজন।'

'অ।'

চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া উত্তেজনায় হাত জোড় করে ফেলেছেন।

'ভেতরে আসুন স্যার। ভেতরে এসে বসুন।'

'না, ভেতরে যাব না। সাইকেল আছে।'

'কিছু হবে না।'

'হবে। গ্রামের ছেলেপিলেগুলো মহাচোর। এর আগে আমার দু-দুটো সাইকেল গেছে। হারামজাদার দল সব।'

চিত্তরঞ্জনবাবু নিজেকে সামলালেন। চোর কেন, ডাকাত বা খুনি বললেও রাগ করার কিছু নেই। বাথরুম চাই। এত বছরের চেষ্টা সত্যি কি সফল হবে? তিনি দ্রুত ভেতর থেকে চেয়ার বার করে আনলেন।

'বসুন, স্যার, এখানে বসুন? কী খাবেন? চা বলি?'

প্যান্ট টেনে কোমরে তুলতে তুলতে সিড়িঙ্গে চেয়ারে বসল। চোখেমুখে বিরক্তি বাড়ছে।

'আমি প্রাইমারি স্কুলবাড়ির বাথরুম ইনস্পেক্টর। কাজ অতি নোংরা। কী করা যাবে? চাকরি বলে কথা। যাই হোক, আপনারা বাথরুম চেয়ে অ্যাপ্লাই করেছিলেন?'

চিত্তরঞ্জনবাবু বললেন, 'করেছিলাম স্যার, বহুবার করেছিলাম, খুবই সমস্যা। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা...। কী খাবেন স্যার?'

ইনস্পেক্টর ব্যাগ খুলে দড়ি পাকানো কাগজের তাড়া বের করতে করতে বিরক্ত গলায় বলল, 'আপনি বারবার খাওয়ার কথা বলছেন কেন? আমি কি এখানে খেতে এসেছি? এই যে, এই যে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন পেয়েছি। শালারা কাগজগুলো এমন গুলিয়ে রাখে। ঠিক সময় কিছু যদি খুঁজে পাওয়া যায়, হারামজাদার দল সব।'

মেলে ধরা হাতের কাগজটায় চোখ বুলিয়ে মুখ তুলে তাকাল ইনস্পেকটর।

'অনেক আবেদন করেছি স্যার। বহু দিন ধরে করছি। শুধু আমি নয়, আমার স্কুলের ছেলেমেয়েরাও বাথরুম চেয়ে চিঠি লিখেছে।'

boierpathshala.blogspot.com

ইনস্পেক্টর ঠোঁটের মুচকি ফাঁকে হেসে বলল, 'আপনি তো ওস্তাদ লোক মশাই। ঘুরে ফিরে ঠিক জায়গায় গেছেন।'

'ঠিক জায়গায়!'

ঠোঁটের হাসি বড়ো করে ইনস্পেক্টর বলল, 'বুঝতে পারছেন না? এই তো আপনার অ্যাপ্লিকেশনের ওপর মানা সরকারের সই।'

এতক্ষণে পুরোটা বুঝতে পারলেন চিত্তরঞ্জনবাবু। মানা সরকার কথা রেখেছে।

'কিছু না হতে শেষ পর্যন্ত ওঁর কাছে যাই। আমি ভাবতেও পারিনি সত্যি সত্যি উনি কিছু করবেন। অত বড়ো নেতা...।'

ইনস্পেক্টর ফিচ করে হেসে বলল, 'এটাই তো ভুল করেছেন। শেষ পর্যন্ত কেন? আমাদের দেশে নেতা মন্ত্রী দিয়ে শুরু থেকেই কাজ শুরু করতে হয়। নিন চলুন, কোথায় বাথরুম হবে দেখে আসি। ইস কেমন একটা বিচ্ছিরি গন্ধ আসছে না? ব্যাড স্মেল।'

রোগা ইনস্পেক্টর প্যান্ট ঠিক করতে করতে উঠে দাঁড়িয়েছে। আবার চারপাশে তাকাচ্ছে গভীর সন্দেহের চোখে। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বলল, 'আপনার ছেলেমেয়েরা কি যেখানে সেখানে ইয়ে করে?'

চিত্তরঞ্জনবাবু হেসে বললেন, 'এখনও যেখানে সেখানে শুরু করেনি, তবে এবারও যদি একটা ব্যবস্থা আপনারা করে না দেন তাহলে ভবিষ্যতে কী হবে বলতে পারছি না। নিন, আসুন, দক্ষিণ দিকে একটা জায়গা দেখে রেখেছি, দেখুন আপনাদের যদি পছন্দ হয়।'

ইনস্পেক্টর বারান্দা থেকে নামতে নামতে হতাশ গলায় বলল, 'আর পছন্দ অপছন্দ, মানা সরকারের রেকমেন্ডেশন যখন, তখন তো পছন্দ-অপছন্দ আর স্কুল ডিপার্টমেন্টের হাতে নেই, যেখানে হোক একটা কিছু করে দিতে হবে। বড়ো সাহেব কালই আমাকে ডেকে বলে দিয়েছে, কাজ একেবারে ফাইনাল করে ফিরবে মদন। মনে রাখবে, এক সপ্তাহের মধ্যে বাথরুম চাই। আমি কিন্তু সাইকেলটা সঙ্গে নিয়ে যাব।'

'দরকার নেই স্যার, এই তো পিছনেই।'

'দরকার আছে। চুরি যাওয়া সাইকেল উদ্ধারের জন্য তো আমি আপনাদের মতো নেতা পাকড়াও করতে পারব না।'

চিত্তরঞ্জনবাবু কী বলবেন, কী করবেন বুঝতে পারছেন না। এক সপ্তাহের মধ্যে কাটাখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাথরুম তৈরি হয়ে

boierpathshala.blogspot.com

যাবে! তিনি কল্পনাও করতে পারছেন না। বিশ্বাস হচ্ছে না। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। মানা সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠেছে। কে বলে নেতা, মন্ত্রী খারাপ? তিনি নিজে রাজনীতি করেননি কখনও। মানা সরকারের দল কেন, কোনো দলের সঙ্গেই যোগাযোগ নেই তাঁর। রাখতে চানও না। কোনো উপায় নেই দেখে একেবারে খড়কুটোর মতোই ওঁর কাছে গিয়েছিলেন। ভুলেও গিয়েছিলেন। নেতাদের কাছে কত মানুষই তো যায়। এই মানুষটার কাছে আবার যেতে হবে। ধন্যবাদ জানিয়ে আসতে হবে। আচ্ছা, ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা চিঠি লেখালে কেমন হয়? ধন্যবাদের চিঠি। তার বয়ানটা হবে—

'মাননীয় মানাবাবু, আপনার প্রতি আমাদের...।'

কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে, দু-আঙুলে নাক টিপে ধরে জায়গা দেখে নিল ইনস্পেক্টর।

চিত্তরঞ্জনবাবু হেসে বললেন, 'আপনি নাক চেপে আছেন কেন স্যার? ওখানে ময়লা কিছু নেই।'

'নেই তো কী হয়েছে? হবে তো। বাথরুম তৈরি হলেই হবে। যাক, আমি সব দেখেশুনে গেলাম। কাল না হোক পরশুই লোক চলে আসবে। এক-দেড়দিনের কাজ। তবে হ্যাঁ, বাজেট কিন্তু সামান্য। এটা চাই, ওটা চাই বলে তখন বায়না করবেন না মশাই।'

চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়ার চোখে প্রায় জল এসেছে। এত বছরের লেগে থাকা, জেদ, ঘোরাঘুরি সফল হতে সময় নেবে মাত্র দেড় দিন! নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'না না সামান্য হলেই আমাদের চলে যাবে। আমি তো ভেবেছিলাম, শুধু যদি মেয়েদেরটুকুই করতে পারি তাহলেই অনেকটা।'

ইনস্পেক্টর ফিরতে ফিরতে বললেন, 'বলা যায় না আবার হয়তো মানা সরকারের মতো কাউকে গিয়ে ধরলেন, আর আমার গেল বাঁশ। পলিটি-শিয়ানদের তো আর ভাবনাচিন্তা নেই, শুধু চাই আর চাই। যাক, আমি চললাম।'

এত খোঁচাও আজ গায়ে লাগছে না চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়ার। আজ একটা দারুণ আনন্দের দিন। আনন্দ আর তৃপ্তি। লেগে থাকলে তাহলে হয়। কাজ এখনও অনেক পড়ে আছে। বাথরুম হয়েছে, এবার স্কুলবাড়ি ঠিকঠাক করতে হবে। মাত্র একটা ঘরে চলে কখনও? এরকম দিনে ছোটোখাটো মান অপমান গায়ে মাখলে চলবে কেন?

'স্যার, অন্তত একটা ডাব খেয়ে যান।'

সাইকেল হাতে থমকে দাঁড়াল ইনস্পেক্টর। নাক সিঁটকে বলল, 'ডাব?

boierpathshala.blogspot.com

এখন খাব না। দুটো দিয়ে দিন, বাড়ি নিয়ে যাই। এত করে যখন বলছেন।'

সাইকেলের রডে ডাব ঝুলিয়ে ইনস্পেক্টর চলে যাওয়ার পর ফাঁকা স্কুলে বসে রইলেন চিত্তরঞ্জনবাবু। তিনি তখনও জানেন না শূন্য, আলো আঁধারি ক্লাসরুমের এককোণায় ভাঙা বেঞ্চে মাথা নামিয়ে দিয়ে বসে আছে ছোট্ট একটা মেয়ে। তার চুল পড়েছে এলিয়ে। সেই চুলে ছোট্ট একটা সবুজ ক্লিপ।

দূর থেকে তাকিয়েই চিত্তরঞ্জনবাবু বুঝতে পারলেন, মেয়েটা অসুস্থ। ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে তিনি প্রায় চিৎকার করে উঠলেন।

'ফুল তুই! তুই কী করছিস?'

ফুলের মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায়। গোটা মাথাটা যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেই জ্বলুনি এতটাই যে ছুটির পরও উঠে বাড়ি যাওয়ার ক্ষমতা ছিল না তার। কাউকে ডাকতেও পারেনি। আধা অচেতনে শুয়ে আছে। মাস্টারের চিৎকারে ফুল কোনোরকমে মাথা তুলল। কিন্তু বেশিক্ষণ তুলে রাখতে পারল না। তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিল। চোখ খুলতে কষ্ট হচ্ছে। বিকেলের নরম আলোতেও কষ্ট হচ্ছে!

চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া সামনে এসে দাঁড়ালেন। ফুলের মাথায় হাত রাখতেই ফুল ছিটকে সরে গেল। জড়ানো গলায় বলল, 'উফ ব্যথা, খুব ব্যথা।'

'কোথায় ব্যথা?' উদ্বিগ্ন চিত্তরঞ্জনবাবু ঝুঁকে পড়লেন।

এবার আধা আচ্ছন্ন গলায় ফুল বলল, 'মারে, ওরা মারে...।'

'মারে! কে মারে ফুল?'

'মারে, মারে...।'

চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া নরম গলায় বলেন, 'কাকে মারে ফুল?'

'আপনারে মারে, আপনারে মেরে ফেলে মাস্টারমশাই। ওরা আপনারে মেরে ফেলে...।'

চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া কী করবেন বুঝতে পারছেন না। শুধু বুঝতে পারছেন, এই মেয়ের যন্ত্রণা এতটাই বেশি হচ্ছে যে সে ভুল বকতে শুরু করেছে। ডিলিরিয়াম। পরম যত্নে ফুলের মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন তিনি।

খানিক আগের আনন্দ ছোটো একটা মেয়ে বিষাদে মাখামাখি করে দিল। খুঁটিয়া মাস্টারের মন ভারী হয়ে গেল।

boierpathshala.blogspot.com

পনেরো

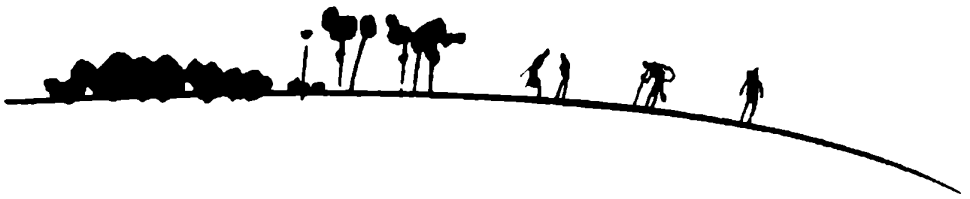

বন্ধ দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল শুদ্ধনাথ।

দরজায় গায়ে বড়ো বড়ো করে লেখা 'মেকআপ'। লেখার মাথায় ছোট্ট লাল বাল্‌বের আলো জ্বলছে। আলোতে সম্ভবত কোনো গোলমাল হয়েছে, তিরতির করে কাঁপছে। কাঁপার সময় প্রতিবারই মনে হচ্ছে, এই নিভে যাবে, কিন্তু নিভছে না।

শুদ্ধনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সে বুঝতে পারছে না কী করবে। নক করবে? নাকি কাঁপা আলো পুরোপুরি নেভা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? এই সময় কোনটা উচিত হবে?

পরিচালক আর্টিস্টের মেকআপ রুমে নক্ করলে খারাপ কিছু নয়। সে হক তার আছে। কিন্তু ভেতর থেকে আর্টিস্ট যদি কড়া গলায় বলে, 'পরে আসবেন', তাহলে সেটা খারাপ। অন্যদিনের জন্য খারাপ নয়, আজকের জন্য খারাপ। কারণ আজকের দিনটা একটা আলাদা দিন। আলাদা দিনে কাজ করতে হয় আগুপিছু সাতবার চিন্তা করে।

আর্টিস্টদের ডাকাডাকি সাধারণত অ্যাসিস্ট্যান্টদের দিয়েই করানো হয়। আজ সেটা হবে না। পরিচালককে নিজেই ডেকে কথা বলতে হবে। আর্টিস্ট যখন ঝামেলা পাকায় তখন ডাকা থেকে শুরু করে, কথা বলা পর্যন্ত সবটাই পরিচালককে নিজে করতে হয়। এটাই নিয়ম। নইলে আর্টিস্টের মাথা ঠান্ডা হয় না।

শুদ্ধনাথ সেই চেষ্টাই চালাচ্ছে। আর্টিস্টের মাথা ঠান্ডা করার চেষ্টা।

দরজার সামনে থেকে সরে এল শুদ্ধনাথ। অস্পষ্ট হলুদ আলোর

boierpathshala.blogspot.com

করিডোরে আবার চিন্তিত মুখে পায়চারি করতে শুরু করল। তার এক হাতে সিগারেট, অন্য হাতে ফাইল। সিগারেট জ্বলছে না। আট মাস আগে ডান দিকের বুকে চিনচিনে ব্যথার পর থেকে ডাক্তার সিগারেটে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তারপর থেকে শুদ্ধনাথ হাতে সিগারেট রাখে কিন্তু ধরায় না। তাও সবসময় রাখে না। টেনশন হলে রাখে। তার অন্য হাতে একটা গাবদা ফাইল। ফাইলের ওপর লেখা—

ঝরনার মতো জীবন। ৪২ পর্ব।

আজ বিয়াল্লিশ পর্বের শুটিং চললেও 'ঝরনার মতো জীবন' মেগা সিরিয়ালটির এখন পর্যন্ত সাঁইত্রিশ পর্ব টেলিকাস্ট হয়েছে। এর মধ্যেই সুপারহিট। প্রথম প্রথম অনেকের মনে হয়েছিল, নামের কারণেই সিরিয়ালের এই রমরমা। 'ঝরনার মতো জীবন' নাম হিসেবে সত্যি ভালো। একটা নরম, রোমান্টিক ব্যাপার আছে। তবে যত দিন যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে নামই জনপ্রিয়তার আসল কারণ নয়। আসল কারণ মোম চ্যাটার্জি। মোম চ্যাটার্জি এই সিরিয়ালের নায়িকা এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই তার নাম ঝরনা।

সেই মোম চ্যাটার্জি ঝামেলা শুরু করেছে। ঘণ্টাখানেক হল শটের মাঝখানে 'মাথা ধরেছে' বলে ফ্লোর ছেড়ে চলে এসে মেকআপ রুমে দরজা দিয়েছে। এই জগতে মেকআপ রুমই হল আর্টিস্টদের গোঁসাঘর। আর্টিস্টদের রাগ দেখানোর কমন পদ্ধতি হল 'মাথা ধরেছে।'

চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর সেই গোঁসা ভাঙানোর জন্য শুদ্ধনাথ ছুটে এসেছে। কিন্তু এখনও কিছু করতে পারেনি।

এই মেগা সিরিয়ালের জন্য শুদ্ধনাথ অতিরিক্ত পরিশ্রম করছে। আগে লেখা স্ক্রিপ্ট ধরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। দর্শকদের ডিমান্ড অনুযায়ী নতুন করে কাহিনি বদলানো হচ্ছে। এর জন্য বারোজনের একটা সার্ভে টিম তৈরি করা হয়েছে। তারা সিরিয়াল চলার সময় বাড়ি ঘুরে ঘুরে দর্শকের রিঅ্যাকশন বুঝছে। পরিচালককে ফিডব্যাক দিচ্ছে। সেই অনুযায়ী গল্প এদিক-ওদিক মোড় নিচ্ছে। সিরিয়াল জগতে অবশ্যই এটা একটা অভিনব ঘটনা। দর্শকদের ইচ্ছে অনুযায়ী কাহিনির ঘন ঘন বদল। এমনটা আগে কখনও হয়েছে বলে জানা নেই। টালিগঞ্জে তো দূরের কথা, মুম্বাইতেও নয়। বিদেশেও কি পাওয়া যাবে? মনে হয় না।

গত সপ্তাহ পর্যন্ত গল্প ছিল নামের মতই নরম-সরম। এখন সমীক্ষায় ডিমান্ড এসেছে শুধু প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা, বন্ধুত্ব দেখালেই চলবে না,

boierpathshala.blogspot.com

হার্ড এলিমেন্টও চাই। ঝগড়া, অশান্তি, টানাপোড়েন, ঘাত প্রতিঘাতও দেখাতে হবে। এটা সহজ জিনিস নয়। এতদিন ধরে একটা ঠান্ডা গল্প দুম্ করে গরম হয়ে যাবে কী করে? কিন্তু তা বললে চলবে না। দর্শকরা যখন চাইছে সেটাই করতে হবে।

করাও হয়েছে। শুদ্ধনাথ তিন রাত জেগে কাহিনি বদলেছে। বিয়াল্লিশ পর্বের শুরুতেই পর্দা জুড়ে লেখা হবে—

ঝরনা এবার রুক্ষ পর্বতমালার ওপর দিয়ে ছুটছে।

সেই 'রুক্ষ পর্বতমালা'র প্রথম পাথরটি হল একটা চড়। নায়িকার গালে ঠাসিয়ে চড়। কলেজ ক্যান্টিনে ঊর্মিলা তার প্রাণের বান্ধবী ঝরনাকে এই চড়টি মারবে।

স্ক্রিপ্টে এই চড়ের ব্যাপারটা কাল পর্যন্ত ছিল না। আজ সকালেই শুদ্ধনাথ ঢুকিয়েছে। স্টুডিয়ো আসার পথে টালিগঞ্জের মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ি দাঁড়ালে তার মাথায় বিদ্যুতের মতো 'চড়' চমকে ওঠে। যে-কোনো বড়ো চিন্তার নিয়মই তাই। হঠাৎ ঝলক দেয়। সে নিশ্চিত হয়, একটা সহজ সরল সুন্দর মেয়ের গালে চড় পড়লে দর্শকদের নড়েচড়ে বসতে হবে। হার্ড জিনিস হার্ড ভাবে শুরু করাই ভালো। কিন্তু তার আগেই নড়ে উঠেছে মোম। শট দেওয়ার আগে এই দৃশ্যের কথা শুনে ফ্লোর ত্যাগ করেছে। বুলু করিডোর ধরে হেঁটে আসছে। বুলু মোমের অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম পাহারাদার। শুটিং -এর সময় এই মেয়ে 'দিদি'র ব্যাগ, মেকআপ বক্স, জলের বোতল, মোবাইল ফোন বহন করে। বেশ কয়েকবছর ধরে সঙ্গে আছে। বুলু গোড়া থেকেই মাতব্বর, ইদানীং 'দিদি'র নামডাকে খ্যাতি এবং আচার ব্যবহারে কুখ্যাতি বৃদ্ধি পাওয়ার পর মাতব্বরি বেড়েছে। প্রোডাকশনের লোকজনদের ধমক-ধামক দেওয়া শুরু করেছে।

বুলুকে দেখে শুদ্ধনাথ এগিয়ে গেল। শালোয়ারের ওড়নায় হাত মুছতে মুছতে বুলু ভুরু তুলল।

'কী হয়েছে ডিরেক্টর সাহেব? এখানে ঘুরঘুর করেন কেন?'

শুদ্ধনাথ লক্ষ করলেন, তেইশ চব্বিশ বছরের এই নাক বোঁচা, কালো মেয়ে সম্প্রতি সাজগোজও বাড়িয়েছে। মুখে গাদাখানেক পাউডার। ভুরু প্লাক করা। ঠোঁটে মোটা লিপস্টিক। কানে ঝুমকো ধরনের বেমানান দুল।

শুদ্ধনাথ বিরক্ত গলায় বলল, 'কী আবার হবে? তোমার দিদির জন্য দাঁড়িয়ে আছি।'

বুলু লাল আলোর দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।

boierpathshala.blogspot.com

'দিদির মাথা ধরেছে।'

'সে তো প্রায় এক ঘণ্টা হতে চলল। এখনও কমেনি?'

বুলু নির্বিকার ভঙ্গিতে বলে, 'মাথা ধরা আপনার ইউনিটের কেউ নয় আর দিদির কপালটাও শুটিং ফ্লোর নয় যে ইস্টপ বললে থেমে যাবে।'

নায়িকার মেডসার্ভেন্টও যে নায়িকার মতো ঠেঁটা হবে এ আর আশ্চর্য কী? শুদ্ধনাথের মনে হল, চড় একেই মারা উচিত। সিরিয়ালের বানানো চড় নয়, সত্যিকারের চড়। ধমক দিতে গিয়েও শুদ্ধনাথ নিজেকে সামলাল। আজ ধমক ধামক দেওয়ার দিন নয়। গলা নরম করে বলল, 'একটু ভেতরে গিয়ে দ্যাখো না বাপু।'

বুলু তারকার ঢঙে তার পিটপিটে চোখ নাচিয়ে, কপালের চুল ঠিক করতে করতে বলল, 'কী দেখব?'

'দেখবে তোমার দিদির মাথা ধরা কমেছে কিনা। আর যদি দ্যাখো কমেনি তাহলে বল আমি একটু কথা বলব।'

বুলু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'মাথা ধরা কি দ্যাখা যায়? এটা আপনি কী বলেন ডিরেক্টর সাহেব!'

ভেতরে দাঁত কিড়মিড় করে উঠল শুদ্ধনাথ। এই ফড়ফড়িটা তো আচ্ছা জ্বালাতন শুরু করেছে। খোদ পরিচালকের সঙ্গেই এই ব্যবহার, অন্যদের সঙ্গে তাহলে কী না করে।

শুদ্ধনাথ শান্তভাবে বলল, 'আহা, জিজ্ঞেস করেই দ্যাখো।'

'লাভ হবে না। দিদি যন্তরনায় কাতরাচ্ছে।'

বুলুর কথা শেষ হতে না হতেই মেকআপ রুমের ভেতর থেকে হাসির আওয়াজ ভেসে এল। খিলখিল ধরনের হাসি। মোম হাসছে। শুদ্ধনাথ চমকে উঠল। নায়িকা যন্ত্রণায় হাসছে! বুলুও বোধহয় ঘাবড়ে গেল। সে কথা না বাড়িয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল টুক করে এবং মিনিট দুয়েক পরেই মুখ বের বলল, 'আসুন, ডিরেক্টর সাহেব, ভেতরে আসুন।'

ঘরের ভেতর উজ্জ্বল আলো। দেয়ালজোড়া আয়নার সামনে চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে মোম। গায়ে ম্যাজেন্টা রঙের তোয়ালে। বুক থেকে গলা পর্যন্ত ছড়ানো। জিনস পরা পা দুটো ছড়ানো সামনের টুলে। এর অর্থ সে শুধু মেকআপ তুলে ফেলেনি কস্টিউমও খুলে ফেলেছে। কলেজের শটটা ছিল শাড়ির। শান্তশিষ্ট, বাঙালি মেয়ে শাড়ি পরে কলেজে আসে। সবাই দেখে গদগদ হয়ে যায়।

boierpathshala.blogspot.com

আয়নার মধ্যে দিয়েই হাসি হাসি মুখে মোম বলল, 'এসো শুদ্ধদা, বসো।'

শুদ্ধনাথ চিন্তিত মুখে ঘরের একমাত্র চেয়ারটা টেনে বসল। রাগ কমিয়ে, মেকআপ লাগিয়ে, কস্টিউম বদলে এই মেয়েকে কি আজ আর ফ্লোরে নেওয়া যাবে? না নেওয়া গেলে বিপদ। অনেকটা সিডিউল নষ্ট হবে। সিনেমায় সিডিউল নষ্ট তাও চলে, টিভির কাজে বিরাট লোকসান।

'মাথা ধরা কমেছে?'

এই কথার জবাব না দিয়ে মোম লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল, 'তুমি নাকি বাইরে পায়চারি করছিলে শুদ্ধদা?'

শুদ্ধনাথ পরিবেশে হালকা করার জন্য হেসে হাত উলটে বলল, 'কী করব? লাল আলো জ্বালিয়ে রেখেছ।'

মোম নাক কুঁচকে, ঠোঁটের ফাঁকে হাসি রেখে বলল, 'ছি ছি, ওই আলো কি তোমার জন্য? ডিরেক্টরের আবার আলো অন্ধকার কী? বুলু হতচ্ছাড়াটাকে বললাম, বাইরে দাঁড়া। শুদ্ধদা এলে ঢুকিয়ে নিবি।'

বুলু মিনমিন করে বলল, 'আমি তো দাঁড়িয়েইছিলাম। কয়েক মিনিটের জন্য...।'

শুদ্ধনাথ হাতের ইশারায় বুলুকে থামাল।

'ও কিছু না, মাথা ধরার ট্যাবলেট খেয়েছ? পাঠিয়ে দেব?'

মোম রিভলভিং চেয়ার ঘুরিয়ে সামান্য পাশ ফিরল। ডান দিকের কাঁধ থেকে তোয়ালে পড়ল হাতের ওপর। শরীরের একপাশ উন্মুক্ত হয়ে গেল তার। বাদামি রঙের একটা জামা পরে আছে। তার আয়তন এতই সামান্য যে একে জামা বলতে অসুবিধে হয়। অন্তর্বাস বলাই সমীচীন। মসৃণ, মাখন-রঙা কাঁধ ও হাতের ওপর অতি সামান্য একটা স্ট্র্যাপ কোনোরকমে সেই জামাকে মোমের গায়ের সঙ্গে ধরে আছে। একটু জোরে হাওয়া দিলেই উড়ে যাবে। তোয়ালেটা বুকের ওপর তুলতে তুলতে মোম হাসল।

'মাথা ধরলে আমি আজকাল ট্যাবলেট খাই না শুদ্ধদা। জোকস পড়ি।'

'জোকস পড়!'

মোম হাসতে হাসতেই বলল, 'হ্যাঁ, একে বলে লাফিং ট্রিটমেন্ট। এখনও পড়ছিলাম। এই দ্যাখো না।'

আয়নার নীচে রং, পাউডার, চিরুনি, তুলো, টিস্যু পেপারের মতো হাজার সাজগোজের পাশে রাখা একটা বই তুলে দেখাল মোম। পেপারব্যাক।

'একটা শুনবে? শোন না, তোমারও মাথা ধরা-টরা সব সেরে যাবে

boierpathshala.blogspot.com

শুদ্ধদা।'

এরকম একটা সিরিয়াস সময় এই ধরনের রসিকতার কী জবাব হওয়া উচিত শুদ্ধনাথের ভালো জানা নেই এমন নয়। ভালো করেই জানা আছে। শান্ত গলায় বলতে হয়, 'তোমাকে একটা বলতে এলাম মোম। তোমার কাজ যতটা হয়ে গেছে সেই পর্যন্তই থাক, আমরা তোমাকে বাদ দিচ্ছি। এই ধরনের মেগায় অনেক ক্যারেক্টরই হঠাৎ ভ্যানিশ হয়ে যায়। যাকে বলে নিখোঁজ। ওতে খুব একটা অসুবিধে হবে না। তোমার বেলায় ভাবছি, নিখোঁজ-টিখোজ নয়, একেবারে মেরেই দেব। যাবে যখন পাবলিকের সিমপ্যাথি নিয়ে যাওয়াটাই ভালো। এখন রোড অ্যাক্সিডেন্ট না অসুখ-বিসুখ কোনটা তোমার পছন্দ সেটা জানতেই এলাম। যতই হোক এতদিন একসঙ্গে কাজ করেছ, ইউ মাস্ট হ্যাভ আ চয়েস।'

কিন্তু এক্ষেত্রে এরকম জবাব দেওয়া যাবে না। ঝরনাকে মারলে গোটা সিরিয়ালটাই শেষ।

শুদ্ধনাথ হেসে বলল, 'আমার মাথা ধরেনি।'

'ধরেনি তো কী হয়েছে, ধরতে তো পারে। অ্যাই বুলু, হাঁ করে কী দেখছিস? গলার বেসটা তোল।'

কথা শেষ করে মোম এবার চেয়ারে মাথা এলিয়ে দিল। ম্যাজেন্টা তোয়ালে পুরোটাই এবার নেমে এল তার কোলের ওপর। এখন আর শুধু কাঁধ নয়, বুক, পেটের অনেকটাই ভেসে উঠল। মনে মনে তারিফ করল শুদ্ধনাথ। মেয়েটা ফিগার রেখেছে বটে। বুকে, পেটে কোথাও একটু বাড়তি নেই। টিভির কল্যাণে হিন্দি আর ইংরেজি সিনেমা, সোপ দেখে দেখে বাঙালির রুচি পালটে গেছে। আদ্দিকালের ঢলঢলে চেহারা এখন চলে না। শরীরে একটা টাইট ভাব চাই। আজকাল এই লাইনের মেয়েরা প্রায় সকলেই সেই চেষ্টা করছে, বেশিরভাগই পারছে না। যে সামান্য কয়েকজন পারছে তার মধ্যে মোম অবশ্যই একজন।

মোমের সিকি খোলা শরীর দেখে শুদ্ধনাথ আরও একবার নিশ্চিত হল। না, সে ভুল সিদ্ধান্ত নেয়নি। দু-একটা একটা ছোটোখাটো ঘটনায় এই মেয়েকে ছাড়া যাবে না।

শুদ্ধনাথ একটু হেসে চেয়ারে হেলান দিল। বলল, 'ঠিক আছে বল মোম, শুনি তোমার জোকস কেমন। মাথা ব্যথা সারে কিনা।'

হাতের স্ক্রিপ্টের বান্ডিল কোলের ওপর গুছিয়ে নিয়ে ব্যস্ত পরিচালক নায়িকার মুখে জোকস শোনার জন্য তৈরি হল। বুলু এক খাবলা তুলো হাতে

boierpathshala.blogspot.com

দাঁড়াল তার 'দিদি'র পিছনে। ঘষতে লাগল মোমের গলায়। মোম পেপারব্যাক তুলে পড়তে শুরু করল। তার বলার কায়দা ভালো। বেশ একটা গল্পের ঢং আছে।

'মুকুল আর শ্বেতা বসে আছে কফি পার্লারে। মগে চুমুক দিয়ে মুকুল বলল, আচ্ছা শ্বেতা, গতকাল রাতে তোমাকে যখন টেলিফোনে বললাম, আমি তোমাকে বিয়ে করব, তুমি কি রাজি? উত্তরে তুমি কী বলেছিলে মনে আছে? আমি একদম ভুলে মেরে দিয়েছি। আজ ঘুম ভাঙার পর সারাদিন ভাবলাম, কিছুতেই মনে পড়ল না। কিছুতেই না। ইস কী যে খারাপ লাগছে। এত ইমপর্টান্ট একটা বিষয়।'

পড়া থামিয়ে মোম পরিচালকের দিকে তাকাল। চোখে দুষ্টুমি ধরনের একটা ভাব এনে বলল, 'শ্বেতা তখন কী করল জানো শুদ্ধদা?'

শুদ্ধনাথ অবাক হওয়ার ভান করল। কাঁধের স্ট্র্যাপ্ সামান্য নামিয়ে বুলু তার 'দিদি'র বুকের কাছ পর্যন্ত তুলো নিয়ে চলে গেল। এটা কি ইচ্ছাকৃত? মোমের ইঙ্গিত আছে? শরীর দেখানোর ইঙ্গিত। হতে পারে। মোম ভালো করেই তার ডিমান্ডের কথা জানে। জানে পরিচালকরা কেন তার কাছে এসে বসে থাকে। কেন হঠাৎ 'মাথা ধরেছে' বলে ফ্লোর ছেড়ে চলে এলে গোটা ইউনিট নার্ভাস হয়ে যায়। শরীর দেখিয়ে সেই নার্ভাস ভাবটাই হয়তো বাড়িয়ে দিতে চায়। হয়তো বলতে চায়—

'দ্যাখো হে, এমনটা তুমি কোথায় পাবে? আমি নেই তো। তোমার দর্শকরাও নেই। বুঝলে চাঁদু।'

শুদ্ধনাথ মিথ্যে আগ্রহ দেখিয়ে বলল, 'কী বলল।'

মোম বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে ছেলেমানুষির ঢঙে বলল, 'শ্বেতা তখন অ্যাত্তবড়ো জিভ বের করে মুকুলকে বলল, এই রে আমিও যে গুলিয়ে ফেললাম! কী হবে এখন? কাল তোমার পর পরই শতদ্রু ফোন করল। ওরও একই প্রশ্ন। আমাকে বিয়ে করতে চায়, আমি রাজি কিনা? মনে আছে, আমি তোমাদের দুজনের একজনকে হ্যাঁ বলেছি, আর একজন বললাম, না। কিন্তু কাকে কোন্‌টা বলেছি এখন আর মনে করতে পারছি না। কী হবে?'

গল্প শেষ করে বুলুর হাত সরিয়ে খিলখিল করে হাসতে শুরু করল মোম। প্রতিটা হাসির দমকের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে তার বুক কাঁপতে লাগল। ট্রেন্ড অনুযায়ী বুকের আয়তনও রক্ষা করে চলেছে মেয়েটা। বেশি হতে দেয়নি কিছুতেই। শুদ্ধনাথ বুঝতে পারল, সেদিন আর খুব দূরে নেই, যখন মোম হাসলে

boierpathshala.blogspot.com

পরিচালক, প্রযোজকদেরও হাসতে হবে। হাসি পেলে কম হাসতে হবে, না পেলে হাসতে হবে দ্বিগুণ জোরে।

শুদ্ধনাথ কিন্তু না হেসেই একটা চাল চালল।

'বাঃ এই জোকসটা আমাদের সিরিয়ালে রাখলে তো বেশ হয় মোম। নিছক হাসি ছাড়াও এটার মধ্যে একটা অন্য জিনিস আছে, একটা সোশাল আসপেক্ট। এইসময়ে ইয়ং জেনারেশনের সম্পর্কে একটা চেহারা পাওয়া যায়। এই ধর তুমি কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে...।'

মোম শুদ্ধনাথের দিকে টানা চোখে তাকিয়ে বলল, 'আমি!'

শুদ্ধনাথ চোখমুখ উজ্জ্বল করার চেষ্টা করে। বলে, 'হ্যাঁ, তুমি। মেগাতে তোমার মুখেই তো শুধু দারুণ দারুণ ডায়লগ দিচ্ছি। এটাও দেব।'

মোম আবার ঘাড় এলিয়ে চোখ বুজল। বুলুকে ইশারা করে বাঁ হাত মেলে ধরে গম্ভীর গলায় বলল, 'শুদ্ধদা, ঝরনার মতো জীবনের কাজ আমি আর করব না। তুমি অন্য কাউকে পছন্দ করে নাও।'

বুলু এখন তার 'দিদি'র লম্বা করে রাখা হাত নিয়ে পড়েছে। আয়নায় সেই নগ্ন হাতের ছায়া। যেন সেই ছায়াও হাত বাড়িয়েছে এই রূপবতীর দিকে!

শুদ্ধনাথ জানত এ-কথা শুনতে হবে। মনে মনে তৈরি-ই ছিল। হেসে উড়িয়ে দেওয়ার কায়দায় বলল, 'দুর, কী যা-তা বলছ? তোমার হিট জানো মোম? গত দু-সপ্তাহে টি আর পি সাঁই সাঁই করে উঠে গেছে। পর্দায় তোমার মুখ দেখার জন্য ভিউয়াররা পাগল।'

'আর তুমি পাগল, সেই মুখে চড় মারতে।'

'চড়!'

মোম এলিয়ে থাকা অবস্থাতেই মুখ ফিরিয়ে বলল, 'বাঃ, একটু আগে শট নিতে যাচ্ছিলে, এখন ভুলে গেলে? বিদিশা আমাকে চড় মারতে যাচ্ছিল না?'

বুঝেও মুহূর্তখানেক না ঝোঝার ভান করে ভুরু কুঁচকে থাকল শুদ্ধনাথ। তারপর হো হো করে বানানো হাসি হেসে বলল, 'বিদিশা, মানে গল্পের ঊর্মিলার কথা বলছ? হ্যাঁ, যাচ্ছিলই তো, তাতে কী হয়েছে? এটা স্টোরি লাইনের একটা ইমপর্টান্ট ট্রানজিশন। ঝরনার কঠিন পথে চলার শুরু।'

'কীসের শুরু আমার জানার দরকার নেই শুদ্ধদা, আমার শেষ এটুকু আমি বলে দিলাম।'

শুদ্ধনাথ সোজা হয়েই বসেছিলেন। এবার যেন আরও একটু সোজা হলেন। বললেন, 'কী ছেলেমানুষি করছ? নাউ ইউ আর আ বিগ শট। ইউ শুড

boierpathshala.blogspot.com

বিহেভ লাইক দ্যাট। সমস্যাটা কোথায়?'

'সমস্যাটা কোথায় তুমি বুঝতে পারছো না?'

মোম হাত বদল করল। বুলু ঘুরে চলে এসেছে ওপাশে। টিস্যু পেপারে জল নিয়ে মুছিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছে, হাতের আঙুল, পাতা, কনুই। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মেকআপ তোলায় এত ঘটা ছিল না মোমের। এখন হয়েছে।

বুলুর প্রশ্নে শুদ্ধনাথ খানিকটা অবাকই হল। এটা সত্যিই যে শুদ্ধনাথ জানে, আবার জানেও না। চড় নিয়ে কিছু একটা সমস্যা। কিন্তু কেন সমস্যা বুঝতে পারছে না। গল্পে তো এরকম থাকেই। যে ঝরনাকে নিয়ে বন্ধুরা এতগুলো এপিসোডে মাতামাতি করেছে, তাদের একজনই এবার চড় মারছে—দর্শকদের মধ্যে দুর্দান্ত ইমপ্যাক্ট তৈরি হবে। ঠিক হয়েছে, চড়ের কারণ চট করে বলা হবে না। কম করে তিন দিন টানা হবে।

হাত টেনে নিয়ে মোম সোজা হয়ে বসল। বুকের তোয়ালে তুলে মুখ মুছল। আয়নার দিকে ফিরে ঝুঁকে পড়ে কপালে, গালে, ঠোঁটে হাত চেপে চেপে দেখল। ঝুঁকে পড়ার কারণে তার 'অতি সামান্য' টপ পিঠের অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। জিনসের কোমরও নেমেছে। গাঢ় বেগুনি রঙের প্যান্টির বেশ খানিকটা উঁকি দিচ্ছে ভেতর থেকে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্যান্টি দেখানোটা একটা ফ্যাশন ছিল। এখন সাধারণ ব্যাপার। কেউ তাকিয়ে দেখে কিনা সন্দেহ।

শুদ্ধনাথ দেখল। অন্য কোনো কারণে নয়, দেখল মেয়েটা শরীরের নীচের অংশটা ধরে রাখতে পারছে কিনা সেটা জানার জন্য। পোশাকে ঢেকেঢুকে থাকলে অনেক সময় বোঝা যায় না। ক্যামেরা কিন্তু পোশাক টপকে ভুল ত্রুটি ধরে ফেলে। শট নেওয়ার সময় মনিটরে দেখা যায়, ভারী লাগছে। আগে থেকে জানলে অ্যাঙ্গেল বদলে সতর্ক হওয়া যায়। ভালো কাজের অনেক হ্যাপা। তবে এই মেয়ে ধরে রাখতে পেরেছে। সামনের মতো এর পিছনও মেদহীন।

মোম এবার স্পষ্ট গলায় বলল, 'বিদিশার চড়ের সিকোয়েন্সের কারণেই আমি কাজটা করব না।'

'সে কী! এতে তো ঝরনারই লাভ। শি উইল গেট দ্য সিমপ্যাথি। দর্শকরা তোমার দিকেই যাবে। চমৎকার একটা মেয়ে চড় খেলে দর্শকরা রেগে যাবে, দুঃখ পাবে। এই রাগ, দুঃখটাই আমি চাইছি।'

মোম চ্যাটার্জি এবার পুরো ঘুরে বসল। শুদ্ধনাথের মুখোমুখি।

'আমি চাইছি না শুদ্ধদা। আমার সন্দেহ হচ্ছে, এটা একটা কনসপিরেসি, চক্রান্ত।'

boierpathshala.blogspot.com

'কনসপিরেসি! কনসপিরেসি কীসের?'

শুদ্ধনাথ এবার সত্যি সত্যি ঘাবড়াল। নায়িকার এই কথার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। মোম কঠিন গলায় বলল, 'তুমি জানো না, ক-দিন আগে বিদিশা আড়ালে কী বলেছে?'

'কী বলেছে?'

'আমার ধারণা কথাটা তুমি জানো শুদ্ধদা, জেনেও না জানার ভান করছো। তবু বলছি, ও ইউনিটের কয়েকজনকে আমাকে টার্গেট করে বলেছে, ওই দেমাকি মাগিকে ঠাঁটিয়ে একটা চড় মারা উচিত। চান্সের জন্য নাকি সে অপেক্ষা করছে। সবার সামনেই মারবে। দু-দিনের মধ্যে সে চান্স পেয়ে গেল। আমাকে চড় মারার চান্স। কী করে পেল? নিশ্চয় স্ক্রিপ্টের মধ্যে সে ম্যানুপুলেট করেছে। আমি কাল পর্যন্ত জানতাম না। আজ ফ্লোরে গিয়ে শুনছি। কনসপিরেসি ছাড়া এটা কী করে সম্ভব? আপনি-ই বলুন সম্ভব এটা?'

আর্টিস্টদের মধ্যে ঝগড়া, রেষারেষি, হিংসে সারাক্ষণই দেখতে হয়, কিন্তু এরকম উদ্ভট কথা শুদ্ধনাথ কখনও শোনেনি। হাসতে গিয়েও নিজেকে সামলাল। বলল, 'কী ছেলেমানুষের মতো কথা বলছ? কে চক্রান্ত করবে?'

মোম ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'কেন তোমার স্ক্রিপ্ট রাইটার। মহীতোষ না অহিতোষ কী যেন নাম সান্ অব্ আ বিচটার? ওর সঙ্গে বিদিশার লটর-ঘটরের কথা সবাই জানে। সেভেরাল টাইম শি স্লেপ্ট উইথ দ্য বাস্টারড। গত বছর না আগের বছর কোন একটা শুটিং-এর সময় ধরাও পড়েছিল দুজনে। কী রে বুলু মনে আছে?'

কথা থামিয়ে পিছনে দাঁড়ানো বুলুর দিকে মাথা ঘোরাল মোম। বুলু নির্বিকার মুখে বলল, 'অক্টোবরে দিদি। দুজনেই ন্যাকেড ছিল। হারামজাদাটা ওই মাগির ঘাড়ের ওপর উঠে বসেছিল।'

শুদ্ধনাথ তাড়াতাড়ি হাত তুলে বলল, 'থামো, থামো, শান্ত হও মোম। ডোন্ট বি সো এক্সাইটেড। পারসোনাল বিষয়ে এভাবে কথা বলাটা ঠিক না।'

'জামাকাপড় খুলে জড়াজড়িটা পারসোনাল, আর আমার গালটা পারসোনাল নয়? আমি লিখে দিতে পারি, ওই ছেলেকে বিদিশা হাত করেছে। তুমি যখন বলছ জানো না, আমি মেনে নিচ্ছি, কিন্তু প্লিজ ওদের গার্ড করবে না।'

এক নিশ্বাসে কথা শেষ করে মোম চ্যাটার্জি হাঁপাতে লাগল। হাসির মতো হাঁপানোর সময়েও সে নিঁখুতভাবে বুকে ছন্দ তোলে। তাল কাটে না।

'শান্ত হও, শান্ত হও মোম। বি কোয়াইট। স্ক্রিপ্টের এই অংশটা একেবারে

boierpathshala.blogspot.com

আমার বানানো। ইন ফ্যাক্ট আজ স্টুডিয়োতে আসতে আসতে আমি ভেবেছি। তুমি নিশ্চয় মনে করবে না, আমি কোনো কনসপিরেসিতে আছি?'

মোম ভুরু কুঁচকে তাকাল। তার গলায় চাপা সন্দেহ।

'কেন বানিয়েছো?'

'ঝরনা এবার রুক্ষপথে ছুটবে। দর্শকরা তোমার চরিত্রের কোমল অংশটা এতদিন দেখেছে এবার টাফ পার্টটা দেখতে চাইছে।'

'টাফের জন্য আর কিছু ছিল না?'

শুদ্ধনাথ মুচকি হেসে বলল, 'ছিল হয়তো, আমার মাথায় এটাই এসেছে। আজকাল সিরিয়ালে হিরোইনের গালে চড়টা খুব ভালো যাচ্ছে। হিন্দিতে দ্যাখো না?

অভিমানাহত গলায় মোম বলল, 'ভিলেন না হিরোইন আমার জানার দরকার নেই। ওই মেয়ের হাতে চড় খেতে আমি রাজি নই। এই জন্যই মা বলে সব স্ক্রিপ্ট আগে আমাকে দেখাতে বলবি।'

মায়ের কথা শুনে শুদ্ধনাথ আবার ঘাবড়াল। মোম চ্যাটার্জির মা মহিলাটি যে কী ভয়ংকর ইন্ডাস্ট্রির সবাই জানে।

'আরে বাবা, বিদিশা চড় কি তোমাকে সত্যি সত্যি মারছে? তুমি এমন একটা কথা বলছ যেন আজই প্রথম কাজে এলে।'

'দর্শকরা তো সেটা বুঝবে না। দেখবে আমি চড় খেয়ে...। চড়টা বাদ দাও শুদ্ধদা।'

মোমের গলা অনেকটা নরম। শুদ্ধনাথ নিশ্চিন্ত হল। এটাই নিয়ম। আর্টিস্টদের রাগ হল ইঞ্জিনের স্টিমের মতো। বেরিয়ে গেলেই ঠান্ডা। এই আর্টিস্ট একটু বেশি মাত্রায় ঠেঁটা—সমস্যাটা এটুকুই।

শুদ্ধনাথ একটু ভাবল। উঠে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে বলল, 'চড় বাদ দেওয়া যাবে না মোম, তবে মানুষ বাদ দেওয়া যাবে। বিদিশার বদলে রূপা যদি তোমায় চড়টা মারে কোনো অসুবিধে আছে?'

মোম ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'রূপা খুব মিষ্টি মেয়ে। ও চড় মারলে শটের পর আমি ফ্লোরেই বিদিশাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওকে একটা চুমু খাব।'

শুদ্ধনাথ দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'মেকআপ আর কস্টিউম খুব চটপট করে ফেল। অলরেডি উই আর লেট।'

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে শুদ্ধনাথ সিদ্ধান্ত নিল, ইলেট্রিশিয়ানকে আগে খবর দেবে। মেকআপ রুমের লাল আলোটার কাঁপা বন্ধ হওয়া দরকার।

boierpathshala.blogspot.com

পোশাক বদলের মাঝখানেই বুলুর হাতে মোবাইল বেজে উঠল।

'ধরবে?'

ব্রায়ের ক্লিপ আটকাতে আটকাতে মোম বলল, 'না। বলে দে শট দিচ্ছি।'

বুলু কানে ফোনটা তুলতে তুলতেই কী মনে হল মোমের। হাত বাড়িয়ে বলল, 'আচ্ছা, আমায় দে।' স্ক্রিনের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে দেখল নম্বর অচেনা।

'কে বলছেন?'

ওপাশ থেকে পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল, 'হ্যালো মোম? মোম বলছ?'

মোম বিরক্ত গলায় প্রায় ধমক লাগাল, 'বলছি, আপনি কে?'

'মোম, আমি সোমনাথ, সোমনাথদা, চিনতে পারছ?'

সোমনাথ! থমকে দাঁড়াল মোম। নিজের অজান্তেই গাঢ় গলায় বলল, 'কোন সোমনাথ?'

ওপাশের পুরুষকণ্ঠ উৎসাহী গলায় বলল, 'আগরপাড়ার সোমনাথ, খুকুর দাদা... মনে পড়েছে?'

চমকে উঠল মোম। সোমনাথ! সোমনাথদা! এতদিন পর! বুকের ভেতরটা শিরশির করে উঠল। দ্রুত সেই শিরশিরানি সামলে ঠান্ডা গলায় মোম বলল, 'না, মনে পড়ছে না।'

boierpathshala.blogspot.com

ষোলো

আজ 'চিত্তশুদ্ধি' কর্মসূচিতে রয়েছে মনীষীদের জীবনী পাঠ।

বাইরের কেউ নয়, পড়বার দায়িত্ব পেয়েছে গাব্বু। গাব্বু মানা সরকারের পছন্দের ছেলে। গলা ভালো। মিছিলের সময় স্লোগানে লিড দেয়। শুধু মিছিল, স্লোগান নয়, এই ছেলে অ্যাকশনেও পটু। ওয়ান শটার, গাদা, ছররা সবই চালাতে পারে। যদিও এগুলো আজকাল খুব একটা লাগে না। আপাতত এলাকা মোটের ওপর শান্তই। কেউ ট্যাঁ-ফোঁ করলে ধমক, হুমকি, খুব বেশি হলে নিরামিষভাবে একটা-আধটা লাঠির ঘায়েই কাজ চলে যায়। তবে এখন গাব্বুকে দেখলে কে তার এসব গুণপনা বুঝবে? 'দাদা'র দেওয়া নতুন দায়িত্বে সে যেমন আহ্লাদিত, তেমন নার্ভাস। যতই হোক লেখাপড়ার ব্যাপার। কাচা পায়জামা, পাঞ্জাবি পরেছে। দাড়ি কামিয়ে, স্নান সেরেছে একেবারে কাকভোরে। চোখমুখে একটা 'ভক্তি ভক্তি' ভাব।

'শ' এবং 'স' নিয়ে কিছু অসুবিধে থাকলেও গাব্বু পড়ছে খারাপ না। বেশ গড়গড়িয়েই যাচ্ছে। হোঁচট খেল শেষের মুখে।

'...ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাশগসর মহাসয় বারে বারে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে শোচ্চার হইয়াছিলেন। শেকালে আমাদের শমাজে নারী নির্যাতনের শীমা ছিল না। কুলীন ব্রাক্ষ্মণেরা হিন্দু শাস্ত্র অনুশারে অনেকগুলি বিবাহ করিতে পারিতেন। পিতা-মাতারা কুলীন পাত্রের শঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিয়া কুলধর্ম বজায় রাখিতেন। এক একজন বৃদ্ধের সঙ্গে কত যে মেয়ের বিবাহ হইত তাহার হিশাব নাই। মেয়েরা বিবাহের পর নিজ নিজ পিতৃলয়েই থাকিয়া যাইত। স্বামী ঘরে নিত না। কালেভদ্রে অতিথির মতো উপস্থিত হইয়া সেবা লইত। বহু বিবাহের এই কদর্য

boierpathshala.blogspot.com

রীতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাশাগর মহাশয় ঘৃণা করিতেন। অনেক মেয়ের আট নয় বৎসর বয়েসের মধ্যেই বিবাহ হইয়া যাইত। কিছুদিনের মধ্যে বৃদ্ধ স্বামী মারা যাইলে বাকি জীবন কঠিন বৈ... বৈ... বৈ...।'

মানা সরকার ভুরু কোঁচকালেন।

'কী হল আটকে গেলি কেন? বেশ তো চলছিলি।'

গাব্বু আমতা আমতা করে মাথা চুলকে বলল, 'না দাদা, আটকায়নি এই জায়গাটা ঠিক বলতে পারছি না।'

মানা হাত বাড়িয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, 'দেখি দে, বইটা দে।'

হাত বাড়িয়ে 'মনীষী জীবনকথা' টেনে নিয়ে মাদুরের ওপর পেতে ধরলেন মানা সরকার।

'ওফ, এ তো বৈধব্য। বৈধব্য পড়তে পারছ না গর্দভ? ছি ছি। দেখ কী লেখা আছে, লেখা আছে, বৃদ্ধ স্বামী মারা যাইলে বাকি জীবন কঠিন বৈধব্যের নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে হইত। নে বাকিটুক পড়ে ফেল। এইজন্যই বলি লেখাপড়া তো কিছু করবি না, শুধু ঝাণ্ডা, ডাণ্ডা নিয়ে কী আর চলে? নে নে পড়।'

গাব্বু ফের শুরু করতে গেল। ঘরে ঢুকল খগেন। একে টপকে, ওকে সরিয়ে সোজা চলে এল মানা সরকারের ঘাড়ের কাছে। অন্য কেউ হলে পারত না। চিত্তশুদ্ধির সময় কারও ঘরে ঢোকার পারমিশন নেই। খগেনকে শুধু দায়িত্ব দেওয়া আছে। সে বাইরে থাকবে, কেউ এলে 'দাদা'কে এসে খবর দেবে। আগে এটুকু নিয়মও ছিল না। ইলেকশনের টিকিট নিয়ে ভিড় শুরু হওয়ার পর থেকে হয়েছে। টোপ ফেলা শুরু হয়েছে। বলা যায় না, কখন রুই কাতলা এসে ধরা দেবে। খেয়াল রাখতে তো হবে।

খগেন মুখ নীচু করে মানা সরকারের কানে কানে কিছু বলল। মানা মুখ তুলে বিরক্ত গলায় বললেন, 'কে? কে এসেছে বললি?'

'কাদু।'

'কাদু! সেটা আবার কে?'

'ঝিলডাঙার কাদু।'

থমকালেন মানা। এই লোককে এখনও খবর দেননি তিনি। তবে দেবেন বলে ঠিক করেছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই ডেকে নেড়েচেড়ে দেখবেন। তার আগেই চলে এল! নিশ্চয় খবর পেয়েছে। মানা সরকার ঠোঁটের ফাঁকে মুচকি হাসলেন। যদিও সেই হাসি অন্য কেউ দেখতে পেল না। নেতা মানুষদের এই

boierpathshala.blogspot.com

এক মজা। তাদের হাসি, কান্না চট করে কেউ দেখতে পায় না।

মানা খুশি হলেন। নিজে চলে আসা লক্ষণ হিসেবে ভালো। ডেকে এনে ভোটে দাঁড়ানোর কথা বললে অনেক সময় ভাও বেড়ে যায়। নিজে এলে উলটোটা। টাকা পয়সার জন্য চাপ বেশি দেওয়া যায়। তবে এই লোকের কাছে চট করে মুখ খোলা যাবে না। আগে ভালো করে খেলিয়ে দেখতে হবে। ঝিলডাঙার কাদু সম্পর্কে এখন পর্যন্ত যা রিপোর্ট পাওয়া গেছে তাতে এই লোক সাধারণ বদ নয়, বাড়াবাড়ি রকমের বদ। বাড়াবাড়ি রকমের বদদের নিয়ে কাজ করতে মজা। কাঁচা পয়সার বদ হলে সেই মজা ডবল।

ঠোঁটের লুকোনো হাসি মুছে মানাবাবু বললেন, 'অপেক্ষা করতে বল।'

খগেন ঘাড় নেড়ে চলে যেতে গেলে মানা তাকে আবার কাছে ডাকলেন। নীচু গলায় বললেন, 'সঙ্গে কেউ আছে?'

'না, একা এসেছে। মোটরবাইকে।'

'বারান্দায় একটা চেয়ার পেতে দে।'

'আচ্ছা। চা দেব?'

'না, তার দরকার নেই, শুধু বসতে দিলেই হবে।'

খগেন চলে যেতে মানা বুকের দু-পাশে তৃপ্তির হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'নে গাব্বু, শুরু কর। বড়ো মানুষদের কথার মাঝখানে বাধা ভালো লাগে না।'

তৃপ্ত কাদুও। তাকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। ইচ্ছে করলে ঘুরিয়ে দিতে পারত। সে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসেনি। তা ছাড়া না ঘোরালে নেতা হওয়া যায় না। যে-নেতা যত বেশি হারামজাদা সে তত বেশি ঘোরাবে। কখনও নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে, কখনও কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরাবে। মানা সরকারের সঙ্গে তার একেবারেই পরিচয় নেই এমন নয়। তবে সেটা কয়েক বছর আগের ঘটনা। মনে রাখার মতো কিছু নয়। তার ওপর আবার ভিড়ের মধ্যে দেখা। ওই লোক ঝিলডাঙাতেও গেছে। কালেভদ্রে গেছে। ভোট-টোটের সময়। কাদু তখন নিজেকে সরিয়ে রাখত। পার্টি পলিটিক্স থেকে যত দূরে থাকা যায় তত মঙ্গল। যাকে যখন দরকার তার কাছে যাওয়া যায়। এই এখন যেমন আসা গেছে। বড়ো কাজে পার্টি পলিটিক্স লাগে। সে বড়ো কাজ করতে চায়।

খগেন বলল, 'আপনি ভেতরে এসে বসুন।'

কাদু লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল, 'না না তার দরকার নেই। মানাবাবু বুঝি মিটিং করছেন?'

boierpathshala.blogspot.com

'মিটিং নয়, চিত্তশুদ্ধির প্রোগাম চলছে।'

কাদু একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। বলে, 'কী শুদ্ধি!'

'চিত্তশুদ্ধি। পার্টি প্রোগ্রাম।'

কথাটা বলে খগেন হাসে। অন্য লোক হলে বলত না, এই লোককে বলা যায়। 'দাদা' চেয়ার দিয়ে বসাতে বলেছে মানে এই লোক আর পাঁচজনের মতো নয়। গুরুত্ব আছে। রাজনীতিতে গুরুত্ব লোক বুঝে হয় না, সময় বুঝে হয়। কাল যে ফালতু ছিল, আজ সে-ই হয়তো সব থেকে ইমপর্টান্ট। এইজন্যই গান লেখা হয়েছে—কাল যে রাজা আজ সে ফকির। আচ্ছা আজ যে ফকির কাল সে রাজা বলে কোনো গান আছে?

কাদু হাতের মিষ্টির বাক্সটা বাইকের সিটে রাখল। সন্দেশ এনেছে। যদিও সে ভালো করেই জানে নেতা মানুষরা সাধারণত মিষ্টি পছন্দ করে না। তারা পছন্দ করে টক বা ঝাল। মানা সরকার সম্পর্কে তার যেটুকু জানা আছে, তাতে এই লোক আবার টক ঝাল দুটোই পছন্দ করে।

সেই ব্যবস্থা হয়েছে। টক ঝাল দুটোই থাকবে। বড়ো কাজের জন্য বড়ো ব্যবস্থা।

'প্রোগ্রাম শেষ হতে অনেকক্ষণ লাগবে ভাই? ঘণ্টাখানেক?' কাদু বিনয়ী গলায় জানতে চাইল।

খগেন বলল, 'ঘণ্টাখানেক না ঘণ্টাদুয়েক বলতে পারব না। আপনি ভেতরে আসতে পারেন।'

'কোনও অসুবিধে নেই। আমি এখানেই রইলাম। ছায়া-টায়া আছে। আমার তো মিনিট পাঁচেকের কথা।'

খগেন চলে যেতে যেতে বলল, 'দাদার কিন্তু জেলায় মিটিং আছে। বেশিক্ষণ আটকাবেন না। অপেক্ষা করুন। খবর দেব।'

কাদু ঘণ্টাখানেকের জন্য মনে মনে তৈরি হল। ডাক পড়ল কুড়ি পঁচিশ মিনিটের মাথায়। বাক্স হাতে নিয়ে ছুটল।

খগেনকে ইশারায় দরজা বন্ধ করতে বলে মানা সরকার বললেন, 'বোসো কাদু, আছ কেমন?'

লোকটা কি তাকে চিনতে পেরেছে? কাদু মোড়া টেনে বসতে বসতে অবাক হল। কী করে চিনতে পারবে? ফল্‌স দিচ্ছে না তো? হতে পারে। এরা ফল্‌স দিতে পছন্দ করে। 'দাদা, আমায় কি আপনার মনে আচে? সেই যে ঝিলডাঙায় আপনি গিয়েচিলেন। তাও বছর তিন হয়ে গেল।'

boierpathshala.blogspot.com

মানা সরকার মুচকি হেসে বললেন, 'মানুষ কি শুধু আগে দেখা থাকলেই চেনা যায়? অ-দেখা লোক কত সময় চেনা ঠেকে, আবার বহুদিনের চেনা লোকও দুম করে অচেনা হয়ে যায়। ঠিক লোককে চিনতে অসুবিধে হলে আমাদের চলবে কেন কাদু? আমাদের মানুষ নিয়ে চলতে হয় না?'

কাদু মনে মনে বলল, শালা হারামির বাচ্চা। জ্ঞান ফোটায়। চিনতে পেরেছে না কচু। হাবিজাবি বলে ঘাবড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। মুখে হেঁ হেঁ ধরনের ভঙ্গি করে বলল, 'সে তো বটেই দাদা। আপনারা মানুষ নিয়ে চলবেন না তো কে চলবে? দাদা, ওই বুদ্ধিশুদ্ধি ব্যাপারটা কী?'

মানা কাদুর মুখে দিকে তাকিয়ে জোরে হেসে উঠলেন।

'না না, বুদ্ধিশুদ্ধি হবে কেন? ও হল চিত্তশুদ্ধি। চিত্ত বোঝ? চিত্ত?'

কাদু গোবেচারা মুখ করে মাথা নাড়ল। হারামিটার সামনে যত বোকা সাজা যায় তত ভালো। খেলাতে সুবিধে হবে।

'চিত্ত হল তোমার মন, অন্তর। সেই অন্তরের কালি দূর করাই হল চিত্তশুদ্ধি। আমাদের পার্টির প্রোগ্রাম। চলবে কয়েকমাস। তুমিও এস কাদু। ইচ্ছে হলে চলে এস। ধর্মকথা, মনীষী জীবন পাঠ হয়।'

কাদু মাথা নামিয়ে বলল, 'ইচ্চে তো হচ্চে দাদা, কিন্তু আপনাদের পলিটিক্সের ব্যাপার, আমি আসি কী করে?'

'কী যে বল। আমি ছেলেদের বলে রেখেছি, যাতে খুশি পার্টিবাজি কর বাপু, চিত্তশুদ্ধিতে কোনো পার্টিবাজি চলবে না। এখানে সবাই সমান। এই যে এত মানুষ আজ এসেছিল, তুমি তো নিজের চোখে দেখলে, তারা কি সব আমার দলের? মোটেও নয়। নিজের টানেই এসেছিল।'

কাদু মনে মনে বলল, নিজে এসেছিল না কাকের গু এসেছিল। শালা, তোমার ভয়ে সুড়সুড় করে এসেছিল। আমি যেমন এসেছি। তবে ভয়ে আসিনি, এসেছি তোমাকে গাঁথতে। টোপ মেরে বড়শিতে গাঁথতে।

'সে তো আসবেই দাদা। আপনার টানে আসবে না তো কার টানে আসবে? আমিও তো ঝিলডাঙা থেকে চুটে এলাম।'

মানা মিথ্যে করে হাসলেন। এই লোক শুধু খারাপ নয়, সেয়ানাও। সাবধানে এগোতে হবে।

'এবার বল, ছুটে এলে কেন?'

'দাদা, একটা আর্জি আচে।'

কাদু বসে আছে মোড়ায়। নেতার নীচে বসা নিয়ে সে কোনো আপত্তি

boierpathshala.blogspot.com

করেনি। মানা সরকারের মাটিতে বসার ঢঙের খবর সে জেনেই এসেছে। দু-হাতে মোড়াটাকে সামান্য সামনে টেনে আনল। মানা চোখ নামালেন। আর্জি? এবার নিশ্চয় ব্যাটা ইলেকশনের কথা বলবে। বলবে, দাদা, ঝিলডাঙার টিকিটটা আমায় দিন। এই বদের সঙ্গে টাকাপয়সার কথা কি সরাসরি বলতে হবে? নাকি খেলিয়ে বলা উচিত? মনে হচ্ছে, খেলিয়ে বলা উচিত।

'আর্জি! আবার আর্জি কীসের হে?'

'দাদা, আমার ওখানে একবার যেতে হবে।'

'ওখানে মানে? ঝিলডাঙায়? কী হল আবার? ফুটবল ম্যাচ? নাকি সংবর্ধনা? বাপু হে, সংবর্ধনা-টংবর্ধনায় আমাকে ডেকো না। ফুল মালায় আজকাল বড়ো ক্লান্ত লাগে।'

কাদু মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করে উঠল। একবার চল না শালা ফুল মালা কাকে বলে দেখতে পাবি। সে বুকের কাছে হাত দুটো জড়ো করে মিনতি করার কায়দায় বলল, 'না-না ওসব কিচু নয়, অনেক দিনের ইচ্চে, দাদাকে একবার আমার অফিসটা দেখাই।'

মানা সরকার ভুরু কোঁচকাল। অফিস! এ-ছেলে আবার কীসের অফিস করল? পার্টি অফিস নাকি? কই তাকে তো এই খবর কেউ দেয়নি! বরং শুনেছিল, কাদু পলিটিক্সের ধারেকাছে নেই। কে জানে হয়তো এই দু-তিন দিনের মধ্যে খুলে বসেছে। ইলেকশনে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি। আজকাল পার্টি অফিস বানাতে সমস্যা নেই। ক-টা টেবিল চেয়ার, আর বাড়ির মাথায় পতাকা। ব্যস, তাহলেই হল। এরকম আকছার হচ্ছে।

'তুমি আবার কীসের অফিস করলে কাদু?' মানা সরকারের চোখে কৌতূহল।

কাদু লজ্জা লজ্জা গলায় বলল, 'চালকলের অফিস দাদা।'

মানা অবাক হয়ে বললেন, 'চালকল! আমি যে শুনলাম তোমার ব্যবসাপাতি হুগলি না বর্ধমানের দিকে।'

কাদু ঢোঁক গিলল। শুয়ারটা তার ব্যবসাপাতিরও খবর রাখে! ভালো, টাকার মুরোদটা জানা দরকার। সে হাত কচলে বলল, 'আপনি তো জানেন দাদা, বাপ ঠাকুরদার অন্নপূর্ণা রাইসমিলের একটা ব্রান্চ খুলেচি গাঁয়ে। ঝিলডাঙার লোকের সুবিধের জন্যই খুলেচি। বেচারিদের সদর পর্যন্ত ছুটতে হয়। নিজের গাঁয়ের মানুষজনকে দেখব না তো কাকে দেখব বলুন?'

মানা সরকার খুশি হলেন। ব্যবসা ছড়াচ্ছে মানে বদটার জোর আছে। বদ

boierpathshala.blogspot.com

মানুষের জোর থাকা ভালো জিনিস।

'তোমাদের একটা ইঁটভাটা আছে না কাদু?'

'আচে, ছোটোখাটো একটা আচে, বড়ো কিচু নয়। একটা কোল্ড ইস্টোরেজও করেছি। একটা ভিডিও হল্ দেব ভাবচি।'

'বাঃ, ভেরি গুড। এই তো চাই। এখন হল ব্যবসার যুগ। গোটা দুনিয়া ব্যবসায় মেতেছে। আর বাঙালি? বাঙালি কী করছে দ্যাখো, শুধু চাকরি চাই আর চাকরি চাই। চেয়ে চেয়ে জাতটা একেবারে চাওয়া-জাত হয়ে গেল হে। উচ্ছন্নে গেল। ছ্যা ছ্যা। এই সময় তোমরা যদি এগিয়ে না আসো তাহলে কে আসবে? সৎ, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান একটা জাতি একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে আর আমরা বসে বসে দেখব।'

নিজের প্রশংসা শুনে কাদু চকচকে দাঁত বের করে হাসল। খচ্চরটা বকে বেশি। নেতা মানুষ বকবেই। তবে ব্যাটা যে টাকা পয়সার গন্ধ পেয়েছে এটা ধরা পড়ে যাচ্ছে। এবার অন্য জিনিসের গন্ধ পাওয়াতে হবে। তাহলেই কাজ হাসিল।

'চেষ্টা করছি দাদা। আপনার আশীর্বাদ চাই। এ-তল্লাটে আপনার আশীর্বাদ চাড়া কাজ করব, এমন সাহস আমার নেই।'

মানা সরকার চুপ করে রইলেন। ছোকরা শুধু বজ্জাত নয়, ভালো খেলোয়াড়। কিন্তু ভোটে দাঁড়ানোর কথা কিছু বলছে না কেন? ধান্দা কি অন্য?

'দাদা, পায়ের ধুলো পাব তো?'

'বাপু আমায় ছেড়ে দাও। দেখতেই তো পাচ্ছ রাজনীতি নিয়ে নাজেহাল হয়ে আছি। সারাদিনই ছোটাছুটি করি। একটু ফাঁক পাই না।'

কাদু কথাটা লুফে নিল। বলল, 'জানি দাদা, দিনে আপনার অনেক কাজ। সেই সময় বিরক্ত করতে চাই না। রাতের বেলায় চলুন। এই বিকেলের পর। আমার অফিসে বসেই একটু খাওয়া-দাওয়া করবেন। রাতের খাওয়া।'

মানা সরকার ভুরু কোঁচকালেন। শয়তানটা রাতে নিয়ে যায় কেন? মতলব কী?

'আজকাল রাতে কোথাও যাই না কাদু। দিনকাল ভালো না। গাঁ-গঞ্জের লোকদেরও এখন বিশ্বাস নেই। হুট বলতে কী করে বসে। ভোট-টোট ছাড়া অচেনা পাড়ার ভেতরে ঢুকি না পারতপক্ষে।'

কথাটা বলেই মানা সরকার বুঝতে পারলেন কাজটা ঠিক হল না। বদটা তাকে ভীতু না ভেবে বসে। পরিস্থিতি সামলাতে গলা নামিয়ে বললেন, 'আসলে কী জানো বাপু, এখন গাড়ি ছাড়া তেমন নড়াচড়া করতে পারি না। বয়স

boierpathshala.blogspot.com

বাড়ছে। একটু-আধটু হল তো ঠিক আছে। তোমাদের ওখানে তো গাড়ি ঢোকে না। খালের পুল পেরোতে হয় হেঁটে। একবার যখন গিয়েছিলাম তখন বেজায় ঝামেলা হল।'

শালার শালা। কাদু আবার জলে পড়ল। মানা সরকারের জন্য যে 'টক ঝাল'-এর ব্যবস্থা সে ভেবেছে তা হল রাতের ব্যবস্থা। দিনে সে-জিনিস হবে কী করে? কিন্তু উপায় তো কিছু নেই। এই লোক যদি রাত বলে তাহলে রাত, যদি দিন বলে তাহলে দিন। সব মেনে নিতে হবে। সে খানিকটা কুঁজো হয়ে বলল, 'কোনো অসুবিধে নেই, আপনি দাদা দিনেই আসুন। সকালে আসতে বলচি না, দুপুরের দিকটায় আসুন। আমার লোক খাল পুলে গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসবে, হাঁটতে হবে না, বাইক থাকবে। আমার নতুন অফিস-বাড়ির দিকটা একেবারে ফাঁকা জায়গায়। আশপাশে কেউ থাকবে না। গাছের নীচে চেয়ার দেব। খাওয়া-দাওয়ার পর ওখানে বসেই না হয় খানিকটা বিশ্রাম নিলেন।'

মানা সরকার নড়েচড়ে বসে। ছোকরা গুছিয়েই খেলতে চায়। কিন্তু উদ্দেশ্যটা কী? এতক্ষণেও টিকিটের কথা তো নিজের মুখে কিছু বলল না! থাক, বরং আরও একটু উসকে দেওয়া যাক। তিনি হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলেন। হেসে বললেন, 'তুমি তো জানো কাদু, পার্টি পলিটিক্স যারা করে তাদের খাওয়া-দাওয়ার বদনাম আছে। আমি কিছু খাই না।'

মনে মনে ফের ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল কাদু। পার্টির লোকেরা খায় না! তাহলে খায় কে? শুধু খায় না, সেরকম সেরকম লোক ছালা বেঁধে বাড়িতেও নিয়ে যায়। মুখে বলল, 'দাদা, বেশি কিচু নয়। একেবারে সামান্য ব্যবস্থা। একটু ভাত-ডাল।'

'না, না ছেড়ে দাও।'

এবার আসল অস্ত্র বের করল খাদু। মোক্ষম টোপ। কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'আসলে কী জানেন দাদা, আপনি একটু কিছু মুখে না দিলে শান্তি বেচারি দুঃখ পাবে। অনেক আশা নিয়ে মেয়েটা রান্না করবে।'

কথা শেষ করে দম আটকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল কাদু। মাছ-ধরিয়েরা যেমনভাবে ফাতনার দিকে তাকায়। টোপ কি খাবে? হারামজাদা ইশারা কি ধরতে পারবে? নাকি পারবে না?

পারল। মানা সরকার ঠোঁট সরু করে ঠান্ডা বলল, 'শান্তি! শান্তিটা কে কাদু? তোমার বউ নাকি?'

কাদুর চোখ চকচক করে উঠল। কাজ হয়েছে। বিশ্রী দাঁতে একমুখ হেসে

boierpathshala.blogspot.com

কানে হাত ঠেকিয়ে সে বলল, 'না-না আমায় বিয়ে কে করবে? আমি দাদা একা মানুষ। মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াই। শান্তি ঝিলডাঙার মেয়ে নয়, বানেরহাটের দিকে বাড়ি। মোহনের কালেকশন। আপনার মতো অতিথি এলে ইস্পেশাল রাঁধবার জন্য ধরে আনে। রাঁধে ফাইন। সমস্যা শুধু একটাই।'

কাদু থামল। ভুরু তুলল মানা সরকার। বলল, 'আবার সমস্যা কীসের? ঝালের হাত বেশি নাকি?'

কাদু ফের দাঁত বের করল। মানা সরকারের এবার মনে হল, এই লোকের দাঁত এতক্ষণ যতটা চকচকে মনে হচ্ছিল, আসলে তার থেকেও বেশি চকচকে।

'ঠিক বলেছেন দাদা, শুধু ঝাল নয়, টক, ঝাল দুটোর হাতই বেশি। তবে মেয়ের দোষ নেই। বয়স অল্প। একটু ছলবলে। ছলবলে মেয়ের টকে ঝালে একটু গোলমাল তো হবেই।'

মানা সরকার মনে মনে কাদুর তারিফ করলেন। সাবাস। খেলুড়ে একেই বলে। শুধু সে-ই কাদুর খবর নেয়নি, কাদুও তার খবর নিয়ে এসেছে। মানা সরকার যে শুধু জিভের স্বাদে খুশি হয় না, অন্য স্বাদও লাগে সে-কথা জেনেই ঘরে ঢুকেছে। এ ধরনের ছেলেপিলেই ঠিকমতো গড়েপিটে নিতে পারলে একদিন দলের সম্পদ হয়ে ওঠে। তবে দলের সম্পদ বাড়ানোর কাজে তো এখন ব্যস্ত হলে চলবে না। ব্যস্ত হতে হবে নিজের সম্পদ নিয়ে। এই লোকের কাছে চট করে ধরা দেওয়া চলবে না। ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে হবে। মানা সরকার উঠে পড়বার জন্য তৈরি হলেন। মাদুরের ওপর ছড়ানো কাগজপত্র গোছাতে লাগলেন।

কাদু বলল, 'আর একটা মজার কথা আছে।'

'আবার কী মজা?'

কাদু নীচু গলায় বলল, 'ওই মেয়ে হল গিয়ে দাদা আপনার সাজুনি মেয়ে। শান্তির সাজগোজ দেখলে কে বলবে চাষাভুষো ঘরের মেয়েচেলে? মোহন তো ঠাট্টা করে বলে, এত ইস্টাইল তুই শিখলি কোথায় শান্তি? হা হা। ওহো মোহন কে সেটাই তো আপনাকে বলা হয়নি দাদা। মোহন আর শোল আমার দুই কর্মচারী। ঝিলডাঙা অফিসটা ওরাই দেখাশোনা করে। ছেলে খারাপ নয়। লোকে বলে পেটে বোমা মারলেও কথা বেরোয় না, আমি বলি মোহন, শোলের পেটে কামান দাগলেও কথা বেরোয় না। হা হা। এই যে আপনি যাবেন, তা কাকপক্ষীতেও টের পাবে না।'

ইশারা শেষ করে হাসতে হাসতেই সামান্য ঝুঁকে পড়ল কাদু।

মানা সরকার দু-হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন। মুচকি হেসে বললেন,

boierpathshala.blogspot.com

'সেটা ভালো। মানুষের ভিড় সবসময় সহ্য হয় না। ঠিক আছে তোমার ওই লোককে পাঠিও কাদু। তবে বেশিক্ষণ থাকব না কিন্তু। তখন বলতে পারবে না। সন্ধে সন্ধে ফিরিয়ে দিতে হবে। ইলেকশন আসছে, এক মিনিটও সময় নষ্ট করার উপায় নেই বাপু।'

কাদু উঠে দাঁড়িয়ে গদগদ গলায় বলল, 'না-না দাদা আপনাকে আটকাব না। খেয়ে-দেয়ে একটু রেস্ট নিয়েই চলে আসবেন।'

'আবার রেস্ট কীসের?'

মানা সরকার আপত্তির ভান করলেন। কাদু মনে মনে বলল, ন্যাকা। রেস্ট কীসের জানো না? শুধু গল্প শুনেই তো জিভ লকলক করছে। এরপর শান্তিকে দেখলে কী হবে?

'আপনি যা ভালো বোঝেন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে সে দেখা যাবে'খন। এখন চললাম কাদু, মিটিং আছে।'

খুশি মনে কাদু দরজার দিকে পা বাড়াল। প্রথম রাউন্ডে তার জেতা হয়ে গেছে। মানা সরকারের মতো লোককে নিজের ডেরায় নিয়ে গিয়ে ফেলাটাই একটা কঠিন ব্যাপার ছিল। এসব লোকের কাছে মেয়েছেলে পাঠানো যায় না। মেয়েছেলের কাছে এদের নিয়ে গিয়ে ফেলতে হয়। যেতে রাজি হওয়া মানেই তার আদ্দেকটা হয়ে গেল।

'কাদু।'

দরজার সামনে পৌঁছে কাদু ঘুরে দাঁড়াল।

'ডাকলেন দাদা?'

'তোমাদের ঝিলডাঙার চিত্তরঞ্জনটা কে?'

কাদু ভুরু কোঁচকাল। মানা সরকার তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে সরাসরি। ঠোঁটে অদৃশ্য হাসি। এবার খেলায় তিনি দান ছেড়েছেন।

'আরে বাপু তোমাদের স্কুলের মাস্টার। নিজের গাঁয়ের মাস্টারকে চেনো না!'

রাগতে গিয়েও নিজেকে জোর সামলে নিল কাদু।

'বিলক্ষণ চিনি। মাস্টারকে চিনব না? আসলে ঝিলডাঙায় আপনার দাদা তিনটে চিত্তরঞ্জন আছে। একটা গোরু ছাগল নিয়ে থাকে। গোবর চিত্ত। আরেকটা দাদা, আপনার মাতাল-চাতাল। মাল খেয়ে রাস্তার ধারে পড়ে থাকে। আর এটা হল চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া। পাগলা।'

boierpathshala.blogspot.com

'হ্যাঁ, হ্যাঁ খুঁটিয়া। মাস্টার আমার কাছে এসেছিল। তুমিই নাকি বলেছিলে?'

কাদুর কাছে এতক্ষণে ঘটনা পরিষ্কার হল। ঠিকই তো, পাগলটাকে তো সে-ই বলেছিল। স্কুলের ফ্যাকড়া নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করছিল, তখন বলেছিল। কাটাবার জন্য বলেছিল। তা বলে সত্যি সত্যি চলে আসবে! হারামজাদার সাহস তো কম নয়! বিরক্তি চেপে বানিয়ে হাসল কাদু।

'ছি ছি, দেখুন দেখি কাণ্ড। নিশ্চয় স্কুলের বাথরুম...আপনার মতো ব্যস্ত মানুষের কাছে ছেলেমেয়েদের হাগা-মোতা নিয়ে পাগলা চলে এল।'

মানা সরকার যেন খানিকটা নিজের মনেই বললেন, 'মানুষটা দেখলাম ভালো। বেশ ভালো। ভাবছি, সামনের পঞ্চায়েত ইলেকশনে ঝিলডাঙা থেকে ওকে ক্যান্ডিডেট করব। ভালো লোক ভোটে দাঁড়লে পার্টির ইমেজ ভালো হয়। তাই না? তুমি একটু খোঁজখবর নিয়ে দ্যাখো তো কাদু, ঝিলডাঙায় মাস্টারের পপুলারিটি কেমন? মনে হয় বেশিই হবে। তার ওপর আমি ওর স্কুলের বাথরুমের ব্যবস্থাটা করে দিলাম। ভেবেচিন্তেই করলাম। তোমাদের ভাষায় ওই হাগা-মোতাও অনেক সময় দাম দেয়।'

কথা শেষ করে হাসতে লাগলেন মানা সরকার। জয়ের হাসি।

কাঁচা রাস্তা দিয়ে মোটরবাইক ছুটছে। গোটা শরীরে যেন আগুনের হলকা ছুটছে কাদুর। ঠোঁট কামড়ে নিজেকে কোনোরকমে সামলে রেখেছে সে। সামান্য একটা মাস্টার হবে ঝিলডাঙার নেতা! তারপর আর কাদুকে কেউ মানবে? কেউ ভয় পাবে? শুধু গায়ের জোর নয়, ব্যবসাপাতি পর্যন্ত সব চৌপাট হয়ে যাবে। পেটে লাথি। ঘটনা কি সত্যি? নাকি মানা শুয়োরের বাচ্চা খেলল? হতে পারে। একটা খোঁচা দিয়ে রাখল। নেতারা খোঁচা মারার অনেক কায়দা জানে। তবে যা-ই হোক ওই পাগলা মাস্টারকে এখনই ঠেকাতে হবে। মাথা ঠান্ডা করে নতুন গজিয়ে ওঠা উপদ্রব সামলাতে হবে। আগে মানা সরকার, তারপর চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া।

কাদুর মোটরবাইক গর্তে পড়ে লাফিয়ে উঠল।

boierpathshala.blogspot.com

সতেরো

বারান্দার দরজাটা খুলে কথাকলি থমকে দাঁড়াল। আশ্চর্য এক মায়াবী আলো ফুটেছে আজ!

কথাকলি এমনটা প্রায়ই করে। ঘুম না এলে রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে আসে। অন্ধকার বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। কোনো কোনোদিন বসে থাকে বেতের চেয়ারে। বসে থাকতে থাকতে একসময় মনে হয়, মিশে গেছে অন্ধকারে। অন্ধকার হয়ে গেছে। কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না, সেও পাচ্ছে না।

আজ এত আলো! এত আলো এল কোথা থেকে! নরম আলোয় ভেসে যাচ্ছে বারান্দা। কে যেন চুপিচুপি এসে রাংতার টুকরো বিছিয়ে রেখে চলে গেছে! সেই টুকরো কোথাও রুপোলি, কোথাও সোনালি। চিকচিক করছে, উড়ছে, খেলা করছে নিজের মতো।

কথাকলি অস্ফুটে বলল, 'বাহ্!'

কলকাতা রাত একটাতেও জেগে থাকে। বাড়ি ফেরার জন্য গাড়ি ছোটে পড়িমড়ি। ট্যাক্সি পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে শেষ ভাড়ার অপেক্ষায়। দু-একটা ক্লান্ত রিকশা অপ্রয়োজনে আরও ক্লান্ত ঘণ্টা বাজিয়ে চলে যায়। ঠোঁটে কড়া রং মাখা মেয়েরা ল্যাম্পপোস্টের ছায়া অন্ধকারে জোর করে অপেক্ষা করে। গলির মোড়ে পানের দোকানে রেডিয়ো বাজে চাপা স্বরে। বাজতেই থাকে।

সল্টলেকে সেসবের বালাই নেই। রাত একটা মানে শুধু গভীর রাত নয়, গা ছমছমে গভীর রাত। নিঝুম, শুনশান। গোটা শহরটাই চাদর মুড়ি দিয়ে ফেলে। সাজনো গোছানো বাড়িঘর, ছড়ানো ছিটোনো গাছপালা দাঁড়িয়ে থাকে চৌকিদারের মতো। যেন অচেনা, অজানা কাউকে দেখতে পেলেই চোখ পাকিয়ে

boierpathshala.blogspot.com

হাঁক দেবে, 'কে হে? কে যায় এত রাতে?'

তার ওপর আবার কথাকলিদের বাড়ি বড়ো রাস্তা থেকে খানিকটা ভেতরে। ফলে আরও নির্জন, আরও চুপচাপ। কিছুক্ষণ এই নির্জনতার মধ্যে থাকলে বিভ্রম তৈরি হয়। অন্যরকম একটা অনুভূতি হতে শুরু করে। মনে হয়, ঝাঁ চকচকে সল্টলেক গভীর রাতে তার আদিম বালিয়াড়ি, সোঁদা গন্ধ মাখা জলাভূমির চেহারায় ফিরে যেতে চাইছে। পারছে না। চাপা দীর্ঘশ্বাসে থমকে আছে।

কথাকলির বেশ লাগে। বেশ লাগে বলেই মন খারাপের ঘুমহীন রাতে এই বারান্দা তার এত প্রিয়। বাবার চেয়ারটায় গুটিসুটি মেরে বসে থাকে। অন্ধকারে ডুব দেয়।

আজ কি পূর্ণিমা? কই আকাশে চাঁদ নেই তো! তবে কীসের এত আলো?

আলোর টুকরোয় সাবধানে পা ফেলে কথাকলি বেরিয়ে এল বাইরে। চারপাশেও একই কাণ্ড। বাড়িঘর, গাছপালাতেও আলো পড়েছে। রেলিঙের পাশে এসে কথাকলি হাত বাড়িয়ে দিল। মানুষ যেমনভাবে হাত পেতে বৃষ্টিকে ছোঁয়, তেমনভাবে সে আলোও ছুঁল। নিজের ছেলেমানুষিতে নিজের মনেই হেসে ফেলল। ভাগ্যিস সবাই ঘুমোচ্ছে। কেউ যদি দেখে ফেলত কী হত তাহলে?

'এই যে মেয়ে, তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছ?'

'আলো ধরছি।'

'আলো ধরছ! এটা আবার কেমন কথা? আলো কখনও ধরা যায়?'

'ওমা, কেন ধরা যাবে না? এই তো ধরেছি।'

'মেয়ে, তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা কর?'

'এক মুঠো আলো দিলেই আপনি বুঝতে পারবেন আমি রসিকতা করছি না। দেব?'

'না, দেবে না। তোমার বাবা কি ঘুমোচ্ছেন?'

'মনে হয় ঘুমোচ্ছে। কেন বলুন তো? আপনি কি বাবাকেও আলো ধরতে বলবেন? বললে খারাপ হয় না। আমার বাবা একজন খুবই মজার মানুষ। বলা যায় না, আলো ধরার জন্য তিনি হয়তো একটা পাত্রও নিয়ে আসতে পারেন।'

'না, আলো নয়, তোমাকে ধরতে বলব। পাগল মানুষকে যে এত রাতে একা ছাড়া ঠিক নয় সেটা নিশ্চয় তিনি আমার থেকে অনেক বেশি ভালো করে জানেন।'

'আপনি কি আমাকে পাগল ভাবছেন?'

boierpathshala.blogspot.com

'চিন্তা কোরো না, তোমার বাবা, ডাক্তার সুদর্শন রায় একজন অতি নামকরা চিকিৎসক। তিনি নিশ্চয় তোমার এই অসুখ খুব তাড়াতাড়ি সারিয়ে দিতে পারবেন।'

'আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। আপনি কি ভাবছেন আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

'নিশ্চয়। মাথা খারাপ না হলে কেউ রাতদুপুরে আলো ছুঁতে বারান্দায় আসে? আলো কি ছোঁয়া যায়।'

এতক্ষণ গম্ভীর ভঙ্গিতে কথা চালালেও এই পর্যায়ে এসে কথাকলিকে খুব সুন্দর করে হাসতে হবে। হেসে বলতে হবে, 'না, ছোঁয়া যায় না। কখনওই যায় না।'

যদিও আজ ঘটনা ঘটল অন্য! হাত বাড়াতেই কথাকলি আলো ছুঁতে পারল! চমকে উঠল সে! ছোঁয়ামাত্র এই আশ্চর্য আলো সে চিনতে পেরেছে! এ হল রাতের আলো। দু-হাতের আঁজলা বাড়িয়ে কথাকলি ফিসফিস করে বলল, 'রাতের আলো, রাতের আলো, রাতের আলো...।'

মুর্হূতে কয়েকটা বছর পিছিয়ে গেল কথাকলি।

বিয়ের পর হানিমুনে যাওয়া হবে। কিন্তু যাবে কী করে? ব্রতীনের পকেটে পয়সাকড়ির অবস্থা এমন যে ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে বড়োজোর ক্যানিং পর্যন্ত যাওয়া যায়। সেখানে গিয়ে মাতলা নদীর ধারে বসতে হবে। চা-বিস্কুটের বেশি খাওয়া যাবে না। তাহলে আবার কলকাতায় ফেরার ভাড়ায় টানাটানি পড়বে। নতুন সংসার গোছাতে গিয়ে ভয়াবহ অর্থসংকট শুরু হয়েছে।

কথাকলি বলল, 'আমি দিচ্ছি।'

ব্রতীন মাথা নেড়ে বলল, 'তা কী করে হবে? স্ত্রী-র খরচে সব জায়গায় যাওয়া যায়, হানিমুনে যাওয়া যায় না। নিয়ম নেই।'

কথাকলি হেসে ফেলল। বলল, 'কার নিয়ম?'

ব্রতীন গম্ভীর গলায় বলল, 'ঠিক বলতে পারব না, মনে হয় হানিমুনাস।'

'হানিমুনাস! সে আবার কে?' কথাকলি চোখ বড়ো করল।

ব্রতীন গলা আরও গম্ভীর করে বলল, 'হানিমুনের দেবতা। শুনেছি হানিমুন বিষয়ক জটিল নিয়মকানুনের যাবতীয় ড্রাফট তারই তৈরি। খুবই কড়া ধরনের ভদ্রমহিলা একজন।'

কথাকলি মুচকি হেসে বলল, 'নিয়ম না মানলে কী সাজা হয়?'

'কে জানে কী হয়, হয়তো হানিমুনে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীর প্রচণ্ড ঝগড়া লেগে

boierpathshala.blogspot.com

গেল। স্বামী বলল, কনটিনেন্টাল খাব, স্ত্রী বলল, চাইনিজ ছাড়া কিছুতে মুখ দেব না। স্ত্রী বলল, বিকেলবেলা হাঁটব, স্বামী বলল, তুমি হাঁটলে হাঁট, আমি রিকশাতে উঠলাম। আমি এই রিস্কে যেতে পারব না কথা।'

কথাকলি হাসতে হাসতে বলল, 'ঠিক আছে নিয়ম ভাঙতে হবে না। নিয়মে ছাড় পাওয়া যাবে?'

'খরচাপাতিতে ছাড় নেই, জায়গায় ছাড় থাকতে পারে। যেখানে পয়সাকড়ি কম লাগে সেখানে যাওয়া যায়।'

কথাকলি উৎসাহী গলায় বলল, 'তাহলে তাই করি আমরা। কম খরচের স্পটে গিয়ে হানিমুন সারি।'

ব্রতীন বলল, 'কম খরচই-বা কে দেবে?'

'কেন তুমি দেবে। আমার কাছ থেকে ধার নিয়ে তুমি দেবে। ধার নেওয়ার পর তো টাকা তোমারই।'

ব্রতীন এবার হেসে ফেলল, 'এইটা খারাপ বলোনি। নিয়মরক্ষাও হল, আবার যাওয়াও হল। শ্রীমতী হনিমুনাস দেবীর এতে রাগ করা উচিত নয়। ঠিক আছে, চল আজই সব ঠিকঠাক করে কাল রওনা হয়ে পড়ি।'

কথাকলি চোখ কপালে তুলে বলল, 'আজই ঠিক করবে মানে! তুমি কাজে বেরোবে না?'

'তুমি কি খেপেছ কথা? হানিমুনে যাওয়ার প্ল্যান ছেড়ে কাজে বেরোব! জীবনে কাজ অনেকবার আসবে, হানিমুন আসে মাত্র একবার। ওনলি ওয়ান টাইম। যাও, চট করে কাগজ পেন নিয়ে এসো।'

সকালে অনেক আলোচনা পর দেখা গেল, ব্রতীন, কথাকলির দুজনেরই পাহাড়ে টান। সুতরাং পাহাড়েই যেতে হবে। বড়ো কোনো পাহাড় নয়, ছোটোখাটো পাহাড়। দার্জিলিং বা কার্শিয়াং ধরনের কোথাও। দুপুরে হিসেব নিয়ে বসা হল। ট্রেন, গাড়ি, হোটেলের খরচের যোগ বিয়োগ হল। ডেফিসিট প্রচুর। শুধু একজনের কাছ থেকে ধার নিলে হবে না, আরও দু-একজন চাই। সেই দু-একজন কারা? বিকেল পর্যন্ত লিস্ট তৈরির কাজ চলল। 'হানিমুন যাব' বলে বড়োদের কাছ থেকে টাকা চাওয়াটা ভালো দেখায় না। বন্ধুদের কাছে হাত পাতা ছাড়া উপায় নেই। সেই পরিকল্পনা মতো নাম লেখা হল। সেই সংখ্যা খুবই সামান্য। সব মিলিয়ে সাত-আটজন। কথাকলির জানা তিন, ব্রতীনের মেরে কেটে পাঁচজন। পরে আবার দুজনকে বাদ দেওয়া হল। কারণ তাদের ফোন নম্বর, ঠিকানা কিছুই জানা নেই।

boierpathshala.blogspot.com

ব্রতীন বলল, 'টাকা যখন আমি ধার নিচ্ছি, তখন আমিই কথা বলি।'

'একেবারে আজই করবে?'

'শুরুটা তো করি। কাল সকালের মধ্যে অ্যারেঞ্জ হয়ে গেলে বিকেলেই বেরিয়ে যেতে পারব।'

কথাকলি বলল, 'অসম্ভব। কাল কিছুতেই হবে না। টাকা জোগাড় হলেও ট্রেনের টিকিট, থাকার ব্যবস্থা হবে কী করে?'

ব্রতীন ফোন হাতে নিয়ে বলল, 'সব হবে। তুমি জামাকাপড় গুছিয়ে ফ্যালো।'

কথাকলি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'ঠাট্টা কোরো না ব্রতীন। কিছু ঠিক নেই, আমি এমনি এমনি জিনিস গোছাব? তারপর না যাওয়া হলে মন খারাপ হবে।'

'মন খারাপ হবে না কথা। কাল আমরা যাচ্ছি।'

'না, আমরা যাচ্ছি না।'

পরদিন শুধু যাওয়া হল না, একেবারে ভোরের বাসে বেরিয়ে পড়া হল। বাস ছাড়ার পরও কথাকলির বিশ্বাস হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, এই যাত্রা সত্যি নয়। সে স্বপ্নের মধ্যে আছে। মশার কামড় বা জল তেষ্টায় ঘুম ভেঙে যাবে। স্বপ্ন ভাঙবে। তাড়াহুড়োতে সে ঠিকমতো জামাকাপড়ও নিতে পারেনি, হাতের কাছে যা পেয়েছে কোনোরকমে ব্যাগে পুরেছে। সম্ভবত সেগুলি সবই ঘরে পরবার মতো। দু-একটা ছেঁড়া ফাটা হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। ছেঁড়াফাটা পরে রান্না করা যায়, হানিমুনে যাওয়া যায় না। মজা হল, সে যাচ্ছে এবং তার খুবই আনন্দ হচ্ছে। ইচ্ছে করছে বাস্‌এই ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে ওঠে। অন্য যাত্রীরা কড়া চোখে তাকবে। তখন সে বলবে, 'আমরা হানিমুন কাপ্‌ল। হানিমুন কাপলরা যা খুশি করতে পারে। হাততালি কেন, ইচ্ছে করলে তারা বাস্‌এ নাচতেও পারে।'

গোটা ব্যবস্থাটাই করেছে ব্রতীনের ছেলেবেলার বন্ধু প্রাংশু। লেখাপড়ায় ঝকঝকে প্রাংশু ব্যাঙ্কের মস্ত অফিসার। জীবনে ইচ্ছে ছিল, বই আর ক্যাসেট-সিডির দোকান দেবে। সারাদিন অলসভাবে সেখানে বসে থাকবে। যত দিন যেতে লাগল সেই সম্ভাবনা কমতে লাগল। প্রাংশুও হতাশায় সেই সময় একমুখ দাড়ি রেখে বসেছিল। ভাবটা এমন বই-গানের দোকানই যখন দিতে পারলাম না, জীবনে বেঁচে থেকে আর লাভ কী? কোনো লাভ নেই। যাই হোক, সেই ছেলে এখন অফিস ছাড়া দিনের বাকি সময়টুকু বই আর পত্রপত্রিকা মুখে ডুবিয়ে শুয়ে

boierpathshala.blogspot.com

থাকে। তাকে 'বই পোকা' বললে কম বলা হয়, বলা উচিত 'বই রাক্ষস'। রাক্ষস যেমন সব খায়, প্রাংশুও তেমন। যে-কোনো ধরনের বিষয়ে পড়তে পারে। শুধু পড়ে না, 'পরে পড়ব' বলব জমিয়েও রাখে। স্টকের পরিমাণ এমন বাড়িয়েছে যে বাড়িতে বই ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে হাঁটতে হয়। খাটে শুতে হয় বই সরিয়ে। স্ত্রী রুমা শান্তশিষ্ট চমৎকার মেয়ে। সেই শান্ত মেয়ে বিয়ের পর থেকেই হুমকি দিচ্ছিল, অবস্থা এরকম চলতে থাকলে যে-কোনো দিন একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। এই হুমকির কিছুদিনের মধ্যেই প্রাংশু একবার অন্যমনস্ক হয়ে ফ্রিজে বই রেখে ফেলে। সেদিনই রুমা সুটকেস গুছিয়ে হাওড়ায় বাপের বাড়ি রওনা দেয়। যাওয়ার আগে বলে যায়, আর ফিরবে না। ফেরে তিনদিন পরে। সঙ্গে প্রাংশুর টেলিফোনে পাওয়া অর্ডার মতো গাদা খানেক বই ম্যাগাজিন। তার মধ্যে ছিল 'অর্গানাইজেশন অব গ্লোবাল নেগোসিয়েশন' এবং অ্যানে উইলান্সের 'লুক অ্যান্ড কুক' সিরিজের পাঁচ নম্বর খণ্ড। এই খণ্ডে নাকি ক্যারাবিয়ানদের রান্নাবান্নার বিস্তারিত হদিশ রয়েছে। বইয়ের প্যাকেট নামিয়ে রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে রুমা বলে 'ফিরতাম না। মোটেও ফিরতাম না। নেহাত ছাইপাঁশগুলো তোমার তাড়াতাড়ি লাগবে তাই ফিরলাম।'

ব্রতীন ভেবেচিন্তেই প্রাংশুর নাম লিস্টের প্রথমে রেখেছিল। এই লোকের কাছে সহজ বায়নাক্কা কাজ দেয় না। বেয়াড়া আবদার লেগে যাবে। লেগেও গেল। ফোন ধরেই বিরাট চেঁচামেচি শুরু করল প্রাংশু।

'হারামজাদা ছেলে, বিয়েতে নেমন্তন্ন করোনি, আবার ফোন করছ? লজ্জা করে না?'

ব্রতীন চাপা গলায় বলে, 'একটা কথা শোন প্রাংশু, বিয়েটা হুট করে হয়ে গেল।'

'হুট করে হয়ে গেল! হোয়াট ডু ইউ মিন বাই হুট করে হয়ে গেল? নেকিয়ে নেকিয়ে প্রেম চালালে এতদিন, এখন বলছ হুট করে হয়ে গেল? চোপ শালা। কোনো কথা বলবি না। ফোন রেখে দে।'

'আমি আর কথাকলি একদিন তোর বাড়িতে যাচ্ছি।'

'লাভ হবে না, ঘাড় ধরে বের করে দেব। রুমা যদি তোমাদের নিয়ে আদিখ্যেতা দেখায় তাকেও বের করে দেব। সে রাজি না হলে আমি নিজে বেরিয়ে যাব।'

ব্রতীন হেসে বলে, 'একটা কথা শোন প্রাংশু। ঠিক একটা কথা বলেই ফোন রেখে দেব।'

boierpathshala.blogspot.com

'নো, একটা কথা নয়। রুমা, তোমার সঙ্গে মিশতে বারণ করেছে। তুমি বোধহয় জানো না, বউয়ের কথা ছাড়া আমি একটি পা-ও চলি না। আমি হলাম বউ-কথা-কও স্বামী। সুতরাং গুডনাইট।'

'গুডনাইট' বলেও যে এই ছেলে টেলিফোন ধরে রাখবে এবং তার কথা শুনবে ব্রতীন তা ভালো করেই জানত। নিষ্কর্মা, অপদার্থ, বন্ধুটির প্রতি প্রাংশুর ভালোবাসা গভীর। এই ভালোবাসার সুযোগ নিয়ে সে দ্রুত টাকার কথা বলে ফেলে।

প্রাংশু এবার হুংকার ছাড়ল, 'চাঁদা তুলে হানিমুন! রাতদুপুরে ফাজলামি হচ্ছে? জুতিয়ে তোমার মুখ ছিঁড়ে দেওয়া উচিত।'

ব্রতীন চাপা গলায় বলল, 'চাঁদা তো বলিনি, ধার দিবি। কার্শিয়াং থেকে ফিরেই টাকা ফেরত।'

'ধার? ব্যাঙ্ক লোন? ভাই, হানিমুন লোন নামে ব্যাঙ্কে কিছু চালু আছে বলে তো আমার জানা নেই।'

কথা শেষ করে প্রাংশু হো হো করে হেসে উঠল। চেহারায় মোটা হওয়ার কারণে চিরকালই তার হাসির মধ্যে প্রাণ বেশি।

'আহা, ব্যাঙ্ক বলিনি, তোর কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু টাকা ধার করব। কাল সকালে অ্যারেঞ্জ করে রাখ, আমি তোর অফিসে গিয়ে নিয়ে নিচ্ছি।

'একটা পয়সাও দেব না। নো কানাকড়ি। তবে হ্যাঁ, কিছু করিনি শুনলে রুমা আমার ওপর রাগারাগি করতে পারে। সংসারে অশান্তি আমি পছন্দ করি না। সেই কারণে অলটারনেটিভ একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি, রাজি থাকলে বল।'

রাজি মানে? প্রস্তাব শুনে কথাকলি, ব্রতীন দুজনেই লাফিয়ে উঠছে। ব্রতীন টেলিফোনেই চিৎকার করে বলল, 'জয়, হানিমুনাস দেবী কি জয়!'

প্রাংশু গম্ভীর গলায় বলল, 'ওটা আবার কী বললি, গাল দিলি নাকি?'

ব্রতীন হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাঁ, দিলাম। বললাম এত লেখাপড়া শিখেও তুই একটা মস্ত গাধা। আর সেই কারণেই এত ভালো।'

প্রাংশু বলল, 'হতে পারি, তবে তোর থেকে বড়ো নই। খুব বড়ো ধরনের গাধা ছাড়া কেউ ডাক্তারি পড়া ছাড়ে না। যা, শুতে যা। কাল ভোরের বাসে বেরিয়ে যাস। আমি টেলিফোনে সব বলে রাখব।'

প্রাংশু তাদের অফিসের হলিডে হোম ঠিক করে দিয়েছে। নামমাত্র খরচ। নিউদিঘার বিচ ধরে কয়েক কিলোমিটার এগিয়ে যেতে হবে। জায়গাটা ওড়িশা

boierpathshala.blogspot.com

সীমান্তের মধ্যে কিছুটা ঢুকে। বিচে লোকজন প্রায় যায় না বললেই চলে। শুধু জেলেদের গ্রাম আর এলোমেলো ঝাউবন। সমুদ্রতীরের এই বাংলো প্যাটার্নের হলিডে হোম হঠাৎ দেখলে মনে হয়, নির্জন বালিয়াড়িতে একটা ঝিনুক পড়ে আছে। সেই ঝিনুকের খোলের মধ্যে ব্রতীনের হাত ধরে কথাকলি গিয়ে উঠেছিল।

সেখানেই কথাকলির প্রথম 'রাতের আলো' দেখা।

বারান্দার রেলিং থেকে সরে কথাকলি চেয়ারে এসে বসল। কাছাকাছি কোনো গাছে পাখি উড়ে গিয়ে ডাল বদলাল। অন্ধকারে দেখা গেল না। শুধু তার ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ শোনা গেল। ঘুম ভেঙে গেলে পাখিরা বাসা বদলায়! ভারি অদ্ভুত! অদ্ভুত কেন? মানুষও কি এমন নয়? এরকমই তো। সেও তো জেগে উঠে ঘর বদলায়, মানুষ বদলায়। ব্রতীনও কি বদলাবে? কে জানে হয়তো করবে। আবার বিয়ে করবে। হয়তো শ্যামবাজার বা পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথে দেখা হয়ে যাবে। লাজুক হেসে বলবে, 'কথাকলি, এ আমার স্ত্রী। এসো আমরা তিনজনে কোথাও বসে চা খাই।'

হলিডে হোমে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা সবই ছিল। চৌকিদারকে পয়সা দিলে বাজার এনে দেবে, তবে রান্না করতে পারবে না। সমস্যা আছে।

কথা অবাক হয়ে বলল, 'কী সমস্যা?'

চৌকিদার মাথা নামিয়ে জানাল, সমস্যার কথা বলা যাবে না। তবে সমস্যা আছে। কথা বলল, 'অসুবিধে নেই, আমি দুটো ভাতে ভাত ফুটিয়ে নেব। দিন কয়েকের তো ব্যাপার।'

ব্রতীন বলল, 'নো, এখানে তুমি কিছুই করবে না। পায়ের ওপর পা তুলে সমুদ্র দেখবে।'

'তাহলে খাওয়া-দাওয়ার কী হবে? বালি খাবে?'

'দরকার হলে তাই খাব। হানিমুনে বালি খুবই সুস্বাদু লাগে। যারা পাহাড়ে যায় তারা খায় পাথর। আমরা সমুদ্রের ধারে এসেছি তাই বালি খাব।'

চৌকিদার জানাল, কোনো অসুবিধে নেই। একটু গেলেই ঝুপড়ি ধরনের দোকান। বলে রাখলে দু-বেলাই খাবার বানিয়ে রাখবে। ভাত, ডাল, মাছ, কাঁকড়ার ঝোল। দাম অতি অল্প। তবে স্বাদ সাংঘাতিক। একবার খেলে মনে হবে রাঁধুনির হাত দুটো বাঁধিয়ে দিই। রাস্তা দিয়ে গেলে একটু দূর পড়ে। আর সমুদ্র ধরে হাঁটলে ঝাউবন দিয়ে শর্টকাট। ব্রতীন বলল, 'আমরা সমুদ্র ধরেই হাঁটাহাঁটি করব। খিদেও বাড়বে, খাওয়াও হজম হবে।'

তারপর থেকে সেই ব্যবস্থাই চালু হল। প্রথম দিন দুপুরে খেতে গিয়ে দেখা

boierpathshala.blogspot.com

গেল, হলিডে হোমের চৌকিদারই সেই ঝুপড়ি দোকানের রাঁধুনি। ব্যবসা তার। নবদম্পতিকে দেখে এক গাল হেসে খাতির করে বলল, 'আসেন, ভিতরে আসেন।'

ব্রতীন আর কথাকলি দুজনেই হো হো করে হেসে উঠল।

কথাকলি চেয়ারটা একটু সরিয়ে নিল। একটু শীত শীত করছে। করুক। সেদিনও ঠান্ডা লাগছিল। গায়ের শাড়িটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়েছিল। রাতের খাবার সেরে শূন্য সি বিচ দিয়ে হেঁটে আসছিল দুজনে। একদিকে সমুদ্রের গর্জন, অন্যপাশে ঝাউবনের ফিসফিস। জেলেদের সারি সারি কালো নৌকো শুয়ে আছে। ফসিলের মতো। যেন হাজার হাজার বছর ধরে তারা এভাবেই রয়েছে। নিশ্চল, প্রাণহীন। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ব্রতীন। চাপা গলায় বলল, 'দেখতে পাচ্ছ কথা?'

'কী?'

'এই যে, এই যে আলো। দেখতে পাচ্ছ না?'

'আলো! কোথায়?'

ব্রতীন হাতটা চেপে ধরল। উত্তেজিত গলায় বলল, 'ওই তো।'

অবাক কথাকলি চোখ তুলে তাকাল এবং মুগ্ধ হয়ে গেল। সত্যি তো! সত্যি তো আলো। জনমানবহীন শূন্য সৈকত জুড়ে পড়ে আছে রাংতার মতো। ঝলমলে অথচ কোমল সেই আলো টুকরো হয়ে উড়ছে সমুদ্র-বাতাসে। ঝরে ঝরে পড়ছে তুষারকণার মতো। জলে, বালিতে আর ঘুমন্ত ঝাউপাতায়।

কথাকলি অস্ফুটে বলল, 'অপূর্ব।'

ব্রতীন স্ত্রী-র দিকে ঘন হয়ে আসে। ফিসফিস করে বলে, 'মারাত্মক! ভয়ংকর।'

'এ কীসের আলো ব্রতীন? জ্যোৎস্না?'

ব্রতীন গাঢ় গলায় বলল, 'না, জ্যোৎস্না নয়। আজ চাঁদ ওঠেনি। এই আলো শুধু রাতের আলো। এই আলো সবসময় দেখা যায় না কথা। কোনো কোনো সময় দেখা যায়। মায়ার মতো। এসো আমরা এই আলোর তলায় কিছুক্ষণ বসি। বসবে?'

নৌকোর পাশে বালিতে পা ছড়িয়ে দুজনে চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ। একসময় কথাকলি মাথা রাখল তার স্বামীর কাঁধে। ব্রতীন তার মুখের ওপর মুখ নামিয়ে বলল, 'একটা গান করবে?'

'দুর, আমি কি গান জানি?'

boierpathshala.blogspot.com

'ঠিক আছে, তাহলে গাইতে হবে না।'

ব্রতীনের বুকের ওপর হাত রেখে কথাকলি হেসে বলল 'আচ্ছা, গাইব না।'

রাতের আলো তার মায়ার আঁচল সরিয়ে চলে যাচ্ছে ধীর পায়ে। সমুদ্রে জোয়ার এসেছে। ঢেউ আসছে এগিয়ে। রাশি রাশি সাদা ফেনা হাসতে হাসতে ছুটে আসছে, পালাচ্ছে। আবার আসছে। ফিরে যাচ্ছে কলকল আওয়াজ তুলে।

কথাকলি গুনগুন করে গান ধরল—'আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো/ কে এল মোর অঙ্গনে কে জানে গো...'

ব্রতীন কথাকলিকে এক হাতে জড়িয়ে কাছে টানল। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'কথা, কথা, আমার কথা।'

কথাকলি গেয়ে চলল— 'হৃদয় আমার উদাস করে কেড়ে নিল আকাশ মোরে,/ বাতাস আমায় আনন্দবাণ হানে গো...।'

একসময় জোয়ারের জল কখন যে উঠে এল তীরে, কখন যে ভিজিয়ে দিয়ে চলে গেল, চুম্বনরত নারী পুরুষ দুজনে জানতেই পারল না।

সল্টলেকের আকাশ একটু একটু করে ফর্সা হচ্ছে। চোখের জল মুছে কথাকলি উঠে দাঁড়াল। ঘরে যেতে যেতে ফিসফিস করে বলল, 'যদি চলেই গেলে, আবার কেন এলে? কেন এলে ব্রতীন?

boierpathshala.blogspot.com

আঠেরো

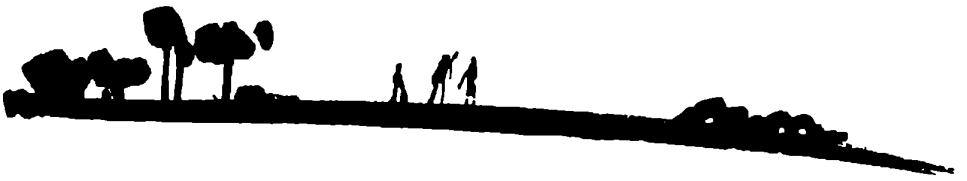

'খিদে কী মামা?

'কী বললি!'

'বললাম, খিদে কাকে বলে?'

'খিদে কাকে বলে! ওরে বাব্বা, হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন রে ব্যাটা?'

'বল না মামা, প্লিজ বল।'

'আগে বল কেন জিজ্ঞেস করছিস।'

'মা আমাকে বলে খাব না খাব না করছিস অর্ক, জানিস খিদে কী? আজ তোকে বলতেই হবে নইলে তোর একদিন নয়তো আমার একদিন।'

ভাগনের কথা বলার ভঙ্গিতে সোমনাথ হেসে ফেলল। না, দিদিটার মাথা সত্যিই গেছে।

'খিদে একটা খুব কঠিন বিষয়।' হাসি মুখেই বলল সোমনাথ।

অর্ক বলল, 'কত কঠিন!'

'এত কঠিন যে তুই বুঝবি না।'

'না বুঝলেও বল।'

সোমনাথ খাটের ওপর আধশোয়া হয়ে আছে। সামনে খাতা। খাতার পাতায় চোখ পড়লে মনে হবে সে হাবিজাবি, আঁকিবুকি কাটছে। যদিও ঘটনা তা নয়। সে স্ক্রিপ্ট তৈরি করছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস নিয়ে টিভি প্রোগ্রামের স্ক্রিপ্ট। এমন স্ক্রিপ্ট যে চ্যানেল নাইনটি টু-র মাথা ঘুরে যাবে। সামান্য আবহাওয়ার প্রোগ্রামে তারা এতটাই খুশি হবে যে মল্লিক টিভি প্রোডাকশন ছাড়া ভবিষ্যতে অন্য কাউকে কাজ দেওয়ার কথা ভাবতেই পারবে না। কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে না। যেটুকু লিখছে মনে ধরছে না সোমনাথের। বারবার কাটছে। পাতা

boierpathshala.blogspot.com

জুড়ে কেবল কাটাকুটিই চলছে। এতদিন মনে হত, সেক্স অতি সহজ বস্তু। চিত্রনাট্যের ওপর যেমন খুশি খানিকটা ঢেলে দিলেই হয়ে যায়। এখন নিজে করতে গিয়ে বুঝতে পারছে, ব্যাপার মোটেও সেরকম নয়। জিনিস ঝামেলার। এখানে তো আরও কঠিন। রোজকার ব্যাপার। শ্যুটিং-এর কথাও মাথায় রাখতে হবে। মেঘ-বৃষ্টির খবর বলার সময় মেয়ে যদি বৃষ্টিতে ভেজে আর গরমে খালি গায়ে তালপাখা নেড়ে হাওয়া খায়, সেটা কোনো চমক হবে না। অন্যরকম কিছু করতে হবে। ইংরেজিতে যাকে বলে আনপ্রেডিকটেবল। সেটাই হচ্ছে না।

সোমনাথের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে অর্ক। মামার কাছে তার আবদার হল, মামা যা করবে সে-ও তা করবে। ফলে সাদা পাতা আর পেন নিয়ে সে-ও আঁকিবুকি কাটছে। এর মাঝখানেই গম্ভীর গম্ভীর বিষয়ে দুজনের আলোচনা চলছে।

'কী হল মামা, বল, বলবে তো খিদে কী।'

অর্ক সোমনাথের গায়ে ধাক্কা দিল। সোমনাথ সোজা হয়ে বসল। ভাগনের চুলে হাত বুলিয়ে বলল, 'খিদের মানে এক-একজনের কাছে এক-একরকম।'

অর্ক তার সুন্দর চোখ দুটো আরও বড়ো বড়ো করে বলল, 'এক-একরকম! সে আবার কেমন?'

সোমনাথ হাসল। বলল, 'হ্যাঁ রে ব্যাটা তাই। কারও কাছে খিদে হল বাঁচা, কারও কাছে স্রেফ মজা। এত যে সব মারামারি কাটাকাটি হয়, জেনে রাখবি সবের পিছনে আছে খিদে রাক্ষস।'

'খিদে রাক্ষস!' অর্ক খিলখিল করে হেসে উঠল।

সোমনাথ উৎসাহ নিয়ে বলল, 'রাক্ষস ছাড়া আবার কী? ওই রাক্ষসের ভয়ে সবাই জুজু হয়ে থাকে। কেউ না খেয়ে কাঁদে, কেউ খেয়ে কাঁদে। তুই যেমন খেয়ে কাঁদিস। কাঁদিস না?

অর্ক অনেকটা মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ কাঁদি।'

'তবে সবাইকেই খেতে হবে। না খেলে শরীরের কলকবজাগুলোর সব নট নড়ন চড়ন কন্ডিশনে চলে যাবে। না খেলে তোর হাত পা, মুখ কিছুই নড়বে না। হ্যাঁ রে অর্ক খাওয়া নিয়ে তোর মা কি বাড়াবাড়ি কমিয়েছে?'

'না মামা, বাড়াবাড়ি কমায়নি, বাড়াবাড়ি বাড়িয়েছে।'

'আরও বাড়িয়েছে! বলিস কী রে! দিদি তো জানতাম ছেলে খাওয়ানোর বিশারদ।'

'আগে মা আমাকে দিনে এইট্ টাইমস্ খাওয়াত, এখন টেন টাইমস্

boierpathshala.blogspot.com

খাওয়াচ্ছে।'

'একেবারে টেন! মনে হচ্ছে, ওটা খুব তাড়াতাড়ি টুয়েন্টি ফোর হয়ে যাবে। তখন তোকে প্রতি ঘণ্টায় খেতে হবে।'

'কী হবে মামা? আমার যে খুব ভয় করছে।' অর্ক চিন্তিত গলায় বলল।

'আমারও করছে। তবে তোকে নিয়ে নয়, ভয় করছে তোর মাকে নিয়ে। মনে হচ্ছে বনানী ঘোষের মাথার অবস্থা খুবই খারাপ জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে। এবার ম্যানেজ না করলে বড়ো ধরনের বিপদে পড়তে হবে।'

অর্ক ঘাড় কাত করে বলল, 'ম্যানেজ কী মামা?'

সোমনাথ এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'ম্যানেজ? ম্যানেজ হল তোর বিপদ থেকে নিজেকে বাঁচানোর উপায়।'

খুদে অর্ক তার আরও খুদে খুদে দাঁতে হেসে বলল, 'আমিও ম্যানেজ করতে পারি মামা। আজ খাওয়ার পর বমি করে দিয়েছি।'

সোমনাথ ভাগনের এলোমেলো চুল আরও এলোমেলো করে দিয়ে বলল, 'ঠিক করেছিস। আমি হলেও করতাম। তুই খেয়ে করেছিস, আমি না খেয়েই করতাম। এখন তোর অবস্থা কেমন? বমি করে শরীর খারাপ লাগছে?'

'না, মামা খুব ভালো লাগছে। খিদে খিদে পাচ্ছে।'

'ভেরি গুড। কী খাবি?'

এবার অর্ক সরে এসে সোমনাথের কানে কানে বলল, 'আইসক্রিম।'

সোমনাথ আঁতকে উঠে বলল, 'সর্বনাশ। আইসক্রিম খাওয়া তো তোর বারণ।'

অর্ক ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'সেইজন্যই ইচ্ছে করছে। আমাকে আইসক্রিম খাওয়াবে?'

'দেখি চেষ্টা করি।' খানিকটা হতাশ গলায় বলল সোমনাথ।

ঘরে ঢুকল বনানী। রাগী মা ধারেকাছে এলে ছেলেপিলেরা মায়ের মুখের দিকে তাকায়। অর্ক ভয়ে ভয়ে তাকাল হাতের দিকে। বাটি, প্লেট কিছু আছে কি?

বনানী কড়া গলায় ছেলেকে বলল, 'অর্ক, একটু যাও তো। তোমার মামার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।'

অর্ক ছড়ানো কাগজ-টাগজ নিয়ে দৌড় দিল।

সোমনাথও খাতা উলটে বলল, 'বোস দিদি। কেমন আছিস?'

বনানী খাটের একপাশে বসতে বসতে বলল, 'আদিখ্যেতা করিস না। একটা ফোন করেও তো খবর নিতে দেখি না। আমার কথা বাদ দে, জামাইবাবুটা

boierpathshala.blogspot.com

বাঁচল না মরল জিজ্ঞেস করিস কখনও?'

সোমনাথ হেসে ফেলল।

'এটা জিজ্ঞেস করার কী আছে! যেদিন থেকে তোর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সেদিনই যে নির্মলদা মৃত্যুবরণ করেছেন। বীরের মৃত্যুবরণ।'

'ঠাট্টা করছিস? লোকটা তোর জন্য কত চিন্তা করে জানিস? সেদিন মাঝরাতে জল খেতে উঠেছিল। চোখ খুলে দেখি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে কী ভাবছে। আমি বললাম, কী ভাবছ? তোর জামাইবাবু বলল, সমুর জন্য চিন্তা করছি।'

সোমনাথ চোখ কপালে তুলে বলল, 'সর্বনাশ! হ্যাঁ রে দিদি, তোর সঙ্গে থেকে থেকে জামাইবাবুরও মাথায় কোনো সমস্যা হয়নি তো? পাগলামি ছোঁয়াচে রোগ বলে তো জানা ছিল না। আমার মতো একটা ধেড়ে ছেলেকে নিয়ে চিন্তা করা ভয়ংকর লক্ষণ।'

বনানী খাটের ওপর পা তুলে গুছিয়ে বসল। সে ভাইয়ের এসব কথায় আমল দেয় না। যার কাজকর্মের ঠিক নেই, তার আবার কথার ঠিক কী? এই ছেলের জীবনটাই তো ঠাট্টাতামাশার। জীবন ঠাট্টাতামাশার না হলে কেউ টিভি মিভি নিয়ে পড়ে থাকে?

'শ্যালককে নিয়ে জামাইবাবুর দুশ্চিন্তার কারণটা কী জানতে পারি?'

'দুশ্চিন্তা নয়, সু-চিন্তা। সে-কথায় পরে আসছি। আগে তুই বল, মার কাছে যা শুনলাম সেটা সত্যি?'

সোমনাথ আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'কী আবার শুনলি?'

ভাইয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বনানী বলল, 'তুই নাকি পাহাড়ের বিজনেসে নামছিস?'

'পাহাড়!' সোমনাথ অবাক গলায় বলল।

'বাবাকে বলেছিস। কলকাতা ছেড়ে চলে যাবি। কোথায় দিল্লি না মুম্বাইতে গিয়ে পাহাড় কেনাবেচা করবি। বলিস নি?'

সোমনাথ মুহূর্ত কয়েক চুপ করে থেকে হো হো করে হেসে উঠল।

'দুর, দুর। মাথামুণ্ডু কী যে শুনিস। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক রাজস্থানের বান্‌জারাতে মার্বেল পাথরের ব্যবসা করছে। সেখানে একটা ম্যানেজার টাইপের লোক লাগবে। পাথর ভাঙা-টাঙার হিসেবপত্র রাখবে। ভেবেছি কাজটা নিয়ে চলে যাব। এখানে আর ভালো লাগছে না। বোর হয়ে গেছি।'

boierpathshala.blogspot.com

বনানী চিন্তিত গলায় বলল, 'ভালো লাগার কথাও নয়। উচুণ্ডেপনা ছেড়ে পুরুষমানুষকে একটা সময় ঘরসংসার করতে হয়। নইলে কোনোকিছুই ভালো লাগে না। তোর জামাইবাবু সেদিন রাতে এই কথাই বলছিল। অনেক ভাগ্য করে বাবা-মা এরকম একটা জামাই পেয়েছে।'

সোমনাথ উঠতে উঠতে বিড়বিড় করে বলল, 'হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।'

বনানী ঝুঁকে পড়ে ভাইয়ের হাত ধরল। গলা নরম করে বলল, 'ইয়ার্কি করিস না। তোর নির্মলদা তোর জন্য মেয়ে দেখেছে। অফিস-কলিগের আত্মীয়। চেনাজানার মধ্যে বিয়ে-থা ভালো। সমস্যা করলে ধমক-ধামক দেওয়া যায়। লক্ষ্মীসোনা তুই না বলিস না সমু।'

সোমনাথ দিদির হাত ছাড়িয়ে নিয়ে খাট থেকে নামল। এই মহিলাকে এখন থামানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। থামবে না। যদি-বা থামে একটা কান্নাকাটি হইচই বাধিয়ে বিচ্ছিরি কাণ্ড করবে। কে জানে হয়তো রাগের চোটে ছেলেটাকে ধরে গাণ্ডেপিণ্ডে খাওয়াতে শুরু করে দিল। যা করতে হবে মাথা ঠান্ডা করে করতে হবে।

'পাত্রী কেমন?'

বনানী একগাল হাসল। ছেলে যখন বলে 'পাত্রী কেমন' তখন ধরে নিতে হয় কাজ অর্ধেক হয়ে গেছে। বনানী উৎসাহ নিয়ে বলল, 'সত্যি কথা বলতে কী দেখতে শুনতে খুব একটা যে ভালো এমন নয়।'

'সে কী রে! দেখতে শুনতে ভালো নয়।' হাসি গোপন করে বলল সোমনাথ।

'তোকে তো লুকোনোর কিছু নেই। লুকোবও না। তারপর রাজ্যের লোক আমাকে দোষ দেবে, বলবে, ভাইয়ের ঘাড়ে পেত্নি গছিয়ে দিয়েছে। সে বাপু চলবে না। মেয়ের গায়ের রং চাপা। নাকেও গোলমাল আছে।'

'নাকে গোলমাল! বলিস কী রে, জামাইবাবু আমার জন্য নাকে-গোলমাল মেয়ে জুটিয়েছে?'

বনানী বিরক্ত হল। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'পাত্র হিসেবে তুই বিরাট কিছু লাড্ডু নোস যে সুন্দরীরা সব ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

সোমনাথ হেসে ফেলে বলল, 'লাড্ডু নই ঠিকই, তা বলে চাপা রঙের মেয়ে বিয়ে করব দিদি? এটাই-বা কেমন কথা?'

বনানী ধমকের গলায় বলল, 'তোর তো কাজকর্মেরই ঠিক নেই। ফর্সা মেয়ে তোর জন্য রাজি হবে কেন? এই মেয়ে তোর কাজ শুনে ইন্টারেস্ট

boierpathshala.blogspot.com

দেখিয়েছে।'

'ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে!'

'হ্যাঁ, সেই কারণেই তোর জামাইবাবু লাফালাফি করছে। তোর জামাইবাবু এমনি লাফালাফি করার মানুষ নয়, সে অতি বুদ্ধিমান মানুষ।'

সোমনাথ মুখ ফিরিয়ে বলল, 'দিদি, তুই দয়া করে বরের প্রশংসা কি এবার একটু থামাবি?'

বনানী আবারও ভাইয়ের কথায় পাত্তা দিল না।

'জেনে রাখবি সমু সে যা করে অনেক ভেবেচিন্তেই করে। তোর জন্য এই যে মেয়ে ঠিক করেছে সেটাও ভেবেচিন্তে করেছে। মেয়ের ফটো এনেছে। একরকম ফটো নয়, দু-রকম ফটো এনেছে। রঙিন আর সাদা-কালো।'

'সাদা-কালো!'

বনানী বিজয়ীর হাসি হেসে বলল, 'সাদা-কালোতে গায়ের রং লুকোনো যায় না। তুই ফটো দেখবি?'

সোমনাথ হাসল। ফটোটা নিয়ে নিলে কেমন হয়? পৃথার সঙ্গে বেশ মজার একটা কাণ্ড করা যাবে। সন্ধেবেলায় মোবাইলে ধরবে।

'পৃথা একবার আসতে পারবে?'

'না পারব না। ইভনিং শিফটে কাজ করছি। রাত দশটার আগে বেরোনোর কোনো চান্স নেই।'

'আমিও তো কাজ করছি।'

'কচু করছ। করছ তো টিভি সিরিয়ালের শ্যুটিং। ও করাও যা না করাও তাই। পুরোনো কোনো এপিসোড চালিয়ে দাও।'

'সিরিয়াল নয় পৃথা, অন্য একটা স্ক্রিপ্ট লিখছি।'

'ওই একই হল। এবার কিন্তু ফোন ছাড়ব সোমনাথ।'

'আহা, শোন না, মিনিট দশ পনেরোর জন্য দেখা করলেও হবে। খুব জরুরি।'

পৃথার গলা এবার সিরিয়াস হয়ে যাবে।

'কিছু বলবে?'

সোমনাথ গলা ভারী করে বলবে, 'না, কিছু দেখাব।'

'মানে!'

সোমনাথ হেসে বলবে, 'মানে আবার কী? একটা ফটো দেখাব।'

'কীসের ফটো?' পৃথার গলায় থাকবে উদ্‌বেগ।

boierpathshala.blogspot.com

'কীসের নয় পৃথা। কার ফটো বল। একটা মেয়ের ফটো।'

কথার এই পর্যায়ে এসে পৃথা নির্ঘাত রেগে যাবে। পৃথিবীতে কোনো নারী নেই যে প্রেমিকের মুখে অন্য মেয়ের কথা শুনে রেগে যায় না।

'সোমনাথ আমি তো তোমার মতো প্রোডাকশন হাউসে চাকরি করি না যে ছেলেমেয়েদের ফটো নিয়ে ঘুরব।'

'আরে বাবা এই মেয়ে সেই মেয়ে নয় পৃথা। খুবই সিরিয়াস ব্যাপার।'

এখানে পৃথা না থমকে পারবে না। মোবাইলে দেখা যাবে না, তবু পৃথার ভুরু কোঁচকানো বোঝা যাবে।

'কীসের সিরিয়াস মেয়ে?'

'আমার পাত্রী। দিদি আজ সকালে আমার বিয়ের সম্বন্ধ এনেছে। কথা অনেকদূর এগিয়েছে। মেয়ের বাড়ি থেকে দুটো ফটো পাঠিয়েছে। কালার আর ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। গায়ের রং দেখার জন্য ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট।'

প্রব্যাবিলিটির দিক থেকে দেখলে এই সময় পৃথার আচরণের দু-রকম সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম সম্ভাবনা হল সে ফোন কেটে দিতে পারে। দু-নম্বর হল গাঢ় গলায় বলতে পারে, 'মেয়েটিকে কেমন দেখতে? সুন্দরী?'

'মনে হচ্ছে সুন্দরী। গায়ের রং তোমার মতো খুব ফর্সা নয়, চাপার দিকে। নাকেও গোলমাল আছে। একটু টেপা মতো। জামাইবাবুর পছন্দ। আমারও মনে হচ্ছে চলে যাবে। থার্ড কাউকে দেখিয়ে নিতে চাইছি। প্লিজ, তুমি যদি একটু হেল্প কর পৃথা। প্লিজ।'

মনে মনে কথাটা ভেবে হেসে ফেলল সোমনাথ।

বনানী আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, ভাই হাসছে। খুশি হল সে। বিয়ের কথা শুনে হাসি একটা শুভলক্ষণ। এই সময়টা পুরুষমানুষ কারণ ছাড়াই হাসে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, মাথার গোলমাল হয়েছে। আসলে তা নয়। মাথায় বিয়ের কথা ঢুকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

'কী রে ফটো দেখবি?'

সোমনাথ এগিয়ে এসে দিদির সামনে দাঁড়াল। হেসে বলল, 'দেখতে পারি। কিন্তু একটা শর্ত আছে দিদি।'

বনানী চোখ সরু করে বলল, 'শর্ত! কীসের শর্ত?'

'আগে বল, না বলবি না।'

বনানী সন্দেহের গলায় বলল, 'ঠিক আছে বলব না।'

'অর্ককে নিয়ে আমি এখন আইসক্রিম খেতে যাব।'

boierpathshala.blogspot.com

বনানী আঁতকে উঠল, 'আইসক্রিম! ওর যে ঠান্ডা লাগার ধাত। ডাক্তার ধর বারণ করেছে।'

সোমনাথ গায়ে জামা পরতে পরতে বলল, 'করুক, তুই কিন্তু কথা দিয়েছিস।'

বনানী হতাশ গলায় বলল, 'ঠিক আছে।'

একটা নয়, পর পর দুটো আইসক্রিম খাচ্ছে অর্ক। প্রথমটা ছিল ভ্যানিলা কোন, এবার নিয়েছে একটা চকোলেট কাপ। মুখে, হাতে, গায়ে আইসক্রিম গলে গলে পড়ছে। তাতে অর্কর কেয়ার নেই। তার মুখ হাসি হাসি। মনে হচ্ছে, খাওয়া যে এত আনন্দদায়ক একটা ঘটনা অনেকদিন পর সে বুঝতে পারছে। সোমনাথেরও আনন্দ হচ্ছে। মায়ের জন্য বেচারির খাওয়ার প্রতি ঘেন্না তৈরি হয়ে গেছে। ছেলেটাকে ক-দিন এ-বাড়িতে রেখে দিতে পারলে ভালো হত। পকেটে মোবাইলটা বেজে উঠল। সোমনাথ মোবাইল বের করে দেখল, কমল মল্লিক। কাচের দরজা ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়াল সোমনাথ।

'মোমের সঙ্গে কথা হল সোমনাথ?'

'হয়েছে আবার হয়নিও।'

'সেটা আবার কী!'

'ফোন করেছিলাম, শ্যুটিং-এ ছিল। নাম বলায় চিনতে পারল না। বললাম না, ওই মেয়ে বিরাট গোলমেলে।'

কমল মল্লিক হেসে বললেন, 'গোলমেলে বলেই তো তোমাকে দায়িত্ব দিয়েছি সোমনাথ।'

'স্যার, অন্য কাউকে নেওয়া যায়?'

'না, যায় না। আজও আমার চ্যানেলের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওরা মোম চ্যাটার্জি ছাড়া নড়বে না। তুমি চেষ্টা কর।'

সোমনাথ হতাশ গলায় বলল, 'করব স্যার। কথা যখন দিয়েছি, চেষ্টা অবশ্যই করব।'

কমল মল্লিক এবার চাপা গলায় বলল, 'জমিয়ে একটা স্ক্রিপ্ট বানিয়ে ফেল। সেই স্ক্রিপ্ট দিয়ে মেয়েটাকে ঘাবড়ে দিতে হবে। সুপারহিট হওয়ার এলিমেন্ট থাকলে তোমার পিছনে পিছনে ছুটবে। এখন একবার ফোন ধরেনি, তখন হাজারবার ফোন ধরবে। গলা জড়িয়ে ধরে বলবে— চিনি, খুব চিনি।'

কথা শেষ করে কমল মল্লিক হাসতে লাগলেন।

চিন্তিত মনে ফোন ছেড়ে দিল সোমনাথ। শুধু তো মোম চ্যাটার্জিকে

পাকাড়ানো নয়, প্রোগ্রামের কনসেপ্টটাও মাথায় আসছে না। এ-কথা তো আর বস্‌কে বলা যায় না। এখন মনে হচ্ছে, অ্যাসাইনমেন্টটা নেওয়াটা ঠিক হয়নি। অর্ককে ডাকতে পার্লারের দরজা ঠেলল সোমনাথ। ঠেলেই থমকে দাঁড়াল।

কাচের দরজার গায়ে রঙিন ছবি। নীল সমুদ্র সৈকতে যে-তরুণীটি বসে আছে, তার ঝলমলে শরীরে জলের ফোঁটা চিকচিক করছে।

ভাগনেকে নিয়ে জোর পায়ে হাঁটতে শুরু করল সোমনাথ। বাড়ি ফিরে এখনই বসতে হবে। মনে হচ্ছে, স্ক্রিপ্টটা হয়ে গেছে।

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

উনিশ

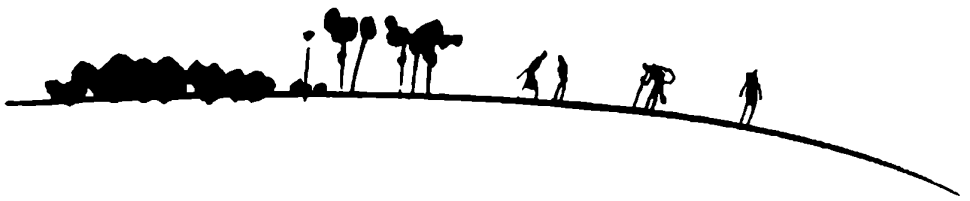

গোপীনাথ ফুলের প্যাকাটি হাতের নাড়ি টিপল। ফ্যাকাশে চোখ টেনে দেখল। তারপর বলল, 'নে, এবার জোরে অ্যা অ্যা কর। একেবারে গলা পজ্জন্ত দেখে নিই।'

ফুল জিভ বের করল, কিন্তু জোরে আওয়াজ করতে পারল না। সে দুর্বল। নাড়ি, চোখ, জিভের পর্যবেক্ষণ শেষ করে গোপীনাথ একটুখানি থম মেরে রইল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল 'মাথার কোনদিকটা ব্যথা করে?'

ফুল মুখে কিছু বলল না। হাত দিয়ে কপাল থেকে তালুর মাঝ বরাবর টেনে দেখাল। গোপীনাথ গোল চশমার ওপর দিয়ে বলল, 'পাশ দুটো করে না? এই ধর এই জায়গাগুলো?'

বলতে বলতে নিজের রগ দুটো দু-আঙুলে টিপে দেখাল গোপীনাথ। ফুল ঘাড় কাত করে বলল, 'করে, তবে সবসময় করে না।'

'এখন করছে?'

'না, এখন করছে না, কপালেও ব্যথা নাই।'

মালতী কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'সেদিন ডাক্তারবাবু মেয়েটা যন্তরনায় ছটফটাচ্ছিল। মাস্টার যে কীভাবে বাড়ি অবধি নিয়ে এল। একটা ভ্যানে তুলে... বাড়ি এসে মেয়ে বলে কপালে দড়ি বেঁধে দাও মা।'

কথা শেষ করে মালতী নাক টেনে চোখে আঁচল দিল। নিতাই পাশ থেকে বলল, 'আঃ থাম তো, আবার ফ্যাচফ্যাচানি শুরু করলে। গোপীদা তো দেখলে। মেয়েমানুষদের নিয়ে এই হয়েছে জ্বালা।'

মালতী চোখ মুছতে মুছতে সস্নেহে মেয়ের গায়ে হাত রাখল। ফুল বলল,

boierpathshala.blogspot.com

'মা কেঁদো না।'

গোপীনাথ হাত বাড়িয়ে কাচের বড়োসড়ো একটা বয়াম টেনে নিল। বয়ামে ঘোলাটে রঙের মিছরি। মুখ খুলে একটা মাঝারি টুকরো বের করে এগিয়ে ধরে বলল, 'নে ফুল, এটা মুখে ফেলে রাখ।'

গোপীনাথের এটাই নিয়ম। ছেলেপিলেরা অসুখ-বিসুখ দেখাতে এলে কিছু না কিছু হাতে দেবে। এক টুকরো মিছরি, খানকতক বাতাসা, না হলে আধমুঠো খই-গুড়ের মুড়কি। কেউ কেউ বলে, এটা ডাক্তারের রোগী টানার ফন্দি। জিজ্ঞেস করলে গোপীনাথ মিটিমিটি হাসে।

'কী করব বল ভায়া, মেডিকেল কলেজের সার্টিফিকেট তো গলায় নাই। কল-কসরত অনেকরকম করতে হয়।'

'তা একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করে নিলেই পার।'

'চেষ্টা তো করেছিলাম। লোকও ঠিক হয়েছিল। হারামজাদা বলেছিল, একেবারে বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙানোর ব্যবস্থা অবধি করে দেবে। বিহারের জিনিস। খরচা বেশি পড়বে। অনেক ভেবেচিন্তে পিছিয়ে এলাম।'

'কেন? পিছিয়ে এলে কেন?'

এই পর্যায়ে গোপীনাথ মুচকি হাসে। গলা নামিয়ে বলে, 'গাঁয়ের মানুষ পাশ করা ডাক্তারে ভয় পায়। ভাবে ধরবে আর পেট কাটবে। দরকার নেই আমার সার্টিফিকেট। বেশ আছি বাপু।'

ফুল এক ঢোঁক জল খেল, কিন্তু মিছরি প্রাণে ধরে মুখে ফেলতে পারল না। যত্ন করে হাতে ধরে রাখল। সেই যত্ন দেখলেই বোঝা যায়, পরে রসিয়ে রসিয়ে খাবে। স্বামীর ধমকে মালতী কান্না সামলেছে, কিন্তু কাঁদো কাঁদো গলা সামলাতে পারেনি। বলল, 'কী হবে গোপীদা?'

'কী আর হবে? ব্যথা তো এখন নাই।'

'আবার যদি হয়?'

'সে যখন হবে দেখা যাবে'খন। এখন দুটো ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। দিন সাত খাওয়াও। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।'

মালতী আঁচল দিয়ে ফের চোখের কোল মুছতে মুছতে বলল, 'আমার ভয় লাগে।'

গোপীনাথ বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলে, 'ভয়ের কিছু নাই। মনে হয় ওষুধে কাজ দেবে। তবে মেয়ের তোমার খাওয়া-খাদ্য চাই। হাবিজাবি খাওয়া খাদ্য নয়, ভালো খাওয়া-খাদ্য। দু-বেলা মুরগির ইস্টু দাও গো মেয়ের মা। রাতে

boierpathshala.blogspot.com

অল্প দুধ। পারলে ছানা কেটে দাও। ফল-ফলাদি চাই। ভালো খাওয়া খাদ্য শুরু না করলে কাঠির মতো শরীর জুত পাবে কেন?'

এই রাজবাদশার খাদ্যতালিকা শুনে মালতী ফের ফুঁপিয়ে উঠল। নিতাই বিরক্ত গলায় বলল, 'উফ আবার ফ্যাঁচাফ্যাঁচানি শুরু করে। মেয়ে নিয়ে তুমি এগো দেখি, আমি ওষুধ নিয়ে আসছি। যাও, যাও, বেলা হয়ে গেল।'

ফুলকে নিয়ে মালতী বেরিয়ে যাওয়ার পর গোপীনাথ খানকতক খদ্দের ছাড়ল। দোকান ফাঁকা হতে নিতাইকে হাতছানিতে কাছে ডাকল। তারপর এদিক-ওদিক দেখে নীচু গলায় বলল, 'সমস্যা আছে।'

'সমস্যা!'

'তোর মেয়ের শরীরগতিক বিশেষ ভালো ঠেকছে না নেতাই। এখনকার মতো ওষুধ দিচ্ছি বটে তবে এই মেয়ের আরও বড়ো চিকিচ্ছে চাই।'

নিতাই শুকনো মুখে বলল, 'বড়ো ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম তো। তোমার পরামর্শেই বানেরহাটে গেলাম।'

চশমা হাতে খুলে গোপীনাথ বলল, 'কী বললে?'

'বললে চিন্তার কিছু নাই। আমাদেরই ভুলভ্রান্তি হচ্ছে। ডাক্তার খুব বড়ো। সুদ্দশন রায়।'

'বড়ো ডাক্তার'-এর বিধান গোপীনাথের মনঃপূত হল না। গুড়ের টিন সরাতে সরাতে মাথা নাড়তে লাগল। তারপর বলল, 'বড়ো ডাক্তারের বড়ো বড়ো কথা। কিছু না হলেই মঙ্গল। আসলে কী জানিস নেতাই, ঝিলডাঙা আর সেই ঝিলডাঙা নাই। জায়গা ভালো নয়। রোজ রোজ আরও খারাপ হচ্ছে। দেখলি তো আমার দোকানের সামনে কেমন কাণ্ড করল।'

নিতাই গলা নামিয়ে বলল, 'জানি, সব ওই হারামি কাদুটার কাজ।'

গোপীনাথ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, 'শ্-শ্। আস্তে বল। মেয়েমানুষ নিয়ে হারামজাদা ছিনিমিনি শুরু করেছে। এই ছিনিমিনি বাড়বে। মেয়ে তোমার বড়ো হচ্ছে। পারলে ঘরবাড়ি বেচেবুচে অন্য কোথাও পালাও।'

নিতাই উদ্‌বিগ্ন মুখে বলল, 'কোতায় পালাব গোপীদা? ঘর বলতে তো ওই বাপ-ঠাকুরদার ভাঙা চালটুকু। জমিজিরেতও নাই। পরের খেতে কাজ করি। নইলে এটা সেটার ধান্দা লাগাই। লোকের ঘরদুয়ার মেরামতি করি। জানই তো সব। তার ওপর মেয়েটার অসুখ।'

গোপীনাথ কয়েকটা বড়ি কাগজে মুড়ে নিতাইয়ের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'ঠিক হয়ে যাবে। চিকিচ্ছের খরচাপাতি লাগলে আমায় বলিস। দ্যাখ, কেউ যেন

boierpathshala.blogspot.com

না জানে। এখন পালা দেখি। ফট করে কে দেখে ফেলবে। আজকাল বড়ো ভয়ে ভয়ে থাকি।'

গোপী ডাক্তারের লিস্ট অনুযায়ী খাবার না দিতে পারলেও মালতীর যত্নে ক-দিন পর ফুলের শরীর খানিকটা বল পেল। মাথার যন্ত্রণা হয়নি আর। জ্বরজারিও আসেনি। মালতী-নিতাই দুজনেই খানিকটা নিশ্চিন্ত।

নিতাই সেদিন ফটো-ভবার ওখানে বেশি করে মদ খেয়ে ফেলল। নিশ্চিন্তের বেশি খাওয়া। নেশায় পা টলছে। হাত টলছে। কিন্তু ফুরফুরে লাগছে।

হ্যারিকেনের ঝিম ধরা আলোয় মালতী বসেছিল গাদাগুচ্ছেরখানেক পুরোনো ছেঁড়া শাড়ি আর সূঁচ সুতো নিয়ে। কাঁথা বানানোর তোড়জোড়। নতুন মানুষ আসার এখনও দেরি আছে, কিন্তু আগে থেকে খানিকটা গুছিয়ে না রাখলে হবে না। মেয়েটা এখন একটু ভালো আছে, দু-দিন পরেই আবার কী হয় ঠিক নেই। একটা দুটো করে এগিয়ে থাকাই দরকার।

নিতাই ঘরে ঢুকে বলল, 'কী কর?'

গন্ধ পেয়ে নাক কোঁচকালো মালতী। মুখ না ঘুরিয়ে বলল, 'গিলে এসেছ?'

এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নিতাই হেসে বলল, 'ছেলের জন্য কাঁথা বানাও?'

'ছেলে হবে কে তোমায় বললে?'

নিতাই এবার কাছে সরে এসে বউয়ের পাশে মেঝেতেই বসে পড়ল। কাঁধে হাত রেখে হেসে বলল, 'আমি বললাম। মেয়ের পরে ছেলে। আমাদের বংশের এমনটাই নিয়ম।'

মালতী সোহাগের ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'রাখ তোমার বংশ। ভালো করে শ্বশুরবাড়িই দেখলুম না কোনোদিন, উনি আবার বংশ দেখান। কী আমার বংশ রে।'

নিতাই ঘন হয়ে এল। মালতীর কাঁধের ওপর থুতনি রেখে বলল, 'ওমা শ্বশুরের ভিটের ওপর বসে বলে কিনা শ্বশুরবাড়ি দেখলুম না! তুমি তো আচ্ছা অকিতজ্ঞ মালতী।'

মালতী কাঁধ ঝাঁকিয়ে স্বামীকে সরিয়ে দেওয়ার ভান করল। সামনে ছড়িয়ে থাকা শাড়ি, সুতো গোছাতে গোছাতে বলল, 'অকিতজ্ঞ তো অকিতজ্ঞ। এখন সর দেখি। রান্নাঘরে যাই। গিলতে তো হবে? শুধু মদ খেলে তো রাত কাটবে না।'

নিতাই বউকে আলতোভাবে টান দিল। মালতীর শাড়ির আঁচল খসে পড়ল

boierpathshala.blogspot.com

কাঁধ থেকে।

'কাটবে, একশোবার কাটবে। তবে এই মদ না, অন্য মদ।'

মালতী চাপা গলায় বলল, 'অ্যাই কী কর, মেয়ে আছে না?'

নিতাই গাল ধরে মালতীর মুখ নিজের দিকে ফেরাতে ফেরাতে গাঢ় গলায় বলল, 'ঘুমিয়ে গেছে কখন। এসো তো। কিচ্ছু হবে না।'

'যাঃ এখন নয়।'

মুখ ফেরাল মালতী। সংসার কম দিন হল না। দু-দুটো সন্তানের মা হতে চলল। তবু আজও স্বামীর আদর সোহাগে মাঝে মাঝে গা শিরশির করে ওঠে, লজ্জা লাগে। আর সেই কারণে ভালো লাগে। সরিয়ে দেওয়ার জন্য সে নিতাইয়ের বুকে ঠেলা দিল। নিতাই সরল না। মুখ বাড়িয়ে বউয়ের গালে ঠোঁট রেখে বলল, 'আমি শুধু ওপরে ওপরে...একটুখানি।'

এই দুনিয়ায় ভালোবাসার নিয়মকানুন বড়ো কঠিন। যিনি সেই নিয়ম বেঁধেছেন তিনি আরও কঠিন। তাঁর নিয়ম নিদারুণ অভাব, সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা, সংসারের চাপে বিন্দুমাত্র টলে না। হাজার দুঃখকষ্টের পরও দুটো শরীর জেগে ওঠে, হেসে ওঠে।

ঘুরে গিয়ে নিতাইয়ের কাঁধ জড়িয়ে ধরল মালতী। নিতাই বউয়ের বুকের মাঝখানটা ছুঁয়ে গলায় নাক, মুখ ঘষতে ঘষতে বলল, 'মেয়েটা কেমন আছে?'

আদর নেওয়ার জন্য মালতী মুখটা তুলল ওপরে। ঘরের চালার দিকে। ফিসফিস করে বলল, 'অ্যাই অমন করে না...বলতে নেই, দুটো দিন ভালো আছে। আজ বিকালে বলল, মা খিদে পেয়েছে।'

'বাঃ খিদে পাওয়া ভালো লক্ষণ। আমি তোমায় বলেছিলাম না, ওই বড়ো ডাক্তার যে-সে মানুষ নয়। বলেছিল তো সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কোলে-পড়া শাড়ির আঁচল সরাতে সরাতে মালতী বলল, 'তাও তুমি আরও একবার যাও।'

রাত হয়ে গেলে, গরমে ঘরে গায়ে জামা রাখে না মালতী। তার ওপর এই সময় বুক দুটো ভারী হয়ে আসছে। গলা থেকে সেই নগ্ন বুকে মুখ নামাল নিতাই। আলগোছে স্তনবৃন্তদুটোয় ঠোঁট ঘষতে লাগল। ভরা শরীরের স্বাদ, গন্ধই আলাদা।

'গোপীদাও এই কথা বলছিল।'

'কী বলছিল?' স্বামীর মাথার পিছনটা চেপে ধরে বুকের মাঝখানে। আদর নিতে নিতে বলল মালতী।

boierpathshala.blogspot.com

নিতাই জড়ানো গলায় বলল, 'বলছিল, আর একবার দেখিয়ে নিয়ে আয় নেতাই।'

'অ্যাই কী কর? কর কী? লাগে না বুঝি? উফ এই বুড়ো বয়েসে কী যে কর।'

মালতীর গলায় আশকারা। নিজেই স্বামীর হাতটা টেনে নগ্ন বুকের ওপর বোলাচ্ছে।

নিতাই বলল, 'ছাড়ব না।'

'ইস, মদের গন্ধ।'

'একটা কথা ভেবে রেখেছি মালতী?'

'কী?'

হাত বাড়িয়ে হ্যারিকেনের আলো কমাল মালতী। মানুষটাকে নিয়ে এই বিপদ। যখন চাইবে এমন করবে যে কোনোদিকে জ্ঞানগম্যি থাকবে না। মেয়েটা যদি ঘুম ভেঙে উঠে পড়ে?

'ঠিক করেছি, ফুলের যদি ফের কিছু হয়, সোজা বানেরহাটে নিয়ে যাব।'

'তাই ভালো। তবে মনে হয় ভগবানের কৃপায়..।'

মেঝেতে শুয়ে পড়ল মালতী। ঘাম আর মদের গন্ধ মাখা নিতাইকে সরিয়ে কোমরের কাপড় আলগা করল। শায়ার দড়ি খুলল। তারপর নিতাইয়ের জামা খুলতে খুলতে বলতে, 'আমি তো পুজো দিয়েছি।'

'বেশি করে দিয়েছ তো?'

'গরিব বাপের মেয়ে, তার আবার বেশি পুজো কী? সেদিন দশ টাকা দিয়ে এলাম।'

মালতীকে পাশ ফেরাতে ফেরাতে নিতাই বলল, 'তাও আর একবার বেশি করে দিয়ে আসবে। এই ধর শ-খানেক টাকা।'

শাড়ি, শায়া সরিয়ে মালতীতে উন্মুক্ত করেছে নিতাই। পেট বড়ো হয়েছে। সেই পেটে মুখ দিল যত্নে। মালতী গোড়া থেকেই দেখেছে, তার স্বামী মানুষটা যতই গাঁইয়া ভূত হোক না কেন বউকে সোহাগের সময় যত্ন করে। ব্যথা কষ্ট দেয় না। যেটুকু দেয় সেটাও আরামের। গ্রামের মেয়েবউদের মুখে কতরকম শোনে। শুনে শিউরে ওঠে। খগেন বউকে আগে কাপড় খুলে উবু করে বসিয়ে রাখে, তারপর—ইস মাগো। মানুষ না পিশাচ? ঘোষপাড়ার দুগ্গার অবস্থা আরও খারাপ। রাতদুপুরে এমন ভাবে শরীরের ওপর চেপে বসে যে দমবন্ধ হয়ে আসে মেয়েটার। সেই তুলনায় তার স্বামী অন্যরকম। অনেক ভালো।

নিতাইয়ের কোমর দু-হাতে ধরে নিজের পেট থেকে সাবধানে সরাল

boierpathshala.blogspot.com

মালতী, তারপর এগিয়ে ধরল নিজেকে। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'অ্যাই সাবধানে কিন্তু। একদম জোর করবে না। দেখবে লাগে না যেন। পেটেরটা ব্যথা পাবে। হি হি।'

ভালোবাসার যন্ত্রণায় জীবনের বাকি যন্ত্রণাগুলো অল্প সময়ের জন্য হলেও ভুলে গেল মালতী। চাপা গোঙানি নিয়ে ভেসে গেল। সঙ্গমের তৃপ্তি শেষে উদোম শরীরের ওপর কাপড় টেনে ধরে যখন উঠে দাঁড়াল সে তখন নিতাইয়ের চোখ বোজা। জড়ানো গলায় বলল, 'রাতে খাব না।'

মালতী ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'মরণ। লুঙ্গিটা টেনে নেবে তো।'

পরদিনই ঘটনা ঘটল অন্যরকম।

দুপুরে ফুল দাওয়ায় মাদুর পেতে বসেছিল। সামনে খাতা বই খোলা। আবার ক-দিন স্কুল কামাই গেল। উপায় নেই অতটা পথ যেতে হবে। তার বাবার সাইকেলও নেই যে পৌঁছে দেবে। এখনই এই শরীরে অতটা হাঁটা ফুলের জন্য কঠিন। তবে মনে হচ্ছে কাল পরশু থেকে পারবে। খুঁটিয়া মাস্টার দু-দিন খোঁজ নিয়ে গেছে। মেয়ের বাপ মাকে বলে গেছে, শরীরে পুরোপুরি বল না পাওয়া পর্যন্ত স্কুলে পাঠানোর দরকার নেই। তেমন প্রয়োজন হলে তিনি নিজে বাড়ি এসে ফুলকে পড়া দেখিয়ে দেবেন। তবে তা আর লাগবে না মনে হয়।

মালতী উঠোন থেকে মেলা কাপড় তুলে এনে মেয়েকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

ফুল মাদুর থেকে সরে উবু হয়ে বসে আছে দরজার কোণটায়। দুটো হাত মেঝেতে। মাথা ঝুঁকিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখছে। কী দেখছে? মেয়েটার মাথায় ক-দিন তেল পড়েনি। উশকোখুশকো চুল ঝুলে পড়েছে মুখের একপাশে। বেশি ঝুঁকে পড়বার কারণে সেই চুলের কিছুটা মাটিতেও ঠেকছে।

দাওয়ায় ওঠার সিঁড়িতে পা রেখে চেঁচিয়ে ওঠে মালতী। বলল, 'অ্যাই ফুল করিস কী? মাটিতে গড়াগড়ি দিস কেন? ইস দ্যাখো কাণ্ড! মেঝের ঠান্ডাটা কেমন গায়ে লাগায় দ্যাখো।'

ফুল তাকায় না। নড়েও না। ঘাড় নীচু করে স্থির হয়ে থাকে ছবির মতো।

মালতীর বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। সে আবার চিৎকার করে, 'কী হল কথা কানে যায় না? ওঠ, ওঠ বলছি। মার খাবি কিন্তু ফুল। খুব মার খাবি।'

ফুল মুখ তোলে। মায়ের দিকে তাকায় ঘাড় ঘুরিয়ে। ঠোঁটে হাত দিয়ে বলে, 'আস্তে।'

boierpathshala.blogspot.com

ফুলের চোখের পাতাদুটো কাঁপছে তিরতির করে। কপালে ঘামের বিন্দু।

হাতের শুকনো কাপড়-চোপড় দাওয়ায় ফেলে মালতী দ্রুত এগিয়ে আসে। মেয়ের মাথা হাত দিয়ে সরিয়ে নিজেও ঝুঁকে পড়ে মেঝের দিকে। কী দেখে? মেয়ে কী দেখে?

কিছুই নয়। সামান্য পিঁপড়ে! একদল কালো পিঁপড়ে। তারা উঠোন টপকে, মাটির দাওয়া পার হয়ে ঘরে ঢুকছে।

মালতী অবাক হয়, এত উৎসাহ নিয়ে পিঁপড়ে দেখার কী আছে? এ আবার নতুন কোন খেলা মেয়েটার! সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। চোখ পাকিয়ে বলে, 'পিঁপড়ার সঙ্গে কী করিস? কী করিস পিঁপড়ার সঙ্গে? ঝড়জল ছেড়ে এখন কি পিঁপড়া নিয়ে খেলা শুরু করিস?'

ফুল মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাশে হাসে। বলে, 'খেলি কই? কথা শুনি তো মা। পিঁপড়ার কথা শুনি।'

মালতী চমকে ওঠে। শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে ঠান্ডা স্রোত উঠে আসে তার। মেয়ে কি তার সঙ্গে ফাজলামি করে? তামাশা? নিজেকে সামলে বলে, 'কথা শুনিস! ওরা কী বলে?'

ফুল হাসে। গরিবের ঘরে মেয়েদের দাঁত হয় কালাকুলো। এই মেয়ের দাঁত সুন্দর। সাদা আর সারি দেওয়া। ধারে ঝক্‌ঝক্ করে, আলো পড়ে ঝলসে ওঠে। মাঝেমধ্যে মালতীর অবাক লাগে এত সুন্দর দাঁত মেয়েটা পেল কোথা থেকে? কই তার বা নিতাইয়ের তো নেই!

'মা, ওরা বলে, পালাও পালাও, পালায়ে যাও।'

মালতীর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মেয়ের দিকে। আবার? আবার সেই গোলমাল? সেই পাগলামি?

ফুল ঘাড় কাত করে আঙুল তুলে বাইরে দেখায়। তারপর যেন খানিকটা ঘোরের মধ্যেই বিড়বিড় করে।

'ওই যে গাছটা দেখছ না? ওই যে বেড়ার ওপাশে। গেটের ঠিক সামনে গো। গাছটা এবার ভেঙে পড়বে। গুঁড়িটা ফোঁপরা মেরে গেছে...তাই গাছ ছেড়ে ওরা সবাই পালায়...। দ্যাখো দ্যাখো কেমন ছোটে। ঘরে ঢুকে আসে।'

মালতী বাকিটুকু শোনে না। শুনতে চায় না। চুলের মুঠি ধরে মেয়েকে টেনে তোলে। চিৎকার দিয়ে ওঠে, 'পিঁপড়ার সঙ্গে কথা বলা তোমার বের করছি হারামজাদি। পাগলামি হচ্ছে? পাগলামি? পাগলামি কেমন করে সারাতে হয় আমার জানা আছে।'

boierpathshala.blogspot.com

মেয়ের চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে থাকে মালতী, গায়ে পিঠে মাথায় মারতে থাকে এলোপাথাড়ি। পাগলের মতো। মারতে মারতে হাঁপাতে থাকে সে। কাঁপতে থাকে।

'বল, বল আর এসব ছাইভস্ম বলবি? বলবি আর কখনও? বলবি জল হবে, আগুন হবে? বল বল। বলবি কখনও গাছ পড়ার কথা?'

মারের প্রথম ধাক্কাটা ফুল সম্ভবত বুঝতে পারে না। এটা মারই তো? এমন অনেকসময় হয়, কারণ জানা না থাকলে ব্যথা বুঝতে সময় লাগে। এই মেয়েরও লাগল। সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় মায়ের দিকে। তারপর হতচকিত হয়ে পড়ে। রোগা রোগা হাত দিয়ে মাকে থামাতে চেষ্টা করে ব্যথা ও দুঃখে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

'মা, মারো কেন? কেন মারো মা?'

'কেন মারি বুঝিস না শয়তানি?। বুঝিস না তুই?'

ফুল ফোঁপাচ্ছে। তার শীর্ণ, দুর্বল শরীর এই অকস্মাৎ আঘাতে কাঁপছে থর থর করে। সে মাথা নামিয়ে, শরীর ভেঙেচুরে বেঁকিয়ে মার বাঁচাতে চেষ্টা করে। পারে না। মালতী চুল ধরে টান মারে। কিল চড় মারতে থাকে পিঠে।

'তোকে মারব, পেটেরটাকেও মেরে ফেলব। কী হবে রেখে? একটা পিঁপড়ার মতো ঝড়জলের খবর পায়, পেটের শয়তানটা না জানি আর কোন পোকামাকড়ের বিদ্যে নিয়ে জন্মাবে।'

ফুল ফুঁপিয়ে ওঠে। মাকে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, 'আমি মিত্যে বলেছি মা, আমি মিত্যা বলেছি। পিঁপড়ার কথা আমি বুঝি না। আর ও-কথা বলব না। বলব না আর মাগো। মেরো না, মেরো না আর, তোমার পায়ে পড়ি।'

সন্ধের ঠিক মুখে মুখে দরমা বেড়ার ওপাশে দীর্ঘদিনের কাঁঠালচাঁপা গাছটা গুঁড়ি থেকে ভেঙে, মুখ থুবড়ে পড়ল রাস্তার ওপর। এতখানি ঝাঁপসা একটা গাছ পড়লে আওয়াজ যতটা হওয়ার কথা ততটা হল না। তবে সদ্য-ঘরে-ফেরা পাখির দল উড়ে গেল ডানা ঝাপটিয়ে।

দাওয়ায় মেয়ের পাশে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখল মালতী। তারপর মেয়েকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল।

এ কী অলুক্ষুনে কাণ্ড শুরু হয়েছে তাদের ঘিরে!

boierpathshala.blogspot.com

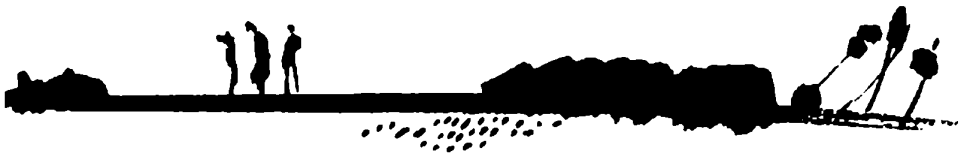

কথাকলি পুরোপুরি চোখ তুলে বাবার দিকে তাকাতে পারে। কিন্তু সে তা করছে না। সে তাকাচ্ছে আড়চোখে।

এ-ঘরে আসার কারণে কথাকলি আয়নায় দেখেছে তার চোখের তলাগুলো ফুলে আছে। চোখ ফুলে থাকলে কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু ফুলে থাকার কারণ ধরা পড়লে অসুবিধে। সে যে কালও অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিল, সেটা ধরা পড়ে যাবে। সামনের চেয়ারে বসা মানুষটা শুধু ডাক্তার হলে চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু মানুষটা যে শুধু ডাক্তার নয়, তার বাবাও। ডাক্তার পারে না, কিন্তু বাবা মুখ দেখে মেয়ের সব খবর জানতে পেরে যায়।

এই কারণেই কথাকলি সুদর্শন রায়ের দিকে পুরো মুখ তুলে তাকাতে পারছে না। কিন্তু তাকাতে তাকে হবে। চোখ নামিয়ে ঝগড়া করা যায় না। কথাকলি সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজ সে তার বাবার সঙ্গে ঝগড়া করবে। ঝগড়া নয়, একতরফা বকাবকি করবে। গম্ভীর গলায় বলল, 'বাবা, তুমি নাকি ঠিক করেছ আবার বানেরহাটে যাবে?'

সুদর্শন রায় বসে আছেন তাঁর হেলানো চেয়ারে। চেয়ার শুধু হেলানো নয়, অল্প অল্প দোলানোও যায়। তিনি অবশ্য চেয়ার দোলাচ্ছেন না। তাঁর গায়ে একটা পাতলা চাদর। হাতে একটা বই। তিনি আগ্রহ সহকারে বই পড়ছেন। কথাকলি বইয়ের নাম দেখতে পাচ্ছে না। খবরের কাগজের মলাট দেওয়া। মলাটে সানিয়া মির্জার ছবি। ছবিটা আড়াআড়িভাবে পড়েছে। মনে হচ্ছে, সানিয়া হাতে টেনিস র‍্যাকেট নিয়ে শুয়ে আছে। বই পড়ার কারণে সুদর্শন রায় মেয়ের কথা শুনতে পেলেন না।

boierpathshala.blogspot.com

কথাকলি সামান্য গলা তুলে বলল, 'কী হল বাবা? চুপ করে আছ কেন?'

ডাক্তার রায় এবারও চুপ করে রইলেন। কথাকলির রাগ বাড়ল।তার মনে হচ্ছে, এটা আসলে মানুষটার চালাকি। ঠিকই কথা শুনছে, কিন্তু কী উত্তর দেবে বুঝতে পারছে না। দু-দিন আগেই যে কথা দিয়েছিল, বানেরহাটের ক্লিনিকে আর যাবে না, সে-ই যদি হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত বদল করে তাহলে তার চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় কী? সবে জ্বর থেকে উঠেছে। এই শরীরে যদি ফের অতদূর যাতায়াত শুরু করে তাহলে এবার যে কঠিন অসুখে পড়তে হবে তা কি বুড়ো মানুষটা বুঝতে পারছে না?

কথাকলির ইচ্ছে করল উঠে গিয়ে বাবার হাত থেকে বইটা টেনে নেয়। তারপর জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে নীচে ফেলে দেয়।

'বাবা।'

ডাক্তার রায় এবার সাড়া দিলেন। মুখ তুলে সুন্দর হেসে বললেন, 'বল। এক কাপ কফি দিবি মা?'

কথাকলি এবার রাগি গলায় বলল, 'না, দেব না।'

ডাক্তার রায় মেয়ের দিকে হাত তুলে অনুরোধের ঢঙে বললেন, 'বেশি নয়, এই একটুখানি। হাফ কাপ।'

'হাফ, ফুল কিছুই হবে না। বাবা, তুমি কি সত্যিই আবার বানেরহাট যাচ্ছ?'

'তোকে কে বলল?' ঠোঁটের কোণায় হাসি নিয়ে বললেন সুদর্শন রায়।

'যে-ই বলুক। কথাটা সত্যি কিনা বল।'

কথাকলি কঠিন গলাতে যেন কৈফিয়ত চাইল। সে ঠিকই করে এসেছে, আজ কঠিন হবে। মা মারা যাওয়ার পর থেকে এই মানুষটা কঠিন শাসন পায়নি বলেই এতখানি বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।

'নিশ্চয় সুমঙ্গলা এনজিও থেকে রঞ্জন ফোন করেছিল। তাই না কলি?'

কথাকলি চুপ করে রইল। ঘটনা তাই। ডাক্তার রায় অস্বস্তি ভরা গলায় বলল, 'এই রে, একেবারে ধরবি তো ধর তুই-ই ফোনটা ধরলি?'

'তুমি বাথরুমে ছিলে।'

'ঠিক আছে। তা বলে রঞ্জন তোকে খবরটা ফাঁস করে দেবে? হা হা।'

বানানো হাসি দিয়ে মেয়েকে সামাল দিতে চেষ্টা করলেন সুদর্শনবাবু। কাজ মোটেও হল না। কথাকলি গলা আরও থমথমে করে বলল, 'এটা হাসির কোনো বিষয় নয় বাবা। রঞ্জনকাকাকে কাল রাতে তুমি নিজে ফোন করেছিলে।

boierpathshala.blogspot.com

রঞ্জনকাকা তোমায় বলেছিল, বানেরহাটের ক্লিনিকে তোমায় আর যেতে হবে না। একজন অলটারনেটিভ সাইকিয়াট্রিস্টের ব্যবস্থা তারা করে ফেলেছে। তিনিই এবার থেকে দেখবেন। তুমি তখন বলেছ, তুমি নাকি আরও কিছুদিন ওখানে যেতে চাও। ওরা তার পরেও আপত্তি করে। বলে, তোমার শরীরে ধকল হচ্ছে, অনেকদিন টেনেছ, আর দরকার নেই। তুমি তখন জোর করেছ। এই ঘটনা কি সত্যি?'

সুদর্শন রায় মুচকি হেসে বললেন, 'বাপ রে, বকুনির চোটে কেঁদে না ফেলি। না, ঘটনা পুরো সত্যি নয় কলি। আমি বানেরহাটে আরও কয়েকদিন যেতে চেয়েছি ঠিকই, তবে পাকাপাকি নয়। চেয়েছি একটা বিশেষ কারণে। সেই বিশেষ কারণটার সমাধান হয়ে গেলেই আমার সেখানে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন থাকবে না।'

'বিশেষ কারণটা আমি জানি।'

'জানিস তো, বকাঝকা শুরু করেছিস কেন?'

ডাক্তার রায় হাতের বই ভাঁজ করে কোলের ওপর রাখলেন। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। আকাশে ঝকঝক করছে রোদ। এই রোদ দেখলে কে বলবে কাল রাতে অমন দুর্যোগ হয়ে গেছে। প্রকৃতির এটাই মজা। নিজেকে দুম করে বদলে ফেলতে জানে।

সুদর্শন রায় মুখ ফিরিয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন।

'তোর চোখমুখের এই অবস্থা কেন কলি? এনিথিং রং? শরীর-টরীর খারাপ নাকি? রাতে ঘুম হয়নি?'

কথাকলি তাড়াতাড়ি চোখ নামাল। বলল, 'অমন একনাগাড়ে বৃষ্টি পড়লে ঘুমের ডিস্টার্ব হবে না? সঙ্গে বাজ পড়ছিল। আমি তো ভেবেছিলাম, বৃষ্টি থামবেই না। যাক ওসব বাদ দাও, তুমি আমার কথা বলে আলোচনার আসল জায়গাটা থেকে সরে যেতে চাইছ। বিশেষ কারণ হোক, আর যাই হোক শরীরের এই অবস্থা নিয়ে অতদূর যাওয়াটা যে তোমার ঠিক নয়, সেটা কি তুমি জানো না বাবা? নাকি জানার পরও যাচ্ছ?'

মেয়ের চোখমুখ ফোলার কারণ শুনে মনে হল না ডাক্তার রায় সন্তুষ্ট হলেন। তিনি অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, 'না গিয়ে আমার উপায় নেই কলি। আমাকে যেতেই হবে। সেরকম হলে আমি আজই যেতাম।'

কথাকলি চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'আজই যেতে! বাবা, কিছু মনে কোরো না, আমার মনে হয় মানসিক রোগের চিকিৎসা করতে করতে তোমার

boierpathshala.blogspot.com

নিজেরই কোনো সমস্যা হচ্ছে। কাল ওরকম ঝড় বৃষ্টি হল। পথের কী অবস্থা হয়েছে বুঝতে পারছ না? নিশ্চয় ট্রেনের তার টার ছিঁড়ে গেছে। গাড়ি নিয়ে গেলেও সমস্যা। জল কাদা, গর্ত।'

ডাক্তার রায় নিজের মনে মনেই যেন বললেন, 'ঝড়বৃষ্টি হল বলেই আরও যেতে হবে রে কলি। কাল পর্যন্ত চিন্তায় ছিলাম।'

কথাকলি অবাক হয়ে বলল, 'কী নিয়ে চিন্তা? ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে না বলে?'

'ঠিক বলেছিস। গোপালের মা দেশে যাওয়ার আগে বলে গেল, বৃষ্টি আসছে। খুব বৃষ্টি আসছে। কিন্তু কোথায় বৃষ্টি! রোজই নজর রাখি। দেখি, আকাশ একেবারে ফটফটে নীল! শুনলে তুই হাসবি, রাতে ঘুম ভেঙে উঠে আমি মেঘের সন্ধানে ছাদে পর্যন্ত গেছি। দেখেছি, আকাশে মেঘ জমল কিনা।'

কথাকলি গম্ভীর গলায় বলল, 'এখন বুঝতে পারছি, আবার কেন তোমার জ্বর এল। এক তো বানেরহাটে সেদিন যাওয়াটাই অন্যায় হয়েছে। তার ওপর আজকাল মাঝরাতে তুমি খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশের মেঘ দেখা শুরু করেছ। বাবা, আমি জানি কেন তুমি এসব শুরু করেছ। ওই ফুল না পাতা নামের মেয়েটার জন্য তো? তুমি কি মনে করছ না একজন পেশেন্টের জন্য এটা অতিরিক্ত রকম বাড়াবাড়ি হচ্ছে? গ্রামের সকলেই ছোটোখাটো ঝড় বৃষ্টির কথা আগাম বলতে পারে। চাষিরা তো আকাশের দিকে তাকিয়েই বলে দেয় শুনেছি। আমরাও বলি। আমরা যারা শহরে থাকি তারাও প্যাচপ্যাচে গরম দেখে বুঝতে পারি বিকেলে বৃষ্টি হবে। পারি না?'

জ্বর থাকার কারণে দু-দিন দাড়ি কাটা হয়নি। গালে অল্প সাদা দাড়ি ডাক্তার রায়ের। মুখের সৌম্য ভাবটা আরও ফুটে বেরিয়েছে। তিনি থুতনিতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'ওইটুকু একটা মেয়ের পক্ষে এটাও অসম্ভব। এর জন্য অভিজ্ঞতা দরকার। তাও যদি তর্কের খাতিরে মেনে নিই, শুধু ঝড়-বৃষ্টি হলে একটা কথা ছিল। কিন্তু আগুন?'

'আগুন! কই তুমি তো আমাকে আগুনের গল্পটা বলোনি।' কথাকলির গলায় বিস্ময়।

ডাক্তার রায় শান্ত গলায় বললেন, 'কাল যদি বৃষ্টিটা না হত তাহলে আমি ওই মেয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য এভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠতাম না। প্রথমে যা ভেবেছিলাম সেটাই ধরে রাখতাম। ভাবতাম, ওর বাবা-মায়ের মানসিক গোলমাল। মেয়েকে নিয়ে বেশিমাত্রায় কনসার্ন।'

ঘটনার মধ্যে কথাকলি নিজেও যেন ঢুকে পড়ছে। সে বলল, 'তুমি যেদিন

boierpathshala.blogspot.com

গল্পটা প্রথম আমাকে বল সেটা তো অন্যরকম ছিল।'

'সত্যি কথা বলতে কী প্রথম যখন আমি ব্যাপারটা শুনি তখন আমার মনে হয়, মেয়েটার কোনো সমস্যাই নেই। সমস্যা ওর গার্জেনের। এখন আমার মনে হচ্ছে, ওটা ভুল হয়েছে। ভুল ডায়াগনোসিস। ফার্স্ট রিঅ্যাকশনে আমি বিভ্রান্ত হয়েছি। ভেবেছি, ছেলেমানুষ কখন কী বলছে ঠিক নেই। কোইন্সিডেন্সের মতো মিলে গেলে বাবা-মা ভাবছে, আরে! মেয়ে আগেই কথাটা বলেছিল না? আসলে গ্রামের লোকের মনের মধ্যে নানারকম কুসংস্কার থাকে। ছোটো বিষয়কে বড়ো করে দেখে। আবার বড়ো জিনিসকে গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু পরে কেসটা আমার মাথার ভেতরে যত ঘুরতে থাকে তত সন্দেহ বাড়ে। কেসটার আরও কতগুলো দিক আছে। কই মেয়েটা তো অন্য কিছুর কথা বলছে না? শুধু বিপদের কথা বলছে কেন? বইয়ের ভাষায় প্রাকৃতির বিপর্যয়ের কথা। জলে ভাসবে, ঝড়ে ভাঙবে, আগুনে পুড়ে যাবে—এইসব আশঙ্কা, ভয়। কথাটা মাথায় আসতেই খটকা শুরু হয়। কেন এরকম বলে? কেন ভয় দেখায়? কাকে ভয় দেখায়? বাবা, মাকে? নাকি সবাইকে?'

কথাকলি সামনের সোফায় বসে পড়েছে। বলে, 'ওইটুকু মেয়ে কি আর অতকিছু ভেবেচিন্তে বলছে? হয়তো ভয়ই দেখাচ্ছে।'

সুদর্শন রায় ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ভয় দেখানোটা যে একটা বিরাট ব্যাপার এরকম বলতে চাইছি না। কোনো কোনো মনোরোগের এটাও একটা লক্ষণ। কিন্তু ঘটনা পরপর সাজানোর পর একসময় আমার মনে হতে থাকল, ফুল নামের মেয়েটা হয়তো বিশেষ কোনো ধরনের স্কিৎজোফ্রেনিয়ায় ভুগছে। সঙ্গে পারসোনালিটি ডিসঅর্ডার। এই যে মেয়েটা ওয়েদার ফোরকাস্ট করে সেটা আসলে ফোরকাস্ট নয়। মনের-ভেতরে-ঘটা একধরনের পারস্পরিক অন্তঃক্রিয়া আর বিপন্নতার প্রকাশ মাত্র। এটা আবহাওয়ার কথা না হয়ে অন্যকিছুও হতে পারত।'

'বাপ রে, সেটা আবার কীরকম?'

সুদর্শন রায় চেয়ারে হেলান দিলেন।

'ও বিপদ বলতে ঝড়বৃষ্টি জানে তাই ঝড় বৃষ্টি বলছে। যদি নিউক্লিয়ার ওয়্যার জানত তাই বলত। ছেলেমেয়েরা আন্‌অ্যাটেনডেট্ হলে এরকম হতে পারে। ভাবনার একটা পর্যায়ে এসে আমার মনে হয় অসুখ বোধহয় তাই, অতি সামান্য। বৃষ্টি হবে, ঝড় হবে, আগুন লাগবে কথাগুলো শুধুমাত্র কথার কথা। গার্জেনদের অ্যাটেনশন পাওয়ার চেষ্টা। আর সেই চেষ্টাই একসময় অসুখে এসে

boierpathshala.blogspot.com

দাঁড়িয়েছে। মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে হবে। কথা বলতে হবে মেয়ের মায়ের সঙ্গে। শি ইজ প্রেগন্যান্ট।'

'তাতে কী হয়েছে? মায়ের বাচ্চা হওয়ার সঙ্গে মেয়ের অসুখের কী সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক অবশ্যই আছে। শরীরে নেই, মনে আছে। হয়তো যে-শিশুটি আসছে তার জন্য ফুলের মা অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন হয়ে পড়েছে। ফার্স্ট চাইল্ডের ওপর আগের মতো আর অতটা নজর রাখতে পারছে না। দুজনের মাঝখানে হঠাৎ একটা স্পেস তৈরি হয়ে গেছে।'

ডাক্তার রায় থামলেন। মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু এখানেই আমি আমার ইনভেস্টিগেশন থামাই নি। বলা ভালো আমি থামলেও আমার মন থামেনি। এরপরেও আমি আর একটা কাজ করি। আরও একটু এগিয়ে যাই।'

কথাকলি ভুরু কুঁচকে বলে, 'কী কাজ?'

'আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, সত্যি কি যন্ত্র ছাড়া প্রকৃতির বিপর্যয় আগে থেকে আঁচ করা সম্ভব? সাধারণ কৌতূহলেই কথাটা আমার জানতে ইচ্ছে করে। মানুষ যে পারে না জানি, কিন্তু অন্য কেউ? অন্য কোনো প্রাণী কি পারে? ভয়ংকর কোনো বিপদের কথা আগাম জানতে পারে? তার শরীরের মধ্যে এমন কোন রসায়ন কি আছে যা প্রকৃতির সংকেত বুঝতে সক্ষম? আমি খোঁজ শুরু করি। বেশ কয়েকটা জায়গায় মেল পাঠাই।'

কথাকলি নড়ে-চড়ে বসে। এই কারণেই বাবাকে নিয়ে তার এত গর্ব হয়। মানুষটা শুধু সাধারণ একজন ডাক্তার নয়, তার থেকেও অনেক বেশি। এমন ভাবে সমস্যার গভীরে ডুব দিতে ক-জন পারে? কিন্তু সমস্যার ভেতরে তার ঢুকলে চলবে না। বরং বাবাকে বের করে আনতে হবে। বাড়ি বসে যা খুশি করুক। কিন্তু এই দুর্বল শরীর নিয়ে কলকাতার বাইরে যেতে দেওয়া যাবে না।

সুদর্শন রায় বলে যেতে থাকেন। যেন নিজেই নিজেকে ঝালিয়ে নিচ্ছেন।

'কলি, সবাই যে আমার মেলের উত্তর দেয় তা নয়। উইটওয়াটার স্ট্যান্ড ইউনিভার্সিটি যে-উত্তরটা আমাকে পাঠায় সেখানে ভূমিকম্পের কথা আছে। কিছু কিছু পশুপাখি আছে যারা ভূমিকম্পের বিপদ আগেই আঁচ করতে পারে। কী করে পারে তার ব্যাখ্যা নেই, কিন্তু পারে। কিন্তু কেউই ঝড়বৃষ্টি বা আগুন নিয়ে আমাকে নির্দিষ্টভাবে কিছু জানাতে পারল না। হঠাৎ সেদিন গোপালের মা বলল...।'

boierpathshala.blogspot.com

কথাকলি বাবাকে থামিয়ে দিল। আবার রাগী গলা ফিরিয়ে এনে বলল, 'আমি জানি গোপালের মা কী বলল। তুমি আমাকে বলেছ। ক-টা পিঁপড়ে দেখে বলল, বৃষ্টি হবে, ঝড় হবে। আর অমনি তুমি রাত জেগে আকাশে মেঘ খুঁজতে শুরু করে দিলে। তাই তো? বাবা, তুমি বরং একটা কাজ কর, আলিপুর ওয়েদার অফিসের ডিরেক্টরকে একটা চিঠি লেখ। সাজেশন দাও এবার থেকে তারা যেন স্যাটেলাইট, রাডার, কম্পিউটার ফেলে দিয়ে কয়েকটা ডেঁয়ো পিঁপড়ে পোষে। অশিক্ষিত একজন রান্নার মাসির কথায় তুমি কীভাবে এতটা নেচে উঠলে আমি ভাবতেও পারছি না। গতকালের ঝড়বৃষ্টিটা যে হঠাৎ তৈরি হওয়া একটা থান্ডার-স্টর্ম সেটা তো আজ খবরের কাগজে লিখেছে। নতুন কিছু নয়, এরকম তো হয়। প্রতি বছরই সময়ের আগে একটা দুটো কালবৈশাখী হয়েছে। কলকাতায় গাছ পড়েছে, জল জমেছে, ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়েছে। আগে থেকে এগুলো বোঝা যায় না। হঠাৎ মেঘ জমে।'

'তাহলে পিঁপড়েরা বুঝল কী করে?'

প্রশ্নটা করে মুচকি হাসলেন ডাক্তার রায়। কথাকলি উঠে দাঁড়াল। অনেক হয়েছে। সে চোখ কুঁচকে বাবার দিকে তাকাল।

'তুমি কি বলছ ঝিলডাঙার ফুল নামের মেয়েটার মধ্যে পিঁপড়েদের ক্ষমতা আছে?'

'না তা বলছি না। বরং উলটোটাই বলছি। বলছি নেই। মানুষ পোকামাকড় নয়। পোকামাকড়ের গুণ দোষ কোনোটাই তার শরীরে বা মনে থাকতে পারে না। আর সেটা কনফার্ম করতেই আমাকে ওই মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি। তুই আমাকে আটকাস না•কলি। আটকালে একটা ছোটো মেয়ের অনেক বড়ো ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তুই ভাবিস না, গঙ্গা আছে।'

ডাক্তার রায় থামলেন। একটু হাসলেন। বললেন, 'এবার একটু কফি হবে নাকি মা? গোপালের মা কি আজও ফেরেনি?'

কথাকলি বলল, 'কী করে বলব? আমি জানি না। পিঁপড়েরা জানে হয়তো। ঝড়বৃষ্টির ভয় দেখিয়ে দু-দিন বাড়তি ছুটি হয়ে গেলে অসুবিধে কী? যাই হোক, আমি তোমাকে কফি করে দিচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো, এখনই তোমার বানেরহাটে যাওয়া চলবে না। ক-টা দিন পরে যদি শরীর একেবারে ফিট হয় তখন ভাবব।'

কথাকলি ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

'কিছু বলবি?'

boierpathshala.blogspot.com

কথাকলি নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'না, বলব না।'

'কলি, এর মধ্যে ব্রতীন এসেছিল না?'

কথাকলি সামান্য চমকে উঠল। শান্ত গলায় বলল, 'হ্যাঁ। বলব বলব করেও তোমাকে বলা হয়নি।'

সুদর্শন রায় মমতা মাখা গলায় বললেন, 'ইটস ও-কে মাই ডিয়ার। সব কথা যে আমাকে বলতে হবে তার কী মানে? ওর টেলিফোন নম্বরটা তোর কাছে আছে?'

কথাকলি ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কেন?'

সুদর্শন রায় অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, 'ক-টা বইয়ের দরকার। পিঁপড়ের ওপর বই। এই যে বইটা দেখছিস এটাও পোকামাকড় সংক্রান্ত। এখানেও পিঁপড়েদের সম্পর্কে অনেক কিছু আছে, কিন্তু আমি নির্দিষ্ট করে ওদের ফেরোমেন নিয়ে জানতে চাইছি। ফেরোমেনের কেমিক্যাল কম্পোজিশন হয়তো ওদের কোনো একস্ট্রা সেনসেশনারি পাওয়ার দেয়। শুনেছি আমেরিকার পারডু আর উইসকানসিন ইউনিভার্সিটিতে এই বিষয়ে কিছু কিছু কাজ হয়েছে। ইন্টারনেটে এগুলো সব ভাসা ভাসা। আই নিড সাম ডিটেইলস। বই দেখতে হবে।'

কথাকলি খানিকটা অবাক, খানিকটা ব্যঙ্গের গলায় বলল, 'ব্রতীন কী করবে? ও যে পিঁপড়ে-বিশেষজ্ঞ এমন কথা তো জানতাম না।'

সুদর্শন রায় লজ্জা পেয়ে হাসলেন। বললেন, 'না না, সে-কথা বলছি না। ও তো একটা সময় অদ্ভুত অদ্ভুত সব বই-টইয়ের মধ্যে থাকত। নইলে এই বুড়ো বয়েসে আমাকে গিয়ে লাইব্রেরিতে বসতে হবে। তাই ভাবছিলাম, তোর কাছে যদি ফোন নম্বর...বা আসে যদি আবার...। থাক আমিই খুঁজে নেব।'

কফি বানাতে বানাতে কথাকলির মনে হল, সে নিজেও একটা পিঁপড়ে হয়ে যাচ্ছে। বিপদের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে।

boierpathshala.blogspot.com

একুশ

মানা সরকারের দলে মিটিঙের ভেতর চড় মারার নিয়ম নেই। চড় মারার নিয়ম আছে মিটিঙের বাইরে।

বাইরে চড়, কিল, লাথি সব ধরনের মারধরই চলতে পারে, কোনো অসুবিধে নেই। বেশ কয়েক বছর আগে একবার দলের ছেলেপিলে বিভূতি দেবনাথের পায়জামা, পাঞ্জাবি ছিঁড়ে দিয়েছিল। বিভূতির তখন বিরাট প্রতিপত্তি। সে যা বলবে, জেলায় দলকে সেইভাবে চলতে হবে। একটা জমিদার জমিদার ব্যাপার। আড়ালে বলা হত 'পায়জামা পরা জমিদার'। সেই বিভূতিকে অফিসের সামনে একদিন আচ্ছা করে পিটিয়ে দেওয়া হল। বেচারি আন্ডারওয়্যার আর গেঞ্জি পরে বাড়ি ফিরেছিল। তবে এসব ক্ষেত্রে অনেকরকম ব্যবস্থা লাগে। বাইরে থেকে অচেনা লোক ভাড়া করে আনতে হয়। মারধরের সময় যেন মুখ চেনা না যায়। খানকতক গাড়ির হেডলাইট ভাঙতে হয়, অফিসবাড়ির জানলার কাচ ভাঙতে হয়, কিছু ফালতু কাগজপত্র ছিঁড়তে হয়। তারপর রাতের দিকে বিবৃতিতে বলতে হয়—'অপনেন্ট দলের দুষ্কৃতীরা দলীয় কার্যালয়ে এসে হামলা চালিয়েছে।' সেইমতো রিপোর্ট পাঠানো হয় ওপরতলায়। পিটিয়ে দেওয়াও হল, আবার গা-ও বাঁচানোও হল।

এখন আর কেউ এত ঝামেলার মধ্যে যেতে চায় না। যাওয়ার দরকারও পড়ে না। শায়েস্তা করার অন্য হাজারটা পথ আছে। সেই পথ হল নিঃশব্দ পথ। কুচ করে গলাটি কেটে নাও। টুঁ শব্দটিও হবে না।

মানাবাবু ঠান্ডা মাথায় সেই নিঃশব্দ পথের কথা ভাবছেন।

অন্য কেউ হলে হয়তো এতক্ষণে একটা তুলকালাম কাণ্ড করে বসত।

boierpathshala.blogspot.com

চোখমুখ লাল করে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চিৎকার শুরু করত বোকার মতো।

'কী এত বড়ো সাহস আমাকে অপমান কর? আমাকে বল টাকা খাই? চড়িয়ে তোমার গাল লাল করে দেব ছোকরা। দাঁত ভেঙে দেব। দেখব কী করে তুমি দলে থাক। কোন দাদা তোমায় বাঁচায় দেখা যাবে।'

মানা সরকার এরকম কিছুই করলেন না। সামান্য হাসলেন। হাত বাড়িয়ে বললেন, 'একটা বিড়ি দাও দেখি বিদ্যুৎ। আছে নাকি বিড়ি?'

বিদ্যুৎ ঠোঁটের ফাঁকে হাসি দিল। পকেট হাতড়ে বিড়ির প্যাকেট বের করতে করতে বলল, 'আছে, কিন্তু এখন কি আর আপনার বিড়ি সহ্য হবে মানাদা? দামি সিগারেটে অভ্যেস হয়ে গেছে যে।'

মানা সরকারের ইচ্ছে করল চেয়ার ছেড়ে উঠে ছোকরার গালে সত্যি সত্যি এবার একটা চড় কষাই। সেই চড় খেয়ে ছোকরা টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ুক। সামনের একটা দাঁত ভেঙে যাক।

মানা পালটা হাসলেন। বললেন, 'সহ্য হবে না, তবু দাও। দু-দিন পরে তো তুমিও সঙ্গে আর বিড়ি রাখবে না বিদ্যুৎ। দামি সিগারেট বের করবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। ওনলি টাইম।'

বিদ্যুৎ বিড়ি এগিয়ে দিয়ে বলল, 'সবাই একরকম নয়। তাহলে দলটা এতদিনে উঠে যেত।'

ঠোঁটে বিড়ি ঝুলিয়ে দেশলাই জ্বেলে আগুন লাগালেন মানা। গলায় ধোঁয়া যেতেই বুঝলেন, বিদ্যুতের কথাই ঠিক। কটু স্বাদ আজকাল আর সহ্য হয় না। হওয়ার কথাও নয়। সময়, ক্ষমতা, অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের স্বাদ, গন্ধ, আদর্শই বদলে যায় তো বিড়ি সিগারেট কোন্ ছার। এই ছোকরারও যাবে। তিনি বিজ্ঞ ভঙ্গিতে বললেন, 'ছি ছি, দল উঠে যাবে কেন? তোমাদের মতো ইয়ং জেনারেশন আসছে। তোমরাই এখন দল চালাবে।'

বিদ্যুত ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'আপনারা সে-সুযোগ দিচ্ছেন কই? সবটাই তো আঁকড়ে বসে থাকছেন।'

ছোকরা বাড়াবাড়ি করছে। একটু বাড়াবাড়ি নয়, বেশি বাড়াবাড়ি করছে। দলে এসেছে বেশিদিন হয়নি। বছর পাঁচেক, নাকি তারও কম? কমিটিতে ঢুকেছে মাত্র দু-বছর। এর মধ্যেই চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। মানাবাবু ভুরু কুঁচকে টেবিলের ডান দিকে তাকালেন। টেবিলের ওপর হাত রেখে চুপ করে বসে আছে তপন। তপন গুছাইত। কেন চুপ করে বসে আছে? তিনদিনের ছোকরা তাকে মিটিঙে বসে এত বড়ো একটা অপমান করল অথচ কমিটির মাথা হয়ে তপন চুপ করে

boierpathshala.blogspot.com

বসে থাকবে! এইভাবে দল চালাবে?

মুখ, নাক নিয়ে ঘন ধোঁয়া বের করে দু-বার কাশলেন মানা। বললেন, 'বিদ্যুৎ, তোমার অভিযোগটা কি আমাকে উদ্দেশ্য করে?'

বিদ্যুতের বয়স সত্যি কম। এখনও গা থেকে কলেজ-জীবনের ঝাঁঝ সরাতে পারেনি। তবে ছেলেটা যে ঝকঝকে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দল সম্পর্কে জ্ঞানগম্যি আছে। বলা কওয়া ভালো। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ভাষণ শুরু করলে ভিড় টেনে নেয়। চোখা চোখা যুক্তিতে বিরোধীপক্ষকে একেবারে পেড়ে ফেলে। একবার সেই ভাষণ শুনেই বিজয় সান্যাল বিদ্যুতের প্রতি মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বাড়িতে ডেকে পাঠালেন। জেলার বেশ কয়েকটা বড়ো সভায় চান্স করে দিলেন। এই জেলায় দলে মেয়ের সংখ্যা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল। ওপর থেকে গুঁতো দিচ্ছিল। মেয়েদের মধ্যে পেনিট্রেট না করতে পারলে দল মধ্যবিত্ত বাড়িতে ঢুকতে পারবে না। মধ্যবিত্ত সঙ্গে না থাকলে ভোটে টান পড়বে। এখন আর সেই দিন নেই যে শুধু শ্রমিক-কৃষক বলে নাকে তেল দিয়ে বসে থাকা যায়, কোনো পলিটিক্যাল পার্টিই পারে না। বিদ্যুৎকে বিজয় সান্যাল দায়িত্বটা দিলেন। মেয়েদের দলে টানবার দায়িত্ব। কম বয়েসের স্মার্ট ছেলে। দেখতে শুনতে ভালো, কথাবার্তায় তরতরে। মাসখানেকের মধ্যে মহিলা ইউনিটকে বাড়িয়ে দিল বিদ্যুৎ। রবিবার সকালে অফিসের একতলায় তাদের নিয়ে বসে। কথাবার্তা হয়, প্রোগ্রাম হয়। সেই থেকে ছোকরা বিজয় সান্যালের চেলা। দু-বছর আগে যখন বিদ্যুৎকে কমিটিতে ঢোকানো হচ্ছে, মানা সরকার, তপন গুছাইত, উজ্জ্বল মুখোটি আপত্তি তুলেছিল। মানা সরকারের আপত্তি ছিল সবথেকে জোরালো।

'এত অল্প বয়েসেই একেবারে জেলায়!'

বিজয় স্যানাল বললেন, 'কেন? নয় কেন? বড়ো কমিটিতে ঢুকতে গেলে বয়স বেশি দরকার এমনটা তো দলের কোনো নিয়ম নেই।'

তপন বিরক্ত হয়ে বলল, 'সব কি নিয়ম মেনে করা হয়? অভিজ্ঞতার একটা সীমা তো মানতে হবে। তার ওপর বিদ্যুৎ দলের কতটা কাজ করেছে? শুধু ভাষণ মারলেই তো হয় না। কাজ বলতে কয়েকটা মেয়েকে দলে টেনেছে।'

বিজয় সান্যাল বললেন, 'ভাষণ এমনি মারা যায় না তপন। দল সম্পর্কে জানতে হয়, বুঝতে হয়। পড়াশোনা লাগে। আর মেয়েদের ইনফ্লুয়েন্স করে রাজনীতিতে আনা আজকের দিনে খুব কঠিন একটা কাজ। ছেলেরাই রাজনীতিতে আসতে চাইছে না তো মেয়েরা।'

উজ্জ্বল মুখোটির আপত্তির কারণটা ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

boierpathshala.blogspot.com

'বিদ্যুতের থেকে অনেক প্রবীণ কর্মী আমাদের জেলায় আছে। তারা এখনও কমিটিতে ঢুকতে পারেনি। তাদের মধ্যে এই ঘটনার রিঅ্যাকশন খারাপ হবে।'

বিজয় সান্যাল তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলেন, 'কার মধ্যে কী অ্যাকশন-রিঅ্যাকশন হল সেটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হল দলের কী হল। আমি মনে করি, তরুণদের অবশ্যই কমিটিতে আসা উচিত। এতে অল্পবয়সিরা দল সম্পর্কে উৎসাহ পাবে। বুঝতে পারবে লিডারশিপে তাদেরও নেওয়া হচ্ছে।'

মানাবাবু বললেন, 'উৎসাহ বাড়বে কিনা জানি না, তবে গ্রুপবাজি যে বাড়বে এটা বলতে পারি।'

বিজয় সান্যাল এ-কথায় রেগে গেলেন।

'আপনি কি মনে করছেন আমি গ্রুপ করছি?'

মানা সরকার ঠান্ডা গলায় বললেন, 'আমি মনে করছি না, কিন্তু দলের অনেকেই মনে করতে পারে। মনে করতে পারে, নেতার বাড়িতে রেগুলার হাজিরা দিলে উন্নতি অনিবার্য। দলের পরীক্ষায় পাস।'

বিজয়বাবু হাত তুলে বললেন, 'মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ মানাবাবু। আপনি কী বলছেন, আপনি নিজেই জানেন না। দলের ভেতর কথা বলার ক্ষেত্রেও একটা নিয়মকানুন আছে। একটা ভেটারেন লিডার হয়ে এ ধরনের কথা আপনি বলতে পারেন না।'

'দলের বাইরে কথা হওয়ার থেকে আগে ভেতরে কথা হয়ে যাওয়াটা ভালো নয় কি?'

এই ছোকরা কি দু-বছর আগের সেই ঘটনার প্রতিশোধ নিচ্ছে? হতে পারে, অসম্ভব কিছু নয়। কমিটির ভেতর অনেকদিনই ফাটল হয়ে গেছে। বিজয় গ্রুপ আর মানা গ্রুপের কথা এখন আর গোপন কোনো ব্যাপার নয়। বাইরে যতই এক দেখাক না কেন, প্রত্যেকেই নিজের পাল্লা ভারী করার লড়াই চালায়। কাজে, কথায়, সিদ্ধান্তে পরস্পরকে আক্রমণ চলছেই।

মানা সরকার বিড়িটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'কী হল বিদ্যুৎ বললে না? অভিযোগটা কি আমাকে লক্ষ্য করে?'

বিদ্যুৎ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আপনাকে লক্ষ করে তো বলিনি, আমি মিটিঙে কথাটা রাখলাম। এবার সবাই বিবেচনা করে দেখুন। দলে ব্যক্তিগত লক্ষ্যটা বড়ো কথা নয়, আদর্শটাই আসল।'

বিজয় সান্যাল চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'অভিযোগটা যদি তুমি আর একটু

boierpathshala.blogspot.com

স্পষ্ট কর বিদ্যুৎ, তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধে হয়।'

বোঝাই যাচ্ছে ভদ্রলোক চাইছেন কাদাটা ভালো করে ঘাঁটা হোক। মানা নিশ্চিন্ত হলেন, সবটাই বিজয়ের প্ল্যানমাফিক হচ্ছে। পিছন থেকে তিনিই বিদ্যুৎকে উসকেছেন।

তপন গুছাইত হাত তুলে বলল, 'আঃ, এখন এসব থাক না বিজয়দা। পঞ্চায়েত ইলেকশনের দেরি নেই, এখন এইসব চাউর হলে দলের ক্ষতি হয়ে যাবে।'

বিজয় সান্যাল নস্যির ডিবে বের করলেন। এক টিপ নাকে পুরে, লম্বা করে নাক টানলেন। বললেন, 'ক্ষতি ঠেকাতেই তো আলোচনা। ক্ষতি হয়ে গেলে আর আলোচনা কীসের?'

মানা বললেন, 'তপন, ওদের বলতে দাও।'

বিদ্যুৎ হাত নেড়ে বলল, 'ওদের আমাদের কথা নয়, আমি যা শুনেছি সেটাই বলেছি। বাইরে লোকে বলছে, দল নাকি এবার পঞ্চায়েতে টিকিট বেচছে। কেউ কেউ নাকি দরদামও করতে শুরু করেছে।'

মানা সরকার নড়ে বসলেন। স্থির চোখে বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইলেকশনের টিকিট আলু না পটল যে কেনাবেচা হবে?'

বিদ্যুতের একমাথা চুল। সেই চুলে হাত বুলিয়ে মৃদু হাসল। বলল, 'সেটাই তো কথা। দুনিয়াদারির যা অবস্থা হয়েছে সবই আজকাল কেনাবেচা করা যায়। এতদিন ভাবতাম, অন্তত দল এই অসুখ থেকে মুক্ত। এখন দেখছি তা নয়।'

বিজয় সান্যাল ভুরু তুলে বললেন, 'কী দেখছ?'

মানা গালে হাত বোলালেন। বুলিয়ে আরাম পেলেন না। চুয়ান্ন বছরের গাল, শক্ত হয়ে গেছে। দল যখন শুরু করেছিলেন তখন গাল ভর্তি দাড়ি রাখাটা একটা ফ্যাশন ছিল। পলিটিক্স করি অথচ দাড়ি নেই, একেবারে মানাত না। এখন দু-বেলা দাড়ি না কামালে অসুবিধে হয়। সপ্তাহে তিনদিন করে চুলে রং মারতে হয়। কলকাতা থেকে রং আনা হয়। আজকাল পরিষ্কার মুখ, ধোপদুরস্ত পোশাক ছাড়া পাবলিক নেয় না। বিজয় হারামজাদা বিদ্যুৎকে খোঁচাচ্ছে। খোঁচাক, ভালো মতো খুঁচিয়ে নিক। খোঁচালে ধিকিধিকি আগুন ভালো করে জ্বলে ওঠে। আগুন জ্বললে সবকিছুই পুড়বে। বিজয় শালাও বাদ যাবে না।

বিদ্যুৎ মুখ টিপে হেসে বলল, 'দেখিনি কিছু বিজয়দা, শুনেছি।'

তপন গুছাইত এবার কন্ট্রোল নেওয়ার চেষ্টা করল।

'শোনা কথা নিয়ে আলোচনা করার কোনো মানে হয় না। দেখুন বিজয়দা,

boierpathshala.blogspot.com

আমরা দল থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এবার পঞ্চায়েত ইলেকশনে টিকিট বিলির দায়িত্বটা সবার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। সেইমতো মানাবাবুর হাতে গেছে তিনটে সিট। আপনার হাতেও পাঁচটা রয়েছে। এমনকী বিদ্যুৎকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, মহিলা ক্যান্ডিডেট লিস্টটাকে ফাইনাল করতে। এরপর আমরাই যদি বিষয়টা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করি, একে অপরকে সন্দেহ করি, তাহলে তো বিরাট মুশকিল।'

বিজয় সান্যাল অবাক গলায় বললেন, 'ঝগড়া! আমি তো ঝগড়া করতে বলিনি। দলের বিরুদ্ধে যাতে কেউ আঙুল তুলতে না পারে তার জন্য একটা ওয়ার্নিং দিলাম।'

মানা সরকার চিবুকটাকে ওপরে তুলে বললেন, 'কাকে ওয়ার্নিং দিলেন বিজয়দা? আপনার হাতেও তো পাঁচটা সিট।'

বিজয় হাত উলটে বললেন, 'সবাইকেই সাবধান করছি। সবার থেকে তো নিজেকে বাদ দিইনি এখনও। দল যতদিন করছি, নিজেকে সবার মধ্যেই ধরব। যাক ওসব কথা বাদ দিন মানাবাবু, শুনলাম, আপনি নাকি এলাকায় চিত্তশুদ্ধি কর্মসূচি শুরু করেছেন? প্রোগ্রাম চলছে কেমন? চিত্তের কোনো শুদ্ধি ঘটছে?'

কথা শেষ করে ফিকফিক করে হাসলেন বিজয় সান্যাল। অপমানের হাসি। বিদ্যুৎও হাসল। হেসে বলল, 'আমি উঠলাম তপনদা। নীচে বসতে হবে। মেয়েরা সব এসে গেছে। ভাবছি, ইলেকশনের আগেই মেয়েদের শাখায় একটা সভা করিয়ে দেব। কেমন হবে সন্তোষদা?'

সন্তোষ মান্না এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। বয়স্ক মানুষ। একটা বয়েসে দলের জন্য কী না করেছেন। মিটিং মিছিল তো সামান্য, অ্যাকশনও করতেন। কলকাতার কলেজে পড়েছেন। হস্টেলে থাকতেন। ছাদের ওপর থেকে বোমাও ছুড়েছেন। ডাকাবুকো মানুষটা এখন কেমন যেন থম মেরে যাচ্ছেন। দলের ভেতরের এত ঝুটঝামেলায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছেন না। সারাক্ষণ মনে হয়, এ তো দল নয়, বাড়ি-জমির ভাগাভাগি নিয়ে জ্ঞাতিগুষ্টির লড়াই। বিদ্যুতের কথা শুনে এতক্ষণ পরে মুখ খুললেন। বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি বরং সেই ব্যবস্থাই করো। মহিলা শাখার সভায় শুধু মহিলারাই থাকবে। তারাই বলবে, তারাই সভা চালাবে। সভার আগে গানবাজনাও তাদের হাতে ছেড়ে দিও বিদ্যুৎ। আমরা কেউ স্টেজে উঠব না।'

'আমিও সেরকম ভাবছি। এখন দেখি ওদের সঙ্গে কথা বলে।'

মানা সরকার চুপ করে আছেন। বিজয় হারামজাদা না জেনে তার উপকার

boierpathshala.blogspot.com

করল। একটা উপকার নয়, একসঙ্গে দুটো উপকার। যেমন সাবধান করে দিল, তেমন আবার ফাইলটা খুলে দিল। ফাইল খুলে দেওয়ার অর্থ কাজের সুবিধে করা। ভয় কমে যায়। 'আগে অভিযোগ আনো, তাহলে তুমি জিতে যাবে'— থিয়োরির মধ্যে একটা গ্রাম্যপনা আছে। এখন এই থিয়োরি খাটে না। অভিযোগ আনতে হবে অতর্কিতে। অভিযোগ নয়, একেবারে প্রমাণ। আগে বিদ্যুৎ ছোকরাটাকে গলা টিপে ধরতে হবে। এমন ধরা যাতে ঘাড় সহজে সোজা করতে না পারে। নেতাগিরি কিছুদিনের মতো শেষ করতে হবে। ইচ্ছে করলে মারধর দিয়ে দেওয়া যায়। রাতে হাত-পা ভেঙে ফেলে দিলেই হল। কিন্তু তাতে লাভ নেই। বরং ক্ষতি আছে। কম বয়েসে হিরো হয়ে যাবে। উলটো দলের লোকেরা করেছে বলে, মাথায় ফেট্টি বেঁধে ঘুরবে। অন্য পথ ভাবতে হবে। সেই পথটা কী?

পথ পাওয়া গেল আচমকা।

সন্ধের সময় অফিস ছেড়ে বেরোনোর সময় মানা দেখলেন একতলার ঘরে দশ বারো জন মেয়ে ভিড় করে আছে। কমবেশি সব বয়েসেরই মেয়েরা আছে। টেবিলের একপাশে বসে বিদ্যুৎ দু-হাত নেড়ে তাদের কিছু বোঝাচ্ছে। কী বোঝাচ্ছে? দলের আদর্শ?

মানা সরকার গাড়িতে উঠতে উঠতে শুনতে পেল বিদ্যুৎ বলছে, 'আপনারা রাজি?'

অনেকগুলো গলা ভেসে এল, 'রাজি। খুব রাজি।'

গাড়ি স্টার্ট দিতে আলোর ঝলকানি দিয়ে উঠল মানা সরকারের মাথায়। বাঃ, ছেলেটা মেয়েদের ইউনিটকে তো বেশ চনমনে করে তুলেছে! গুণী ছেলে! দলের সম্পদ। বাড়ি পৌঁছেই গাব্বুকে খবর পাঠালেন।

মিনিট পনেরোর মধ্যে গাব্বু হাজির হল। সে নার্ভাস। নিশ্চয় চিত্তশুদ্ধি কর্মসূচিতে তাকে আবার বই পড়তে হবে। কেলেঙ্কারি কাণ্ড। গতবার 'শ' আর 'স' নিয়ে কম বিপদে পড়তে হয়নি। শুধু কি এইটুকু? মোটেই না। কঠিন বইগুলোতে এমন সব শব্দ আছে যে উচ্চারণ করাই অসম্ভব। এসব কি আর গাছতলায় ঝাণ্ডা লাগিয়ে লেকচার? গরম গরম দুটো কথা বলে দিলেই হল?

মানা সরকার থমথমে গলায় বললেন, 'দরজাটা লাগিয়ে এসো।'

গাব্বু চিন্তিত মুখে বলল, 'কী হয়েছে দাদা?'

'কিছু হয়নি, এবার হবে। আমাদের বিদ্যুৎকে চিনিস? জেলাতে কাজ করে।'

boierpathshala.blogspot.com

গাব্বু ঠোঁট কামড়ে মনে করার চেষ্টা করল।

'ঠিক বুঝতে পারছি না। জেলা প্রোগ্রামে তো আমার তেমন যাতায়াত নেই। গনেশ বা চাঁদু চিনতে পারে। ওদের খবর দেব?'

'না, দরকার নেই। কাজ তোকে দিয়েই করব। সাতকান হলে ঝামেলা হবে।'

গাব্বু নেতার রাগ ধরতে পারছে, কিন্তু রাগের কারণ বুঝতে পারছে না। মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'কী হয়েছে?'

মানা সরকার দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, 'ওই বিদ্যুৎ হারামিটা খুব বেড়েছে। আজ মিটিঙে সবার সামনে অপমান করল।'

'কী বলল?'

'কী বলল তোর শুনে দরকার নেই। আমি চাই শালার মাজাটা একেবারে ভেঙে দিতে।'

'শুয়ারের বাড়ি কোথায়? ঠিকানা দিন।'

'না, ওভাবে হবে না। মারধরের মামলা নয়। বিদ্যুৎ মানে তো আর শুধু বিদ্যুৎ নয়, দলের ভেতর একটা গ্রুপ। বিজয় সান্যাল সেই গ্রুপের মাথা। অনেকদিন ধরে আমাদের ঠেসতে চাইছে।'

গাব্বু নীচু গলায় বলল, 'দুটোকেই ঝেড়ে দিই না।'

মানা সরকার তাড়াতাড়ি বললেন, 'না, না অত লাগবে না। খুনজখমের মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই। টাইট করলেই চলবে।' কথাটা বলে গাব্বুর চোখের দিকে সরাসরি তাকালেন মানা।

'আমার একটা মেয়ে লাগবে গাব্বু।'

'মেয়েছেলে? বেশ্যা?'

'লাইনের মেয়েছেলে নয়, ভদ্র সভ্য মেয়ে। লেখাপড়া জানা হলে সবথেকে ভালো।'

গাব্বু মাথা চুলকে বলল, 'ভদ্র সভ্য! কাজটা কী জানতে পারি দাদা?'

মানা প্রতিশোধ স্পৃহার ক্রূর হাসি হেসে বললেন, 'কাজটা সহজ, ভয়ের কিছু নেই। ম্যানেজ করতে পারবি?'

'ম্যানেজ করা যাবে না এমন বলছি না, টাকাপয়সার কথা বলব কী?'

মানা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এইটা আমি চাইছি না, কোনো কারণে যদি ফাঁস হয়ে যায়, আমি টাকা দিয়ে করিয়েছি তখন ঝামেলায় পড়ব। তুই বরং একটা কাজ কর গাব্বু, মেয়েটাকে আমার নাম করে বলবি, টাকাপয়সা না

boierpathshala.blogspot.com

দিলেও চাকরিবাকরির একটা ব্যবস্থা করে দেব। তবে মেয়ে যেন আমার এই এলাকার না হয়।'

'হবে না।'

গাব্বু মাথা নেড়ে চলে যেতে গিয়ে আবার ফিরে এল।

'দাদা, খারাপ কিছু?'

'না, খারাপ কিছু নয়। খারাপ কিছুর ভান। আমাদের দলে খারাপ কিছু করলে কিছু হয় না, ভান করলে মারাত্মক কাণ্ড। ওই ছোকরাকে আমি মারাত্মক কাণ্ডের মধ্যে ফেলব। পারব না?'

গাব্বু একমুখ হেসে বলল, 'অবশ্যই পারবেন, আপনি পারেন না এমন কিছু আছে?'

সত্যি মানা সরকার পারলেন। তিনদিনের মাথায়, বাইশ-তেইশ বছরের এক তরুণী জেলা অফিসে গিয়ে তপন গুছাইতের কাছে একটা সহজ সরল চিঠি জমা দিয়ে এল।

'মহাশয়, একটা লজ্জার কথা জানাতে আপনাকে এই পত্র লিখতে বাধ্য হলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম, লিখব না। কোনো নালিশ জানাব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মত বদল করলাম। এই ঘটনা যদি ভবিষ্যতে আরও চলে তাহলে রাজনীতি সম্পর্কে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কী ধারণা তৈরি হবে বুঝতেই পারছেন। তা ছাড়া আপনাদের দলের প্রতি আমার একটা অন্যরকম ধারণা আছে। আমার জেঠু এই দল করতে গিয়ে জেলে গিয়েছিলেন। জেলের ভিতরেই অসুখে তাঁর মৃত্যু হয়। ফলে আমার টান অন্যরকম। যাক, আসল কথায় আসি। আমি রাজনীতি করি না, একটু গানবাজনার চর্চা করি। খুবই সামান্য। সম্প্রতি বিদ্যুৎবাবু আমার এক বন্ধুকে খবর পাঠান আমি যেন তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করি। আমি নিজে রাজনীতি করি না, কিন্তু বিদ্যুৎবাবুর প্রশংসা আমি অনেকের মুখেই শুনেছি। কোনো দ্বিধা না করে এক শনিবার দুপুরে তাঁর বাড়িতে চলে যাই। উনি আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেন। আমি বুঝতে পারি, তিনি সত্যিই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য একজন মানুষ। আমাকে ভারি যত্ন করে বসতে বললেন। বললেন, মেয়েদের নিয়ে একটা বড়ো সভা হবে। তাতে শুধু মেয়েরাই বলবে, মেয়েরাই সব ব্যবস্থা করবে। আমি বললাম, আমি তো পলিটিক্সের মধ্যে নেই, আমাকে কেন ডাকছেন? উনি তখন বললেন, কোনো অসুবিধে নেই, তোমাকে রাজনীতি করতে হবে না। তুমি গান তো করতে পারো? তাহলেই হবে। সবার সঙ্গে গানে গলা মেলাবে। সভা শুরুর আগে গান হবে। আমার খুব

boierpathshala.blogspot.com

ভালো লাগল। আমি রাজি হয়ে গেলাম। উনিও খুশি হলেন। কিন্তু আমি যখন উঠে আসতে চাই তখন হঠাৎ উনি আমার হাত টেনে ধরেন। এক ঝটকা দিয়ে আমাকে নিজের চেয়ারের পাশে বসিয়ে নেন। তারপর জোর করে আমার... ওঁর মুখের বিড়ির সেই কটু গন্ধ কতদিন যে আমি আমার মুখ থেকে মুছতে পারব না...। আপনারা ওকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আমি জানি এরপর উনি বলবেন, শিখা নামে কোনো মেয়ের সঙ্গে তার কোনোদিন দেখাই হয়নি। এমন নামে কাউকে সে চেনেই না। এই ধরনের কাজ করার পর সবাই এ-কথাই বলে। উনিও বলবেন। বলুন, যত খুশি বলুন। যেহেতু আমি কোনো নালিশ করছি না, কোনো কিছু প্রমাণ করার দায়ও আমার নেই। আপনাদের কাছে শুধু একটাই অনুরোধ, দলকে এভাবে নষ্ট হতে দেবেন না। জোর করে একটা মেয়ের গায়ে হাত দিলে মেয়েটার কোনো ক্ষতি হয় না, ক্ষতি হয় নীতি, আদর্শের...। আমার জেঠুর কথা মনে পড়তেই এই চিঠি লিখলাম, নইলে লিখতাম না।'

মিটিঙে চিঠি পড়া শেষ হলে মানা সরকার হাত নেড়ে বলে উঠলেন, 'দুর দুর, যত সব বানানো, রাবিশ অ্যালিগেশন। কে এই মেয়ে? খোঁজ নাও দেখবে একেবারে ফালতু। তপনদা, আমি ওই চিঠি এখনই ছিঁড়ে ফেলার প্রস্তাব করছি। বিজয়দা আপনি কী বলেন? বিদ্যুৎ শুধু একটাই গোলমাল করেছে। মহিলা-সভা নিয়ে জেলা মিটিঙের কথাগুলো বাইরে বলে ফেলেছে। ওই যে মেয়েরাই সব করবে। গানবাজনা হবে। সেদিন ঠিক হল না? বাইরে এত কথা না বলাই উচিত ছিল। যাক, বয়স অল্প বুঝতে পারেনি। যাক গে বিদ্যুৎ, একটা বিড়ি খাওয়াও দেখি।'

বিদ্যুৎ মুখ নামানো অবস্থাতেই বিড়ি বের করে এগিয়ে ধরল।

বিড়ি ধরিয়ে মানা ধোঁয়া ছাড়লেন। হেসে বললেন, 'এবার এই হ্যাবিটটা ছাড় বিদ্যুৎ। দেখেছ তো মেয়েটা কেমন লিখেছে? তোমার মুখে বিশ্রী গন্ধ পেয়েছে। হা হা।'

বিদ্যুৎ মুখ তুলল। তার চোখে আগুন জ্বলছে। মানা সরকার সেই আগুন উপেক্ষা করলেন। ফণী নামের লোকটাকে খবর দিতে হবে। সাটেরগড় সিটটার জন্য দরদাম ফাইনাল করে ফেলা দরকার। তারপর ঝিলডাঙা।

boierpathshala.blogspot.com

বাইশ

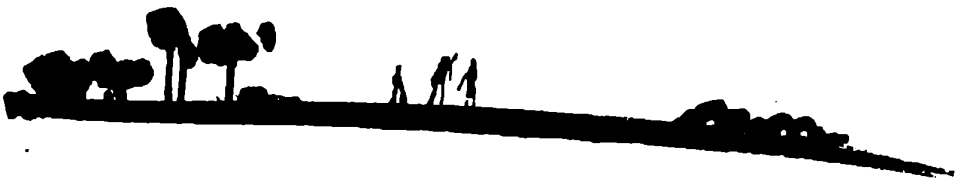

শেষরাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ডিপ্রেশনের বৃষ্টি। হঠাৎ হঠাৎ হুড়মুড় করে নামছে। সবকিছু ভিজিয়ে চুপচুপে করে দিয়ে থম মেরে যাচ্ছে কিছুক্ষণের জন্য। তারপর আবার নামছে ঝাঁপিয়ে। একটা খেলার মতো।

মোম বিছানায় শুয়ে রয়েছে উপুড় হয়ে। সে পরে আছে আকাশি রঙের নাইটি। নাইটির আকার সংক্ষিপ্ত। পায়ের গোছেই শেষ। ডান কাঁধের ওপর থেকে স্ট্র্যাপ নেমে পড়েছে কনুই পর্যন্ত। বুকের নীচে বালিশ মোমের। চারপাশে গাদাখানেক বাংলা ইংরেজি পত্রপত্রিকা ছড়ানো। সে অলসভাবে একটা করে পত্রিকা টানছে। পাতা উলটে ফটো দেখছে, সরিয়ে রাখছে। তারপর আরও একটা টেনে নিচ্ছে। গল্প, উপন্যাস পড়তে মোমের ভালো লাগে না। তার পছন্দ সাজগোজ, পোশাক, গ্রুমিং, পার্টি টিপস। মন খারাপ হলে জোকস। এই মুহূর্তেও চোখ আটকে গেছে সাজগোজ বিষয়ক এক সচিত্র প্রতিবেদনের ওপর। তবে সেটা মানুষের সাজ নয়, বাথরুমের সাজ। বাথরুমের রং, আলো, কল, বেসিন, শাওয়ার এসব নিয়ে লেখা। পাতা উলটে বাথ-টাব বিভাগে এসে চোখ আটকে গেল মোমের।

বাপ রে! বাথ-টাবও এরকম হয়!

বৃষ্টির কারণে আজ শ্যুটিং ক্যানসেল হয়েছে। সকালে শুদ্ধনাথ ফোন করেছিল। কাজ অবশ্য ছিল ইনডোরে। আনোয়ার শাহ্ রোডের একটা ফ্ল্যাটের ভিতর। বেডরুমের সেট। সেই অর্থে ঘরের ভিতর বৃষ্টি সমস্যা হওয়ার কথা নয়, কিন্তু বাইরে থেকে আলো বানানোর ব্যাপার আছে। ভোরবেলার সিকোয়েন্স। জানলা থেকে সফ্‌ট আলো ঘরে ঢুকবে। মোম গতকালই স্ক্রিপ্ট শুনে এসেছে।

boierpathshala.blogspot.com

দৃশ্যটা খারাপ নয়। নায়িকা নায়কের সঙ্গে পালিয়ে এসে নদীর ধারে একটা বাংলোতে উঠেছে। আগের দিন গভীর রাত পর্যন্ত প্রেমপর্ব চলার পর এলোমেলো বিছানায় দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোরে ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে আড়মোড়া ভাঙবে নায়িকা। ভাঙতে গিয়ে তার খেয়াল হবে, গায়ে কোনো পোশাক নেই। সে লজ্জা পাবে, পায়ের কাছে রাখা জামাটা টেনে পড়তে গিয়ে থমকে, মুচকি হাসবে। পাশ ফিরে ঘুমন্ত নায়কের দিকে তাকাবে। তারপর পোশাক ছাড়াই কোনোরকমে একটা বিছানার চাদর গায়ে জড়িয়ে সাবধানে খাট থেকে নেমে পড়বে। পা টিপে টিপে এসে দাঁড়াবে জানলার সামনে। পর্দা সরিয়ে বলবে, 'বিউটিফুল।' ততক্ষণে নায়কেরও ঘুম ভেঙেছে। সে পা টিপেটিপে নেমে পড়বে খাট থেকে। পিছন থেকে এসে মোমকে জড়িয়ে ধরে বলবে, 'সত্যি বিউটিফুল।' নায়িকার গা থেকে চাদর মাটিতে খসে পড়বে।

বাংলা টেলিফিল্মে নগ্ন শরীরের প্রায় কিছুই দেখানো যায় না। গভীর রাতের স্লট হলেও নয়। কাঁধ আর পায়ের খানিকটা পর্যন্ত অ্যালাউ হয়। খুব বেশি হলে খানিকটা পিঠ। আগে তাও ছিল না। হিন্দি চ্যানেলগুলো মেয়েদের ব্যাকলেস জামা দেখিয়ে দেখিয়ে বিষয়টা জলভাত করতে চাইছে। ফলে সিকোয়েন্সের সবটাই সাজেশনের ওপর নির্ভর করতে হবে। আর নির্ভর করতে হবে মোমের এক্সপ্রেশান। শুদ্ধনাথ কালই মোমকে ভালো করে বুঝিয়ে রেখেছিল। ঘুম ভেঙে নিজের নগ্ন শরীর দেখা থেকে শুরু করে জানলার সামনে গায়ের চাদর খসে পড়া পর্যন্ত প্রায় সবটাই তাকে বোঝাতে হবে চোখমুখের অভিনয় দিয়ে। ভোরের আলো এসে নায়িকার লজ্জা পাওয়া মুখে পড়বে। লালচে আভা। একটা সৌন্দর্য তৈরি হবে। ঠিক মতো লাইট অ্যারেঞ্জমেন্ট ছাড়া এই দৃশ্য তোলা সম্ভব নয়। বৃষ্টির কারণে সেই লাইট হবে না।

হঠাৎ একটা ছুটি। মোমের ভালো লাগছে, আবার বিরক্তও লাগছে। শ্যুটিং না হলে কী হবে, ঘুম থেকে তো সেই তাড়াতাড়ি উঠতে হয়েছে। কল টাইম ন-টায় মানে আটটার মধ্যে পৌঁছোনোর কথা ছিল। শুদ্ধনাথের ফোন এল সাতটা দশ পনেরো। মোবাইলটা অন্ করার সঙ্গে সঙ্গে। ততক্ষণে মোম বাথরুমে গিজারটা চালু করে এসেছিল।

'সরি, মোম আজ শ্যুটিং হবে না। ইনসাফিশিয়েন্ট লাইট।'

'ওমা এত পরে জানাচ্ছ কেন?'

'কী করব? তোমার মোবাইল অফ ছিল।'

'কাল রাতেই বলে দিলে হত। ইস, ফালতু ঘুম থেকে উঠলাম।'

boierpathshala.blogspot.com

শুদ্ধনাথ শান্ত গলায় বলল, 'ওয়েদার এক্সপার্ট হলে কাল রাতেই বলে দিতে পারতাম। বঙ্গোপসাগরের ওপর গভীর নিম্নচাপ ঘনীভূত হয়েছে। যাঁরা সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবেন তাঁরা সাবধান।'

মোম আধো আধো গলায় বলল, 'সাতসকালে ঠাট্টা করবে না শুদ্ধদা।'

'ঠাট্টা করার অবস্থায় নেই মোম। শেষরাত থেকে জেগে বসে আছি। ক্যামেরার সঙ্গে কথা বললাম, লাইটের সঙ্গে কথা বললাম। যদি কিছু করা যায়। দে সেড ইমপসিবল। একটা দিন গোলমাল হয়ে যাওয়া মানে কতটা ক্ষতি বুঝতে পারছ? টেলিফিল্মের বাজেট তো জানো। শালা, এখানে কাজ করে লাভ নেই।'

কানে ফোন চেপে বাথরুমে গিয়ে গিজার বন্ধ করতে করতে মোম খিল খিল করে হাসল। বলল, 'মুম্বাই চলে যাও শুদ্ধদা। সঙ্গে আমাকে নিয়ে চলো। দুজনে একটা ফ্ল্যাট-ট্যাট নিয়ে কষ্ট করে থাকব।'

'তুমি বরং একটা কাজ করো, বেলা বাড়লে আমার মিসেসের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা করো। তোমার সঙ্গে ফ্ল্যাট নিয়ে থাকব জানলে সে নিশ্চয় খুশি হবে। আমাকে তার আর সহ্য হচ্ছে না।'

মোম হাসতে হাসতে বলল, 'ভালোমানুষ বউদিকে কেন জড়াচ্ছো? বেচারি তোমার প্রেমে তো হাবুডুবু খায়। আমি আর তুমি পালাব। তারপর তোমার স্ক্রিপ্টের মতো ভোরবেলা চাদর গায়ে জানলার সামনে গিয়ে বলব, বিউটিফুল, আর তুমি পিছন থেকে এসে...হি হি।'

শুদ্ধনাথ গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমি মন দিয়ে হাসাহাসি কর মোম, আমি ফোন রাখছি। অনেক কাজ আছে। বাকিদের জানাই। এখন মনে হচ্ছে, ''ঝরনার মতো জীবন''-এর কাজ শেষ না করে টেলিফিল্মে হাত দেওয়াটা উচিত হয়নি।'

'অবশ্যই হয়েছে। তোমরা বেশি বেশি কাজ না করলে আমাদের মতো অবলা নারীদের কী হবে? হি হি।'

শুদ্ধনাথের ফোন ছেড়ে মোম ভেবেছিল বিছানায় গিয়ে আর এক রাউন্ড ঘুমিয়ে নেবে। আলো নিভিয়ে, চোখ বুজে খানিকটা শুয়েও ছিল। মিনিট কুড়ির মধ্যে ফের মোবাইল বেজে উঠল। আবছা অন্ধকারে মোবাইল তুলে মোম দেখল, শঙ্কর। শুদ্ধনাথের টেলিফিল্মের হিরো। নতুন ছেলে। বয়স একেবারেই কম। প্রথম কাজ করতে এসেছে। কাজ খারাপ করছে না, নায়িকার সঙ্গে বিছানায় শুতে হবে বলে কাল থেকে নার্ভাস। স্ক্রিপ্ট শোনার সময় ঘন ঘন কপালের ঘাম মুছছিল। ছেলেটাকে আরও একটু ঘাবড়ে দিলে কেমন হয়? মনে মনে হাসল মোম।

boierpathshala.blogspot.com

'কী হল শঙ্কর?'

ওপাশ থেকে উত্তেজিত গলা ভেসে এল, 'ম্যাডাম, আজ শ্যুটিং হচ্ছে না।'

'তাই নাকি!'

'শুদ্ধনাথবাবু ফোন করেছিলেন। বৃষ্টির জন্য ক্যানসেল।'

মোম গলায় বানানো রাগ এনে বলল, 'দেখেছ কাণ্ড। আমি তো এখনও কিছু জানি না। তৈরি হচ্ছি।'

শঙ্কর লজ্জা পেল। বলল, 'আপনাকে নিশ্চয় এবার জানাবে ম্যাডাম।'

'কে জানে, নাও জানাতে পারে। গিয়ে দেখতে পাব কাজ হচ্ছে না।'

শঙ্কর খানিকটা গদগদ গলায় বলল, 'তাহলে তো ভালোই হল, আমিই আপনাকে জানিয়ে দিলাম।'

মোম মোবাইল কানে চেপে পাশ ফিরল।

'ওমা ভালো হল কোথায়! আজকের সিকোয়েন্সটা নিয়ে কাল রাত পর্যন্ত ভেবেছি। ঘুমের মধ্যেও মুডটা ধরেও রেখেছিলাম।'

শঙ্কর বলল, 'আমি কিন্তু কাল বাড়ি ফেরার সময়ই বুঝতে পারছিলাম, আজ ঝড়বৃষ্টি হবে। সকাল থেকে যে হবে বুঝতে পারিনি, তবে হবে এটা বুঝেছি। আকাশ লাল হয়ে ছিল।'

এই ছেলেমানুষিতে মোমের হাসি পেল।

'তাই নাকি! আকাশ লাল হলে বুঝি ঝড় বৃষ্টি হয়?'

শঙ্কর সহজ গলায় বলল, 'তাই তো। একটা হাওয়াও দিচ্ছিল। ঝড়-টড়ের আগে এরকম হয় না?'

মোম গলা ভারী করে বলল, 'এটা তোমার অন্যায় হয়েছে শঙ্কর।'

'অন্যায়! কোনটা?'

'কাল রাতেই আমাকে একটা ফোন করে এই খবর জানানো উচিত ছিল। আমি তাহলে আজ বেলা বারোটা পর্যন্ত ঘুমোতাম।'

শঙ্কর সরল হেসে বলল, 'কী যে বলেন ম্যাডাম।'

মোম হেসে বলল, 'ঠিকই বলি। শঙ্কর এবার, থেকে তোমার দায়িত্ব হল, রোজ রাতে বাড়ি ফেরার পর ছাদে গিয়ে একবার করে আকাশ দেখবে। তারপর ফোন করে আমাকে ফোরকাস্ট জানাবে। কেমন?'

ফোনের ওদিকে শঙ্কর হাসতে লাগল। না, ছেলেটা সত্যি বোকা। মোম প্রসঙ্গ পালটে বলল, 'কাজ করতে কেমন লাগছে?'

'ভালো ম্যাডাম। শুধু একটাই অসুবিধে?'

boierpathshala.blogspot.com

মোম আগ্রহ দেখিয়ে বলল, 'কী অসুবিধে?'

'শট নেওয়ার আগে রিহার্সাল বড্ড কম হয়। দু-একটা মনিটর যদি বেশি করা যেত...। নতুন কাজ করছি তো, নার্ভাস লাগে। এই দেখুন না আজ যে সিকোয়েন্সটা করার কথা ছিল সেটা তো যথেষ্ট হার্ড।'

মোম না বোঝার ভান করে বলল, 'কোনটা?'

'ওই যে আমি-আপনি শুয়ে আছি, আপনি উঠে গিয়ে জানলার পাশে দাঁড়াবেন...। টাফ সিন। শুদ্ধনাথবাবু বলছিলেন, ফাঁকে নাকি আমার একটা ক্লোজআপ থাকবে। আমি চোখ খুলে লুকিয়ে লুকিয়ে আপনাকে দেখছি। অ্যান্ড দ্যাট লুক শুড বি সামথিং ডিফারেন্ট।'

আর হাসি চাপতে পারছে না মোম। তবু কষ্ট করে নিজেকে থামাল।

'কীরকম ডিফারেন্ট?'

ওপাশে শঙ্কর লজ্জা পেল। বলল, 'দুর, আপনি জানেন ম্যাডাম।'

মোম হাসতে হাসতে বলল, 'একটা কাজ কর শঙ্কর। বেটার ইউ কাম টু মাই হোম। আমি তো আজ বাড়িতেই আছি। সিনটা আমরা কয়েকবার রিহার্সাল করে নিই। আমি চাদর গায়ে দিয়ে জানলার সামনে দাঁড়াব, তুমি আমাকে ডিফারেন্ট লুকে দেখবে, তারপর উঠে এসে জড়িয়ে ধরবে। কেমন হবে? সেই রিহার্সালে কিন্তু একটা ব্যাপার সত্যি থাকবে।'

'কী?'

'আমি ন্যুড থাকব।'

'মানে!'

'মানে কিছু নয়, তাতে তোমার এক্সপ্রেশানটা রিয়েলিস্টিক হবে। সেটাই তুমি শ্যুটিং-এ করবে।'

শঙ্কর এবার বুঝতে পারল, মোম চ্যাটার্জি তাকে নিয়ে মজা করছে। 'আপনি যে কী বলেন না ম্যাডাম' বলে তাড়াতাড়ি ফোন ছেড়ে দিল সে। একা একাই হাসতে হাসতে লাগল মোম। বোকা ছেলে, সরলও। লাইন বুঝতে সময় লাগবে। নায়িকার গা থেকে বিছানার চাদর পড়ে যাওয়ার পর এই ছেলে সত্যি সত্যি যদি দেখে কিছু নেই, তাহলে কী করবে? নির্ঘাত অজ্ঞান হয়ে যাবে।

না, ঘুম আর হবে না। দরজা খুলে ঘর থেকে বেরোতেও ইচ্ছে করছে না। মাকে বলে দিয়েছে, বারোটা অবধি সে ঘুমোবে, কেউ যেন বিরক্ত না করে। মোম উঠে গিয়ে র‍্যাক থেকে পত্রপত্রিকা এনে খাটের ওপর ছড়িয়ে দিল। এটা ওটা উলটে এখন বাথরুম নিয়ে পড়েছে। বাথ-টাবে এসে থমকে গেল।

boierpathshala.blogspot.com

বাপরে! এ তো রাজাবাদশার স্নানের ব্যবস্থা! নাকি স্বপ্নপুরীর? লেখার নামটাও সেরকম। ড্রিম বাথ। বাংলা করলে কী হবে? স্বপ্ন স্নান? ছোটো ছোটো লেখার সঙ্গে বড়ো বড়ো ছবি।

বাথ-টাবের সবটাই কাচের। তিনটে দেয়ালই স্বচ্ছ। ভেতরে গা ডোবানো ইজিচেয়ার। সেই চেয়ার আঁজলা করে বুক, পেট ও নিতম্ব ধরে রাখবে আলগোছে। মাথার ওপর ঝরনার মতো জলপ্রপাতের আয়োজন। জলের ভেতরই চারপাশ থেকে বাতাস এসে ম্যাসাজ দেবে। একে বলে এয়ার ম্যাসাজ। মোমের চোখ চকচক করে উঠল। একটা নিতে পারলে কেমন হয়? এই জিনিসের দাম কত? মোম তাকাল ছবির নীচে। দাম দেখে আঁতকে উঠল। তিয়াত্তর লক্ষ টাকা! ধড়ফড় করে উঠে বসল মোম। ঠিক দেখল তো? চোখ কচলে আবার পড়ল। হ্যাঁ, ঠিকই দেখেছে। এই তো লেখা সেভেনটি থ্রি! এ তো প্রায় কোটি টাকা! কাদের জন্য এ-জিনিস? আরবের বাদশা? দ্রুত হাতে পত্রিকার পাতা বদল করল মোম। পরের ছবিতে এল। নীল আর সবুজ রং মেশানো বাথ-টাবের নাম, 'সী সাইড বাথটাব'। সমুদ্র ধারে মাথা রাখার জন্য নরম গদি। হাত বাড়ালে বালির কিচকিচানি স্পর্শ। সেইভাবে বাথটাবের গা ফিনিশ করা আছে। সুইচ দিলে চালু হয়ে যাবে লুকোনো ব্লোয়ার। জলে ঢেউ উঠবে। হালকা ঢেউ বয়ে যাবে শরীরের ওপর দিয়ে। দাম? ছবির তলায় কায়দা করে লেখা—ওনলি থার্টিন ল্যাক্স। মাত্র তেরো লক্ষ! মাত্র! ঢোঁক গিলে অন্য ছবিতে গেল মোম। 'কালার থেরাপি' বাথ-টাবে রহস্য নাকি লুকিয়ে থাকে রঙে। জল উপচে পড়ে চারধার থেকে। ক্রোমোথেরাপি আলো সেই জলধারার সঙ্গে মিশে শরীরে আশ্চর্য শিহরণ তুলতে পারে। ক্রোমোথেরাপি আলোটা আবার কী রে বাবা! অলৌকিক কিছু? প্রতিবেদনের তলায় ইংরেজিতে যা লেখা আছে, তার বাংলা করলে মানে হয়, 'সাত লক্ষ টাকায় আপনি আপনার এই স্বপ্নের টুকরোকে অতি সহজে নিজের বাথরুমে নিয়ে যান।'

পাতা বন্ধ করে পত্রিকা সরিয়ে রাখল মোম। তার মন খারাপ হয়ে গেল। এরা মিথ্যে লিখেছে। স্বপ্নের টুকরো নিজের কাছে নিয়ে আসা 'অতি সহজে' হয় না। অনেক পথ যেতে হয়। সেই পথে স্বপ্ন যেমন তৈরি হয়, তেমন স্বপ্ন ভাঙেও। আজ সে লক্ষ, কোটি টাকার স্নানের স্বপ্ন দেখছে, অথচ একটা সময় ছিল, যখন স্নান মানে তার কাছে ছিল গা-মাথায় কোনোরকমে কয়েক মগ জল ঢালা। তাও বেশির ভাগ সময় পারত না। কাকিমারা বাথরুমের বাইরে থেকে তাড়া লাগাত। কঠিন গলায় বলেই চলত, 'জল খরচ করিস না মোম, অত জল

boierpathshala.blogspot.com

খরচ করিস না।'

মিনিটে মিনিটে মা দরজায় এসে ধাক্কা দিত। চাপা গলায় ধমকে বলত, 'বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয় বলছি হতচ্ছাড়া মেয়ে।'

বাপ-মরা, কাকা-জেঠার বাড়িতে হাফ-আশ্রিত কিশোরী মোম কাকভেজা অবস্থাতেই বেরিয়ে আসত।

'অমন চেঁচাচ্ছ কেন মা?'

মা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলত, 'চেঁচাব না তো কী করব, গলা জড়িয়ে চুমু খাব? ঘণ্টাখানেক ধরে বাথরুমে কী করিস?'

'ঘণ্টাখানেক কোথায়? এই তো সবে ঢুকলাম। দশ মিনিটও হয়নি।'

'দশ মিনিটও-বা থাকবি কেন?' মা হিসহিসিয়ে উঠত।

'বাঃ, জল ঢালতেও তো একটু সময় দেবে।'

'না দেব না। পরের বাড়িতে থাকছিস, খাচ্ছিস এই যথেষ্ট। তারপর আবার বাথরুমেও সময় চাস?'

মোম মাথার জল ঝাড়তে ঝাড়তে শান্ত গলায় বলত, 'আমি তো পরের বাড়িতে থাকতে চাই না।'

'কোথায় যাবি? রাজপ্রাসাদে? তোর বাবা তো তোর জন্য রাজপ্রাসাদ বানিয়ে রেখে গেছে। যা সেখানে চলে যা।'

'তাই যাব মা। ঠিক একদিন তাই যাব। রাজপ্রাসাদে না পারি এ-বাড়ির লোকগুলোর মুখে থুতু দিয়ে ঠিক একদিন চলে যাব অন্য কোথাও।'

'ইস, ভিখিরির মুখে বড়ো বড়ো কথা।'

কিশোরী মোম দ্রুত হাতে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ঠোঁট কামড়ে বলল, 'একদিন কী করি দেখবে।'

মা গজগজ করতেই থাকত।

'অমন কথা তোর বাবাও বলত। তারপর বউ, মেয়ে ফেলে পৃথিবী থেকেই পালাল। এখন পরের ঘরে হেঁশেল ঠেলে ভাত জোটাতে হয়। এরা বের করে দিলে ভিক্ষে করে খেতে হবে।'

'দরকার হলে তাই করব, ভিক্ষে করেই খাব।'

মোম খাট ছেড়ে নেমে এসে জানলার কাছে দাঁড়াল। আকাশ মুখ কালো করে তাকিয়ে আছে। এই মুহূর্তে বৃষ্টির দাপট কম। তবে একটা ঝোড়ো হাওয়া রয়েছে। শঙ্কর ঠিকই বলেছে, কোথাও ঝড় হচ্ছে নিশ্চয়। জানলা দিয়ে কুচি কুচি জলের ছাঁট ঢুকছে। এরকম চলতে থাকলে কালও শ্যুটিং হবে না। ইস, পরপর

boierpathshala.blogspot.com

দুটো দিন কাজ নষ্ট মানে বিচ্ছিরি। বিকেলেই কথা বলে নিতে হবে। সেরকম হলে অন্য কাজে ডেট নিয়ে নেবে। স্টুডিয়োতে কাজ হলে ঝড়বৃষ্টিতে কোনো সমস্যা নেই। এখন আর সেদিন নেই। কাজের জন্য দোরে দোরে গিয়ে দাঁড়াতে হয় না। বরং উলটোটাই ঘটে। মোম চ্যাটার্জিকে পাওয়ার জন্য টিভিওলারা বাড়িতে এসে ভিড় করে। ফোন করে পাগল করে দেয়। সোমনাথদা কেন ফোন করেছিল? সেও কি কাজের ব্যাপার? কথাটা মনে পড়তেই মোম যেন সামান্য চঞ্চল হয়ে পড়ল।

সেদিনও কি বৃষ্টি ছিল? নাকি পরিষ্কার আকাশ, রোদ উঠেছিল? মোম মনে করবার চেষ্টা করল। মনে পড়ছে না। কে জানে হয়তো এরকমই হয়। বৃষ্টি দেখতে দেখতে রোদের কথা মনে পড়ে না।

জ্বরের কারণে সাতদিন স্কুল যেতে পারেনি মোম। এদিকে সামনেই টেস্ট পরীক্ষা। বিকেলে খাতাবই নিয়ে চলে গেল খুকুর বাড়ি। খুকুর ভালো নামটা যেন কী? দীপ্তা? না না, সুদীপ্তা। ক্লাসের ভালো মেয়ে সুদীপ্তা। শুধু লেখাপড়ায় না, স্বভাবেও ভালো। মোমকে কোচিং-এর নোট্স দিয়ে দিত । বই-টই দিয়েও সাহায্য করেছে অনেকবার। লেখাপড়ার জন্য নিজের বাড়িতে সুদীপ্তার আলাদা ঘর ছিল। দোতলার একপাশে। যখন নিজের বাড়িতে শান্ত মনে পড়ার জায়গা পেত না, সুদীপ্তার কাছে চলে যেত। দুজনে মিলে পড়ত।

সেদিন সেই ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মোম।

অল্পবয়সি একটা ছেলের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছে খুকু। আর মাঝে মাঝেই হেসে গড়িয়ে পড়ছে। দরজার কাছে মোমকে দেখে হাসতেই হাসতেই বলল, 'আয় মোম, ভেতরে আয়।'

মোম অস্বস্তি নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

ঝকঝকে তরুণটিকে দেখিয়ে সুদীপ্তা বলল, 'আমার মামাতো দাদা, সোমনাথ। দারুণ মজার ছেলে। এমন কথা বলবে যে হাসতে হাসতে তোর পেট ফেটে যাবে। সবসময় নানারকম উদ্ভট উদ্ভট প্ল্যান ঘোরে মাথায়। এখন কী প্ল্যান ঘুরছে বল তো?'

মোম লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে বলল, 'যাঃ, আমি কী জানি?'

সুদীপ্তা বলল, 'আচ্ছা, আমি বলছি।'

সোমনাথ নামের এলোমেলো চুলের তরুণটি চোখ পাকিয়ে বলল, 'খবরদার খুকু, প্ল্যান ফাঁস হয়ে যাবে।'

সুদীপ্তা হেসে বলল, 'মোটেই না, মোম খুব সুন্দর মেয়ে। ও কোনো

boierpathshala.blogspot.com

গোপন কথা ফাঁস করে না। বলব?'

সোমনাথ হাত উলটে বলল, 'বল, তোর রিস্ক।'

'জানিস মোম, সোমনাথদা ঠিক করেছে এবছর ডিসেম্বরে কলেজের পরীক্ষা কেটে জঙ্গলে পালিয়ে যাবে। সেখানে গাছ-বাড়ি বানিয়ে পাকাপাকি গাছের ওপর থাকবে। ঝরনার জলে দাঁত ব্রাশ করবে। ব্রেকফাস্টে ফলমূল খাবে। দিঘির জলে স্নান করবে। মাছ ধরে পুড়িয়ে খাবে। বেক্‌ড ফিশ। তারপর দুপুরবেলা বাঁদরদের সঙ্গে গল্পগুজব করবে। যাকে বলে একেবারে টারজান লাইফ।'

বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়ল সুদীপ্তা। মোমও হেসে ফেলল। চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'ওমা! কেন?'

অচেনা সুন্দর তরুণটি উদাসীন ভঙ্গিতে বলল, 'অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম, এই দুনিয়ায় জঙ্গলই একমাত্র জায়গা যেখানে নিশ্চিন্তে থাকা যায়। মানুষের উৎপাত নেই।'

সুদীপ্তা মোমের হাত ধরে বলল, 'আমরাও যাব সোমনাথদা।'

'অসুবিধে নেই, ফাইনাল পরীক্ষার পর তোরাও চলে আয়। পরীক্ষার পর আজকাল ছেলেমেয়েরা কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ শেখে, জঙ্গলে গিয়ে তোরা শিখবি বাঁদর ল্যাঙ্গুয়েজ। শুনেছি ওদের একটাই ভাষা। আমাদের মতো মন আর মুখে দু-রকম কথা বলে না। হুপ-হাপ, হুপ-হাপ।'

হাসতে হাসতে মোমের চোখে জল চলে এল। কোনোরকমে বলল, 'ঠিক নিয়ে যাবেন তো? ভুলে যাবেন না?'

তরুণটি চমৎকার হেসে বলল, 'খেপেছ?'

সেই 'সোমনাথদা'র সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তারপর অনেকবার কাজে-অকাজে সুদীপ্তার বাড়িতে গেছে মোম। ঠারেঠোরে সোমনাথের খোঁজ করেছে। একদিন তো লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞেসও করে ফেলল।

'হ্যাঁ রে, তোর ওই দাদার খবর কী?'

'কোন্ দাদা? সোমনাথদা?'

মোম লজ্জা লুকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। গেল কই? জঙ্গলে পালাল নাকি!'

'মোটেই না। কলেজ শেষ করে কীসব ট্রেনিং নিচ্ছে শুনেছি। শুনেছি সিনেমা করা শিখবে। এদিকে আসার একদম সময় পায় না।'

বাড়ি ফিরে সারাদিন মন খারাপ করেছিল মোম। একদিন, দু-দিন, তিনদিন। ব্যস, আগরপাড়া ছেড়ে চলে আসার পর সব ভুলে গিয়েছিল দ্রুত।

boierpathshala.blogspot.com

ভুলে যাওয়ারই কথা। অতি তুচ্ছ একটা ঘটনা। এক অভাগা দরিদ্র কিশোরীর গোপন প্রেম মনে রাখার মতো সময় মোম চ্যাটার্জির ছিল না।

তাহলে এতদিন পর কেন আবার মনে করিয়ে দিল সোমনাথ?

জানলার সামনে থেকে ফিরতে ফিরতে মোমের মনে পড়ে গেল, সেদিনটা বৃষ্টির দিন ছিল না। ছিল ঝলমলে রোদের বিকেলবেলা। যে ধরনের বিকেল কোনো কিশোরীর জীবনে এক-দু-বারের বেশি কখনও আসে না।

boierpathshala.blogspot.com

তেইশ

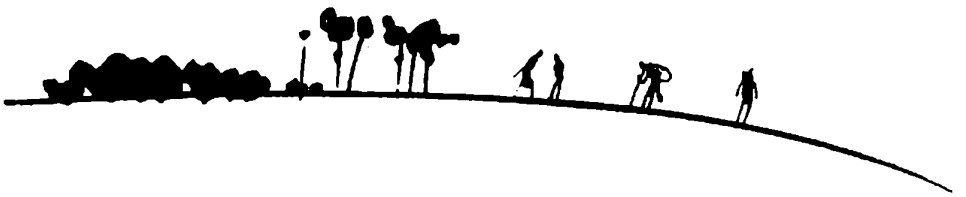

ভিজে ছাতাটা শোলের হাতে দিয়ে কাদু দোকানের দরজায় পা রাখল।

'কই হে গোপী? গোপীনাথ গেলে কই বাবা?'

কোলের ওপর জাবদা খাতা রেখে গোপীনাথ হিসেব মেলাচ্ছিল। দিনে দু-বার হিসেব মেলায় সে। একবার দুপুরে, একবার রাতে। আগে একবারেই কাজ সারত। তাতে ঝামেলা ছিল। চার, ছ-আনা ভুলের জন্য গোটা দিনের হিসেব নিয়ে ফের বসতে হত। দু-বারে ভাগ করে এখন সুবিধে হয়েছে। দু-দিন বৃষ্টি চলার পর, আজ অনেকটা ধরেছে। তবে একেবারে থামেনি। মাঝেমধ্যে ঝিরঝির করে পড়ে যেন জানান দিচ্ছে—আমি চললাম।

দোকানে খদ্দের আসছে কম। গোপীনাথ মন দিয়েই হিসেব দেখছিল। এত মন দিয়ে যে কাদু কখন ঘুরে পিছনের দরজায় হাজির হয়েছে খেয়াল হয়নি। গলা পেয়ে তড়বড় নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে এল।

'আরে ভাই যাব কই? আসেন, আসেন ভেতরে আসেন।'

শয়তানটাকে কী বলে সম্বোধন করত? 'আপনি' নাকি 'তুমি'? গুলিয়ে গেছে। গুলিয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। যতদূর মনে হচ্ছে, 'তুমি'। মরুক গে, খারাপ লোকেরা আপনি-আজ্ঞেতে খুশি হয়। কাদুকে মোড়া এগিয়ে দিল গোপীনাথ।

কাদু সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'ওতে আবার ধুলো কাদা নেই তো গো ডাক্তার? দেকো বাপু পাছায় যেন দাগ না পড়ে।' দাঁত দেখিয়ে বিশ্রী হাসল কাদু। বলল, 'আজকাল গায়ে কাদা ময়লা লাগতে দিই না মোটে।'

গোপীনথ তাড়াতাড়ি কাপড়ের টুকরো এনে মোড়া ঝেড়ে দেয়।

boierpathshala.blogspot.com

'নেন বসেন, আর ধুলো নাই।'

এত জলকাদার মধ্যেও গায়ের পায়জামা, পাঞ্জাবি কাদুর সত্যি ধোপদুরস্ত। মানা সরকারের ওখান থেকে ঘুরে আসার পর কাদুর এই একটা বদল হয়েছে। রংচঙে পোশাক ছেড়ে সে 'সাদা'য় ঢুকছে। পথেঘাটে বেরোলে সাদা ছাড়া কিছু পরতে চাইছে না।

মোহন বলল, 'দাদার হঠাৎ হল কী বল দেখি। একেবারে কালার ছেড়ে দিলে! বেধবাদের মতো শুধু সাদা আর সাদা।'

কাদু গম্ভীর গলায় বলল, 'প্র্যাকটিস করচি।'

'প্র্যাকটিস!'

'হ্যাঁ, নেতা হওয়ার প্র্যাকটিস। নেতাদের কখনও রংচঙে জামা কাপড় পরতে দেকেচিস শুয়ার? সবসময় সাদা ফ্যাটফ্যাট মারে। একটু ময়লা নাই।'

শোল হেসে বলল, 'তুমি তো দাদা, আমাদের নেতাই ছিলে।'

কাদু সামান্য হেসে বলল, 'সেই নেতা নয়, একেবারে ডাইরেক্ট নেতা। ডাইরেক্ট নেতা কী জিনিস জানিস?'

মোহন আর শোল মুখ চাওয়াচায়ি করল। 'গুরু'র কথা চ্যালারা ধরতে পারছে না।

'তোরা দুটোই গাধার বাচ্চা। ডাইরেক্ট নেতা কী জানিস না? ডাইরেক্ট নেতা হল ভোটে-দাঁড়ানো-নেতা। ভাবচি এবার ঝিলডাঙায় ভোটে দাঁড়িয়ে পড়ব। কেমন হবে?'

উজ্জ্বল মুখে শোল বলল, 'কেমন হবে মানে! বলছ কী দাদা, শুনেই তো আনন্দে বুকের ভেতরটা ঝপাং ঝপাং মারচে।'

কাদু বলল, 'এখনই ঝাঁপাঝাপির সময় হয়নি। সময় হলে বলব।'

মোহন উত্তেজিত গলায় বলল, 'তুমি দাঁড়ানো মানেই জিতে গেলে। একটা ভোট শালা বাইরে ফেলতে দেব না। পেটে পা ঢুকিয়ে, ইয়ে চেপে ভোট আদায় করব।'

হাত দিয়ে নোংরা ইঙ্গিত করল মোহন।

কাদু চিন্তিত মুখে বলল, 'ভোট বাগানোর কতা পরে হবে। আগে ইলেকশনের টিকিটটা পেতে হবে।'

'টিকিট পেতে অসুবিধে কোথায়? তুমি মানা সরকারকে বল।'

'ওভাবে সরাসরি বলতে নেই। সরাসরি বললে হারামজাদা বড়ো দর হাঁকবে। তা ছাড়া অন্য ঝামেলা আছে।

boierpathshala.blogspot.com

'কী ঝামেলা?'

কাদু ভুরু কুঁচকে চুপ করে রইল। মানা তাকে চিত্তরঞ্জন মাস্টারের নাম শুনিয়েছে। ওকে ভোটের টিকিট দিতে চায়। এটা সত্যি হতে পারে আবার প্রেশারও হতে পারে। প্রেশারটা এরকম—'দ্যাখো বাপু, ঝিলডাঙায় কিন্তু তোমার পালটা লোক বানাচ্ছি। আমাকে সামলেসুমলে চলো, নইলে ডিসটার্ব করে দেব।' গুন্ডা-মাস্তানদের কবজায় আনতে 'পালটা লোক বানানো' কমন হুমকি। এই হুমকি সামলাতে হবে। গতবার পঞ্চায়েতে ক্যান্ডিডেট এসেছিল বাইরে থেকে। লোক গাঁয়েরই, কিন্তু থাকত বাইরে। কলকাতায় চাকরি না বিজনেস করত। বছরে একবার করে জমিজিরেত দেখতে আসত। ভোটের পর দু-বছর এ মুখো হল না। জিতে গেছে ব্যস, কে মরতে এই অগা পচা-জায়গায় আসবে? এলেই তো হাজারটা ফ্যাকড়া। শুধু নেই আর নেই। পাবলিকের কেবল এটা চাই, ওটা চাই। তারপর সেই ব্যাটা আবার দুম করে গেল মরে। ঝিলডাঙায় ডেডবডি এল। বডি দেখে ঝিলডাঙার কিছু এসে গেল না। ট্রাকের ভেতর উঁকি মারল এই পর্যন্ত।

সেই থেকে ঝিলডাঙা অনাথ। অনেকদিন পর এবার সুযোগ এসেছে।

মোহন বলল, 'কী হল দাদা বললে না? ঝামেলাটা কী? বল আজই পরিষ্কার করে দিই।'

কাদু সামান্য হেসে বলল, 'আচে রে। সময় হলে বলব। আগে দেখি ময়লা নিজে ফর্সা হয় কিনা। নইলে আড়ংধোলাই তো দিতেই হবে। তবে যাই হোক, তোরা দুজনেই শুনে রাখ, এখন থেকেই একটা জমি তৈরি করতে হবে। সাদা পোশাক দিয়ে সেই জমি তৈরির কাজ শুরু করেচি। এরপর একটার পর একটা কাজ আসবে। হাতে সময় আচে, সাবধানে এগোতে হবে। তাড়াহুড়ো করলেই ঘেঁটে যাবে।'

একটু পরেই এ-বেলার মতো দোকান বন্ধ করত গোপীনাথ। কাদু ঢুকতে আগেই ঝাঁপ টেনে দিল আদ্দেকটা। কাদু তার দোকানে বসে আছে—এই দৃশ্য গাঁয়ের লোক যত কম দেখে তত মঙ্গল।

'কী খাবেন? জল দিই? চা বলব?'

কাদু চুপ করে রইল। ভগবান, শয়তান দুজনে চুপ করে থাকাটাই ভয়ের। ভগবানের বেলায় একরকম দুশ্চিন্তা, শয়তান হলে অন্যরকম। অনেক ডাকাডাকির পরও ভগবান যখন সাড়া দেয় না, মনে হয়, কৃপা বুঝি আর পাওয়া যাবে না। আর শয়তানে চুপ করে থাকা দেখে বুকে কাঁপুনি আনে। মনে হয় এই

boierpathshala.blogspot.com

বুঝি হাত বাড়িয়ে চুলের মুঠি চেপে ধরল, অথবা টিপে ধরল গলা।

তবে এই মুহূর্তে গোপীনাথ জানে কাদু শয়তান কেন তার কাছে এসেছে।

জুতোর মালার ধাক্কা সবে সামলে উঠছে গোপীনাথ। না সামলে চলবে কেন? সারাক্ষণ ফন্দিফিকিরের মধ্যে বেঁচে থাকতে হয়, জুতো, লাথি, চড় থাপ্পড়ের কথা বেশিক্ষণ মনে রাখলে চলে না। ঘটনার কিছুদিন পরে হঠাৎ এক সন্ধেতে কাদু এসে হাজির। একগাল হেসে বলল, 'ডাক্তার আচো কেমন?'

ভাবটা এমন যেন কিছুই ঘটেনি। গোপীনাথের সঙ্গে সম্পর্ক অতি মধুর চলছে।

গোপীনাথ ব্যস্ত হয়ে হাতের কাজ সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাত কচলে বলে, 'ভালো আছি রে ভাই, খুবই ভালো আছি। এসো, ভেতরে এসো। আজ কিন্তু চা না খাইয়ে ছাড়ব না।'

কাদু গলা নামিয়ে বলল, 'ওসব চা-ফা ছাড়ো ডাক্তার, একটা কথা চিল।'

গোপীনাথ ঘাবড়ে যায়। এই মানুষ যতটা সাংঘাতিক জানা ছিল, তার থেকেও যে বেশি সাংঘাতিক তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে গোপীনাথ। সদানন্দের বউমার মৃগী রোগের সময়েও একইভাবে 'কথা চিল' বলে শুরু করেছিল বজ্জাতটা। দরজার দিকে সতর্ক তাকিয়ে কাদু গোপীনাথের দিকে ঝুঁকে পড়ল। গলা নামিয়ে বলল, 'একটা পেরাইভেট ওষুধের জন্য তোমার কাচে এলাম।'

'পেরাইভেট ওষুধ!' ভুরু কুঁচকে বলল গোপীনাথ।

কাদু চোখের ইঙ্গিত করে মিটিমিটি হেসে বলল, 'আস্তে বল। আস্তে বল গোপীনাথ। পেরাইভেট ওষুধ কী জানো না তুমি? কেমন ডাক্তার হে? পেরাইভেট অসুখের জন্য পেরাইভেট ওষুধ।'

হাসতে হাসতে ঠোঁট চাটল কাদু।

'অসুখটা কী?'

'যা শালাঃ তুমি তো এক্কেবারে দেকচি কাঁচা মাল গো। সজনে ডাঁটা।'

'হ্যা হ্যা' করে কদর্য হাসল কাদু।

গোপীনাথ ভুরু কোঁচকাল। হারামজাদা শরীরে কী নিয়ে এসেছে? পাড়া-গাঁয়ে দাদ, হাজা, চুলকানি আছে, সিফিলিস, গনোরিয়ার পাট নেই। তবে এ-লোকের সব হতে পারে।

'অসুখটা যদি একটু খোলসা করে বলতে ভাই চিকিচ্ছেতে সুবিধে হত।'

কাদু সোজা হয়ে বসল।

boierpathshala.blogspot.com

'হুট করে কেউ চলে আসবে না তো গোপী?'

'না। তবে যদি অসুবিধে লাগে...।'

কাদু বলল, 'ডাক্তারের কাচে আবার লজ্জা কী?' তারপর হাতের অশ্লীল ইঙ্গিত করে বলল, 'মেয়েচেলের সঙ্গে কাজের সময় সমস্যা হয়। হাজার কারিকুরিতেও যন্তর জাগে না। ব্যাটা ঝিমিয়ে থাকে। বাধ্য হয়ে শুধু ঘাঁটাঘাটি করে ছেড়ে দিই। শুধু ঘাঁটাঘাটিতে কি মেয়েমানুষ খুশি হয় ডাক্তার? নাকি আমি হই? বিয়ে-থা করোনি তুমি বুঝবে না।'

আবার হাসল কাদু। সেই হাসি দেখাল খানিকটা অসহায়ের মতো। গোপীনাথ মাথা নামাল। ও এই তাহলে ঘটনা, হারামজাদা নপুংসক!

কাদু ফিসফিস করে, 'কলকাতা থেকে বিদেশি মাল এনেচিলাম। চাইনিজ জিনিস। শালারা বলেচিল, কাজের আধঘণ্টা আগে দুটো গুলি খেলেই হবে। শরীর একেবারে ঘোড়ার মতো টগবগ করে উঠবে। কোতায় টগবগ! উলটে মোটবওয়া গাধার মতো আরও মিইয়ে যায়। কী মুশকিল বল দেকি ডাক্তার। কাপড়-চোপড় খুলে রেডি, সেই টাইমে যদি কেলিয়ে পড়ি... জিনিস যেখান থেকে কিনেছিলাম, চলে গেলাম সেখানে। কুত্তার বাচ্চাটাকে যদি পাই, শালার ইয়ে ছিঁড়ে আনব। দেকি ফুটপাথ ফাঁকা। জালি মাল গচিয়ে ভেগে পড়েচে। কলকাতাটা শালা ঠকবাজদের জায়গা।'

গোপীনাথের ভয় করছে। এই চিকিৎসা সে কখনও করেনি। কাদু তার কাছে যা চাইছে সে-ওষুধ কোথা থেকে দেবে? কাদু মোড়া টেনে আরও এগিয়ে এল।

'শুনেছি দিশি জিনিস আচে। ঘরে বানানো যায়। পাড়াগাঁয়ের মেয়েমানুষ বাগে আনতে ওই জিনিসই নাকি সবথেকে ভালো। তুমি পারবে নাকি গোপীনাথ? দ্যাখো না, ঘাস পাতা বেটে কিছু বানাতে পারো কিনা। বেশ জব্বর একটা। এক ডোজ খেলেই শালা ইয়ে একেবারে এক্সপ্রেস গাড়ির মতো ছুটবে। হ্যা হ্যা।'

চোখ নাচিয়ে, শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে হাসতে লাগল কাদু।

কাদুর ভাবভঙ্গির বেহায়াপনায় গোপীনাথ লজ্জা পায়। শুধু লজ্জা পায় না, আতঙ্কিতও হয়। হারামজাদা যা চাইছে তা সত্যি হলে ভয়ংকর। কিন্তু তার উপায় কী? সে মাথা নামিয়ে বলে, 'দিনকয়েক সময় লাগবে ভাই। চেষ্টা করে দেখতে হবে।'

'তুমি এক হপ্তাই নাও ডাক্তার। ঠান্ডা মাতায় কাজ করো। কিন্তু দ্যাকো বাপু

boierpathshala.blogspot.com

গোলমাল কিচু কোরো না। ঠিক সময়ে না হলে মাতায় আগুন লেগে যায়। তুমি বুঝবে না বাপু, বিয়ে থা করনি। তুমি বুঝবে কী করে?'

হারামজাদা বারবার বিয়ের কথা বলছে কেন? মেয়েছেলে নিয়ে নোংরামি, ফুর্তির সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক কোথায়! গোপীনাথের ইচ্ছে করল, পায়ের জুতোটা খুলে কাদুর গালে সপাটে মারে। এমন সপাটে যাতে গালটা তেব্‌ড়ে যায়। তারপর হাতে কয়েকটা নকুলদানা ধরিয়ে বলে, 'নে আর ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদতে হবে না। এটা মুখে ফেলে বাড়ি যা। ফের যদি আমার কাছে এসে নোংরামি করিস অন্য গালটাও তেবড়ে দেব।'

মনের ইচ্ছে মনেই গোপন করে মাথা নাড়ল গোপীনাথ। বিড়বিড় করে বলল, 'না, আমি বুঝব না।'

হপ্তাখানেক লাগেনি। তিনদিনেই কাজ শেষ হয়েছে। রাত জেগে বইপত্তর হাতড়ে সেই 'পেরাইভেট ওষুধ'-এর মোটামুটি একটা ফর্মুলা তৈরি করে ফেলেছে গোপীনাথ। ফর্মুলা সহজ। মূল উপাদান বরবটির বীজ। বালিতে কড়কড়ে করে ভাজতে হবে। সেই ভাজা বীজের সঙ্গে মেশাতে হবে এক কাপ দুধ আর কাপ তিনেকের মতো জল। ফোটাতে হবে ভালো করে। গুলে, ঘেঁটে, সিদ্ধ করে ফেলতে হবে একেবারে থকথকে ক্বাথের মতো। জিনিস নাকি একেবারে অব্যর্থ। খেতে হবে দিনে একবার। হপ্তাখানেক নিয়ম করে খেলেই কাজ হবে। বইতে লেখা আছে, এতে জোশ উদ্দীপনা সবই বাড়বে। কাজের সময় ফল পাওয়া যাবে হাতেনাতে।

এরপর থেকেই চিন্তায় রয়েছে গোপীনাথ। কাজ হবে তো? না হলে গোলমাল।

কাদু আজ সেই জিনিসই নিতে এসেছে। সে চোখ নাচিয়ে বলল, 'তৈরি হয়েচে?'

'হয়েছে।'

কাদুর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। বলল, 'কেমন হল?'

গোপীনাথ ঢোঁক গিলে বলল, 'সে তো আমি বলতে পারব না ভাই।'

কাদু বিশ্রী দাঁতে হেসে বলল, 'তা তো বটেই, তুমি বলবে কী করে? তুমি হলে নিরামিষ মানুষ। মাংস খাওয়ার দাঁত ঘষে তোমার কী লাভ? দাও দিকিন, টেস্ট করে দেকি পেরাইভেট ওষুধে পেরাইভেট কাজ কেমন হয়। হ্যা হ্যা।'

কাগজে-মোড়া-শিশি হাতে কাদু বেরিয়ে যেতে গোপীনাথ কপালে হাত ঠেকাল। কে জানে এবার নতুন কী বিপদ আসছে। না, এই বদটার হাত থেকে

boierpathshala.blogspot.com

বাঁচতে এবার সত্যি সত্যি ঝিলডাঙা ছাড়তে হবে।

কাদুর মাথায় ছাতা ধরে মোহন বলল, 'ফিরবে তো ওস্তাদ?'

কাদু শিশি মোহনের হাতে দিয়ে বলল, 'সাবধানে ধর। ফেরার আগে একটা জায়গায় ঘুরে যাই চল।'

'কোথায়?'

পায়জামা দু-হাত দিয়ে তুলে লাফ মেরে খানিকটা জল ডিঙোল কাদু। মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'শালার রাস্তা দেকেচিস মোহন? বৃষ্টি পড়লেই কী হাল!'

মোহন হেসে বলল, 'বাবা, তুমি যেন ঝিলডাঙায় প্রথম বৃষ্টি দেখছ মাইরি।'

'সত্যি যদি ভোট-ফোটে দাঁড়িয়ে একবার জিতে যাই, ঝিলডাঙার থোবড়া একদম পাল্টে দেব এই তোকে বলে রাখলাম।'

'কী করবে?'

'দেখতেই পাবি। সবাই হাত তুলে এই কাদু হারামিটার জয়গান করবে। জয়গান কী জানিস?'

নিজেকে গাল দিয়েও মনে মনে খুশি হল কাদু। ভেতরে একটা 'নেতা নেতা' ভাব আসছে নাকি? লোভ বাড়ছে? বাড়ুক । লোভ না বাড়লে কিছু করা যায় না। টাকা, মেয়েমানুষ আর ক্ষমতা এই তিন জিনিসের প্রতি লোভ যত বাড়বে পুরুষমানুষ তত 'বড়ো' হবে। সে তো তুমি সাধুই হও আর ডাকাতই হও। এ শালা শাস্ত্রেই লেখা আছে। বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের লেখা জিনিস, ভুল হওয়ার উপায় নেই। পণ্ডিতদের কথায় মন আপ্লুত হয়ে গেল কাদুর। সে মোহনকে ধমক দিয়ে বলল, 'বকবক না করে তাড়াতাড়ি পা চালা দেকি।'

কাটাখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আজও রেনি-ডে। এই নিয়ে পরপর তিনদিন স্কুল বন্ধ রইল। বৃষ্টিবাদলায় স্কুল বন্ধ রাখা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। ভাঙা ক্লাসঘরের ভিতরে জল, আবার বাইরেও জল। চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসে আছেন। মনটা ভালো-মন্দেতে মেশানো। বাথরুমের একটা গতি হয়েছে এইটা ভালো। কিন্তু বাড়িটার অবস্থা তো খুব খারাপ। জানলা, দরজার অবস্থা ভয়ংকর। এবারের বৃষ্টিতে ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়েছে। একটা চাঙড় নয়, দু-দুটো চাঙড় পড়েছে। আরও খানকতক পড়ব পড়ব করছে। এরপর বাচ্চাদের বসানো ভয়ের ব্যাপার হয়ে যাবে। কখন কী ঘটবে তার ঠিক নেই। বাড়ি না থাকলে কীসের বাথরুম? আবার সদরে দৌড়াদৌড়ি? সামান্য বাথরুমের জন্য এতগুলো বছর গেল, বাড়ির জন্য তদ্বির করতে তো গোটা জীবনটাই

boierpathshala.blogspot.com

কেটে যাবে।

এই কারণে মনটা ভেঙে আছে মাস্টারের। বেড়ার গেট ঠেলে কাদুকে ঢুকতে দেখে তিনি নড়েচড়ে বসলেন। লোকটা ভালো নয়। কিন্তু তার উপকার করেছে। মানা সরকারের কাছে পাঠিয়েছিল। আচ্ছা, বাড়ির কথাটা একে একবার বলে দেখলে কেমন হয়? ক্ষতি কী? কিছু তো হয়েই যেতে পারে।

কাদু দূর থেকে হাসল। কাছে এসে বলল, 'মাস্টারমশাই আচেন কেমন?'

চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এসো কাদু, ভেতরে এসো।'

কাদু হাত বাড়িয়ে বলল, 'আরে আপনে বসেন দেখি। ভেতরে আসব না, এদিক দিয়ে যাচ্চিলাম, ভাবলাম একবার যাই ঘুরে। ইস্কুল, কলেজ তো মন্দিরের মতো। নিজে লেখাপড়া শিকতে পারিনি বলে কি মন্দির দশ্‌শন হবে না?''

চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া বারান্দা থেকে নামতে নামতে বললেন, 'তোমার কাছেই যেতাম কাদু। বাথরুমটা মনে হয় হয়ে যাবে। গভর্নমেন্টের লোক ঘুরে গেছে। হলে তোমার জন্যই হবে।'

'কী যে বলেন মাস্টার। আমার জন্য কোতায়? আপনি লেগে পড়ে চিলেন। তাই হচ্ছে।'

কাদু চারপাশে তাকাতে তাকাতে বলল।

'আজকাল লেগে থাকলে কিছু হয় না। নেতা মন্ত্রীর মতো মুরুব্বি ধরতে লাগে। ওটাই আসল। তুমি না বললে মানাবাবুর কাছে হয়তো আমার কোনোদিন যাওয়াই হত না। জুতোর শুকতলা খুইয়ে ঘুরে বেড়াতাম।'

'ঠিকই বলেচেন। হাগু-মুতুও এখন লিডারদের হাতে। হ্যা হ্যা।'

লোকটার কথাবার্তা খারাপ। আচরণ ভঙ্গিও গুন্ডা মাস্তানদের মতো। তা হোক। আজকাল ভদ্রলোক দিয়ে সব কাজ হয় না। বেশির ভাগ কাজই হয় না। চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন, কাদুকে স্কুল বাড়ির কথাটা আজই বলবেন। এখনই।

'এই দ্যাখো কাদু, বাড়িটার কী হাল হয়েছে!'

কাদু চোখ পিটপিট করে বলল, 'কী হাল?'

চিত্তরঞ্জন কাদুর পাশে এসে দাঁড়ালেন। হাত তুলে বললেন, 'নিজের চোখেই দ্যাখো। দরজা, জানলা নেই, ছাদ ভেঙে পড়ছে। বারান্দা, উঠোনে ছেলেমেয়েদের এনে পড়াই, বৃষ্টিবাদলায় সে-পথও বন্ধ।'

কাদু স্থির চোখে তাকাল মাস্টারের দিকে।

চিত্তরঞ্জনবাবু বলতে থাকলেন, 'এতদিনের স্কুল। ঝিলডাঙায় এমনিতেই

boierpathshala.blogspot.com

লেখাপড়ার পাটবালাই নেই বললেই চলে। এটাও যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তো গেল।'

কাদুর মাথায় দুর্বুদ্ধি খেলছে। শয়তানের সঙ্গে থাকার এই এক সুবিধে। ব্যাটা নিজের চ্যালা চামুণ্ডার মাথায় সময় বুঝে বিদ্যুতের চমক পাঠায়। সাধারণ অগা বগারা হিংসে করে একে বলে শয়তানি। সে চাপা গলায় বলল, 'এই জমি বাড়ি কার মাস্টার? মালিকটা কে?'

চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া উৎসাহ পেলেন। লোকটা প্রশ্ন করছে মানে, বিষয়টা মাথায় ঢুকেছে।

'সে এখন কী আর আলাদা করে কারও রয়েছে? কাটাখালি স্কুলেরই বলতে পারো। কতবছর আগের ঘটনা। কাগজপত্রও কিছু নেই। শুনেছি, একসময় মানিক আঢ্য নামে কে একজন স্কুলের জন্য দান করেছিল। ঝিলডাঙারই লোক ছিল। জমিদার মানুষ। সেই ফ্যামিলিই এখন উধাও। তাও পঞ্চাশ বছরের কম হবে না।'

কাদু ভাঙা স্কুলবাড়ির দিকে ঠোঁট চেটে বলল, 'অ, তাহলে আপনিই এখন মালিক?'

'দুর, কী যে বল কাদু, আমি কীসের মালিক? আমি সামান্য মাস্টার। স্কুলটা বাঁচানোর চেষ্টা করছি। ঝিলডাঙাকে ভালোবাসি। এখানকার ছেলেমেয়েগুলো যদি দুটো লেখাপড়া শেখে ভালো লাগে।'

কাদু মনে মনে চমকে উঠল। এই কথাটাই গোলমেলে। তুই ব্যাটা ফেকলু মাস্টার, ঝিলডাঙা ভালোবাসার তুই কে রে শুয়ার? মানা হারামজাদাকেও কথাটা বলেছে নিশ্চয়। মানাও কথাটা লুফে নিয়েছে। ভালোবাসার লোককে ভোটে দাঁড় করিয়ে জেতাতে চাইছে। মাস্টারকে মানার কাছে পাঠানোই বিরাট বোকামি হয়েছে। লাইন চেনানো ঠিক হয়নি। এই হল মুশকিল, ছোটোখাটো বিষয়কে গুরুত্ব না দিলে বড়ো ভুল হয়ে যায়, তখন পস্তাতে হয়। সেই কারণেই এই খুঁটিয়া মাস্টারকে এখন গুরুত্ব দিতে হবে। শালার পশ্চাদ্দেশ থেকে ঝিলডাঙার ভালোবাসা টেনে বের করতে হবে। তারপর সেই ভালোবাসা গোপী ডাক্তারের বলবর্ধক ওষুধের মতো শিশিতে ভরে মানা সরকারের সামনে ছুড়ে দিয়ে বলতে হবে—'এই নিন,আপনার ভালোমানুষের নমুনা'। নইলে এই মাস্টার এখন স্কুলের ভালো দেখছে, এরপর ঝিলডাঙার ভালো দেখবে। এখনই থামাতে হবে।

কাদু চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'খুলে বলুন দিকি।'

চিত্তরঞ্জন এক পা এগিয়ে কাদুর হাতটা সামান্য ধরল। বলল, 'দ্যাখো না

boierpathshala.blogspot.com

বাবা, এই বাড়িটা যদি মেরামতের কোনো ব্যবস্থা করতে পারো।'

কাদু ঠোঁটের ফাঁকে হাসল। এই হাত ধরাটাই সে চাইছিল। মানুষ যত বিশ্বাস করে হাত ধরবে শয়তানের কাজে তত সুবিধে হবে। আঁচড়ে দিতে সুবিধে। সে নীচু গলায় বলল, 'চিন্তা করবেন না। একটা কিছু হয়ে যাবে। কাল পরশু করে আমার ওখানে চলে আসেন। দুজনে কথা বলি। খরচাপাতির হিসেব করি। অ্যাই মোহন, অ্যাই শালা মোহন।'

খানিকটা পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা মোহন প্রায় ছুটে এলো।

'কী হল দাদা?'

'তুই নিজে এসে মাস্টারকে আমার কাছে নিয়ে যাবি। সকালে নয়, সন্ধের পর নিয়ে যাবি। আমি আবার সকালে ভালো করে কিছু ভাবতে পারি না। মাতা শালা কাজ করে না।'

কথা শেষ করে বিশ্রী আওয়াজে হাসল কাদু।

আবার ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া স্কুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছাতা মাথায় কাদুর চলে যাওয়া দেখলেন।

তিনি জানতেও পারলেন না কী ভয়ংকর বিপদ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে।

boierpathshala.blogspot.com

চব্বিশ

কথা,

আমার চিঠি পেয়ে নিশ্চয় খুব অবাক হচ্ছ। হওয়াই স্বাভাবিক। চিঠি লেখার অভ্যেস আমার কোনোদিনই ছিল না। সে-কথা তুমি আমার থেকেও ভালো করে জানো। আজও সেই অভ্যেস নেই। আমার সঙ্গে মেলামেশার সময় এই নিয়ে তুমি কম রাগারাগি করোনি। প্রথম প্রথম নাক ফুলিয়ে বলতে, একটা চিঠি লিখতে পারো না? আমি অবাক হতাম। বলতাম, চিঠি! চিঠি কেন লিখব! তুমি বলতে, কেন মানে! আমাকে বলার মতো তোমার কোনো কথা নেই? আমি বলতাম, থাকবে না কেন! খুব আছে। এই তো তোমার সঙ্গে দেখা হয়, টেলিফোন করি। যা বলার সবই তো তখন বলি। চিঠিতে নতুন করে আর কী লিখব? তুমি অভিমান করে বলতে, না অন্য কিছু, আরও কিছু বলার নেই? আমি হেসে বলতাম, থাকলে বলব। সামনাসামনিই বলব। মনে পড়ে, তোমার মুখ ভার হয়ে যেত। চোখ ফিরিয়ে বলতে, থাক, লিখতে হবে না। আমি তখন তোমার মুখ ভারের কারণ বুঝতাম না। এখন পারি। তুমি ঠিকই করতে। সব মেয়েরাই তাদের প্রেমিকের কাছ থেকে চিঠি আশা করে। ভালোবাসার মানুষের চিঠির আকর্ষণ মারাত্মক। এর জন্য দীর্ঘ অপেক্ষাও তাদের কাছে কিছু নয়। মনে হয়, ভালোবাসার কথা মুখে শুনতে যেমন ভালো লাগে, চোখে পড়তেও তেমন ভালো লাগে। মুখের কথা কাগজের পাতায় এসে নতুন হয়ে যায়। প্রেমিকের চিঠি যেন শুধু চিঠি নয়, একটা আস্ত মানুষ। তাকে ইচ্ছে মতো ছিঁড়েখুঁড়ে আদর করা যায়। যুগযুগান্ত ধরে কেমন একই কাণ্ড চলছে তাই না? এখন হয়তো শুধু মাধ্যম বদলেছে। কাগজের বদলে ছেলেমেয়েরা আজকাল এস এম এস বা মেল্-এ চিঠি দেয়ানেয়া করে। তোমার অভিমান সামলাতে মাঝখানে আমিও চিঠি লেখার অভ্যেস

boierpathshala.blogspot.com

করলাম। তোমার নিশ্চয় মনে আছে, দু-একটা দিয়েছিও। এক দু-লাইনের সব চিঠি। আমার লেখা দুটো চিঠির কথা আজও আমার পরিষ্কার মনে পড়ে কথা। 'কাল তোমাকে বাসে তুলে দেওয়ার পরপরই স্যান্ডেলটা গেল ছিঁড়ে। মুচি খুঁজতে খুঁজতে বাড়ি পর্যন্ত চলে গেলাম। কী মজা বলো তো? পয়সা বেঁচে গেল। বাসেও উঠতে হল না, ছেঁড়া স্যান্ডেলে চেপে বাড়ি চলে এলাম! অথবা, 'কোনান ডয়েল তাঁর সমাধিফলকের জন্য লিখে গিয়েছিলেন, ইস্পাতের মতো সত্যি, তরবারির মতো সোজা। আশ্চর্য! মৃত্যুর মতো একটা বেদনাময় জিনিসকে কত কঠিন ভাবে নেওয়া! আজ সারা সকালটা এই এপিটাফটা নিয়েই কেটে গেল।

মনে আছে, তৃতীয় দিনের মাথায় তুমি বললে, ব্রতীন, তোমাকে আর কষ্ট করে চিঠি লিখতে হবে না। দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে, বুকের নীচে বালিশ দিয়ে, জানলার পর্দা টানার মতো হাজার আয়োজন করে ছেঁড়া স্যান্ডেল বা কোনান ডয়েলের মৃত্যুফলক পড়বার সময় বা ইচ্ছে কোনোটাই আমার নেই। তার চেয়ে তুমি বরং চল, একটা জুতো কিনে দিই। আমি খুব হাসলাম। তারপরই চিঠি লেখার ব্যর্থ চেষ্টা ত্যাগ করি।

এতদিন পর আজ আবার তোমায় লিখতে বসেছি। লিখতে বসেছি এমন একটা সময়ে যখন আর তুমি আমার কাছ থেকে কোনো চিঠি আশা কর না। উলটে চিঠি পেলে বিরক্ত হবে। অথচ কয়েকটা জরুরি কথা তোমাকে বলা দরকার কথা। টেলিফোন করে বা সামনাসামনিও বলা যেত। কিন্তু আমার কথা শোনার জন্য তুমি এতটা সময় কেন দেবে? আমিই-বা চাইব কীসের জোরে? সেই কারণে অনেকদিন পর কাগজকলম নিয়ে বসলাম।

কথা, প্রথমেই তোমার কাছে দুঃখপ্রকাশ করছি। সেদিন হুট করে তোমার বাড়িতে চলে যাওয়াটা আমার একেবারেই উচিত হয়নি। আসলে ভেবেছিলাম, বাড়িতে নয়, তোমার কাজের ওখানে যাব। অফিসের ভেতর ঢুকব না। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করব। তুমি কাজ শেষে বেরোলে দেখা হবে। তারপর চিন্তা করে দেখলাম, কাজটা বেশি নাটকীয় হয়ে যাবে। চেনা কেউ দেখে ফেললে তোমার পক্ষে অপমানেরও হতে পারে। ছেড়ে যাওয়া স্বামীর দেখা করতে আসা অপমানের ছাড়া আর কী? তাই বাড়িই বাছলাম। অন্তত বাইরের লোক থাকবে না। কিন্তু গিয়েও কোনো লাভ হল না। যা বলতে গিয়েছিলাম বলতে পারলাম না। তুমি আমাকে সময় দাওনি, তবে সুযোগ দিয়েছিলে। সেই সুযোগ আমি কাজে লাগাতে পারিনি। উলটে আরও একটা অন্যায় করে বসলাম সেদিন। 'খিদে পেয়েছে' বলে তোমাকে খাবার আনতে বললাম। তারপর না খেয়ে চুপিচুপি পালিয়ে এসেছি। পরে

boierpathshala.blogspot.com

বুঝতে পেরেছিলাম এই কাজটা মোটেও ঠিক হয়নি। কিন্তু যখন বুঝতে পারলাম তখন আর সংশোধন করার উপায় ছিল না। একটার পর একটা ভুল। ভুলের এটাই নিয়ম কথা। একটা আর একটার দিকে ঠেলে দেয়। আশা করি তুমি আমাকে বুঝবে এবং ক্ষমা করবে।

কথা, তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর বেশ কয়েকটা দিন অস্বস্তির মধ্যে ছিলাম। অস্বস্তি না বলে ছটফটানি বলাই ভালো। কোনো কিছুতেই ঠিকমতো মনঃসংযোগ হত না। না কাজে, না লেখাপড়ায়। সেটাই স্বাভাবিক। খুব বেশিদিনের জন্য না হলেও কিছুদিনের জন্য তো একটা অভ্যেসের মতো হয়ে গিয়েছিল। দুজনে থাকার অভ্যেস। সবসময়ই ভাবতাম কেন এরকম হল? কী এমন ঘটল যাতে তোমাকে সরে যেতে হল? একটা সময় নিজেই সেই উত্তর পেলাম। বুঝতে পারলাম, তুমি সরে যাওনি, আসলে খুব ধীরে ধীরে আমিই সরে এসেছি। যে ধরনের ন্যূনতম জীবন একজন নারী তার স্বামীর কাছ থেকে আশা করে সেই জীবন থেকে আমি সরে এসেছি। তোমার যে খুব বিরাট কোনো চাহিদা ছিল এমন নয়। তুমি চেয়েছিলে মোটামুটি একটা রোজগার। দিনের শেষে দুজনে মুখোমুখি বসে একটু গল্প, বছরে একবার ছোটোখাটো কোথাও বেড়াতে যাওয়া। ব্যস, তার বেশি কিছু নয়। তুমি হলে সেরকমই একজন চমৎকার মেয়ে যে গাদাখানেক ফুল এনে ফুলদানিতে সাজাতে চায় না। টেবিলের পাশে একটা দুটো অগোছালো পড়ে থাকলেই খুশি। ঘরের রোজকার হাজার কাজের মধ্যে মাঝেমধ্যে চোখে পড়লেই হল, না পড়লেও ক্ষতি নেই। আছে, এইটুকুই যথেষ্ট। আমি তোমাকে তাও দিতে পারিনি। জীবনযাপন সম্পর্কে আমার সংশয়, আমার বিহ্বলতা, আমার সন্ধান সর্বদা আমাকে অস্থির করেছে। বেঁচে থাকার মানে খুঁজতে গিয়ে জট পাকিয়ে ফেলেছি। বিশ্বভরা প্রাণের মাঝে নিজের প্রাণকে ছুঁতে গিয়ে গোলকধাঁধায় পড়ি বারবার। এই অস্থিরতা শুধু যে আমার কেরিয়ারকে নষ্ট করেছে এমন নয়, ব্যক্তিজীবনেও প্রভাব ফেলেছে। তুমি এসব শুনে হয় বিরক্ত হচ্ছ, নয় হাসছ। প্লিজ কথা, একটু সময় দাও। এতদিন পরে কৈফিয়ত নয়, ভুল স্বীকারের সময় চাইছি। অথবা কী জানি, হয়তো ভুল নয়, নিজেকে স্বীকার করতে চাইছি। খুলতে চাইছি নিজেকে। পোশাক খুলে দুজন নগ্ন মানুষ পরস্পরকে চিনতে পারে না। সঙ্গম শেষের ক্লান্তি কি শুধু শরীরের? তৃপ্তির? ব্যর্থতার নয়? এত কাছে গেলাম, নিজেকে উন্মুক্ত করলাম পুরো, তাও পারলাম না। বুঝতে পারলাম না, বোঝাতেও পারলাম না।

তুমি নিশ্চয় হাসছ। ভাবছ, ফালতু, অকর্মণ্য, আলসে একটা লোকের মুখে বড়ো বড়ো কথা! ঠিকই। আমি কবি, সাহিত্যিক নই, দার্শনিকও নয়।

boierpathshala.blogspot.com

তাদের ছিটেফোঁটা যোগ্যতাও আমার নেই। জীবন সম্পর্কে বড়ো কেন, ছোটো কথা বলার অধিকারও যে নেই আমার তা আমি ভালো করেই জানি। একজন কবি তার বিহ্বলতা, বিপন্নতার কথা লিখতে পারেন। ঈশ্বর তাঁকে সে-ক্ষমতা দিয়েছেন। একজন দার্শনিক জানাতে পারেন জীবনবোধের গভীর তত্ত্ব। বধূ শুয়েছিলো পাশে—শিশুটিও ছিলো;/ প্রেম ছিলো, আশা ছিলো, —জ্যোৎস্নায় —তবু সে দেখিল / কোন ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার? অথবা টু স্ট্রং ইজ ডেসটিনি, নো ওয়েলথ, নো আরমারি, নো টাওয়ার, নো শিপ দ্যাট রাইডস দ্য অ্যাংগরি সী...।

আমি পারি না। এলোমেলো কুয়াশার জালে জড়িয়ে পড়ি। সেই জাল ছিঁড়তে গিয়ে দেখি, তারা আমাকে আরও ঘিরে ধরছে।

ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দেওয়ার পর পর খুব সমস্যায় পড়েছিলাম। চারদিকে সমালোচনা, হা-হুতাশ আর নিন্দে। তার থেকেও বড়ো কথা, সবাই শুধু জিজ্ঞেস করত, এরকম একটা অবিবেচকের মতো কাজ আমি কেন করলাম? পড়া ছেড়ে দেওয়ার ঘটনা সংসারে এই প্রথম নয়। অনেকেই ছেড়েছে। ছেড়ে কিছু না কিছু করেছে। তাদের কি শুধু গুণ ছিল? ক্ষমতা ছিল? না, আসলে ছিল উদ্যম। আরও একটা কিছু করব এই ইচ্ছেটা ছিল প্রবল। আমি সেই দলের নই। আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, পরিচিতজনেরা জানত আমি সেই দলের নই। অন্য কিছু করার জন্য আমি মেডিকেল কলেজে যাওয়া বন্ধ করেছি, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। আমার বিশ্বাস করাতে যাওয়াটাও কঠিন ছিল। সত্যিই তো আমি কেন ছেড়েছি? যদিও আমার কাছে উত্তর খুব স্পষ্টই ছিল। ভেতরে একধরনের অস্থিরতা নিয়ে এই ধরনের সিরিয়াস কাজে জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়। বিশেষ করে যে-পেশায় সরাসরি অন্য মানুষের ভালোমন্দ নির্ভর করছে। আমার মন ভালো না থাকলেও অপারেশন থিয়েটারে ঢুকতে হবে। ইচ্ছে না করলেও রোগীর নাড়ি পেট টিপে অসুখ ধরতে হবে। একটু ভুলচুক হলে যার মূল্য অনেকটা। আমি সরে এলাম। সেই সময় তুমি এলে কথা। আমার ইচ্ছেকে মূল্য দিলে। আমি তার প্রতিদান দিতে পারলাম না। জীবন, সুখে বেঁচে থাকা, অপরকে বাঁচিয়ে রাখা সম্পর্কে আমার গুলিয়ে যাওয়া, অস্বচ্ছ ভাবনা আমাকে একজন কর্মবিমুখ (সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য যেটুকু কাজকর্মের প্রয়োজন), অলস মানুষে পরিণত করল। একটার পর একটা চাকরি বদলাতে লাগলাম। বলা ভালো মন বসাতে পারলাম না। অর্থের টানাটানিতে কোনো কোনো সময় সকালে বাজার করাটাও অসম্ভব হয়ে উঠছিল। কথা, আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তুমি বলেছিলে, একজন নিস্পৃহ, অলস মানুষের সঙ্গে অনেক কিছুই করা যায়, কিন্তু দিনের পর দিন

boierpathshala.blogspot.com

একসঙ্গে থাকা যায় না। আমি রসিকতার ছলে সেদিন বলেছিলাম, কেন সাধু সন্ন্যাসীরা তো নিস্পৃহই। তুমি রেগে বলেছিলে, 'সাধু বা ডাকাত কোনটা হওয়ার যোগ্যতাই তোমার নেই'। সেদিন মনে মনে দুঃখ পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, কথাও আমাকে শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারল না। পরে বুঝেছিলাম, ঠিকই বলেছিলে। সাধু-ডাকাত তো অনেক বড়ো ব্যাপার। কিছু হওয়ার যোগ্যতাই আমার নেই।

যাক; অনেক অবান্তর কথা লিখে ফেললাম। অবান্তর আর অসংলগ্ন। আমার এই বকবকানি পড়তে পড়তে তুমি নিশ্চয় এতক্ষণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ (যদি না এতক্ষণে চিঠি ফেলে দিয়ে থাকো)। এরকমই বোধহয় হয়, যখন লেখার দরকার ছিল তখন লিখতে পারিনি, আজ থামতে পারছি না। যে-কারণে যুক্তি বুদ্ধি হারিয়ে সেদিন তোমার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম সেটাই এবার সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করি।

ঠিক তিন মাস আগের কথা। না, ঠিক তিন মাস নয়, সম্ভবত তিন মাসের একটু বেশিই হবে। হঠাৎ রাতে ঘুম ভেঙে গেল। রাতে ঘুম ভেঙে যাওয়া আমার কাছে নতুন কিছু নয়। কোনোদিন কোনোদিন সারারাত জেগেও কাটাই। রান্নাঘরে গিয়ে চা বানাই। রাত জেগে চা খাওয়ার বিচ্ছিরি অভ্যেস তোমার কাছ থেকেই শেখা। মনে আছে কথা, ঘুম না এলে দুজনে রাতদুপুরে কেমন গল্প করতাম? তুমি চা বানাতে। আমি বলতাম, এত রাতে চা! তুমি বলতে, চা না খেলে খালি চায়ের কাপ এনে দিই, তুমি ধরে বসে থাক। কাপ হাতে না নিলে গল্প জমে না। মনে পড়ে? এখনও কি তোমার এই বিচ্ছিরি অভ্যেসটা আছে? এখনও কি রাতে ঘুম ভেঙে গেলে চা বানিয়ে খাও?

যাক, আবার অন্য কথায় চলে যাচ্ছি। সেদিন চা নিয়ে বসার ঘরে এলাম। ভাবলাম, একটু বই পড়ি। মার্কেজের 'মেমোরিজ অব মাই মেলানকলি হোরস' উপন্যাসটার একটা বাংলা অনুবাদ কাছে পেয়েছি। অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক ভারি সুন্দর কাজ করেছেন। উপন্যাসের নামটারও বাংলা করেছেন চমৎকার। *আমার স্মৃতির বিষাদ গণিকারা*। এই উপন্যাস আমার আগেই ইংরেজি ভাষায় পড়া। সম্ভবত এই নামটাই আমাকে আবার পাঠের তাগিদ তৈরি করল। ঝরঝর করে কয়েক পাতা পড়েও ফেললাম। দশ বারো পাতা তো বটেই। হঠাৎই কেমন জানি একটা অস্বস্তি হতে লাগল। প্রথমে ভাবলাম শরীর খারাপ হল নাকি? হজমের কোনো সমস্যা? জ্বর আসছে? নড়েচড়ে বসে আবার বইতে মন দিলাম। আরও দু-এক পাতা শেষ করলাম। কিন্তু মন বসল না। অস্বস্তিটা বাড়তে লাগল। একটা গা ছমছমে ভাব! জিনিসটা আমার একেবারেই

boierpathshala.blogspot.com

অচেনা। আমার বহু রাত জাগার সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি বই বন্ধ করলাম। উঠে বিছানায় গিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। লাভ হল না। উলটে জিনিসটা বাড়তে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম, অস্বস্তি শরীরে নয়, আরও ভেতরের কিছু। বিছানা ছেড়ে নেমে ফের আলো জ্বালাতেই শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শীতল অনুভূতি নেমে গেল শরীরের নীচের দিকে। আমি দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে পড়লাম, কথা। স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম, আমি ভয় পেয়েছি! মারাত্মক ভয়! ভূতের ভয় নয়, একা থাকার ভয়। সেই ভয় প্রথমে আমার অবচেতনে তৈরি হয়েছে, তারপর এসেছে চেতনায়। আমার গোটা শরীর গ্রাস করেছে। আমাকে অবশ করে দিয়েছে।

যখন নিজেকে সামলে উঠলাম, তখন ভয়ংকর এক ক্লান্তি আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। আমি বিছানায় ফিরে যাই।

কথা, একদিন বা দু-দিন হলে একটা ব্যাপার ছিল, তারপর থেকে প্রায়ই এই একাকিত্বের ভয় আমার ঘাড়ে এসে চাপে। ঘুমের ওষুধ খেয়ে যদি রাতটা পার করে দিই, তাহলে সে হানা দেয় দিনে। কাজকর্মে মন বসাতে পারি না। বইয়ের কটা পাতা উলটে সরিয়ে রাখি। ভাবলাম টিভি দেখে (যে-অভ্যেস আমার কোনোদিনই ছিল না) সময় কাটাব। চেষ্টা করলাম ক-দিন। সময় কাটল কিন্তু আসল অসুখ কাটল না। কোনো কোনোদিন খুব অসুবিধে হলে পথে বেরিয়ে পড়ি। ভিড় খুঁজে নিয়ে হাঁটি। কাজ হয় না। কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারি সে-ও আছে। হাঁটছে আমারই সঙ্গে। পাশে পাশে হাঁটছে। অত ভিড়েও একা হয়ে পড়ি নিমেষে। সে আমার হাত চেপে ধরে।

এটা বলতেই সেদিন হুট করে তোমার কাছে গিয়ে পড়েছিলাম। বলতে গিয়েছিলাম, আমার একা লাগছে। এমন একা যে আমার ভয় করছে। মনে হচ্ছে, যে কোনো সময় আমি পাগল হয়ে যাব। ভেবেচিন্তে যাইনি। ভেবেচিন্তে কি কোনো পুরুষ মানুষ কখনও তার ছেড়ে যাওয়া স্ত্রীকে বলতে যায়—আমার একা লাগছে? যেতে পারে কখনও? প্লিজ তুমি কিছু মনে কোরো না।

দ্যাখো তো ছাইপাঁশ কত কী বকে ফেললাম। তোমার গাদাখানেক সময় নষ্ট হল। যাক, তুমি চিন্তা কোরো না। সব যন্ত্রণাদায়ক অসুখই আসলে একধরনের অভ্যেস। একটা সময় যন্ত্রণাটাই স্বাভাবিক মনে হয়। আমারও নিশ্চয় সেরকম কিছু হয়ে যাবে। আমি আর আমার একাকিত্বের ভূত দিব্যি ভাবসাব করে কাটিয়ে দেব বাকি জীবনটা। রাত জেগে দুজনে মিলে গল্প করব। চা খাব। ব্যাটা যদি বলে, 'যান তো আরও এক চামচ

boierpathshala.blogspot.com

চিনি নিয়ে আসুন।' আমি উঠে গিয়ে চিনি নিয়ে আসব। মন্দ কী?

তুমি ভালো থেকো। আমি জানি, তুমি ভালো আছ, তাও বলতে হয় বলে বললাম। রাগ কোরো না। এটাও বোকার মতো লিখে ফেললাম। আমার ওপর তোমার আর রাগের কী আছে? স্যারকে আমার প্রণাম জানাবে। ঈশ্বর যে সামান্য কয়েকজন মানুষকে তাঁর নিজের মতো করে পৃথিবীতে পাঠান, উনি তেমনই একজন মানুষ।

ইতি ব্রতীন।

পুনশ্চ : অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটেছে। সেদিন রাস্তায় হঠাৎ ছেলেবেলার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। এই ছেলের কথা তোমায় কোনোদিন বলিনি। নাম সলিল। আমারই মতো জীবনে কিছুই করতে পারেনি। তবে এখন চেষ্টা করছে। ভয়ংকর চেষ্টা। আগুন খাওয়া শিখছে। আমি খুব উৎসাহিত হয়েছি। ভাবছি এই ভয়ংকর বিদ্যেটা ওর কাছে শিখব। কচকচ করে আগুন খাব। কিছু তো একটা করা হল। কেমন হবে?

চিঠি লেখা শেষ করে মাথা তুলল ব্রতীন। বাবাঃ, এতখানি লিখে ফেলেছে! নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না। কীভাবে লিখল! টেবিলে বসে একটানা এতখানি যে কতবছর লেখেনি। জগ থেকে ঢেলে পুরো এক গ্লাস জল খেল ব্রতীন। ছড়ানো পাতাগুলো জড়ো করে প্রথম থেকে পড়তে শুরু করল মন দিয়ে। দু-একটা শব্দ বদলাল যত্ন করে। কয়েকটা বাদ দিল। একটা বাক্যে ক্রিয়াপদ এগিয়ে নিল। কাজ শেষ হলে পাতাগুলো ছিঁড়ে, দুমড়ে মুচড়ে, দলা পাকিয়ে ফেলে দিল টেবিলের তলায় রাখা ওয়েস্ট-পেপার-বক্সে।

ওয়েস্ট-পেপার-বক্সের রং সবুজ। ফ্ল্যাটে এসে কথাকলি তাড়াহুড়ো করে কিনেছিল। ব্রতীন বলেছিল, 'ওয়েস্ট-পেপার-বক্স কী এমন এমারজেন্সি জিনিস যে এত তাড়াহুড়ো করলে?'

কথাকলি বলেছিল, 'বাড়িতে বাজে কাগজ ফেলার জায়গা রাখাটা জরুরি।'

ব্রতীন বলল, 'কেন?'

কথাকলি হেসে বলল, 'একসময় ওতে অনেক কাজের জিনিস খুঁজে পাওয়া যাবে।'

গায়ে পাঞ্জাবি গলাতে গলাতে ব্রতীন ঠিক করল, বেরোবে। এই ঠা ঠা দুপুরে কোথাও যাওয়ার নেই। তবু বেরোবে। পথে পথে ঘোরার অভ্যেস তার হয়ে গেছে। অসুবিধে কিছু নেই, আজও না হয় তাই করবে। যদি সেরকম হয়, কোনো পার্কে ঢুকে বসে থাকবে কিছুক্ষণ। সিনেমা হলেও ঢুকে যেতে পারে।

boierpathshala.blogspot.com

নরম চেয়ারে চোখ বুজে বসে থাকা যায়।

মিনিট চল্লিশ পর ট্রাম রাস্তা ছেড়ে ব্রতীন এন্টালি মার্কেটের পিছনে যে-গলির মধ্যে ঢুকল সেখানে দুটো মানুষও পাশাপাশি হাঁটা সমস্যার। পাশে একটানা দেয়াল চলে গেছে যতদূর চোখ যায়। শেষ দুপুরের রোদ তেরচাভাবে পড়েছে। জ্যামিতির নকশার মতো লাগছে। এই দেয়াল কি সেদিন রাতেও ছিল? নিশ্চয় ছিল। একই পথ দিনে একরকম, রাতে অন্যরকম হয়ে যায়। সেদিন একটা বাচ্চা কাঁদছিল না? আজও কোথায় যেন এক শিশু কেঁদে চলেছে। এখানে ঢুকলেই সম্ভবত কান্নার শব্দ পাওয়া যায়। নাকি ভ্রম হয়?

দরজা আন্দাজ করে ব্রতীন নক করল। একবার, দু-বার, তিনবার। ভুল বাড়ি নয় তো?

না, ভুল বাড়ি নয়।

ঘুম-ভাঙা বিরক্তমুখে দরজা খুলেই কপালে চোখ তুলল চন্দনা। গায়ের এলোমেলো কাপড় সামলাতে সামলাতে এক গাল হেসে বলল, 'ওমা আপনি! বেস্ট বয়! আসুন, আসুন।'

থতমত খেয়ে ব্রতীন জোর করে হাসল। বলল, 'না না আসব না। এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার সলিলের খবর নিয়ে যাই। আপনি কেমন আছেন? জ্বর কমেছে?'

বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে চন্দনা ঠোঁট কামড়াল। মুচকি হেসে পাশে দরজা ছেড়ে বলল, 'জ্বর কমেছে কিনা বাইরে দাঁড়িয়ে বুঝবেন কী করে? আসুন ভেতরে আসুন। চিন্তা নেই, আপনার বন্ধু বাসায় নেই।'

কথা শেষ করে আবার নিজের ঠোঁট কামড় ধরল চন্দনা। দাঁতের ফাঁকে হাসল।

সলিল নেই! এই মেয়ে বাড়িতে একা?

ঝিম ধরা শরীর নিয়ে চৌকাঠ পেরোল ব্রতীন। আলোছায়া ঘরে নিঃশব্দে ছিটকিনি তুলল চন্দনা। ব্রতীন দেখতে পেল বন্ধুপত্নীর গায়ে জামা নেই। সম্ভবত গরমের কারণেই শুধু শাড়ি জড়ানো।

বুকের ওপর আঁচল টানতে টানতে চন্দনা ফিসফিসে গলায় বলল, 'বসুন। খাটে আরাম করে বসুন।'

boierpathshala.blogspot.com

পঁচিশ

দু-দিন আগেই বানেরহাটে যাবে ঠিক করেছিল নিতাই। ঝড়জলের কারণে পারেনি। আজ সকাল থেকে আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। সে ঠিক করল, কালই যাবে। শুধু যাবে না, ফুলকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। ডাক্তারবাবু যদিও মেয়েকে আনতে বারণ করেছিলেন। করুক, তবু মেয়েকে নিয়ে যাবে।

মালতী বলল, 'আমিও যাব।'

নিতাই বলল, 'খেপেছ? শরীরের এই অবস্থা, তুমি যাবে কী করে?'

মালতী বলল, 'সে ঠিক চলে যাব। তুমি তো আছ।'

নিতাই বিরক্ত গলায় বলল, 'বোকার মতো কথা বোলো না। আমি আছি তো কী হয়েছে? আমি কি বাসের ঝাঁকুনি থামাতে পারব? পেটে বাচ্চা নিয়ে ঝাঁকুনি খাওয়া কত খারাপ তুমি জানো না?'

'ও আমি সামলে নেব। তুমি দেখবে যাতে কেউ ধাক্কাধুক্কি না মারে।'

'যন্ত্রণা কর না মালতী। বাসের ভিড় নিয়ে তোমার জ্ঞান নেই। কেউ কারও কথা শোনে না। হাভাতে, গাঁইয়ার দল সব। সবাই ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে। বসার জায়গা পাওয়াই মুশকিল।'

মালতী উদ্‌বিগ্ন গলায় বলল, 'মেয়েকে নিয়ে তুমি একা পারবে?'

নিতাই চিন্তিত গলায় বলল, 'পারব কিনা জানি না, তবে যেতে হবে। কাল সকালের বাসেই যাব। আর দেরি করা ভালো বুঝি না। মন বলছে, ডাক্তারবাবু একবার নিজের চোখে যদি ফুলকে দেখেন তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি আর ঝামেলা বাড়িও না। সকালে মেয়েকে তাড়াতাড়ি তৈরি করে দিও।'

মালতী কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'তাই করব।'

boierpathshala.blogspot.com

সেদিন বাড়ির সামনে উপড়ে-পড়া গাছ দেখে নিতাই অবাক হয়নি। বুড়ো গাছ। গোড়ায় ফোঁপরা ধরেছিল। জল বৃষ্টিতে মাটিও নরম। পাড়াগাঁয়ে এই অবস্থায় গাছ পড়াটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। কারও গায়ে মাথায় যে পড়েনি, এই যথেষ্ট। অবাক হল বাড়ি ঢুকে মালতীর কাছে ঘটনা শুনে।

'পিঁপড়া!'

মালতী আতঙ্কিত গলায় বলল, 'হ্যাঁ, পিঁপড়া। প্রথমে ভাবলাম, মেয়ে মজা করে। পিঁপড়া নিয়ে খেলে। কিন্তু একটু সময়ের মধ্যেই বুঝলাম, খেলা নয়, অন্য কিছু।'

'অন্য কিছু ! কী অন্য কিছু?'

'তা জানি না। দেখি, মেয়েটার চেহারা ছবি পালটে গেছে! চোখে আলুথালু ভাব। মাটির ওপর শুয়ে পড়েছে প্রায়। আমার রাগ হল। এই সবে জ্বরজ্বারি ছেড়ে উঠেছে, মাটিতে গড়াগড়ি কীসের? ধমক দিয়ে বললাম, মাটিতে উপুড় হয়ে কী করিস? মেয়ে মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসে। সে হাসি ভালো নয়, ফ্যাকাশে। বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে।'

এতটুকু বলে মালতী চুপ করল। শাড়ির আঁচল দিয়ে গলা, কপাল মুছল। তার চোখেমুখে আতঙ্ক।

নিতাই বলল, 'তারপর?'

মালতী ঢোঁক গিলে বলল, 'তারপর বলল, মা পিঁপড়ার সঙ্গে কথা বলি।'

'কথা বলি!'

'পিঁপড়ারা নাকি তাকে বলছে, গাছ ভেঙে পড়বে! আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না। মেয়ের পিঠে কিল চড় দিলাম। সন্ধের আগে আগে গাছ পড়ল।'

কথা শেষ করে মালতী ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'মেয়েটা মরে যাবে গো।'

এরপরই নিতাই ঠিক করে, সে আবার বানেরহাটে ডাক্তার সুদর্শন রায়ের কাছে যাবে।

ফুলের বাসে চড়ার অভ্যেস নেই। তার ওপর এতটা পথ। শনিবার করে মল্লিকপুরে হাট বসে। বাসে ভিড় হয় খুব। আজও হয়েছে। সেই ভিড়ে মানুষ যেমন আছে, হাঁস, মুরগি, ছাগলও রয়েছে। এর মধ্যে কে যেন একটা সাইকেল তুলল। সেই নিয়ে ঝামেলা হল খুব একচোট। এমন ঝামেলা যে ড্রাইভার বাস দাঁড় করিয়ে বিড়ি খেতে চলে গেল। কন্ডাক্টর বলল, সাইকেল না নামালে বাস

boierpathshala.blogspot.com

চলবে না। সাইকেল মালিকও ছাড়বে না। সে সাইকেলের হাতল ধরে গাঁট মেরে বসে রইল সিটে। তার কথা হল, সাইকেল নামবে কেন? ছাগল, মুরগি বাসের ভেতর যাচ্ছে, সাইকেল কেন যাবে না? সাইকেল কি ছাগলেরও থেকে নীচে? বাসের একদল যাত্রী তার পক্ষ নিল। হইহই করে বলল, 'কথাটা তো ভুল বলেনি। সাইকেল কি গোরু ছাগলের থেকেও খারাপ?'

এই নিয়ে সময় নষ্ট হল খানিকটা। এর মধ্যেই ফুল দু-বার বমি করেছে। প্রথমবার এমনি আর দ্বিতীয়বার টিফিন মুখে দেওয়ার পর। টিফিন বেশি কিছু না। ক-টা বিস্কুট আর গোপীনাথের দোকান থেকে কেনা দুটো মোয়া। মোয়া অতি বাজে। চিঁড়ে গুড়ে ঠিক মতো মিশ খায়নি। মালতী জলের বোতলের সঙ্গে ছোটো একটা কৌটো ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। বাবা, মেয়ে দুজনের জন্যই দিয়েছিল। পথে খিদে পাবে। সাইকেলের ঝামেলায় বাস যখন আটকে পড়েছিল নিতাই বিস্কুট বের করে মেয়েকে দিল।

'খেয়ে নে ফুল। এখনও অনেকটা যেতে হবে। বানেরহাটে গিয়ে কখন যে ভাত খাব তার ঠিক নেই।'

ফুল বিস্কুট হাতে বলল, 'বাবা, ভালো লাগে না। শরীরে পাক মারে।'

নিতাই চাপা গলায় ধমক দেয়। বলে, 'পাকালে পাকাবে। বমি করলি, পেটটা তো খালি। খালি পেটে আরও খারাপ লাগবে। বিস্কুট না ভালো লাগলে মোয়াটা মুখে দিয়ে জল খা। বাস দাঁড়িয়ে আছে, এই সময় খেয়ে নে। আর জ্বালাতন বাড়াস না।'

মোয়া হাতে নিয়ে ফুল খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করল, তারপর ঠোঁটে ঠেকিয়েই জানলার বাইরে মুখ বাড়াল। মাথার স্কার্ফটা নোংরা হয়ে গেছে। এই স্কার্ফ অনেক পুরোনো। ফুলের দিদিমার। মালতী বলে, সে-ও নাকি ফুলের বয়েসে পরেছে। রং নষ্ট হয়ে গেলেও জিনিসটা আজও আস্ত আছে। ফুলের মেয়েও এটা পরবে নাকি? কে জানে হয়তো পরবে।

পিছনের দরজার কাছে কাটা সিটে দুজনে জায়গা পেয়েছে। এইটা একটা ভালো। ফুল বসেছে জানলার দিকে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিতাইয়ের মনে হল, মেয়েটা গায়েগতরে বড়ো হচ্ছে। রোগাভোগা অপুষ্ট শরীরে যেন প্রকৃতির নিয়মে একটু মেয়েলি ছোঁয়া লাগছে। সন্তানের 'বড়ো' হওয়া বাবা মা চট করে ধরতে পারে না। ফুল শীর্ণ হাতদুটো গুটিয়ে কোলের ওপর রেখেছে। নিতাইয়ের মায়া হল। আলতোভাবে মেয়ের হাত ছুঁলো সে।

'বাবা, এই ডাক্তার কি রাগী?'

boierpathshala.blogspot.com

নিতাই হেসে বলল, 'না রে মা। ডাক্তারবাবু খুব ভালো। দেখবি তোকে কত আদর করে।'

'ও। উনি কী গোপীকাকার মতো আমায় ওষুধ দেবেন? তিতা ওষুধ? তিতা ওষুধ আমি খেতে পারব না।'

নিতাই ভুরু কুঁচকে বলল, 'ওটাই তো চিন্তার রে ফুল, এই ডাক্তার একদম ওষুধবিষুধ দেন না।'

ফুল চোখ বড়ো করে বলল, 'ওমা, ওষুধ দেয় না! কেন?'

নিতাই মেয়ের থুতনি ছুঁয়ে হেসে বলল, 'বলে, দুর অসুখই হয়নি, ওষুধ দেব কেন?'

ফুল শুকনোভাবে হাসল। গত কয়েকদিনে তার জ্বরজ্বারি বা ব্যথা বেদনা হয়নি, কিন্তু শরীরটা দুর্বল। সেই দুর্বলতা বাসে উঠে আরও বাড়ছে।

'আমাকেও বলবে অসুখ হয়নি?'

নিতাই বড়ো করে হেসে বলল, 'বলবেই তো। তোর তো কিছুই হয়নি। তাই না?'

ফুল তার ঝকঝকে দাঁতের সারি বের করে হাসল। মাথা নাড়ল।

সাইকেলের ঝামেলা সামলে বাস ছেড়েছে। এমনিতে রাস্তা ভালো নয়, তার ওপর বৃষ্টিতে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। গর্তে পড়ে বাস অনেকটা করে লাফিয়ে উঠছে। পলকা কৌটোর মতো ঝাঁকুনি মারছে। নিতাই মনে মনে ভাবল, ভাগ্যিস মালতী আসেনি। যে-কোনো সময় একটা বিপদ হয়ে যেতে পারত।

'ফুল, অ্যাই ফুল, এদিকে ফের একবার।'

জানলা থেকে মুখ ঘুরিয়ে ফুল তার বাবার দিকে তাকাল। নিতাই গলা নামিয়ে বলল, 'তুই কি সত্যি সত্যি পোকামাকড়ের কথা বুঝিস মা?'

'পোকামাকড়!' ফুল অবাক হল।

নিতাই ভুরু কুঁচকে বলল, 'ওই যে, তোর মায়ে বলছিল। তুই নাকি পোকামাকড়ের সঙ্গে কথা বলিস? গল্প করিস? পিঁপড়ায় তোকে সত্যি সত্যি গাছ পড়ার খবর দিয়েছে নাকি?'

ফুল বাবার দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসল। কোনো উত্তর দিল না।

নিতাই বলল, 'কী রে বললি না?'

'আমি জানি না বাবা।'

নিতাই বুঝতে পারল, মেয়ে বলতে চাইছে না। কেন চাইছে না? দুটো কারণ হতে পারে। হয়তো বাবার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করতে চায় না। আবার

boierpathshala.blogspot.com

মায়ের মারের কথাটাও মনে আছে। মালতী এটা ঠিক করেনি। ছেলেমেয়েকে মারধর ভালো, কিন্তু রুগ্ন ছেলেমেয়েকে মারধর ভালো না।

নিতাই গলা নামিয়ে বলল, 'আমাকে না বলিস ক্ষতি নেই, ডাক্তারবাবুকে কিন্তু সবকিছু বলবি। ডাক্তারকে কোনো কিছু লুকোতে নেই।'

ফুল মাথা নাড়ল। বলল, 'শরীরটা ভালো লাগে না বাবা।'

নিতাই মেয়ের মাথায় হাত রেখে বলল, 'ঠিক আছে আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমা।'

ফুল বাবার কাঁধে মাথা রাখল। বাস জোরে দৌড়োচ্ছে। ঝাঁকুনিও বেশি। নিতাইয়ের চিন্তা হচ্ছে। মেয়েটা আবার বমি না করে। ইস, চেহারার কী হাল হয়েছে! কাঁধে-পড়ে-থাকা মাথাটার যেন কোনো ওজন নেই। দেখলে কে বলবে, এই মেয়ের এগারো পেরিয়ে বারো বছর বয়স হতে চলল?

'বাবা, আর কতটা?'

'বেশি নয় মা, একটুখানি।'

'অনেকক্ষণ থেকে তো একটুখানি বলছ। ভালো লাগছে না।'

'ছিঃ মা এরকম করে না।'

'বাবা, বাড়ি যাব। শরীরে পাক মারে।'

একমাত্র উপায় মেয়েটা যদি ঘুমিয়ে পড়ে। নিতাই চাপা ধমক দেয়, 'চুপ করে চোখ বুজে ঘুমা। একটা কথা বলবি না। ঘুমা চুপ করে।'

ফুল আবার চোখ বোজে। ঘুমিয়েও পড়ে দ্রুত।

নিতাই বুঝতে পারল, ডাক্তারবাবু যতই বারণ করুক মেয়েকে এনে সে ঠিকই করছে। বড় ডাক্তারবাবু না দেখলে এই মেয়ের অসুখ সারবে না।

বাস থেকে নেমে ক্লান্ত বিধ্বস্ত ফুলকে নিয়ে নিতাই যখন সুমঙ্গলা ক্লিনিকে পৌঁছোল তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। গঙ্গা নামের অল্পবয়সি ছেলেটি নিতাইকে চিনতে পারল। শুধু মুখ চিনতে পারল না, নামও বলতে পারল। এটা একটা আশ্চর্য কথা। একদিন আসাতেই নাম মনে রাখা সহজ ব্যাপার নয়। কী করে আছে!

গঙ্গা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলে, 'এসো নিতাই, এসো।'

নিতাই বলে, 'আপনে আমায় চিনতে পেরেছেন ভাই?'

গঙ্গা বলে, 'বাঃ পারব না। এই তোমার মেয়ে নাকি নিতাই? এরই নাম ফুল?'

গঙ্গা ফুলের দিকে আগ্রহ ভরে তাকায়।

boierpathshala.blogspot.com

বাবা, ফুলের নামও মনে আছে! এ ছেলে তো খুবই ভালো। ভালো হওয়ারই কথা। একটা মানুষ খুব ভালো হলে তার চারধারের মানুষজনও ভালো হবে।

যদিও ঘটনা এতটা নয়। প্রথম যেদিন নিতাই ক্লিনিকে এসেছিল সেদিনই সে খাতায় রোগীর নাম লেখায় ফুল মণ্ডল। গঙ্গা রোগ জানতে চাওয়ায় বলেছিল, মেয়ে তার ঝড়, জল, আগুনের আগাম খবর পায়। এই লোককে গঙ্গা ভোলে কী করে?

তা ছাড়া আরও একটা কারণ আছে।

নিতাই বলল, 'ডাক্তারবাবু আছেন তো? মেয়েকে দেখাতে এনেছি।'

গঙ্গা সামান্য চুপ করে থেকে দুটো টুল এগিয়ে দেয়। ফুলের দিকে তাকিয়ে বলে, 'নাও বসো। আহা রে মুখটা শুকিয়ে গেছে। জল-টল কিছু খাবে তুমি?'

ফুল তার বাবার দিকে তাকায়। নিতাই মেয়ের হাত ধরে টুলে বসিয়ে দেয়। নিজেও বসে।

'মুখ শুকোবে না। গোটা রাস্তাটা বমি করতে করতে এলো। চিন্তা করছি কীভাবে যে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।'

গঙ্গা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'চিন্তা করো না নিতাই। পাখার তলায় বসে খানিকটা বিশ্রাম নিলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে। ফেরার বাসের তো দেরি আছে। এক কাজ করো, ওদিকে কল আছে। এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে দু-পা গেলেই বেসিন পাবে। যাও মেয়ের চোখেমুখে ভালো করে জলের ঝাপটা দিয়ে নিয়ে এসো। যাও ফুল, বাবার সঙ্গে যাও।'

নিতাই বলল, 'আগে ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে নিলে হত না।'

'তুমি তো আগে যাও।' গঙ্গা প্রায় ঠেলেই দুজনকে ঘর থেকে বের করে দেয়।

ঠান্ডা জলের ঝাপটা পেয়ে ফুলের ভালো লাগে। সে ফিসফিস করে বলে, 'লোকটা কে গো বাবা? ডাক্তার?'

- নিতাই নিজেও ঘাড়ে মাথায় জল দেয়। বলে, 'না ডাক্তার নয়। ডাক্তারকে সাহায্য করে। এও দেখি মানুষ খুব চমৎকার। দেখিস না আমাদের কেমন খাতির যত্ন করে?'

গঙ্গার কাছে ফিরে এসে নিতাই আরও অবাক হল। গঙ্গা ইতিমধ্যে তার এবং তার মেয়ের জন্য ভাঁড়ে করে রসগোল্লা কিনে এনেছে।

'নাও, মুখে দিয়ে জল খাও। '

boierpathshala.blogspot.com

ফুল লজ্জা পেয়ে হাত গুটিয়ে রইল। গঙ্গা হেসে বলল, 'লজ্জা কী ফুল? খাও। রসগোল্লা খেলে শরীরে বল পাবে।'

শরীরটা এখন সত্যি একটু ভালো লাগছে ফুলের। পাক মারাটা বন্ধ হয়েছে। চোখেমুখে জলের ঝাপটা দেওয়ায় বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। একটু খিদেও লাগছে যেন। সে বাবার দিকে তাকাল। নিতাই মাথা নেড়ে ভাঁড়ে হাত ঢুকিয়ে রসগোল্লা তুলে মুখে দিল।

'ডাক্তারবাবু কই? আসেনি এখনও?'

গঙ্গা এবার যা বলল তা মাথায় বাজ পড়ার মতো।

'নিতাই, ডাক্তার রায় আর এখানে আসবেন না।'

'আসবেন না!'

'না, উনি এ-মাস থেকেই বানেরহাটে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। শরীর খুব খারাপ হয়েছিল। তার ওপর বয়েস হয়েছে। কলকাতা থেকে এতটা পথের ধকল সহ্য হচ্ছে না।'

নিতাই আর্তনাদের গলায় বলল, 'সে কী! ফুলের কী হবে?'

গঙ্গা একটু হাসল। বলল, 'তাতে কী হয়েছে? সুদর্শন রায় আসা বন্ধ করে দিয়েছেন মানে তো আর সুমঙ্গলা উঠে যায়নি। ক-দিন পর থেকেই ওঁর জায়গায় আর একজন সাইকিয়াট্রিস্ট আসবেন। শুনেছি, কথাবার্তাও প্রায় ফাইনাল হয়ে গেছে। ফুলকে তিনি দেখবেন।'

কথাটা একেবারেই মনঃপূত হল না নিতাইয়ের। সে মনে মনে একেবারে ভেঙে পড়ল। ইস এতটা পথ ছুটে আসার পর এই দুঃসংবাদ শুনতে হল? ওই ডাক্তারকে না দেখালে ফুল কী করে ভালো হবে? অসম্ভব। ফুলের অসুখ কেউ ধরতে পারবে না।

গঙ্গা বলল, 'তুমি বরং এক কাজ কর নিতাই, আমাদের এখানকার টেলিফোন নম্বরটা রাখ। তোমাদের ঝিলডাঙায় টেলিফোন নেই?'

নিতাই মাথা নাড়ল।

'আছে একটা-আধটা। লাইন পাওয়া যায় না।'

গঙ্গা মুখ দিয়ে চুকচুক করে আওয়াজ করে বলল, 'তাহলে তো মুশকিল হল। নইলে তুমি ফোন করে নিতে।'

গঙ্গা বিড়বিড় করে বলল, 'সে না হয়, আমি এসে খোঁজ নিয়ে যাব। কিন্তু...।'

গঙ্গা বলল, 'কিচ্ছু কিন্তু নয়। সব ডাক্তারবাবুই কম বেশি ভালো হয়। তা

boierpathshala.blogspot.com

ছাড়া তোমার মেয়েকে তো সুস্থই দেখছি। ভারি ফুটফুটে মেয়ে।'

হাত বাড়িয়ে ফুলের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিল গঙ্গা।

নিতাই মাথা নামিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল। গাছ পড়ার ঘটনা এই ছেলেকে বলার কোনো মানে হয় না। এই ছেলে বুঝতে পারবে না। অস্ফুটে বলল, 'কই সুস্থ? বাসে বমি করতে করতে এলো।'

গঙ্গা আওয়াজ করে হেসে উঠল।

'বমিটা একটা অসুখ হল? ছোটো মেয়ে বাসে উঠে বমি করবে না তো কী করবে? একটা ট্যাবলেট দিয়ে দিচ্ছি। এখনই খেয়ে নিক। ফেরার পথে দেখবে আর বমি-টমি কিচ্ছু হবে না। তাই না ফুল?'

ফুল কিছু বুঝতে পারল না, তবু মাথা নাড়ল। এই লোকটাকে তার পছন্দ হয়েছে। কেমন হড়বড় করে কথা বলে। বেশ মজার।

গঙ্গা হাসিমুখে বলল, 'ফুল, তুমি লুডো খেলতে জানো?'

ফুল মাথা নাড়ল। গঙ্গা বলল, 'তোমার লুডো আছে?'

ফুল এবার কথা বলল। ডাক্তার দেখানোর ভয় তার কেটে গেছে। অসুখ বিসুখের থেকে রসগোল্লা, লুডো অনেক ভালো জিনিস। টানা টানা চোখ তুলে বলল, 'আছে। কিন্তু গুটি নাই।'

গঙ্গা টেবিলের ওপর চাপড় দিয়ে বলল, 'আমি জানতাম। জানতাম, এটাই হবে। বেশিরভাগ সময়েই এই কাণ্ড হয়। লুডোর বোর্ড থাকে, কিন্তু গুটি হারিয়ে যায়।'

গঙ্গার ভাবভঙ্গি দেখে ফুল মজা পেল। লুডোর গুটি নিয়ে বড়োরা এমন করে কখনও বলে না। ফুল হেসে মাথা নাড়ল। বলল, 'ঠিক তাই।'

গঙ্গা এবার একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। ড্রয়ার খুলে একটা প্যাকেট ফুলের দিকে এগিয়ে দিল।

'এই নাও লুডো আর গুটি। তোমার জন্য কিনে রেখেছি। নাও ধরো ধরো, লজ্জা কীসের? দুর বোকা মেয়ে, লুডো নিতে কেউ লজ্জা পায়? আমি জানতাম, ফুল ঠিক একদিন না একদিন আসবে। না এলেও ক্ষতি ছিল না। ঝিলডাঙাতে আমিই চলে যেতাম। কী খারাপ হত?'

জোরে হেসে উঠল গঙ্গা। ফুলকে নিয়ে এই ছেলের এত হইচইয়ের কারণ ঠিক বুঝতে পারছিল না নিতাই। শুধু খাবার নয়, সঙ্গে একেবারে উপহার! ব্যাপারটা কী!

ব্যাপার বুঝতে পারল আরও কিছুটা পরে।

boierpathshala.blogspot.com

ক্লিনিক ছেড়ে বেরোনোর মুখে গঙ্গা একটা ভাঁজ-করা-কাগজ ফুলের দিকে এগিয়ে ধরল। লাজুক ভঙ্গিতে বলল, 'এটা রাখো দেখি ফুল।'

নিতাই বলল, 'এ আবার কী?'

'এটা একটা পত্রিকা। আমার একটু ছড়া কবিতা লেখার শখ আছে। বেশি কিছু নয়, একেবারে ছোটোখাটো। বানেরহাটের এই কাগজে আমার একটা ছড়া ছাপা হয়েছে। তোমার মেয়েকে নিয়ে লেখা ছড়া। সবাই খুব ভালো বলেছে। অবাকও হয়েছে। সেই কারণেই ফুলের জন্য লুডো কিনে রেখেছিলাম। যাকে নিয়ে লেখা তাকে কিছু না দেওয়াটা খারাপ। পড়ে দেখবে। নাও ধরো।' এবার ফুলের দিকে তাকিয়ে গঙ্গা বলল, 'একদিন ঝিলডাঙায় তোমাদের বাড়ি যাব ফুল, তখন জেনে আসব তোমাকে নিয়ে লেখা ছড়া কেমন লেগেছে।'

কথা শেষ করে লজ্জা লজ্জা মুখে হাসল গঙ্গা।

ফুল অবাক হয়ে তার বাবার দিকে তাকিয়ে রইল। তাকে নিয়ে লেখা ছড়া! সে কিছুই বুঝতে পারে না। তাকে নিয়ে কেউ ছড়া লিখবে কেন? কী লিখবে?

boierpathshala.blogspot.com

ছাব্বিশ

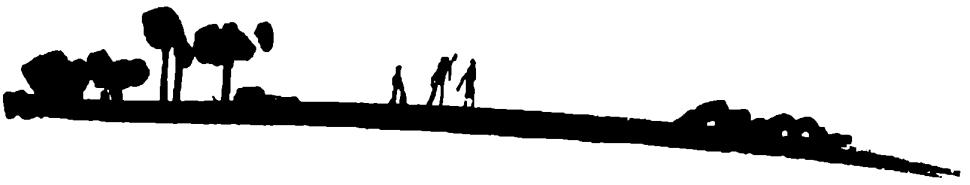

কমল মল্লিক ফাইল খুলে চিন্তিত মুখে পাতা ওলটাচ্ছেন। ফাইলের ওপর বড়ো বড়ো করে লেখা—রিয়ালিটি শো।

কনসেপ্ট ১ ঃ গানের খেলা। এই খেলায় প্রতিযোগী ছেলেমেয়েদের বয়স হবে ষোলো থেকে একুশের মধ্যে। প্রতি রাউন্ডে চারজন করে থাকবে। দুজন ছেলে, দুজন মেয়ে। এটা বেড়ে ছয় বা আটও হতে পারে। এদের সামনে থাকবে বড়ো পর্দা। সেই পর্দায় হিন্দি সিনেমার দৃশ্য দেখানো হবে। গানের দৃশ্য। জনপ্রিয় হিট গান। প্রেমসংগীত থেকে আইটেম সংগীত, বিরহসংগীত থেকে ফান সংগীত। পর্দায় ছবি দেখা যাবে কিন্তু গান শোনা যাবে না। গান গাইবে প্রতিযোগীরা। দৃশ্যের সঙ্গে মিলিয়ে গাইবার জন্য নিজেদের পছন্দ মতো গান বেছে দেবেন বিচারকরা। মূলত চার ধরনের গান থেকে অপ্শন থাকবে। রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, শ্যামাসংগীত এবং অতুলপ্রসাদ। উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে, কোনো জনপ্রিয় প্রেম দৃশ্যের সঙ্গে গাইতে হল 'নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন, হবেই হবে', অথবা 'মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন।' কিংবা ক্যাবারে কায়দার আইটেম সং-এর দৃশ্যের সঙ্গে গাইতে দেওয়া হল 'সারাটি সকাল বসে বসে সাধের মালাটি গেঁথেছি' বা 'পরদেশী মেঘ যাও রে চলে'।

বিচারকরা ঠিক করবেন, দৃশ্যের সঙ্গে কার গান সবথেকে বেশি মানানসই হয়েছে। সেই অনুযায়ী পয়েন্ট। এই শো-এর নাম হতে পারে 'মেড ফর ইচ আদার।'

কনসেপ্ট ২ ঃ ইন্টারভিউয়ের খেলা। এই রিয়ালিটি শো-এর বিষয়

boierpathshala.blogspot.com

'চাকরির ইন্টারভিউ'। দুজন করে টিম। একজন ইন্টারভিউ দেবে, একজন নেবে। খেলা শুরুর মুহূর্তে বিচারকরা বলে দেবেন কোন কাজের জন্য লোক খোঁজা হচ্ছে। ইন্টারভিউয়ের প্রশ্ন যেন কোনোভাবেই কাজের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত না হয়। যার প্রশ্ন যত উলটো বিষয়ে হবে তার পয়েন্ট তত বেশি। সেই সঙ্গে দেখা হবে চাকুরিপ্রার্থীর পারফরমেন্স। উদারহণ— কম্পিউটার প্রোগ্রামের জন্য লোক নেওয়া হচ্ছে। অথচ গোটা ইন্টারভিউটাই হল রান্নাবান্না সংক্রান্ত। মাগুর মাছের ঝোল থেকে ফ্রায়েড গার্লিক প্রনের রেসিপি। অথবা কোনো প্রতিযোগীকে বলা হল, মনে করুন, আপনি ফাইভ স্টার হোটেলের ম্যানেজার। আপনি একজন ভালো শেফ খুঁজছেন। এবার আপনার ইন্টারভিউ শুরু করুন। দেখা গেল, প্রতিযোগী তাকে গোটা সময়টাই শিশুমনের বিকাশ এবং সমাজের দায়িত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করল। বিষয় পরিষ্কার করার জন্য আরও একটা উদাহরণ দেওয়া হল— সরকারি কৃষি বিভাগে লোক নেওয়া হবে। কাজ হল খেতে মাঠে ঘুরে গোবর সারের ব্যবহার এবং মাজরা পোকা বিষয়ে সমীক্ষা রিপোর্ট তৈরি করা। প্রতিযোগীকে ইন্টারভিউ নিতে বলা হল। ইন্টারভিউ হল তিন বিষয়ে। ট্রাফিক রুল, মহাকাশের রহস্য এবং বিশ্বায়নের সুফল কুফল।

কনসেপ্ট ৩ ঃ পারিবারিক খেলা। এখানে প্রতিযোগী হবে পুত্রবধূরা (বউমা)। বিচারকের আসনে বসবে শাশুড়ির দল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বউমারা তাদের শাশুড়ির নিন্দে শোনাবে। কথার সঙ্গে ডেমনস্ট্রেশনও চলতে পারে। শাশুড়ি কেমন মুখ নেড়ে নেড়ে ঝগড়া করে, কেমন রাগ দেখিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় ধরনের ডেমনস্ট্রেশন। এই শোতে একটাই সমস্যা আছে। প্রাইজ মানির পরিমাণ খানিকটা ওপরের দিকে রাখতে হবে। খেলায় ঝুঁকি আছে বলেই এই ব্যবস্থা জরুরি। শোয়ের প্রথম এপিসোডগুলো সাধারণদের নিয়ে হলেও পরের দিকে সেলিব্রিটিরা আসতে পারেন। যেমন অভিনেত্রীর বউমা, খেলোয়াড়ের শাশুড়ি, শিল্পপতির বউ। খেলার নাম দেওয়া যেতে পারে —আমি তোমায় বড়ো ভালোবাসি।

কনসেপ্ট আরও আছে। কিন্তু কমল মল্লিকের পড়তে ইচ্ছে করল না। বাকিগুলোও নিশ্চয় এই তিনটের মতোই রাবিশ হবে। তিনি ফাইলটা বন্ধ করে জল-টেবিলের ওপর ছুড়ে দিলেন। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু খারাপ হলে চলবে না। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। মল্লিক টিভি প্রোডাকশনের সামনে আবার একটা ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ এসেছে। সহজ কথায় বলা চলে খেলাধুলোর মধ্যে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ। গেম শোকে বাংলায় খেলাধুলো

boierpathshala.blogspot.com

ছাড়া আর কী-ই বলা যেতে পারে? তবে ঝামেলা আছে। ঠান্ডা মাথায় ঝামেলা সরাতে হবে। সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।

অফিসে ঢুকতেই আলো চ্যানেল থেকে ফোন এসেছিল। স্বয়ং মালিক ফোন করছেন। কমল মল্লিকের বুকটা ধক করে উঠল। ফোন কীসের? আরও কোনো প্রোগ্রাম রিজেক্ট হল নাকি? ফোন ধরে বললেন, 'কী ব্যাপার মিস্টার ঘুতুনিয়া? সকালেই ফোন কীসের?'

ওপাশে ঘুতুনিয়া ঘসঘসে ধরনের হেসে বললেন, 'সকাল কোথায় দাদাভাই? বেলা তো গড়িয়ে গেল। আপনি আছেন কেমন?'

কমল মল্লিকের অস্বস্তি হল।

'কোথায় আর আছি? আপনারা যা শুরু করেছেন। একটার পর একটা প্রোগ্রাম যদি রিজেক্ট করতে শুরু করেন তাহলে তো ব্যবসাপাতি গুটিয়ে নিতে হবে।'

ঘুতুনিয়া যেন টেলিফোনের ভেতরেই জিভ কাটলেন।

'ছি ছি, এ আপনি কী বলছেন দাদাভাই। টিভি বিজনেস এখন বুম আছে। আপনারা মাল মেটেরিয়াল সাপ্লাই বন্ধ করে দিলে চ্যানেল চলবে কী দিয়ে? ব্ল্যাঙ্ক রান তো করাতে পারি না দাদাভাই।'

কমল মল্লিক টেবিলের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'সেটাই তো আপনারা বুঝতে চাইছেন না।'

'বুঝছি দাদাভাই, আমরা ঠিকই বুঝছি। আপনারাও ভি বুঝুন। শুধু নিজের কথা বুঝলে তো চলবে না। আমাদের ডিমান্ড ভি বুঝতে হবে। মার্কেটটা বুঝতে হবে। এ বড়ো ডেনজারাস মার্কেট আছে । দর্শকদের ভিউয়ার হিসেবে দেখার জামানা আর নেই। তাদের বায়ার হিসেবে দেখতে হবে। বায়াররা বড্ড ছটফটে আছে। আপনার দোকানে পছন্দমতো জিনিস না পেলে রিমোট টিপে ঝট্ করে অন্য দোকানে পালিয়ে যাবে। সেকেন্ড কা মামলা। সেইমতো জিনিস বানাতে হবে। যাতে আপনার শোকেসের সামনে থেকে পার্টি নড়তে না পারে। সোফায় সেঁটে বসে। টিভি কনসেপ্টটাই পালটে যাচ্ছে দাদাভাই।'

কথা শেষ করে ফের ঘসঘস ধরনের হাসল ঘুতুনিয়া। কমল মল্লিক চুপ করে রইলেন। লোকটা ভুল কিছু বলেনি। সত্যি তো, টিভির চ্যানেলগুলো এখন যেন বাজারে সারি সারি দোকান সাজিয়ে বসেছে। দর্শকদের অবিরত হাতছানি দিয়ে ডাকছে— আমার কাছে এসো, আমার কাছে এসো। দর্শকও ক্রেতার মতো ছুটে যাচ্ছে। পছন্দ হলে নিচ্ছে, নইলে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে। সুখ, দুঃখ, মান,

boierpathshala.blogspot.com

অভিমান নিয়ে আশ্চর্য এক কেনাবেচার জগৎ গড়ে উঠেছে ওইটুকু পর্দা জুড়ে। এতদিন এই লাইনে থাকার পরও এই সরল কথাটা বুঝতে সময় লাগল। ঘুতুনিয়ারা আগে বুঝছে। এই কারণে ওরা টিকে থাকবে।

কমল মল্লিক বললেন, 'বলুন মিস্টার ঘুতুনিয়া, আমাকে হঠাৎ কেন মনে পড়ল?'

'দাদাভাই, আমার চ্যানেলের জন্য একটা রিয়ালিটি শো লাগবে। এই জিনিসটা আজকাল পাবলিক হামড়ে পড়ে খাচ্ছে। যা হয় চেটেপুটে মারে। রাত সাড়ে ন'টা থেকে দশটার স্লটটায় ঝাড় খাচ্ছি। অনেক ভেবে ধর্মকর্মের একটা প্রোগ্রাম দিলাম। হোলি প্লেসের ওপর। তীর্থক্ষেত্র। শালা ধরল না। ওই টাইমে ধম্মকম্ম চলে না। দত্ত বলল, একটা রিয়ালিটি দিন দাদা। দত্তকে চেনেন তো দাদাভাই?'

অর্ডার আসতে পারে শুনে কমল মল্লিক নড়েচড়ে বসলেন। আলো চ্যানেল একাই মল্লিক টিভি প্রোডাকশনকে আবার তুলে ধরতে পারে। তিনটে প্রোগ্রাম ফেলে দিয়ে নতুন করে যদি পাঁচটার অর্ডার দেয়, ক্ষতি নেই, লাভ আছে। তবে 'সম্রাট দত্ত' মানে ঝামেলা। ছোকরাকে তিনি অনেক বছর ধরে চেনেন। গণ্ডগোলের ছেলে।

'দত্তকে চিনব না? কী যে বলেন ঘুতুনিয়া সাহেব। আলো চ্যানেলের এগ্‌জিকিউটিভ প্রোডিউসারকে এ-লাইনে কে না চেনে?'

ঘুতুনিয়া খুশি হলেন। তার চ্যানেলের লোক খাতির পাচ্ছে শুনে খুশি হওয়ারই কথা।

'দত্ত ছেলে ভালো।'

ছেলে ভালো না কচু। ব্যাটা এক নম্বরের ঘুষখোর। প্রোগ্রাম ছাড়তে শুধু টাকা খাবে না, অন্য ফ্যাকড়াও আছে। তবে একদিক থেকে খারাপ না। কাজ বের করে নেওয়ার পথ পাওয়া যাবে। কে জানে হয়তো ওই সম্রাটই সেক্স-টেক্সের বাহানা তুলে মল্লিক প্রোডাকশনের কাজগুলো আটকে দিয়েছে। চাপের মধ্যে রাখলে ঘুষ খেতে সুবিধে। এই লোকের সঙ্গে মল্লিক টিভি প্রোডাকশন সরাসরি আগে কাজ করেনি। কমল মল্লিকের সঙ্গে আলাপ থাকলেও কাজ এই প্রথম। অবশ্য শেষ পর্যন্ত যদি হয়।

কমল মল্লিক বললেন, 'হ্যাঁ ছেলে খুবই ভালো শুনেছি।'

'বুঝলেন দাদাভাই, আমিও ভেবে দেখলাম, কথাটা দত্ত ঠিকই বলেছে। বাঙালির জীবনে গেম বলে তো আর কিছু নেই, টিভিতে দেখে যতটা টেস্ট

boierpathshala.blogspot.com

পাওয়া যায়। সেই কারণেই রিয়ালিটি শোগুলোর টি আর পি এত ওপরের দিকে থাকছে। আপনি দাদাভাই, একটা কিছু ভেবে ফেলুন তারপর সম্রাটের সঙ্গে বসে যান। দেরি করবেন না। তবে পুরোনো জিনিস চলবে না। নতুন কিছু চাই। একদম ফ্রেশ মাল। চমচমে শো।'

'চমচম, রসগোল্লা যা-ই বলুক, একটু সময় তো লাগবে। নতুন কিছু করতে হলে সময় নিয়ে ভাবতে হবে না?'

'ভাবুন, ভাবতে তো আপনাকে বারণ করছি না। আপনি ভাবুন, দত্ত ভি ভাবুক। ওকেও আমি বলে দিয়েছি। আমার ইচ্ছে কাজটা আপনার হাউস করুক। ক-টা প্রোডাকশন ক্যানসেল হয়ে আপনার কিছু লস হয়েছে। ভালো কাজ করে সেই লস তুলে নিন। আপনার বিজনেস টিকুক, আমার বিজনেস ভি টিকুক।'

কথা শেষ করে আবার খানিকটা হাসলেন ঘুতুনিয়া।

'ঠিক আছে, দুটো দিন পরে, কনসেপ্ট নিয়ে আপনার ওখানে চলে যাচ্ছি।'

'দুটো দিন পরে নয় দাদাভাই। আমি দেরি করতে চাই না। খবর পাচ্ছি, আরও তিনটে চ্যানেল ওইসময় রিয়ালিটি নিয়ে নামছে। আমি যদি দেরি করি আটকে যাব। আজই আপনি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে সম্রাটের সঙ্গে বসে যান। ওকে টেলিফোন করে নিন। আমার বলা আছে।'

কমল মল্লিক বুঝলেন তিনি ঝামেলায় পড়ে গেলেন। ঘুষখোর দত্ত'র ঝামেলায়। এই কারণেই মেজাজ খানিকটা বিগড়েছে। কিন্তু বিরক্ত হওয়া চলবে না। ঠান্ডা মাথায় জট খুলতে হবে। সুযোগটা হাতছাড়া করা যাবে না। ঘুতুনিয়ার ফোন নামিয়ে কমল মল্লিক সম্রাটকে ধরার চেষ্টা করল। বারতিনেক নো রিপ্লাইয়ের পর সম্রাট ফোন ধরল।

গলায় একেবারে আহ্লাদ ঝরে পড়ল ছোকরার। আহ্লাদের সঙ্গে খোঁচাও আছে। সে তো থাকবেই। বঁড়শিতে মাছ গেঁথেছে। এবার খেলিয়েই তুলবে।

'আরে মল্লিকদা, আমায় তো ভুলেই গেছেন দাদা। ভুলে যাবেনই তো। এত বড়ো টিভি আইকন হয়েছেন। এখন শুধু মালিকদের সঙ্গে হট লাইন।'

কমল মল্লিক রাগ চাপলেন। এখন এর পাল্লায় পড়তে হয়েছে। ম্যানেজ করে চলতে হবে।

'কী যে বল সম্রাট, তোমাকে ভুললে আমাদের চলবে কী করে? আজ যে ভাই একটু বসতে হবে।'

সম্রাট উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, 'অবশ্যই বসব। আপনি বসতে চাইছেন আর আমি বসব না তা কখনও হয়? তবে দিনের বেলা তো পারছি না দাদা। সন্ধের

boierpathshala.blogspot.com

পর বসছি। এই ধরুন আটটা নাগাদ।'

'ঠিক আছে ভাই। তোমার অফিসে চলে আসছি। নাকি তুমি এখানে আসবে?'

'অফিসে!' দত্ত আকাশ থেকে পড়ল। বলল, 'বলেন কী? সন্ধের পর কেউ অফিসে বসে? কমলদা, আপনি মাইরি এখনও লাইনে বেমানান রয়ে গেলেন। শুকনো গলায় কাজের কথা হয়?'

মদ? ছোকরা গোড়া থেকেই তাহলে ঘুষের কথা শুরু করল। একদিকে ভালো।

কমল মল্লিক শান্ত গলায় বললেন, 'কোনো অসুবিধে নেই। কোথায় বসবে বল?'

চায়না টাউনের এই রেস্তোরাঁটা নাকি নিরিবিলি। সেইরকমই বলেছে সম্রাট। ভুল কিছু বলেনি। কোণের দিকের টেবিলগুলোতে ছড়ানো ছিটোনো কয়েকজন বসে আছে। ভাসা ভাসা লাল আলোয় তাদের মুখ স্পষ্ট করে দেখাও যাচ্ছে না।

দু-নম্বর পেগে চুমুক দিয়ে সম্রাট তৃপ্তির হাসি হেসে বলল, 'নিন কমলদা, এতক্ষণে গলাটা ভিজল। এবার কাজের কথা শুরু করা যাক।'

মল্লিক বললেন, 'কাজের কথা তো তুমি তো জানো। মিস্টার ঘুতুনিয়া তো তোমাকে বলেছেন।'

'উনি বলবেন কী মল্লিকদা? বললাম তো আমি। একটা রিয়ালিটি ধরনের কিছু না চালালে সমস্যা আছে। সন্ধে আর রাতের মাঝামাঝি ওই সময়টা একেবারে প্রাইম টাইম। দখল নেওয়ার জন্য চ্যানেলে চ্যানেলে কাড়াকাড়ি চলছে। আপনি তো ভালো করেই জানেন। ঘুতুনিয়া সাহেবের টাকা আছে, কিন্তু হেড শর্ট। বলল, ধর্মকর্ম চালাও। লে হালুয়া ওই টাইম কি হরি বোল শোনার টাইম? আমি বারণ করেছিলাম, ওসবে যাবেন না স্যার। টি আর পি জিরোতে গিয়ে ঠেকবে। তখন শুনল না, এখন সেই আমার পথে আসতে হয়েছে।'

কমল মল্লিক বললেন, 'উনি তোমার কথা বলেছেন।'

'না বলে উপায় কী?'

সম্রাট গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে চোখ নাচিয়ে বলল, 'না বলে উপায় কী দাদা? আলো চ্যানেল আমাকে ছাড়া এক পা-ও চলতে পারবে?'

ছোকরা দর বাড়াচ্ছে। সে তো বাড়াবেই। মালিককে নিশ্চয় অন্য কথা বলে, তেল দেয়। এরা এরকমই। মল্লিক দ্রুত কাজের কথায় ঢুকতে চাইলেন।

boierpathshala.blogspot.com

'কী ধরনের শো তুমি চাইছ সম্রাট?'

'তুমি চাইছ' কথাটা বলে মনে মনে খুশি হলেন। ভাবটা যেন ওর চাওয়া, না চাওয়াটাই সব।

'আপনার মাথায় কিছু আছে নাকি কমলদা?'

'আমি কয়েকটা ঘেঁটে এলাম, পছন্দ হচ্ছে না। বড্ড ম্যাড়ম্যাড়ে। তুমি যদি চাও দেখতে পারো। ফাইলটা সঙ্গে এনেছি, দেখবে?'

সম্রাট হাত নেড়ে বলল, 'আপনার যখন পছন্দ নয়, তখন আর আমি দেখে কী করব? আর একটা প্রন বলুন। এখানকার গার্লিক প্রনটা ফ্যানটাসটিক।'

খাবার এবং আর একটা লার্জ পেগের অর্ডার নিজেই দিল সম্রাট। তারপর বলল, 'একটা অন্যরকম খেলার কথা ভাবতে হবে। একদম ইউনিক। যে-খেলা ভিউয়াররা দেখা তো দূরের কথা, ভাবতেও পারবে না। ইংরেজিতে যাকে বলে বিওল্ড ইমাজিনেশন। তার ওপর প্রাইজ মানির অ্যামাউন্ট হেভি করতে হবে। লাখের ওপর।'

'এক লক্ষ টাকা!'

সম্রাট অবাক হয়ে বলল, 'তা ছাড়া ভিউয়ার পাব কেন? অ্যামাউন্ট বাড়ালে ভিউয়ারদের মধ্যে টেনশনও বাড়ে। আপনি টাকার কথাটা ভাববেন না। ঘুতুনিয়াকে বোঝানোর দায়িত্ব আমার। আপনি শুধু প্রোপোজালে লিখে দেবেন।'

'শুধু তো টেনশন নয়, তোমরা তো আবার একটু ইয়ে চাও। শুধু তোমরা কেন, কমবেশি সব চ্যানেলই চাইছে।'

সম্রাট হেসে বলল, 'সেক্স তো? সে তো দাদা লাগবেই। বাঙালি জীবনে যত পানসে মেরে যাচ্ছে, তত ওই জিনিস নিয়ে উৎসাহী হয়ে পড়ছে। শালাদের পরকীয়া করতে বুক কাঁপে। টিভি সিরিয়ালে দেখতে গুছিয়ে বসে। সেইভাবে বলতে গেলে স্রেফ একস্ট্রা ম্যারিটাল রিলেশন বেচে চ্যানেলগুলো লাভের মুখ দেখে ফেলল।'

আওয়াজ করে হাসল সম্রাট। নেশা আরও বেড়েছে?

'পরকীয়া নিয়ে তো শো হয় না।'

সম্রাট সিরিয়াস গলায় বলল, 'কেন হবে না? করলেই হবে।'

'সে আবার কী?'

কমল মল্লিক অবাক হল। ছেলেটা বলে কী!

সম্রাট একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, 'এই খেলায় খানিকটা সেক্স পাঞ্চ করে দেব।'

boierpathshala.blogspot.com

'রিয়ালিটি শো তো নাচ-গানে হয় সম্রাট।'

'হয় মানে? কোথাও তো লেখা নেই দাদা। আমরা পরকীয়াতেও করব। পরকীয়া কি রিয়াল নয়? লেগে গেলে আমাদের দেখে অন্য চ্যানেলগুলোও শুরু করবে।'

'আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

গ্লাসে চুমুক নিয়ে, মুখে এক টুকরো প্রন নিল সম্রাট।

'আমার কাছে একটা কনসেপ্ট আছে। শুনবেন?'

'বলো।'

'দুটো কন্ডিশন আছে কিন্তু দাদা।' চোখ নাচাল সম্রাট।

কমল মল্লিক সতর্ক হলেন। দুটো শর্ত! একটা না হয় টাকা চাইবে। আর একটা?

'কী ঘাবড়ে গেলেন নাকি?'

কমলবাবু একটু হাসলেন। প্লেট থেকে খাবার তুলে মুখে দিলেন। রেস্তোরাঁর খাবার এই বয়েসে সহ্য হয় না। কিন্তু উপায় কী, ব্যবসার জন্য কত অসহ্য জিনিস সহ্য করতে হয়।

'ঘাবড়াব কেন ? ব্যবসা করতে এসেছি। এত চট করে ঘাবড়ালে চলবে? তুমি স্বচ্ছন্দে বলে ফ্যালো। কত দিতে হবে?'

সরাসরি কথাটা বলতে পেরে খুশি হলেন কমল মল্লিক। ঘুষখোররা সরাসরি কথা পছন্দ করে।

'কনসেপ্ট চ্যানেলে অ্যাপ্রুভ হলে পার এপিসোড ফিফটিন পারসেন্ট। অন্য পার্টির কাছ থেকে টুয়েন্টির কমে কথা বলি না। আপনি অন্য কথা দাদা।'

কমল মল্লিক মনে মনে হাসলেন। যে নিজেই অ্যাপ্রুভ করবে, সে-ই বলছে অ্যাপ্রুভ হলে! ঘুষ খাওয়ার এটাই তাহলে ছোকরার নিয়ম? ভালো নিয়ম।

'রাজি। আর অন্যটা? দ্বিতীয়?'

এক কথায় কাজ হয়ে যাওয়ায় সম্রাট মনে হয় খুশি হল। গলা নামিয়ে বলল, 'অন্য কাউকে এটা বলতে পারতাম না, আপনি বলেই পারছি। কারণটা প্রাইভেট!'

'প্রাইভেট!'

এক চুমুকে গেলাস শেষ করে সম্রাট নীচু গলায় সেই 'প্রাইভেট' শর্ত জানাল। শর্ত ভয়ংকর।

ছোকরার এক বান্ধবী আছে। এমনি বান্ধবী না, 'বেশি' বান্ধবী। মেয়েটি

boierpathshala.blogspot.com

বিবাহিত। মাসে এক-দু-দিন গেস্ট হাউসে দুজনে রাত কাটায়। শোতে এই মেয়েকে সুযোগ দিতে হবে। শুধু সুযোগ নয়, এই মেয়েই রাউন্ডে জিতে জিতে ফাইনালে উঠবে। শেষ পর্যন্ত খেলায় সেরা হবে। বিচারকদের ম্যানেজ করতে হবে। সেই দায়িত্ব নেবে মল্লিক টিভি প্রোডাকশন।

কমল মল্লিক চুপ করে রইলেন। এই শর্তের কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। এই কারণেই প্রাইজের টাকার পরিমাণ বেশি করা হল? নিশ্চয় এখান থেকেও শেয়ার নেবে সম্রাট। ঘুষ নেওয়ার আর একেকরকম ফন্দি।

'নাম কী?'

সম্রাট লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল, 'আপনি চিনবেন না। ওর নাম রূপরেখা। এই কাজে প্রথম। আগে আবৃত্তি-টাবৃত্তি করত। দেখবেন দাদা, কাজ খারাপ করবে না। আমি কথা দিচ্ছি। আপনার আপত্তি নেই তো?'

কমল মল্লিক চেয়ারে হেলান দিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আজকাল কেনাবেচার জগতে একবার ঢুকলে আপত্তি বলে কিছু হয় না। দীর্ঘশ্বাসই শেষ কথা।

'না না আপত্তি কী? তুমি যখন বলছ?'

এত সহজে গোটা ডিলটা হয়ে যাবে সম্রাট দত্তও বোধহয় ভাবতে পারেনি। সোজা হয়ে বসে সে উৎসাহ নিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ দাদা, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। এই জন্যই আপনার সঙ্গে কাজ করে আনন্দ। এবার কনসেপ্টটা মন দিয়ে শুনুন। এই শোয়ের নাম হবে কাটাকুটি। দুজনের টিম। মহিলা আর পুরুষ। দুজনেই বিবাহিত। অন্তত একজন তো বটেই। পরকীয়ার প্রেমে যেমনটা হয় আর কি। খেলাটা হবে এরকম...।'

boierpathshala.blogspot.com

সাতাশ

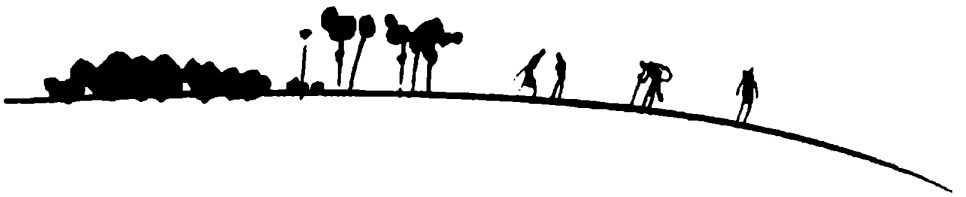

শান্তি যে পোশাকটা হাতে ধরে আছে সেটা কাদু আনিয়েছে কলকাতা থেকে।

পোশাকের নাম শান্তি জানে না। একই সঙ্গে জামা এবং স্কার্ট। রং বেগুনি, কাপড় স্বচ্ছ। তবে সব জায়গায় নয়। বিশেষ বিশেষ জায়গায় স্বচ্ছ। বুকের কাছে সার দেওয়া বোতাম। বোতামের পাশে সূক্ষ্ম সুতোর কাজ আছে। সুতোর রংও বেগুনি। বুকের ওপরটা ঢাকাঢুকি থাকলেও, দু-পাশে স্বচ্ছ কাপড় দেওয়া। কাচের জানলার মতো। ভেতর বাইরে দেখা যায়।

পাড়াগাঁয়ে এই পোশাক দেখা যায় না। দেখার কথাও নয়। গ্রামের মেয়েরা পয়সার অভাবে ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক পরতে শিখেছে, কিন্তু আস্ত পোশাক ছিঁড়ে খুঁড়ে শরীর দেখাতে এখনও শেখেনি।

কাদু চোখ নাচিয়ে বলল, 'জিনিস কেমন শান্তি?'

শান্তি ঠোঁটের ফাঁকে হেসে জামায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'জিনিস তো খুবই কায়দার, কিন্তু এই জামা পরব কী করে গো কাদুদা? এ তো বুক, পেট, থাই সব দেখা যাবে গো।'

কাদু বিরক্ত হল। বিরক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। মানা সরকারকে অনেক ভুজং ভাজুং দিয়ে ঝিলডাঙায় আসতে রাজি করানো গেছে। কাজটা সহজ ছিল না। এরা সমাজের মাথা। আজকাল যারা সমাজের মাথা হয় তারা অন্যের মাথা নিয়ে লোফালুফি খেলে। ইচ্ছেমতো কাটে, ইচ্ছেমতো বসায়। তার ওপর আবার মাথা কাটা সহজ, বসানো কঠিন। মানা সরকার সেই কাজও পারে। এই লোক বনবাদাড়ে পেরিয়ে এতদূর আসতে রাজি হয়েছে এইটাই অনেক। আসার পর যদি ঠিকমতো যত্নআত্তি না হয় তাহলে খুশি হবে কেন? যত্ন তো শুধু পেট পুরে

boierpathshala.blogspot.com

গেলালেই হয় না, শরীরে আরাম দিতে হয়। সেই ভেবেই ব্যবস্থা। এখন শান্তির রং ঢং গায়ে পিত্তি জ্বলিয়ে দেবে না?

কাদু চাপা ধমক দিয়ে বলল, 'দেখা যায় তো তোর অসুবিধে কোতায়? এমন একটা কতা বলছিস যেন তুই কখনও গা দেখাস না?'

শান্তি খিলখিল ধরনের অশ্লীল আওয়াজে হেসে ওঠে। বলে, 'কী যে বল না কাদুদা। নজ্জাশরম বলে তো একটা ব্যাপার আছে। নাকি নেই?'

'তোদের আবার লজ্জা! ফুঃ।'

শান্তি ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'অমন ফুঃ ফাঃ কোরো না। দুঃখ লাগে।'

কাদু শান্তির অভিমান উপেক্ষা করে বলল, 'ফালতু কতা রাখ শান্তি। তোর এই ডেস কিনতে আমায় কত ভাবনাচিন্তা করতে হয়েছে জানিস?'

শান্তি মিথ্যে বিস্ময় দেখিয়ে বলে, 'ওমা, তাই বুঝি?'

কথাটা মিথ্যে নয়। মানা সরকার নেমন্তন্নে রাজি হওয়ার পরই কাদু শান্তির পোশাক কিনে ফেলেছে। গর্তে ফেলতে গেলে, গর্তের মুখ আগে ইন্টারেস্টিং করতে হয়। গর্ত যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। নইলে মানুষ গর্তে উঁকি দেবে কোন দুঃখে? মানা সরকারদের মতো সাবধানী মানুষকে গর্ত পর্যন্ত টেনে আনাটাই কঠিন। সেই কঠিন কর্মটি সারা হয়ে গেছে। এবার বাকিটুকু সারতে হবে। এই কারণেই শান্তির সাজগোজ নিয়ে সে এত মাথা ঘামিয়েছিল। প্রথমে ভেবেছিল হিন্দি সিনেমার নাচের মেয়েদের মতো ঘাগরা চোলি নেবে। বুকের কাছে দড়ি ঝুলবে। 'টান মারি' দড়ি। দেখলেই টান মারতে ইচ্ছে করবে তাই 'টান মারি'। পরে মত পালটে এই জামা কিনেছে।

শান্তির কথা শুনে কাদু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'তা নয় তো কী? অনেক ঘেঁটে জিনিসটা চোখে পড়ল। তা ছাড়া জামা-কাপড়ের তোরা কী জানিস? শহরের মেয়েরা কি ঘোমটা মাথায়, কাঁখে কলসি নিয়ে পথে বেরোয়? শহরে এখন এই সব খুব চলছে।'

শান্তি বুঝতে পারে, জামা নিয়ে আপত্তি তোলাটা ঠিক হয়নি। বোকামি হয়ে গেছে। সত্যি সে গাঁয়ের মেয়ে। শহরের কায়দা জানে না। আর জানুক না জানুক, কাদু বলেছে, এটাই যথেষ্ট। তাকে হাসিমুখে ওই পোশাক পরেই ঘুরতে হবে। যদি বলে, কিছু না পরে ঘুরে বেড়া, তাই করতে হবে। এই লাইনে পয়সা যার কথা তার। পয়সা কাদুর, কথা তারই হবে। ইস, ভুল হয়ে গেল। ম্যানেজ দিতে এগিয়ে এসে সে কাদুর কাঁধে হাত রাখল। হেসে বলল, 'তুমি কী মাইরি কাদুদা? আমি একটা ঠাট্টা করে বললাম অমনি রেগে গেলে? জিনিস দেখে ঘাবড়ে

boierpathshala.blogspot.com

গিয়েছিলাম। আমরা কি তোমার মতো শহুরে ইস্টাইল জানি? তার ওপর তুমি ভালোবেসে দিয়েছ, আমি না নিয়ে পারি? তুমি গাছের ছাল দিলেও তাই নিতাম কাদুদা। ওপর নীচে ছাল জড়িয়ে ঘুরতাম।'

কথা শেষ করে ঠোঁটদুটো সরু করে মাথা নাড়ল শান্তি। যেন দূর থেকেই আদর করল কাদুকে।

কাদু কাঁধ থেকে শান্তির হাত সরিয়ে দেয়।

'তোর ভালোবাসার মুখে আমি ইয়ে করি। বকবকানি থামা দেকি। যা বলছি মন দিয়ে শোন, ক-দিনের মধ্যেই মানা সরকার এখানে আসবে।'

শান্তি চোখ কপালে তুলে বলল, 'মানা সরকার! সেটা আবার কে গো?'

'কে তোমার জেনে কাজ নেই। শুধু এইটুকু জেনে রাখো খুবই মান্যিগুন্যি লোক। অনেক ক্ষমতা।'

শান্তি ভুরু নাচিয়ে বলল, 'কীসে ক্ষমতা? ওতে?'

ইঙ্গিত বুঝতে পেরে কাদু চোখ পাকিয়ে বলল, 'চোপ, এ-ক্ষমতা সে-ক্ষমতা নয়। তোর গলা কাটার ক্ষমতা।'

শান্তি নিজের বুকে হাত দিয়ে ভয় পাওয়ার অভিনয় করল। বলল, 'ওমা! গলা কাটবে কী গো! গুণ্ডা বদমাশ নাকি?'

কাদু তার বিশ্রী দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'না, গুণ্ডা বদমাশ নয়, আমার মতো ভদ্রলোক। মেয়েছেলে মোটে পছন্দ করে না।'

শান্তি শরীরে কাঁপন তুলে হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে কাদুর গাল ছুঁল। বলল, 'তাহলে তো একেবারে নক্ষ্মী ছেলে।'

কাদু পকেটে থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর আলো জ্বলা লাইটার বের করল। হাতের তলায় তাকিয়া টেনে আধশোয়া অবস্থায় সিগারেট ধরাতে কসরত লাগে। অভ্যেসে সেই কসরত রপ্ত করেছে। ডান পা-টাকে বাঁ হাঁটুর ওপর তুলে লম্বা টানে একসঙ্গে অনেকটা ধোঁয়া ছাড়ল। আঁধবোজা চোখে বলল, 'লক্ষ্মী সরস্বতী না রাবণ বুঝতে পারবে সোনা। তবে ব্যাটা এ-পথ মাড়াতে চাইছিল না কিছুতেই। নিশ্চয় ভাবছিল, ডেকেডুকে এনে কিছু একটা চেয়ে বসব। গাঁইগুই করছিল। শেষে ইশারা দিলাম।'

শান্তি বলল, 'ইশারা! কী ইশারা কাদুদা?'

কাদু পা নাচিয়ে বলল, 'সে আছে। দুনিয়া এখন ইশারায় চলে। দুনিয়া ভরা যে কতরকম ইশারা আছে রে শান্তি, শুধু ঠিক সময় ঠিকটা ছাড়তে জানতে হয়। তোর ইশারায় মানাকে এখানে নিয়ে আসছি, এলে দেব আর এক ইশারা। সেটা

boierpathshala.blogspot.com

হবে টাকা-পয়সার ইশারা।' কাদু কথায় লাগাম টেনে বলল, 'যাক, অত তোমার জেনে কাজ নেই। তুমি সেদিন এখানে চলে আসবে। তোমার ডিউটি হবে রেঁধেবেড়ে, যত্ন করে মানাবাবুকে খাওয়ানো।'

শান্তি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'রেঁধে? ইস আমি কি রাঁধুনি যে রাঁধব? উনুনের আঁচে আমার ইস্কিন নষ্ট হয়ে যাবে না? তখন তুমিই মাইরি আমায় পাত্তা দেবে না, খাটে উঠতে গেলে নাতি বসাবে। তা ছাড়া আমি ভাত পর্যন্ত গালতে পারি না। বাড়িতে সব মা করে।'

কাদু 'খ্যা খ্যা' আওয়াজে হাসল। শান্তির গালে ঠোনা মেরে বলল, 'আমার চুনুমুনু রে, তোমায় বাচা রাঁধতে হবে না। শোল আর মোহন সব ব্যবস্থা করে রাখবে। তুমি শুধু...। বুঝেছ সুন্দরী?'

এবার চোখ টিপল কাদু। শান্তি প্রথমে ভুরু কুঁচকে তাকাল তারপর ঠোঁট কামড়ে হাসল।

'বুঝেছি। ওই রান্না তো? সে আমি ভালোই পারি। কিন্তু পেমেন্ট?'

কাদু হাত নেড়ে বলল, 'সে হবে। কে'ন্ কাজটা তোর পেমেন্ট ছাড়া হয়েছে? মাগনায় আমি কিছু করি না। এক ঘণ্টা থাকিস কী না থাকিস থুতু দিয়ে টাকা গুনে নিস।'

শান্তি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'কী এমন দাও যে এত কতা শোনাচ্ছ? এবার পেমেন্ট কিন্তু ডবল চাই। অত বড়ো মানুষ বলে কতা। অ্যাই অ্যাডভানস হবে?'

কাদু হিসহিসিয়ে ওঠে, 'উফ, টাকা টাকা করেই তুই গেলি শান্তি। আমার সঙ্গে ছেনালি করিসনি। ডবল কীসের?'

শান্তি চোখ বড়ো করে বলল, 'ওমা, সে কী গো! বড়ো পার্টি। এই বললে গাঁ গঞ্জের মাথা। পয়সা ডবল হবে না?'

কাদু বিরক্ত মুখে সোজা হয়ে বসল।

'চুপ কর, একদম চুপ কর। শোন শান্তি, মানা সরকার এলে এই জামাটা পরবি। সবসময় নয়। খাওয়া-দাওয়ার পর হারামজাদাকে নিয়ে যখন বসব। সেজেগুজে তুই রেডি হয়ে থাকবি। ইশারা দিলে তবে এটা গায়ে দিয়ে আসবি। তার আগে নয়। মনে থাকবে? শুধু এই জামা কিন্তু।'

শান্তি হাত দিয়ে পোশাক তুলে বলল, 'এমা! ছি ছি শুধু এটা? আর কিছু না? অ্যাই আমার ভীষণ নজ্জা করবে।'

কাদু দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'ন্যাকামি করিস না । সিরিয়াস সময়ে ন্যাকামি আমি পছন্দ করি না। যা বলব তার নড়চড় করলে তোমার কপালে দুঃখু আছে।

boierpathshala.blogspot.com

গলা কেটে ফেলে দেব।'

শান্তি কাদুর রাগ দেখে একটু চমকে গেল। না, দর কষাকষিটা একটু বেশিই হয়ে গেছে। এই শয়তান রেগে গেলে সত্যি সত্যি অনেক কিছু করতে পারে। কাটাকুটি তো সহজ কাজ, গলায় পাথর বেঁধে জলে চুবিয়ে দিলেও কেউ বুঝতে পারবে না। বলবে, আহা রে, খারাপ মেয়েটা নিজেই মল। শান্তি কায়দা করে বুক থেকে আঁচল ফেলে দাঁত বের করে হাসল।

'তোমার কী হয়েছে বলো তো কাদুদা? আজকাল তুমি মাইরি ঠাট্টাও বোঝো না। নিচ্চয় পেসার বেড়েছে। তোমাদের ওই গোপীডাক্তার না কে আছে তাকে একবার দেকিয়ে নাও না বাপু।'

শান্তির কথা কাদুর কানে গেল না। সে আঁচল-ফেলা শান্তির দিকেও তাকাল না। সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে মনেই বলল, 'মানাকে দিয়ে আমায় দুটো হ্যাঁ করিয়ে নিতে হবে। একটা করাব তোকে দিয়ে, আর একটা করাব টাকায়। পার্টি পলিটিক্সের এই লোকগুলো শুধু মেয়েছেলের টোপে বড়শি গেলে না, সঙ্গে টাকা-পয়সার মধু মেশাতে হয়। কাজ যদি ঠিকঠাক করতে পারি শান্তি, আগামী কয়েক বছরে আমি ঝিলডাঙার রাজা। লোকে আমাকে দেখে কাঁপবে, সেলুট ঠুকবে।'

শান্তি কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, 'আমি বাবা আগেই সেলুট মেরে রাখলাম।'

কাদু হাত বাড়িয়ে শান্তির থুতনি ধরল। যাঃ বাবা, এই মেয়ের থুতুনিতে আবার তিল এল কোথা থেকে? তলপেটের নীচে একটা আছে না? এই হল মুশকিল। তলপেট দেখলে আর মুখ দেখা হয় না।

'কাজটা হলে শান্তি তুই হবি মক্ষীরানি। কী রে পারবি না?'

শান্তি কাদুর এই কথাগুলোর মানে বুঝতে পারছে না। তাতে কিছু আসে যায় না। সে জানে অর্ডার ছাড়তে নেই। অর্ডার হল মা লক্ষ্মী। কী অর্ডার, কেন অর্ডার এসব ভাবনা পরে। বেচাকেনার জগতে অর্ডার শুধু অর্ডার। তার কোনো জাত নেই। রসগোল্লা না বোমা বন্দুক তাতে কিছু যায় আসে না। ঘাড় কাত করে বলল, 'খুব পারব কাদুদা। কেন পারব না? তুমি সঙ্গে থাকলে কোন শালা ঠেকাবে?'

কাদু খুশি হয়ে বলল, 'যা বললাম সেরকমই করবি। বাকি সময় ভদ্রলোক সেজে থাকবি। এমন ভদ্রলোক যেন এভাবে আঁচল খসে না পরে। যখন বলব তারপর দেখাবি।'

boierpathshala.blogspot.com

শান্তি মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসল। হাসতে হাসতেই বলল, 'তাহলে কিন্তু পেমেন্ট আড়াই লাগবে কাদুদা। হ্যাঁ, এইটা বলে দিলাম।'

'বড্ড যোগ বিয়োগ শিকেছিস দেকছি।'

শান্তি ডান কাঁধটা সামনে ঠেলে বলল, 'বাঃ শিকব না? তোমার মতো মাস্টার পেয়েছি। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সব শিকেছি।'

'মাস্টার' শব্দটায় যেন চমকে উঠল কাদু। জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো ঘরের কোণায় ছুড়ে ফেলে সে এবার সোজা হয়ে বসল। চিন্তিত মুখে বলল, 'এখন কেটে পড় শান্তি।'

'ওমা হঠাৎ কী হল! এখনই চলে যাব কী গা?'

কাদু হাত নেড়ে বলল, 'যা ভাগ বলছি। জরুরি একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেল। ভেবেচিলাম ক-টা দিন পরে হাত দেব, এখন মনে হচ্চে, সেটা ঠিক হবে না। এসব কাজ ফেলে রাখতে নেই।'

শান্তি এগিয়ে এসে কাদুর কাঁধে হাত রাখল। শরীরের ভার তার গায়ের ওপর ছেড়ে মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'কী কাজ?'

কাদু বাঁ হাত তুলে শান্তির চুলে হাত বুলিয়ে হেসে বলল, 'ছোটো কাজ। বড়ো কাজে যাওয়ার আগে ছোটো কাজ। একটা মাস্টারকে একটু শিক্ষে দেওয়ার কাজ।'

কাদুর গালে থুতনি রেখে শান্তি বলল, 'সে মাস্টারকে যত খুশি শিক্ষে দাও গে, আমি কিন্তু এখন মোটেও যাচ্ছি নে। তুমি বলেচিলে কী যেন জড়িবুটি এনেচ, সেই জড়িবুটি গিলে একদিন আমার ওপর পরিখ্যে করবে। বলোনি? হি হি।'

কাদু শান্তির মুখ সরিয়ে দিয়ে বলল, 'জড়িবুটি কোতায়, ও তো লিকুইড। ও আর একদিন হবে।'

'কেন আজই হোক না। অসুবিধে কী? আমি তো রেডি।'

গায়ের কাপড় সরাতে লাগল শান্তি।

কাদু এবার সত্যি সত্যি রাগ দেখিয়ে বলল, 'ভাগ বলছি । আর বেচাল করলে কপালে দুঃখু আচে।'

শাড়ি ঠিক করতে উঠে দাঁড়াল শান্তি। বলল, 'আজ একটা নোট বেশি দেবে কাদুদা?'

'কেন? বেশি দেব কেন!'

'বাঃ দেবে না? কিছুই তো করলে না। গায়ে হাত পজ্জন্ত ঠেকালে না।

boierpathshala.blogspot.com

মনটাই ভেঙে গেল। নোট দিয়ে ভাঙা মন মেরামত করব।'

শান্তির বলার কায়দায় দেখে কাদু আওয়াজ করে হেসে উঠল। এই রংঢঙের জন্যই মেয়েটাকে তার পছন্দ। শালি কায়দাকানুন জানে। পাড়াগাঁয়ের মেয়েমানুষ এত কায়দা শিখল কোথা থেকে? এই কায়দা দিয়ে যদি মানাটাকে খানিকটা পিছলে দিতে পারে তাহলে আর কথাই নেই। গর্তে ফেলার জন্য বাকি ঠেলাটুকু সে নিজেই দিতে পারবে।

'চিন্তা করিস না শান্তি। যা বলব তা যদি ঠিকমতো করতে পারিস, তোর নোটের অভাব হবে না হারামজাদি।'

শান্তি মাথা নামিয়ে বলল, 'আশীর্বাদ কর কাদুদা যেন তাই হয়।'

কথা শেষ করে শান্তি বন্ধ দরজায় টোকা দিল। বাইরে থেকে তালা মারা দরজা খুলে দেওয়ার টোকা।

শান্তি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই কাদু মোহন আর শোল দুজনকেই ভেতরে ডেকে নেয়।

'মোহন, বাথরুমের কাজ কি শুরু হয়েছে?'

মোহন খানিকটা অবাক হয়ে বলল, 'বাথরুম! কোন্ বাথরুম দাদা?'

'হারামজাদা কোন্ বাথরুম বুঝতে পারছ না, ঝিলডাঙার ইস্কুলের বাথরুম।'

পাশে বসা শোল বলল, 'শুরু হয়েছে ওস্তাদ। আমি আজ ওপাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখি ইঁটের গাঁথনি পড়চে।'

কাদু শান্ত গলায় বলল, 'কতটা পড়েচে?'

শোল হাত তুলে বলল, 'এই এতটা, আমার গলা পজ্জন্ত।'

'ক-টা লোক কাজ করচিল?'

'আমি যখন দেখলাম, তখন তো মোটে দুটো ছিল। একটা মিস্ত্রি, আর একটা বাঁশের ভাড়ার নীচে দাঁড়িয়ে জোগান দিচ্চিল।' একটু থেমেই শোল আবার বলল, 'আর হ্যাঁ, ওই মাস্টারটা ছিল।'

কাদু তাকিয়াটা কোলের ওপর টেনে নিল। চোখ ঝকঝক করে বলল, 'বাঃ, গাঁয়ের লোক তাহলে দেকছে চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ছেলেমেয়েদের হাগা মোতার জায়গা বানায়?'

মোহন, শোল দুজনেই চুপ করে রইল।

কাদু নীচু গলায় বলল 'ওই মিস্ত্রিদুটো থাকে কোতায়? ওরা কি ঝিলডাঙার?'

boierpathshala.blogspot.com

শোল বলল, 'না, ঝিলডাঙার হলে চিনতে পারতাম। গরমেন্টের কাজ, নিজেদের আলাদা লোক আছে। বাইরের কনটাকট।'

প্রাক্ সন্ধের আলোয় কাদুর চোখ আরও জ্বলে উঠল। সে মোহনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মোহন তুই আজ রাত আটটার পর খুঁটিয়ার কাছে যাবি, বলবি, আমি ডেকেচি। স্কুলবাড়ি নিয়ে মিটিং করব। লোকটাকে তোর মোটরাবাইকে চড়িয়ে সটান নিয়ে আসবি এখানে। আমরা সত্যি সত্যি কতা বলতে শুরু করব। কিছুক্ষণের মধ্যেই শোল ইস্কুলবাড়িতে খানকতক চেলেপিলে পাঠিয়ে মিস্ত্রি মজুরগুলোকে বেদম ঠেঙানি দেবে। এমন ঠেঙানি যাতে শালারা কোনোদিন এ মুখো না হয়। নিজে মারবি না, তোর চেলেরা মারবে। কিচু একটা বলে মারধর করলে ভালো হয়। একটা অভিযোগ থাকবে।'

শোল বলল, 'কী বলবে ওস্তাদ?'

কাদু এক মুহূর্ত ভেবে বলল, 'যা খুশি, ধর বলবি বিকেলবেলা পুকুরঘাটে মেয়েছেলের স্নান দেখচিল, কিংবা মদ খেয়ে বেলেল্লাপনা করচিল। দু-একটা বোতলও নিয়ে যেতে পারিস। প্রমাণ হিসেবে ফেলে আসবি। মারধরের সময় বাথরুম যতটা গাঁথনি হয়েছে ভেঙে দিতে হবে। তুই কিন্তু মারধরের মাঝখানেই এসে এখানে খবর দিবি। খুব স্বাভাবিকভাবেই মাস্টার সঙ্গে সঙ্গে যেতে চাইবে। যাবেও। মোহনই তাকে বাইকে নামিয়ে দেবে স্কুলের সামনে। তখন ছেলেগুলো হারামজাদার হাত পা ভেঙে দেবে। ঠিক আচে?'

কাদু শোলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'লোক কোথা থেকে আনবি?'

শোল একটু হেসে বলল, 'চিন্তা কোরো না ওস্তাদ। ছেলে যেখানকারই হোক, ঝিলডাঙার হবে না। কেউ চিনতে পারবে না।'

কাদু বলল, 'গুড।'

ঘটনা কিন্তু কাদুর ছকে দেওয়া পরিকল্পনার থেকে একটু বেশিই হল। মারপিটের সময় চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়ার হাত পায়ের বদলে লোহার রডের আঘাত লাগল মাথায়।

দু-বোতল রক্ত দেওয়ার পরও মাস্টার মারা গেল বানেরহাট হাসপাতালে। কাদু নিজে দাঁড়িয়ে রক্তের ব্যবস্থা করল।

boierpathshala.blogspot.com

আটাশ

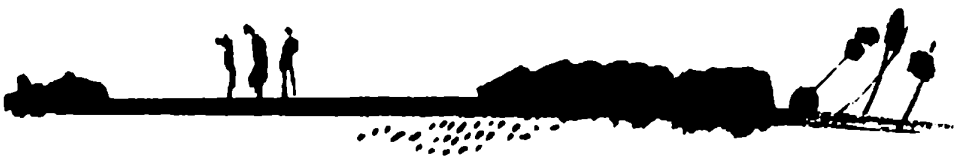

নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কোথা থেকে যেন 'গুম গুম' আওয়াজ ভেসে আসছে। সেই আওয়াজ চাপা এবং গম্ভীর। দেয়ালে ধাক্কা লেগে গা ছমছমে একটা পরিবেশ তৈরি করছে।

পৃথা মুখ তুলে বলল, 'আওয়াজটা নিশ্চয় এদের নিউ অ্যাডিশন।'

সোমনাথ মুহূর্তখানেক শুনে বলল, 'ড্রামের বিটস। মনাস্ট্রি বা গুম্ফার কাছে গেলে শোনা যায়।'

পৃথা হেসে বলল, 'পারেও বটে।'

সোমনাথ বলল, 'বাঃ পারবে না! কোনো কিছু করতে গেলে ডিটেইলসেই করতে হয়।'

'তোমাদের মতো?'

'ঠাট্টা করছ পৃথা? অডিওভিসুয়্যাল কী জিনিস জানো না তো। আলো, সেট, কস্টিউম ঠিক করতে জান কয়লা হয়ে যায়।'

পৃথা বড়ো করে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'জান কয়লা হবে না? তোমার সবাই রোজ টিভির জন্য এক-একটা পথের পাঁচালি বানাচ্ছ। পরিশ্রম করতে তো হবেই।'

সোমনাথ হতাশ গলায় বলল, 'আবার ঠাট্টা করছ।'

পৃথা কফির মগ হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ঠাট্টা করছি। এবার তোমার সিরিয়াস কথাটা শুনি।'

একটা সময় ছিল যখন খাবার দিয়ে রেস্তোরাঁর পরিচয় হত। মোগলাই খানার জন্য একটা তো চিনা খাবারের জন্য আর একটা। বাঙালির আলু

boierpathshala.blogspot.com

পোস্তোর বড়া আর বড়ি দেওয়া শুক্তোর জন্যও নাম করল কেউ কেউ। এখন আর সেদিন নেই। শুধু মেনুতে চলছে না। সবকিছুর মতো, খাবারেও কঠিন কম্পিটিশন। সম্ভবত সেই কারণে কলকাতার রেস্তোরাঁগুলোর আজকাল খাবারের সঙ্গে সাজগোজও লাগছে। কারও টেবিলের পাশে ছোটোখাটো জঙ্গল, ঝরনা বয়ে যাচ্ছে। কেউ রেস্তোরাঁর ঘর বানিয়েছে রেলগাড়ির কোচের মতো, কেউ নৌকার ছাউনির মধ্যে বসে খানাপিনার ব্যবস্থা রেখেছে।। ক্যামাক স্ট্রিটের কোন রেস্তোরাঁ নাকি 'লাইব্রেরি' ধরনের একটা ব্যাপার করেছে। চাউমিন খেতে খেতে 'অর্গানাইজেশন অব্ গ্লোবাল নেগোশিয়েন' বা 'ওয়ার্কস অব্ টমাস হার্ডি' নিয়ে উলটে দেখার ব্যবস্থা হয়েছে।

এই রেস্তোরাঁ সাজানো হয়েছে তিব্বতি গুম্ফার কায়দায়। একপাশের দেয়ালে সারি দিয়ে সাজানো আছে কাঠের প্রেয়ার হুইল। আলো আঁধারিতে একই সঙ্গে স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট। একটা গা ছমছমে, ফিসফিসানি ব্যাপার। সিলিং থেকে লম্বা লম্বা রঙিন কাপড় ঝুলছে। দেয়ালে বড়ো বড়ো তিব্বতি ছবি, মুখোশ। গানের বদলে সম্প্রতি সাউন্ড বক্সে ঘণ্টা ধ্বনি এবং ড্রামের বিট শোনানোর আয়োজনও হয়েছে। কে বলবে কয়েক পা দূরেই ব্যস্ত গড়িয়াহাট?

পৃথা জায়গাটা পছন্দ করে সাজগোজের জন্য নয়, মোমো, থুক্পার কারণে। তার মতে, তিব্বতি খাবারে এই মুহূর্তে নাকি এরাই কলকাতায় সেরা। সোমনাথ মনে করে, পৃথার এই ধারণা ঠিক নয়। বিশপ লেফ্রয় রোডের কাছে এর থেকে অনেক ভালো মোমো পাওয়া যায়। এরা অ্যাম্বিয়েনস তৈরি করে খাবারের ওপরে প্রভাব ফেলেছে। তবে এই সামান্য বিষয় নিয়ে সে পৃথার সঙ্গে বিরোধে যেতে চায় না। খাবারের ব্যাপারে প্রেমিকাদের সিদ্ধান্ত মাথা পেতে মেনে নেওয়াটাই নিয়ম। সে-ও মেনে নিয়েছে। পৃথার ইচ্ছেমতো আজ এখানে এসে বসেছে।

পৃথা তার হাতে ধরা মোমোতে ছোটো কামড় দিল। এক চামচ স্যুপ তুলে মুখে নিল। বলল, 'নাও, এবার তোমার সিরিয়াস কথাটা বলো।'

সোমনাথ বলল, 'সিরিয়াস না বলে গুরুত্বপূর্ণও বলতে পারো। ওয়েদার ফোরকাস্টের প্রোগ্রামটা এই প্যাটার্নে করলে পাবলিক নেবে না ছুঁড়ে ফেলে দেবে সেটা তোমার কাছ থেকে শুনতে চাইছিলাম।'

পৃথা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'কনসেপ্ট না বললে, কী করে বুঝব নেবে না ফেলে দেবে?'

সোমনাথ নীচু গলায় দ্রুত স্ক্রিপ্টটা বলল।

boierpathshala.blogspot.com

পৃথা চোখ বড়ো করে বলল, 'এর মধ্যে ওয়েদার কোথায়? মেয়েটির শরীর-ই তো বেশি!'

'আহা, মোম চ্যাটার্জিকে তো এইজন্যই নেওয়া।'

পৃথা ভুরু কুঁচকে বলল, 'মোম! সে কে?'

সোমনাথ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'তোমাকে নিয়ে এই হল মুশকিল পৃথা। আমাদের লাইন সম্পর্কে ইউ হ্যাভ নো ইন্টারেস্ট। এই সময়ে মোম হল বাংলা টিভি ওয়ার্ল্ডের মোস্ট চার্মিং পারসোনালিটি। কত সিরিয়াল আর টেলিফিল্মে যে কাজ করছে। দর্শকরা ওকে খুব ভালোভাবে অ্যাকসেপ্টও করেছে। মোমই তো প্রোগ্রামটা কন্ডাক্ট করবে।'

পৃথা মন দিয়ে খানিকটা স্যুপ খেয়ে ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁট মুছল। চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, 'ও সেটাই বলো, তোমরা ওয়েদার বুলেটিনের নাম করে মোম চ্যাটার্জির চেহারা সেল করতে চাও?'

সোমনাথ মুচকি হেসে বলল, 'পুরোটা ঠিক না হলেও, খানিকটা ঠিকই বলেছ। তবে আমরা চাই না, পার্টি চায়! আমি মল্লিক প্রোডাকশন থেকে কাজটা করার অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছি। কনসেপ্ট তৈরি করতে দিনরাত মাথার ঘাম ফেলেছি। সেদিন বোনপোকে আইসক্রিম খাওয়াতে বেরিয়েছিলাম...হঠাৎ পার্লারে একটা মেয়ের ছবি দেখলাম...দ্য গার্ল ইজ ইন দ্য সুইমিং পুল।'

পৃথা একদৃষ্টিতে সোমনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রোগ্রামে ডিরেক্টর হিসেবে তোমার নাম থাকবে নাকি?'

'মনে হয় থাকবে।'

'তুমি রাজি হলে?'

সোমনাথ শুকনো হেসে বলল, 'আমার রাজি অ-রাজির ব্যাপার নয়, এটা পার্ট অব দ্য জব। চাকরির অংশ।'

পৃথা একটা ছোটো নিশ্বাস ফেলে আবার মোমোতে মন দিল। বলল, 'যেদিন শুরু হবে তার দু-দিন আগে বোলো তাহলে।'

সোমনাথ ভুরু কুঁচকে বলল, 'কেন? অফিস ছুটি নেবে?'

'হ্যাঁ, ছুটি নিয়ে কলকাতা ছেড়ে পালাব। তোমাকে নিয়ে নিজে হাসিঠাট্টা করতে পারি, কিন্তু অন্যের হাসি ঠাট্টা সহ্য করতে পারব না।'

সোমনাথ সিগারেটের প্যাকেট বের করতে গিয়েও থমকে গেল। আজকাল কলকাতার অনেক জায়গায় সিগারেট খাওয়া যায় না। এই তিব্বতি রেস্তোরাঁতেও সেই ব্যবস্থা। এই কারণেই সোমনাথ চট করে এখানে আসতে চায় না। প্রেম

boierpathshala.blogspot.com

করার সময় ধোঁয়া না ছাড়লে চলে?

'হাসিঠাট্টা বলছ কেন? কনসেপ্টটা লেগে গেলে প্রোগ্রাম হিট করবে।' সোমনাথের ঠোঁটে দুষ্টুমি ধরনের হাসি। বলল, 'মোম চ্যাটার্জি বলে কথা। মেয়েটির স্কিনরেটিং কত যাচ্ছে জানো?'

'স্কিন্‌রেটিং! সে-বস্তুটি কী সোমনাথ?'

'সে আছে। তোমাদের যেমন কম্পিউটারের জন্য নানারকম ভাষা, আমাদেরও সেরকম আছে। পর্দায় দেখানোর পর দশ নম্বরের মধ্যে ভিউয়ারদের কাছ থেকে কে কত পাচ্ছে তার হিসেব রাখতে হয়। মোম পেয়েছে সেভেন পয়েন্ট টু। সেভেন পয়েন্ট টু হেলাফেলার বিষয় নয় পৃথা। শরীরে বিদ্যুৎ চমকায়, হাসিতে মুক্তো ঝরে।'

হাত নেড়ে বিজ্ঞাপনের ঢঙে কথাটা বলে হাসতে লাগল সোমনাথ । পৃথা ভুরু কুঁচকে বলল, 'ওই মেয়েকে তুমি চেনো নাকি!'

'আলবাত। না চিনলে কোম্পানি রাখবে কেন? তবে এর সঙ্গে আমার আবার একটু আলাদা খাতির।'

খোঁচাটা দিয়ে সোমনাথ আনন্দ পেল। চেয়ারে হেলান দিয়ে হাত দুটো তুলে আড়মোড়া ভাঙল।

পৃথা ঠোঁট কামড়ে বলল, 'সেটা কীরকম জানতে পারি?'

সোমনাথ সহজ গলায় বলল, 'নিশ্চয় পারো। পুরোনো চেনাজানা।'

পৃথা আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'কই আগে বলোনি তো? এমন একজন বিদ্যুতের সঙ্গে তোমার চেনা জানলে টিভি খুলে একবার অন্তত দেখে নিতাম। টিভি সেট বিগড়ে যাবে না তো?'

পৃথার হিংসেতে সোমনাথ খুশি হল। মেয়েটাকে রাগানো গেছে। প্রেমিকাকে অন্য মেয়ের গল্প বলে রাগানোটা খুবই আনন্দের একটা বিষয়।

মুখে একটা 'এ আর এমন কী' ধরনের ভাব এনে সোমনাথ বলল, 'এরকম কত মেয়ের সঙ্গে আমাকে রোজ চলতে হয়। বলতে গেলে বিরাট লিস্ট হয়ে যাবে। লাইনটাই তো সুন্দরীদের। ছেড়ে দিচ্ছিলাম বলে এই কারণে একটু খারাপও লাগছিল। '

বেয়ারা বিল দিয়ে গেছে। এদের মেনু এবং বিল দুটোই কায়দার। পুথির মতো গোটানো। খুলে দেখতে হয়। পৃথা বিল দেখতে দেখতে বলল, 'ছেড়ে দিলে কই?'

সোমনাথ এবার যেন বল নিজের কোর্টে পেল।

boierpathshala.blogspot.com

'এখন বলছ কেন? সেদিন যখন বলেছিলাম, কমল মল্লিক ডাকলেও আর যাব না, তখন কী বলেছিলে মনে আছে? যাও যাও, এভাবে না বলে চলে আসাটা ঠিক নয়। মনে পড়ছে ডার্লিং?'

পৃথা চকিতে তাকিয়ে বলল, 'কেন পড়বে না? খুব পড়ছে। আমি তোমাকে এখনও ছেড়ে দিতে বলছি না। কাজটা তুমি আসলে বাই হার্ট ভালোবাসো। দুম করে অন্য কিছুতে মন বসাতে পারবে না। কিন্তু তা বলে পুরোনো বান্ধবীর জন্য যে এরকম একটা চিত্রনাট্য বানাবে সেটা কী করে বুঝব বলো?'

'পুরোনো বান্ধবী!' আওয়াজ করে হেসে উঠল সোমনাথ। বলল, 'প্রেমিকাদের নিয়ে এই হল সমস্যা পৃথা। শরীর, মনে তারা কত আধুনিক হল, কিন্তু সর্ষের মধ্যে ভূত দেখা ছাড়তে পারল না। সরি ভূত নয়, পেতনি।'

পৃথা ভুরু তুলে বলল, 'সুন্দরী পেতনি বলো।'

'দুর, দুর মোম সুন্দরী না কুচ্ছিত আমার কী? মেয়েটার সঙ্গে খুব ছোটোবেলায় একবার দেখা হয়েছিল, একদিনই, আগরপাড়ায় আমার দূরসম্পর্কের এক বোনের সঙ্গে পড়ত। কমল মল্লিক এখন সেটা ক্যাশ করতে চাইছে।'

পৃথা হেসে চোখ বড়ো করে বলল, 'এ তো গভীর প্রেমকাহিনি সোমনাথ। জানো সব বয়েসের মেয়েরা প্রেম ভুলে যায়, কিশোরীরা শুধু ভোলে না।'

'বাবাঃ, আজকাল কবিতা-টবিতাও লিখছ নাকি?

'লিখলে ক্ষতি কী? তোমরা সুযোগ পেলে কবিতাও বেচে দেবে। মল্লিক টিভি প্রোডাকশন প্রেজেন্টস...।'

দু-হাত তুলে শূন্যে লেখা দেখাল পৃথা। তারপর বলল, 'দ্যাখো, সাবধানে থেকো। মুক্তো নিয়ে সমস্যা নেই, বিদ্যুতের জন্যই ভাবছি। হাত লাগাতে গিয়ে ছিটকে পোড়ো না।'

সোমনাথ ঝুঁকে পড়ে পৃথার হাত ছোঁয়। কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'আর হাত, টেলিফোনে কথা বললাম, চিনতেই পারল না। অথচ কমল মল্লিক আমার ওপর ডিপেন্ড করে আছে। চ্যানেল ওই মেয়েকেই চাইছে।'

সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে পৃথা মুখে 'চুক চুক' ধরনের আওয়াজ করল। বলল, 'মনের কোণে অভিমান থাকলে ওরকমই হয়। চিনতে পারলেও প্রথমে মুখ ফুটে বলা যায় না।'

'তোমার এক্সপিরিয়েন্স আছে মনে হচ্ছে।'

boierpathshala.blogspot.com

'ওসব বলে কথা ঘোরাতে চেষ্টা কোরো না সোমনাথ। চেষ্টা চালিয়ে যাও, দেখবে ঠিক চিনতে পারবে। সময় লাগবে। আমার মনে হয়, ওই মেয়েই তোমাকে ফোন করবে। মনে হয় কেন, আই অ্যাম শিওর।'

'ঠাট্টা কোরো না, দায়িত্ব যখন নিয়েছি কাজটা করে দিতে হবে। তবে দিস ইজ লাস্ট। এরপর আমি পালাব।'

পৃথা মুচকি হেসে বলল, 'কোথায়? ওই যে পাথর না কি ভাঙতে?'

হতাশ গলায় সোমনাথ বলল, 'সেও এক বিপদ।'

'সেখানে আবার কী বিপদ হল!'

সোমনাথ বেজার মুখ করে বলল, 'সেখানে বিপদ নয়, এবার বিপদ হয়েছে বাড়িতে। দিদি ঝামেলা পাকাচ্ছে।'

'কীরকম?'

'বিয়ের জন্য জোরাজুরি শুরু করেছে, মাথাটা আগেই গিয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে, একেবারে গেছে।'

সাদা টপের সঙ্গে ম্যাচ করে পৃথা আজ কালো পাথরের একটা মালা পরেছে। কানের ছোটো ছোটো দুল দুটোও কালো। মেয়েটা ছিমছাম ধরনের সাজপোশাক পছন্দ করে। মালা হাতে প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে বলল, 'বিউটিফুল! ছাঁদনাতলায় গিয়ে বসে পড়ো। হাফ্ বেকার বরদের আজকাল খুব দাম।'

'হাফ্ বেকার বলছ কেন?'

'বাঃ হাফ নয়? পাত্র কী করে? না, টিভির জন্য ঝড়-জলের ফোরকাস্ট বানায়। পূর্বাভাষ বলে হাফ্, ওরিজিনাল ঝড় জলের ছবি তুললে বলতাম ফুল।'

সোমনাথ গম্ভীর মুখে বলল, 'রসিকতা করছ তো? কর। জানো দিদির মেয়ে দেখা হয়ে গেছে।'

'তুমি দ্যাখোনি?'

'না, মেয়ে দেখিনি, তবে মেয়ের ফটো দেখেছি।'

পৃথা হাসি চেপে ভুরু নাচিয়ে বলল, 'পাত্রীর হাইট কেমন? আমার থেকে বেশি?'

সোমনাথ বলল, 'মনে হয়। অ্যাই একটা হেল্প করবে? প্লিজ পৃথা, বলো করবে?'

'না। একদিকে কৈশোরের প্রেমিকা, অন্যদিকে ভাবী বউ—তোমার তো দেখছি ভরা অবস্থা সোমনাথ। এর মধ্যে আমার হেল্প অতি তুচ্ছ।'

সোমনাথ নিজের পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে বলল, 'তুচ্ছ হলেই চলবে।

boierpathshala.blogspot.com

এই রে! কোথায় গেল বলো তো?'

পৃথা কফি মাগে চুমুক দিয়ে বলল, 'কী?'

এখানকার কাপ ডিশগুলোও রেস্তোরাঁর সঙ্গে মানানসই। দেখলে মনে হয় পাথরের। প্রাচীন গুম্ফায় কফিমগ তো পাথরের হওয়াই ঠিক।

শার্ট প্যান্টের সব ক-টা পকেট হাঁটকে সোমনাথ বলল, 'যা, বাবা, খামটা কোথায় রাখলাম?'

'কীসের খাম?' নীচু গলায় বলল পৃথা।

'আমার পাত্রীর ফটোর খাম। দুটো ফটো আছে, কালার আর ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। ফটো দেখিয়ে তোমার কাছ থেকে ফাইনাল মতামত নেব বলে, এনেছিলাম। ইস কোথায় যে রাখলাম।'

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে পৃথা বলল, 'ফটো দেখাতে হবে না। আমি মত দিয়ে দিলাম।'

'সত্যি বলছ তো? পরে যদি পাত্রীর গায়ের রং ময়লা বলেছ তাহলে কিন্তু শুনব না।'

'না বলব না। কালো হলেও বলব, পাত্রীর গায়ের রং কাঁচা সোনার মতো, অতি সুন্দর।'

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে দুজনেই হেসে উঠল।

গুম্ফার গোল দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে সোমনাথ বলল, 'তুমি কিন্তু আসল কথাটা বললে না পৃথা। প্রোগ্রাম কনসেপ্টটা কেমন হয়েছে।'

পৃথা দ্রুত চোখে খালি ট্যাক্সি খুঁজছে। সল্টলেকে সেক্টর ফাইভের যাওয়ার জন্য এই সময় ট্যাক্সি পাওয়া ঝামেলা। আজ তার নাইট শিফটে ডিউটি।

'সিরিয়াসলি বলব?'

'নিশ্চয়। সিরিয়াস কথাই তো শুনতে চাইছি।'

'খুব খারাপ সোমনাথ। হোয়াট ইজ দিস? এসব কী তোমরা শুরু করেছ বলো তো? ব্যবসা তো করতেই হবে, তার মানে যা খুশি করতে হবে? যেরকম সেরকমভাবে?'

সামান্য থমকে গিয়ে সোমনাথ বলল, 'তুমি কি নীতির কথা বলছ? ভ্যালুজ্?'

'অত বড়ো কথা আমি জানি না। তবে একটা জায়গায় তো থামতে হয়। নাকি? মানুষকে আবহাওয়ার খবর জানাবে, তার জন্য...ছি ছি। ইউ শুড চেঞ্জ দিস।'

boierpathshala.blogspot.com

অন্য সময়ে হলে প্রেমিকার মুখে 'ছি ছি' শুনে থমকে যেত। সোমনাথ এখন খুশি হল। পৃথার খারাপ লেগেছে মানে চ্যানেল খুশি হবে। মনের ভাব গোপন রেখে বলল, 'আমি কী করব? জিনিসটা তো বেচতে হবে।'

'শুধু কি জিনিস বেচছ? নিজেকে বেচছ না? এভাবে চারপাশে সবকিছু চলতে থাকলে একটা সময় দেখবে, আর কিছু নেই, মানসম্মান, বোধবুদ্ধি সব বিক্রি করে ফকির হয়ে বসে আছ। ইউ হ্যাভ নাথিং টু সেল মোর। তখন কী করবে?'

সোমনাথ বিড়বিড় করে বলল, 'সমাজটাই তো এরকম হয়ে গেছে। কেনা-বেচার সমাজ।'

হাত বাড়িয়ে একটা ট্যাক্সি থামিয়ে এগিয়ে গেল পৃথা। মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'এই দোহাই দিয়ে বাঁচা যাবে মনে করছ?'

পৃথার এই জোর সোমনাথের ভালো লাগে। ভালো লাগে বলেই মেয়েটাকে তার এত পছন্দ। সোমনাথ সুন্দর করে হাসল। বলল, 'বাঁচা যাবে না তো, সেই কারণেই তো তোমাকে নিয়ে মরতে পাহাড়ের কাছে চলে যাব।'

ট্যাক্সির দরজা খুলতে খুলতে পৃথা মুখ ফিরিয়ে হাসল।

'উইশ ইওর বেস্ট লাক ফর ওয়েদার। বাই।'

হাঁটতে হাঁটতে পার্কস্ট্রিটের কাছাকাছি চলে এলো সোমনাথ। মোমকে যে করেই হোক ধরতে হবে। বাড়ি চলে গেলে কেমন হয়? মনে হচ্ছে কনসেপ্টটা শুনলে কাজটা নিতে রাজি হয়ে যাবে। পুরোনো ঝামেলা না হয় টাকা-পয়সা দিয়ে ম্যানেজ করা যাবে। ভয় একটাই, মোম চ্যাটার্জির মা। ইন্ডাস্ট্রিতে মহিলার বদনাম মারাত্মক। ন্যাগিং ধরনের একজন মহিলা। শুধু তাই নয়, আরও নাকি ব্যাপার আছে। সে-ব্যাপার অবশ্য সোমনাথ বিশদ জানা নেই। তাকে আর্টিস্ট নিয়ে কারবার খুব বেশি করতে হয়নি। সে ভেতরের কর্মী। দুর, আর ভালো লাগছে না। ইচ্ছে করছে, সব ছেড়েছুড়ে সত্যি সত্যি কিছুদিনের জন্য কলকাতা ছেড়ে পালাই। কিন্তু কাজও যে একধরনের অভ্যেস হয়ে গেছে। হাত-পা গুটিয়ে বেশিদিন ঘরে বসে থাকাটা কঠিন। যতই কঠিন হোক, এই হ্যাপা সে নেবে না। মল্লিক টিভি প্রোডাকশন তাকে কাজের সুযোগ দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার মানে এই নয়, একেবারে সবার পা ধরে বেড়াতে হবে।

নানারকম ভাবতে ভাবতে বাসস্টপে এসে দাঁড়াল সোমনাথ। সিগারেট ধরিয়ে পরপর দুটো বাস ছেড়ে দিল। এখনই একবার অফিসে গেলে কেমন হয়? মোটে আটটা। এখনও কমল মল্লিককে অফিসে গেলে পাওয়া যাবে। গিয়ে বলে

আসা যায়—'স্যার, এই রইল আপনার নতুন প্রজেক্টের স্ক্রিপ্ট, এবার আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আর পারছি না। আপনি তো জানেন, মোমকে ধরবার চেষ্টা আমি করেছি, বাট শি ডিড নট এগ্রি। এবার আপনি বুঝুন।'

ভাবতে ভাবতেই হাতের সিগারেটটা ফেলে দিল সোমনাথ, আর তখনই পকেটের মোবাইল বেজে ওঠে।

সুইচ টিপে কানে দিতেই ওপাশ থেকে মোমের গলা ভেসে এলো।

চমকে উঠল সোমনাথ। পৃথা এই কথাটাই বলেছিল না? ওই মেয়েই তোমাকে ফোন করবে! আশ্চর্য!

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

ঊনত্রিশ

এই ফ্ল্যাটে বহুদিন পরে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড শুরু হয়েছে।

হুলুস্থুল কাণ্ড চলছে বিভিন্ন পর্যায়ে। খানিক আগে সাতদিনের বাসি কাপ ডিশ, জামাকাপড় ধোয়াপর্ব শেষ হয়েছে। এখন চলছে ঝুলঝাড়াপর্ব। এই পর্ব শেষ হলে বিছানা, বালিশ, ডিভান, সোফা কুশনের চাদর, ওয়াড় পালটানোর কাজ শুরু হবে। শেষে ফিনাইল সহযোগে ঘর মোছার মধ্যে দিয়ে কর্মকাণ্ড শেষ হওয়ার কথা।

ড্রইংরুমে শিবুর মা টুলের ওপর ঊর্ধ্বমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই অল্প অল্প নড়ছে। অল্প অল্প নড়বার কারণ তার হাতে লম্বা ঝুলঝাড়ু। সংসারে বেশিরভাগ জিনিসই ব্যবহারে নষ্ট হয়। খুব অল্প কয়েকটি জিনিস আছে যাদের ক্ষেত্রে নিয়ম উলটো। তারা কর্মক্ষমতা হারায় অ-ব্যবহারে। সেই সংক্ষিপ্ত তালিকায় যারা রয়েছে তাদের মধ্যে মানুষ এবং ঝাড়ু জাতীয় জিনিস উল্লেখযোগ্য। এদের ঠিকমতো কাজে না লাগালে আলস্যজনিত কারণে এরা অকেজো হয়ে পড়ে। গরিব দেশে মানুষ নিয়ে বেশি মাথা ঘামালে চলে না, ঝাড়ু নিয়ে ঘামাতে হয়। তবে এ বাড়ির ঝুলঝাড়ুর ক্ষেত্রে ঘটনা ঘটেছে অন্যরকম। মাসের পর মাস দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকায় তার অবস্থা যথেষ্ট কাহিল। ঝাঁকড়া মাথা একপাশে কাত হয়ে গিয়েছে। এ ধরনের ঝুলঝাড়ু ম্যানেজ করা জটিল। ডান দিকের ঝুল পরিষ্কার করতে গেলে এরা কাজ করে বাঁদিকে। ফলে ঝাড়ু চালাতে হবে উলটোদিকে। শিবুর মা এই কাজ দক্ষতার সঙ্গে করছে। বোঝাই যাচ্ছে সে একজন দক্ষ ঝাড়ু ম্যানেজার। তার মুখ হাসিহাসি। কোমরে শাড়ির আঁচল গুঁজে মুখ তুলে তার ম্যানেজারির দিকে কড়া নজর রাখছে

boierpathshala.blogspot.com

কথাকলি। শুধু ঝুল ঝাড়া নয়, এই গোটা কর্মকাণ্ডেরই সে আজ পরিচালক। তার চোখমুখের অবস্থা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, খুবই বিরক্ত। শিবুর মায়ের হাসিহাসি মুখ দেখে সেই বিরক্তি বাড়ল। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে চাপা গলায় সে ধমক লাগায়।

'হাসছ কেন শিবুর মা? ঝুল পরিষ্কারের মধ্যে তুমি হাসির কী পাচ্ছ?'

শিবুর মা 'ফিচ' ধরনের হেসে বলল, 'কিছু পাই না বউদি, এমনি হাসি।'

'এমনি হাসি বন্ধ করো। ঘরদোরের যে হাল তুমি করে রেখেছ তাতে তোমার হাসা উচিত নয়, লজ্জা পাওয়া উচিত।'

শিবুর মা আবার হাসে এবং বলে, 'আমি কী করব? দাদাবাবুই তো ঘরদোর সাফ করতে দেন না। যখনই করতে যাই, বলেন পরে কোরো শিবুর মা।'

কথাকলি দাঁত কিড়মিড় করে বলে, 'মাইনে নেওয়ার সময় কথাটা মনে থাকে কি? নাকি সেটাও পরে নাও?'

মাকড়সাসহ মাঝারি সাইজের একটা জালব্যাগ এনে বলে, 'মাইনে নিতে খুবই লজ্জা করে বউদি। বেশিরভাগ দিনই ঘর ঝাঁট দিই না, বাসি কাপড় ফেলে রাখি, এঁটো চায়ের কাপ ধোয়া হল কি হল না ঠিক নেই। আপনি বলেন, এরপর মাইনে নিতে লজ্জা করবে না?'

কথাকলি বাধা দিয়ে বলল, 'চুপ করো। একদম চুপ করো। ছি ছি, তোমার নিজের একটা দায়িত্ব বলে কিছু থাকবে না! দাদাবাবু কাজ করতে দেন না বলে তুমি কাজ করবে না! তুমি এখানে কী করতে আছ? টিভি দেখতে না ঘরের কাজ করতে?'

কাজের লোকেরা আজকাল ধমক দিতে অভ্যস্ত, ধমক খেতে নয়। বকাবকি শুনলে তাদের মাথায় রক্ত ওঠে। কাপড়ের কোঁচে রেজিগনেশন লেটার নিয়েই ঘুরছে। যখন-তখন বের করে দেবে। কোনো এক রহস্যময় কারণে, শিবুর মায়ের আজ কথাকলির বকুনি খুবই ভালো লাগছে। সে আবার ফিক করে হাসল।

'বউদি, দাদাবাবু আর একটা ভয়ংকর কাজও করেন।'

'আরও ভয়ংকর! ভয়ংকর তো সবই করে রেখেছেন দেখছি। আর কী আছে?'

'তিনদিন হয়ে গেল বিছানার মশারি খোলেন না।'

'মানে!'

শিবুর মা মুখ নামিয়ে চোখ বড়ো করে বলল, 'তাহলে আর বলছি কী?

boierpathshala.blogspot.com

তোমাদের শোওয়ার ঘরে আজকাল বাসি বিছানা তোলাই হয় না।'

'তোমাদের শোওয়ার ঘর' শুনে একটু থমকাল কথাকলি। ব্রতীনের সঙ্গে একঘরে সে কতদিন আগে শুয়েছে? দ্রুত মনে করার চেষ্টা করল। এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার আগের বেশ কিছুদিন ব্রতীন বাইরের ডিভানে এসে শুত। মুখে কিছু বলত না, বালিশ, গায়ের চাদর নিয়ে উঠে আসত। শিবুর মায়ের অবশ্য এটা জানার কথা নয়।

'তুমি কিছু বলো না শিবুর মা! জোর করো না?'

'করি বউদি, খুবই জোর করি। একবার তো কাজ ছেড়ে চলেই গেলাম। দাদাবাবুকে বললুম, আমার টাকা-পয়সা বুঝিয়ে দেন, আমি আর আসব না। এ কেমন কথা, বাড়িতে যদি বাসি বিছানাও না তোলা হয়, তাহলে ঝি চাকর রেখে লাভ কী? আপনি বলেন, কোনো লাভ আছে?'

'তারপর?'

শিবুর মা হেসে বলল, 'তারপর আবার কী? একলা মানুষ ফেলে রেখে যাই কী করে বলেন? যেটুকু হয় আমি না এলে তা-ও তো বন্ধ হয়ে যাবে। পরদিন সকালে আবার এলুম। চা-টা করে দিলুম।'

কথাকলি বিড়বিড় করে বলল, 'উফ হরিবল।'

ঝুল ঝাড়া শেষ করে টুল থেকে নেমে পড়ল শিবুর মা। আঁচল দিয়ে কপাল, গলার ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'আমি একটা কথা বলব বউদি?'

'না, কোনো কথা বলবে না। এবার বালতি করে জল আর ঘর মোছার ন্যাতা নিয়ে আসবে। থাক, ন্যাতা আনতে হবে না। আমি আলমারি থেকে ছেঁড়া কাপড় বের করে দিচ্ছি। তুমি শোওয়ার ঘর দিয়ে শুরু করো।'

দশদিন না-মোছা কোনো ঘর মুছতে হলে পরিশ্রম দশগুণ হওয়ার কথা। শিবুর মা-র কিন্তু সেরকম কিছুই হচ্ছে না! বরং মনে হচ্ছে, বউদি থাকলে আরও দীর্ঘক্ষণ সে কাজ করে যাবে। কতদিন পরে মেয়েটা বাড়িতে এল! শুধু এসেছে না, আগের মতো ঘর সংসার গোছগাছ করছে। মনে হচ্ছে না, মানুষটা এই ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে। মনে হচ্ছে, বাইরে কোথাও বেড়াতে গিয়েছিল। পুরী বা হরিদ্বার। সকালে ট্রেন থেকে নামল। শুধু আসাটাই বড়ো কথা নয়, শিবুর মায়ের কেন জানি মনে হচ্ছে কথাকলির আসা শুরু হল। এরপর ঘন ঘন আসবে। মেয়ে মানুষের এরকমই হয়, একবার আসা শুরু হলে চলতেই থাকে। ব্যাটাছেলেদের এই সমস্যা নেই। তারা এসে আবার ফুড়ুৎ করে উড়ে যেতে পারে।

boierpathshala.blogspot.com

শিবুর মা যা কখনও করে না, আজ তাই করছে। সে নীচু হয়ে, হাত ঢুকিয়ে কাঠের তলা, ওয়ার্ডরোবের পিছন, ঘরের কোণা পর্যন্ত মুছছে। শারীরিক এতটা পরিশ্রমে সে অভ্যস্ত নয়। কোনো বাড়িতে কাজ নেওয়ার আগে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, 'বেশি ওপর-নীচের কাজ কিন্তু পারব না। কোমরে সমস্যা আছে। বলেন তো ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখিয়ে দেব।'

ব্রতীনের টেবিলের বই খাতা গোছাতে গোছাতে নিজের মনেই খানিকটা হাসল কথাকলি। আজ সকালেও কি সে ভেবেছিল, সে এ-বাড়িতে আসবে এবং ব্রতীনের ঘরদোর গোছাবে? একেবারেই ভাবেনি। সত্যি জীবনটা আশ্চর্যের। একটু আশ্চর্যের নয়, খুব বেশি রকমের আশ্চর্যের।

সকালে অফিসের সামনে মিনিবাস থেকে নেমে তার হঠাৎই মনে হয়েছিল, ব্রতীনকে একটা ফোন করি। মনে মনে কথাও ঠিক করে রেখেছিল।

'বাবা, তোমাকে খুঁজছে। পারলে একবার যোগাযোগ করো।'

ব্রতীন নিশ্চয় অবাক হবে এবং বলবে, 'কী ব্যাপার কথা?'

এইসময় খানিকটা নির্লিপ্ত গলায় বলতে হবে, 'আমি জানি না।' বলেই ফোন কেটে দিতে হবে।

ব্যাগ থেকে মোবাইল বের করে নম্বর টিপেছিল কথাকলি। খ্যানখ্যানে মেয়ের গলায় মোবাইল একনাগাড়ে বলে যেতে লাগল তার বাংলা—এই নম্বরের কোনো অস্তিত্বই নেই। ব্রতীন কি মোবাইল ছেড়ে দিয়েছে? নাকি নম্বর বদলেছে? কী হবে তা হলে? কী আর হবে। ভালোই হয়েছে। বাবা যদি আবার প্রসঙ্গটা তোলে, বলে দিলেই চলবে সে ব্রতীনের নম্বর জানে না। দীর্ঘদিন সেপারেশনে থাকার পর কোনো স্ত্রী তার স্বামীর ফোন নম্বর নাও জানতে পারে। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, বাবাও নিশ্চয় বিশ্বাস করবে। তবে বাবা ব্রতীনের প্রসঙ্গ আর না তুলতেও পারে। সেই সম্ভাবনাই বেশি। এরপর নিশ্চিন্ত মনে অফিসে ঢুকেছিল কথাকলি। কিন্তু নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারেনি। ভেতরে একটা খচখচানি রয়ে গেল। আরও কয়েকবার সে ব্রতীনের নম্বর ডায়াল করল। জানে পাওয়া যাবে না, তবু করল। একটা সময় তার মনে হয়, সে নিজেই চলে যাবে। আজই যাবে। ব্রতীন যদি হুট করে তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হতে পারে তাহলে সে পারবে না কেন? সে তো ব্রতীনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে না, যাচ্ছে সুদর্শন রায়ের একটা 'মেসেজ' পৌঁছে দিতে। নিজেকে বোঝায় কথাকলি। মনে মনে যুক্তি সাজায় আবার দ্রুত মনের ভেতরে যুক্তি ভাঙে। মনের মজা হল, তার মালিক তাকে কোনো প্রশ্ন করলে সে ভেঙেগড়ে নানারকম উত্তর জোগাতে

boierpathshala.blogspot.com

পারে। কথাকলি ভাবে, বিষয়টা এমন কিছু জরুরি নয় যে তাকে একেবারে বাড়ি পর্যন্ত চলে যেতে হবে। ব্রতীন ছাড়া অন্য কেউ বাবাকে বই জোগাড় করে দিতে পারবে না এমন নয়। বাবা নিজেও পারবে। বাবা সেটা জানেও। তাহলে বলল কেন? সে কি মেয়েকে পরীক্ষা করে দেখতে চাইল? হতে পারে। সুদর্শন রায় শুধু তার বাবা নয়, একজন মনোবিদ্‌ও। মনোবিদ্‌রা নানাভাবে মানুষের মন পরীক্ষা করতে চেষ্টা করে। হয়তো বইয়ের কথা বলে, দেখতে চাইছে ব্রতীনের প্রতি তার মেয়ে এখনও সমান উদাসীন কিনা। ঘটনা যদি স্বাভাবিকভাবে নেয় তাহলে বুঝতে হবে, তার মন একইরকম আছে। আর যদি প্রতিক্রিয়া বেশি হয় তাহলে বুঝতে হবে নতুন করে কোথাও গোলমাল শুরু হয়েছে। একইরকম উদাসীন থাকতে গেলে কী করা দরকার? গোটা বিষয়টা ভুলে যাওয়ার ভান? নাকি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ব্রতীনকে খবর দিয়ে বাবার মুখোমুখি করে দেওয়া। যেন কিছুই ঘটেনি। ব্রতীনের আবার আসা যাওয়া তার মনে কোনো রেখা ফেলেনি। একটা সময় কথাকলির মনে হল, সে ছেলেমানুষি করছে। তুচ্ছ একটা বিষয় নিয়ে এত ভাবনার কোনো অর্থ নেই। বিষয়টা কি সত্যি তুচ্ছ? মন এর কোনো উত্তর দিল না।

'ছেলেমানুষি' চিন্তা ঝেড়ে ফেলে কথাকলি কাজে মন দিল এবং একসময়ে বুঝতে পারল, মন বসছে না।

লাঞ্চে ছুটি নিয়ে কথাকলি যখন বেরিয়ে আসছে রিসেপশনে নন্দিনী তখন ব্যস্ত। গেম শোয়ের জন্য যারা দর্শক হিসেবে অডিশন দিয়েছিল তাদের রেজাল্ট বেরিয়েছে। কথাকলিকে দেখে বলল, 'কোথায় চললি?'

কথাকলি সামান্য হেসে বলল, ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে তা অ-কাজে।'

নন্দিনী এ-কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'সে তুই অ-কাজে যা আর যা খুশি কর কথাকলি, আমার জন্য একটা কাজ করে দে প্লিজ।'

'কী কাজ?'

'আমার ছেলের একটা টিউটর ঠিক করে দে সোনা।'

'ওইটুকু ছেলের টিউটর! সবে তো ক্লাস থ্রি।'

'ওমা ওইটুকু কী রে! তুই ওদের সিলেবাস জানিস? ক্লাস ফোরেই শুনেছি, অ্যালজেব্রা ঢুকবে। ইংরেজি লিটারেচার শুনলে ভিরমি খাবি। ওথেলো, ডেসডিমনা সব আছে।'

কথাকলি অবাক হয়ে বলল, 'ক্লাস থ্রিতে ওথেলো! আর ইউ জোকিং

boierpathshala.blogspot.com

নন্দিনী?'

'আরে বাবা ছোটদের ওথেলো। ছোটদের রামায়ণ, মহাভারত হয়, ছোটোদের ওথেলো হতে আপত্তি কোথায়? তুই তো আর কাচ্চাবাচ্চার ঝামেলায় পড়লি না কলি। খুব বাঁচান বেঁচে গিয়েছিস। যা যে চুলোয় যাচ্ছিস যা। তোদের ঝাড়া হাত পা দেখলে হিংসে হয়।'

কথাকলি হেসে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল। সন্তান নিয়ে ব্রতীনের সঙ্গে তার কখনও কথা হয়নি এমন নয়, হয়েছে। তবে প্রতিবারই ব্রতীন এড়িয়ে গিয়েছে।

'আর দেরি করা কিন্তু ঠিক নয়। ছেলেপিলে যত আগে হয় তত সুবিধে।'

'কী যে বলো না কথা, নিজেরাই সুবিধে করে উঠতে পারছি না, এখনই সন্তান?'

'তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে না, তুমি কখনও তেমন সুবিধে করে উঠতে পারবে।' মুখ ঘুরিয়ে বলেছিল কথাকলি।

বউকে একহাতে জড়িয়ে ধরে ব্রতীন হেসে বলেছিল, 'স্বার্থপরের মতো আর একটু একা একা ভালোবাসতে দাও। সন্তান তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।'

'এসব পুরুষমানুষের এড়িয়ে যাওয়ার কথা। যতদিন দায়দায়িত্ব না নিয়ে থাকা যায়।'

কথাকলিকে জোর করে নিজের বুকের ওপর টেনে ব্রতীন বলেছিল, 'আর ক-টা দিন কথা, প্লিজ আর ক-টা দিন...'

বলতে বলতে সে মুখের ওপর মুখ নামিয়ে আনে।

ফ্ল্যাটের সামনে থমকে দাঁড়াল কথাকলি। এতক্ষণ পরে কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। এখানে এল কেন? শুধু কি সুদর্শন রায়ের 'বার্তা' পৌঁছে দিতে? এ-কথা ব্রতীন বিশ্বাস করবে? করবে না। তার নিজেরও তো কেমন সন্দেহ হচ্ছে নিজের ওপর। বোকার মতো ঝোঁকের মাথায় কাজটা করে ফেলল মনে হচ্ছে। এখন কী করবে সে? ভেতরে ঢুকবে নাকি 'এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম' ভেবে ফিরে যাবে? সেটাই বুদ্ধির হবে। দুপুরের দিকে লোকজন কম। আশপাশের বাড়ি থেকে কেউ নিশ্চয় তাকে লক্ষ করছে না। এখানকার লোকজন কতটুকু-বা জানে? কোনোদিনই ব্রতীনের সঙ্গে তার গলা ফাটিয়ে ঝগড়া হয়নি। পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারাই কিছু বুঝতে পারেনি, তো বাকিরা। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন হয় নিঃশব্দে, কিন্তু বিচ্ছেদের সময়ে অনেক শোরগোল ওঠে। এটাই হয়তো সম্পর্কের নিয়ম। তাদের বেলায় সেরকম হয়নি। কথাকলি এই

boierpathshala.blogspot.com

বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল কোনোরকম সাড়া না ফেলেই। গলির মুখে দাঁড়ানো ট্যাক্সিতে ব্রতীন যে-ভঙ্গিতে তার ব্যাগগুলো তুলে দিয়েছিল, তাতে যে কেউ মনে করবে, মেয়েটা ক'দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে, সময় মতো ফিরে আসবে। কারও যদি কিছু সন্দেহ হয়ে তাকে, তা হয়েছে পরে।

দীর্ঘদিন তাকে ফিরে আসতে না দেখে। ব্রতীনকে কি কেউ জিজ্ঞেস করেছে?

ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াতে মুহূর্তের জন্য গা শিরশির করে উঠল কথাকলির। কতদিন পরে সে এ-বাড়িতে এল? মনে মনে হিসেব করতে গিয়েও থমকে গেল। কী হবে হিসেব করে? জীবনের সব হিসেব প্রয়োজন লাগে না। ভেতরে টিভি চলছে না? তাই হবে। হিন্দি গান ভেসে আসছে। এই শেষ দুপুরে ব্রতীন বাড়ি বসে হিন্দি গান শুনছে! সে যখন দরজা খুলবে কী বলবে? সে কি সত্যি কথাটা বলতে পারবে? বলতে পারবে, 'তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল ব্রতীন'? ছি ছি। কাজটা শুধু ঝোঁকের মাথায় করা হল না, খুব লজ্জারও হল।

কলিংবেলে হাত দিতে গিয়েও দেওয়া গেল না। সেখানে সেলোটেপ লাগানো। নিশ্চয় খারাপ হয়ে আছে। ব্রতীনের এই একটা বিচ্ছিরি অভ্যেস, খারাপ হয়ে গেলে চট করে যে-জিনিস সারিয়ে ফেলা যায় সেই কাজ সে ফেলে রাখে।

কলিংবেলের আশা ছেড়ে দরজায় ধাক্কা দিল কথাকলি। নার্ভাস লাগছে। ব্রতীনের মুখোমখি হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে অসুবিধে হচ্ছে।

তিনবার ধাক্কার মাথায় দরজা খুলল শিবুর মা। শিবুর মা এ-বাড়ির ঠিকে কাজের লোক। বিয়ের পর পরই কথাকলি এই মহিলাকে নিয়োগ করে। বাড়াবাড়ি ধরনের ফাঁকিবাজ এই মহিলার একমাত্র গুণ হল বিশ্বাসযোগ্যতা। কতবার যে এক হাতে বাড়ি ছেড়ে রেখে দুজনে বেরিয়ে গিয়েছে। আরও একটা মজার কথা হল, এই মহিলার শিবু নামে কোনো ছেলে নেই, তবু কোনো অজ্ঞাত কারণে তাকে সবাই এই নামেই চেনে এবং ডাকে। শিবুর মা এখনও এখানে আছে!

একই সঙ্গে খুশি এবং বিস্মিত হল কথাকলি।

শিবুর মা দরজা খুলেছিল গভীর বিরক্তি নিয়ে। টিভি ছেড়ে উঠে আসার বিরক্তি। কথাকলিকে দেখে নিমেষে সে-ভাব উধাও হল। বড়ো করে হেসে চিৎকার করে উঠল, 'বউদি! তুমি!'

boierpathshala.blogspot.com

কথাকলি হেসে বলল, 'কেন। আমি আসতে পারি না? তোর দাদাবাবু কোথায়?'

'সে তো সকালেই বেরিয়ে গিয়েছে। তুমি আগে এসো দেখি।'

স্বস্তির নিশ্বাস চাপল কথাকলি। যাক, একটা সমস্যা থেকে ছাড় পাওয়া গেল। ব্রতীন ফিরে আসার আগেই চলে যাওয়া যাবে। এখান থেকেই ফিরে গেলে কেমন হয়?

শিবুর মা হাত বাড়িয়ে কথাকলিকে ধরে ঘরে টেনে নিল। ভাবটা এমন ছিল যেন চেপে না ধরলে পালিয়ে যাবে।

ঘরে পা দিতেই দমকা বাতাসের মতো পুরোনো, চেনা গন্ধ পেল কথাকলি। চা, সিগারেট, পুরুষমানুষের ঘামের গন্ধ। তুলে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল কথাকলি। ইস কী অবস্থা! ডিভানের চাদরটা এলোমেলো হয়ে আছে। কে জানে বোধহয় মাসখানেক বদলানোই হয়নি। কোণার টেবিলটা থেকে বইখাতা উপচে পড়েছে। বেতের চেয়ার দুটো ছিটকে আছে দু-দিকে। মেঝেতে ছাই। কাচের ছোট্ট টেবিলটায় চায়ের কাপ পড়ে। কথাকলি ঝুঁকে দেখল, কাপের তলায় পড়ে থাকা চায়ের রং ঘন কালো। নিশ্চয় অনেকদিনের ব্যাপার। চটি খুলতেই পায়ের তলাটা ধুলোয় কিচকিচ করে উঠল। উঁকি মেরে দেখল, বেডরুমের অবস্থা আরও মারাত্মক! বিছানার ওপর এখনও মশারি ঝুলছে! মশারির ভেতরেই সিগারেটের টুকরো ভর্তি অ্যাশট্রে। মেঝেতে বই ছড়ানো। বাথরুমে ঢুকে আঁতকে উঠল কথাকলি। বালতি ভর্তি বাসি কাপড়। ভিজে তোয়ালেটাও বারান্দায় শুকোতে দেওয়া হয়নি। রান্নাঘর পরীক্ষা করতে গিয়ে পিছিয়ে এল কথাকলি। আরও কী ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে হবে কে জানে?

শিবুর মা শুধু কথাকলির পিছন পিছন ঘুরল না, মহা উৎসাহে বকর বকর করে যেতে লাগল।

'এ আর কী দেখছ বউদি? শোওয়ার ঘরে গিয়ে একবার দ্যাখো না। বাথরুমে গেলে তো ছুটে পালাবে। রান্নাঘরটা তাও খানিকটা ভালো। সবথেকে ভালো হত যদি খাটের তলাটা তোমাকে দেখাতে পারতাম। ধুলো দেখলে মনে হবে, ছোটোখাটো একটা পাহাড় হয়ে যাবে।'

খানিকটা সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কথাকলি। এ কী অবস্থা!

'এসবের মানে কী শিবুর মা? ফ্ল্যাটের হাল এরকম কেন?

শিবুর মা মাথা চুলকে বলল, 'টিভিতে বইটা শেষ হলেই...।'

কথাকলি চোখ পাকিয়ে বলল, 'এ তো অনেকদিনের ধুলো ময়লা!'

boierpathshala.blogspot.com

শিবুর মা তার পরিচিত ফাঁকিবাজির হাসি হেসে বলল, 'ওসব বাদ দাও দেখি। সব ঠিক করে দেব, তার আগে বলো কেমন আছ? কতদিন দেখিনি।'

কথাকলি শাড়ির আঁচল কোমরে গুঁজতে গুঁজতে বলল, 'খুব ভালো ছিলাম, কিন্তু এখানে ঢুকে খুব খারাপ হয়ে গিয়েছি। এটা ফ্ল্যাট না নরককুণ্ড? ক'দিন পরে সাফ করতে তো কর্পোরেশন থেকে লোক ডাকতে হবে।'

'মনে হচ্ছে বউদি, তবে ওরা কি আসবে? কর্পোরেশনের লোক চট করে ডাকলে আসে না। ফ্যাচাং করে।'

'উফ শিবুর মা, তোমার বকবকানি থামাবে? হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে, ঝাঁটা, বালতি নিয়ে এসো। ধুলো ঝাড়ার কাপড়গুলো কোথায়?'

শিবুর মা হেসে ফেলল।

কথাকলি অবাক হয়ে বলল, 'তুমি হাসছ! হাসছ কেন?'

শিবুর মা উত্তর দিল না। মহানন্দে ঝাঁটা, বালতি, কাপড় আনতে ছুটল। সে যেন মুখে নয়, ব্যবহারে হাসির কারণ বুঝিয়ে দিতে চায়।

পাক্কা দু-ঘণ্টায় অনেকটা সামলে নিয়ে কথাকলি যখন শিবুর মায়ের করে দেওয়া চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বেতের চেয়ারে বসল তখন বাইরে রোদ অনেকটাই মরে এসেছে।

'এবার আমি চলে যাব।'

শিবুর মা মেজেতে বসে কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, 'সে কী, দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা করে যাবে না?'

কথাকলি হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল।

'না, আমার সময় নেই।'

শিবুর মা কথাটা সহজভাবে নিল।

'তা ঠিক, দাদাবাবুর তো ফেরার কোনো ঠিক নেই। আমিও নীচের দোকানে চাবি রেখে পালাব।'

কথাকলি গরম চায়ে দ্রুত চুমুক দিল। তার মধ্যে সামান্য একটু অস্থির ভাব।

'শোনো, শিবুর মা, ব্রতীন এলে তাকে বলবে, আমার বাবা তার খোঁজ করছে। সেই কথাটা বলতেই আমি এসেছিলাম। মনে থাকবে।'

শিবুর মা বড়ো করে ঘাড় নেড়ে বলল, 'কবে যেতে বলব? কাল?'

কাপের চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল কথাকলি।

'না, অত তাড়াহুড়োর কিছু নেই।'

boierpathshala.blogspot.com

'শিবুর মা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি আবার কবে আসবে?'

কথাকলি মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আবার আসব কেন?'

শিবুর মা একগাল হেসে বলল, 'বাঃ ঘর ঝাড়পোঁছ করতে হবে না?'

কথাটা শেষ হতে না হতেই দরজায় টোকা। পরপর তিনবার। শিবুর মা চমকে উঠে বলল, 'এই রে দাদাবাবু চলে এসেছেন।'

কথাকলি যেন খানিকটা কেঁপে উঠল।

শিবুর মা দরজা খোলার সময় কথাকলি ভেবেছিল, তাকে দেখে ব্রতীন চমকে যাবে।

ব্রতীন ঘরে পা রেখে খুব সহজভাবে বলল, 'কখন এলে?'

কথাকলি দ্রুত হাতে অবিন্যস্ত চুল ঠিক করতে করতে বলল, 'অনেকক্ষণ। এবার উঠব।'

দেখা হওয়ার মুহূর্তে 'এবার উঠব' বলে কথাকলি যেন নিজের মনকে সামলাতে চাইল। ব্রতীন সেই কথায় গুরুত্ব না দিয়ে এগিয়ে এসে দরজার পাশে জুতো খুলল। তারপর নিজের টেবিলের সামনে এসে থমকাল একটু। এলোমেলো বই, কাগজপত্র গোছানো। ঠোঁটের কোণে সামান্য হেসে কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে রাখল ব্রতীন। অনেকদিন পর এই টেবিল পরিষ্কার হয়েছে। ধুলো ঝাড়া, টেবিলক্লথ বদলানো, খানিকটা বই দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো। কয়েকটা সাজানো থাক করে। এলোমেলো কাগজ গুছিয়ে রাখা হয়েছে একপাশে। অনেকগুলোর মধ্যে দুটো মাত্র পেন পড়ে আছে। বোঝাই যায় বাকিগুলোর কালি-ফুরোনো শোচনীয়-অবস্থা দেখে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিয়ের প্রথম প্রথম টেবিল গোছানো নিয়ে দুজনের ঠান্ডা লড়াই হত।

ব্রতীন বলত, 'ঘরদোর গোছগাছের সময় টেবিলটাকে বাদ দিলে হয় না কথা?'

'কেন? তোমার টেবিল কি ঘরদোরের বাইরে?' কথাকলি ভুরু তুলে বলত।

ব্রতীন খানিকটা আমতা আমতা করে বলত, 'না, তা ঠিক নয়, আসলে প্যাটার্নটা আলাদা।'

'প্যাটার্ন আলাদা মানে!'

'একঘরে থাকলে কী হবে, লেখাপড়ার টেবিল আর বেডরুমের খাট এক জিনিস নয়।'

boierpathshala.blogspot.com

বিরক্ত গলায় কথাকলি বলত, 'কী বলছ ছাইভস্ম?'

'আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। দুটো মানুষ এক ঘরে থাকলে কি তাদের প্যাটার্ন একরকম হয়ে যায়? তারা নিজের নিজের মতোই থাকে। ফার্নিচারও তেমন। বিছানা গোছালে তার মধ্যে প্রাণ আসে, ঝলমল করে, লেখাপড়ার টেবিলের বেলায় কিন্তু তা হয় না।'

কথাকলি ভুরু আরও গভীরভাবে কুঁচকে বলে, 'কী হয়? টেবিল অক্কা পায়?'

ব্রতীন মলিনভাবে হাসতে চেষ্টা করে। বলে, 'না তা নয়, তবে কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে মনে হয়। মনমরা হয়ে যায়। এই ধরনের টেবিলের স্পিরিট লুকিয়ে থাকে বইখাতা খোঁজায়, জরুরি কাগজ হারিয়ে যাওয়ায়, পেন পেনসিল লুকিয়ে পড়ায়। আই থিঙ্ক দে ফিল কমফোর্ট।'

আলোচনার এই পর্যায়ে সবসময়ই কথাকলি মুখ দিয়ে 'ফুঃ' ধরনের অবজ্ঞার আওয়াজ করেছে এবং ব্রতীনকে সরিয়ে দিয়ে টেবিল গোছাতে শুরু করেছে।

আজ কিন্তু অন্যরকম মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, গোছানো টেবিল হাসছে!

কথাকলি দাঁড়ানো অবস্থাতেই নীচু গলায় বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম। তোমার মোবাইলে অনেকবার চেষ্টা করলাম।'

কথাকলি যেন এখানে চলে আসার জন্য কৈফিয়ত দিল।

ব্রতীন বলল, 'মোবাইলটা গোলমাল করছে।'

'সারিয়ে নিলেই পারো। বাড়ির কলিংবেলটাও তো খারাপ দেখলাম। শক দিচ্ছে।'

ব্রতীন জবাবের বদলে অল্প হাসল। শিবুর মা বলল, 'বউদি, চা করব? আরেক কাপ চা খান। দাদাবাবুও খান।'

'না, শিবুর মা আমি এখন বেরোব।'

শিবুর মা সে-কথা না শুনে রান্নাঘরে দিকে পা বাড়াল। ব্রতীন বলল, 'চা না খাও, একটু বসতে তো পারো। এসেছ যখন...।'

একটু অস্বস্তির সঙ্গেই বসল কথাকলি।

'বাবা তোমার খোঁজ করছেন। কী একটা বই দরকার। তুমি পারলে একবার যোগাযোগ কোরো।'

'কী বই?' কৌতূহলে তাকাল ব্রতীন।

'বলতে পারব না। পিঁপড়ে না কী বিষয়ে যেন।'

boierpathshala.blogspot.com

'পিঁপড়ে!'

চেয়ারে পাতা ছোটো লাল কুশন থেকে একটুখানি সুতো বেরিয়ে আছে। কথাকলি হাত দিয়ে সেই সুতো ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, 'তাই তো বলল।'

ব্রতীন অবাক গলায় বলল, 'সাইকিয়াট্রিস্ট মানুষ পিঁপড়ে নিয়ে কী করবেন?'

বড়ো সুতো চট করে ছেঁড়া যায়। ছোটো সুতো সমস্যা করে। কথাকলি সুতোটাকে বাগে আনতে কসরত করছে।

'মনে হয় এবার পিঁপড়েদের মাথা সারাবে।'

ব্রতীন 'হো হো' আওয়াজে হেসে উঠল। বহুদিন পর এভাবে মন খুলে হাসল ব্রতীন। কথাকলিও নিঃশব্দে হাসল।

'বয়স বাড়ছে আবার নানারকম ঝামেলা শুরু করছে। একেকটা অদ্ভুত অদ্ভুত সব পেশেন্টও জুটছে।'

'বানেরহাটে যাচ্ছেন? নাকি বন্ধ হয়েছে?'

'আটকে তো ছিলাম। এখন আবার বলছে যাবে। শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না।'

ব্রতীন চেয়ারে হেলান দিতেই খচমচ করে উঠল। কথাকলি মুখ তুলল।

'এবার এগুলো পালটাও। যে-কোনো সময় ভেঙে পড়ে যাবে।'

ব্রতীন চুপ করে রইল। কথাকলির সুতো টানাটানি চলছে। যা হোক একটা কাজ পাওয়া গেছে। ব্রতীনের দিকে তাকিয়ে তো বসে থাকতে হচ্ছে না। তাহলে অস্বস্তি বাড়ত।

'ফ্ল্যাটটার এই অবস্থা করে রেখেছ কেন?'

'কী অবস্থা?'

'এরকম নোংরা, তার পরেও বলছ কী অবস্থা? ছি ছি। শুনলাম শিবুর মাকে কিছু করতে দাও না।'

ব্রতীন হাসল। বলল, 'ওসব বাদ দাও।'

কথাকলি মুখ নামিয়ে দাঁত দিয়ে কুশনের সুতোটুকু কাটল। তারপর খানিকটা নিজের মনেই বলল, 'বাদ তো দিয়েই দিয়েছি, কিন্তু এখানে তো একটা মানুষ থাকে। তা ছাড়া লোকে দেখলে কী ভাববে?'

'লোক-টোক আজকাল আর খুব একটা আসে না। কে আসবে? আমি একাই থাকি।'

কথাকলি কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে গেল। তার কেমন যেন হচ্ছে।

boierpathshala.blogspot.com

এখানে থাকতে ভালো লাগছে না, আবার উঠে যেতেও ইচ্ছে করছে না। অদ্ভুত তো! শিবুর মা চা নিয়ে ঢুকল। বারণ করা সত্ত্বেও 'বউদি'র জন্য সে চা করেছে। কাপ হাতে নিতে নিতে কথাকলির মনে হল, মনের অদ্ভুত ব্যাপারটা এই সামান্য কাজের মহিলাটি বুঝতে পেরেছে।

শিবুর মা দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'বউদি, আমি চললুম। আরও দুই বাড়িতে ঢুঁ মারতে হবে। এক বাড়িতে রুটি করার কাজ নিয়েছি। মাইনে ভালো।'

কথাকলির ইচ্ছে করল বলে, 'একটু দাঁড়াও, চা-টা খেয়ে আমিও তোমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব।' বলল না। বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। সে শিবুর মায়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

'এবার থেকে ঘরদোরের দিকে একটু খেয়াল রাখো শিবুর মা।'

শিবুর মা ব্রতীনের দিকে ইঙ্গিত করে হেসে বলল, 'আমায় বকাবকি না করে যাকে বলার তাকে বলুন বউদি।'

দরজা টেনে শিবুর মা বেরিয়ে যাওয়ার পর ব্রতীন লাজুক হেসে বলল, 'একটা বইয়ের কথা বলতে এসে কেমন বিপদে পড়লে দেখলে তো? পরিশ্রম হল। তবে আমার ভালোই হল, সব ধুলো-টুলো ঝেড়ে একেবারে ঝকঝক করে ফেলেছ দেখছি।'

'একদিনে সব ধুলো ঝাড়া যায় না। যাক, তুমি মনে করে বাবার সঙ্গে কথা বলে নিও। নইলে ভাববে খবর দিইনি।'

'স্যার খুব বড়ো মানের একজন মানুষ কথা। উনি এ ধরনের কিছু ভাবেন না।'

'এতদিন তাই জানতাম, আজকাল দেখছি অন্যরকম। সেদিন তুমি গিয়েছিলে সে-কথাটা না বলায় বাবা বোধহয় একটু মনঃক্ষুন্ন হয়েছে।'

ব্রতীন একটু নড়ে বসল। চাপা গলায় বলল, 'আমারই অন্যায় হয়েছে। দেখা করে আসা উচিত ছিল।'

'উচিত ছিল যখন দেখা করে এলেই পারতে।'

ব্রতীন অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'সেদিন হঠাৎ যে কী হল। দুম্ করে চলে এলাম।'

'দুম করে চলে না এলেই পারতে। গোপালের মা বিষয়টা খেয়াল করে বাবাকে বলেছে। একটা সময়ের পর নাটকীয় অংশগুলো জীবন থেকে সরিয়ে রাখাই ভালো। আজ যদি আমি এখানে সেরকম কিছু করতাম?' একটু চুপ করে থেকে কথাকলি বলল, 'পারতাম না। মেয়েদের এটাই সমস্যা। ছেলেদের মতো

boierpathshala.blogspot.com

তারা সবকিছু পারে না। ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপর চলা যায় না। তোমরা সেটা জানো। জানো বলেই...।' কথার মাঝখানেই থেমে গেল কথাকলি।

ব্রতীন মাথা নামিয়ে চুপ করে রইল। যেন এইটুকু বকুনি তার প্রাপ্য ছিলই। ঘরের আলো অনেকটা কমে গেছে। একটা ছায়া ছায়া ভাব। বাইরে কি মেঘ করল? নাকি সন্ধে নামছে? এই ফ্ল্যাট খুব বেশি আলো হাওয়ার ফ্ল্যাট নয়। সেই সময় যে পয়সাকড়ি ছিল তাতে বেশি আলো হাওয়ার ফ্ল্যাট কেনা যেত না। বাইরে আলো মরার আগে এখানে অন্ধকার নামে। উঠে গিয়ে আলোটা জ্বাললে হয়। থাকুক। আলো-ছায়ায় বসে থাকা কথাকলিকে বেশ লাগছে। মনে হচ্ছে সবটা সত্যি নয়। অন্ধকার ঘরে এটাও একটা পাওনা। ভারী পরিবেশ হালকা করার জন্য ব্রতীন বলল, 'একটা মজার ব্যাপার হয়েছে কথা।'

কথাকলি চুপ করে রইল। এতক্ষণ মনে হয়নি, কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে, শুধু বাবার বই নয়, ব্রতীনকে তার নিজেরও একটা কথা বলার আছে। কে জানে হয়তো অবচেতনে সেটা ছিল বলেই আজ চলেছ এসেছে। অবচেতন এতক্ষণ এই বিষয়ে কোনো সাড়া দেয়নি, এখন বলছে। দরজায় নক করার মতো? আশ্চর্য! সত্যিই কি এরকম কিছু হয়? মনের ভেতরে কিছু আড়ালে থাকা জিনিস হঠাৎ বাইরে চলে আসে? বাবাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। মনোবিজ্ঞানীরা বলতে পারে।

কথাকলির দিক থেকে সাড়া না পেয়ে ব্রতীন বলল, 'সেদিন হঠাৎ রাস্তায় সলিলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, তবু খালি কাপটা হাতে ধরে বসে ছিল কথাকলি। কাপ নামাতে নামাতে বলল, 'সলিল! সে কে?'

প্রসঙ্গ পালটাতে পেরে ব্রতীন খুশি হল। হেসে বলল, 'সে আমার স্কুলের বন্ধু। মাঝখানে একবার দেখা হয়েছিল, তারপর ভ্যানিশ।'

'তোমার স্কুল-কলেজের তো অনেক বন্ধু দেখছি। তোমার সেই প্রাংশু কেমন আছে?'

'অনেকদিন খবরাখবর নেই। তবে শুনেছি, শিলিগুড়িতে বদলি হয়েছে। উইথ পদোন্নতি।'

'বাঃ, মানুষটা ভালো।'

'সলিলও খুব ইন্টারেস্টিং। ও হল গিয়ে তোমার কালেক্টর। নানারকম হাবিজাবি জিনিস সংগ্রহ করে। সেদিন দেখা হতে বলল, এখন নাকি ম্যাজিক সংগ্রহ করছে।'

boierpathshala.blogspot.com

'ম্যাজিক! ম্যাজিশিয়ন?'

'না ম্যাজিশিয়ন নয়, শুধু ম্যাজিকের কায়দাকানুন জমিয়ে রাখে। এখন আগুন খাওয়ার ম্যাজিক কালেক্ট করছে।'

কথাকলি একটু থেমে থেকে বলল, 'তোমার এখনও অদ্ভুত অদ্ভুত সব যোগাযোগ আছে?'

ব্রতীন একটু হাসল। আবছা আলোয় সেই হাসি দেখা যায় না।

'এই তালে আমি কয়েকটা শিখে নেব ভাবছি।'

কথাকলি আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'ভালোই হবে। কিছু একটা করা হবে। সেরকম হলে বল, আমার বস্‌কে বলে তোমার একটা টিভি শো-এর ব্যবস্থা করে দেব। ক্যামেরার সামনে বসে তুমি আগুন খাবে। আজকাল রিয়ালিটি শোয়ের খুব রমরমা।'

ব্রতীন এবার জোরে হেসে উঠল। তার চমৎকার লাগছে। কথাকলির সঙ্গে বসে কতদিন পর হাসাহাসি করছে।

'আলোটা জ্বালাব কথা?'

'না থাক, আমার এবার সত্যি দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ভ্যানিটি ব্যাগটা পাশ থেকে কোলের ওপর টেনে নিল কথাকলি।

'কথা, আমি দুঃখিত।'

কথাকলি ফিসফিস করে বলল, 'কী কারণে?'

'ওভাবে আমার চলে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। অন্তত টেলিফোন করে একটা পারমিশান নেওয়া উচিত ছিল। হুট করে কী মনে হল...পরে ক-দিন খুব লজ্জায় ছিলাম।'

'লজ্জা!' হাসল কথাকলি। সেই হাসিতে চাপা বিদ্রুপ।

কথাকলি উঠে দাঁড়িয়ে জানলার কাছে এগিয়ে গেল। হ্যাঁ, মেঘ করেছে। তবে খুব বেশি নয়। শুধু দিনের শেষ আলোটুকু থমকে দেওয়ার মতো।

'ব্রতীন, আমার তোমাকে একটা কথা বলার আছে।'

ব্রতীনের কথা শুনতে ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে করছে উঠে গিয়ে কথাকলির পাশে দাঁড়ায়। একটা সময় ছিল, যখন বর্ষার সময় জানলার পাশে দুজনে চেয়ার নিয়ে টানা বসে থেকেছে। কলকাতার আকাশে খুব যে বৃষ্টি দেখা যায় এমন নয়। ছাদের কার্নিসে ডিশ অ্যানটেনায় জলের ফোঁটা আটকে যেত। যেটুকু দেখা যেত তাতেই মুগ্ধ হত কথাকলি। বলত, 'আজ যতক্ষণ বৃষ্টি হবে ততক্ষণ এভাবে বসে থাকব।'

boierpathshala.blogspot.com

'যদি সারারাত চলে?'

'সারারাত বসে থাকব।'

'সারারাত!'

'কেন? অসুবিধে কী? সারারাত যাত্রা, থিয়েটার, উচাঙ্গসংগীতের আসর দেখা যায়, বৃষ্টি দেখতে আপত্তি কোথায়?'

ব্রতীন এক হাতে বউকে জড়িয়ে ধরে বলত, 'আমি কিন্তু থাকব না। আমার ঘুম পাবে এবং আমি উঠে গিয়ে ঘুমোতে চলে যাব।'

কথাকলি সুন্দর হেসে বলত, 'ইস, এমন একটা উৎসব হত যদি? বৃষ্টি দেখার উৎসব?'

ব্রতীন কথাকলির গালে গাল ঠেকিয়ে বলত, 'খুব ভালো হত, ঠান্ডা লেগে সাতদিন জ্বর বাধাতে।'

স্বামীর গায়ের কাছে ঘেঁষে কথাকলি বলত, 'বেরসিকের মতো কথা বোলো না।' তারপর একসময় গুনগুন করে গান ধরত— আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে, হায় হায়! বৃষ্টিসজল বিষণ্ণ নিশ্বাসে, হায়...।

খোলা-জানলা-দিয়ে-আসা ছাঁটে ভিজে যেত দুজনে। ভেসে যেত ঘর।

কথাকলির হঠাৎ মনে হল, কতদিন গান গাওয়া হয় না। মনে হয় গান ভুলে গেছে।

ব্রতীন চেয়ার ছেড়ে উঠল না। বলল, 'বলো।'

কথাকলি ঘুরে দাঁড়াল।

'তুমি কেন আমার কাছে গিয়েছিলে ব্রতীন?'

চমকে উঠল ব্রতীন।

'আমি জানি কেন গিয়েছিলে। প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। বরং সেদিন খানিকটা ভয়ই পেয়েছিলাম। পরে যখন বুঝতে পারি...।'

ব্রতীন ফিসফিস করে বলল, 'তাহলে আবার জানতে চাইছ কেন?'

'যদি ভুল বুঝে থাকি, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

ব্রতীন সামান্য হাসল। বলল, 'ক্ষতি কী? ভুল বুঝলে অসুবিধে তো কিছু নেই। দুটো মানুষ ঠিক বুঝে দূরে সরে যেতে পারে, ভুল বুঝে কাছে এল, অসুবিধে কী?'

কথাকলি অল্প সময় চুপ করে থেকে অন্যমনস্ক গলায় বলে, 'এবার আমি যাব ব্রতীন।'

ব্রতীন উঠে এসে কথাকলির মুখোমুখি দাঁড়াল। অন্ধকারে কেউ কাউকে

boierpathshala.blogspot.com

স্পষ্ট দেখতে পারছে না। অথবা হয়তো বেশিই দেখতে পাচ্ছে।

'কই বললে না তো অসুবিধে কী?'

কথাকলি অস্ফুটে বলল, 'এবার আমি সত্যি যাব।'

ব্রতীন কথাকলির কাঁধে হাত রাখতে গিয়েও হাত সরিয়ে নেয়। গাঢ় স্বরে বলে, 'না গেলেই নয় কথা?'

কথাকলি নিজেকে সামলে বলে, 'না, এরপর বৃষ্টি আসবে।'

মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে ব্রতীন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'তাহলে চল তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

গলায় জোর ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে কথাকলি।

'প্লিজ ব্রতীন, আমি একাই যেতে পারব।'

রাস্তায় বেরোনোর একটু পরেই ঝড় ওঠে। ধুলোর ঝড়। শান্ত পায়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকে কথাকলি। ইচ্ছে করলে সে একটা ট্যাক্সি ধরতে পারে, কিন্তু সে তা ধরবে না। ঝড় ওঠায় তার সুবিধে হয়েছে। ধুলো বাঁচাতে চোখে হাত চাপা দেওয়ার কারণে কেউ তার কান্না দেখতে পাবে না।

boierpathshala.blogspot.com

ত্রিশ

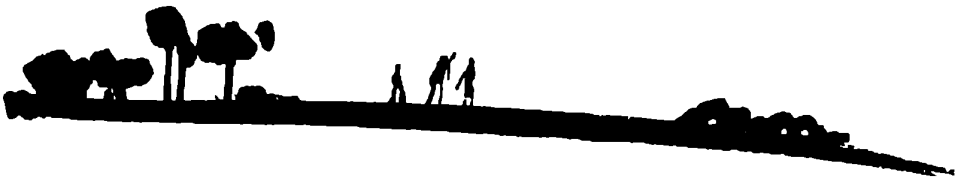

চমৎকার দুটো বেতের চেয়ারে মা আর মেয়ে পাশাপাশি বসে আছে। সোমনাথ বসেছে উলটোদিকে। নিয়ম মতো মাঝখানে একটা টেবিল ধরনের কিছু থাকার কথা। নীচু, চাপা টেবিল। কিন্তু এখানে টেবিল নেই, রয়েছে মাঝারি মাপের দুটো প্লাস্টিকের গামলা। গামলাদুটোর রং লাল এবং নীল। লাল গামলায় ঠান্ডা জল, নীল গামলার জল গরম। বেশি গরম নয়, কুসুম কুসুম গরম।

মেয়ের হাতে বই। পেপারব্যাক। সেই বই কোলের ওপর রাখার কারণে নাম দেখা যাচ্ছে না। মায়ের দুটো হাতে নিজের শাড়ি উঁচু করে ধরা। সেই শাড়ি তোলা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। না তুলে উপায় নেই। দুটো পা-ই লাল নীল গামলার জলে ডোবানো। একটি আট ন-বছরের ফুটফুটে মেয়ে মাটিতে বসে আছে। সম্ভবত বাড়ির কাজের লোক। তার হাতে মগ। সে পর্যায়ক্রমে ঠান্ডা এবং গরম জল তুলে মহিলার পায়ে ঢালছে। মহিলার বাতের ব্যথার চিকিৎসা চলছে। জল চিকিৎসা। মহিলার কালো এবং ফাটা দুটি নগ্ন পা দৃশ্য হিসেবে সোমনাথের পক্ষে মোটেই স্বস্তিকর নয়। কিন্তু উপায় কিছু নেই। কারণ এই পা যার-তার পা নয়। এই পা এই সময়ের টিভি কুইন মোম চ্যাটার্জির মায়ের পা।

মাটিতে বসা মেয়েটির চুলে একটা সস্তার লাল ব্যান্ড। সস্তার হলেও তাকে দেখাচ্ছে ভারি সুন্দর। অনেকটা মোরগের মাথার লাল ঝুঁটির মতো। দুনিয়ায় এটাই মজা। সস্তার জিনিস অনেক সময় দামি জিনিসকে হারিয়ে দেয়।

মহিলা একটু অন্যমনস্ক হলেই মেয়ে দ্রুত হাতে সেই ঝুঁটি ঠিক করছে।

মোম মুখ তুলে সোমনাথের দিকে তাকাল। আঙুল দিয়ে প্রথমে কপালের চুল সরালো, তারপর দু-কানের পাশের চুল সরালো। শেষে ঝকঝকে দাঁত বের

boierpathshala.blogspot.com

করে হাসল। সোমনাথ খেয়াল করল শরীরের বাকি সবকিছুর মতো এই মেয়ের দাঁতও মাপা।

'কী নাম বললেন যেন? খুকি?'

'খুকি নয়, খুকু। ভালো নাম সুদীপ্তা। আগরপাড়ায় থাকত। এখন বিয়ে-টিয়ে করে পাটনা চলে গেছে।'

সোমনাথ বসা অবস্থাতেই চেয়ারের সামনের দিকে খানিকটা এগিয়ে আসে। এই নাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার তুরুপের তাস। 'খুকু' নামের জোরেই সে আজকের এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট জোগাড় করেছে। ফোন করতে হয়েছিল মোট তিনবার। শেষবার নায়িকা নিজেই ফোন করে।

পথের মাঝে হঠাৎ আসা সেই ফোনে সোমনাথ যেমন বিস্মিত হয়েছিল, তেমন খুশিও।

খানিকটা কঠিন খানিকটা মধুর স্বরে ওপ্রান্তের নারীকণ্ঠ বলে, 'আপনি সোমনাথবাবু-ই তো?'

সোমনাথ নিজেকে পুরোটা সামলাতে পারে না। স্বাভাবিকের তুলনায় একটু যেন বেশি চিৎকার করে বসে।

'মোম। চিনতে পেরেছ?'

মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে মোম বলল, 'আমি এখনও পারিনি। তবে মাকে বলেছি, তিনি হয়তো পারবেন। আপনি সেদিন ফোন করার পর থেকে অস্বস্তি হচ্ছিল। এমনি কিছু নয়, আপনি ওভাবে বললেন, অথচ লোকেট করতে পারলাম না।'

'খুকুকে মনে পড়ছে না?'

রিনরিনে গলা একটু যেন হাসল।

'দ্যাট ইজ নট ইমপর্টান্ট। আপনি যদি মনে করেন মাকে একটা ফোন করে নিন। জানেন বোধহয়, আমার প্রফেশনাল কাজের ব্যাপারগুলো মা-ই দেখেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার হলে মা-ই দেবে।'

ফোন ছেড়ে দেওয়ার পর সোমনাথের মনে হল, কাজটা হয়ে গেছে। মোম প্রায় রাজি। রাজি বলেই মায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলল। আপাতত এইটুকুই যথেষ্ট। বাকিটা সামনে বসে সামলাতে হবে। মহিলা যতই সাংঘাতিক হোক তাকে ম্যানেজ করতে হবে।

সেই সাংঘাতিক মহিলা ফোন করতেই হুড়মুড়িয়ে গাদাখানেক কথা শোনালেন।

boierpathshala.blogspot.com

'দেখুন ভাই, মোমের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমরা তো আগেই বলে দিয়েছি, ওই মল্লিক টিভির সঙ্গে মেয়ে কোনো কাজ করবে না। প্রফেশনাল জীবনের শুরুতে এই কোম্পানি তাকে খুবই অপমান করে। অপমানিত হলে মোম কাজ করে না। তার কাছে মানসম্মানই আগে। সে কোটি টাকা দিলেও আগে, না দিলেও আগে। আমি বললাম, তুই যখন কাজ করবি না তখন ওদের লোককে বাড়িতে ডাকছিস কেন? মেয়ে বলল, আপনি নাকি চেনাজানা কার নাম করেছেন।'

সোমনাথ তাড়াতাড়ি বলে, 'খুকু। আমার মাসতুতো বোন। এখন অবশ্য যোগাযোগ কমে গেছে। বিয়ে-থা করে বাইরে চলে গেছে কিনা।'

আলো চ্যাটার্জি কথার মাঝখানেই বললেন, 'যাক, সেই কারণে মোম দেখা করতে রাজি হয়েছে। আপনি পরশু সকালে চলে আসুন। ন-টা থেকে সাড়ে ন-টার একটা স্লট ফাঁকা আছে।'

মোমের মা মিসেস আলো চ্যাটার্জি। এই সাতসকালে সাজানো গোছানো ড্রইংরুমে হাঁটু পর্যন্ত শাড়ি তুলে বসে আছেন। সামনে বসে আছে সোমনাথ। যদিও 'খুকু'কে এখনও মোম চিনতেই পারেনি।

সোমনাথ আবার চেষ্টা করে। হেসে বলল, 'আরে, খুকু। খুকুকে চিনতে পারছ না? ওকে তোমরা স্কুলে খেপাতে, তুই কোনোদিন বড়ো হবি না, খুকুই থেকেই যাবি। সেদিন ওদের বাড়িতে কী একটা অকেশন ছিল। জন্মদিন-টন্মদিন কিছু একটা হবে। তোমরা তখন ছোটো, স্কুলে পড়ছ। থ্রি-ফোর হবে। বাড়ি জুড়ে ছোটাছুটি করে খেলছিলে। আমরা খেতে বসেছি। হঠাৎ খুকু কাঁদতে কাঁদতে এসে বলল, মোম ছাদে পড়ে গেছে। ওর থুতনি কেটেছে। আমরা ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখি, তুমি ছাদের ধুলোতে বসে কাঁদছ। তোমার থুতনি কাটেনি। হা হা।'

ঘটনা সত্যি নয়। পুরোটা বানানো। তবু সোমনাথ হেসে ঘটনা জমানোর চেষ্টা করল। মা, মেয়ের কারও এই গল্প পছন্দ হল বলে মনে হয় না। মোম ভুরু কুঁচকে মুখ ফেরাল। সম্ভবত সে গল্প যে বানানো সেটা ধরতে পেরেছে। সেই কারণে প্রতিশোধও নিল। কাঁধ দুটো অল্প ঝাঁকিয়ে বলল, 'মা, তোমার কি কিছু মনে পড়ছে? স্ট্রেঞ্জ! ইনফ্যাক্ট খুকু নামে এইরকম কাউকে মনেই করতে করতে পারছি না। কে খুকু? যেদিন আপনি ফোনে বললেন, আমি স্টুডিয়োতে ছিলাম। ভাবলাম, জীবনমরণের খুকু। ওই যে টেলিফিল্মে মেইড সার্ভেন্টের রোল করেছিল? মনে আছে মা? পরে খবর পেলাম ড্রাইভার না কার সঙ্গে পালিয়েছে। মনে পড়ছে তোমার?' তারপর আবার মুখটা কাঁচমাচু করে সোমনাথের দিকে

boierpathshala.blogspot.com

তাকিয়ে বলল, 'দেখুন তো কী মুশকিল। আমি তো ভেবেছিলাম আপনি সেই পালানো খুকুর দাদা। যতই ছোটো রোল হোক, খুকু সেই সময় তো আমার কো-অ্যাক্টর ছিল। ইস এখন কী যে করি? এত খারাপ লাগছে। মা, অ্যাই মা কী করব বলো না।'

মোমের মায়ের বয়স পঞ্চাশের বেশ খানিকটা ওপরে। চোখে কায়দা করা সোনালি ফ্রেমের চশমা। বোঝাই যাচ্ছে, মেয়ের রোজগারে বিভিন্ন প্রকার ঠাটবাটে মহিলা অভ্যস্ত হয়েছেন। ঠাটবাট এবং ফ্যাশন। বয়স বাড়লেও সেই ফ্যাশন ছাড়তে রাজি নন। চশমা নাকের ওপর অল্প নামানো। মহিলার প্রায় প্রতি বাক্যের শুরু এবং শেষে হাসির অভ্যেস আছে। সম্ভবত উনি নিজেকে 'স্টার' ধরনের কিছু ভাবেন। যদিও হাসলে খুবই খারাপ লাগে। এবড়ো-খেবড়ো, পান খাওয়া সবুজ দাঁতগুলো বেরিয়ে আসে। হাঁ-টাও ভালো না। মুখের তুলনায় বড়ো। সবথেকে বড়ো বিষয় হল পোশাক। মহিলার পোশাক মারাত্মক। এই মুহূর্তে মেয়ে গলা বন্ধ পোশাক পরে থাকলেও এই মহিলা সাতসকালে পিলে চমকানো সাজ দিয়েছেন। হিন্দি সিরিয়ালের কায়দায় জরি পাড়ের চকমকে শাড়ির নীচে একটা ফিতেওলা ব্লাউজ। ফিতেওলা সেই ব্লাউজও চকমকে। ফিতেতে জরির গুঁড়ো থাকতে পারে। নইলে আলো পড়ে এত চিকচিক করবে কেন? সোমনাথের এক সময় মনে হল, ব্লাউজ নয়, এটা আসলে অন্তর্বাস ধরনের কিছু। নইলে এত ছোটো কেন? শরীরে লেগে আছে মাত্র। মহিলার ঘাড়, কাঁধ, হাত এবং বুকের অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। চেয়ারে বসে থাকার কারণে পিঠ দেখা যাচ্ছে না। তবে তার অবস্থা যে আরও মারাত্মক সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। মহিলা কি বাড়িতে সবসময় এরকম শরীর দেখিয়ে বসে থাকেন? নাকি লোক আসবে বলে সেজেছেন?

মিসেস চ্যাটার্জি হাসি হাসি মুখে চশমার ওপর দিয়ে নিজের পা দেখছেন। দেখছেন এবং মেঝেতে বসা বালিকাটিকে নানা ধরনের নির্দেশ দিচ্ছেন। নির্দেশগুলি সবকটাই এক-একটা ধমক।

'আরে, আরে কী করিস গাধা? করিসটা কী? গরম জল যে বেশি ঢেলে ফেললি। ইস দ্যাখো কাণ্ড, উফ লাগছে মিনতি। কী হল বলছি না লাগছে? কথা কানে যায় না হারামজাদি? ওই জল এখন আমি তোর মাথায় ঢালব।'

কথা বলতেই বলতেই মহিলা নীচু হয়ে বালিকার পিঠে চড় লাগালেন। নীচু হওয়ার কারণে আঁচল খসে মহিলার কোলে পড়ল। সোমনাথ দ্রুত চোখ সরাল। মিনতির অবশ্য চড়ে কিছু এসে গেল না। সে একইরকম নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জল

boierpathshala.blogspot.com

ঢালে এবং সুযোগ পেলেই লুকিয়ে মাথার লাল ব্যান্ড ঠিক করতে লাগল।

বোঝাই যাচ্ছে এই মেয়েরা চড় এবং বকুনিতে অভ্যস্ত।

মোম আবার ন্যাকা ন্যাকা গলায় বলে উঠল, 'ও মা, বল না এবার কী হবে? বলবে তো। ইস আমার কী খারাপ লাগছে।'

আঁচল তুলতে তুলতে আলো চ্যাটার্জি ধমক লাগালেন, 'কী আর হবে? মনে করতে পারছিস না বলে ভদ্রলোকের ছেলেকে তো আর এখন বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারিস না। ডেকেছিস যখন কথা শুনতেই হবে। এইজন্যই বলি, সবটা যাচাই করে নিবি। একটা কাজ তোর হাতে ছেড়েছি, ব্যস ঝামেলা পাকালি। আরে বাবা, তুই কি আর এখন হেঁজিপেজি কেউ হলি? সবাই বলবে তোকে চেনে। সেটা তো কথা না, কথা হল, তুই কাকে চিনিস।'

কথা বলতেই মহিলা আবার বালিকার দিকে হাত চালালেন। আঁচল আবার পড়ল। মহিলা সোমনাথের দিকে ফিরলেন।

'দ্যাখো বাপু, চেনাজানা একটা জিনিস, আর কাজ একটা জিনিস। দুটোকে গুলোলে চলবে না। তুমি সবথেকে হিট টিভি নায়িকার সঙ্গে চেনাজানা করতে আসোনি, এসেছ কাজ করতে। ঠিক কিনা?'

অপমানের খোঁচা খেয়েও সোমনাথ মুখে হাসি আনার চেষ্টা করল। হাসি এল। কিন্তু সেটা হাসির মতো দেখতে হল কিনা বলা কঠিন। কিছু করার নেই। এরা মল্লিক টিভি কোম্পানির অপমানের প্রতিশোধ নিচ্ছে। মল্লিক টিভি একসময় এই মেয়েকে দুচ্ছাই করেছিল। এখন হাত কচলাতে হচ্ছে। প্রতিশোধ তো নেবেই। ধৈর্য ধরা ছাড়া পথ নেই।

'ঠিকই বলেছেন মাসিমা। এখন হল প্রফেশনালদের সময়। পেশাদারের যুগ। চেনা, অচেনার সেখানে কী দাম? কোনো দাম নেই। চিনলে ভালো, না চিনলেও ক্ষতি নেই।'

মহিলা সোমনাথের কথা শুনলেন কিনা বলা যাচ্ছে না, কিন্তু বালিকাকে আবার চাপা গলায় ধমকে উঠলেন, 'এই কী করিস ছেমড়ি? কী করিস এটা? এত গরম জলে পা যে পুড়বে। দেব মাথায় ঢেলে? দেখবি কেমন লাগে? আর একবার ভুল কর দেখবি তোর কী হয় আজ।'

সোমনাথ চোখের কোণা দিয়ে দেখল, মায়ের হাতে সমস্যা ছেড়ে দিয়ে মোম পেপারব্যাকে মন দিয়েছে। এও একটা কায়দা। পাত্তা না দেওয়ার কায়দা।

শ্রীমতী আলো চ্যাটার্জি সোমনাথের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। বিশ্রী দাঁত দেখিয়ে হেসে বললেন, 'পরিচয়ের কথা হলে একরকম আর কাজের কথা হলে

boierpathshala.blogspot.com

আর একরকম। পরিচয়ের কথা হলে জল-সন্দেশ খেয়ে উঠে পড়া লাগে। আমার মেয়ে তোমার পূর্ব পরিচিত না পশ্চিম পরিচিত এইটা এখানে বিবেচ্য নয়। অনেকেই এইটা করে। পরিচিত বলে মন ভুলানোর চেষ্টা করে। আমরা মা মেয়ে অতি সরল বলে সুযোগও পায়। তুমিও পেয়েছ।'

মোম মুখ তুলে বলল, 'আঃ, মা, তুমি না। কী যে বল।' বলে বইতে আবার মুখ নামাল।

'তুই চুপ কর দেখি। আমাকে বলতে দে।' মেয়ের দিক থেকে ফিরে আলো চ্যাটার্জি আবার সোমনাথের দিকে ফিরল।

'মোমের হাতে নতুন কাজ ধরার সময় কই? তুমি তো জানোই টিভি ওয়ার্ল্ডে আমার মেয়ে এখন এক নম্বর। একবারে নাম্বার ওয়ান। নাম্বার ওয়ান মানুষের বড়োই ঝামেলা। তাদের হাতে, মুখে, গায়ে কোনোখানেই সময় থাকে না। কিন্তু তুমি পরিচিত বলে ঢুকে পড়লে। আমরা যাচাই না করে কথা বলতে রাজিও হয়ে গেলাম। অ্যাই মিনতি, তুই কী শুনিস? কী শুনিস তুই? নিজের কাজ কর। কাজ হলে আজ একটু ঘোল করবি। ঘোলে গোলাপ পাপড়ি বাটা দিবি। আধ ঘণ্টা পা ডুবিয়ে বসে থাকব। ফাটা পায়ের জন্য গোলাপ পাপড়ি আর ঘোল ট্রিটমেন্ট খুব কাজের। তাই না মোম?'

মোম বইতে চোখ রেখেই বলল, 'তোমার যা খুশি লাগাও মা। তোমাকে তো বলেছিলাম, উইকে একদিন করে বটগাছের আঠা লাগাও। তোমার গোড়ালির যা অবস্থা। একেবারে বটগাছের গুঁড়ির মতো। আঠা দিয়ে জুড়তে হবে।'

মহিলা সোমনাথের দিকে ফিরে হাসলেন। যেন বটগাছের গুঁড়ির মতো পায়ের গোড়ালি হওয়া একটা গুণের বিষয়। বললেন, 'কথাটা মিথ্যে নয়, বটগাছের আঠা তোমার হল গিয়ে গোড়ালির জন্য ভালো। আরও একটা জিনিসও তুমি করতে পারো, আতার শাঁস বা বেলের ছিবড়েও ব্যবহার করতে পারো। বেলের পানা করার পর ছাঁকনির ছিবড়েগুলো প্রথমে তুলে রাখলে, তারপর গরম গরম জলে ফেলে পা ডোবালে। ঘণ্টাখানেক পরে দেখবে পা একেবারে ফনফনে। অ্যাই মিনতি, কালই আতা এনে রাখবি। অ্যাই মোম, আতা না বেল কোনটা করব?'

মোম এতক্ষণ বাঁ পায়ের ওপর ডান পা তুলে বসেছিল। এবার পা বদল করে ভুরু কুঁচকে বলল, 'উফ, বললাম না বিরক্ত কোরো না, পড়তে দাও।'

'আহা, বল না।'

boierpathshala.blogspot.com

'তুমি দুটোই কর। আতা, বেল দুরকমই।'

আলো চ্যাটার্জি সোমনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার মেয়ের সব ভালো, শুধু এই একটা দোষ। খালি পড়ে। সেই ছোটোবেলা থেকেই লেখাপড়ার নেশা। বল তো বাপু কী বাজে অভ্যেস। আরে বাবা, তুই কি প্রফেসর? তুই হলি স্টার। স্টার অত পড়বে কেন? যাক, এখন কথা হল তোমাদের কোম্পানিতে আমার মেয়ে কাজ করবে না।'

সোমনাথ মিনমিন ধরনের গলায় বলল, 'একবার যদি ভেবে দেখেন।'

'ভাবার কোনো জায়গা নেই বাছা। কাজ কেন করবে না তুমি জানো?'

মোম হাত তুলে আধো আধো গলায় বলল, 'উফ মা তুমি না, ছাড়ো তো ওই সব পুরোনো কথা।'

আলো চ্যাটার্জি দু-হাতে শাড়ি আর একটু তুললেন। সোমনাথ আবার চোখ ফেরাল। দুজনে মিলে অদ্ভুত একটা খেলা শুরু করেছে। একজন দর বাড়াচ্ছে, অন্যজন তাতে চাপা দিচ্ছে। মারাত্মক জুটি!

মোমের সাজ কিন্তু তার মায়ের একেবারে উলটো। গোড়ালি ছাড়ানো লং স্কার্ট মাটিতে লুটোচ্ছে। স্কার্টে রাজস্থানি প্যাটার্ন। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, জয়পুর থেকে কেনা ঘাগরা। গায়ের কালো টপের হাতদুটো কবজি পর্যন্ত লম্বা। গলাও ওপর পর্যন্ত। অনেকটা হাইনেক সোয়েটারের মতো । গোটা শরীরের মধ্যে শুধু লম্বা, ফর্সা আঙুলগুলো বেরিয়ে আছে। অভিনেতা, অভিনেত্রীদের অনেক সময়ই বাস্তবের তুলনায় পর্দায় বেশি ভালো লাগে। এই মেয়ের বেলায় ঘটনা উলটো। তাকে পর্দার বাইরে মনে হয় বেশি ভালো লাগছে। সত্যি মোম দারুণ সুন্দর একটা মেয়ে। এই মুহূর্তে তার মুখে কোনো চড়া প্রসাধন নেই। শুধু চোখের পাতায় হালকা একটা শেড। রং বেগুনি হবে। তার ফলে মায়াবি চোখদুটো যেন আরও মায়াবি হয়ে উঠেছে। বয়স আঠেরো, উনিশ না বত্রিশ তাতে কিছু এসে যাচ্ছে না। কিশোরী মোম কি এতটাই সুন্দর ছিল! সোমনাথ মনে করার চেষ্টা করল। মনে পড়ছে না। ইস তখন যদি সম্পর্কটা আর একটু বাড়িয়ে রাখা যেত। তবে আশার কথা হল, মেয়ের স্বভাব মায়ের মতো উগ্র মনে হচ্ছে না। এই লাইনে এটাই নিয়ম। নায়িকার মায়েরাই বেশি গোলমেলে হয়। কমল মল্লিকও সে-কথা বলে দিয়েছে।

'মেয়ের একটু নাম-ডাক হওয়ার পর থেকে মা-ই সেক্রেটারি হয়েছে। তবে এখনও সবসময় সঙ্গে ঘোরা শুরু করেনি, তবে শিগগিরই করবে মনে হচ্ছে। মেয়ে বড়ো পর্দায় ইন নিলেই করবে। তখন ইউনিটগুলোকে একেবারে

boierpathshala.blogspot.com

নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়বে। এখনই করে। শুনেছি, একসময় অন্যের বাড়িতে আশ্রিতা ছিল। ছোটো মেয়েকে নিয়ে কোনোরকমে মাথা গুঁজে থাকত। এখন মেয়ের রোজগারে ফড়ফড় করে বেড়েছে। আমি রিপোর্ট পেয়েছি, প্রোডিউসার, ডিরেক্টর গেলে মহিলা নাকি এমন সব অপমানের কথা বলে যে মনে হয় কষে একটা চড় লাগাই। দাঁতগুলো ফেলে দিই। মহিলার দাঁত ফেলার ইচ্ছে হওয়াটা ঠিক নয়। খুবই বিশ্রী ব্যাপার। কিন্তু, এর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এই মহিলার দাঁত ফেলার ইচ্ছেটা আনন্দের। দেখবে সোমনাথ, তোমারও হয়তো ইচ্ছে হবে।'

সোমনাথ শিউরে উঠে বলে 'বলেন কী স্যার, এ তো ভয়ংকর ব্যাপার!'

'ভয়ংকরের আরও আছে। তোমাকে এমনি এমনি ডেকে পাঠাইনি। চেনা জানা ধরে যদি শুরুটা করা যায়। স্বপ্নের গলি মেগা সিরিয়ালের প্রোডিউসার দীনেশ খঞ্জনওয়ালাকে দিয়ে ওই মহিলা কী করিয়েছে জানো?'

'কী করিয়েছে?'

'বাজার করিয়েছে।'

'বাজার!'

'হ্যাঁ। ঝিঙে, কুমড়ো, শিম আর দুটো পাতিলেবু কিনিয়েছে। লেবু আনতে ভুলে গিয়েছিল বলে আবার পাঠিয়েছিল। মানুষটা দুশো আটান্ন নম্বর এপিসোডের স্ক্রিপ্ট নিয়ে ওই বাড়িতে শোনাতে যায়। মোম বলল, আমি শুনব না। আমি এখন ঘুমোব। এখন থেকে আমার মা সব শুনবে। মা হ্যাঁ বললে হ্যাঁ, না বললে না। বোঝ কাণ্ড। দুশো আটান্নতে এসে নায়িকা যদি বেঁকে বসে প্রোডিউসার যায় কোথায়? জানোই তো ''স্বপ্নের'' গলি কী দারুণ ব্যবসা দিয়েছে। সুপার ডুপার হিট। অন্য সবকটা চ্যানেলকে সাড়ে আটটার স্লটে আঙুল চুষতে হয়েছে। এই সময়ে নায়িকা বলছে ঘুমোব!'

'তারপর?'

'তারপর আর কী? খঞ্জনওয়ালার তো হার্টফেল করবার মতো অবস্থা। সে বেচারি নায়িকার মাকেই স্ক্রিপ্ট শোনাবে বলে বসে রইল। মহিলা ঘণ্টা খানেক পরে এসে জানালেন, তিনিও এখন সময় দিতে পারবেন না। খুবই চিন্তার মধ্যে আছেন। ঘরে আনাজপাতি নেই। মেয়ে আজ খাবে কী—এই নিয়ে চিন্তা। ওর আবার ভেজিটেবল ছাড়া একবেলাও চলে না। এই অবস্থায় স্ক্রিপ্ট শোনার মতো কাজে মন দেওয়া অসম্ভব। একমাত্র খঞ্জনওয়ালা যদি আনাজপাতি সমস্যার কোনো সমাধান বের করতে পারে, তবে একটা উপায় হয়। বাধ্য হয়ে

boierpathshala.blogspot.com

খঞ্জনওয়ালা তখন মহিলার কাছ থেকে বাজারের থলি চেয়ে, শিম বরবটির লিস্ট হাতে বের হল। অত বেলায় তরিতরকারি কোথায় পাবে? শেষ পর্যন্ত নিজের গাড়ি নিয়ে বেলেঘাটা না কোথাকার বাজারে গেলেন। গলিতে গাড়ি রাখাও সমস্যা।'

'বলেন কী!' সোমনাথ হাঁ হয়ে বলল।

'এই ঘটনা পরে মোমের মা-ই ইন্ডাস্ট্রিতে রটিয়েছে। নইলে সবাই জানবে কী করে? আসলে বছর তিন আগে খঞ্জনওয়ালা নাকি মোমকে পুরো একটা বেলা স্টুডিয়োর বাইরে অপেক্ষা করিয়েছিল। তখন মোম কেউ নয়। অগা-বগা। সবে লাইনে ঢুকেছে। বাজারে পাঠানো নাকি সেই বসিয়ে রাখার বদলা। মল্লিক টিভির ব্যাপারেও নিশ্চয় তাই করবে। বদলা নেবে। সাবধানে থাকবে সোমনাথ। দরকার হলে থলি হাতে বাজারেও চলে যাবে। রান্না করে দিতে বললে তাতেও পিছপা হবে না। কিন্তু ফেরার আগে প্রজেক্টে রাজি করিয়ে ফিরতে হবে। মল্লিক টিভি শুধু এইটুকু তোমার কাছে চায়। আমার বিশ্বাস তুমি পারবে।'

পারবে কিনা এখনও বুঝতে পারছে না সোমনাথ। তবে প্রোগ্রাম কনসেপ্টটা সঙ্গে করে এনেছে সোমনাথ। দুদিন আগে সে যখন কমল মল্লিককে টেলিফোনে সেটা শোনায়, তিনি লাফিয়ে ওঠে।

'সোমনাথ, তুমি করেছটা কী! অ্যাঁ! আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না হে। এমন একটা জিনিস তুমি ভাবলে কী করে! মার্ভেলাস, দারুণ! চ্যানেল একেবারে লুফে নেবে। দেখি এবার মোম চ্যাটার্জি কেমন করে না বলে। একটু নরম বুঝলেই অ্যামাউন্ট ডবল করে দেবে। বলবে, বিজ্ঞাপনে শহর ভরে দেব। হোর্ডিং, পোস্টার, কিচ্ছু বাদ রাখব না। ক্যারি অন মাই বয়। তোমার ওই ভাবনাটা কাজ আদ্দেকটা হয়ে গেছে। এবার বাকি আদ্দেকটা করে এসো।'

সোমনাথ নিশ্চিন্ত হল। বলল, 'স্যার, একটা কথা ছিল। আমার কিন্তু এটাই মল্লিক টিভির শেষ কাজ। এরপর আমি আর নেই।'

কমল মল্লিক থামিয়ে দেয়। বলে, 'রাখো তোমার শেষ আর শুরু। তুমি যা ভেবেছ সোমনাথ, তোমাকে আমার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। ওয়েদার বুলেটিন এরকমও হতে পারে!'

কথা শেষ করে কমল মল্লিক টেলিফোনেই হেসে উঠলেন।

মোম একটা হাই মতো তুলল। বাঁ-হাতের উলটো পিঠ দিয়ে ঠোঁটে আলতো করে টোকা মারল। সোমনাথ এতক্ষণ আলাদা করে দেখেনি, এবার মনে হল, মোমের ঠোঁট দুটোও সুন্দর। সুন্দর মেয়ের ঠোঁট সুন্দর হবে এ আর

boierpathshala.blogspot.com

আশ্চর্যের কী? মোমেরটা যেন আরও একটু বেশি সুন্দর। মনে হয় অতিরিক্ত কিছু আছে। সেই অতিরিক্তটা কী?

মোম তার বেশি সুন্দর ঠোঁট ফাঁক করে বালিকা কণ্ঠে বলল, 'মা। এবার কাজের কথা বলো। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

সোমনাথ এটাই চাইছিল। কাজের কথা শুরু হোক। এরা সম্ভবত নানা ধরনের অপমানের মধ্যে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখে পার্টি টেঁকে কিনা। টিকলে তবে আসল কথা শুরু করে।

মহিলা পা দুটো জল থেকে তুললেন। জল ঝরছে। সেই ঝরা জলের দিকে তাকিয়ে তিনি পা নেড়েচেড়ে চোখেমুখে ব্যথার ভঙ্গি করলেন। তারপর বালিকার প্রায় কোলের ওপর পা দুটো তুলে বললেন, 'নে এবার মোছ। কী যে জল ঢাললি মিনতি ব্যথা তো কিছুই কমল না। আলতো করে মুছবি। লাগলে কিন্তু কান টেনে ছিঁড়ে দেব।' সোমনাথের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'কাজের কথার আগেও একটা কাজের কথা আছে যে ভাই।'

'কী কথা মাসিমা?'

সোমনাথের গলায় আগ্রহ এবং চিন্তা দুটোই।

আলো চ্যাটার্জি নাক কুঁচকোলেন। বাঁ-হাতের আঙুল দিয়ে ঠেলে চশমা তুললেন। বুকের ওপর থেকে খসে যাওয়া শাড়ির আঁচল এমন-ভাবে কাঁধে ফেলেন যাতে আবার দ্রুত পড়ে যায়। মোমকে একবার দেখলেও এই মহিলাকে কখনও দেখা হয়নি সোমনাথের। সুযোগ বা প্রয়োজন কোনোটাই ছিল না। এখন মনে হচ্ছে, দেখে রাখলে ভালো হত। যুবতী মোমের মা আর কিশোরী মোমের মায়ের মধ্যে তফাতটা বোঝা যেত।

'দ্যাখো ছেলে, ওসব মাসিমা, পিসিমা শুনলে আমার মেয়ে খুবই বিরক্ত হয়। মুশকিল হল, মেয়ে আবার তার মাকে বুড়ি দেখতে চায় না। মা বুড়ি মানে মেয়েও বুড়ি। বোঝো দেখি কাণ্ড! তুমি বাপু আমাকে ম্যাডাম ডেকো, কেমন?'

সোমনাথ মাথা নেড়ে বলল, 'তাই ডাকব ম্যাডাম। আমি তাহলে প্রোগ্রামটা বলি?'

মোম মুখ তুলল। হাতের বই গালে ঠেকিয়ে হাসল। বইয়ের নাম এবার দেখতে পেল সোমনাথ, 'অ্যালকেমিস্ট'। লেখকের নাম পাওলো কোয়েলো।

মোম কি সত্যি এতসব পড়াশোনা করে, নাকি শুধু বই হাতে ভান করে? নিজেকে মহার্ঘ করে তোলার এটাও একটা কায়দা?

মোম মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্ক্রিপ্ট শোনবার আগে মা ওটার কথা

boierpathshala.blogspot.com

বলে নিলে হত না?'

আলো চ্যাটার্জি মেয়ের কথা যেন লুফে নিলেন।

'হত কী? নিতে তো হবেই। তা বাপু তোমরা টাকা-পয়সার কথা কীরকম ভেবে রেখেছ? মল্লিক টিভির কাজ আমার মেয়ে নেবে না। তবু পেমেন্টের কথা না শুনে আমার মেয়ে আবার ইন্স্ক্রিপ্ট শোনে না। একটা অভ্যেসের মতো। বোঝোই তো, গুড হেভিট।'

আলো চ্যাটার্জি পান খাওয়া দাঁত বের করে হাসলেন।

সোমনাথ বুঝল, এবার সুযোগ এসেছে। মুখ ঘুরিয়ে সে তাকাল মোমের দিকে। এক মুহূর্তও থমকে না গিয়ে বলল, 'দ্বিগুণ, ডবল। তুমি যা নাও এই কাজের জন্য তার দু-গুণ বেশি পারিশ্রমিক দেবে মল্লিক টিভি। ছ-মাসের কন্ট্রাক্ট। তিন মাসের টাকা অ্যাডভান্স। অসুবিধে হবে?'

মা মেয়ে দুজনেই থমকে গেল। একেবারে চুপ। চোখমুখই বলছে, ঘাবড়েছে। ভালোরকম ঘাবড়েছে। শকের মতো হয়েছে। নিশ্চয় ওরা এত টাকা ভাবতে পারেনি। ভেবেছিল, চেনাজানা দেখিয়ে ছোকরা আসলে পয়সা কমাতে এসেছে। দুজনেই একসঙ্গে ফিরল সোমনাথের দিকে। সোমনাথ নরম করে হাসল। ভাবটা এমন যেন— এ আর কী এমন। এখনও তো প্রোগ্রামটাই বলা হয়নি।

মহিলা গায়ের শাড়ি ঠিক করে নিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। গলা নরম করে বললেন, 'অ্যাই মিনতি, ঠিক আছে আর লাগবে না। তুই এবার পা ছাড়। ভেতরে গিয়ে স্নানের জল গরম কর। আকাশটা মেঘলা মেঘলা করেছে।'

মিনতি উঠে যেতে মোম পেপারব্যাকটা মুড়ে সামনের নীচু টেবিলে রাখল। মাথার চারপাশে ছড়িয়ে থাকা চুল পিছনে টেনে একটা ক্লিপ লাগাল। কালো রঙের ক্লিপটা এতক্ষণ ওর হাতেই ছিল নাকি? মেয়েরা প্রসাধনের জিনিস ম্যাজিশিয়ানের মতো লুকিয়ে রাখতে জানে। এইটুকু ব্যাগ থেকে ঝপ করে লম্বা আয়না বের করে মুখ দেখে নেয়। সামান্য অদল বদলে চেহারাটাই আরেকরকম হয়ে গেল মোমের। না, লোকে মিথ্যে বলে না। এই মেয়ে সত্যিই আকর্ষণীয়। সোমনাথ প্রথম দেখার কথা মনে করতে চাইল। এতটাই কি ঝকমকে ছিল তখন?

সোমনাথের দিকে তাকিয়ে যত্ন করে হাসল মোম। বলল, 'তুমি অ্যালকেমিস্ট জানো সোমনাথদা?'

সোমনাথদা! তুমি! সোমনাথ চমকে উঠল।

boierpathshala.blogspot.com

আজ থেকে বহু যুগ আগে মিশরের অর্থনীতিবিদ্ এবং দার্শনিক নেভারতিনিস বলেছিলেন, অর্থের পরিমাণের ওপর মানুষের আচরণ আনুপাতিক হারে বদল হয়। পরিমাণ কম হলে যেমন বদলায়, বেশি হলেও বদলায়। পরে এই তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে প্রাচুর্য, অভাব বনাম মানব চরিত্রের স্বভাব, আচরণ নিয়ে অনেক ধরনের কাজ হয়েছে। কিন্তু সেই বদল কি এত তাড়াতাড়ি ঘটে? নেভারতিনিস এ-ব্যাপারে কিছু বলে গেছেন কি? এতটা সোমনাথের জানা নেই।

মোম চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতে লাগল।

'যারা সোনা তৈরি করতে পারে তাদের বলে অ্যালকেমিস্ট। রূপকথার চরিত্র। কিন্তু ভেতরে একটা ফিলসফি আছে। আমার তো মনে হয়, আমাদের চারপাশেও অ্যালকেমিস্ট'রা রয়েছে। তারা সোনা তৈরি করে, কিন্তু আমরা চিনতে পারি না। তাই না সোমনাথদা?'

কথা শেষ করে চমৎকারভাবে হাসল মোম। ভাবটা এমন যেন জীবনের গভীর দর্শন ছাড়া অন্য বিষয় নিয়ে এই মেয়ের কোনো মাথাব্যথা নেই।

আলো চ্যাটার্জি ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'রাখ তোর সোনা। কাজের কথাটা বলতে দিবি তো।'

মহিলা ঝুঁকে বসলেন। জামার ওপর দিয়ে বুকের অনেকটা আবার সোমনাথের চোখের সামনে এগিয়ে এল। পায়ের মতো বুকও কুৎসিত। মহিলা চোখ বড়ো করে বললেন, 'হ্যাঁগো ছেলে, তোমাদের অ্যামাউন্ট ভালো। কিন্তু শুনে ভয় লাগে যে।'

মোম নড়েচড়ে বসল। হাত দিয়ে ঘাগরা ঠিক করতে করতে বলল, 'কী যে বল না মা। ভয়ের কী আছে? ওঁরা তো সবটা চেকে পেমেন্ট করবেন না। ক্যাশও থাকবে। তা ছাড়া সোমনাথদা নিজে মাঝখানে থাকছে। কি থাকবে না সোমনাথদা? না থাকলে কিন্তু আমি কাজ করব না। এই বলে রাখলাম হ্যাঁ। পরে রাগ করতে পারবে না।'

যে পরিচিত মানুষটাকে এতক্ষণ অপরিচিত বলে অবহেলা, অপমান করছিল মেয়েটা, তার এতটা বদল চোখে লাগার মতো। সোমনাথ মনে মনে হাসল। নিশ্চয় একটু পরেই পুরোনো সব কথাই মনে পড়বে। টাকা হাতে পেলে হয়তো যা সত্যি নয়, যা ঘটেনি, তাও মনে পড়বে। এমনকী ছাদে পড়ে কান্নার গল্পও মোম মনে করে বসবে।

'তুই থাম দেখি। বোকার মতো কথা বলিস না। আমি কি সেই নার্ভাসের কথা বলেছি?'

boierpathshala.blogspot.com

সোমনাথ হাসি লুকোল। খুব সহজেই ভেঙে পড়েছে এরা। এটাই হয় বোধহয়। বড়ো বড়ো কথা দিয়ে যারা শুরু করে, তারা সহজেই ভেঙে পড়ে। আর চিন্তা নেই। তবু মিথ্যে চিন্তার ভান করে বলল, 'তাহলে কোন ভয়ের কথা বলছেন?'

ঝুঁকে পড়া অবস্থাতেই মহিলা গলা নামিয়ে বললেন, 'তোমাদের ইস্ক্রিপ্টে বেড সিন নেই তো বাছা? আমার মেয়ে কিন্তু এখন বেড সিন করতে পারবে না। তুমি চেনাজানা বলেই বলছি, নইলে বলতাম না। ইতিমধ্যেই তিনজনের সঙ্গে সিনেমার কথা চলছে। তোমাদের টিভির জিনিস নয়, বড়ো পর্দার ছবি। এর মধ্যে একজনের সঙ্গে কথা প্রায় ফাইনাল। সে হারামজাদা পাঁচটা বেড সিন চায়। তার মধ্যে একেবারে শুরুতেই একটা।'

'উফ্ মা, তুমি থামবে?'

মোম লজ্জার ভান করে। এই লজ্জা সম্ভবত সত্যি নয়।

মেয়ের মা থামে না। বলে চলে।

'এইভাবে তোমার মোমের পা, হাঁটু, উরু, কোমর, পিঠ দিয়ে ক্যামেরা উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে টাইটেলও পড়তে থাকবে।'

মহিলা দু-হাতে পরিচালকের মতো ভঙ্গি করতে করতে সোজা হয়ে বসেছেন। যেন মেয়ের নগ্ন শরীরের ওপর দিয়ে তিনিই ক্যামেরা চালাচ্ছেন!

সোমনাথ ঢোঁক গিলল। মনে মনে তারিফ করল। আহা! এই না হলে স্টারের মা!

মোম ঠোঁটের ফাঁকে হেসে ফের লজ্জা পাওয়ার কায়দা বলল, 'আঃ, মা, তুমি থামবে? তুমি না কী। এসব কেউ বলে?' তার গলা যেন আরও আদুরে হয়ে গেছে।

সোমনাথই থামাল। হাত তুলে বলল, 'না, আমাদের প্রজেক্টে ওরকম কোনো ব্যাপার নেই ম্যাডাম। এটা একটা নিছক ওয়েদার বুলেটিন। ওয়েদার ফোরকাস্ট।'

মোম নাকমুখ কুঁচকে বলল, 'ওয়েদার বুলেটিন!'

মহিলা সোজা হলেন। ঘাড় কাত করে বললেন, 'কী বললে বাপু? ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'হ্যাঁ, ওয়েদার বুলেটিন। আবহাওয়ার খবর। যাকে সোজাসাপটা কথায় আমরা আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলি। আজকাল প্রায় সব চ্যানেলেই এর জন্য সময় থাকে। অল্প সময়, কিন্তু থাকে। আমরা যে-চ্যানেলের হয়ে কাজটা করব তারা

boierpathshala.blogspot.com

ওয়েদার বুলেটিনের এই স্লটটা রাখছে রাতের দিকে। একটু বেশি রাতের দিকে। মিনিট তিন-চারের ব্যাপার। আমরা চাই, মোম এই বুলেটিনে ওয়েদারের খবর বলুক।'

আলো চ্যাটার্জি ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এটা কেমন কথা? আমার মেয়ে একজন আর্টিস্ট। নায়িকার রোলে সে গান করে, প্রেম করে। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে ওয়েদারের খবর বলাটা কি তার উচিত হবে? এতে তার গ্ল্যামার নষ্ট হবে। তার ওপর রোজ শ্যুটিং। সব কাজ বাদ দিয়ে সে করবে কী করে? এটা কি ঠিক হবে?'

ঘটনা এখন হাতে। সোমনাথ চেয়ারে হেলান দিল। সামান্য হেসে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'না, ঠিক হবে না। আপনি চিন্তা করবেন না। মোমকে সংবাদ পাঠিকা হতে হবে না। তাকে রোজ শ্যুটিংও করতে হবে না। আমাদের পরিকল্পনাটা এখনও পুরো শোনেননি ম্যাডাম। দয়া করে পুরোটা শুনে নিলে সুবিধে হবে।'

মোম তার ভাসা ভাসা চোখদুটো আরও ভাসিয়ে বলল, 'তোমার পরিকল্পনা কী সোমনাথদা? প্লিজ বল।'

সোমনাথ পরিকল্পনা বলল।

মোমকে দিয়ে বুলেটিনের সবটা বলানো হবে না। সে বলবে শুধু গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো। যেটা মানুষ শুনতে চায়। পরদিন বৃষ্টি হবে না আকাশ শুধুই মেঘলা থাকবে? শীত বাড়বে নাকি উত্তরের হাওয়া থমকে যাবে দূরে? গরম কবে কমবে? দুপুরের পর আকাশ কালো করে কালবৈশাখী কি আসছে? সমুদ্রের আকাশে ঘন হয়ে আসা নিম্নচাপ আছড়ে পড়বে কখন? নাকি পথ বদলে সরে যাবে অন্যদিকে? এইটুকু জানিয়েই মোমের কাজ শেষ। বিস্তারিত ব্যাখ্যা, তথ্য, পরিসংখ্যান আর বিশ্লেষণ দেওয়ার জন্য অন্য লোক থাকবে। তবে মূল কথাটা মোমকে বলতে হবে গল্প বলার ঢঙে। চাইলে দু-একটা জোকসও বলতে পারে। আজকাল টিভিতে জোকস খুব চলছে। ধরা যাক, ঝড়, বৃষ্টি, তুফানের খবর জানানোর পর, মোম দর্শকদের এমন একটা জোসক বলল, যেখানে নৌকো উলটে জলে পড়ে কেউ খুব একচোট হাবুডুবু খেল। এতে ভিউয়ারদের টেনশন কমবে।

এত পর্যন্ত জানিয়ে সোমনাথ মা, মেয়ের দিকে তাকাল। দুজনের চোখেই আগ্রহ। সোমনাথ আবার হাসল। তারপর বলল পরিকল্পনার পরের অংশটুকু।

আবহাওয়া রোজ বদলালেও মোমকে রোজ লাগবে না। অনেকদিনের

boierpathshala.blogspot.com

শ্যুটিং একসঙ্গেই সেরে নেবে মল্লিক টিভি। সেইভাবেই সিডিউল তৈরি হবে। মেঘ করবে, বৃষ্টি হবে, ঝড় আসছে ধরনের গাদাখানেক একই কথা তোলা থাকবে নানা কায়দায়। যেদিন যেরকম খবর আসবে, বুলেটিনের প্রথমে জুড়ে নেওয়া হবে। দর্শক মনে করবে, আজই টাটকা বলেছে।

সোমনাথ থামলে মোম হাততালি দিয়ে উঠল। হেসে বলল, 'চমৎকার। চমৎকার না মা?'

সোমনাথ মাথা ঝুঁকিয়ে অভিনন্দন গ্রহণের কায়দা করল। বলল, 'তবে মোম তোমার কাজ কিন্তু স্টুডিয়োর ঘরে বসে হবে না।'

'তাহলে?'

সোমনাথ সরাসরি মোমের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শ্যুটিং হবে সুইমিং পুলে। ধর কলকাতারই কোনো ফাইভ স্টার হোটেলে করলাম। কোনোদিন গলা পর্যন্ত জলে ভেসে, কোনোদিন পুলের ধারে বসে, কোনোদিন তোয়ালে দিয়ে গায়ের জল মুছতে মুছতে তুমি আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানাবে। বলবে, মেঘ বৃষ্টির খবর। এক একদিন এক একরকম সুইম স্যুট থাকবে। অবশ্যই মল্লিক টিভি কস্টিউম প্রোভাইড করবে। এখানেই শেষ নয়, প্রোগ্রাম চলাকালীন এস.এম.এস.-এ ভোটের ব্যবস্থা হবে। পূর্বাভাস ভোট। ওয়েদারের পূর্বাভাস নয়, সুইমস্যুটের পূর্বাভাস। দর্শকদের কাছে জানতে চাওয়া হবে, আগামীকাল কি আপনি মোমকে আরও সুন্দরী, আরও অ্যাট্র্যাকটিভ দেখতে চান? আপনি কি চান সে আরও খোলামেলা আর সাহসী পোশাক পরুক? তাহলে মোবাইলে মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন...।'

কথা থামিয়েও সোমনাথ বিনয়ের ভঙ্গিতে হাসল।

এর আগেরবার শুধু হাততালি দিয়েছিল। এবার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে হাততালি দিয়ে মোম বলল, 'ফ্যানটাস্টিক। কাজটা আমি করব।'

আলো চ্যাটার্জি খসে-পড়া আঁচল তুললেন। সেই আঁচল দিয়েই উন্মুক্ত পেট ঢাকলেন, চোখের চশমা ঠিক করে সোমনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাপু, তুমি কী খাবে বল? ঠান্ডা না গরম?'

সোমনাথ আরও বিনয়ের ভঙ্গিতে মাথা নামিয়ে বলল, 'ম্যাডাম একটা কথা বাকি ছিল।'

'আবার কী?' মোম আগ্রহ নিয়ে বলল।

সোমনাথ মোমের দিকে মুখ ঘোরাল। বলল, 'আমরা ঠিক করেছি, প্রোগ্রামটার নাম দেওয়া হবে, মোমের আকাশ বাতাস। ওই নামে চ্যানেল

boierpathshala.blogspot.com

বিজ্ঞাপন দেবে, হোর্ডিং লাগাবে।'

মোম চাপা গলায় বলল, 'বিউটিফুল! আমাকে কি বিকিনি পরতে হবে?'

আলো চ্যাটার্জি মেয়ের দিকে তাকিয়ে ধমক দিলেন, 'পরতে হলে হবে। ডিরেক্টর যেমন চাইবে আর্টিস্ট তেমনই করবে। তোর অসুবিধেটা কোথায়? সামান্য ঝড়জল দিয়ে তুই হিট থেকে একেবারে সুপারহিট হয়ে যাবি।' সোমনাথের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'এই যে ছেলে তোমাকে একটু মিষ্টিমুখ না করিয়ে কিন্তু ছাড়ছি না। দাঁড়াও আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসছি। অ্যাই মোম, ওকে পালাতে দিবি না।'

আলো চ্যাটার্জি উঠে মিষ্টি আনতে চলল। সোমনাথ দেখল, যা আশঙ্কা করেছিল, তাই। মহিলার পিঠ ভয়াবহ। কোমরের অনেকটা নীচ পর্যন্ত কিছু নেই! নায়িকাদের 'ব্যাকলেস' বোঝা যায়, নায়িকার মায়েরও 'ব্যাকলেস'!

সোমনাথ মোমের দিকে ফিরে হেসে বলল, 'বইটা আমাকে একবার দিও তো। ওই যে অ্যালকেমিস্ট, পড়ে দেখব।'

মোম কথাটা শুনল বলে মনে হয় না। মাথা নামিয়ে গাঢ় গলায় বলল, 'তুমি হারিয়ে গিয়েছিলে কেন সোমনাথদা?'

সোমনাথ মুচকি হাসল। এই ধরনের মেয়েদের কথায় গুরুত্ব দেওয়ার কোনো কারণ নেই। এদের সবটাই বানানো। টাকায় খুশি হয়ে গলা নরম করছে। নরম ভাব ঝেড়ে ফেলতে সময় লাগবে না মোটেও। মল্লিক টিভির জন্য কাজটা হয়েছে, এই যথেষ্ট। এবার সত্যি সত্যি সে বেরিয়ে আসবে। শুধু পৃথা পছন্দ করছে না, তা নয়, তারও ভালো লাগছে না। যত দেরি হচ্ছে তত জালে জড়িয়ে পড়ছে।

সোমনাথ তখনও জানত না, সে বেরিয়ে আসতে পারবে না, জালে তাকে আরও জড়িয়ে পড়তে হবে। আর সেই জালে মোম নামের এই মেয়েটাও থাকবে।

boierpathshala.blogspot.com

একত্রিশ

গরিব মানুষ অনেক কিছু পারে না। তার মধ্যে একটা হল শোক দুঃখ নিয়ে বাড়াবাড়ি। শোক দুঃখ নিয়ে বাড়াবাড়ি করবার মতো সময় তার নেই। নিজে বেঁচে থাকার জন্য তাকে সর্বদাই অতি ব্যস্ত থাকতে হয়। সেই ব্যস্ততার মধ্যে দীর্ঘ শোকপালনের সময় কোথায়? তবে সে যে মরা মানুষের জন্য চোখের জল ফেলে না এমন নয়, ফেলে। কিন্তু কখনওই পুরোটা ফেলতে পারে না। অর্ধেকটা ফেলে, অর্ধেক ধরে রাখে। অর্ধেক জলে-ভেজা-চোখ শুকোনোর আগেই সে দরকার হলে বেঁচে থাকার জন্য আবার হাসে। কারণ সে জানে তাকে হাসতে হবে। কষ্ট হবে, কিন্তু হাসতে হবে। বেঁচে থাকার জন্য গরিব মানুষকে অনেক কষ্ট করতে হয়। বাঁচার তাগিদে জোর করে শোক ভুলে যাওয়াও একরকম কষ্ট।

ঝিলডাঙার বেলায় ঘটনা অন্যরকম হয়েছে।

চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়ার মৃত্যুর বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেছে কিন্তু গ্রামের থমথমে ভাব এখনও কাটেনি। গ্রাম যেন এখনও শোকে মুহ্যমান। মানুষ কথা বলছে নীচু গলায়। কাজকর্ম সারছে ধীর গতিতে। ক্ষণে ক্ষণে সতর্ক চোখে তাকাচ্ছে চারপাশে। কেউ দেখছে না তো? শুনছে না তো কিছু?

একজন সহজ সরল স্কুল মাস্টারের মৃত্যু ঝিলডাঙার মতো শান্ত নিরীহ গ্রামকে যে কাতর করবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু একটু মন দিলেই বোঝা যাবে, ঝিলডাঙার এই থমথমে ভাব যতটা না শোকের, তার থেকে অনেক অনেক বেশি আতঙ্কের। যেভাবে মাস্টারের মৃত্যু হয়েছে তাতে সকলে ভীত, আতঙ্কিত। কী করবে বুঝতে পারছে না, আদৌ কিছু করা যায় কিনা তাও বুঝতে পারছে না। পিটিয়ে মারার ঘটনা এই গ্রামে প্রথম। যে-মানুষটা ভাঙা

boierpathshala.blogspot.com

একটা স্কুল আর কতগুলো ছোটো ছেলেমেয়ে ছাড়া কোনো সাতেপাঁচে কখনও থাকেনি তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলল! কারা মারল? কেন মারল?

যতটুকু জানা গেছে, খুনিরা এসেছিল বাইরে থেকে। কিন্তু কোথা থেকে এসেছিল, ক-জন এসেছিল, সেসব কিছুই জানা যায়নি। তারা মোটরবাইকে চেপে আসে, ঘটনা ঘটিয়ে একইভাবে পালিয়ে যায়। কেউ বলছে, বাইকের সংখ্যা ছিল দুই, কেউ বলছে তিন। কারও মতে আবার সংখ্যা অনেক বেশি। দশ-বারোর কম হবে না। গল্প আরও ছড়িয়েছে। খুনিদের মুখে নাকি কালো কাপড় বাঁধা ছিল। মাথায় ফেট্টি। দেখলেও লাভ হত না।

হত্যাকাণ্ডের পরদিন দোকানপাট বন্ধ ছিল ঝিলডাঙার। অনেকটা বন্‌ধের মতো। কাদুর ছেলেরাই হুকুম দিয়েছিল। মাঠেও কাজ হয়নি। সারাদিন কানাঘুষো চলল। জটলা পাকিয়ে ফিসফিসানি। এখন জটলাটা কমেছে, ফিসফিসানি কমেনি। সঙ্গে সঙ্গে আবার আরেক ঘটনা ঘটেছে। ক-টা দিন কাদু আর তার দলবল গ্রামে দাপাদাপি শুরু করেছে। তবে সত্যি কথা বলতে হলে, সে দাপাদাপি খারাপের দিকে নয়, ভালোর দিকে। বানেরহাট মর্গে পোস্টমর্টেমের পর মাস্টারের দেহ ঝিলডাঙায় নিয়ে আসার সবরকম ব্যবস্থা তারাই করেছিল। ফ্যাচাং কম ছিল না। থানার বড়োবাবুর সঙ্গে কাদুর খাতির। সেই কারণেই অসুবিধে কম হয়েছে। সৎকার থেকে শুরু করে মাস্টারের সদ্য বিধবা বউ আর সাত বছরের ছেলের ক-দিনের হবিষ্যির জিনিসপত্র পর্যন্ত জোগাড় করে দিয়েছে কাদু। শুধু তাই নয়, ঘোষণা করেছে, যতদিন না টাকাপয়সার একটা কিছু সুরাহা হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত গরিব মাস্টারের পরিবারকে দেখভালের ব্যবস্থা তারাই করবে। এই কাজের জন্য মোহনকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

কাদু এবং তার দলের এই হঠাৎ আচরণ পরিবর্তনে সবাই একটু থতমত খেয়ে আছে।

কাদু যে শুধু মৃত চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়ার বউ ছেলের পাশে দাঁড়িয়েছে এমন নয়, খুনিদের ধরার জন্যও তৎপর হয়েছে। থানাতে দু-বেলা যাতায়াত করছে। বড়োবাবুর সঙ্গে বসছে। মাঝেমধ্যে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে গ্রামের মুরুব্বিদের। পরশু যেমন নিয়ে গেল, সদানন্দকে। আজ সে এলো গোপীনাথের কাছে।

থানায় যেতে হবে শুনে গোপীনাথ তো প্রথমটায় ঘেমেনেয়ে একশা। প্রায় কেঁদে ফেলে আর কী।

'ভাই কাদু, আমাকে ছেড়ে দাও।'

কাদু ভুরু কুঁচকে বলে, 'এর মধ্যে ধরা-ছাড়ার কী আছে ডাক্তার? তুমি কি

boierpathshala.blogspot.com

চাও না মাস্টারের খুনিরা ধরা পড়ুক?'

গোপীনাথ আতঙ্কিত গলায় বলে, 'না, না চাই তো বটেই, অবশ্যই চাই। একশোবার চাই।'

'এই কতাটাই পুলিশকে গিয়ে বলবে। থানা পুলিশ আমাকে চেনে বটে, কিন্তু একার কতায় জোর হয় না।'

'সে তো তোমরা বাপু রোজই বলছ, ঝিলডাঙার আরও অনেকে যাচ্ছে।' কাতরকণ্ঠে বলে গোপীনাথ।

কাদু চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'তুমিও যাবে। তুমি হেঁজিপেঁজি কেউ নয়, ঝিলডাঙার একজন ইমপটানট লোক। তুমি থানায় গেলে পেসার বাড়বে। পুলিশ হল শালা বেলুনের মতো। যত পেসার মারবে তত ফুলবে। ফুলতে ফুলতে একসময় ফটাস। ব্যস, তারপরই অ্যাকশন। নইলে শালারা নেতিয়ে চেয়ারে পড়ে থাকে। সেই ন্যাতা নিংড়ে জল ফেলে দিতে হয়।'

কথা শেষ করে 'খ্যাক খ্যাক' পরিচিত বিশ্রী হাসি দিল কাদু।

খড়কুটো আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে গোপীনাথ। বলে, 'ভাই কাদু, থানা পুলিশ জিনিসটা আমার কেমন সহ্য হয় না। ছোটোবেলা থেকেই হয় না।'

মুখ দিয়ে চুকচুক ধরনের আওয়াজ করে কাদু।

'টেনশনের সময় ফালতু কথা বলে চটিয়ে দিও না মাইরি। মনে রেকো যে-শালা একন থানা পুলিশের কতা শুনে চুপসে যাচ্চে, সেই শালার ওপর সন্দেহ পড়বে। সবাই ভাববে নিশ্চয় কোনো গোলমাল আচে। এই যে আমি রোজ একবার করে পুলিশের কাছে গিয়ে ধন্না মারচি সে কি এমনি এমনি?'

গালাগালি গায়ে মাখল না গোপীনাথ। সে বুঝতে পারল প্যাঁচ কঠিন মেরেছে কাদু। এই শয়তানই এর পর গ্রামে ছড়াবে মাস্টারের খুনি ধরবার কথা বলতে গোপীনাথ থানায় যেতে রাজি হয়নি। কেন হয়নি? ব্যাটার নিশ্চয় কোনো ঝামেলা আছে। কী ঝামেলা? ক-দিন ধরে কাদু নিজের অন্যরকম একটা ভাবভঙ্গি তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে। যেন ঝিলডাঙার ভালোর জন্য পাগল। চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়ার খুনিদের ধরা না পর্যন্ত কিছুতেই স্বস্তি পাবে না। মানুষ কি তার এই চেষ্টা বিশ্বাস করছে? কে জানে। মানুষের মন বোঝা কঠিন। সবাই না করুক, কেউ কেউ নিশ্চয় বিশ্বাস করছে।

গোপীনাথ মাথা নামিয়ে বলল, 'থানায় গিয়ে কী বলতে হবে?'

কাদু ফের বিশ্রী দাঁত বের করে হাসল।

'সবাই যা বলচে তাই বলবে। খুনিদের ধরতে হবে। শুধু ধরলে হবে না,

boierpathshala.blogspot.com

ধরে তুলে দিতে হবে ঝিলডাঙার মানুষের হাতে। তারা যেমন খুঁটিয়া মাস্টারকে পিটিয়ে মেরেছে, আমরাও তেমন ওদের পিটিয়ে মারব। বাজারের ওপর একটা ইস্টেজ বানানো হবে। পেটানোর কাজ সেখানেই হবে।'

গোপীনাথ কপালের ঘাম মুছে বলল, 'মারামারির কথাটা আমার বলা কি উচিত হবে কাদু? ডাক্তার মানুষ।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে কাদু বলল, 'কেন? উচিত হবে না কেন? তুমি কি বল খুনিগুলোকে ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে?'

'না, তা বলি না, তবে নিজেদের হাতে আইনকানুন তোলাটা ঠিক নয়।'

কাদু হিসহিসিয়ে ওঠে, 'রাকো তোমার আইন আর তোমার কানুন। ঝিলডাঙায় আমি-ই আইন। সাজা যদি কাউকে দিতে হয় সে আমি-ই দেব।' তারপর দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'ঠিক আচে তোমাকে কিছু বলতে হবে না, শুধু সঙ্গে থাকবে। থানায় তো আমি একাই যেতে পারি। পারি না? তবু তোমাদের সঙ্গে নিচ্চি, কেন জানো?'

গোপীনাথ মুখ তুলে তাকায়। সত্যি সে তেমন করে কিছু বুঝতে পারছে না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছে, এই শয়তান নতুন খেলায় নেমেছে। খেলাটা কী?

'নিচ্চি কারণ তোমরা যাতে বুঝতে পারো, কাদু ব্যাটা হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই। খুঁটিয়ার খুনিদের ধরবার জন্য সে চোটাচুটি কম করচে না। এত বড়ো একটা অন্যায়ের সে বিহিত চায়। থানা থেকে ফিরে এসে তুমি পাঁচজনকে কতাটা বলবে, সেই পাঁচজন আরও পাঁচজনকে বলবে। একসময় গোটা গ্রাম জানবে।'

চাপা গলায় হাসল কাদু। হাসির দমকে তার শরীর দুলে দুলে উঠল।

গোপীনাথ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। তার কাছে এবার ঘটনা কিছুটা স্পষ্ট হচ্ছে। কাদুর এত লাফঝাঁপের পিছনের আসল কারণ তাহলে লোক দেখানো? মাস্টারের নির্মম হত্যাকাণ্ড থেকে ফায়দা তুলতে চাইছে। এটাই স্বাভাবিক। এরকম একটা বিশ্রী লোকের কাছ থেকে অন্য কিছু আশা করাটাই বোকামি।

থানার বড়োবাবুর সঙ্গে কাদুর খাতিরের গল্প গোপীনাথ আগেই শুনেছিল। এবার একেবারে নিজের চোখে দেখল। কাদুর মোটরবাইক থানার গেটে থামতেই সেপাই সেলাম দিল। সে-ই জানাল, বড়োবাবু নেই। পরশু রাতে কেঁপে জ্বর হয়েছে। ডাক্তার সন্দেহ করছে, ম্যালেরিয়া। ডেঙ্গিও হতে পারে। লম্বা ছুটি নিয়ে বড়োবাবু কলকাতায় পালিয়েছে। তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই, থানায় মেজোবাবু আছে। এখন মেজোবাবুই দায়িত্বে।

কথাটা পছন্দ হল না কাদুর। এই সময় 'নিজের লোক' ছুটিতে চলে

boierpathshala.blogspot.com

যাওয়াটা ভালো না। বিড়বিড় করে বলল, 'ডাক্তার তোমাকে আজ না নিয়ে এলেই ভালো হত। মেজোবাবু লোকটা শুনেছি খচ্চর।'

খানিকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল গোপীনাথ। তাড়াতাড়ি বলল, 'তাহলে বরং আমি এই বাইরেই অপেক্ষা করি। তুমি ভেতর থেকে ঘুরে এসো।'

কাদু মুহূর্তখানেক ভাবল। তারপর বলল, 'না চল। তবে কতা বলবে না।'

কাদু বাইক রাখতে রাখতে সিপাইকে বলল, 'তোমাদের মেজোবাবু কী করছেন?'

সেপাই গলা নামিয়ে বলল, 'ডিউটি করছেন।'

কাদু ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী ডিউটি? জরুরি কিছু?'

সেপাই হাত দিয়ে থানার ভেতর পর্দা টানা ঘর দেখাল। গলা নামিয়ে বলল, 'এখন ভেতরে না যাওয়াই ভালো কাদুবাবু। অসুবিধা আছে।'

এই বারণ গ্রাহ্য করল না কাদু। মুখ দিয়ে ছোঃ ধরনের আওয়াজ করে বলল, 'পুলিশের ডিউটি আমার জানা আছে। নাক ডেকে ঘুমোনো।' যদিও এগিয়ে সামান্য পর্দা সরাতে দেখা গেল, মেজোবাবু সত্যি ডিউটি করছেন। একটা ডিউটি নয়, একসঙ্গে ডবল ডিউটি। টেবিলের ওপর গাদাখানেক ফাইলপত্র ছড়ানো। একবার করে পেন তুলে খস খস করে কাগজে আঁচড় দিচ্ছেন, একবার করে পাশে রাখা লাঠিটা তুলে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে থাকা চিমসে চেহারার একটা লোককে খানকতক ঘা বসাচ্ছেন। একইসঙ্গে থানার কাগজ পরীক্ষা এবং চোর পেটানো চলছে। রুলের গুঁতো খেলেও চিমসে লোকটা মেজোবাবুর চেয়ারের কাছাকাছিই দাঁড়িয়ে আছে। নজর রেখেছে পেটানোর ডিউটি পালনে মেজোবাবুকে যাতে বেগ পেতে না হয়। তবু মার অতি কঠিন জিনিস। মাঝে মধ্যেই 'বাপরে মারে' বলে ছিটকে ছিটকে সরে যেতে হচ্ছে। তখন মুখ না ফিরিয়েই মেজোবাবু হুংকার দিচ্ছেন, 'এদিকে সরে আয় হারামজাদা...আয় বলছি...উঠলে কিন্তু পাছা ফাটিয়ে দেব।' চিমসে লোক নির্লিপ্ত মুখে সরে আসছে এবং রুলের বাড়ি খেয়ে ছিটকে যাচ্ছে আবার।

মিনিট দুয়েক পরে মুখ তুলে কাদুকে দেখতে পেলেন মেজোবাবু। একগাল হেসে বললেন, 'এসো কাদু, এসো, ভেতরে এসো। আজ আবার কাকে সঙ্গে আনলে?'

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে খানিকটা কায়দা করেই কাদু বলল, 'আমাদের গ্রামের ডাক্তার। গোপীনাথ ডাক্তার।'

ডাক্তার শুনে মেজোবাবু যেন আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

boierpathshala.blogspot.com

'বাপরে, তুমি করছ কী কাদু! অ্যাঁ! ডাক্তার বদ্যি সব ধরে ধরে আনছ!'

কাদু ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হেসে বলল, 'কী করব বলুন স্যার? আপনারা তো বুঝতেই চাইচেন না মাস্টার খুনের ঘটনায় ঝিলডাঙা কতটা খেপে আছে। সবাইকে এনে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করচি। এবার ভাবচি, একদিন গ্রামসুদ্ধু সবাইকে একসঙ্গে এনে হাজির করব।'

কথাটা যে হুমকি বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। যে সামান্য কয়েক ধরনের মানুষ গালাগালি, অপমান এবং হুমকিতে প্রাণ খুলে হাসতে পারে তার মধ্যে পুলিশ অন্যতম। কাদুর হুমকিতে মেজোবাবুও জোরে হাসতে লাগলেন। গোপীনাথ আড়চোখে দেখল, পাশে দাঁড়ানো চিমসে চোরও হাসছে। খুবই আশ্চর্য! এত মার খাওয়ার পরও ব্যাটা হাসছে! দুনিয়াদারির কি এটাই নিয়ম? যার হাতে লাঠি সে হাসলে হাসো, সে কাঁদলে কাঁদো?

মেজোবাবু হাসি থামিয়ে বললেন, 'আরে কাদু, এত চটামটির কী আছে? তুমি আগে মাথা ঠান্ডা কর দেখি। নিন, ডাক্তারবাবু আপনিও বসুন।'

হাতের ইশারায় গোপীনাথকেও বসতে বলে কাদু নিজে বসল। মেজোবাবু পাশে দাঁড়নো চিমসেকে ধমক দিয়ে বলল, 'যা ভাগ শালা।'

লোকটা মিন্‌মিন করে বলল, 'একেবারে চলে যাব মেজোবাবু?'

মেজোবাবু এবার প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, 'চলে যাবি না তো কী করবি? আমার গলা ধরে ঝুলবি শুয়ার? কাল বিকেলের মধ্যে যদি চোরাই মাল থানায় এসে জমা না দিয়েছিস মজা টের পাবি।'

লোকটা পর্যায়ক্রমে মেজোবাবু, কাদু এবং গোপীনাথকে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম জানাতে জানাতে একরকম ছুট লাগাল।

'কী খাবে কাদু? চা বলি? ডাব চলবে? গরমে ডাব পেটের জন্য ভালো।'

কাদু পায়ের ওপর পা তুলে বলল, 'কিচ্ছু খাব না। এবার কাজের কথায় আসুন স্যার।'

মেজোবাবু চোখ নাচিয়ে হেসে বলল, 'সবই তো কাজের কথা ভাই। খাওয়া-পরা কাজের কথা নয়? কী ডাক্তার আপনি কী বলেন?'

গোপীনাথ কী বলবে বুঝতে পারছে না। গোটাটাই তার কাছে একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। কত তাড়াতাড়ি এই দুঃস্বপ্ন শেষ হয় এখন কেবল তার অপেক্ষা।

'স্যার, কেসটা কতদূর এগোল? পুলিশ তো কিচ্ছুই করচে না। এদিকে গ্রামে তো মুখ দেখাতে পারচি না।'

boierpathshala.blogspot.com

'আরে বাবা, এগোচ্ছে, এগোচ্ছে। খুনের কেস বলে কথা। তড়বড় করলেই বিপদ। কচ্ছপ আর খরগোশের গল্পটা মনে নেই তোমার? সেই যে ছুটতে গিয়ে খরগোশ বেচারির কী হাল হয়েছিল?'

কথাটা বলে চোখ নাচিয়ে হাসলেন মেজোবাবু। কাদু হাসল না। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'স্যার, গালগপ্প শোনবার জন্য এতদূর ছুটে আসিনি। ঝিলডাঙার মানুষ চায় এখনই খুনিদের ধরা হোক। পুলিশ নড়ে বসুক। আপনি বোধহয় জানেন না, বড়োবাবুর সঙ্গে ঘটনাটা নিয়ে আমার আলোচনা হয়েচে।'

'খুব জানি, বিলক্ষণ জানি। কাদুবাবু, আপনি তো জানেন খুনি হাতের মোয়া নয় যে পুলিশ খপ করে ধরে ঝপ করে কামড় বসাবে। ভুল কামড় দিলে দাঁত উপড়ে চলে আসবে।'

গোপীনাথ নড়েচড়ে বসল। 'আপনি আজ্ঞে' করে মেজোবাবু কি কাদুকে বিদ্রুপ করল? হতে পারে। মানুষটার কথাবার্তা কেমন যেন ঠেকছে।

কাদু সামান্য ঝুঁকে বলল, 'হারামিগুলোকে চেনা গেল?'

মেজোবাবু চোখ নাচিয়ে বললেন, 'খেপেছ? চেনা গেলে এখনও কি বাইরে ঘুরে বেড়াত? লকআপে হাড় ভেঙে গড়াগড়ি খেত।'

কাদু সোজা হয়ে বসে মুখ ব্যাঁকাল।

'এটা কেমন কতা হল স্যার? ধরতে না পারুন, লোকগুলো কে চিল এতদিনেও সেটাও বুঝতে পারলেন না! এ তো স্যার, পুলিশের বিরাট ফেলিওর।'

মেজোবাবু হাসলেন। বেঁটে রুল দিয়ে টেবিলের ওপর টোকা দিতে দিতে বললেন, 'ফেলিওর ইজ দ্য পিলার অব্ সাকসেস। মানে বোঝো কাদু? থাক বুঝে কাজ নেই। আমিও বুঝি না।' কথাটা বলেই মেজোবাবু চট করে গোপীনাথের দিকে মুখ ফেরালেন। একই টানে বললেন, 'আচ্ছা, ডাক্তারবাবু, খুঁটিয়া লোক কেমন ছিল?'

প্রশ্নের জন্য গোপীনাথ মোটেও প্রস্তুত ছিল না। সে ঘাবড়ে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

মেজোবাবু এবার কণ্ঠস্বর চট করে খানিকটা গম্ভীর করে বললেন, 'চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া লোক কেমন ছিল?'

গোপীনাথ আমতা আমতা করে। কাদু কিছু বলতে যায়। মেজোবাবু হাত তুলে তাকে থামিয়ে বললেন, 'তুমি চুপ করো কাদু, আমি ডাক্তারের কাছ থেকেই শুনতে চাইছি, মাস্টারের সঙ্গে গ্রামের কারও শত্রুতা ছিল? ঝগড়া?'

boierpathshala.blogspot.com

গোপীনাথ ঢোঁক গিলে বলে, 'না না, মানুষটা ভারি ভালো ছিল স্যার। কারও সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া তো দূরে কথা, ছেলেমেয়েদেরও বকাঝকা দিত না মোটে, ওরাও খুব পছন্দ করত।'

কাদু বিরক্ত দেখিয়ে বলল, 'আপনারা স্যার একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছেন। গ্রামে মাস্টারের যে কোনো শত্রু ছিল না, সে-কথা তো সবাই বলেছে।'

মেজোবাবু দ্রুত মুখ ফিরিয়ে কাদুর চোখের দিকে তাকাল। মুখের চেহারা যেন হঠাৎ করে বদলে গেছে মানুষটার। চোয়াল কঠিন। কে বলবে, এই মানুষটাই কাদুর হুমকি খেয়ে খানিক আগে ওই চোয়ালে হাসছিল?

'সবাই বললেই বিশ্বাস করতে হবে এমন কথা কে ঠিক করে দিল কাদু? শত্রু কেউ তো ছিলই। এমনি এমনি দলবেঁধে একটা মানুষকে পিটিয়ে মারবে কেন?'

মেজোবাবুর কঠিন মুখ কাদুকে যেমন থমকে দিল, গোপীনাথকে যেন ভরসা দিল। কাদু তাকে কথা বলতে বারণ করেছে ভুলে গিয়েই সে বলল, 'টাকা পয়সা নেই, জমিজিরেত নেই, স্কুল নিয়ে পড়ে থাকত... শহর থেকে সামান্য যে কয়েকটা টাকা বেতন আসে...তার আবার শত্রু হবে কেমন করে?'

'শত্রু কি শুধু টাকা-পয়সায় হয়? পুরোনো কোনো ঝগড়া থাকতে পারে, নতুন কোনো ঝগড়া হতে পারে। পারে না?'

মেজোবাবুর এই হঠাৎ আচরণ পরিবর্তনে কাদু সম্ভবত থমকে গেছে। পুলিশ তাকে ধমক দিল! তাও আবার গোপীনাথের সামনে। সে মুখে কিছু বলছে না, শুধু চোখ সরু করে তাকিয়ে রইল।

মেজোবাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'একটা কথা জেনে রাখুন ডাক্তারবাবু, কিছু একটা যে ছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু কিছু একটা নয়, চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া মার্ডারের কোনো যোগসূত্র আপনাদের ওই ঝিলডাঙাতেই লুকিয়ে আছে।'

কাদু আর চুপ করে থাকতে পারল না। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'মানে!'

মেজোবাবু মুখ ঘুরিয়ে কাদুর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বললেন, 'মানে খুব সহজ। খুনি বাইরে থেকে এসেছে না তাদের বাইরে থেকে আনা হয়েছে এটা আগে তদন্ত করে দেখতে হবে।'

গোপীনাথ চমকে উঠল। লোকটা বলে কী! কাদু নিজের চোয়ালে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'আপনি স্যার কী বলচেন! ঝিলডাঙারই কেউ কাজটা করেছে?'

boierpathshala.blogspot.com

'করেছে তো বলিনি। তবে করেনি তা-ও বলিনি। তুমি শুনে খুশি হবে কলকাতায় যাওয়ার আগে বড়োবাবু কেসটার দায়িত্ব আমাকে দিয়ে গেছে। কাল থেকে কাজ শুরু করব।'

কাদু চিবিয়ে বলল, 'কী কাজ শুরু করবেন।'

মেজোবাবু যেন দ্রুত পুরোনো চেহারায় ফিরে এলেন। কঠিন চোয়াল নরম হল। কণ্ঠস্বরে হাসি মাখানো।

'পুলিশের কাজ কি আগাম বলে দেওয়াটা ঠিক হবে? তবে তোমার ব্যাপার আলাদা, তুমি তো পুলিশের কাছের লোক, যদি জানতে চাও বলতে আপত্তি নেই।'

কাদু চিন্তিত মুখে হাত তুলে বলল, 'থাক থাক আমি কিচু জানতে চাই না। কিন্তু একটা কতা স্যার, তদন্তের নামে ঝিলডাঙার লোককে থানায় তুলে এনে প্যাঁদানো চলবে না। এর মধ্যেই পুলিশ লোকের ঘরে-মরে ঢুকে ছানবিন করেছে, এটা কিন্তু ঠিক না। রাতবিরেতে মেয়েছেলে ঘরে থাকে। তাদের মানইজ্জত আছে।'

'ঠিক না মানে, খুবই অন্যায়। ভীষণ অন্যায়। আমি ওসব পুলিশি ছ্যাঁচড়ামো বন্ধ করে দেব। পুলিশ হয়ে পুলিশি ছ্যাঁচড়ামি বন্ধ করা সহজ। তার আগে একটা লোককে খুঁজে বের করি।'

গোপীনাথ অস্ফুটে বলল, 'কাকে?'

মেজোবাবু চোখ নাচিয়ে মিটিমিটি হেসে বললেন, 'কেন ওই লোকটাকে।'

কাদু থমথমে মুখে বলল, 'কোন্ লোকটাকে?'

'ওই যে, ওই লোকটা, যে খুনিগুলোকে অন্ধকারে পথ দেখিয়ে স্কুলবাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল।' ফের চোখ নাচালেন মেজোবাবু। যেন 'ওই লোক'কে ধরা মানুষটার কাছে মজার কোনো খেলা হবে। 'লোকটাকে ধরলেই সবকিছু ফর্সা হয়ে যাবে। তুমি এখন এসো কাদু। চিন্তা করো না, খুনি ধরা পড়বে। ঝিলডাঙার সবাইকে কথাটা বলো। একটা ভালোমানুষ পিটুনি খেয়ে মরবে এটা ঠিক না। বল এটা ঠিক?' এবার গোপীনাথের দিকে তাকিয়ে মেজোবাবু বললেন, 'ডাক্তারবাবু, আপনার কাছে একদিন যাব। ভোররাতের দিকে হাঁটু দুটোতে কেমন শিরশিরানি দেয়। বেলা পর্যন্ত চলতে থাকে। মাস তিন হল সমস্যাটা শুরু হয়েছে। অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কোবরেজ অনেক কিছু করলাম। কাজ কিছু হল না। ভাবছি, এবার টোটকা করে দেখব।'

মেজোবাবু লোকটাকে গোপীনাথের প্রথমদিকে অপছন্দ হচ্ছিল, ভয় ভয়ও

boierpathshala.blogspot.com

করছিল। এখন অন্যরকম লাগছে। ভালো লাগছে। কেন জানি মনে হচ্ছে, গোড়ায় হম্বিতম্বি দেখালেও লোকটাকে কাদু ভয় পেয়েছে। কেন ভয় পেয়েছে? যে-কারণেই পাক, শয়তান ভয় পেলে ভালো লাগে। মেজোবাবুর দিকে তাকিয়ে একমুখ হেসে বলল, 'আসেন ভাই, টোটকায় ব্যথা কমানোর সহজ চিকিচ্ছে আছে।'

কাদু মোটরবাইক চালায় ঝড়ের বেগে। আসার সময় গোপীনাথ প্রাণ হাতে করে বসেছিল। এখন গাড়ি যেন গড়াতেই চাইছে না। গোটা পথটাই ঢিমেতালে নিয়ে এল কাদু। বোঝা গেল গাড়ি চালাতে চালাতে সে গুরুতর কিছু চিন্তা করছে। ঝিলডাঙার মুখেই গাড়ি থামিয়ে বলল, 'তুমি এখানেই নেমে যাও ডাক্তার। আমার কাজ আছে। আর শোনো, এই থানায় যাওয়ার গল্প কাউকে করতে যেও না।'

গোপীনাথ অবাক হয়ে বলল, 'যাওয়ার আগে তুমিই তো বলেছিলে সবাইকে বলতে!'

কাদু মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'যা বলেচিলাম বলেচিলাম, এখন অন্য কথা বলচি। বেশি বোকো না তো।'

কাদুর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বাঁচল গোপীনাথ। তা ছাড়া গ্রামের মধ্যে কাদুর গাড়ি চেপে এত যাতায়াত ভালো দেখায় না। যতই মাস্টারের খুন নিয়ে হইচই করুক, লোকটা যে খারাপ সে-কথা সবাই জানে।

বাইকে ফের লাথি মেরে স্টার্ট দেওয়ার আগে কাদু বিড়বিড় করে বলল, 'শালা, বেশি মাতব্বর হয়েছে। বেশি মাতব্বর। থানায় বসে আমায় ধমকি দেয়।'

গোপীনাথ বাতাসে-এলোমেলো-হয়ে-যাওয়া পাঞ্জাবি ঠিকঠাক করতে করতে বলে, 'কার কথা বলছ কাদু?'

চাপা গলায় হিসহিসিয়ে ওঠে কাদু।

'কার আবার? শুনলে না হারামজাদার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। লোক ধরার নামে ওই মেজোবাবু যদি ঝিলডাঙায় কোনো ঝামেলা করে ওর ইয়ে আমি মাথায় তুলে চাড়ব।'

বিশুকে দোকান দেখতে বলে বেরিয়েছে গোপীনাথ। দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে হাসল। বড়োমুখ করে থানার নিয়ে গিয়ে হেঁটমাথায় ফিরতে হল কাদু হারামজাদাকে। মেজোবাবু মানুষটা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল তেণ্ডাই মেণ্ডাই করে লাভ হবে না। না, এখনও সবাই নষ্ট হয়ে যায়নি।এখনও আশা আছে।

boierpathshala.blogspot.com

দোকানে পৌঁছে গোপীনাথ দেখল, মালতী দাঁড়িয়ে আছে। জড়োসড়ো ভঙ্গি। মুখ শুকনো। কী হল? নিশ্চয় ফুলের শরীর খারাপ। তাই হবে। মেয়েটা বড্ড ভোগে।

'কী হল? ফুলের শরীর আবার খারাপ নাকি?'

মালতী নীচু গলায় বলল, 'না, ফুল নয়, ফুলের বাবা।'

গোপীনাথ ভুরু কুঁচকে বলল, 'নিতাই! কী হয়েছে?'

'জ্বর। গা মাথা পুড়ে যায়।'

'ও, আমি ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি, এখনই গিয়ে দুটো বড়ি একসঙ্গে খাইয়ে দে।'

'আপনে একবার বাড়ি চলেন।'

গোপীনাথ বিরক্ত গলায় বলল, 'আমি গিয়ে কী করব? শরীর থাকলে জ্বরজারি তো হবেই মালতী। ওষুধ দিচ্ছি ঠিক হয়ে যাবে।'

মালতী ফিসফিস করে বলে, 'আপনি একবার চলেন। ফুলের বাবায় আপনেরে কী বলতে চায়। জরুরি কথা।'

'জরুরি কথা বলতে চায়!'

বিকেলের পর গোপীনাথ নিতাইয়ের বাড়িতে গেল। বড়ি খেয়ে নিতাইয়ের জ্বর গেছে, তবে শরীর খুবই দুর্বল। মাথা তুলতে কষ্ট হচ্ছে। আধশোয়া অবস্থাতেই সে গোপীনাথকে 'জরুরি কথা' বলল।

সেই কথা শুনে শিরদাঁড়া দিয়ে হিমস্রোত বয়ে গেল গোপী ডাক্তারের।

boierpathshala.blogspot.com

বত্রিশ

'তুমি সেই সময় কোথায় গিয়েছিলে নেতাই?'

'বাড়ুইদের বাড়ি।'

গোপীনাথ ভুরু কুঁচকে বলল, 'অত রাতে বাড়ুইদের বাড়ি! কেন?'

'ওদের ছাউনির কাজ হবে গোপীদা, গোয়ালের ছাউনি। খড়-বাঁশের কাজ। কত্তা সকালে খবর দিল, আমি বললাম এখনই যাব? বললে, না, এখন নয় আমি বানেরহাটে যাচ্ছি, ফিরতে রাত হয়ে যাবে। তুই তখন আয়। আমি বললাম, তাহলে কাল সকালেই যাই? বললে, না, আজই আয়। দেখেশুনে খরচাপাতি বলে যা।'

কথা থামিয়ে নিতাই হাঁপাতে লাগল। নিতাইয়ের একনাগাড়ে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট হওয়ারই কথা। তার গায়ে জ্বর। খুব না হলেও গা বেশ গরম। চোখ দুটো লাল হয়ে আছে। ঘন ঘন গলা শুকিয়ে আসছে। মালতী কাঁসার গ্লাসে জল ভরে তক্তাপোশের পাশে রেখেছে। নিতাই হাত বাড়িয়ে সেই গ্লাস তুলে মাঝেমধ্যে চুমুক দিচ্ছে। জল খেয়ে যত না আরাম হচ্ছে, তার থেকে কষ্ট হচ্ছে বেশি। গোপীনাথ মালতীর সঙ্গেই এসেছে। নিতাই প্রথমেই 'জরুরি কথা' বলতে যায়। গোপীনাথ হাত দেখিয়ে বলে, 'কথা পরে শুনব, আগে তোমার অসুখ দেখি। গা যে গরম!' বেশ কিছুটা সময় ধরে নাড়ি ধরে, পেট টিপে, চোখ, জিভ টেনেটুনে পরীক্ষা চালায় গোপীনাথ। তবে বড়ো কোনো রোগ খুঁজে পায় না।

'ঝামেলার কিছু হয়েছে বলে তো মনে হয় না। মনে হচ্ছে দিন কয়েক শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

মালতী পাশেই থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে আছে। স্বামীর 'ঝামেলার কিছু হয়নি'

boierpathshala.blogspot.com

শুনে তার চোখে মুখে যে-স্বস্তির ছাপ আশা করা যায়, তার একটুও পাওয়া গেল না। সে আগের মতেই থমথমে মুখে রইল।

গোপীনাথ সামান্য হেসে বলল, 'বললাম তো ভয়ের কিছু নেই। পেটে ব্যথাবেদনা থাকলে চিন্তার ছিল।'

মালতী বিড়বিড় করে বলল, 'আপনি ওর কথাটা আগে শোনেন গোপীদা।' তারপর ঝুঁকে পড়ে নিতাইকে বলে, 'নাও বলো, বলো কী দেখেছ সেদিন। গোপীদাকে সব বলো। গোপীদা তো বাইরের কেউ নয়, আমাদের ঘরের লোক।'

নিতাই লাল চোখ খুলে স্ত্রীকে বলল, 'তুমি দরজাটা ভেজিয়ে দাও।'

মালতী বলল, 'আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। তুমি কথা বলো।'

গোপীনাথ কৌতূহলে হাসলেন।

'কী এমন জরুরি কথা নিতাই, যে একেবারে দরজা আটকে বলতে হবে!'

নিতাই বাঁ হাত দিয়ে গোপীনাথের হাত ধরল। কাঁপা গলায় বলল, 'আমাকে বাঁচাও গোপীদা।'

'আরে, কী হয়েছে বলবে তো।'

এরপরই ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে ভয়ংকর ঘটনার বর্ণনা দিল নিতাই। প্রথমে হালকা পলকা ভাবে শুনতে শুরু করলেও ধীরে ধীরে গোপীনাথের চোখ স্থির হয়ে যায়। তক্তাপোশের একপাশে বসা শরীর টানটান। শেষে শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বইতে শুরু করে। তক্তাপোশের একপাশ চেপে ধরে নিজেকে সামলাতে থাকে সে।

এসব কী বলছে নিতাই!

বাড়ুইদের ভাঙা গোয়াল সরেজমিনে দেখে সেদিন রাতে কাটাখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে আসছিল নিতাই। ওই পথে বাড়ি ফিরলে তার মিনিট চার-পাঁচ শর্টকাট হয়। সে অবশ্য বাড়ি ফিরছিল না, যাচ্ছিল বাজারে। ইচ্ছে ছিল একেবারে 'দু-পাত্তর' খেয়ে ফিরবে। ফুলের শরীর খারাপ হওয়ার পর থেকে মদের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। তবে একেবারে না খেলে চলে না। সারাদিন খাটাখাটনির পর শরীরটা ম্যাজম্যাজ করে। মিস্ত্রিমজুরের কাজ বলে কথা। দ্রুতই পা চালচ্ছিল নিতাই। রাস্তা ছেড়ে ঘোষদের পুকুর ধারটা ধরল। কয়েক পা এগোলেই খুঁটিয়া মাস্টারের স্কুল। সেখানে এখন আবার পাকা ঘর হচ্ছে। ছেলেমেয়েদের বাথরুম। এও একটা মজার ব্যাপার। মাস্টার এই সামান্য জিনিসটার জন্য গাঁয়ে একেবারে হই-হই ফেলে দিয়েছিল। সইসাবুদ করিয়ে

boierpathshala.blogspot.com

একশা কাণ্ড। প্রথম প্রথম ঝিলডাঙার মানুষ হাসাহাসি করত। বলত, মাস্টারের পাগলামি। পরে বুঝে সবাই খুশি হয়েছিল। শুধু খুশি হয়নি, মানুষটার জন্য শ্রদ্ধা ভক্তিও বেড়েছে। যতই ছোটো হোক, গাঁয়ের মেয়েদের মানমর্যাদার কথা যে মানুষটা এত গুরুত্ব দিয়ে ভাবে সে কম কিছু নয়। তাকে চোখ বুজে ভরসা করা যায়। পাড়াগাঁয়ে এমন মানুষ পাওয়া কঠিন। মেয়েদের আব্রু নিয়ে হই-চই পাকানো বড়ো মনের কথা।

নিতাই ঠিক করল, স্কুলের সামনেটা দিয়ে যাওয়ার সময় চট করে একবার ঢুঁ মেরে যাবে। দেখবে কাজ কতটা এগোল। বাইরে থেকে মিস্ত্রিমজুর এসেছে। সরকারি কাজ। গাঁয়ের লোক দিয়ে করা মুশকিল। সরকারি লোকই করে। তারা কাজও জানে ভালো। অন্য কিছু হলে নিশ্চয় সে ডাক পেত।

কয়েক পা এগোতেই ঝটাপটির আওয়াজ শুনতে পায় নিতাই। সেইসঙ্গে চাপা চিৎকার। আর্তনাদের মতো! যেন গোঙানি! জোরে পা চালায় নিতাই। পুকুরপাড়ের বাঁকটা ঘুরতেই অন্ধকারেও চোখের সামনে ভয়ংকর দৃশ্য স্পষ্ট হল—

স্কুলের চাতালে উপুড় করে ফেলে ক-টা লোক কাউকে যেন লাঠি, রড দিয়ে পেটায়! লোকগুলো সংখ্যায় বেশি নয়, বড়োজোর চার কী পাঁচ হবে। ছুটে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায় নিতাই। কোথায় যাবে? খালি হাতে কাকে আটকাবে? সে বড়ো একটা পাকুড় গাছের আড়ালে, অন্ধকারে মিশে যায়। গুণ্ডাগুলোর মুখ দেখা যাচ্ছে না। অচেনাই মনে হচ্ছে। ঝিলডাঙার কেউ নয়। মাটিতে-পড়ে-থাকা মানুষটা ছটফট করছে আর কাতরাচ্ছে। দমবন্ধ করে থাকে নিতাই। বুঝতে বাকি থাকে না, কোনোরকম সাড়াশব্দ পেলে গুণ্ডাগুলো তাকে ছাড়বে না। কারা এরা? কেন মারছে? খুব বেশি হলে তিন কী চার মিনিট ধরে লাগাতার পেটানি চলতে থাকে। হঠাৎ উলটোদিকে আওয়াজ! নিতাই মুখ ঘুরিয়ে দেখতে পায়, কঞ্চির গেট খুলে ছুটে আসে চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া। কাটাখালি স্কুলের মাস্টার। অন্ধকারেই তাকে স্পষ্ট চিনতে পারে নিতাই। হাতে ছাতা। ঝড়বৃষ্টি থাকুক না থাকুক খুঁটিয়া মাস্টার সবসময় হাতে ছাতা রাখে। এটা বোধহয় মাস্টারদের নিয়ম। দূর থেকেই মাস্টার চিৎকার করে ওঠে।

'মারছ কেন? তোমরা কে? ওকে মারছ কেন? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও...।'

দুজন লোক ঘুরে দাঁড়ায়। নিতাই দেখে তাদের মুখ বাঁধা কাপড়ে। একজন এগিয়ে এসে হাতে-ধরে-থাকা রডটা তুলে চালায় মাস্টারকে লক্ষ করে। প্রথম

boierpathshala.blogspot.com

বাড়িটা লাগে কাঁধে। মাস্টার ছিটকে পড়ে মাটিতে। পরের ঘা-গুলো সবকটাই মাথায় পড়তে থাকে। কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। 'আঃ' ধরনের তীক্ষ্ণ আতর্নাদ করে মাস্টার চুপ মেরে যায়। নিথর হয়ে শুয়ে থাকে চাতালে। গুণ্ডাগুলোর একটা চাপা গলায় বলে ওঠে, 'যা শালা, মরল নাকি?'

এরপরে আর একমুহূর্তও দেরি করেনি লোকগুলো। ছুটে বেরিয়ে আসে স্কুলচত্বরের বাইরে। মোটরবাইক অন্ধকারে রাখা ছিল। ঝোপের আড়ালে শোয়ানো ছিল। নিতাইয়ের চোখে পড়েনি এতক্ষণ। স্টার্ট দিয়ে সেগুলো ছুট দেওয়ার সময় সে স্পষ্ট দেখতে পায়, একটা গাড়ি চালাচ্ছে শোল। কাদুর চ্যালা। সামনের মোটরবাইক মুখ ঘোরানোর সময় হেডলাইটের আলো তার মুখে পড়ে।

কালো কাপড়ের টুকরোটা তখন শোলের মুখ থেকে নেমে গলায় ঝুলে পড়েছে।

কখন কীভাবে যে বাড়ি ফিরেছে সে-কথা মনে নেই নিতাইয়ের। রাতেই কেঁপে জ্বর এল। শেষ রাতে প্রায় বেহুঁশ অবস্থা। মালতীকে ঘুম থেকে তুলে ঘটনা বলে। দুজনে সারাটা রাত জেগে পার করে।

মাস্টার মরে গেছে আর বাথরুম বানানোর এক মিস্ত্রির মরমর অবস্থার খবর আসতে পরদিন বেলা গড়িয়ে যায়। ক-টা দিন দিশেহারা অবস্থায় কাটিয়েছে নিতাই আর মালতী। আজ সকালে মালতীই তাকে বলে, 'তুমি গোপীডাক্তারকে সব বলো। '

নিতাই বলে, 'কীভাবে বলব, আমি তো বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারছি না।'

এই কারণেই মালতী গোপীনাথকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে।

এতক্ষণে গোপীনাথ বুঝতে পারে, শরীরের কারণে নয়, নিতাইয়ের জ্বর এসেছে আতঙ্কে। চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়ার খুনের দিন সে যা দেখেছে তা যদি সত্যি হয় তাতে আতঙ্কে জ্বর আসার ঘটনায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই খুনের পিছনে তাহলে কাদু!

'কী করব ডাক্তার?' কাতর গলায় নিতাই জানতে চায়।

মাথা নামিয়ে বসেছিল গোপীনাথ। সেই অবস্থাতেই বলে, 'কী করতে চাও?'

'সেইটাই তো বুঝি না। প্রথমে মনে হয়েছিল, মরতে কেন ওই পথ ধরেছিলাম। এখন অন্য কথা মনে হয়।'

গোপীনাথ মুখ তুলে ফিসফিস করে বলে, 'কী মনে হয়?'

'অমন ভালোমানুষটাকে কাদুর লোকগুলো মেরে দিলে, এর একটা বিহিত

boierpathshala.blogspot.com

হবে না? ঝিলডাঙার মাস্টারের মতো মানুষ আর পাওয়া যাবে?'

গোপীনাথ চিন্তিত গলায় বলে, 'কাদুর লোক বলছ কেন নিতাই, বল কাদু। কাদুর হুকুম ছাড়া ওই শয়তানগুলো এ-কাজ করতে পারত? কিন্তু কেন মারল? খুনেগুলো বাইরের। ওই শোল-ই পথ চিনিয়ে এনেছিল।'

'ইস, কীভাবে যে রড চালাচ্ছিল!'

কথাটা বলতে গিয়ে হাত তুলে নিজের চোখ দুটো চাপা দিল নিতাই। যেন সেই দৃশ্য আর মনে করতে চায় না। তবু ফিরে আসছে।

মালতী দরজার পাশ থেকে এগিয়ে এসে ফোঁপানো গলায় বলে, 'দেখেন তো গোপীদা, ক-দিন ধরে শুধু বলছে, আমি কেন আটকাতে গেলাম না? এটা কোনো কতা হল? খুনিগুলো কি ফুলের বাবারে ছাড়ত?'

গোপীনাথ খানিকটা ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করল। বলল, 'যা করেছ ঠিক করেছ নিতাই। আটকাতে গেলে তোমাকেও মরতে হত। পেটে বাচ্চা নিয়ে বউ বিধবা হত।'

নিতাই বিড়বিড় করে বলত, 'তাহলেও তো মনে হত, মানুষটারে বাঁচানোর একটা চেষ্টা করেছিলাম।'

শুকনো হাসল গোপীনাথ।

'মরে গেলে আর ভাবতে কি? মরা মানুষের ভাবাভাবি থাকে না।'

মালতী শাড়ির আঁচল তুলে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'এই কতাটা ওরে একটু বুঝিয়ে বলেন। আমার শরীরের এই অবস্থা। এই সময় যদি একটা কিছু ঘটনা ঘটে যেত...।'

কথা শেষ না করে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ডুকরে উঠল মালতী।

'শুধু আটকাতে গেলে মারত না, যদি জানতে পারত ঘটনা তুমি দেখেছ তাহলেও মারত। কাদু এই ঘটনার সাক্ষী রাখত না।'

নিতাই বলল, 'ওরা মাস্টারকে কেন মারল ডাক্তার? অমন ভালো লোকটাকে...আহা রে... সেদিনও কথা হল। বলল, বুঝলে নিতাই, তোমার মেয়েটার মাতায় খুব বুদ্ধি। ভালো করে লেখাপড়া শেখাও...। স্কুলে যখন অসুস্থ হয়ে পড়ল...কতবার খোঁজখবর নিল...বলল, দরকার হলে বাড়িতে গিয়ে পড়িয়ে আসব...।'

নিতাইয়ের বিলাপ থামলে গোপীনাথ অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'কেন মারল বুঝতে পারছি না রে নেতাই, তবে মরার পর কাদু কেন এত লাফঝাঁপ শুরু করেছে বুঝতে পেরেছি।'

boierpathshala.blogspot.com

নিতাই বলল, 'কেন?'

'ও নিজেকে লুকোতে চাইছে। সেই কারণেই মরা মাস্টারের জন্য এত দরদ দেখায়। হারামজাদা খুন করে নিজেই থানায় ছুটছে খুনি ধরতে। ঝিলডাঙার লোককে সাক্ষী মানছে। আমাকেও আজ থানায় নিয়ে গিয়েছিল।'

মালতীর পেট আরও বড়ো হয়েছে। ভেতরের মানুষটা মাঝেমধ্যে নিজের অস্তিত্ব জানান দেয়। ব্যথা লাগে। আজ সকাল থেকে যেন বেশি নড়াচড়া করছে। কষ্টও হচ্ছে। কিন্তু এখন পেটের সন্তান নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই। তার থেকেও বড়ো চিন্তার ঘটনা ঘটছে। শরীরে অস্বস্তি সামলে সে বলল, 'তাই নাকি!'

গোপীনাথ মাথা চুলকে বলল, 'হ্যাঁ। আজ আমিও ওর সঙ্গে থানায় গিয়েছিলাম। তবে বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। উলটে মেজোবাবুর ধমক খেল হারামজাদা।'

'কাদু থানায় ধমক খেল!'

নিতাই ডাক্তারের কথাটা যেন বিশ্বাসই করতে চাইল না।

'শুধু ধমক নয়, আরও ব্যাপার আছে। মেজোবাবু লোকটাকে মনে হল ভালো। উনি যেন কিছু সন্দেহ করছেন।'

নিতাই উত্তেজনায় নিজের অসুখের কথা ভুলে উঠে বসতে গেল।

'সন্দেহ! কী সন্দেহ করছে?'

দরজা ভেজানো, তবু গোপীনাথ একবার পিছন ফিরে দরজার দিকে দেখে নিল। তারপর বলল, 'সন্দেহ করছে, মাস্টারের খুনি বাইরের লোক হলে কী হবে, তাকে নিশ্চয় কেউ পথ দেখিয়ে এনেছিল। তাকে খুঁজে বের করতে চায়।'

নিতাইয়ের শরীর কেঁপে উঠল, 'বল কী ডাক্তার!'

'ঠিকই বলি। গাঁয়ে খোঁজখবর করতে পুলিশ আসবে।'

'আমি বলে দেব?' চোয়াল কঠিন করে বলল নিতাই।

নিতাইয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় ধমক দিল গোপীনাথ।

'খবরদার নেতাই। এই কাজটা করতে যেও না। কাদুকে তুমি চেনো না? ওই লোক পারে না, এমন কোনো কাজ নেই। ও যদি জানতে পারে তুমি সব দেখেছ, সব জানো, মহাবিপদ হবে।'

মালতী মিনতি করা গলায় বলে ওঠে, 'আপনে বিপদটা বুঝিয়ে বলে যান গোপীদা। ঝিলডাঙায় আপনে ছাড়া ওকে ঠিক পরামর্শ দেওয়ার আর কে আছে? আমার শরীরের এই অবস্থা, মেয়েটার অসুখ তার মধ্যে ওর মাথার এই পাগলামি

boierpathshala.blogspot.com

চেপেছে।'

গোপীনাথ মাথা নেড়ে বলে, 'পুলিশ তো দূরের কথা, সেদিনকার ঘটনা তোমাকে একেবারে ভুলে যেতে হবে। তুমি কিছুই দ্যাখোনি।'

'এত বড়ো একটা অন্যায় ঠিক হবে ডাক্তার?'

'না ঠিক হবে না। তাও তোমায় করতে হবে। তুমি কি মনে করছ, পুলিশ কাদুর কিছু করতে পারবে? কিছুই পারবে না। আজ থানার মেজোবাবু ধমক দিয়েছে মানে এই নয় রোজ ধমক দিতে পারবে। থানার বড়োবাবুর সঙ্গে শয়তানটার খাতির খুব। হারামজাদার হাত কত বড়ো তুমি আমি জানি না! সদানন্দর ছেলের বউটাকে পর্যন্ত...থাক সে-কথা।'

মালতী চোখের জল মুছে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'শুনলে তো? শুনলে তো কতাটা? সেদিন থেকে বলছি, ওই লোককে ধরতে পারে এমন কারও ক্ষমতা নেই।'

গোপীনাথ বিড়বিড় করে বলল, 'আমার আরও একটা ভয় করছে।'

'ভয়!'

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে, কাদু এই খুনের মামলায় ঝিলডাঙার আর কাউকে না জড়িয়ে দেয়।'

'আর কাউকে জড়াবে মানে! নিজে খুন করল, জড়াবে অন্য কাউকে? এটা মগের মুলুক নাকি।'

গোপীনাথ শুকনো হেসে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'মগের মুলুক না হোক, কাদুদের মুলুক তো বটেই। নিজে অপরাধ করে পার পেতে হলে অন্যকে তো ফাঁসাতেই হবে। খারাপ লোকের হাতে ক্ষমতা থাকলে সব হয়। কাদুর ক্ষমতা আছে। এটাই চিন্তার।'

'তুমি আমায় তাহলে চুপ করে থাকতেই বল?'

গোপীনাথ এবার খানিকটা বিরক্ত গলায় বলল, 'মেয়েকে নিয়ে কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই তোমার, নইলে বলতাম ঝিলডাঙা ছেড়ে চলে যাও। এখনও যখন নিজের বিপদ বুঝতে পারছ না, তখন তুমি যে একটা কেলেঙ্কারি বাধাবে সেটা বুঝতে পারছি। সেদিনের ঘটনা আমাকে বললে তার একটা মানে বুঝি, আর কাউকে যে বলবে না তার কি গ্যারান্টি?'

ডাক্তারের ধমক খেয়ে নিতাই থম মেরে থাকে। সে একটু হালকা বোধ করছে। এই ক-টা দিন সত্যি সে কঠিন সংশয়ের মধ্যে ছিল। মানুষ খুনের দৃশ্য জীবনে এই প্রথম দেখল সে। তার ওপর একেবারে খুঁটিয়া মাস্টারের খুন।

boierpathshala.blogspot.com

প্রাথমিক আতঙ্কটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মনের ভেতরের অশান্তিটাও সামলাতে পারছিল না। একটা অদ্ভুত ধরনের পাপবোধে ভুগছিল। তার মতো সাধারণ গরিবগুব্বো মানুষের এসব চিন্তা মানায় না। তবু কেন যেন মনের মধ্যে পাক মারছিল সবসময়। কে জানে মাঝেমধ্যে দুনিয়ায় বোধহয় এরকমই হয়। যাকে যেটা মানায় না তার ভেতরে সেই জিনিসটাই বেশি করে বাসা বাঁধে। মনে হচ্ছিল, ঝিলডাঙার সবাইকে ডেকে বলে দেওয়া উচিত, চিত্তরঞ্জন মাস্টারের মতো ভালো মানুষটাকে যে খুন করেছে আমি তাকে দেখেছি, আমি তাকে চিনি। এখন যেন খানিকটা বুঝতে পারছে, এসব বোকার মতো কাজ হবে। মারাত্মক বোকার মতো কাজ। গোপী ডাক্তার ঠিকই বলছে, এর থেকে ভিটেমাটি ফেলে পালিয়ে যাওয়া ভালো। সে উপায় যখন নেই, ঝিলডাঙাতেই যখন পড়ে থাকতে হবে, চুপ করে থাকাটাই একমাত্র বাঁচার পথ। অন্যায় হলেও বাঁচতে তো হবে।

গোপীনাথ শান্ত গলায় বলল, 'আমার কথাটা বুঝতে পারছ নেতাই?'

নিতাই বলল, 'বুঝতে পারছি না, তবে বুঝতে যে হবে এটা মানছি।'

গোপীনাথ খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'এতেই হবে। মুখে কুলুপ মারো। আমিও কি চাই না খুনিগুলো ধরা পড়ুক? কাদু আর তার দলবলের সাজা হোক? অবশ্যই চাই। তাতে আর কিছু না হোক, মাস্টারের আত্মার শান্তি হবে। কিন্তু চাইলেই তো সব হয় না। যারা চাইলে সব হয়, আমরা সে-দলে পড়ি না নেতাই। আমি তোমাকে এইটুকু কথা দিচ্ছি, কিছু না পারি, অন্তত নিরপরাধ কাউকে যাতে কাদু ফাঁসিয়ে দিতে না পারে সেই চেষ্টা করব।'

'কীভাবে?'

'কীভাবে জানি না, কিন্তু চেষ্টা করব। যাক, তুমি এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে এখন নিজের অসুখটা সারাও দেখি। বড়ি দিয়ে গেলাম, এখনই দুটো খেয়ে নাও। এ-বেলাতেই জ্বর ছেড়ে যাবে।'

সত্যি সত্যি বিকেলে জ্বর ছেড়ে গেল নিতাইয়ের, তবে মাথাটা ভার। শরীর দুর্বল। স্বামীকে উঠে বসতে দেখে যত না খুশি হল মালতী, তার থেকে বেশি খুশি হল ঘাড় থেকে মাস্টারের খুনি ধরিয়ে দেবার ভূত ছেড়ে যেতে দেখে। সন্ধের মুখে নিতাই বলল, 'খিদে পায়।' একবাটি তেল মুড়ি এনে দিল মালতী। দাওয়ায় সেই মুড়ির বাটি নিয়ে বসল নিতাই। খিদে থাকলেও বেশি খেতে পারছে না। মুখ বিস্বাদ লাগে। ফুলকে কাছে ডেকে বলল, 'মা, তুই এক গাল খা।'

ফুল ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'মুড়ি খেতে ভালো লাগে না।'

boierpathshala.blogspot.com

নিতাই মজা পেয়ে বলল, 'সে আবার কী! গরিবের মেয়ে মুড়ি খেতে ভালো লাগে না তো কী খেতে ভালো লাগে?'

ফুল সুন্দর হেসে বলল, 'জানি না।'

মেয়ের কথা শুনতে পেয়ে রান্নাঘর থেকে মালতী গলা তুলে বলল, 'দুটো রুটি খাবি ফুল? গরম রুটি করে দেব?'

ফুল এ-কথার জবাব না দিয়ে তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা, মাস্টার আর ফিরবে না?'

নিতাই ভুরু কুঁচকে নীচু গলায় বলল, 'ওমা, সে আবার কী কথা! মরা মানুষ ফিরবে কী করে?'

ফুল হাতে-ধরে রাখা পুতুলের গায়ে হাত বুলিয়ে নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'ও। তাহলে স্কুলে কে পড়াবে?'

নিতাই খানিকটা দুঃখিত গলায় বলল, 'নতুন কেউ আসবে।'

ফুল উৎসাহী গলায় বলল, 'ভালোই হবে, আমরা নতুন মাস্টারের কাছে পড়ব।'

সন্ধের ঠান্ডা হাওয়াটা একটু একটু করে আসতে শুরু করেছে। মালতী গায়ে একটা চাদর দিয়ে গেছে। অসুস্থ মানুষ সাবধানে না থাকলে বিপদ। চট করে ঠান্ডা ধরে নেয়। নিতাই অল্প একটু মুড়ি তুলে মুখে ফেলল। বলল, 'ভালো হবে কিনা জানি না, তবে মানুষটা ভালো ছিল রে ফুল। তোদের বড়ো ভালোবাসত।'

'নতুন মাস্টারও ভালোবাসবে।'

'হয়তো বাসবে।' অন্যমনস্ক গলায় বলল নিতাই।

ফুল পুতুল-কন্যার চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, 'একটা কথা বলব বাবা?'

মেয়ের দিকে তাকাল নিতাই। এই ক-দিন মেয়ের দিকে ভালো করে তাকাতে পারেনি নিতাই। আজ মনে হচ্ছে, মেয়েটার চেহারা যেন সামান্য ভালো হয়েছে। চোখের কোলে যে-কালির ছাপটা পড়েছিল, সেটা নেই। গালেও একটু মাংস লেগেছে। চোখ ফিরিয়ে নিল নিতাই। ভালো থাকতে থাকতে বড়ো ডাক্তারের কাছে মেয়েটাকে একবার নিয়ে যেতে পারলে ভালো হত। সুদর্শন রায়। কলকাতার ঠিকানায় গেলে কেমন হয়? বানেরহাটে রোগী না দেখুক, কলকাতায় নিজের বাড়িতে তো দেখবে। অসুবিধে কী? একটা দিন না হয় কলকাতাতেই থাকল। একটু বেড়ানোও হল। মনুমেন্ট, গড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানা

boierpathshala.blogspot.com

দেখলে মেয়েটা খুব খুশি হত। তারও ভালো লাগত। খরচাপাতিরই যা সমস্যা। পাড়াগাঁয়ের মানুষ বড়ো ডাক্তার দেখানোর বিলাসিতা সামলাতে পারে না।

'কী হল বললে না তো?'

'কী বলব?'

'রাগ করবে না তো?'

নিতাই হেসে বলল, 'না করব না।'

ফুল তার বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানো বাবা, খুঁটিয়া মাস্টার আবার ফিরে আসবে।'

নিতাই সামান্য থমকে থেকে হেসে ফেলল। হাত বাড়িয়ে মেয়ের চুলে হাত বুলিয়ে বলল, 'না রে পাগলি, যে-মানুষ একবার মারা যায়, সে আর ফেরে না।'

ফুল মিটিমিটি হেসে বলল, 'দ্যখো, ঠিক ফিরে আসবে।'

সেদিন রাতেই চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া ফিরে এল। ফিরে এল নিতাইয়ের স্বপ্নে। মাথা থেকে রক্ত ঝরছে।

ঘুম ভেঙে ধড়ফড় করে উঠে বসল নিতাই। ঘামে ভিজে গেছে শরীর। পাশেই মালতী মেয়েকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। সলতে-কমানো-হ্যারিকেনের লালচে আলোয় তাদের দেখাচ্ছে মায়াময়। বড়ো সুন্দর। অনেকক্ষণ জেগে রইল নিতাই। শরীরটা ঝরঝরে লাগছে তার। ভোররাতে সে সিদ্ধান্ত নিল, সে চুপ করে থাকবে না। চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়াকে কে মেরেছে সে-কথা পুলিশকে জানাবে।

boierpathshala.blogspot.com

তেত্রিশ

বইয়ের নাম 'ওয়ান্ডার ওয়ার্ল্ড অব অ্যান্ট'। বাংলা করলে, 'পিঁপড়েদের আশ্চর্য জগৎ'।

এই বই পতঙ্গ-বিজ্ঞানের ওপর একটা গুরুত্বপূর্ণ বই। বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড উইলসনের ভূমিকাটিও চমৎকার। কাল অনেক রাত পর্যন্ত বইটা পড়েছেন সুদর্শন রায়। বাকিটুকু পড়বার জন্য আজ খুব ভোরে উঠেছেন। গায়ে একটা হালকা চাদর জড়িয়ে বারান্দায় এসে বসেছেন। ভোরের নরম আলো এসে তাঁর গায়ে পড়ছে।

বইটা যত পড়ছেন তত অবাক হচ্ছেন ডাক্তার রায়। পিঁপড়েদের এই আশ্চর্য জীবনযাপন সম্পর্কে তাঁর প্রায় কিছুই জানা ছিল না। যেটুকু ছিল তা খুবই ভাসা ভাসা। বহু বছর আগে স্কুলের পাঠ্যবইতে পড়া।

দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পর বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এসেছেন, মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে পিঁপড়েদের মিল অজস্র। এরাও সামাজিক প্রাণী। সংঘবদ্ধ হয়ে থাকতে জানে। মানুষের মতোই এদের মধ্যে কাজের ভাগ আছে। সেই ভাগ অনুযায়ী নিজেরা জাতপাতের অনুশাসন তৈরি করেছে। নারী, পুরুষ, শ্রমিক এক-একজনকে এক-একরকম ভাবে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে। এরা নিজেদের খাবার তৈরি করতে পারে। বিচিত্র সব পদ্ধতিতে খাবার জোগাড় এবং সঞ্চয় করতে জানে। শারীরিকভাবে কেউ শক্তপোক্ত, কেউ দুর্বল। কেউ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির, কেউ দৃষ্টিহীন। এরা কখনও যুদ্ধবাজ, কখনও শান্তি চায়। ডাক্তার রায় জেনে বিস্মিত হলেন, আমাজনে একধরনের পিঁপড়ে আছে, যারা যুদ্ধে পরাজিতদের ক্রীতদাস বানিয়ে রাখে! ভাবা যায়?

boierpathshala.blogspot.com

পিঁপড়ের ভাষা নিয়ে দীর্ঘ এক অধ্যায় রয়েছে বইতে। অধ্যায়ের নাম 'দ্য মিস্টিক ল্যাঙ্গুয়েজ অব অ্যান্ট।' সত্যি রহস্যময়। অধ্যায়টি খুবই ইন্টারেস্টিং। পড়বার সময় থামা যায় না। সুদর্শনবাবুও থামতে পারছেন না।

মানুষ যেমন মুখ দিয়ে কথা বলে, পিঁপড়েরা ভাবের আদানপ্রদান করে শুঁড় দিয়ে। সেই ভাব বিনিময়ে গন্ধের ভূমিকাই আসল। এক ধরনের বিশেষ রাসায়নিক এই গন্ধ তৈরি করে। সেই রাসায়নিকের নাম ফেরোমেন। শুধু পারস্পরিক ভাব আদানপ্রদানই নয়, ফেরোমেন পিঁপড়েকে লড়াই করে বেঁচে থাকার কাজে সবরকমভাবে সাহায্য করে। হাটা, খাওয়া এমনকি বিপদ সম্পর্কে আগাম সর্তক করে। এক-একটা ভাব ঝোঝাতে তারা শরীর থেকে এক-এক ধরনের ফেরোমেন বের করতে পারে। বিপদের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে তাদের নিজস্ব জগতে।

অধ্যায়টি দ্বিতীয়বার পড়লেন সুদর্শন রায়। কেন জানি তাঁর মনে হচ্ছে, তিনি যা খুঁজছেন, এখানে তার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

এইসময়টা ঘন ঘন ঝড়বৃষ্টি হয় বলে ভোরের বাতাসে সবসময়ই একটা ঠান্ডা ভাব। বৃষ্টি হয়তো দূরে কোথাও হয়েছে, বাতাস সেই ঠান্ডা বয়ে বেড়ায় আরও দূরে। চাদরটাকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে ফেরোমেনে ডুব দিলেন সুদর্শন রায়।

ফেরোমেনের রাসায়নিক গঠন, চরিত্র এবং কর্মপদ্ধতি খুবই জটিল। এতটাই জটিল যে বৈজ্ঞানিকরা আজও এর রহস্য পুরোটা ভেদ করতে পারেনি। শরীরের বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থি থেকে ফেরোমেন বের করতে পারে পিঁপড়ের দল। এক-একটা গ্রন্থি এক-একরকম রসায়নের জন্য নির্দিষ্ট। বিচিত্র চেহারার সেই সব গ্রন্থি। ফেরোমেনের মতোই বিচিত্র। শরীর থেকে বেরিয়ে আসার পর দ্রুত বাতাসে মিলিয়ে যায়। প্রধানত টারপেনয়েড কম্পাউন্ড, সালফার কম্পাউন্ড, অ্যালিফ্যাটিক কিটোন, অ্যালকোহল ধরনের রাসায়নিক এই বিচিত্র জিনিসটির উপাদান। এর সঙ্গে বিষাক্ত আরও কিছু রাসায়নিক রয়েছে। সেগুলো ছড়িয়ে দিতে পিঁপড়ে ব্যবহার করে তার বিষগ্রন্থি। শরীরের বিভিন্ন অংশের গ্রন্থি থেকে বেরোনো ফেরোমেন তারা নিজেদের শুঁড়ে মাখিয়ে নেয়। এই কারণে শরীরকে ঘন ঘন বেঁকিয়ে চুরিয়ে নিতে হয় তাদের। তারপর শুঁড় থেকে ছড়িয়ে দেয় রাসায়নিক-বার্তা। ফেরোমেনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণু ছুটে যায় বাতাসে। বাতাস তাকে খাদ্যের সন্ধান দেয়, আগাম আঁচ দেয় বিপদের। পিঁপড়েরা যে সারিবদ্ধ ভাবে চলতে পারে তার পিছনেও রয়েছে এই আশ্চর্য বস্তুটির কারসাজি। চলার পথেও ছড়িয়ে থাকা কণায় তারা পথ চেনে।

boierpathshala.blogspot.com

ডাক্তার রায় একই সঙ্গে অবাক এবং চমৎকৃত হলেন। মেয়ে কখন বারান্দায় এসেছে খেয়াল করলেন না। কথাকলিও কিছু বলেনি। নীচু টেবিলের ওপর চায়ের কাপ রেখে উলটোদিকে বেতের কারুকার্য করা মোড়া টেনে বসল চুপ করে।

ডাক্তার রায় আসল জিনিসটা খুঁজছেন। বিপর্যয়ের কথাটা কোথায়? পিঁপড়েরা কি সত্যি ঝড়, বৃষ্টি, আগুন দুর্যোগের খবর বুঝতে পারে? পারলে তার বিজ্ঞানটা কী? প্রকৃতি কি তাদের কাছে বিপর্যয়ের কোনো ফেরোমেন পাঠায়? নাকি সেই রাসায়নিক তাদের নিজের শরীরেই রয়েছে যা এখনও পতঙ্গ-বিজ্ঞানীদের কাছে অনাবিষ্কৃত?

'বাবা, চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।' নীচু গলায় বলল কথাকলি।

ডাক্তার রায় সামান্য চমকে বই থেকে মুখ সরালেন। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

'কখন উঠলি কলি?'

কথাকলি এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছ। কাল থেকে বইটা নিয়ে পড়েছ।'

হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ তুললেন সুদর্শন রায়, অন্যমনস্ক গলায় বললেন, 'বাড়াবাড়ি করার মতোই বিষয়। ভাবতে পারিস কলি, একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবকেও বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতি কী অপরিসীম ক্ষমতা দিয়েছে! আসলে কী জানিস, এই পৃথিবীটা যে সবার, প্রকৃতি সে-কথা কখনওই ভোলে না। আমরাই ভুলে যাই। ভাবি, এই মাটি, আলো, বাতাস শুধু আমাদের। মানুষের জন্যই। ঘটনা তো তা নয়। পৃথিবী যেমন আমাদের তেমন পশুপাখি কীটপতঙ্গেরও। মানুষ জোর করে এককভাবে এর দখল চায়। এই দখল অন্যায়।'

কথাকলি ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হেসে বলল, 'বাপ রে, পিঁপড়ে সম্পর্কে জানতে গিয়ে তুমি যে একেবারে দার্শনিক হয়ে গেলে।'

'দার্শনিক নয়, আরও একবার সত্যটা অনুভব করছি। তুইও বইটা পড়িস। তুইও অবাক হবি।'

কথাকলি বলল, 'মানুষ নিয়েই নাজেহাল হচ্ছি বাবা পিঁপড়েতে আর দরকার নেই। আমাদের বস্ কমল মল্লিক একটা বড়ো ডেঁয়ো পিঁপড়ে। দেরি হলেই কামড় বসাবে।'

সুদর্শন রায় এই হালকা রসিকতায় হাসলেন।

'জানিস কলি, তোকে ফেরোমেনের কথা বলছিলাম না? মনে আছে? সেই ফেরোমেনই বলতে পারিস পিঁপড়েদের সব। চোখ, কান, নাক— সব। শুধু

boierpathshala.blogspot.com

সেটুকুই নয়, এই বিচিত্র কেমিক্যালটি ওদের এমন কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতা দিয়েছে যা মানুষের নেই।'

কথাকলি ভুরু তুলে বলল, 'তাই?'

সুদর্শন রায় মেয়ের কৌতূহলে উৎসাহ পেলেন।

'সেটাই তো মজার। চেহারা আকৃতি অতি সামান্য বলেই হয়তো নেচার তাকে এই আশ্চর্য জিনিসটা দিয়েছে। মানুষের মতো দৈত্যদের সঙ্গে লড়াই করে পৃথিবীতে টিকে থাকা চাট্টিখানি কথা? কতরকমের অস্ত্রশস্ত্র দরকার হয় বল তো? কলি, পড়ে-টড়ে যা বুঝছি, পিঁপড়েরা তাদের ফেরোমেন মোটামুটি পাঁচরকম কাজে লাগাতে পারে। লাইন করে হাঁটবার জন্য তাদের আছে ট্রেল ফেরোমেন। এবার ধর, কোথাও খাবারের খোঁজ পেল, সেই খাবার তো শুধু নিজে খেলেই চলবে না, অন্যদেরও জানাতে হবে। মানুষের মতো নয় যে নিজেই হামলে পড়ে সব শেষ করলাম। এইজন্য তারা ব্যবহার করবে রিক্রুটমেন্ট ফেরোমেন। অন্যের রিক্রুটমেন্ট ফেরোমেনের গন্ধ পেয়ে বাকিরাও ছুটবে খাবারের দিকে। ওদের কমিউনিটি ফিলিংসটা একবার ভেবে দ্যাখো। সেক্সের জন্য আছে সেক্স ফেরোমেন। শত্রুকে আক্রমণ করতে কাজে লাগায় অ্যাগ্রেশন ফেরোমেন। আর মোস্ট ইমপর্টান্ট যেটা হল তাকে বলে অ্যালার্ম ফেরোমেন।'

কথাকলির মজা লাগছে। মানুষটার এটাই স্বভাব। যখন কোনো বিষয়ের মধ্যে ডুব দেয়, সেই ডুব হয় গভীর। তখন আর বিশ্বসংসার নিয়ে খেয়াল থাকে না। গোটা জগৎটাই চিন্তার অতলে তলিয়ে যায়। মায়ের মৃত্যুর ঘটনা এই ভাবেই সামলেছিল। সামলেছিল না বলে ভুলে থাকতে চেয়েছিল বলা ভালো।

'অ্যালার্ম ফেরোমেন! সে আবার কী!'

বাবাকে আনন্দ দিতে ইচ্ছে করেই বেশি উৎসাহ দেখাল কথাকলি।

ডাক্তার রায় বইয়ের পাতায় চোখ রেখে শান্ত গলায় বললেন, 'বিপদ বোঝার জন্য এই ফেরোমেন ব্যবহার করে ওরা। কেউ ধরতে আসছে, আঘাত করতে আসছে, কাছাকাছি এলেই অ্যালার্ম ফেরোমেন বলে দেবে সাবধান হও। শত্রুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠ। সম্পূর্ণ অন্ধকারেও বিপদের উপস্থিতি তারা অনুভব করতে পারে। ফেরোমেনের মধ্যে যে অণু বাতাসে রয়েছে তাদের জটিল যাতায়াতের কারণেই এটা নাকি সম্ভব।'

কথাকলি বাবার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুমি কি মনে করছ, তোমার ওই পেশেন্টের মধ্যেও এই ধরনের ক্ষমতা আছে? ঝিলডাঙার ওই ফুলের মধ্যে?'

boierpathshala.blogspot.com

'আমি এখনও কিছুই বুঝতে পারছি না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি, বিপদের আগাম খবর পিঁপড়ে পায়। কিন্তু সেই বিপদ কীরকম? দু-দিন পরে ঝড়-জল হবে? নাকি কয়েকঘণ্টা পরে আগুন বা গাছ ভেঙে পড়বে? এ সম্পর্কে এখনও কোনো তথ্য জানতে পারিনি। বরং উলটোটাই পাচ্ছি। তা ছাড়া পিঁপড়ের শরীরের রাসায়নিক গুণ মানুষের কাছে আসবে কী করে? এর আদৌ কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি সম্ভব? যদিও সব রহস্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজও সম্ভব হয়নি। একটা মানুষ জ্যোৎস্না দেখলে থমকে দাঁড়ায়, অন্য মানুষ সেই একই জ্যোৎস্নায় বিচলিত হয় না। বরং রাত হয়েছে, ভেবেছে দ্রুত ঘরের দিকে পথ চালায় দুশ্চিন্তায়। এই ইমোশনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা হয়তো কিছু কিছু হরমোনাল ফাংশন নিয়ে আলোচনা করব, কিন্তু তার অনেকটাই যে গোঁজামিল সে-কথা বোধহয় আমরা চিকিৎসকরাই সবথেকে বেশি জানি।'

কথাকলি হেসে বলল, 'বাপ রে, কী কমপ্লিকেটেড!'

ডাক্তার রায় মুখ তুলে বললেন, 'মোটেই নয়। আজকাল একটা থিয়োরি খুব চালু হয়েছে ভাব-ভালোবাসা নাকি অন্যকিছু নয়, হরমোনের খেলা মাত্র। তাই যদি হয়, অতি নিষ্ঠুর মানুষের মধ্যে সিরিঞ্জে করে খানিকটা হরমোন পুরে দিলেই কাজ হয়ে যেত। ভালোবাসা উপচে পড়ত। তাই না? কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। তবে? হরমোন ফাংশনের থিয়োরি সবসময় খাটছে না।'

কথাকলি উঠে পড়ল। অফিসের জন্য তাকে তৈরি হতে হবে। একটা সময় পর্যন্ত ভাব-ভালোবাসা সম্পর্কে তার ধ্যানধারণা কিছুটা স্পষ্ট ছিল, এখন আবছা হয়ে গেছে। গেছে বলেই, সামান্য বইয়ের খবর দিতে সে ব্রতীনের বাড়ি পর্যন্ত চলে যায়, আবার কাল বিকেলে সেই মানুষটাই বাড়িতে এলে তাকে কঠিন কথা শোনায়!

'বাবা, তুমি পিঁপড়ে নিয়ে পড়ে থাকো, আমি উঠলাম। এরপরে অফিসে দেরি হয়ে যাবে।'

মাথা নেড়ে আবার বইতে ডুব দিলেন সুদর্শন রায়।

কথাকলি নিজের ঘরে এল। ভালোবাসার কথাটা শোনার পর থেকেই তার মন ভারী হয়ে গেছে। সেদিন ব্রতীনের বাড়ি থেকে ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বেরিয়েছিল। ব্রতীন কাল এসেছিল সেই ঝড়বৃষ্টিরই মাঝখানে। এর মধ্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই, সময়টাই এরকম। বিকেল হলে আকাশ কালো করে ঝড় দেয়। কোনোদিন দু-এক ফোঁটা ফেলে হাওয়াতেই সেই মেঘ উড়ে যায়, কোনোদিন হয়তো তুমুল বৃষ্টি চলল দীর্ঘ সময়।

boierpathshala.blogspot.com

কাল কথাকলি বাড়িতে ছিল না। ডাক্তার রায় চেম্বার থেকে ফিরে স্টাডিতে বসেছিলেন কাগজপত্র খুলে। সন্ধের দিকটা পড়া-শোনার মধ্যে থাকবেন বলে শনিবার করে চেম্বার বিকেলের মধ্যেই শেষ করছেন।

অন্ধকারেই ঝড় উঠল। জানলা দরজা পড়তে লাগল আওয়াজ করে। সল্টলেকের ঝড়ে ধুলোবালি বেশি। জানলাগুলো বন্ধ না করলে গোটা বাড়ি ধুলোয় ভরে যেতে মিনিট কয়েকও লাগবে না। কিন্তু ডাক্তার রায়ের পক্ষে দোতলা বাড়ির এতগুলো জানলা ছোটাছুটি করে আটকানো অসম্ভব। আজকাল তাড়াহুড়ো করতেও পারেন না। দু-একটা জানলা বন্ধ করতে করতে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, থাক, আজ ঘরে না হয় একটু ধুলোই ঢুকুক। বড়োজোর মেয়েটা ফিরলে রাগারাগি করবে। গোপালের মা কেন জানলা দরজা দিয়ে যায়নি সেই কারণে রাগারাগি।

সত্যি সত্যি খুব দ্রুত বাড়ি ধুলোয় ভরে গেল। তারপরেই শুরু হল বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টি। এর মধ্যে আবার কারেন্ট চলে গেল। আজকাল একটু হাওয়া দিলেই কারেন্ট চলে যায়। গোটা বাড়ি অন্ধকার। অন্ধকার বলে ডাক্তার রায় যে চিন্তিত হলেন এমন নয়। তিনি দোতলার অন্ধকার ঘরে শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে ঝড়বৃষ্টি দেখতে লাগলেন। আহা, কতদিন যে প্রাণভরে বৃষ্টি দেখা হয় না! মনে হচ্ছে, এই বৃষ্টি থামবে না। গাছগুলো মাথা দুলিয়ে, ডালপালা কাঁপিয়ে তুমুল হট্টগোল তুলেছে। বৃষ্টির ফোঁটায় কখনও কখনও অন্ধকারও সাদা লাগে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতে, বাজে জ্বলে জ্বলে উঠছে চারপাশ।

এমন একটা গোলমেলে সময়ে ব্রতীন এসে হাজির। ভিজে কাক । হাতে বইয়ের প্যাকেট। প্যাকেটও ভিজেছে।

কাঁপা মোমবাতি নিয়ে ডাক্তার রায় একতলায় নেমে দরজা খুলে চমকে গেলেন।

'তুমি!'

'বইটা নিয়ে এসেছি।'

'ইস, একেবারে ভিজে গেছ যে। এসো, এসো, আগে ভেতরে এসো। ছি ছি কী কাণ্ড বল তো? এই বৃষ্টির মধ্যে এলে কেন?'

'না স্যার, আপনি বলেছিলেন বইটা যদি সম্ভব হয় একটু তাড়াতাড়ি...। দেখুন এটায় যদি কাজ হয়।'

কথাটা ঠিক। কথাকলি খবর দিয়ে আসার পর ব্রতীন সেদিনই ফোন করেছিল।

boierpathshala.blogspot.com

'স্যার, আমি ব্রতীন বলছি।'

'কেমন আছো ব্রতীন?'

'ভালো আছি স্যর। কথা বলল, আপনি আমায় খুঁজছেন, কী একটা বই চাই?'

সুদর্শন রায় লজ্জা পান। ছেলেটার কথা তখন মাথায় এসেছিল ঠিকই, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে না এলেই ভালো হত। একেবারে একটা বইয়ের জন্য এতদিন পরে ব্রতীনকে খবর পাঠানোটা উচিত হয়নি। তিনি একটু অস্বস্তি নিয়েই বলেন, 'আসলে একটা অদ্ভুত বিষয়ের মধ্যে ঢুকে গেছি। আরও পড়াশোনার দরকার। তুমি তো বই-টইয়ের খোঁজ-টোজ রাখো, ভাবলাম যদি জোগাড় করতে পার। কলিকে সেইজন্যই বলেছিলাম।'

ওপাশে ব্রতীন সামান্য হেসে বলল, 'এখন আর বিশেষ বই ঘাঁটার সময় পাই না। তবু আপনি বলুন স্যার।'

'পিঁপড়ের ওপর, বি স্পেসিফিক পিঁপড়ের ফেরোমেনের বিষয় যদি কিছু থাকে...।'

অন্ধকার ঘরেই ব্রতীনকে বসান সুদর্শন রায়। মাথা মোছার জন্য তোয়ালে এনে দেন দোতলা থেকে। তারপর হাত থেকে বই নিয়ে মোমের আলোয় উলটে দেখতে থাকেন।

'তুমি আছো কেমন?'

ব্রতীন খানিকটা থতমত খেয়ে বলে, 'ভালো স্যার, আগে একদিন এসেছিলাম।'

সুদর্শন রায় বই থেকে মুখ তুলে বললেন, 'জানি। কলি বলেছে। তখনই তো বললাম, ওকে একবার বলে দেখিস।'

কথাকলির প্রসঙ্গ সরিয়ে দেওয়ার জন্য ব্রতীন বলল, 'হঠাৎ পিঁপড়ে স্যার?'

সুদর্শন রায় হেসে বললেন, 'অদ্ভুত একটা কেস পেয়েছি। তুমি তো জানো বানেরহাটের ক্লিনিকে আমার যাতায়াত আছে। সেখানেই কেসটা এসেছে। এক বাচ্চা মেয়ের বাবা ক্লেইম করছে সেই মেয়ে নাকি আগে থেকে বিপর্যয়ের খবর বুঝতে পারে। প্রথমে নরমাল স্কিৎজোফ্রেনিয়া ভেবেছিলাম। পরে কেমন যেন সন্দেহ হতে থাকে।'

মাথা-থেকে-ঝরে-পড়া জল মুছতে মুছতে ব্রতীন বলে, 'আশ্চর্য তো!'

'আশ্চর্য তো বটেই। শুধু প্রকৃতি নয়, ফুল নাকি অন্য বিপদও টের পেয়েছে।'

'ফুল কে?'

boierpathshala.blogspot.com

'ওই পেশেন্টের নাম। একেবারে ইন্টিরিয়র গ্রামের মেয়ে। গ্রামের নাম ঝিলডাঙা।'

'ঝিলডাঙা! বাঃ সুন্দর নাম।'

সুদর্শন রায় বলেন, 'সহজ কাউন্সিলিং -এ রোগ সারবে ভেবেছিলাম, পরে খটকা শুরু হয়। মনে হয়, সত্যি ওই মেয়ের এরকম কোনো ক্ষমতা নেই তো? ভাবনাটা মেডিকেল সায়েন্সের একেবারে অপোজিট। বিজ্ঞানের কোনো ব্যাখ্যা নেই। হয়তো নেই বলেই ঘটনাটা মাথার মধ্যে বেশি করে চেপে বসেছে। একটা এক্সট্রিম পয়েন্ট পর্যন্ত পৌঁছে জানতে ইচ্ছে করছে, না, এটা ঠিক নয়, এরকম হতে পারে না।'

ব্রতীন বলল, 'এর সঙ্গে পিঁপড়ের কী সম্পর্ক?'

'কিছুই নেই। শুনেছি, কোনো কোনো জীব, কীট-পতঙ্গ নাকি আগাম ঝড় বৃষ্টির খবর জানতে পারে। দল বেঁধে নিরাপদে চলে যেতে চায়। একে বলা হয়, মাস মাইগ্রেশন। সত্যি কি এরকম কিছু ঘটে? নাকি লোকের বিশ্বাস মাত্র?' এইপর্যন্ত বলে আবার সামান্য হাসলেন সুদর্শন রায়। সম্ভবত নিজের পাগলামির কথা ভেবেই হাসলেন। বললেন, 'পিঁপড়ে দিয়ে শুরু করেছি। তুমি একটু বসো। কথাকলির আসার সময় হয়ে গেল। ওর সঙ্গে দেখা করে যেও।'

ব্রতীন ঠিক করে এসেছিল, বইটা দিয়েই চলে আসবে। কথাকলির সঙ্গে দেখা করবে না। তবু সে বসে রইল।

কথাকলি যখন ট্যাক্সি থেকে বাড়ির সামনে নামে তখন বৃষ্টির তেজ অনেকটা কমে গেছে। রাস্তায় অল্প জলও জমেছে। ট্যাক্সি থেকে নামার আগেই জুতো খুলে হাতে নিল। তারপর জমা জল টপকে মাথা, পা ভিজিয়ে বাড়ি ঢুকল। ঢুকেই চমকে উঠল। এতটাই চমকে উঠল যে হাতের জুতো পর্যন্ত নামাতে ভুলে গেল সে। অন্ধকারে মিশে সোফার এককোণে কে যেন জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে! হাতে কাপড় মতো কিছু একটা। টেবিলের ওপর রাখা মোমবাতিতে মানুষটাকে দেখাচ্ছে ছায়ার মতো। অন্ধকার চোখ সওয়া হতে কথাকলি চিনতে পারল, ব্রতীন। জামাকাপড় ভেজা। হাতে তোয়ালে।

এ কী! আজ আবার এসেছে! এই দুর্যোগেও!

কথাকলিকে দেখে উঠে দাঁড়াল ব্রতীন। কথাকলি হাত থেকে জুতো নামাল। বলল, 'তুমি!'

'হ্যাঁ, স্যারের বই এনেছিলাম...আমি এবার চলে যাব।'

'বোসো। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। ধরলে যাবে।' কথাটা বলে ভেতরে যেতে

boierpathshala.blogspot.com

যেতে ঘুরে দাঁড়াল কথাকলি। বলল, 'তুমি কি চেঞ্জ করবে? ইচ্ছে করলে বাবার কিছু পরতে পারো।'

ব্রতীন তখনও দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি বলল, 'না, না আমি এখনই চলে যাব।'

কথাকলি মুহূর্তের জন্য থমকাল। যাতায়াতের এই খেলাটা এবার বন্ধ হওয়া দরকার। অনেক হয়েছে, আর নয়। বইটা দেওয়ার হলে কাউকে দিয়েই পাঠিয়ে দিতে পারত। কেন সে আবার আসছে? সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'না, যাবে না। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। আমি আসছি। তুমি চা খাবে?'

ব্রতীন মাথা নেড়ে জানাল, না, সে চা খাবে না।

কথাকলি ভিজে শাড়ি বদলে ফিরল খুব দ্রুত। শাড়ির রং বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, কালো ধরনের কোনো শেড। আসলে রং লাল। চুল পিঠের ওপর ছাড়া। কপালে ছোটো টিপও দিয়েছে। সামান্য মোমবাতির আলোতে সেই টিপ বোঝা যাচ্ছে না। ব্রতীন খাবে না বললেও সে দু-কাপ চা এনেছে। চায়ে সামান্য আদা দেওয়া। সে নিজে আদা পছন্দ করে না। চায়ের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। আদা ব্রতীনের জন্য দেওয়া। তার গলায় সমস্যা আছে। বৃষ্টিতে ভিজলে সেই সমস্যা বাড়ে। কিছু বলতে হল না, ব্রতীন হাত বাড়িয়ে কাপ নিল।

কথাকলি কোনোরকম ভনিতা না করে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কথা শুরু করল। কারেন্ট না থাকায় সুবিধে হয়েছে। কেউ কারও মুখ স্পষ্ট করে দেখতে পাবে না। কথাকলি নিজেকে মনে মনে কঠিন করল। একটা সময় সব মানুষকেই রূঢ় হতে হয়। ভালোর জন্যই হতে হয়।

'ব্রতীন, সেদিন তোমার বাড়িতেই আসলে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম। সাম হাউ আমি পারিনি...যাক, তুমি কেন এখানে আসছ?'

ব্রতীন আমতা আমতা করে বলে, 'না মানে...এমনি। বিশ্বাস কর কলি, আমি কোনো...।'

কথাকলি শান্ত গলায় বলে, 'চা খেতে খেতে কথা বলো ব্রতীন। ঠান্ডা হয়ে যাবে। তোমার আসার আসল কারণটা বললে আমাদের দুজনের পক্ষেই সুবিধে হয়। আমরা জিনিসটা শেষ করতে পারি। দেয়ার শুড বি অ্যান এন্ড। আমরা আলোচনা করেই সেপারেশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। বলেছিলাম, সময় হলে আমরা ডিভোর্সে যাব। আমি ক্যালেন্ডারে দাগ দিয়ে চলি না, কিন্তু মনে হয় না সেই সময় আসতে আর খুব একটা দেরি আছে। এই সময় তোমার এখানে আসাটা আমাদের দুজনের পক্ষেই অসুবিধের। তাই না?'

boierpathshala.blogspot.com

এতটা একদমে বলে কথাকলি থামল।

'কথা, আমি একটা চাকরির সন্ধান পেয়েছি। কলকাতার বাইরে। স্যালারি দারুণ কিছু নয়, তবে অন্যান্য সুবিধে আছে। কোম্পানির ফ্ল্যাট। বছরখানেক বাদে কলকাতায় বদলি। তুমি যদি চাও আমি কাজটা নিয়ে নিতে পারি।'

কথাকলি ঠোঁটের কোণে হাসল। সম্ভবত ব্রতীন সে-হাসি দেখতে পেল না। বলল, 'চিন্তা নেই, একটা বছর পর্যন্ত যাবে না। তার আগেই তুমি ওই কাজ ছাড়বে। সুতরাং গাড়ি বাড়ি, কলকাতার ঝামেলা তোমাকে সামলাতে হবে না। তা ছাড়া এসব আমাকে শোনাচ্ছ কেন? তুমি কি মনে করছ, সেদিন যে আমি তোমার ওখানে গিয়েছিলাম সেটার পিছনে একধরনের কোনো কারণ ছিল? তুমি ভালো চাকরি করো, আবার সংসার কর, তোমার যা খুশি কর, আমার কী? আমি তো তোমার কাছ থেকে কোনো খোরপোশও ক্লেইম করিনি। করেছি কি?' একটু থামল কথাকলি। তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'তুমি আর এসো না ব্রতীন। প্লিজ। বাবার বয়স হয়েছে। তিনি নিজে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেন না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ছটফট করেন। হয়তো ভুল কিছু ভাবছেন। দেশে যাওয়ার আগে গোপালের মা মনে হয় বাবাকে কিছু বলে গেছে। আমাকে সেদিন ডেকে বলছিলেন। আমি রাগারাগি করলাম। এমনকি পুলিশে যাব পর্যন্ত বললাম। পরে খারাপ লাগল। মাথা গরম করাটা ঠিক হয়নি। বাবার তো কোনো দোষ নেই। তিনি যা দেখছেন বলেছেন। এমনকি তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে সেটাও তাঁর কাছে ক্লিয়ার নয়। হবেই-বা কী করে বল? আমার মনোভাবটাও তো উনি বুঝতে পারছেন না। ভাবছেন, তোমার এখানে আসার ব্যাপারে আমার কোনো ইনডালজেন্স আছে। উনি তোমার কাছে যে বইয়ের খোঁজ করেছেন সেটাও ওই কারণে বলে আমার মনে হয়। আসলে উনি আমাদের প্রশ্রয় দিতে চাইছেন। এইটাই সেদিন তোমাকে মুখোমুখি বলা উচিত ছিল। পারিনি সেটা আমার ভুল। সেই ভুলের কারণেই তুমি অন্যরকম কিছু ভেবেছ।'

ব্রতীন মুখ তুলল।

'আমার ওখানে তোমার যাওয়া নিয়ে আমি কিছুই ভাবিনি। এটা সত্যি স্যারের বই নিয়ে এ-বাড়িতে আসাটা একটা অজুহাত। আমি ইচ্ছে করলে ওঁর চেম্বারেও দিয়ে আসতে পারতাম। কথা, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?'

কথাকলি চমকে উঠল। সে কি ভুল শুনল? মনে হয় তাই হবে। ভুল শুনল।

ব্রতীন গলা নামিয়ে বলল, 'কথা, আর একবার চেষ্টা করলে ক্ষতি কী? যদি পারি। মানুষ তো কত কিছু একবারে পারে না। তাও তো সে চেষ্টা করে।

boierpathshala.blogspot.com

আমরাও না হয় করতাম। আসলে এটা বলতেই আমি তোমার কাছে এতবার আসছি। তুমি কীভাবে নেবে বুঝতে না পেরে বলতে সাহস পাচ্ছি না। সেদিন নিজের বাড়িতে বলতে লজ্জা করেছিল। ভেবেছিলাম, তুমি হয়তো ভাবতে পারো আমি সুযোগ নিচ্ছি, কিংবা কে জানে হয়তো আরও একটু সময় থাকলে বলতাম।'

কথাকলি চুপ করে রইল। ব্রতীনের কাছ থেকে এরকম একটা কথা শুনবে সে কল্পনাও করতে পারেনি। এখনও পারছে না। নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল। তারপর মাথা নামিয়ে সামনের টেবিলে রাখা মোমদানি থেকে গলে-পড়া-মোমে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, 'জীবনটা অঙ্ক নয়। বারবার কষে মেলানো যায় না। একবার ভুল হলে ভুলটাই থাকে। ব্রতীন, আমার মনে হয়, গোড়াতেই আমাদের সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল। বিয়ে করাটা উচিত হয়নি। তুমি সংসার করার মানুষ নও। সব মানুষ তা হয়ও না। একসঙ্গে থাকি বা না থাকি এই ভুলটা আর কোনোদিনই ঠিক হওয়ার নয়।'

ব্রতীন সামান্য চুপ করে থাকে। মাথা নামায়। তারপর ধীরে ধীরে বলে, 'তবু, তুমি কি আর একবার ভেবে দেখতে পার না? এসব তর্কের কথা বাদ দিয়েই না হয় ভাবলে। আমি এবার থেকে অন্য ভাবে চলব ঠিক করেছি। কোথায় কী হল তা নিয়ে মাথাও ঘামাব না। বিশ্ব-সংসার গোল্লায় গেলেও না। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি।'

কথাকলি হাসল। বলল, 'তোমাকে অন্যভাবে চলতে হবে না। তুমি তোমার মতোই চল। তাতেই তুমি। রাতে এখানে খেয়ে যাবে?'

ব্রতীন যেন খানিকটা অশান্ত হয়ে পড়েছে। অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'না খাব না। কথা প্লিজ। আর একবার কি তুমি ভাবতে পারো না?'

'না, পারি না।'

উঠে দাঁড়াল কথাকলি। মোমদানিটা হাতে তুলে নরম গলায় বলল, 'বৃষ্টি মনে হয় ধরে এসেছে। এসো তোমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিই। দাঁড়াও একটা ছাতা দিই।'

রাতে ঘরে শুয়ে অনেকক্ষণ কাঁদল কথাকলি। পায়ের দিকের খোলা জানলা থেকে বৃষ্টির ছাঁট এসেছে। ঠান্ডা হাওয়ায় শীত করেছে। অনেক দূরে কোথাও মেঘ ডেকেছে চাপা এবং গম্ভীর স্বরে। চমকে-ওঠা-বিদ্যুৎ ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে গেছে, আহা রে, মেয়েটা কাঁদে।

boierpathshala.blogspot.com

চৌত্রিশ

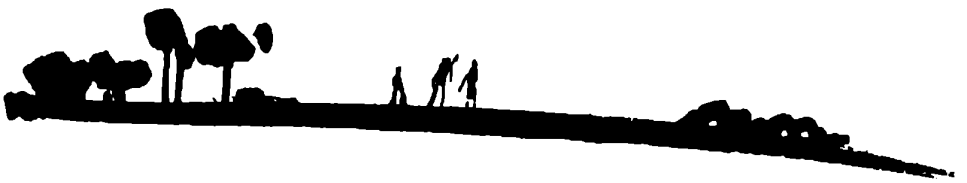

মানা সরকারের বাড়ির ঠিক মুখটায় শুরু হয়েছে বিক্ষোভ কর্মসূচি। একটানা চলছে ভাষণ আর স্লোগান। মাঝে মাঝে মাইকে বাজছে গান। পর্যায়ক্রমে দেশাত্মবোধক এবং গণসংগীত। কর্মসূচি শুরু হয়েছে—'কিরীটধারিণী তুষারশৃঙ্গ সবুজে সাজানো আমার দেশ, তোমার উপমা তুমিই তো মা...' দিয়ে। এখন চলছে—'সাথীদের খুনে রাঙা পথে দ্যাখো হায়নার আনাগোনা...।'

একটা দিন ছিল যখন সভার গান শুনে দল চেনা যেত। নিয়ম ছিল এক-একটা দলের জন্য এক-একরকম গান হবে। এখন সেই নিয়ম উঠে গেছে। সবাই সবরকম গান বাজায়। এরাও বাজাচ্ছে। মাইকে গোলমাল থাকার কারণে গান কিছুটা খ্যাসখ্যাসে ও বেসুরো লাগছে। এতে অবশ্য কেউ কিছু মনে করছে না। পাড়াগাঁয়ে গানের সুর নিয়ে অত মাথা ঘামালে চলে না। দেশাত্মবোধকই হোক আর গণসংগীতই হোক— একটু বেসুরো হলেও সবাই মেনে নেয়।

সমস্যা হয়েছে অন্য জায়গায়। সেই সমস্যা নিয়ে ছেলেপিলেদের মধ্যে চাপা টেনশন রয়েছে।

মঞ্চ তাড়াহুড়ো করে বাঁধা হয়েছে কাল রাতে। মঞ্চ উঁচুও নয়, আবার একেবারে মাটির সঙ্গে মেশাও নয়। ওপরে টান টান করে সাদা চাদর বিছোনো। ছড়িয়ে ছিটিয়ে খানকতক তাকিয়া রাখা। সেগুলোর রং লাল। ঝলমলে লাল। বিয়েবাড়িতে বরযাত্রীদের তাকিয়া। কোলবালিশ ধরনের তাকিয়ার চেহারায় একটা আয়েসি ব্যাপার আছে। দেখলে মনে হয়, মাথার তলায় দিয়ে খানিকটা গড়িয়ে নিলে কেমন হত?

মঞ্চে ওঠবার মুখেই বড়ো একটা ফুলদানি। এই জাতীয় সভায় ফুলদানিতে

boierpathshala.blogspot.com

কী ধরনের ফুল রাখা উচিত তা নিয়ে একটা বিভ্রান্তি হয়েছে। সেই কারণে ফুলদানি আপাতত শূন্য। তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। শূন্য ফুলদানি বেশ মানিয়েছে। সব মিলিয়ে তাড়াহুড়ো করে বানানো মঞ্চ দেখতে খারাপ হয়নি।

মঞ্চ নিয়ে আমাদের দেশে যদি কোনো সমীক্ষা হয় তাহলে দেখা যাবে, মঞ্চ হয় নানারকমের। পাকা মঞ্চ, কাঁচা মঞ্চ, সোজা মঞ্চ, ব্যাঁকা মঞ্চ, উঁচু মঞ্চ, নীচু মঞ্চ। মঞ্চ কেমন হবে তা নির্ভর করে সভা-সমিতির বিষয়ের ওপর। বিষয় যদি জোরদার হয়, মঞ্চ হবে জোরদার। বিষয় হালকা পলকা হলে মঞ্চ আলগোছে তৈরি করলেও চলে যায়।

মানা সরকারের বাড়ির সামনের মঞ্চ অবশ্য জোরদারও নয়, আবার হালকা পলকাও নয়। দেখতে সুন্দর হলেও, মঞ্চ হয়েছে নড়বড়ে। দুটো তক্তপোশ একটার ঘাড়ে আরেকটা তোলা হয়েছে। বানানোর সময় বোঝা যায়নি মঞ্চ নড়বড়ে হবে, এখন বোঝা যাচ্ছে। তবে কেন নড়বড়ে সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত দুটো তক্তাপোশের কোনো একটার পায়ায় গোলমাল আছে। হয় ছোটো, নয় বড়ো। কোন্ পায়ায় গোলমাল এখন আর বোঝার কোনো উপায় নেই। তাই নিয়েই টেনশন।

তক্তপোশ সাপ্লাই করেছে যে ছোকরা ডেকরেটর তাকে সকালেই খবর দেওয়া হয়েছে। গাব্বু নিজে গিয়েছিল। খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে সে একটা চড়ও খেয়েছে। বড়ো কিছু নয়, মাঝারি ধরনের চড়। কোনো রকম দুর্ঘটনা ঘটলে ঘটনা যে শুধু চড়ে থেমে থাকবে না সেকথা তাকে জানানো হয়েছে। বেচারি খুবই নার্ভাস হয়ে পড়ে। পার্টি পলিটিক্সের ব্যাপার। পান থেকে চুন, সুপুরি, খয়ের যা-ই খসুক তা-ই চিন্তার।

'গাব্বুদা, তোমরা তো সন্ধের পর বললে, একটু আগে যদি বলতে তাহলে ঠিক করে বাঁধতাম।'

'চোপ শালা। প্রোগ্রাম ঠিকই হয়েছে কাল বিকেলের পর। তোমাকে আগে কী করে বলব চাঁদু?'

ডেকরেটর কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'ওইটুকু সময়ের মধ্যে কোথা থেকে বাঁশ, দড়ি, তক্তা জোগাড় করব? যা স্টকে ছিল তাই বের করেছি।'

গাব্বু চোখ পাকিয়ে বলে, 'কেন বাছা তোমার স্টকে কি শুধু নড়বড়ে তক্তা আছে?'

'তা নয়, তবে খুঁজে পেতে দেখতে সময় লাগবে না?'

এই পর্যায়ে গাব্বু ছোকরার গালে চড় কষায়। হাত ঝেড়ে বলে, 'এখন এই

boierpathshala.blogspot.com

পর্যন্ত দেওয়া রইল, বড়ো কিছু ঘটলে তোমার বড়ো বিপদ আছে। তুমি শালা আজ সারাদিন ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। স্টেজ ভাঙলে তোমার মাথা ভাঙা হবে। ভাঙা মাথা নিয়ে বাড়ি ফিরবে।'

এরপরই ডেকরেটর ছোকরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। যদিও কিছু করা যায়নি। মাপে মাপে তক্তপোশ জোগাড় করে নতুন করে মঞ্চ বাঁধতে অনেকটা সময় লাগবে। সেই সময় হাতে নেই। পায়াগুলোতে দড়ি দিয়ে ডবল টাইট মারা হয়েছে। তাতেও বিশেষ সুবিধে হয়নি। যেমন নড়বড়ে ছিল তেমনই আছে। ফলে মঞ্চে যারা উঠছে তাদের মধ্যে টেনশন। অতিরিক্ত দাপাদাপি করলে ব্যালান্স হারিয়ে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

মঞ্চের পিছনে বড়ো চাটাইতে খান সাত আট পোস্টার সাঁটা। খবরের কাগজের ওপর লাল কালি দিয়ে লেখা পোস্টার—

'মানা সরকার জিন্দাবাদ', 'মানাদাকে ভোটে দাঁড়াতে হবে', 'মানা, তোমায় আমরা ভুলছি না, ভুলব না', 'মানার পথ দলের পথ, মানার নীতি দলের নীতি,' 'পঞ্চায়েত ভোটে মানাদাকে চাই...'

বাড়ির বাইরে হইচই চললেও, বাড়ির ভেতর শান্ত। চিত্তশুদ্ধি কর্মসূচি চলছে। মানা নিজে সেখানে উপস্থিত রয়েছেন। ঘরের মতো তাঁর ভাবভঙ্গিও শান্ত। বাইরের ঘটনা সম্পর্কে তিনি উদাসীন, নির্লিপ্ত। যেন ছেলেছোকরাদের ব্যাপারে কিছুই জানেন না। জানতে চানও না।

আজ চিত্তশুদ্ধির বিষয় খুবই মূল্যবান। একটু কঠিনও বটে। ছেলেরা বলেছিল, 'দাদা, এই সাবজেক্ট পাবলিক খাবে তো?'

মানা বলেছিলেন, 'গাধার দল, এটা কোনো যাত্রার আসর নয় যে পাবলিকের নাওয়া-খাওয়া নিয়ে আমায় ভাবতে হবে। এটা চিত্তশুদ্ধির ব্যাপার। এতে সহজ জিনিস যেমন থাকবে, কঠিন ব্যাপারও রাখতে হবে। চিত্ত কি শুধু সহজে শুদ্ধ হয় রে গাধার দল? কঠিন জিনিসও লাগে।'

এরপর আর ছেলেরা প্রশ্ন তোলেনি। বিষয় হয়েছে—ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে নারী-শিক্ষার আন্দোলন। নিজের তৈরি রচনা পাঠ করছেন, কালিকানগর কলেজের প্রিন্সিপাল প্রতুল ব্রহ্ম মহাশয়। মানুষটার গলা সুন্দর। একটা ভরাট ব্যাপার আছে। শুনতে শুনতে আপ্লুত হওয়ার ভঙ্গিতে চোখ আধখানা বুজে ফেলেছেন মানা। দেখাদেখি উপস্থিত অন্যান্য শ্রোতারাও অনেকে চোখ বুজছেন। তারা যে চোখ বুজতে চেয়েছেন এমন নয়। নেতা বুজেছেন তাই বোজা।

প্রতুল ব্রহ্মকে চিনতেন না মানা। মাত্র কিছুদিন হল আলাপ হয়েছে।

boierpathshala.blogspot.com

ভদ্রলোক তাঁর কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সমস্যা নিয়ে পার্টি অফিসে কথা বলতে এসেছিলেন। ইউনিয়নের ছেলেরা নাকি ভয়ংকর এক দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করতে চলেছে। সেই দাবি মেনে নেওয়া একেবারে অসম্ভব। আন্দোলন থামাতেই ভদ্রলোকের ছুটে আসা। তপন গুছাইত মানাকে বললেন, 'মানাবাবু, আপনি কেসটা দেখুন।'

মানা সরকার ঠোঁট উলটে বললেন, 'খেপেছেন? স্কুল কলেজের ব্যাপার, আমি কী করব? আপনি বিজয় স্যানালকে বলুন। অত বড়ো তাত্ত্বিক লিডার দলে থাকতে লেখাপড়া নিয়ে কথা বলার আমি কে?'

কথাটার মধ্যে স্পষ্ট ব্যঙ্গ আছে। তপন গুছাইত বিরক্ত হলেন। কাজ করবেন না, নিজেদের ঠোকাঠুকি সামলাবেন? তবে বিরক্তি দেখালে কোনো লাভ হবে না। উলটে কাজকর্ম সব মাথায় উঠবে। সামনে ইলেকশন। অনেক কাজ। দিন আর আগের মতো নেই। তখন ডিসিশন মানে ছিল ডিসিশন। কেউ রাগ করলেও দলের সিদ্ধান্ত, না করলেও দলের সিদ্ধান্ত। এখন রাগ, বিরক্তি সব হজম করে কাজ ম্যানেজ করতে হয়। না পারলে ভেতর থেকেই প্রশ্ন ওঠে— 'তুমি এতদিন তাহলে করলেটা কী বাপু? অর্গানাইজেশনটাকে এই ক-বছরে তো একেবারে জলে ফেলে দিয়েছ দেখছি।' বোঝ ঠ্যালা। নিজেরাই রোজ এক মগ করে ঢালছ, আবার নিজেরাই জলে ফেলার কথা বলছ! সমস্যা এখানেই। ভেতরেই গোলমাল, আবার ভেতরেই প্রশ্ন। প্রশ্ন এড়াতে হলে 'ম্যানেজ' কর। এখন যে যত ভালো ম্যানেজার সে তত ভালো লিডার। মাঝেমধ্যে মনে হয়, হয়তো এমন একটা সময় আসবে যখন দলের মাথায় এম. বি. এ. পাস করা ছেলে-মেয়েদের বসাতে হবে। সবই তারা দেখবে। অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার, অ্যাকশন ম্যানেজারের পোস্ট থাকবে।

বিরক্তি লুকিয়ে তপন গুছাইত শান্ত গলায় বললেন, 'আহ্, এর মধ্যে লেখাপড়ার কী আছে? স্টুডেন্টস ইউনিয়ন গোলমাল পাকাচ্ছে। যা করার পলিটিক্যালি করতে হবে। প্রিন্সিপাল নিজে এসেছেন। আপনি ওঁকে ডেকে কথা বলুন। ইয়ং ব্লাড ট্যাকল করতে আপনি তো এফিশিয়েন্ট মানাবাবু।'

মানা সরকার মুখ দিয়ে 'চুক চুক' ধরনের আওয়াজ করে বললেন, 'ইস্, এটা দলের দাদা-দিদিরা যদি বুঝত। যাক ইউনিয়ন কাদের?'

'কাদের আবার, আমাদের। সেইজন্যই তো আমাদের কাছে এসেছে।'

'আহা, আমাদের বললে তো হবে না, কোন্ আমাদের সেটা তো জানতে হবে। আমরা কি একটা? শুধু আমাদের জেলাতেই সাতরকম আমরা আছি।'

boierpathshala.blogspot.com

তপন গুছাইত মাথা নামিয়ে টেবিলের ওপর রাখা কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে বললেন, 'সেসব কিছু নয়। শুনলাম, ইউনিয়ন সেক্রেটারির নাম ফটিক। অতি ফক্কড় ছেলে।'

মানা সরকার চোখ তুলে বললেন, 'ফটিক! ফটিকটা কে?'

'সেরকম কেউ নয় নিশ্চয়। অন্তত জেলা লেভেল পর্যন্ত নাম আসার মতো তো নয়-ই।'

মানা সরকার আড়মোড়া ভেঙে বললেন, 'ঠিক আছে আপনি যখন বলছেন, তখন দেখছি। কিন্তু ওই ফটিক না মটিক বিজয় সান্যালের ছেলে হলে আমি কিন্তু হাত তুলে নেব, এই বলে রাখলাম।'

এরপরই কলেজের প্রিন্সিপালকে নিয়ে ঘরে বসেছিলেন মানা সরকার। ছেলেদের দাবি সত্যি বেয়াড়া। শুধু বেয়াড়া নয়, অতিরিক্ত রকমের বেয়াড়া। তারা চায় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগেই ইউনিয়নকে দেখাবে। ইউনিয়ন দেখবে প্রশ্ন কঠিন হয়েছে কিনা। কঠিন প্রশ্ন দিয়ে 'কচি মনে' চাপ সৃষ্টি চলবে না। ছেলেরা প্রশ্ন দেখে সন্তুষ্ট হলে তবেই প্রশ্নপত্র ছাপতে যাবে, নইলে নয়। এই দাবি মেটানো না হলে কালিকানগর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ 'বৃহত্তর আন্দোলন'-এ পা বাড়াতে বাধ্য হবে। ঘটনা শোনার পর মানা সরকারের মনে হল, ছেলেগুলোকে এখনই ডেকে পাঠিয়ে গালে দুটো করে চড় দেওয়া দরকার। চড় দেওয়ার কাজে দেরি করা যাবে না। দেরি করলে ভবিষ্যতে বিপদ বাড়বে। তখন আর শুধু চড়ে কিছু হবে না। এখন প্রশ্ন দেখতে চাইছে, এরপর বলবে পরীক্ষার খাতাও ইউনিয়ন থেকে দেখা হবে। প্রথমে তারা নম্বর দেবে, তারপর মাস্টাররা।

মানা সরকার নিজেকে সামলালেন। ভেতরের রাগ বাইরে দেখানোর প্রশ্ন ওঠে না। ঘটনার পিছনে 'ইয়াং ব্লাড' আছে। ইলেকশন এসে যাচ্ছে। এই 'ইয়াং ব্লাড'কে গ্রামে পাঠাতে হবে। প্রিন্সিপাল তো আর ভোট দেখবে না, ভোট দেখবে 'ইয়াং ব্লাড'। যাদের সঙ্গে লড়তে হবে তারা সহজ ব্যাপার নয়।

মানা সরকার গলায় গাম্ভীর্য এনে প্রিন্সিপালকে বললেন, 'ছেলেরা একটু-আধটু দাবি তো করবেই স্যার।'

প্রিন্সিপাল সাহেব থতমত খেয়ে বললেন, 'এটা একটু হল? প্রশ্ন দেখাতে হবে?'

মানা সরকার ভুরু কুঁচকে বললেন, 'প্রশ্ন কি আপনাদের খুব কঠিন হয় নাকি?'

boierpathshala.blogspot.com

'কলেজ পরীক্ষার প্রশ্ন কঠিন তো হবেই। তবে সারাবছর লেখাপড়া ঠিকমতো করলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

গাম্ভীর্য সরিয়ে মানা সরকার এবার হাসলেন।

'আসলে কী জানেন, সবাই তো সারাবছর পড়াশোনা নিয়ে থাকতে পারে না। নিজের কেরিয়ার ছাড়াও দেশ, মানুষ বলে কিছু কিছু বিষয় আছে। আমাদের দুর্ভাগ্য অনেকে সেটাও ভাবে। সবাই যদি নিজের পরীক্ষা, নিজের রেজাল্ট, নিজের কেরিয়ার নিয়ে ভাবি তাহলে দেশটা দেখবে কারা? এই দেশ কি স্বাধীন হত?'

'তা বলে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হবে!'

মানা সরকার চোখ বড়ো করে বললেন, 'এই কথাটা আপনি কী বলছেন! কত মানুষ সব ত্যাগ করে জেলে বছরের পর বছর পচেছেন, প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছেন। কোথায় স্কুল কলেজ? কোথায় পরীক্ষা? কোথায়ই-বা স্ত্রী, পুত্র, পরিবার? আপনিই বলুন না।'

প্রিন্সিপাল হতাশ গলায় বললেন, 'তার মানে প্রশ্নপত্র দেখাতে হবে?'

মানা সরকার বুঝলেন কথাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। তিনি হাত তুলে বললেন, 'না-না, সে-কথা একেবারেই বলছি না। তবে আপনাদেরও ভাবতে হবে। যেসব তরুণ আজ প্রলোভনের হাতছানি ছেড়ে মানুষের জন্য কাজ করছে তাদের সুবিধে-অসুবিধেটাও একটু দেখতে হবে।'

'কীভাবে দেখব?'

'আলোচনা করব। যুব-সমাজের সঙ্গে বসব।'

'যুবসমাজ! ইউনিয়নের ছেলেরা তো বসতেই চাইছে না। বলছে কলেজ বন্ধ করে দেবে।'

মানা সরকার মৃদু হাসলেন। ছেলেদের হয়ে অনেকটা বলা হয়ে গেছে। আর নয়। এবার কলেজের হয়ে বলতে হবে। ব্যালান্স চাই।

'বন্ধ করে দেব বললেই তো বন্ধ করা যায় না। এখন খোলা বন্ধ সবেতেই অনুমতি লাগে। ডিসিপ্লিন বলে একটা ব্যাপার আছে। একসময় প্রচার ছিল, কর্মীদের ওপর আমাদের নাকি কোনো কন্ট্রোল নেই। সেটা যে কতবড়ো মিথ্যে এখন সেটা আমরা মানুষকে বোঝাতে পেরেছি। পেরেছি বলেই, আপনি আমাদের কাছে ছুটে এসেছেন। চিন্তা করবেন না। আমি বিষয়টা দেখব। দরকার হলে ওই ফটিক না কী নাম যেন ছেলেটার? তাকে ডেকে পাঠাব। শিক্ষা হল জাতির মেরুদণ্ড। সেই মেরুদণ্ডকে আমাদের সবাই মিলে রক্ষা করতে হবে।

boierpathshala.blogspot.com

সেখানে কোনোরকম গোলমাল হোক আমরা বরদাস্ত করব না। একটা কলেজ ইউনিয়নে আমরা ক্ষমতায় আছি মানে এই নয় যে সবকটায় আমরা আছি। আজ আমাদের ছেলেপিলেরা গোলমাল করলে, কাল অন্যরা করবে।'

প্রতুল ব্রহ্ম ঢোঁক গিলে বিড়বিড় করে বললেন, 'আপনারা যা ভালো বোঝেন।'

'আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও বুঝতে হবে স্যার।'

'কী বুঝতে হবে?'

মানা সরকার মুচকি হেসে বললেন, 'প্রশ্ন দেখাতে হবে না, আপনি শুধু খেয়াল রাখবেন, ইউনিয়নের পাজি ছেলেগুলো যেন দুমদাম ফেল করে না বসে। খাতা দেখার সময় বেচারিদের একটু কন্‌সিডার করলেই চলবে। প্রশ্ন দেখাতেও হল না, আবার ছেলেগুলোকে ফেলও করতে হল না। কী, সলিউশনটা কেমন লাগছে?'

কথা শেষ করে মানা সরকার সামান্য ঝুঁকে পড়লেন। প্রতুল ব্রহ্ম বুঝলেন এটা যেমন একটা সমাধানের পথ, তেমন একটা হুমকিও বটে। এতে রাজি না হলে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। গোটা কলেজের পরীক্ষা পণ্ড হওয়ার থেকে এই ভালো। গোটা দশ বারো ছেলেকে নম্বর বাড়িয়ে পাস করিয়ে দিলে ল্যাঠা চুকে যাবে। তিনি নিমরাজি-হওয়া-গলায় বললেন, 'এই সিদ্ধান্ত তো আমি একা নিতে পারব না। অন্য টিচাররা আছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

মানা সরকার গলা নামিয়ে বললেন, 'এ আর সিদ্ধান্ত অ-সিদ্ধান্তের কী আছে স্যার? ঢাকঢোল পিটিয়ে মিটিং করার তো ব্যাপার নয়। কয়েকজন টিচারকে ডেকে বলে দেবেন। আমিও ছেলেদের জানিয়ে দেব। ব্যস, সমস্যা মিটে গেল।'

এরপরই মানা সরকার প্রিন্সিপাল সাহেবকে তাঁর চিত্তশুদ্ধি কর্মসূচিতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। 'বেশিক্ষণ নয়, ঘণ্টাখানেকের জন্য গেলেই হবে।'

প্রতুল ব্রহ্ম আমতা আমতা করে বললেন, 'আমি আপনাদের দলের কেউ নই, ওসবে গিয়ে আমি বিপাকে পড়ব না তো?'

মানা বললেন, 'এই প্রোগ্রাম দলের নয় স্যার। এ একেবারেই আমার নিজস্ব। জ্ঞানীগুণী মানুষের জীবনকথা, সংগ্রাম, লড়াইয়ের কথা পাঁচটা মানুষকে শোনানোর পারসোনাল একটা প্রয়াস। আপনাদের মতো নামি দামি পণ্ডিত মানুষের মুখ থেকে সে-কথা শুনলে কথার দাম ডবল হয়ে যায়। এটায় স্যার না

boierpathshala.blogspot.com

করবেন না, বড়ো দুঃখ পাব। আপনাকে যখন পেয়েই গেলাম, ছাড়ছি না কিছুতেই। কলেজ নিয়ে চিন্তা করবেন না, ওটা এখন আমার বিষয়।'

প্রতুল ব্রহ্ম বুঝতে পারলেন, নেতার এই আবদার মেনে নিতে হবে। তাকে যেতে হবে। কলেজ যদি ঠান্ডা ভাবে চালাতে হয়, নিজেকেও ঠান্ডা মাথায় চলতে হবে।

সেইমতো কর্মসূচি চলছে। প্রতুলবাবু ক্লাসে ছাত্র পড়ানোর অভ্যস্ত গলায় চেয়ারে বসে নিজের রচনা পড়ছেন—

'বাংলার তথা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে আলোকপাত করলে বেদবেদান্তে শিক্ষিত মহিলার ভূমিকা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। রুক্মিণী, লীলাবতী, চিত্ররেখা, মৈত্রেয়ী তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। চৈতন্য যুগে জাহ্নবী দেবী, সুভদ্রা দেবী, হেমলতা দেবীর মতো শিক্ষিতা মহিলার কথাও জানা যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে মহিলাদের দার্শনিক আলোচনায় অংশগ্রহণের ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। অষ্টাদশ শতকের ব্রিটিশ শক্তির সাহায্যে তৈরি হওয়া অভিজাত পরিবারে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ছিল। ১৮৪২ সালে বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিত নেটিভ ফিমেল এডুকেশন প্রবন্ধে সেই সময়ের বেশ কিছু বিদুষী মহিলার নাম জানা যায়। তাঁদের মধ্যে আছেন...।'

মাটিতে পাতা চাটাইতে বসে চোখ আধখানা বুজে থাকলেও আসলে 'চিত্তশুদ্ধি'তে মন নেই মানা সরকারের। চোখমুখের শান্তি একটা ভান মাত্র। তাঁর মন চঞ্চল। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি আজ একই সঙ্গে বাড়ির বাইরে ভেতরে দু-ধরনের কর্মসূচি ফেলেছেন। এখন দেখার এই ভাবনা কতটা কাজে দেয়। চিত্তশুদ্ধিতে স্থানীয় মানুষ যাদের ডাকা হয়েছে তারা এসে ঘাবড়ে গিয়েছিল।

'ঘটনা কী মানাবাবু! একেবারে স্টেজ বেঁধে, মাইক লাগিয়ে?'

'আর বলবেন না। ছেলেপিলেদের কত করে বারণ করলাম, ওরে বাবা তোরা এসব করিস না, করিস না। আমি ভোটে দাঁড়াব না। তোরা তো কোন্ ছার, দল বললেও দাঁড়াব না। কে শোনে কার কথা?'

'কেন? দাঁড়াবেন না কেন? আপনি জিতলে তো ভালোই হবে দাদা। মানুষের জন্য কাজ করবেন।'

'ভাই রে, ভোটে জেতা মানেই ক্ষমতা, অহংকার। আমি সেই মানুষ নই রে ভাই। আমি হলাম সবার সঙ্গে মিশে থাকার মানুষ।'

'বাইরে যে এসব চলছে?'

'সে আর আমি কী করব? আন্দোলন করার অধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার।

boierpathshala.blogspot.com

আমি তো বারণ করতে পারি না। তবে বোকাগুলো বুঝতে পারছে না, এতে কোনো লাভ হবে না। চাপের কাছে মাথা নীচু করার মানুষ মানা সরকার নয়। যাক, ছাড়ুন ওসব। ঘরে এসে বসুন, একটু পরেই প্রোগ্রাম শুরু হবে। আজ বড়ো পণ্ডিত এক মানুষকে পেয়েছি। কলেজের প্রিন্সিপাল...।'

কাল সন্ধের সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মানা। ছেলেদের দু-চারজনকে ডেকে বলেন, 'কাল সকালেই বসে যাবি।'

'একেবারে কালই?'

'হ্যাঁ, কালই।'

'হাতে একটা দিন সময় পেলে ভালো হত দাদা। গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে পারতাম না।'

'গাধার মতো কথা বলিস না। গোছগাছের কিছু নেই। একটা স্টেজ বানাবি, দুটো মাইক বাঁধবি। তারপর সারাদিন চিল্লাবি। ব্যস, এই তো। কালকের দিনটা সবদিক থেকে উপযুক্ত। সকালে চিত্তশুদ্ধি, বিকেলে জেলা।'

'দাদা, পোস্টার সাঁটব?'

'সাঁটবি, তবে বাড়াবাড়ি করবি না। স্টেজের পিছনে দু-চারটে লাগাবি।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'না করলেই ভালো হয়। গাধাদের কথার উত্তর দিতে ভালো লাগে না। তবু বল।'

'তুমি কি দাদা সত্যি সত্যি ইলেকশনে দাঁড়াবে?'

'খেপেছিস? একটা টিকিটের দাম জানিস? ইলেকশনে দাঁড়ানোর থেকে ইলেকশনে দাঁড় করানোয় অনেক প্রফিট। আর দাঁড়াতে হলে বড়ো জায়গার কথা ভাবব। পঞ্চায়েত-ফঞ্চায়েতে কি মানা সরকারকে মানায়?'

'তাহলে এতসব করে লাভ কী?'

মানা দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, 'উফ্ তোদের মাথার গোবর যদি একটু কমানো যেত। ওরে গর্দভ একে বলে চাপ। জেলার ওপর চাপ রাখছি। নিজের পপুলারিটির চাপ, স্যাক্রিফাইজের চাপ। যাক, অত জেনে তোদের দরকার নেই। তোরা এখনই কাজে লেগে যা। টাকাপয়সা যা লাগে নিয়ে নিবি।'

'দাদা, পোস্টার, স্লোগানটা যদি বলে দিতে।'

মানা সরকার ধমক লাগান।

'হারামজাদা, এতদিন রাজনীতি করছ, দুটো পোস্টার লিখতে পারছ না? দূর হ' সামনে থেকে।'

boierpathshala.blogspot.com

এখন মনে হচ্ছে, কাজটা ঠিক হয়নি। পোস্টারগুলো দেখে দেওয়া উচিত ছিল। গাধাগুলো কোন্ আক্কেলে 'মানা সরকার তোমায় আমরা ভুলছি না, ভুলব না' লেখে? মানা সরকার কি মরে গেছে? শুধু লেখে না, মাঝেমধ্যে স্লোগানও দিচ্ছে!

চিত্তশুদ্ধি কর্মসূচি শেষ হওয়ার পরপরই খবর এল বাইরের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নতুন এক মানুষ যোগ দিয়েছে। লোকটা এসেছিল মানা সরকারের সঙ্গে দেখা করতে। বাড়ির সামনে এই কাণ্ড দেখে উৎসাহে এগিয়ে যায়। গাব্বু তাকে ঘটনা বলে। সেই লোক আর এক মুহূর্ত দেরি করেনি। নড়বড়ে মঞ্চে উঠে বসেছে এবং সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে স্লোগান দিচ্ছে। পুরো স্লোগান নয়, চোখ মুখ লাল করে স্লোগানের ধরতাইটুকু শুধু দিচ্ছে। উৎসাহ দেখার মতো।

এই লোকের বাড়ি ঝিলডাঙায়। এই লোকের নাম কাদু।

খবরটা শুনে মানা সরকার খুশি হলেন।

boierpathshala.blogspot.com

পঁয়ত্রিশ

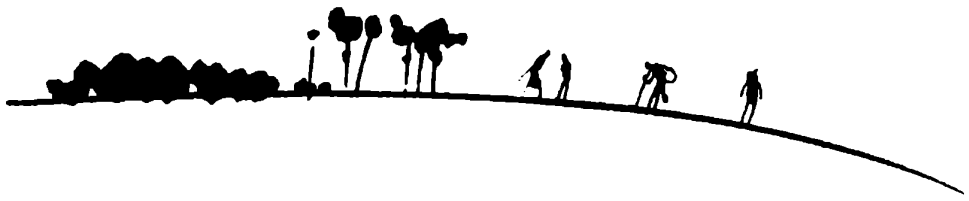

'টাকাপয়সার কথা আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আপনি শুধু রাজি কিনা বলুন।'

কথা শেষ করে মহিলা তাঁর কপালে-ঝুঁকে-পড়া চুলগুলো বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে পিছনে ঠেললেন।

কমল মল্লিক এতক্ষণ ভালো করে তাকাননি, এবার মুখ তুলে দেখলেন। মহিলার বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কাছাকাছি। গায়ের রং ফর্সাও না, আবার কালোও নয়। মাঝামাঝি। কাটা কাটা চোখমুখ। ঘাড় পর্যন্ত ছোটো চুল। উজ্জ্বল চোখের তলায় হালকা কালোর ছোঁয়া চোখদুটোকে আরও উজ্জ্বল করেছে। ঠোঁটের হালকা লিপগ্লস, গালের সামান্য পাউডার কোনোটাই উগ্র নয়। শাড়ির রং মেরুন। কে যেন বলেছিল শ্যামলা রঙে মেরুনই সবথেকে ভালো যায়। কে বলেছিল? কমল মল্লিক মনে করবার চেষ্টা করলেন। মনে পড়ছে না। কে জানে হয়তো মল্লিক টিভির কোনো মেকআপ ম্যান। এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায়, মহিলার গোটা উপস্থিতির মধ্যে একটা অভিজাত, বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব রয়েছে। এর বসার কায়দাটাও আলাদা। এই ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকসময়েই মেয়েরা কর্তা-ব্যক্তিদের উলটোদিকের চেয়ারে কেমন একটা 'এলিয়ে' থাকে। দেখলে মনে হয়, শিরদাঁড়ায় কোনো সমস্যা চলছে। চট করে সোজা হয় না। কাজের প্রতিশ্রুতি পেয়ে যখন ঘর থেকে বের হবে তখন সোজা হবে। এই মহিলার বেলায় ঘটনা তা হয়নি। ইনি বসেছেন পিঠ সোজা করে। যেন বলতে চাইছেন, না, সব মেয়ের শিরদাঁড়ায় সমস্যা নেই। তাঁরও নেই।

প্রীতি শর্মা। কয়েকবছর মুম্বাইতে কাজ করার পর কিছুদিন হল এখানকার

boierpathshala.blogspot.com

টিভি জগতে প্রবেশ করেছেন। অভিনেত্রী হিসেবে আসেননি, এসেছেন পরিচালক, প্রযোজক হিসেবে। নিজে বাঙালি হলেও স্বামী মহারাষ্ট্রের মানুষ। অন্য জগতের ব্যবসায়ী। স্ত্রী-র বহুদিনের ইচ্ছে নিজের ভাষায় কাজ করবে, বাংলায়। তিনিই জোর করেছেন— 'যাও, কাজ করো। ফাইনান্স উইল নট বি দ্য প্রবলেম।'

তারপরই প্রীতির কলকাতায় আসা এবং সমস্যায় পড়া। টাকার সমস্যা নয়, সমস্যা অন্য। সমাধানের জন্য পথ খুঁজছেন। কমল মল্লিকের কাছে ছুটে আসাও সেই কারণে।

প্রীতি শর্মার কাজের তালিকা এখনও বড়ো নয়। কয়েকটা টেলিফিল্ম, একটা গানের অনুষ্ঠান, খান তিনেক সিরিয়াল। তা-ও মাঝপথে একটা আবার বন্ধ হয়ে গেছে। তবে কিছুদিন হল রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প নিয়ে টেলিফিল্মের একটা সিরিজ বানিয়ে খানিকটা সাড়া ফেলেছেন। ঠুনকো হাসিঠাট্টা, একঘেয়ে শাশুড়ি-বউ আর পরকীয়াসর্বস্ব মেগা সিরিয়ালের বাজারে রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে টানা কাজ করবার মতো ঘটনা অনেকদিন পর দেখা গেল। সেই কারণেই সাড়া।

কমল মল্লিক চাপা মুগ্ধতা নিয়ে প্রীতি শর্মার দিকে তাকালেন। মুগ্ধতার কারণ ঝকঝকে চেহারা বা রবীন্দ্রনাথের টেলিফিল্ম নয়। কারণ অন্য। এই মহিলা এমন একটা কাণ্ড করেছেন যাতে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই।

মুগ্ধতা গোপন করতে করতে কমল মল্লিক বললেন, 'টাকাপয়সা-ই সব নয়, এ ব্যবসায় আরও অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে মিসেস শর্মা। আপনি নিশ্চয় এতদিনে সেগুলো জেনে গেছেন।'

প্রীতি শর্মা সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'জানি বলেই তো একসঙ্গে কাজ করতে চাইছি। আমি শুনেছি, ইন্ড্রাস্টিতে মল্লিক টিভির একটা অন্যরকম সুনাম আছে। ইউ হ্যাভ কারেজ। ভালো কাজ করতে গেলে টাকার সঙ্গে এই জিনিসটা এখানে এখন খুব দরকার। আদারওয়াইজ, সফটওয়্যারগুলোর ভাষাই শুধু বাংলা হবে। সেখানে সত্যিকারের বাংলার কিছু থাকবে না।'

নিজের প্রশংসায় গলে যাওয়ার মানুষ কমল মল্লিক নয়। সৌজন্যর হাসিটুকু হেসে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ। আমার মনে হয়, আপনি আমাদের সম্পর্কে একটু বেশি শুনেছেন। সাহস নিয়ে এ লাইনে কাজ করার দিন শেষ হয়ে গেছে। ওসব প্রথমদিকে হত। এখন আমরাও বাজারের মতো চলি। আর পাঁচটা প্রোডাক্টের মতো।'

boierpathshala.blogspot.com

প্রীতি সামান্য হাসলেন। বললেন, 'আমি হাতে তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ করার কথা বলছি না মিস্টার মল্লিক। সত্যিকারের ভালো কিছু করার সাহস বলছি। সব নয়, দু-একটা ঠিকঠাক কাজ করতে পারলেও স্যাটিসফ্যাকশন হয়। মুম্বাই থেকে এমনি ছুটে আসিনি। ওখানে কাজ অনেক, পয়সাও অনেক।'

কাল টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছিলেন প্রীতি। নাম শুনে কমল মল্লিক চমকে উঠলেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে দেরি করেননি। আজ সকালেই সব কাজ বাদ দিয়ে সময় করেছেন। এই মহিলা সম্পর্কে বাজারে এখন খবর গরম। গত সপ্তাহের এক মেঘলা সন্ধেতে প্রীতি শর্মা বাংলা টিভি জগতের এক মাতব্বর চিফ প্রোডিউসারের গালে সপাটে একটি চড় কষিয়েছেন। শোনা যায়, চড় খাওয়ার পর সেই প্রোডিউসার এতটাই হতভম্ব হয়ে পড়ে যে সে তার অন্য গালটাও বাড়িয়ে দেয়। শান্ত চেহারার প্রীতি নাকি তখন সেই গালেও চড় লাগায়!

চড় খাওয়া সেই যুবকের নাম সম্রাট। সম্রাট দত্ত। আলো চ্যানেলে অলিখিত হর্তা-কর্তা। পশ্চিমবঙ্গে টিভি চ্যানেলে প্রোগ্রাম কেনাবেচা করে ব্যবসা করা একজনের পক্ষে সম্রাট দত্তকে চড় মারা কোনো সহজ কথা নয়। তার ওপর মহিলা।

এই মহিলাকে দ্রুত অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া ছাড়া আর কি উপায় ছিল কমল মল্লিকের?

'আপনি আমার কাছ থেকে ঠিক কী ধরনের সাহায্য চান মিসেস শর্মা?'

'কোনো ধরনের সাহায্যই চাই না। আমি আপনার সঙ্গে বিজনেস ডিলে যেতে চাইছি। একসঙ্গে কাজ করতে চাই।'

শুরু থেকেই কথা স্পষ্ট এবং সরাসরি। কিছু মানুষ আছে যাদের দেখলেই বোঝা যায়, এরা সরাসরি কথায় বিশ্বাসী। প্রীতি সেরকমই একজন। কমল মল্লিক সোজা হয়ে বসলেন। সম্রাট দত্তকে চড় মারার ইচ্ছে তাঁরও হয়েছে। আলো চ্যানেলের নতুন অর্ডার পাওয়ার পর যেদিন লোকটার সঙ্গে রেস্তোরাঁয় বসেছিলো, সেদিনই হয়েছিল। ইন্ডাস্ট্রিতে আরও অনেকেরই এই ইচ্ছে আছে। চড়ের থেকে বেশি ইচ্ছেই আছে। পশ্চাদ্দেশে লাথি মারার ইচ্ছেও আছে। অনেকেই আড়ালে বলে—'দত্ত শুয়োরের বাচ্চাটাকে পাছায় লাথি কষালে ঠিক হয়।' সাহসে কুলোয় না। আলোর হাতে কাজ অনেক। সম্রাট তুড়ি মেরে সেই কাজ বন্ধ করে দিতে জানে। মল্লিক টিভি নিজে ভুক্তভোগী। তখন লাইনে টিকে থাকা কঠিন হবে। গত সপ্তাহে প্রীতি শর্মার চড়ের খবর যখন চাউর হয়ে পড়ে

boierpathshala.blogspot.com

তখন আসল খবরের সঙ্গে অনেকরকম মিথ্যে খবরও ইন্ডাস্ট্রিতে ছড়িয়েছিল। কেউ বলল, সম্রাটই নাকি প্রথমে গালে হাত দেয়। চড়ের হাত নয়, আদরের হাত। কেউ বলছে, ওসব গায়ে হাত-টাত দেওয়ার কেস নয়, নিশ্চয় টাকাপয়সার ব্যাপার। দত্ত মেয়েমানুষের থেকে টাকাপয়সায় আদর করতে বেশি পছন্দ। ঘুষের টাকায় তার একধরনের এক্সাইটমেন্ট আসে। মেয়েমানুষ তাকে সেই উত্তেজনা দিতে পারে না।

সত্যি কী ঘটেছিল?

জানার জন্য সকলেরই কৌতূহল। কিন্তু ঘটনাটা নিয়ে কেউই বেশি খোঁচায়নি। সম্রাটের কানে গেলে সমস্যা। তার গালের চড় নিয়ে কথা চলছে শুনলে বিপদ। কিন্তু আজ ঘটনা অন্য। 'আসামি' একেবারে সামনেই হাজির। স্বাভাবিকভাবেই কমল মল্লিকের মনে কৌতূহল বাড়ছে। চড়ের ঘটনা কোনো পাবলিক প্লেসে ঘটেনি, তাই সবটা স্পষ্ট নয়। কতটা সত্যি, কতটা গুজব জানা যায়নি। সম্রাট দত্তের বাড়ি বেহালা। কিন্তু পার্টির সঙ্গে ডিল করার সময় কখনওই এই লোক নিজের বাড়িতে বসে না। সম্ভবত বাড়ির লোকের সামনে 'ঘুষ' নিয়ে কথা বলতে অসুবিধে হয়। এটা স্বাভাবিক। ঘুষ মারাত্মক জিনিস। যারা ঘুষে স্বস্তি পায়, তারা স্ত্রী-পুত্র পরিবারের সামনে ঘুষের কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করে।'কাজ' সারে বাইরে। মল্লিক টিভির মতো ছোটো পার্টি হলে রেস্তোরাঁয় বসে 'কাজ' হয়। মেগা সিরিয়াল-টিরিয়াল হলে 'কাজ'-এর জন্য হোটেল নিতে হয়। শোনা যায়, চ্যানেলে সিনেমা কেনাবেচার ব্যাপার থাকলে আলোচনার জন্য ছোকরা ডায়মন্ডহারবার বা রাজারহাটে রিসর্ট পর্যন্ত নেয়। পার্টিকেই খরচাপাতি দিতে হয়। বিল অবশ্য নিজেই বগলদাবা করে সম্রাট দত্ত। ঘুতুনিয়াকে দেখায়, 'গেস্ট এন্টারটেইনমেন্ট'-এর খরচ। লাভের ওপর লাভ। সম্রাট দত্ত সম্পর্কে এত কিছু কমল মল্লিক আগে জানতেন না। আগ্রহও ছিল না। লোকটার সঙ্গে কাজ করতে হবে জানার পর কানে এসেছে।

প্রীতি শর্মার চড় কোথায় হল? হোটেল না রিসর্টে?

কমল মল্লিক নিজের কৌতূহল গোপন রেখে অল্প হাসলেন। তারপর জল-টেবিলে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'মিসেস শর্মা, যদি কিছু মনে না করেন তাহলে কতগুলো প্রশ্ন করার ছিল।'

'অবশ্যই করবেন। আলোচনায় যখন বসেছি, তখন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার ডিউটি, তবে প্রথম প্রশ্নটা শোনবার আগেই যদি অনুমতি দেন আমি উত্তরটা বলতে পারি।'

boierpathshala.blogspot.com

কমল মল্লিক ভুরু কোঁচকালেন। মহিলা সত্যিই বুদ্ধিমতী। একটু নয়, বেশি বুদ্ধিমতী। বাংলা ঝরঝরে। তবে বলার কায়দায় একটা অবাঙালি টান আছে।

'আমার সম্পর্কে আপনি নিশ্চয় অনেকটাই ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছেন। আলো চ্যানেলের সঙ্গে গোলমাল হওয়ার পর আমি অন্য কোনো চ্যানেলের সঙ্গে কথা না বলে কেন আপনার কাছে এলাম? আমি আর নির্দিষ্ট কারও সঙ্গে টাই-আপ হতে চাই না। স্বাধীনভাবে প্রোগ্রাম করে স্বাধীনভাবে বেচতে চাই। একজনকে বেচতে ইচ্ছে না করলে অন্যজনকে বেচব।'

'আপনি নিজেই একটা কোম্পানি করে ফেলছেন না কেন? আলাদা সেটআপ?'

'আমি প্রোগ্রাম করতে চাই মিস্টার মল্লিক। বিজনেস নয়। বিজনেস করতে গেলে আবার কোনো না কোনোভাবে বাঁধা পড়ে যেতে হবে। আমি মনে করি, জাস্ট নাউ টিভি মিডিয়া ইজ মোস্ট পাওয়ারফুল। এখানে সুস্থ সুন্দর রুচি সম্পন্ন কাজ করার জন্য বহু ভালো ছেলেমেয়ে রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের এক্সপ্লয়েট করা হয়। এটা বন্ধ না হোক কমানো দরকার। হুইচ ইজ ভেরি টাফ। আমি একা পারব না, সঙ্গে অন্যদের চাই।'

কমল মল্লিক চুপ করে রইলেন। মহিলার কথাগুলো নীতিকথার মতো শোনাচ্ছে। এর অর্থ ধাক্কা এখনও তেমন জোর হয়নি। অসুবিধে নেই, আরও কিছুদিন কাজ করলে ধাক্কা জোরদার হবে এবং নীতি টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। তবে শুনতে বেশ লাগছে। কমল মল্লিক চুপ করেই রইলেন। প্রীতি শর্মা বলতে থাকেন।

'আপনাদের এখানে টিভি মিডিয়া খুব বেশিদিন হয়নি। মুম্বাই বা সাউথ ইন্ডিয়াতে বয়স অনেক বেশি। কিন্তু আনফরচুনেটলি, এখানকার ছেলেমেয়েরা দুর্নাম কুড়িয়েছে বেশি। আমি কাজ করতে এসে দেখলাম, ঘটনা কিন্তু একেবারেই সত্যি নয়। এখানকার ছেলেমেয়েরা খুব এফিশিয়েন্ট। বাংলার আর্টিস্টরা যে কতটা পরিশ্রমী আর সিরিয়াস আমি নিজে কাজ করতে গিয়ে বুঝতে পারছি। রোল পাওয়ার জন্য তারা অলওয়েজ ব্যাকডোরে নক করছে এই ধারণাটাই মিথ্যে। রবীন্দ্রনাথের কাজটা করার সময় দুজন ফিমেল আর্টিস্টের ডেট পেতে আমাকে সিডিউল পর্যন্ত পিছোতে হয়েছে। ওদের ছাড়া আমি শুট করার কথা ভাবতেই পারছিলাম না। শুধু আর্টিস্ট কেন, যারা মিডিয়াটাকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে তারাও এখানে ভেরি মাচ সাউন্ড। কত ইনোভেটিভ চিন্তাভাবনা! কিন্তু

boierpathshala.blogspot.com

বেশিরভাগ সময়েই চান্স পায় না। খুব অল্প কয়েকজনের জন্য এটা ঘটছে। তারা শিল্প-সংস্কৃতিটাকে লোহালক্কড়ের বিজনেস করে দিচ্ছে।'

কমল মল্লিক শান্ত গলায় বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত মিসেস শর্মা। কিন্তু কী করব বলুন? আজকাল কাস্টিং ঠিক করতে গেলেও চ্যানেলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। আমি একটা সিরিয়াল করব, চ্যানেল বলে দেবে, নায়ক-নায়িকা কে হবে। চ্যানেল বলে দেবে মিউজিক কার হবে।'

'আমি বিশ্বাস করি না, এটা সবাই করে। বিশ্বাস করি না বলেই আরও খানিকটা দেখতে চাই।'

'আরও খানিকটা' শুনে কমল মল্লিক ভুরু কোঁচকালেন। প্রীতি শর্মা হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, আরও কিছুদিন সময় আমি এখানে চেষ্টা করব। তারপরেও না পারলে হাল ছেড়ে চলে যাব। দেখুন মিস্টার মল্লিক, আমি যে আপনার কাছেই প্রথম এলাম তা নয়। গত কয়েকদিন আপনার মতো বেশ কয়েকটা কোম্পানির সঙ্গে কথা বলেছি।'

'তারা কী বলল?'

'হোপফুল কিছু নয়। সেটাই স্বাভাবিক। সম্রাট দত্ত-র সঙ্গে আমার ঝামেলাটা ইতিমধ্যেই ভেরি মাচ পাবলিসাইজড। এরপরে আমার সঙ্গে কাজ করতে যাওয়া মানে রিসোর্সফুল একটা চ্যানেলের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করা।'

কমল মল্লিক সুযোগটা ছাড়লেন না। ঠোঁটের ফাঁকে হেসে বললেন, 'চ্যানেলের ওনার কিন্তু খারাপ নন। সহজ, সরল মানুষ। ব্যবসা করতে চান। ব্যবসা করতে চাওয়াটা তো অন্যায় কিছু নয়। আপনি কি খাবেন? চা বলব? কফিও খেতে পারেন। তবে আমাদের এখানে কফিটা ঠিকমতো বানাতে পারে না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, আমি কিছু খাব না। আমি কিন্তু একবারও বলছি না, এখানকার চ্যানেলগুলোতে যাঁরা ইনভেস্ট করছেন, তাঁরা সব খারাপ লোক। খারাপ হলে আমি যেটুকু কাজ করতে পেরেছি তাও পারতাম না। বিজনেস তো করতেই হবে। বিজনেস হলে তবেই ইন্ডাস্ট্রি টিকে থাকবে। কত মানুষের আর্নিং জড়িয়ে আছে। কয়েক বছর আগেও বাড়ির মেয়ে অভিনয় করলে বাবা মা-র মুখ শুকিয়ে যেত। অভিনয় শখে করা যায়, ভাত জোটে না। এখন সিচুয়েশন বদলেছে। মুম্বাইতে অনেকদিনই বদলেছে, এখানে কিছুদিন হয়েছে। এখন বাড়ির মেয়ে তো দূরের কথা, পাশের বাড়ি মেয়ে টিভি-স্টার হলে ইউ ফিল প্রাউড ফর দ্যাট।

boierpathshala.blogspot.com

সবাইকে গর্ব করে বলেন, ওই মেয়ের পাশের ফ্ল্যাটে থাকি। তাই না? সমস্যাটা আসলে অন্য জায়গায়।'

কমল মল্লিক মিটিমিটি হাসলেন। প্রীতি শর্মা কি সামান্য উত্তেজিত? তাই হবে।

'সমস্যাটা কোথায়?'

'কোথায় আপনি আমার থেকে ভালো জানেন। তবু বলছি, আপনাদের এখানে মাঝখানে কিছু ফড়ে তৈরি হয়েছে। সম্রাট দত্তের মতো কিছু দালাল, স্কাউন্ড্রেল। এইসব অযোগ্য মানুষ গ্রোয়িং ইনডাস্ট্রিটাকে নষ্ট করবার খেলায় মেতেছে। সংখ্যায় এরা খুব বেশি নয়, তবু কথায় আছে না, একটা রটন আপেল-ই গোটা ঝুড়িটাকে খারাপ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এই লোকগুলো তাই করছে। আজ আলো চ্যানেলকে ডোবাচ্ছে, কাল অন্ধকার চ্যানেলে গিয়ে ডোবাবে। মালিক ব্যবসা থেকে পাততাড়ি গোটাবে। লোকটাকে আমি এমনি এমনি হিট করিনি। আপনি কি ঘটনাটা শুনেছেন?

'শুনেছি। সবটা জানি না।'

'যদি জানতে আগ্রহী হন আমি বলতে পারি।'

কমল মল্লিক নিজেকে সামলে বললেন, 'আমার আগ্রহ নেই।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে শান্ত ভঙ্গিতে প্রীতি শর্মা বললেন, 'তাও আপনাকে বলা উচিত। আপনার সঙ্গে কাজ করতে চাইছি যখন সবটা জানানো দরকার। মিস্টার মল্লিক, হ্যাভ ইউ মিট দ্যাট ফেলো?'

কমল মল্লিক মুহূর্তখানেক চুপ করে রইলেন। এই মহিলাকে এত কিছু বলা কি উচিত হবে? মনে হচ্ছে, বলা উচিত হবে না। মাত্র কিছুক্ষণের পরিচয়। তারপরেও কেন জানি খানিকটা বলতে ইচ্ছে করছে। যার সাহস থাকে, মানুষ সম্ভবত তার কাছে ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও কিছুটা আত্মসমর্পণ করতে চায়। নাকি মহিলার ব্যক্তিত্বের কাছে হার মানতে ইচ্ছে করছে?

মল্লিক নীচু গলায় বললেন, 'আলোতে আমি কাজ করতাম। মাঝখানে আটকে গেল। কাজ একটার পর একটা রিজেক্ট হতে লাগল। প্রথমে ভাবলাম, কোয়ালিটি নিয়ে কোনো গোলমাল হচ্ছে। পরে বুঝতে পারলাম বিষয়টা তা নয়। অথচ মিস্টার ঘুতুনিয়া মল্লিক টিভিকে দিয়ে কাজ করাতে চান। তিনি ওই সম্রাটের সঙ্গে বসতে বললেন। আমি একটা প্রজেক্ট নিয়ে বসেছি। সম্রাটের সঙ্গে বসা এই আমার ফার্স্ট টাইম।'

প্রীতি জল চাইলেন। কমল মল্লিক বেল টিপে জল আনালেন। দু-চুমুক জল

boierpathshala.blogspot.com

খেয়ে প্রীতি বললেন, 'আপনার নতুন প্রজেক্ট সাকসেসফুল হোক আমি চাইব, কিন্তু ইউ শুড বি অ্যালার্ট। ভেরি অ্যালার্ট। এই জিনিসটার আমার অভাব ছিল। আমি সতর্ক ছিলাম না। সেই কারণেই ঘটনা এতটা গড়াল। পরে বুঝতে পারলাম, ওই লোক ডিফারেন্ট ওয়েতে আমার প্রোডাকশন থেকে টাকা সরিয়ে নিচ্ছে। ঘুষের নানারকম টেকনিক আবিষ্কার করেছে। একটা তো সার্ভিস চার্জ ছিলই। স্ট্রেট ওয়ে ফাইভ পারসেন্ট। ক্রিয়েটিভ ইনপুট-এর নাম করে টাকা চাইল। বলল, আমি ক্রিয়েটিভ ইনপুট দেব তুমি টাকা দেবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা নিয়ে কাজ করব, তাতে অন্যের ক্রিয়েটিভ ইনপুটের কী প্রশ্ন উঠছে? বাট আই এগ্রিড। প্রজেক্টের সময় স্কাউন্ড্রেলটা আমার প্রোডিউসারকে বলল, কম্পানিতে একজন স্লিপিং পার্টনার ঢোকাতে হবে। স্লিপিং পার্টনার হবে এক মহিলা, রূপরেখা না কী যেন নাম। সে কোনো ইনভেস্ট করবে না, শুধু প্রফিট শেয়ার করবে। হাউ স্ট্রেঞ্জ!'

কমল মল্লিক বললেন, 'আপনি কি সেই প্রজেক্টে প্রোডিউসার ছিলেন?'

'না, পরিচালনা করেছি। একটা গানের প্রোগ্রাম ছিল। বাংলা ফোক। প্রোগ্রামের নাম দিয়েছিলাম শিকড়। আলো প্রোগ্রামটা দেখাতেও শুরু করল।'

কমল মল্লিক বললেন, 'আমি এই প্রোগ্রামটার সম্পর্কে একটু একটু শুনেছি। রিসার্চ ওয়ার্কের মতো। টি আর পি-ও তো বেশ ওপরের দিকেই ছিল।'

'ঠিকই। বাংলার মানুষের যে লোকসংগীতে ইন্টারেস্ট এখনও হারিয়ে যায়নি সেটা অন্তত বোঝা যাচ্ছিল। আমরা ছোটাছুটি, খাটাখাটনিও খুব করছিলাম। হঠাৎ সম্রাট দত্ত আমাকে বলল, সে বাংলাদেশে যাবে। সেখানকার লোকসংগীত সম্পর্কে খোঁজখবর নেবে। আমার প্রোগ্রামে এরপর বাংলাদেশ পার্টটাও ইনক্লিউড করবে। আমি তো খুব এক্সাইটেড হয়ে পড়লাম। আনডাউটেডলি এতে প্রোগ্রামটা অনেক রিচ হবে। আমি বললাম, কবে যাবেন? সম্রাট বলল, আপনারা যবে অ্যারেঞ্জ করবেন। আমি অবাক হয়ে বললাম, আমরা অ্যারেঞ্জ করব মানে! সম্রাট বলল, বাঃ, আপনাদের প্রজেক্টের জন্য ট্যুরে যাব, আপনারা অ্যারেঞ্জ করবেন না? বেশি খরচের কিছু নেই, দুজনের টিকিট, থাকা আর ঘোরার খরচ। আমি বললাম, উইথ ফ্যামিলি? সে বলল, না ফ্যামিলি নয়, রূপরেখা যাবে। আমি মুম্বাইতে আমার হাজব্যান্ডকে কল করলাম। সে বলল, এতদূর এগিয়েছ, পিছিয়ে আসার কোনো মানে হয় না। প্রসিড করো। মনে লোভ আর খচখচানি নিয়ে রাজি হয়ে গেলাম। অনেকগুলো টাকা খরচ

boierpathshala.blogspot.com

করলাম। সম্রাট পুজোর সময় ওর কেপ্টকে নিয়ে কক্সবাজার বেড়িয়ে এল।'

প্রীতি শর্মা চুপ করলেন। কমল মল্লিক চেয়ারে হেলান দিলেন। সম্রাট লোকটা এতদূর পর্যন্ত যায়!

'শিকড়ে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ পোর্শান ঢোকানো হয়নি। ঢোকানো সম্ভবও ছিল না। ইট ওয়াজ আ ফলস'অ্যাশিওরেন্স। প্রোগ্রামে অল্প নাম করলাম, কিন্তু বড়ো লোকসান হল। তাও চুপ করে রইলাম। ভাবলাম বাইরে থেকে এসেছি, প্রথমদিকে একটু আধটু ঠকতে তো হবেই। তা ছাড়া লাভ-লোকসানটাই তো শেষ কথা নয়। সম্রাট দত্ত আমাকে বলল, চিন্তা করবেন না ম্যাডাম, লস পুষিয়ে দেব, আপনি সিরিয়ালে হাত দিন। প্রাইম টাইমে স্লট দিয়ে দিচ্ছি। এবারও বিশ্বাস করে নেমে পড়লাম। সিরিয়ালের নাম 'আকাশ জুড়ে মেঘ'। গল্পটা ভালো পেয়েছিলাম। কমবয়সি এক সাধারণ মেয়ের লড়াইয়ের গল্প। ঘরে বাইরে সব জায়গাতেই মেয়েটা লড়ছে। ছেলেমেয়েরা কাজ করছিল চমৎকার। এখানকার ছেলেমেয়েদের অ্যাকটিং পার্টস দেখলে চমকে যেতে হয়। ঠিকমতো সুযোগ পেলে তারা তাক লাগিয়ে দিতে পারে। শাঁওলি, মঞ্জিমা, তিথিদের সঙ্গে আপনি নিশ্চয় কাজ করেছেন মিস্টার মল্লিক। সিম্পলি দে আর এক্সেলেন্ট। এর মধ্যে মঞ্জিমা আর তিথি দুজনেই 'ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা'র স্টুডেন্ট ছিল। যাক, ভালো অভিনয় নিয়েও সিরিয়াল টেকঅফ করতে সময় লাগছিল। এত আজেবাজে সিরিয়ালের ভিড়ে ভালো জিনিসের জায়গা পেতে একটু সময় লাগে। সম্রাট বলল, বিজ্ঞাপন প্রথমদিকে কম থাকবে। চিন্তা করবেন না, আমি আমাদের অ্যাড ডিপার্টমেন্টকে ম্যানেজ করে রাখব। প্রাইম টাইমের বিজ্ঞাপনের মেজরটা আপনার 'আকাশ জুড়ে মেঘ'ই পাবে। বোনাসটা অন্যদিকে সরিয়ে দেব। তবে ওয়ান কন্ডিশন। আমাকে রেভিনিউয়ের টেন পার্সেন্ট দিতে হবে। আমি বললাম, ইমপসিবল। আগে টাকা আসুক তারপর। ব্যস, মাঝপথে সিরিয়ালটা আটকে দিল। সে নাকি চ্যানেলে রিপোর্ট দিয়েছে, টিআরপি খুব খারাপ, এ জিনিস চালানো অসম্ভব। আমি এর পরও ওর সঙ্গে বসে ঠান্ডা মাথায় সল্‌ভ করার চেষ্টা করি। এতগুলো টাকা ইতিমধ্যে ইনভলড্ হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েরা কাজ করছে। আর্টিস্ট ছাড়াও টেকনিশিয়ানরা আছে। লোকটা কিছুই শুনল না। উলটে বলল, ওই তো বানিয়েছেন। ঘরের বউ, রান্নাঘরে ঢুকে হাত খুন্তি ধরুন। ক্যামেরা ধরার শখ করছেন কেন? দেন আই হিট হিম। একটাই চড় কষাই।' থামলেন প্রীতি শর্মা। একই কায়দায় কপালের চুল পিছনে সরিয়ে বললেন, 'এরপরে ভেবে দেখুন, আমার সঙ্গে কাজ করতে পারবেন কিনা।'

boierpathshala.blogspot.com

কমল মল্লিক মনে মনে সম্রাট দত্তকে সেলাম জানাল। ঘুষ নেওয়ার এতরকম ফন্দি ফিকির যে বের করতে পারে তাকে সেলাম জানানোই উচিত। পুরোনো পার্টি হলে সবটা সুবিধে করতে পারে না। নতুন লোক হলে গলা টিপে ধরে। প্রীতি শর্মা তো বাইরের লোক। এটা বোঝা যাচ্ছে, বেশি ঘেঁষাঘেঁষি করলে তারও বিপদ আছে। সেই বিপদ সামলানোর ক্ষমতা মল্লিক টিভির থাকবে না। একেবারে ভরাডুবি হতে হবে। সত্যি সত্যি টিভি ছেড়ে গুড়ের ব্যবসায় মন দিতে হবে।

'মিসেস শর্মা, আপনার সঙ্গে কাজ করব কী করব না সেটা তো পরের কথা, আপনি কীভাবে থাকতে চাইছেন সেটা বলুন।'

'আপাতত আমি থাকব পিছনে। আপনি আপনার মতো কাজ করবেন। আমার কোনো ইন্টারফেয়ারেন্স থাকবে না। কেউ জানবেও না। ভালো প্রজেক্ট পেলে বলবেন, আমি ফাইনান্স করব।'

'এতে আপনার লাভ?'

প্রীতি শর্মা নির্দ্বিধায় বললেন, 'কারও ইচ্ছে আর সাহস থাকলে ভালো কাজ করার যথেষ্ট স্কোপ আছে সেটা প্রমাণ করা, জাস্ট এটুকুই।'

কমল মল্লিক হেসে ফেললেন। এটা একটু বেশি ছেলেমানুষি হয়ে যাচ্ছে।

'নিজের লোকসান করে এই সামান্য জিনিসটা প্রমাণ করার কি খুব প্রয়োজন আছে?'

প্রীতি ভুরু কোঁচকালেন।

'আপনার সামান্য মনে হচ্ছে? এই মিডিয়াকে সঙ্গে নিয়ে কত কী করা যায় বুঝতে পারেন না? একজন সত্যিকারের ক্রিয়েটিভ মানুষের সামনে সুযোগের দরজা খুলে যায়। এন্ড স্কাই ইজ দ্য লিমিট। কম বাজেটে আপনি আপনার শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, আনন্দ, ক্ষোভ, অভিমান সবকিছু বলতে পারেন। টিভি মানেই তো শুধু চটকদারি নাচগান নয়। টিভি মানে অনেক কিছু।' একটু থামলেন প্রীতি। তারপর বললেন, 'আর, লোকসানের কথা যদি বলেন, তাহলে বলব, ভালো কাজে লোকসান হয় না। আই বিলিভ ইট। সংখ্যায় অল্প হলেও এখন এখানে কয়েকটা চ্যানেল তো হয়েছে, যেখানে সম্রাটের মতো স্কাউন্ড্রেল নেই। যারা ভালো কাজকে সম্মান দেয়।'

কমল মল্লিক অন্যমনস্ক হয়ে টেবিলে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'আমার উচিত, আজ আপনাকে লাঞ্চে ইনভাইট করা, কিন্তু সরি, এরপরই আমাকে একটা মিটিঙে বসতে হবে।'

boierpathshala.blogspot.com

প্রীতি শর্মার চলে যাওয়ার পর একা ঘরে থম মেরে বসে রইলেন কমল মল্লিক। 'দত্ত-শর্মা'র ঘটনা তাকে থম্ মেরে দিয়েছে। সম্রাট দত্ত আর প্রীতি শর্মা, দুই মিলোলে 'দত্ত-শর্মা'। সাদা আর কালোর মাঝখানে নিজেকে কেমন স্যান্ডউইচের মতো লাগছে। কী করবেন?

খানিকটা বসে থাকার পর কমল মল্লিক একটা বোকার মতো সিদ্ধান্ত নিলেন। সম্রাট দত্তর সঙ্গে কাজ করবেন না। তাতে কিছুদিন বেকার বসে থাকতে হলে তাই থাকবেন।এই সিদ্ধান্তের কথা তিনি আলো চ্যানেলের মালিককে এখনই জানিয়ে দেবেন। দেরি করবেন না। দেরি করলে মনের দুর্বলতা অনেক সময় কেটে যায়। সেটা ঠিক হবে না। দুর্বল মনের মানুষ অনেক ভুল কাজ করে, কিন্তু ভালো কাজ করে।

boierpathshala.blogspot.com

ছত্রিশ

প্রকৃতি সৌন্দর্যে বিতরণে অকৃপণ। নিজের রূপ প্রকাশে সে কখনও ধনী-দরিদ্র বাছবিচার করে না। কুয়াশামাখা বনপথ, আকাশভরা জ্যোৎস্না, দিগন্ত ছোঁয়া সাগরবেলা সে সবার জন্য সমানভাবে মেলে রাখে। তার সৌন্দর্যের আঁজলায় রাজা না ফকির কে রয়েছে তা নিয়ে প্রকৃতির কোনো মাথাব্যথা নেই। সে দরাজ এবং উদার। শুধু কাপ-ডিশের বেলাতেই ঘটনা বুঝি অন্যরকম! ব্রতীন হাতে যে সস্তার কাপ-ডিশ ধরে আছে তার গায়ে আঁকা ফুলগুলো মেটে রঙের, ফ্যাকাশে। পাপড়িগুলো ধেবড়ে আছে। রং ছিটকে পড়েছে। যেন এই কাপ-ডিশের গায়ে তাদের জোর করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। নইলে ফুল এত বিশ্রী হয়!

কথাটা মনে হতে ব্রতীন ভুরু কোঁচাকাল। চন্দনা জিজ্ঞেস করল, 'কী হল? চিনি বেশি দিয়ে ফেলেছি?'

ব্রতীন বিড়বিড় করে বলল, 'না, ঠিক আছে?'

চন্দনা হেসে বলল, 'তাহলে মুখটা অমন করে আছেন কেন?'

ব্রতীন লজ্জা পেল। এই মেয়ে তার মনের কথা বুঝতে পারল নাকি? সে তাড়াতাড়ি কাপ তুলে চায়ে চুমুক দিল। বলল, 'না, কিছু নয়।'

চন্দনা ঠোঁট উলটে বলল, 'কী জানি বাবা, আপনাদের রকমসকম বুঝতে পারি না।'

ব্রতীন শুকনোভাবে হাসবার চেষ্টা করল। আধো আলো আধো অন্ধকার ঘরে সেই হাসি স্পষ্ট হল না। সব ঘরে সব জিনিস স্পষ্ট হয় না। সম্ভবত এই ঘর সেরকমই। এখানে হাসি স্পষ্ট হওয়ার নয়।

আজও চন্দনা চা করে এনেছে। একই কাপ-ডিশ। কাচের গায়ে মোটা হাতল,

boierpathshala.blogspot.com

গায়ে বিশ্রী ফুল পাতা আঁকা। বাইরের লোককে দেওয়ার মতো কাপ-ডিশ সম্ভবত এদের এই একটাই রয়েছে। খটখটে দুপুরে চা খাওয়ার অভ্যেস ব্রতীনের নেই। ভালো লাগে না। তবু অন্যদিনের মতো আজও সে হাত বাড়িয়ে কাপ নিয়েছে।

চন্দনা শাড়ির আঁচল দিয়ে ঘাড় আর গলার ঘাম মুছল। মাথার ওপর তাকাল। ফ্যানটা ঘটাং ঘটাং আওয়াজ তুলে অনিচ্ছায় ঘুরছে। হাওয়া নেই, শুধু অভ্যেসে ঘোরা। মনে হচ্ছে যে-কোনো সময় বন্ধ হয়ে বাঁচবে।

'কী গরমটাই না পড়েছে। সারাদিন আইঢাই করে, বিকেলের পর থেকে ঢালবে। আপনার গরম লাগছে না?'

ব্রতীন চুপ করে মাথা নাড়ল। চন্দনা আঁচলের মুখটা দিয়ে নিজের গলার কাছে বাতাস করতে করতে বলল, 'অবশ্য করলেও কিছু করার নেই। পাখার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। হাওয়ার থেকে গানবাজনা বেশি। মনে হয় মালিকের অবস্থা দেখে ব্যাটা সবসময় ফুর্তিতে থাকে।'

কথাটা বলে 'ফিক' ধরনের হাসল চন্দনা। বলল, 'অমন জড়ভড়তের মতো বসে থাকলে গরম বেশি লাগবে। হাত-পা ছড়িয়ে বসুন।'

ব্রতীন আরও একটু গুটিয়ে গেল। বলল, 'না না ঠিক আছে।'

'আপনার ঠিক থাকলে ভালো, আমার বাপু ঠিক নেই।'

চন্দনা গায়ের শাড়ি আলগা করল। মুখ নামিয়ে, ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে নিজের বুকে ফুঁ দিতে লাগল। দ্রুত চোখ নামিয়ে নিল ব্রতীন।

সলিল নেই। চন্দনা আজকাল ছেলেটাকে কোথায় যেন বিনা পয়সায় পড়তে পাঠায়। জিজ্ঞেস করতে নির্বিকার গলায় বলছে, 'পড়তে পাঠাই না, খেতে পাঠাই।'

ব্রতীন অবাক হয়ে বলল, 'খেতে!'

'হ্যাঁ, ওরা দুপুরে ভাত দেয়। আজকাল কলকাতায় কত কী সব হয়েছে না? বস্তির বাচ্চাদের নিয়ে পড়ানো পড়ানো খেলা? সপ্তাহে দু-দিন মাছ দেয়। শনিবার করে ডিম।'

'ও।'

চন্দনা বলল, 'ভালো করিনি? বাড়িতে থাকলে সপ্তাহে তিনদিন কেন, একদিনও মাছ জুটত না। ছেলের সংগ্রাহক পিতা অনেক কিছু সংগ্রহ করতে জানেন, সন্তানের মাছ সংগ্রহ করতে জানেন না। তিনি হলেন মহান মানুষ। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো তাঁকে মানায় না।' কথা শেষ করে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে চন্দনা হাসল। বলল, 'এই বয়েসে শরীরে একটু প্রোটিন যাওয়া দরকার।'

ব্রতীন ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে বলেছিল, 'লেখাপড়াও তো শিখছে।'

boierpathshala.blogspot.com

চন্দনা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'তা একটু-আধটু শিখছে। গুন্ডা মস্তান, চোর ডাকাত হতে গেলেও এখন পেটে বিদ্যে লাগে। সব লাইনেই খুব কম্পিটিশন।'

ব্রতীন অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'তা কেন? ভালো কিছুও তো হতে পারে।'

চন্দনা শান্ত গলায় বলল, 'হতে পারে। বাপ মা যখন ভালো সন্তানের তো ভালো হওয়ারই কথা। মুশকিল হল, সবসময় যা হওয়ার কথা তা তো আর হয় না, অন্যরকম হয়ে যায়। এই আমার কথাই ধরুন, আমি ছিলাম একটা ছা-পোষা মেয়ে। বেণী বেঁধে কলেজে যেতুম। আমার কি আর আপনার বন্ধুর মতো এত বড়ো একটা মানুষের বউ হওয়ার কথা ছিল? কী করে যেন হয়ে গেলাম। রাখুন ওসব, চা খান।'

ব্রতীন তাড়াতাড়ি বলল, 'না না থাক, এই দুপুরে চা খাব না।'

'তাহলে শরবত দিই ? ঘরে লেবু নেই। শুধু নুন চিনি দিয়ে খেতে হবে।'

'আমার কিছুই লাগবে না। আমি এখনই চলে যাব।'

চন্দনা ফিক করে হেসে বলল, 'তা বললে কী করে হবে? স্বামীর বাল্যবন্ধু, কিছু মুখে না দিলে ছাড়ি কী করে? উনি এসে বকাঝকা দেবেন।'

চন্দনার হাসির ধরনে এমন কিছু আছে যাতে ব্রতীন গুটিয়ে গেল। সে নীচু গলায় আবার বলল, 'আমি চলে যাব।'

চন্দনা ভেতরে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল।

'ব্রতীনবাবু, কেন এ-কথাটা বারবার বলেন বলুন তো? সেদিনও বলেছিলেন। আপনি তো জেনেই এসেছেন, এই সময়টা আপনার বন্ধু বাড়িতে থাকে না, ছেলে থাকে না। আমি একলা থাকি। নাকি জানেন না? তাহলে কেন বলেন? নিন খাটে উঠে আরাম করে বসুন। ওর একটা লুঙ্গি দেব? প্যান্টটা ছেড়ে নেবেন? জামাপ্যান্ট ছেড়ে লুঙ্গি পরুন, আরাম পাবেন।'

ব্রতীন শিউরে ওঠে। হাত তুলে বলে, 'না না, লাগবে না। আমি ঠিক আছি।'

আজ ব্রতীন খাটের ওপর বসেছে। বাধ্য হয়েই বসেছে। আগের দিনই দেখেছিল, ঘরের একমাত্র বেতের চেয়ারটা নড়বড় করছে। আজ সেটা একেবারে কেতরে গেছে। দরজায় ছিটকিনি আটকাতে আটকাতেই চন্দনা হেসে বলল, 'আজ কিন্তু একটা মুশকিল আছে ডাক্তারবাবু।'

'আমি ডাক্তার নই।'

'ওই হল।'

শীর্ণকায়া এই মেয়েটিকে হাসলে কি সুন্দর লাগে? কে জানে। ব্রতীন ঠিক বুঝতে পারে না। মুশকিলের কথা শুনে ব্রতীন মুখ তুলল।

boierpathshala.blogspot.com

'আমাদের একমাত্র চেয়ারটা দেহ রেখেছেন। আপনাকে খাটে উঠে বসতে হবে। খুব যদি ঘেন্না করে, তাহলে মেঝেতেও বসতে পারেন। একটা চাদর পেতে দিতে পারি।'

এরপর আর খাটে বসা ছাড়া উপায় নেই? খাটে বসেই চা খেতে লাগল। সেদিকে খানিকটা তাকিয়ে থেকে চন্দনা বলল, 'মুখটা শুকনো কেন?'

ব্রতীন বলল, 'শুকনো কই? রোদে ঘুরেছি তো হয়তো সেই কারণেই...'

'রোদে ঘোরার দরকার কী? বাড়িতে বসে থাকলেই তো হয়। বেশি রোদে ঘুরলে রং পুড়ে যাবে না? আমায় দেখুন তো, বাইরে বেরোই না বলে গায়ের রংটা কেমন ধরে রেখেছি। এই দেখুন।'

ফস করে শাড়ির আঁচল কাঁধের ওপর গুটিয়ে রোগা রোগা হাতদুটো বাড়িয়ে দিল চন্দনা। আবছা আলোয় সেই হাতদুটোকে ফ্যাকাশে ঠেকল ব্রতীনের।

'মেয়েছেলের এই হল মুশকিল ডাক্তারবাবু। শরীর, মন সব নষ্ট করা যায়, কিন্তু গায়ের রং নষ্ট করা যায় না। দুনিয়া এত এগিয়ে গেলে কী হবে, এখনও পুরুষমানুষ আগে মেয়েছেলের গায়ের রং দেখে। রং ফর্সা তো সব ফর্সা।'

ফ্যাকাশে হাত সরিয়ে তরল গলায় হাসল চন্দনা।

চা শেষ করে কাপ-ডিশ নামিয়ে রাখল ব্রতীন। তারপর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, 'সলিলের খবর কী?'

'খুবই ভালো। অতি উত্তম। আগুনের পর ভেবেছিলাম জল নিয়ে মাতবে। জল সংগ্রহ।'

'জল!'

'বাঃ গাদা গাদা আগুন গিললে পেট জ্বলবে যে, জল চাই না? অগ্নিভক্ষণের পর জল পান না করলে হয়? আপনি তো চিকিৎসক মানুষ, আপনিই বলুন না। পড়া শেষ না করলেও খানিকটা তো এগিয়েছিলেন। আপনি জানবেন। তবে কী জানেন ডাক্তারবাবু, ঘটনা আসলে অন্য। আপনার বন্ধু আগুন গেলে, পেট জ্বলে আমার আর তার ছেলের। কত রাতে যে শুধু জল খেয়ে শুয়ে পড়ি। ছেলে বলে, মা খিদে লেগেছে। আমি ঘুমের মধ্যেই মাথার চুল ধরে নেড়ে দিই। হারামজাদা, পেট ভর্তি আগুন, তারপরেও খিদে লেগেছে? আগে জল খেয়ে আগুন নেভা, তারপর খাওয়া। ভালো করি না?'

দুলে দুলে হাসতে লাগল চন্দনা। কাপড়ের আড়ালে বুক দুটো নাচাতে চাইল যেন।

ব্রতীন অবাক হল। সত্যি চন্দনা এক আশ্চর্য মেয়ে। আশ্চর্য না হলে

boierpathshala.blogspot.com

এভাবে অপমানের জীবনটাকে নিয়ে কেউ হাসিঠাট্টা করতে পারে? ডারউইন বলেছিলেন, সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট। যে যোগ্য সে টিকবে। যে যোগ্য নয়? সে কী করবে? এ ব্যাপারে ডারউইন সাহেব কী বলেছিলেন ঠিক মনে পড়ছে না। তিনি কি লড়াই চালানোর কথা বলেছিলেন? বলুন বা না বলুন, ব্রতীনের মনে হয় চন্দনা সেটাই করছে। সে লড়ছে। লড়াই চালানোর জন্য তার কাছে এখন পড়ে আছে একটা মাত্র অস্ত্র। জীবনকে ঠাট্টা করো, তুচ্ছ করো। যে 'ফিটেস্ট', যে তোমাকে হারিয়ে টিকে গেল সে যেন লজ্জা পায়। ডারউইন সাহেবের সঙ্গে দেখা হলে বলে, 'এ আপনি কী করলেন? আমাকে জেতালেন, তবু আমি কেন এত লজ্জা পাই!' এটা কি লড়াই? নাকি খেলা? ব্রতীনের মনে হয়, খেলা। জীবনের সঙ্গে খেলা। তার বিশ্বাস এই মেয়ের কাছে সে যে বারবার ছুটে আসে, তার কারণ এটাই। সে খেলাটা দেখতে চায়। সে-খেলা সে খেলতে পারেনি, খেলতে জানে না। প্রতিবারই চন্দনা আলো অন্ধকার ঘুপচি ঘরের দরজা খুলে সরে দাঁড়ানোর পর সে সংকুচিত হয়। শরীর ঝিমঝিম করে ওঠে। ভাবে, ছিঃ কেন এল। আর নয়, এই শেষ। কিন্তু পারে না। আবার ছুটে আসে।

চন্দনা জানে না। জানার কথাও নয়। সে অন্য মানে খোঁজে। আজও খুঁজল।

'ডাক্তারবাবু, একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'না, থাক।'

ব্রতীন মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বলল, 'ঠিক আছে থাক।'

চন্দনা হেসে বলে, 'এই দ্যাখো রাগ করে।'

ব্রতীন মৃদুস্বরে বলে, 'আমি রাগ করি না।'

'সে বুঝি। এটা ঠিক নয়। পুরুষমানুষ রাগ না করলে সংসারে শান্তি থাকে না। এই দেখুন না আপনার বন্ধুর রাগ কত। গালমন্দ করে, কথা না শুনলে মারধরও দেয়। তবেই না ঘরে এত শান্তি।'

মারধরের কথা শুনে ব্রতীন বিরক্ত হল। বিরক্তি লুকিয়ে বলল, 'আমি রাগতে পারি না।'

ঠোঁট কামড়ে, স্থির চোখে চন্দনা তাকিয়ে থাকে অল্পক্ষণ। এই মেয়ের চোখ দুটো যেন বেশি কালো। নাকি চোখে কাজল-টাজল ধরনের কিছু দিয়েছে? তাই হবে। ব্রতীন আসার পরপরই ভেতরে গিয়ে শাড়িটা বদলে নেয়, গালে সামান্য পাউডার বুলিয়ে আসে। আজ কি এসেছে? আজ ঘরের অন্ধকার ভাবটা বোধহয় খানিকটা বেশি। চন্দনার মেকআপ ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না। ব্রতীন বুঝতে

boierpathshala.blogspot.com

চায়ও না।

'আপনি এখানে আসেন কেন?'

চমকে উঠল ব্রতীন। কী বলতে চাইছে চন্দনা? আসতে নিষেধ করছে নাকি?

উত্তরের অপেক্ষা না করে চন্দনা সহজ গলায় বলল, 'এ-বাড়ি তো কোনো চায়ের দোকান নয় যে এলেন এক কাপ অ-খাদ্য চা খেলেন আর চলে গেলেন। এই কারণে জিজ্ঞেস করছি।'

'এমনিই আসি। তোমাদের খবরাখবর নিই।'

চন্দনা দুটো হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙে। শাড়ি এলোমেলো হয়ে যায়। শরীর দেখানোর স্পষ্ট ইঙ্গিত।

'কথাটা যে সত্যি নয় তা যেমন আপনি জানেন আমিও জানি। খবরাখবর নিতে এই দুপুরে আসার দরকার হয় না। যদি-বা দরকার হয়, উঠে যাওয়ার সময় মাঝেমধ্যে লুকিয়ে চুরিয়ে তোশকের তলায় পঞ্চাশ একশো টাকার নোট রেখে যাওয়ার কী আছে? পুরুষমানুষ একলা মেয়েছেলের ঘরে টাকা রাখবে কেন?'

কথাটা বলে ভুরু কুঁচকে ব্রতীনের দিকে তাকায় চন্দনা। মিটিমিটি হাসে। বোঝাই যাচ্ছে সে উলটোদিকে-মাথা-নামিয়ে-বসে-থাকা মানুষটাকে রাগিয়ে দিতে চাইছে। ব্রতীন সসংকোচে বলল, 'তুমি, এভাবে বলছ কেন? আমি কিছু ভেবে করি না।'

'বাঃ, এরকম মহাপুরুষ দু-একজন থাকা দরকার। যারা চুপিচুপি আসবে, চুপিচুপি টাকা রেখে যাবে। চুপিচুপি বলবে, আমি কিছু ভেবে করি না।'

'তোমার যদি অসুবিধে হয় তাহলে বলো চন্দনা।'

'অসুবিধে হয় মানে! অবশ্যই হয়। আদর ভালোবাসা কিছুই হল না, শুধু শুধু টাকা নিতে অসুবিধে হয় না।'

ব্রতীন এবার কুঁকড়ে যায়। বলল, 'ছি ছি এসব কী বলছ?'

'অন্যায় বলছি? সেদিন আমার গায়ে জামা ছিল না, আপনি একবারও মুখ তুলে তাকালেন না। ভাবলাম, আপনার শখ অন্যরকম। পরদিন থেকে সাজগোজ করে বসি। তাও ভালো করে তাকান না।'

ব্রতীন খাটের একপাশে রাখা কাঁধের ব্যাগটা তুলে নিয়ে বলে, 'আমি আজ উঠি।'

চন্দনা হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা চেপে ধরে। একইরকম উজ্জ্বল হেসে বলে, 'এই তো রাগ হয়েছে। একটু আগে যে বলছিলেন রাগেন না?'

boierpathshala.blogspot.com

ব্রতীন লজ্জা পায়। বলে, 'না না রাগব কেন? একটা কাজ ছিল।'

'রাখুন আপনার কাজ। আপনি কি আপনার বন্ধুর মতো, সারাদিন মহাব্যস্ত। ছাইভস্ম কুড়িয়ে বেড়ান? তবে একটা কথা জেনে রাখুন ডাক্তারবাবু, আমি কিন্তু রোজ শুধুমুধু টাকা দিতে পারব না। এই যে আপনি চলে যান আর আমি তোশক তুলে টাকা খুঁজব এটা কি ঠিক?'

'ঠিক ভুলের কী আছে? কারও বাড়িতে এলে লোকে তো মিষ্টি নিয়েও আসে।'

চন্দনা হেসে বলল, 'এই বাড়িতে আসে না। আপনার বন্ধু সন্ধের পর যাদের ধরে টরে আনে তারা কেউ রসগোল্লা সন্দেশ নিয়ে আসে না। নখ দাঁত নিয়ে আসে। আমাকে আঁচড়াতে কামড়াতে আসে। এই বাড়ি মিষ্টি বাড়ি নয়, নখ দাঁতের বাড়ি।'

কথা শেষ করে আওয়াজ করে হাসতে লাগল চন্দনা। হাসতে হাসতে বোধহয় চোখে জল চলে এল। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখের কোণা মুছে বলল, 'যদি বিশ্বাস না হয়, নিজের চোখে দেখতে পারেন ডাক্তারবাবু। আমার বুক দেখতে পারেন। দেখবেন?'

ব্লাউজের বোতামে হাত দিল চন্দনা।

ব্রতীন বলল, 'চন্দনা, তুমি কি সত্যি চাও আমি এখনই চলে যাই?'

'ওমা, তা চাইব কেন? আপনি হলেন লক্ষ্মী। পুরুষ লক্ষ্মী। আপনি এলে ঘরে টাকা আসে। পরের দিনের বাজার হয়।'

'এভাবে বলছ কেন? সলিল যতই হোক আমার ছোটোবেলার বন্ধু। একসঙ্গে লেখাপড়া করেছি। বেচারি সমস্যার মধ্যে আছে। তার হাতে টাকা দিতে গেলে ভাববে করুণা করছি। সেই কারণে...।'

চন্দনা উদাসীন গলায় বলল, 'এটা অবশ্য একটা কথা বলেছেন। অন্যের দয়ার দান নিতে তার হয়তো বড়ো খারাপ লাগে। মনে হয় সেই কারণেই সে বউয়ের হাত দিয়ে নেওয়ায়। বউয়ের হাত দিয়ে টাকাপয়সা আসা খারাপ নয়। হাত তো শরীরই হল।'

'এই প্রসঙ্গটা বাদ দিলে হয় না?'

'অবশ্যই হয়। মনের মধ্যে খটকাটা চলে গেলেই বাদ দিয়ে দেব।'

'কীসের খটকা?' ব্রতীন নীচু গলায় বলে।

'এই যে আপনার এখানে আসার কারণ না বুঝতে পারার ঘটনা।'

ব্রতীন চুপ করে থেকে খানিকটা যেন নিজের মনে মনেই বলল, 'আমিও

boierpathshala.blogspot.com

ঠিক বুঝতে পারি না।'

'আপনার কি লজ্জা করে?'

'লজ্জা! কীসের লজ্জা?'

'গুডবয় মার্কা বেটাছেলেদের এরকম হয়। প্রথম প্রথম বাইরের মেয়ে-মানুষের শরীর দেখতে লজ্জা লাগে। ধীরে ধীরে সেই লজ্জা কাটে। তখন নেংটা করে এমন হাঁচোড়পাঁচোড় করে যে সামলাতে কষ্ট হয়। তবে আপনার সে-লক্ষণই তো দেখছি না। আপনি কি বেশি লাজুক?'

কথা শেষ করে আবার হাই তুলল চন্দনা। মেয়েটা কি ইচ্ছে করেই খারাপ খারাপ কথাগুলো বলছে? মনে হচ্ছে। নিশ্চয় এটাও তার একটা খেলা। চন্দনা উৎসাহ দেখিয়ে বলল, 'আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয় ডাক্তারবাবু?'

'কী কাজ?'

ব্রতীনের অবাক লাগে। টিকে থাকার জন্য 'ফিটেস্ট' হওয়ার কত চেষ্টাই না করছে মেয়েটা।

'এক কাজ করি বরং, আমি জামা-টামা খুলে আপনার সঙ্গে বসে বসে গল্প করি। আপনি ইচ্ছে করলে আমার শরীর দেখুন, না ইচ্ছে করলে মুখ ফিরিয়ে থাকুন। যেটা আপনার খুশি। মনে হয় না মুখ ফিরিয়ে থাকবেন। খোলা জায়গাগুলো রোগাভোগা লাগলেও আমার ঢাকা অংশটা একেবারে খারাপ নয়, তবে কথা দিচ্ছি জোর করব না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারব, আপনি মিছিমিছি তোশকের তলায় টাকা রেখে যান না। আমার খটকা দূর হবে।'

ব্রতীন হাসল। বলল, 'তোমায় কিছুই করতে হবে না। আমি আর তোশকের তলায় টাকা রেখে যাব না। হল তো?'

চন্দনা ঠোঁট উলটে বলল, 'হল, তবে ভালো হল না।'

'তুমি যদি বল, তোমার জন্য একটা কাজকর্মের চেষ্টা করতে পারি। করব?'

চন্দনা চোখ সরু করে বলল, 'এ তো বেশি কেলেঙ্কারি মনে হচ্ছে। শরীরের থেকেও বেশি। বন্ধুপত্নীর প্রেমে পড়লেন নাকি ডাক্তারবাবু? খেয়েছে। এখন চাকরি বলছেন, পরে বলবেন ঘর ঠিক করে দেব।'

'ঠাট্টা নয় চন্দনা। তুমি চাইলে আমি খোঁজখবর নিতে পারি। সলিলকে কাজের কথা বলে তো লাভ হবে না। যদিও কাজ বললেই যে পাব এমন নয়।'

চন্দনা হাসল। যে-হাসি এতক্ষণ উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছিল, তা-ই এখন মনে হচ্ছে ম্লান।

'ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু। তবে এই মুহূর্তে কাজ করতে ভালো লাগছে না।

boierpathshala.blogspot.com

ঠিক করেছি, আমিও আপনার মত বন্ধুর মতো সংগ্রাহক হব।'

'কালেক্টর!'

চন্দনা গম্ভীর হয়ে বলে, 'হ্যাঁ, আপনি যদি পারেন, আমাকে সাহায্য করবেন। করবেন সাহায্য?'

'তুমি কি সংগ্রহ করবে চন্দনা!'

সরাসরি চোখের দিকে তাকিয়ে চন্দনা ফিসফিসিয়ে উঠল, 'বিষ।'

ব্রতীন চমকে উঠল। ডারউইন সাহেবই কি তবে জিততে চলছেন? চন্দনার অস্ত্র ব্যর্থ? বিষ চাওয়ার অর্থ সে মরতে চাইছে। জীবন তুচ্ছ করার খেলায় সে হারছে। ব্রতীন উঠে পড়ল। ব্যাগ কাঁধে নিয়ে মানিব্যাগ বের একশো টাকার দুটো নোট বের করল। বাড়িয়ে ধরে বলল, 'নাও, ধরো।'

চন্দনাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। চাপা অথচ তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'আপনি যে বললেন টাকা আর দেবেন না?'

ব্রতীন বিষণ্ণ হেসে বলল, 'লুকিয়ে দেব না বলেছি। এই নাও রাখো। আসলে কী জানো চন্দনা, শরীর বা মন নয়, আমি তোমার কাছে আসি বড়ো অদ্ভুত এক কারণে।'

'কী কারণ?' শান্ত গলায় বলল চন্দনা।

'জীবনকে তুচ্ছ করার খেলা দেখতে।'

চন্দনা অস্ফুটে বলল, 'ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

ব্রতীন হেসে বলল, 'ওই যে আগেই বললাম, আমিও পুরোটা পারি না। তবু তুমি যদি বল, আমি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করতে পারি।'

চন্দনা ফিসফিস করে বলল, 'থাক। সবকিছু বুঝতে না চাওয়াই ভালো। টাকাটা আপনি ফিরিয়ে নিন ব্রতীনবাবু। পৃথিবীতে খুব অল্প মানুষই আছে যাদের দেখলে দু-হাত জোড় করে প্রণাম করতে ইচ্ছে করে, আপনি সেরকমই একজন। সামনে প্রণাম করে আপনার মতো লাজুক মানুষকে আর লজ্জায় ফেলব না। আড়ালে করব। শুধু একটাই অনুরোধ।'

'কী?' দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল ব্রতীন।

'পায়ে পড়ি আপনি আর এখানে আসবেহ না।'

রোদ এখনও চড়া। হাঁটতে বেশ কষ্টই হচ্ছে। তবু ব্রতীন হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হচ্ছে, এই হাঁটা তার কোনোদিন বুঝি শেষ হবে না।

boierpathshala.blogspot.com

সাঁইত্রিশ

'মামা, প্লিজ কাম সুন। আই অ্যাম ইন গ্রেট ডেনচার।'

খাতা থেকে ছেঁড়া ফুলস্কেপ পাতার মাঝখানে বড়ো বড়ো করে লেখা। লেখা হয়েছে বেগুনি রঙের প্যাস্টেলে। তড়িঘড়ি লেখার কারণে মার্জিন রাখা যায়নি। এঁকেবেঁকে গেছে। 'সুন'-এ একটা 'ও' কম। 'ডেনজার' বানানে 'সি', 'এইচ' এবং 'এ' দিয়ে কাজ সারা হয়েছে। ফলে হয়ে গেছে 'ডেন্‌চার'।

ছোট্ট অর্ক তার মামার কাছে এই চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠি না বলে 'এস.ও. এস.' বলা উচিত। গতকাল বিকেলে উমাদেবী মেয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। ছেলের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে জরুরি আলোচনার ছিল। মেয়েই তাঁকে ডেকে পাঠায়। সেই সময় পাঁচ বছরের অর্ক চুপিচুপি তার দিদার ব্যাগে চিঠিটা চালান করে।

কাল সকালে ফোন করে বনানী তার মাকে খুব খানিকটা রাগারাগি করল।

'সমুর বিয়ে ব্যাপারে তোমার তো কোনো গা দেখছি না মা, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।'

'আমার গা থাকা না থাকার কী হয়েছে? ছেলে বড়ো হয়েছে, সে বিয়ে করবে কিনা নিজে ঠিক করবে।'

'এটা কেমন কথা হল! নিজের বিয়ে নিজে ঠিক করবে মানে?'

'আজকাল তো তাই করে। নিজেরাই মেয়ে পছন্দ করে দুম করে ঘরে এনে তোলে।'

'দুম করে ঘরে এনে তোলে!'

'নাও তুলতে পারে। অনেক সময় পরেও খবর পাওয়া যায়। তোমার

boierpathshala.blogspot.com

বাবার অফিসে দত্তবাবু না মিস্টার চ্যাটার্জির ছেলে বউ ঘরে এনেছে একেবারে হানিমুনের পর। বউ শাশুড়ির জন্য হানিমুন থেকে গিফট পর্যন্ত কিনে এনেছে। বধূ বরণের পরপরই হাতে তুলে দিয়ে আহ্লাদি গলায় বলেছে, মা, আপনার জন্য কিনেছি।'

'আমার ভাই মোটেও সেরকম নয়।'

উমাদেবী গজগজ করতে করতে বলেন, 'কীরকম সে আমি জানি না, জানতে চাইও না। দেখব সে-ও একদিন কাণ্ড ঘটিয়েছে।'

'এসব আজগুবি কথা তোমায় কে বলল মা? খবরের কাগজে পাত্রী চাই বিজ্ঞাপন দ্যাখো না? পাতার পর পাতা। সব ছেলে যদি নিজেরাই মেয়ে পছন্দ করত তাহলে এত বিজ্ঞাপন ছাপা হত? যাক, তোমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই।'

'তর্ক করিস না। আমি তো তোকে বলিনি সকালবেলা ফোন করে তর্ক কর। নাকি বলেছি?'

'তোমার বলাবলির ওপর আমার কিছু এসে যায় না। সমুর বিয়ের ব্যাপারে তোমাদের গা না থাকুক, তোমার জামাইয়ের খুবই গা আছে। তার অফিস কলিগের যে-মেয়েটার কথা বলছিলাম তারা আবার তোমার জামাইকে ধরেছিল।'

'তুই সমুকে বল।'

'বলব, অবশ্যই বলব। কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে কথা আছে। আমি একটা প্ল্যান করেছি। সেই প্ল্যান নিয়ে আগে আলোচনা করব, তারপর বলব।'

উমাদেবী বিরক্ত গলায় বললেন, 'আমার সঙ্গে আলোচনার কী আছে? বিয়ে তো আমি করব না। যে বিয়ে করবে কথা হবে তার সঙ্গে।'

বনানী চাপা গলায় বলল, 'উফ্ মা, ব্যাপারটা তো আগে শুনবে?'

'শুনব কিনা জানি না, দুপুরে আয়।'

'দুপুরে আয়! তুমি কি খেপেছ মা? কী করে কথাটা তুমি বললে! জানো না অর্ককে নিয়ে আমাদের কী কঠিন অবস্থা চলছে? নাকি জেনেশুনেও চলে আসার কথা বলছ? শুধু ছেলে নয়, তোমার দেখছি নাতি সম্পর্কেও কোনো মাথাব্যথা নেই।'

'না, নেই, তোরা সবাই মিলে যা শুরু করেছিস, তাতে মাথা না দেওয়াই ভালো।'

'ঠিক আছে দিতে হবে না। তুমি আজই একবার আমার এখান থেকে ঘুরে

যাও। মনে হচ্ছে প্ল্যানটা খুবই ভালো হয়েছে। বেশি দেরি করা যাবে না। যদিও প্ল্যান আমার নয়।'

'কার?'

এতক্ষণ পরে টেলিফোনের ওপাশ থেকে বনানী হাসল। একসঙ্গে লজ্জা এবং গর্বের হাসি। বলল, 'তোমার জামাইয়ের প্ল্যান। সে অনেক মাথা খাটিয়ে বের করেছে। তোমার জামাইয়ের মাথা যে কতটা পরিষ্কার তুমি তো জানই মা। তার বুদ্ধি সম্পর্কে নিশ্চয় তোমার কোনো সন্দেহ নেই?'

এপাশে উমাদেবী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সত্যি কোনো সন্দেহ নেই। নির্মলের বুদ্ধি সম্পর্কে এতদিনে তাঁর ধারণা খুবই স্পষ্ট হয়েছে। একজন লেখাপড়া জানা মানুষও যে কী করে এতটা বোকা হতে পারে! তবে একদিকে ভালো। বর-বউতে মিলেছে খুব। অনেকে বলে সংসারে দুটো মানুষ দু-রকম হওয়া উচিত। একদম ভুল কথা। চোর-পুলিশ থানায় মিলেমিশে থাকে, সংসারে পারে না। সংসারে লাগে একরকম মানুষ। দুটোই চোর হবে, নয়তো দুটোই পুলিশ। তবে বিভিন্ন কোয়ালিটির মধ্যে সংসারের জন্য 'বোকা'-ই সবথেকে উপযুক্ত কোয়ালিটি। যত বোকা তত শান্তি। তাঁর মেয়ে-জামাইয়ের বেলাতে সেটাই হয়েছে। দুজনেই শান্তিতে আছে। বুদ্ধিমান পুত্রকে নিয়ে তাঁর মতো অশান্তিতে বাঁচতে হচ্ছে না। উমাদেবী ফোন রাখতে রাখতে ঠিক করলেন দুপুরের পরে মেয়ের ওখান থেকে ঘুরে আসবেন।

মেয়ের ওখান থেকে ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়েছিল। উমাদেবী ভেবেছিলেন, রাতেই ছেলের ঘরে আসবেন। নাতির চিঠিটা দেবেন। তিনি অবশ্য চিঠি খুলে দেখেননি। মামা-ভাগনের এ ধরনের গোপন কাগজপত্র, জিনিস চালাচালি মাঝেমধ্যেই হয়ে থাকে। এ নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় তাঁর নেই। তাঁর উদ্দেশ্য চিঠি দেওয়ার সময় ছেলের সঙ্গে বিয়ে বিষয়ে দুটো-একটা বলবেন। এমনি কথা বলতে গেলে সোমনাথ বিরক্ত হবে। ভাগনের চিঠির বাহানা নিয়ে ঘরে ঢুকলে সেই আশঙ্কা নেই। ইতিমধ্যে একদিন বিয়ের কথা বলতে গিয়ে ছেলের কাছে তিনি ধমকও খেয়েছেন। যদিও এই ব্যাপারে ছেলের ধমক গায়ে নিতে নেই। বিয়ের কথায় ছেলেমেয়েরা প্রথম দিকে মায়ের ওপর রাগারাগি করবেই। এটাই নিয়ম। যদিও বনানীর বেলায় ঘটনা অন্যরকম হয়েছিল। বিয়ের জন্য সে নিজেই ছটফট করতে শুরু করেছিল। এমনও হয়েছে কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে টিক মেরে মায়ের বিছানার তলায় লুকিয়ে রেখে আসত। মেয়ের বাবা একদিন বালিশ তুলতে গিয়ে সেই কাগজ হাতে পেয়ে

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

যান।

'কী ব্যাপার? এটা কী উমা? গাত্র উজ্জ্বল, উচ্চতা পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি... এসবের মানে কী?'

উমাদেবী স্বামীর হাত থেকে কাগজ নেন, গম্ভীর মুখে বলেন, 'তোমার মেয়ের কীর্তি।'

'আমার মেয়ের কীর্তি ! বনানী?'

'তা ছাড়া তোমার ক-টা মেয়ে আছে? বনানী বিয়ের জন্য খেপে উঠেছে।'

'বিয়ের জন্য খেপেছে! আজকাল এসব হয় নাকি!'

'হয় কিনা জানি না, হয়েছে তো দেখছি। নিজেই পাত্র পছন্দ করছে।'

'গাধীটার কালই বিয়ে দিয়ে দাও। একটা গাধা দেখে ছেলে জোগাড় কর। গাধীর জন্য গাধা।'

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সোমনাথ 'মোমের আকাশ বাতাস' ফাইল খুলে বসেছিল। স্ক্রিপ্ট ঘষামাজার কাজ এখনও বাকি। এরপর শিডিউল তৈরি করা। ঝামেলা আছে। তিনদিনের শ্যুটিঙে মাসখানেকের কাজ তুলে নিতে হবে। সমস্যা একটা হচ্ছে। আলোর সমস্যা। রোজই কি আলো একইরকম হবে? যে ফ্যাটফ্যাটে আলোতে মোম গরমের কথা বলবে, সেই আলোতেই কী 'আজ বিকেলে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে' বলা যায়? নাকি আলো খানিকটা সফ্‌ট করা উচিত? ধরা যাক নিম্নচাপে টানা বৃষ্টি চলছে, আর মোম চ্যাটার্জি টিভির স্ক্রিনে সানগ্লাস কপালে তুলে সুইমিংপুলে গলা পর্যন্ত ডুবে বসে আছে— সেটা কেমন দেখাবে? ভালো দেখাবে না। নিম্নচাপের সময় গলা ডুবিয়ে জলকেলি লোকে নেবে না। ভিউয়ার পার্টিসিপেশনের কথাটা আরও ভাবতে হবে। এখন পর্যন্ত ভাবা হয়েছে, আগামীদিনের ওয়েদার ফোরকাস্ট চাওয়া হবে এস.এম.এস.-এ। কাল সকালে ঝলমলে রোদ উঠবে? নাকি আকাশ মেঘে মুখ ঢেকে বেজার করে রাখবে? সেইসঙ্গে মোমের পোশাক নিয়ে মতামত। এখানেও জটিলতা। ধরা যাক, ভিউয়াররা আরও খোলামেলাভাবে মোমকে চাইল। তখন? সত্যি কি মেয়েটার সুইমস্যুট খোলামেলা করতে হবে? হলে কতদূর? প্রকৃতি আর নারী নিয়ে এই খেলাটা যতখানি সম্ভব ইন্টারেস্টিং করাটাই এই প্রোগ্রামের আসল কাজ। এখন পর্যন্ত সোমনাথ ভেবে রেখেছে, ভিউয়ারদের পূর্বাভাস অনেকটাই মেলানো চলবে না। ভাবলেও যেমন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে না, তেমন অনেক সময় হাজার চাইলেও ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি থামতে চায় না। পূর্বাভাস ভুল হয় বলেই পূর্বাভাস নিয়ে মানুষের এত কৌতূহল, এত আকর্ষণ। মোম চ্যাটার্জির

boierpathshala.blogspot.com

পোশাকের বেলাতেও এই কৌতূহলটা ধরে রাখা যেতে পারে। দর্শকরা চাইল, সাহসী বিকিনি, যেখানে শরীরের এক্সপোজার অনেক বেশি। অথচ পরদিন পরানো হল ফুল স্লিভস ধরনের কিছু। তাতে ভিউয়ার যেমন হতাশ হবে তেমন মজাও কি পাবে না? প্রকৃতির খেয়ালে একধরনের রহস্যই তো তৈরি হয়। সেই রহস্যটা প্রোগ্রামে ধরতে পারলে মন্দ হবে না।

উমাদেবীকে ঘরে ঢুকতে দেখে সোমনাথ কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট গলায় বলল, 'এখনও ঘুমোওনি?'

'না, ঘুমিয়েছি, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোর সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। যে-বাড়িতে ছেলে বেশি রাতে ফেরে এবং তারপরেও অফিসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে-বাড়িতে মাকে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই কথা বলতে হয়।'

সোমনাথ মুখ তুলে হেসে ফেলল। নিজের খাটে একটু সরে গিয়ে বলল, 'নাও বসো। বসে বসে ঘুমোও।'

উমাদেবী মুখ থেকে গাম্ভীর্য সরালেন না। এ ধরনের পাজি ছেলের সঙ্গে যত কম হাসিঠাট্টা করা যায় তত সংসারের পক্ষে মঙ্গল। তিনি চেয়ার টেনে খাটের পাশে বসলেন। সোমনাথ হাত বাড়িয়ে উমাদেবীর গায়ে রেখে বলল, 'রেগে আছ মা?'

'না, খুশি আছি। ছেলে গোল্লায় যাচ্ছে, মায়ের খুশি না থেকে উপায় কী?'

সোমনাথ কাগজপত্র সরাতে সরাতে হেসে বলল, 'না, সত্যিই রেগে আছ দেখছি। আচ্ছা বলো কী বলবে। মন দিয়ে তোমার কথা শুনব। আমার বিয়ের ব্যাপারে কতদূর এগোলে? মা, একটা কথা কিন্তু আমি বলে রাখছি, ওই সব চাপা নাকের মেয়ে আমার মোটেই পছন্দ নয়। চাপা নাকের মধ্যে অনেক ধরনের ভেজাল থাকে। মেকআপ দিয়ে আমরা হয় কে নয় করতে পারি। আমাদের সঙ্গে নো চালাকি। আমার জেনুইন খ্যাঁদা নাক প্রয়োজন।'

কথা শেষ করে সোমনাথ হো হো আওয়াজে হেসে উঠল। উমাদেবী ছেলের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

'ঠাট্টা তো করবিই। পেটের ছেলেকে সংসারী করে থিতু করতে চাইছি সে ঠাট্টা করবে না তো কে করবে?'

'দিদিও এক কাজ করছে, পেটের ভাইকে থিতু করতে চাইছে। জামাইবাবুও একই পথে নেমেছেন। উনি পেটের শালাকে থিতু করতে চান। চারপাশে থিতু করার হিড়িক লেগেছে।'

'অন্যের ভালোবাসা নিয়ে হাসিঠাট্টা করাটা কোনো বীরত্ব নয় সমু। বনানী,

boierpathshala.blogspot.com

নির্মল তোর ভালো চায়। তুইও সেটা জানিস আমিও জানি।'

সোমনাথ তার মায়ের হাতটা ধরে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'ভালোবাসা প্রকাশের কি আর কোনো রাস্তা নেই মা গো? মা...মা আমার...।'

উমাদেবী হাত টেনে সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। গলায় ঝাঁঝ এনে বললেন, 'তোর সঙ্গে আর একটা কথাও আমার বলতে ইচ্ছে করছে না। তুই যা ভালো বুঝিস কর। তবে একটাই কথা, বিয়ে-থা যদি সত্যি না করবি, তাহলে বনানীদের জানিয়ে দে। বেচারিরা মিছিমিছি মেয়ে-টেয়ে দেখে বিচ্ছিরি কাণ্ড করছে।'

'আমি তো দেখতে বলিনি।'

'একবার তোর দিদির সঙ্গে কথা বল না।'

'অসম্ভব, দুটো কথার পরই দিদি নির্মলদার প্রশংসা শুরু করবে। বেশিক্ষণ স্ট্যান্ড করা মুশকিল।'

উমাদেবী নরম গলায় বললেন, 'ওসব বাদ দে, একদিন অফিস-যাতায়াতের পথে বনানীর ওখান থেকে ঘুরে আয়।'

সোমনাথ মুখ তুলে বলল, 'কী বললে, আমি যাব? কী যে বল না, আমার এক মুহূর্ত সময় আছে? তুমি বরং ফোন করতে বলো, আমি গুছিয়ে বলে দেব, এখন বিয়ে-ফিয়ে সব স্টপ।'

উমাদেবী কঠিন গলায় বললেন, 'তুই কি সত্যি বিয়ে করবি না?'

সোমনাথ আবার তার ফাইল, কাগজপত্র কাছে টানতে টানতে বলল, 'বুঝতে পারছি না। ঝড়বৃষ্টির মতো। হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। ফোরকাস্ট মিলবে কি?'

উমাদেবী মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'দয়া করে এসব চালাকি মার্কা কথা আমার সঙ্গে না বললেই ভালো হয়।'

সোমনাথ ফাইলের পাতা উলটোতে উলটোতে হেসে বলল, 'চালাকি নয় মা, সত্যি সত্যি ঝড়বৃষ্টি নিয়ে খুবই চিন্তার মধ্যে আছি। এখন বিয়ে তো কোন ছার, মরতে বললেও মরতে পারব না। কমল মল্লিক আমাকে এমন টাইট পজিশনে ফেলেছে; স্বয়ং যমরাজ এলেও বলব, স্যার, দয়া করে একটু বসুন, আমার মায়ের সঙ্গে দুটো গল্প গুজব করুন। হাতে কোনো নাক খ্যাঁদা, শ্যামলা রঙের পাত্রী থাকলে জানান। হাইট শর্টের দিকে হলে সবথেকে ভালো হয়। আমার মা হন্যে হয়ে ছেলের জন্য বউ খুঁজছেন। দয়া করে ওঁকে সাহায্য করুন। শুধু একটাই রিকোয়েস্ট আমাকে বিরক্ত করবেন না স্যার।'

boierpathshala.blogspot.com

এরপর আর কথা বাড়ানোর কোনো মানে হয় না। উমাদেবী ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন। আর তখনই অর্কর চিঠির কথাটা মনে পড়ল। হাতের ভাঁজ-করা কাগজটা বাড়িয়ে বললেন, 'এটা ধর। অর্ক পাঠিয়েছে।'

ভাগনের নাম শুনে সোমনাথের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অর্ক মাঝেমধ্যেই তাকে নানা ধরনের কাগজের টুকরো পাঠায়। হয় তাতে তার নিজের হাতে আঁকা ছবি থাকে, নয় নানা ধরনের জিনিসের অর্ডার। সেইসব অর্ডার লেখা হয় অতি সংক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে। কখনও লেখা থাকে '১ বল'। কখনও লেখা থাকে '২ বন্দুক'। অর্ডার মতো সোমনাথ জিনিস কিনে রাখে। নিজে পারলে পৌঁছে দেয়, না পারলে বাড়িতেই রেখে দেয়। অর্ক এলে দেওয়া হয়। অর্ডার মতো জিনিস পেলে অর্ক যে উচ্ছ্বসিত হয় এরকম নয়। নির্বিকার মুখেই গ্রহণ করে। ভাবটা যেন, এমনটাই তো কথা ছিল। এই ছেলে একবার লিখেছিল, 'ওয়ান রাইনো।' অর্ডার দেখে সোমনাথ খুবই ঝামেলার মধ্যে পড়ল। গণ্ডার! গণ্ডার কোথায় পাওয়া যাবে! দোকানে দোকানে ঘুরে অনেক খেলনার খোঁজ পাওয়া গেল, কিন্তু কোথাও গণ্ডার পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত মল্লিক টিভির সেট ডিজাইনার ব্রজ তাকে বাঁচায়। সে তার পেঁচিয়ে সত্যি সত্যি একটা ইঞ্চি ছয়েকের গণ্ডার বানিয়ে দেয়। নাকের ওপর খড়্গটা পর্যন্ত আছে। সোমনাথ ভাগনের হাতে পুতুল তুলে দিয়ে বলে, 'খুশি?'

'না।'

'সে কী, তোর রাইনো জোগাড় করে দিলাম আর তুই খুশি নোস!'

'দেরি করেছ বলে খুশি নই।'

'বাঃ দেরি তো হবেই। আমাদের চারপাশে সব জ্যান্ত গণ্ডার, পুতুল গণ্ডার কি চট করে পাওয়া যায়?'

'জ্যান্ত রাইনো! কোথায় মামা? তোমাদের অফিসে?'

'শুধু অফিসে নয়, সব জায়গাতেই আছে। ঘুর ঘুর করে।'

'নাকের কাছটা এরকম উঁচু?'

সোমনাথ ভাগনের চুলে হাত বুলিয়ে বলে, 'অবশ্যই উঁচু রে ব্যাটা। তবে দেখা যায় না। শুধু চামড়াটা বোঝা যায়। স্কিন হেভি পুরু।'

অর্ক চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, 'কী করে বোঝো? গুলি ছুঁড়ে?'

'না, অপমান করে। কিছুতেই গায়ে লাগে না।'

'অপমান কী মামা?'

সোমনাথ হেসে বলে, 'সে আছে। আর একটু বড়ো হলে বুঝতে পারবি।'

boierpathshala.blogspot.com

'গণ্ডারের বুঝি অপমান গায়ে লাগে না?'

'আমার মনে হয় আসল গণ্ডারের গায়ে লাগে, মানুষ-গণ্ডারের লাগে না।'

'তুমি কী?'

সোমনাথ হাসতে হাসতে ভাগনেকে জড়িয়ে ধরে এবং বলে, 'আমি আসল গণ্ডার। এবার তোর সঙ্গে লড়াই করব।'

সেই অর্ক চিঠি পাঠিয়েছে—মামা, কাম সুন। ছেলেটার কী হয়েছে? খাওয়া নিয়ে দিদি অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়েছে? তাই হবে। এইট টাইম্‌স চলছিল, কে জানে এখন হয়তো বেড়ে টেন টাইম্‌স হয়ে গেছে। খুবই শিগগিরই ছেলেটা অসুখে পড়বে। সোমনাথের মনটা খারাপ হয়ে গেল। এম. এ. পাশ. করা একজন মহিলা কেমনভাবে এতটা অবুঝ হয়? মানুষ ভালোবাসায় খুন করতে পারে, স্নেহে অত্যাচার করা আর কী আশ্চর্যের। সোমনাথ চুপ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। এখনই অর্ককে একটা ফোন করবে? থাক, নিশ্চয় দিদিরা সবাই শুয়ে পড়েছে। তা ছাড়া কে জানে ছেলেটা হয়তো তাকে গোপনে কিছু বলতে চায়। মায়ের নামে কোনো নালিশ। সোমনাথ ঠিক করল, যতই কাজ থাক, কাল সে একবার অর্কর কাছে যাবেই।

দিদির বাড়িতে পা দিয়েই সোমনাথ বুঝতে পারল, অর্ক ভুল লেখেনি। সত্যি তার অতি বিপজ্জনক অবস্থা।

একই সঙ্গে দিদি, নির্মলদার গলা শোনা যাচ্ছে। উত্তেজিত গলা।এই সময় নির্মলদা বাড়িতে কেন? অফিসে যায়নি! শোবার ঘরে উঁকি মেরে সোমনাথ দেখল ঘটনা শুধু 'গ্রেট ডেনচার' নয়, 'গ্রেট গ্রেট ডেনচার।'

খাটের একপাশে হাত-পা ছড়িয়ে খালি গায়ে বসে আছে অর্ক। মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে আছে। চোখ-মুখ একই সঙ্গে বসা এবং আতঙ্কিত। দু-পাশ থেকে তার ওপর ঝুঁকে পড়েছে তার বাবা এবং মা। মায়ের হাতে দু-ধরনের বাটি, হাতে চামচ। সে পর্যায়ক্রমে ছেলেকে একবার এ-বাটি, একবার ও-বাটি থেকে খাবার তুলে অর্কর মুখে ঠেসে ঠেসে দিচ্ছে। মুখ খুলতে দেরি হলে চোখ পাকিয়ে ধমক দিচ্ছে— 'হাঁ কর, হাঁ কর বদমাইশ ছেলে। হাঁ না করলে আজ তোর একদিন কী আমারই একদিন। মেরে পিঠ ভেঙে দেব।' আর বাবা বিড়বিড় করে বলছে—'নে এবার বল, সাইটোপ্লাজম কী? রাইবোফ্লাভিন কাকে বলে? কী রে, চুপ করে আছিস কেন? পারছিস না? উফ সকাল থেকে এতবার পড়ালাম, এখন পারছিস না? মাথায় কী আছে? গোবর? নাকি থান ইঁট? ঠিক আছে জেনারেল নলেজ বাদ দে। অঙ্ক বল। সিক্সট্রিন টুয়েলভ জা কত হয়? নাইটিন

boierpathshala.blogspot.com

ইলেভেন জা? উফ, এটাও পারছিস না।কী হবে? এই লাস্ট মোমেন্টে তো দেখছি তোর ভয়ংকর অবস্থা।''

মুখে খাবার নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল চোখে অর্ক কিছু একটা বলতে গেল। মনে হয় নামতার উত্তর। কিন্তু উত্তর শোনা গেল না। গাব গাব জাতীয় আওয়াজ হয়ে মুখের খাবার ছিটকে পড়ল বিছানার ওপর। বনানী ছেলেকে চড় মারার জন্য হাত তুলল এবং তখনই দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা সোমনাথের সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। একগাল হেসে বলল, 'ওহ্, তুই! কখন এলি সমু?' অর্কও মুখ ফেরাল। মামাকে দেখতে পেয়ে দু-হাতের ঝটকায় বাবা-মাকে ঠেলে সরিয়ে একরকম লাফ দিয়ে এসে পড়ল সোমনাথের ঘাড়ের ওপর। সেই লাফের একটাই মানে— 'আমাকে বাঁচাও।'

সোমনাথ অবাক গলায় বলল, 'এসব কী হচ্ছে দিদি! কী করছিস তোরা?'

বনানীর বদলে উত্তর দিল নির্মল। তার চোখমুখের অবস্থাও বিধ্বস্ত। বিছানা থেকে উঠে পড়ে চিন্তিত মুখে বলল, 'আর বোলো না ভায়া। নেক্সট উইক থেকে অর্কর অ্যাডমিশন টেস্ট শুরু হচ্ছে। স্কুলে স্কুলে ভর্তির পরীক্ষা। মোট সতেরোটা জায়গা থেকে ফর্ম তুলেছি। আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে পড়াচ্ছি। ভেবেছিলাম তিনদিন ছুটি নিলে চলবে, এখন শুনছি সিলেবাসের অবস্থা মারাত্মক। তিনদিন ছুটিতে হবে না। সাতদিনই কামাই করতে হবে।'

সোমনাথ বিড়বিড় করে বলল, 'পড়াচ্ছেন সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তা বলে এইটুকু ছেলের এত পড়া! আর দিদি, তুই এটা কী করছিস? দুটো বাটি থেকে একসঙ্গে খাওয়াচ্ছিস কেন?'

বনানী ঝাঁঝিয়ে উঠল। বলল, 'খাওয়াচ্ছি! বল চেষ্টা করছি। দেখলি না পাজি ছেলে কেমন মুখ থেকে বের করে করে ফেলে দিচ্ছে? নিজের চোখেই তো দেখলি। পড়াশোনার এত চাপ এর মধ্যে একটু এক্সট্রা ইনটেক যদি না হয় কী করে হবে? দুটো বাটি একসঙ্গে নিয়েছি, যাতে সময় কম নষ্ট হয়। একটায় হাফবয়েল ডিম, একটায় আলুসিদ্ধ।' কথা শেষ করেই বনানী আবার চোখ পাকিয়ে ছেলেকে বলল, 'অ্যাই অর্ক, এদিকে আয়, আমাকে ছাড় তাড়াতাড়ি, তোর মামার সঙ্গে দরকারি কথা আছে।'

ভীত, সন্ত্রস্ত অর্ক মায়ের বাড়িয়ে দেওয়া চামচ থেকে আলুর টুকরো নিয়ে কোঁত করে গেলে। সোমনাথের দিকে ফিরে ছলছল চোখে জড়িয়ে-মড়িয়ে বলে, 'খেলতে দিচ্ছে না মামা। ওরা একটুও খেলতে দিচ্ছে না।'

নির্মল কলেজ প্রফেসরের ভঙ্গিতে গম্ভীর গলায় বলল, 'এখনও তোমার

boierpathshala.blogspot.com

জি. কে. কিছুই হয়নি অর্ক। অঙ্কের অবস্থাও ভীষণ পুওর। তারপর সোশ্যাল সায়েন্স আছে। এবার শুনছি, সব স্কুল অ্যাডমিশান টেস্টে সোশ্যাল সায়েন্সে জোর দেবে।'

বনানী সোমনাথকে বলল, 'এই ঘরে আয়, সমু। তোর সঙ্গে কথা আছে।'

অর্ক তার মামার হাত চেপে ধরে আছে। প্রবল সমুদ্র জলোচ্ছ্বাসে খড়কুটো পেয়ে বাঁচার মিথ্যে চেষ্টা। সোমনাথ তার ভাগনের মাথার চুল ঘেঁটে দিয়ে গলা নামিয়ে বলল, 'চিন্তা করিস না ব্যাটা। তোকে কীভাবে খানিকটা বাঁচানো যায় তার চেষ্টা করব। ততক্ষণ বাবার কাছে বসে পড়াশোনা করে নে। আমি ও-ঘরে গিয়ে প্ল্যান ভাঁজি।'

মাথার ওপর ফ্যানটাকে জোর করে দিয়ে এসে সোফায় বসল বনানী। ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী খাবি?'

'হাফ্‌বয়েল ডিম অ্যান্ড বয়েলড পোটাটো। দুটো আলাদা বাটিতে দিবি।'

বনানী ভুরু কুঁচকে বলল, 'এখন ফাজলামি করছিস, পরে নিজের ছেলেপুলে হলে বুঝবি।'

'পরের ছেলেকে নিয়ে এখনই বুঝতে পারছি। দিদি, তোর দুটো বাটিতে একই খাওয়ার ব্যবস্থা কিন্তু ফ্যানটাস্টিক। ইউনিক আইডিয়া। তুই বাটির সংখ্যা বাড়া।'

'মানে! বাটির সংখ্যা বাড়াব কেন?' বনানী সন্দেহের চোখে ভাইয়ের দিকে তাকাল।

'মানে কিছুই নয়। সামনে হাফসার্কেলে গাদাখানেক বাটি সাজিয়ে নিবি। তারপর চামচে করে এক-একটা থেকে ছেলের মুখে তুলে তুলে দিবি। না খেলে ধোলাই। এই সিস্টেমে ছেলে খাওয়ানোর নাম দিবি জলতরঙ্গ সিস্টেম। জলতরঙ্গ যেমন বাটিতে জল নিয়ে বাজায়, তেমন বাটিতে খাবার সাজিয়ে খাওয়ানো।'

'উলটোপালটা কথা বাদ দে। তোর সঙ্গে সিরিয়াস কথা আছে।'

সোমনাথ বিরক্তির ভান দেখিয়ে বলল, 'সিরিয়াস কথা শুনতেই তো এসেছি। নইলে তোর কী মনে হয় দরকারি কাজকর্ম ফেলে আমি অর্ককে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে এসেছি?'

বনানী ভাইয়ের কথায় কান দিল না। মামা ভাগনেকে আহ্লাদ দেবে এটা পাত্তা দেওয়ার মতো কিছু নয়। সোফার সামনের দিকে একটু এগিয়ে এল বনানী।

'আমি মাকে বলেছিলাম, সমু দিদির কথা ফেলতে পারবে না। সে আসবে।

boierpathshala.blogspot.com

তুই এসেছিস, আমি খুশি হয়েছি।'

'আমিও হয়েছি, এবার সিরিয়াস কথা শুরু হোক।'

বনানী গদগদ গলায় বলল, 'বিয়ের ব্যাপারে কিছু ভেবেছিস?'

সোমনাথ সোফায় হেলান দিয়ে হেসে ফেলল। বলল, 'এটা তোর সিরিয়াস কথা? যাবাব্বা, আমি ভাবলাম কী না কী? অবশ্যই ভেবেছি। অনেকদিন ধরেই বিয়ে নিয়ে ভাবনাচিন্তা চালাচ্ছি।'

'অনেকদিন ধরে! কই আমাদের তো কিছু বলিসনি? বরং মা তো উলটো কথা বলে, বিয়ের কথা শুনলেই তুই নাকি চটে যাস।'

'নিজের বিয়ের কথা নিজে ঢাকঢোল পিটিয়ে ছেলেরা বলতে পারে না এটা নিশ্চয় তুই জানিস দিদি।'

উত্তেজনায় সোফার কিনারায় চলে এল বনানী। একটা হাত বাড়িয়ে ভাইয়ের হাঁটু ছুঁলো।

'তোকে কিচ্ছু পেটাতে হবে না। ঢাকঢোল কাঁসর ঘণ্টা সব আমি পেটাব।' গলা আরও নামিয়ে বনানী বলল, 'মেয়ে কিছু ঠিক করেছিস সমু?'

দিদির উত্তেজিত মুখ দেখে সোমনাথ হেসে ফেলল।

'কী যে বলিস! বিয়ে করব মেয়ে ঠিক করব না! মেয়ে ছাড়া বিয়ে হবে! সত্যি দিদি, ছেলেকে খাওয়াতে খাওয়াতে বাড়াবাড়ি রকমের বোকা হয়ে যাচ্ছিস। কিছুদিন আগেই চিনের হোয়াংচু ইউনিভার্সিটিতে এ ব্যাপারে একটা রিসার্চ হয়ে গেছে। রিসার্চের বিষয়, সন্তান পালন এবং বাবা-মায়ের বুদ্ধিবৃত্তি। হোয়াংচু ইউনিভার্সিটির নাম শুনেছিস? জানতাম শুনবি না। ইউনিভার্সিটি জগতে টপ টেন লিস্টে যে-কোনো সময় ঢুকে যাবে। এখন থেকে তুই আর নির্মলদা বিশ্বের বড়ো বড়ো ইউনিভার্সিটির নাম ঠিকানা মুখস্থ করতে শুরু করে দে। অর্কর পাঁচ বছর হয়ে গেল, ইউনিভার্সিটি শিক্ষার আর বেশি দেরি নেই। হাতে গোনা ক-টা দিন মাত্র।'

'ফাজলামি রেখে মেয়ের কথা বল।'

সোমনাথ উদাসীন গলায় বলল, 'মেয়ে ফাইনাল করেছি বলব না। ইন্টারভিউ চলছে।'

'মানে! ইন্টারভিউ চলছে মানে!'

'ইন্টারভিউ মানে ইন্টারভিউ। এর আবার মানে অ-মানের কী আছে! চাকরির ইন্টারভিউ হয়, স্কুলে ভর্তির ইন্টারভিউ হয়, বিয়ের ইন্টারভিউ হবে না? তুই যেন আকাশ থেকে পড়লি? তবে এই ইন্টারভিউয়ের প্যাটার্নটা একটু

boierpathshala.blogspot.com

অন্যরকম। অন্যরকম বলেই সময় লাগছে।'

বনানী আরও অবাক হয়ে বলল, 'অন্যরকম বলতে?'

সোমনাথ মুচকি হেসে বলল, 'এই ইন্টারভিউ দু-পক্ষেই চলে। ইন্টারভিউয়ার আর ক্যান্ডিডেট কেউ কাউকে ছাড়ে না। আমার বেলাতেও চলছে।'

'তোর হেঁয়ালির মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। শোন সমু, আমাদের একটা রিকোয়েস্ট আছে। আমাদের না বলে তোর নির্মলদার রিকোয়েস্ট বলা উচিত। জানিস তো তার কেমন মাথা ঠান্ডা? শুধু ঠান্ডা নয়, অতি ব্রাইট ছেলে সে।'

সোফার ওপর হাত তুলে তার দিদিকে তাড়াতাড়ি থামিয়ে সোমনাথ বলল, 'আমি জানি দিদি। নির্মলদার চেনাজানা ওই মেয়েটির সঙ্গে আমার ডাইরেক্ট কথা বলার প্ল্যান তো?'

বনানী এক গাল হেসে গদগদ মুখে বলল, 'কী করে জানলি? মা বলেছে না?'

সোমনাথ এই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'দ্যাখো দিদি কথা বলতে আমার কোনো অসুবিধে নেই। তার ওপর প্ল্যান যখন নির্মলদার তখন তো আরও অসুবিধে নেই। বুদ্ধিমানের প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করাও বুদ্ধিমানের। তবে মুখোমুখি বসার মতো সময় আমার হাতে এখন নেই। তুই বরং আমার ফোন নম্বরটা ওই মেয়ের হাতে কোনোভাবে চালান করে দে। আগে টেলিফোনিক ইন্টারভিউ নিয়ে দেখা যাক। জানিস তো বিদেশে সব ইন্টারভিউ আজকাল হয় ফোনে, নয় মেলে হচ্ছে?'

উত্তেজিত গলায় বনানী বলল, 'সত্যি বলছিস কথা বলবি? ফাজলামি নয় তো? আমার গা ছুঁয়ে বল?'

'মিথ্যে বলব কেন?'

বনানী মুখ ভর্তি করে হেসে বলল, 'জানতাম তুই আমাদের কথা ফেলতে পারবি না। তুই সেরকম ছেলে নোস। মাকে বলছিলাম।'

সোমনাথ পকেট থেকে মোবাইল বের করে সময় দেখল। মোবাইলের চল শুরু হয়ে যাওয়ার পর থেকে ঘড়ি পরার রেওয়াজ কমে গেছে। দেরি হয়ে যাচ্ছে। এবার তাকে উঠতে হবে। কিন্তু আসল কাজটাই এখনও বাকি। দ্রুত মনে মনে ভেবে নিল সোমনাথ। আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'দিদি, তুই নির্মলদাকে আজই অফিসে গিয়ে ব্যবস্থা করতে বল।'

boierpathshala.blogspot.com

'এখন তো হবে না। সে তো ছুটি নিয়ে ছেলে পড়াচ্ছে।'

সোমনাথ এমনভাবে ভুরু কোঁচকাল যেন কথাটা শুনে সে খুবই বিরক্ত হয়েছে।

'এইটা কেমন কথা হল? শালার বিয়ের ব্যবস্থা আগে না ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে ছেলে পড়ানো আগে? তা ছাড়া তোরা অর্ককে নিয়ে বিরাট একটা গোলমালের মধ্যে পড়ে যাবি মনে হচ্ছে।'

'গোলমাল!'

'অবশ্যই গোলমাল। আমি জানতাম না তোরা ছেলের স্কুলে ভর্তি নিয়ে এই কাণ্ড করছিস, জানলে আগেই বলে দিতাম। আমার কাছে খবর আছে, এ-বছর থেকে স্কুলের অ্যাডমিশন টেস্টগুলো ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস থাকছে স্পোর্টস অ্যাকিটিভিটির ওপর। ভালো স্কুলে সেন্ট পার্সেন্টও হতে পারে।'

বনানী পিঠ সোজা করে ঢোঁক গিলে বলল, 'কী বলছিস হাবিজাবি! ঠাট্টা করছিস?'

সোমনাথ উঠে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'আমারও মনে হয় হাবিজাবি। তবু শুনেছি বলে জানিয়ে গেলাম। পরে আমাকে দোষ দিতে পারবি না। বলতে পারবি না সাজেশন জেনেও ভাগনের জন্য বলিনি। মনে রাখবি আমাদের এডুকেশন সিস্টেমে সাজেশনই আসল। মূল লেখাপড়ার কোনো ভ্যালু নেই। একেবারে গোড়া থেকে ছেলেমেয়েদের সাজেশনে অভ্যস্ত করানো উচিত। যাই হোক, স্কুলগুলো নাকি এবার দেখবে, ছেলেরা কেমন দৌড়ঝাঁপ করতে পারে, ফুটবলে কেমন কিক বসায়, ক্রিকেটের ব্যাট ঠিকমতো ধরতে পারছে কিনা। মেয়েদের বেলায় প্রশ্নপত্রে ব্যাডমিন্টন, স্কিপিং মাস্ট করছে।'

'কই আমি তো এরকম কিছু শুনিনি! যতসব উদ্ভট কথা।'

'হয়তো ঠিক নয়, কত কী আজেবাজে কথা কানে আসে। সব কি ঠিক হয়? তবে ভাগনেটা দিনরাত সাইটোপ্লাজম্ আর রাইবোফ্লাভিন মুখস্থ করে গিয়ে ফেল মারল, আর পাশের জন স্রেফ লং জাম্প দিয়ে চান্স পেয়ে গেল শুনলে মনটা খারাপ হয়ে যাবে। যাক, আমার মনে হয়, নির্মলদা ঠিকই করছে। তুই বরং চাপ আরও বাড়িয়ে দিতে বল দিদি। মানুষের শৈশব হবে চাপের, নিজের নয়।'

বনানী গভীর সন্দেহ নিয়ে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। সোমনাথ সুন্দর করে হাসে। তারপর অর্কর সঙ্গে দেখা না করেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। অর্কর সঙ্গে দেখা করার দরকার নেই। যা করার সে করে দিয়েছে। পুরোটা না পারুক খানিকটা পেরেছে। সে নিশ্চিত, আজ থেকে ছেলেটা অন্তত কিছুটা মুক্তি

boierpathshala.blogspot.com

পাবে। লেখাপড়ার নামে দম বন্ধ করা ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি। দিনের একটা সময় অবশ্যই সে খেলাধুলোর জন্য ছুটি পাবে। ইচ্ছে না থাকলেও তার বাবা-মা অসহায়ভাবে ছেলের সেই দৌড়ঝাঁপের দিকে তাকিয়ে থাকবে, কিন্তু বারণ করতে পারবে না। সাজেশনের ভূত তাদের মনের ভেতর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ভয় দেখাবে।

ট্যাক্সি ধরে প্রায় ছুটতে ছুটতে অফিসে পৌঁছোল সোমনাথ। রিসেপশন থেকেই বলল, বস্ অপেক্ষা করছে। এই রে! নিশ্চয় লেট হওয়ার জন্য মালিক বিরক্তি দেখাবে। ভয়ে ভয়ে ঘরের দরজা ঠেলল সোমনাথ।

কমল মল্লিক গম্ভীর মুখে বললেন, 'এসো সোমনাথ। একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হয়েছে।'

'কী ইন্টারেস্টিং ব্যাপার!'

'নিজের চোখেই দ্যাখো।'

কথা বলতে বলতেই কমল মল্লিক টেবিলের ড্রয়ার টেনে একটা পত্রিকা ধরনের জিনিস বের করলেন। ভাঁজ করা কাগজ। সোমনাথ হাতে নিয়ে খুলে দেখল, মফঃস্বলের পত্রিকা। বেঁটে খবরের কাগজের মতো দেখতে। কালি আবছা। টাইপ ভাঙা ভাঙা। প্রথম পাতার মাথায় নাম লেখা, 'বানেরহাট সংবাদ'। নামের ওপরে নীচে ফুল পাতার নকশা। গোদা গোদা টাইপে লেখা—'সত্যের বন্ধু, মিথ্যার শত্রু'। সোমনাথ পাতার নীচে তাকাল। একপাশে সারের বিজ্ঞাপন। সারের নাম 'সুন্দরী সার'। বিজ্ঞাপনে বস্তার ছবি। সেই বস্তা ধরে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে এক গ্রাম্যবধূ। কাঁখে কলসি, মাথায় ঘোমটা। গ্রাম্যবধূর গায়ে গামছা জড়ানো। সদ্য স্নান সেরে ওঠায় গামছা ভিজে শরীরের সঙ্গে লেগে আছে। একটাই বাঁচোয়া, ছাপা খারাপ হওয়ায় মেয়েটির শরীরের প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কমল মল্লিক তাকে পত্রিকাটা দিলেন কেন? এই বিজ্ঞাপন দেখতে? এর মধ্যে ইন্টারেস্টিং কোনটা?

মুখ তুলতে গিয়েই সোমনাথের বিজ্ঞাপনের পাশে চোখ পড়ল। লাল পেনসিলে দাগ দেওয়া চার লাইনের একটা কবিতা। কবিতা! কমল মল্লিক কি তাকে কবিতা পড়তে দিয়েছেন? তিনটে প্রোগ্রাম রিজেক্ট হয়ে যাওয়ার শোকে মানুষটার মাথার সমস্যা হল নাকি?

কবিতা ছোটো হলেও কবিতার নাম বড়ো। 'ঝিলডাঙার ছোট্ট মেয়ে ফুল'। নিচে কবির নাম, 'শ্রীগঙ্গাপদ মাঝি'। তারও তলায় ব্র্যাকেটের মধ্যে ছোটো হরফে লেখা কয়েকটা লাইন—

'আমাদের পত্রিকার অন্যান্য সব রচনাগুলির মতো এই কবিতাটিও একটি

boierpathshala.blogspot.com

সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা। বানেরহাটের তরুণ কবি গঙ্গাপদ মাঝির সঙ্গে কিছুদিন আগেই ফুল নামে এই আশ্চর্য মেয়ের বাবার দেখা হয়। তিনি নিজমুখে কবিকে জানিয়েছেন, তাঁর মেয়ে নাকি ঝড়জলের খবর আগাম জানতে পারে। শুধু ঝড়জল নয়, আগুনের বিপদও আঁচ করে। গঙ্গাপদ সেই ঘটনা অবলম্বন করেই কবিতাটি লিখেছে।'

এ আবার কী! সত্য ঘটনা অবলম্বনে কবিতা! কবিতার আবার সত্যি মিথ্যে হয় নাকি? বুজরুকির কত কায়দা। সোমনাথ বিরক্ত মুখে কবিতা পড়ল এবং শেষ করে চমকে উঠল।

সেই চমকানির পরিমাণ এতটাই বেশি যে পর পর আরও দু-বার তাকে কবিতাটি পড়তে হল।

boierpathshala.blogspot.com

আটত্রিশ

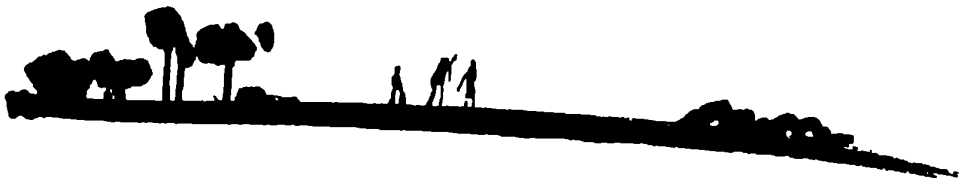

'ফুল, তুমি ঝড়ের খবর আগে জানো জলের খবর আগে জানো,
শুনে সবাই অবাক হয়।
বাতাস জানো, আগুন জানো, মনের কথা কেন নয়?
কেউ কি বোঝে, কেউ কি জানে কেন তোমার এমন হয়?
খবর শুনে সবাই কেন চমকে উঠি— কীসের ভয়!'

কবিতা পড়া শেষ হলে সোমনাথ মুখ তুলে কমল মল্লিকের মুখের দিকে তাকাল। এর মানে কী? কে ফুল? ঝিলডাঙাই-বা কোথায়! সে কীভাবে ঝড়জল আগুনের খবর পাবে!

কমল মল্লিক গম্ভীর। তিনি জল-টেবিলে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'তোমার শরীর কেমন সোমনাথ? খাটাখাটনি বেশি যাচ্ছে?'

কমল মল্লিকের এটা একটা স্বভাব। কর্মীদের সঙ্গে দরকারি আলোচনার সময়ে মূল কথায় বাইরে পাঁচটা উপ-কথায় ঘুরে আসেন। মনে হয় যার সঙ্গে কথা বলছেন তাকে খানিকটা 'আন্‌প্রিপেয়ার্ড' করে দিতে চান। সোমনাথ সতর্ক হল।

'না স্যার, খাটাখাটনি বেশি যাচ্ছে না। ওয়েদার বুলেটিনের স্ক্রিপ্টটা করার জন্য মোটে দু-রাত জেগেছি। এভাবে আরও কয়েক বছর চললে ওয়েট বেড়ে যাবে মনে হচ্ছে।'

এই ধরনের রসিকতায় কমল মল্লিক হাসেন। কোনোদিন অল্প, কোনোদিন বেশি। আজ হাসলেন না। নিজের মনেই টেবিলে হাত বোলাতে লাগলেন।

boierpathshala.blogspot.com

সোমনাথ সামান্য অধৈর্য গলায় বলল, 'এই কবিতার মানে কী স্যার? কাগজটা কোথা থেকে পেলেন?'

কমল মল্লিক একটু চুপ করে রইলেন। বললেন, 'কাগজটা কোথা থেকে পেলাম আমি জানি। কিন্তু কবিতাটার মানে কী সেটা জানি না। তুমি বলবে।'

সোমনাথ অবাক হয়ে বলল, 'আমি কী করে বলব!'

কমল মল্লিক খানিকটা নিজের মনেই বলতে লাগলেন।

'পত্রিকাটা পোস্টে এসেছে। যেমন হাজারটা হাবিজাবি কাগজপত্র রোজ আসে সেইভাবে এসেছে। তোমাদের মতো আমিও ফেলে দিই। খুব বেশি হলে একবার তুলে তাকাই, পড়ি না। কাল বিকেলে যে-লটটা এসেছিল সেগুলো খুলিওনি। হয়তো খুলতামও না। অফিসের পর ফেলে দিয়ে যেতাম। সন্ধেবেলা চা খাচ্ছিলাম। হঠাৎ কাপ থেকে খানিকটা চা চলকে টেবিলে পড়ল। নরমালি আমার এরকম হয় না। বোধহয় খানিকটা আনমাইন্ডফুল ছিলাম। বোধহয় কেন, ছিলাম। তাড়াতাড়ি হাতের কাছে যে-কাগজটা ছিল সেটা টেনে নিলাম টেবিল মোছার জন্য। আর তখনই চোখে পড়ল।'

কমল মল্লিক চুপ করলেন। সোমনাথ বলল, 'কী চোখে পড়ল? ছড়াটা?'

মল্লিক চোখ তুলে সরাসরি সোমনাথের দিকে তাকালেন। শান্ত গলায় বললেন, 'না ছড়াটা নয়। স্লোগানটা। এই যে লেখা আছে না আমরা সত্যের বন্ধু মিথ্যের শত্রু? ওইটা।'

সোমনাথ হাতের কাগজটা খুলে আবার দেখল। হ্যাঁ লেখা আছে। পত্রিকার মাথায় 'বানেরহাট সংবাদ' নামের তলায় লেখা আছে।

'ওটাই আমার অ্যাটেনশন ড্র করে। হয়তো রিয়ালিটি শো সবসময় মাথায় ঘুরছে বলেই সত্যি মিথ্যে ব্যাপারটা চোখে পড়ল। তখন আমি পত্রিকাটা দিয়ে টেবিল না মুছে উলটে দেখতে শুরু করি। একটা সময় কবিতাটায় এসে আটকে পড়ি। ইন্টারেস্টিং না?'

সোমনাথ ইতস্তত করে বলে, 'স্যার, কিছু মনে করবেন না আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না।'

কমল মল্লিক এবার ঠোঁটের ফাঁকে হাসলেন।

'কবিতাটা বলছে, একটা ছোটো মেয়ে ওয়েদার ফোরকাস্ট করতে পারে তারপরেও তুমি বলছ ঘটনা ইন্টারেস্টিং নয়! কোইনসিডেন্টটা একবার খেয়াল করে দ্যাখো সোমনাথ। আমরাও কিন্তু ওয়েদার নিয়ে কাজ শুরু করতে চলেছি। তাই না?'

boierpathshala.blogspot.com

সোমনাথ এবার বিরক্ত হল। তার মনে হচ্ছে, সামনে বসা এই ভদ্রলোকের মাথায় সত্যি সত্যি সমস্যা শুরু হয়েছে। স্বাভাবিক। টিভি জগতে বেশিদিন থাকলে মাথায় সমস্যা তৈরি হওয়াটা আশ্চর্য কিছু নয়। এখন পাড়াগাঁয়ের পত্রিকা নিয়ে চিন্তা করছে, অবস্থা যখন আরও ভয়াবহ হবে তখন দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করবে। উশখুশকো চুলে, ছেঁড়া জামাকাপড় গায়ে গড়িয়াহাটের মোড়ে বাড়ি থেকে টুল নিয়ে গিয়ে ভাষণ দেবে—'হে আমার প্রিয় দেশবাসী...।' ট্রাফিক জ্যাম হয়ে যাবে। পুলিশ টেনে নামাবে। তখন হেসে বলবে, 'চলুন ভাই, থানার লকআপে নিশ্চিন্ত মনে ভাষণ দিই। লকআপে কি টুল অ্যালাউ হবে?' না, তাকে সত্যি পালাতে হবে। এই জগাখিচুড়ি জগৎ থেকে দ্রুত পালাতে না পারলে তারও বিপদ আছে। নতুন প্রজেক্টটা দ্রুত শেষ করে বিদায় নেওয়া দরকার।

কমল মল্লিক আগ্রহ ভরা গলায় বললেন, 'চুপ করে আছো কেন সোমনাথ?'

সোমনাথ নীচু গলায় বলল, 'এটা কি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না স্যার?'

'কোনটা?'

'এই যে কোথাকার কী ফালতু একটা ছড়া নিয়ে ইন্টারেস্ট দেখানোটা?'

কমল মল্লিক হাসলেন। বললেন, 'আমিও তাই ভেবেছিলাম। ইনফ্যাক্ট কাল অনেক রাত পর্যন্ত ভাবনাচিন্তা করে এই বাড়াবাড়িটা থেকে আমি বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, বেরোতে পারিনি। মাথার মধ্যে গুন গুন করছে—কেউ কি বোঝে, কেউ কি জানে কেন তোমার এমন হয়?/ খবর শুনে সবাই কেন চমকে উঠি— কীসের ভয়!'

'স্যার আপনার মুখস্থ হয়ে গেছে!'

'মুখস্থ হয়নি, মনে আছে।'

সোমনাথ ফস করে নিশ্বাস ফেলল। অবস্থা সত্যি খারাপ। টেবিলের ওপর রাখা মোবাইল বেজে উঠল। দু-বার হুঁ, হাঁ করে ফোন কেটে দিলেন কমল মল্লিক। সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'তুমি এই খবর বিশ্বাস কর সোমনাথ?'

'কোন খবর?'

'এই যে ঝিলডাঙা গ্রামে ফুল নামের একটা মেয়ে ঝড়জলের অ্যাডভান্স খবর পায়?'

boierpathshala.blogspot.com

সোমনাথের চোখ বড়ো হয়ে গেল। মানুষটা বলে কী! সে কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'স্যার, আপনি কি বিশ্বাস করছেন কবিতার পিছনে কোনো সত্যি ঘটনা আছে!'

প্রশ্নের থেকে সোমনাথের বিস্ময়টাই বেশি।

'না, আমি করি না। ছোটোখাটো পত্রপত্রিকায় এ ধরনের গাঁজাখুরি গল্প অনেক সময় ছাপা হয়। মুখে মুখেও ছড়ায়। অ্যাস্ট্রলজি, ব্ল্যাক ম্যাজিক, অকাল্ট, ভুডু নানা ধরনের অলৌকিক ঘটনা। তুমি, আমি সচেতন, শিক্ষিত মানুষ, আমরা সেসব জিনিস বিশ্বাস করব কেন? আমরা করি না। কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়।'

সোমনাথ বলল, 'তাহলে কোনটা বড়ো কথা?'

কমল মল্লিক হাসলেন। সোজা হয়ে বসলেন। জল-টেবিলের ওপর ডান হাতটা ধীরে ঘষতে ঘষতে বললেন, 'বড়ো কথা হল মানুষ করে। অলৌকিক, অদ্ভুত, যা হয় না, হতে পারে না মানুষ তা বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করতে ভালোবাসে। আচ্ছা, সোমনাথ ধরো কেউ যদি এই স্পটে যায়?'

'স্পটে যায় মানে? ওই ঝিলডাঙায়?'

'হ্যাঁ, ক্ষতি কী? ধরো উইথ ক্যামেরা, লাইট, সাউণ্ড চলে গেল ? সত্যি যদি অদ্ভুত কিছু থাকে? ধরো, ওই যে ফুল নামের মেয়েটার যদি অতিরিক্ত কোনো ক্ষমতা থাকে? কোনো পাওয়ার? এক্সট্রা সেনসারি পারসেপশন। যাকে ই. এস. পি. বলা হয়। ক্লেয়ারভয়েন্স বলে একটা কথা আছে। অন্যের মনের কথা জানতে পারা। এই ফুল মেয়েটারও ধরো সেরকম কিছু রয়েছে। মানুষের বদলে সে প্রকৃতির মনের কথা বুঝতে পারে। কেউ একজন ক্যামেরায় জিনিসটা ধরে রাখল। এর থেকে বড়ো রিয়ালিটি শো আর কী হতে পারে?'

কমল মল্লিকের চোখ বড়ো বড়ো। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। তিনি যে বিষয়টা নিয়ে অনেকদূর ভেবেছেন এবং ভেবে উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সেই উত্তেজনা গলাতেও। সোমনাথ নড়েচড়ে বসে। কমল মল্লিক খানিকটা যেন ঘোরের মধ্যে বলে যেতে থাকেন।

'হতেও তো পারে। হয় না? কত মানুষের কত ক্ষমতা থাকে, আমরা কি সব জানি? ছোটোবেলায় আমার দিদিমাকে দেখতাম জিনিস হারিয়ে গেলে পায়ের আঙুলে সুতো বাঁধতেন। বলতেন, হারানো জিনিসরে বেড়ি দিলাম। আর যেন পলাইতে না পারে। তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে না সোমনাথ, অনেকসময় জিনিস খুঁজেও পাওয়া যেত।'

সোমনাথ বানিয়ে বানিয়ে গলা খাঁকারি দিল। খাঁকারি ভালো হল না।

boierpathshala.blogspot.com

'স্যার এই বুজরুকিকে মদত দেওয়াটা কি উচিত হবে? টিভির তো একটা মরাল রেসপনসিবিলিটি আছে।'

কমল মল্লিক চেয়ারে হেলান দিলেন। বললেন, 'অবশ্যই আছে। চ্যানেলে চ্যানেলে মেয়েদের জামাকাপড় খুলিয়ে আমরা সেই রেসপনসিবিলিটি রক্ষাও করছি। সেদিন দেখলাম মুম্বাইয়ের কোন চ্যানেল যেন ছেলেদেরও হাফ নেকেড অবস্থায় ফ্লোরে এনেছে। হিরো হওয়ার কম্পিটিশন চলছে। মুখের কথা নয়। ফুল ড্রেস, হাফ ড্রেস, ন্যুড সব লাগে। মহিলা জাজেরা ছেলেদের মাসল্‌স বিচার করে সিরিয়াস মুখে নম্বর দিচ্ছে। সাত, আট, সাড়ে নয়।'

সোমনাথ খানিকটা বিড়বিড় করে বলল, 'সেটা একরকম, কিন্তু তা বলে আমরা তো বুজরুকি, জালিয়াতিকে ব্যাক করতে পারি না।'

'না পারি না। যদি দেখি গোটাটাই মিথ্যে তাহলে সেটাই বলতে হবে। বলতে হবে আমাদের দেশে আজও এইভাবে জালিয়াতির ব্যবসা চলে। সেটাও একটা রিয়ালিটি শো হবে। হার্ড রিয়ালিটি। '

সোমনাথ শুকনো হেসে বলল, 'সে-প্রোগ্রাম আপনার কাছ থেকে কে কিনবে? কোন চ্যানেল? খরচাপাতিটাই জলে যাবে।'

কমল মল্লিক অন্যমনস্ক গলায় বললেন, 'খরচাপাতি নিয়ে মনে হচ্ছে না এই মুহূর্তে ভাবতে হবে।'

সোমনাথ চমকে উঠে বলল, 'স্যার আপনি কি এই প্রোগ্রাম করার কথা ভাবছেন নাকি!'

কমল মল্লিক সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। গলা নামিয়ে বললেন, 'আমরা একজন ফাইনান্সার পেতে পারি। ভদ্রমহিলা এই বিজনেসে টাকা ঢালতে চাইছেন।'

'ভদ্রমহিলা!'

কমল মল্লিক ঠোঁটের কোণে হেসে বললেন, 'হ্যাঁ ভদ্রমহিলা। অন্তত প্রথম সাক্ষাৎকারে আমার সেরকমই ধারণা হয়েছে। এবং মনে হয়, আমার ধারণা ভুল নয়। যদিও কথা কিছু এগোয়নি। তিনি শুধু নতুন কিছু চেয়েছেন। ভেবেছিলাম ঠিকমতো কনসেপ্ট এলে কথা বলব। এটা দিয়ে সেই কথা শুরু করলে কেমন হয়?'

সোমনাথের মনে হচ্ছে, সবটা গুলিয়ে যাচ্ছে। সে আমতা আমতা করে বলল, 'এটা দিয়ে শুরু করলে মানে, এই কবিতাটা দিয়ে!'

'না কবিতা দিয়ে নয়, কবিতার ভেতরটা দিয়ে। অসুবিধে আছে? যদি

boierpathshala.blogspot.com

প্রোগ্রামটার এরকম কোনো নাম হয়— দ্য রিয়ালিটি অব দ্য আনরিয়াল। বাংলায় ধরো আরও সহজ করে বলা হল, মিথ্যের সত্যি? একটার পর একটা সিরিজ তৈরি হতে লাগল। ভিউয়াররা নেবে না? আমার তো বেশ এক্সাইটেড লাগছে।'

সোমনাথ আর পারছে না। সে এবার পিঠ সোজা করে কাঁচুমাচু গলায় বলল, 'স্যার, আমাকে ছেড়ে দিন। দয়া করে আর আমাকে এসবের মধ্যে টানবেন না। মল্লিক টিভি মিথ্যের সত্যি অথবা সত্যির মিথ্যে যা-ই প্রোগ্রাম বানাক, আমি মনেপ্রাণে চাইব সেই প্রোগ্রাম সুপারহিট হোক। কেনার জন্য চ্যানেলে চ্যানেলে হুড়োহুড়ি পড়ে যাক। টি আর পি, ট্যাম রোজ বাড়তে থাকুক। কিন্তু আমাকে স্যার ছেড়ে দিন। আমি আগেই আপনার কাছে এই আবেদন করেছিলাম। তখন মঞ্জুর হয়নি। আপনি বলেছিলেন, মোম চ্যাটার্জির সঙ্গে ওয়েদার বুলেটিনের কাজটা করার পর পরই ছেড়ে দেবেন।'

কমল মল্লিক নির্লিপ্ত গলায় বললেন, 'কথাটা তুমি ঠিকই বলছ। আমি বলেছিলাম। কিন্তু ওই বুলেটিনের কাজটা তো আপাতত হচ্ছে না। কাজ না হলে তুমি ছাড়া পাবে কী করে?'

সোমনাথ আকাশ থেকে পড়ল। হচ্ছে না! সে ঢোঁক গিলে বলল, 'হচ্ছে না কেন? চ্যানেল ক্যানসেল করেছে?'

মল্লিক মিটিমিটি হেসে বললেন, 'না, আমি পোস্টপোনড করেছি। আপাতত স্থগিত। চ্যানেলকে কাল পরশু জানিয়ে দেব ভাবছি।'

'সে কী! মোমকে নিয়ে এত ঝামেলা করে রাজি করালাম স্যার...। সময়টা নষ্ট হল। মেয়ের মা যে কী পরিমাণ অসভ্য আপনি কল্পনা করতে পারবেন না।'

কমল মল্লিক হাত তুলে বললেন, 'খামোকা বলছ কেন সোমনাথ? মোমের সঙ্গে মল্লিক টিভির নতুন করে একটা যোগাযোগ তো হল।'

'লাভ কী? ওকে তো আর লাগছে না।'

কমল মল্লিক সামান্য হেসে বললেন, 'মোমকে লাগবে না তো বলিনি। ওকেই লাগবে, তবে ওয়েদার বুলেটিনে নয়, লাগবে অন্য কাজে। সেই কাজও তোমাকে করতে হবে।'

'আমাকে?'

কমল মল্লিক বললেন, 'এবার কাজের কথায় আসি সোমনাথ। মল্লিক টিভি মোটামুটি ফাইনাল করে ফেলেছে ফুল নামের এই মেয়েটাকে নিয়ে প্রোগ্রাম হবে। যদি আদৌ এরকম কোনো মেয়ে ওই ঝিলডাঙায় না কী যেন নাম সেখানে থেকে থাকে। সেই মেয়েকে খুঁজে বের করতে হবে। ইন্টারভিউ নেওয়া হবে।

boierpathshala.blogspot.com

শুধু তাকে ইন্টারভিউ নয়, তার বাড়িঘর, গ্রাম, গ্রামের মানুষ সবাইকে পেতে হবে। তার বাবা, মা, ভাইবোনের কথা থাকবে। আমরা চেষ্টা করব, একটা ঝড় বৃষ্টি জলের আগাম খবর এই মেয়ের মুখ থেকে শুনতে। প্রয়োজন হলে সেই খবর মেলে কিনা দেখবার জন্য ওখানে আমরা অপেক্ষা করব। একদিন, দুদিন, তিনদিন। সমস্যা নেই। এখন কালবৈশাখীর সময়। যে-কোনো সময় ঝড় বৃষ্টি হতে পারে। আবার নাও পারে।'

সোমনাথ অবাক হয়ে যায়। অকিঞ্চিৎকর একটা পত্রিকা কী লিখেছে, তাই নিয়ে মানুষটা এতখানি ভেবে ফেলেছে! সে টেবিলে দুটো হাতের ভর রেখে ঝুঁকে পড়ে।

'স্যার, একটা বানানো জিনিসের পিছনে আপনি সত্যি সত্যি ছুটবেন ঠিক করেছেন?'

'না, আমি ছুটব না। ছুটবে তুমি। তুমিই হবে এই প্রোগ্রামের পরিচালক। ক্যামেরার পিছনে তুমি আর ক্যামেরার সামনে থাকবে মোম। মোম চ্যাটার্জি। শি উইল বি দ্য অ্যাঙ্কর। সঞ্চালিকা। গল্পটা হবে এরকম—মোম গ্রামে গেছে আশ্চর্য মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে। তাকে পরখ করতে। এই জিনিস যদি আমরা গা ছমছমে করে দেখাতে পারি, এক লাফে আমরা কতটা এগিয়ে যাব তুমি বুঝতে পারছ? একটু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখলে, এই কাজটাও আসলে একটা ওয়েদার বুলেটিন। ওই ফুল নামের মেয়েটাও সেই ঝড়বৃষ্টির খবর দেয়। সেই অর্থে ওই মেয়েও তো আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানায়। তাই না?'

সোমনাথ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার। এই ধরনের উদ্ভট, মিথ্যে এবং গাঁজাখুরি গল্পের পিছনে দয়া করে আমাকে দৌড়োতে বলবেন না।'

কমল মল্লিক শান্ত গলায় বললেন, 'প্রোগ্রামটা যদি শেষপর্যন্ত হয় সোমনাথ, মল্লিক টিভি একটা বড়ো ব্রেক পাবে। ছোটোখাটো ব্রেক নয়, ন্যাশনাল ব্রেক। বলা যায় না বিদেশের চ্যানেলগুলোও ইন্টারেস্টেড হতে পারে।'

সোমনাথ কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'স্যার, আমার দরকার নেই। বড়ো, ছোটো কোন ব্রেকেই আমার দরকার নেই। টিভির কাজ আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি অন্য কারও কথা ভাবুন। এই লাইনে এখন অনেক ছেলে ভালো কাজ করছে। একটা প্রোগ্রাম করে দেওয়াটা বিরাট কিছু কারিকুরির বিষয় নয়। দয়া করে স্যার আপনি আমাকে আর এই ঝামেলার মধ্যে ফেলবেন না।'

কমল মল্লিক শান্ত করার ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি জানি সোমনাথ, কাজ

boierpathshala.blogspot.com

জানা ছেলে আছে আমি জানি। কিন্তু তারা মোমকে ট্যাকল করতে পারবে না। অথবা তোমার মতো পারবে না।'

সোমনাথ অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'মোমের বদলে অন্য কাউকে নিন। বাজারে আর্টিস্টের তো অভাব নেই।'

'তাও ঠিক, কিন্তু মোম স্ক্রিনে থাকলে জিনিসটা বিক্রি করতে সুবিধে হবে।'

সোমনাথ ইতস্তত গলায় বলল, 'তা বলে একটা মিথ্যে ঘটনার জন্য এত কাণ্ড করবেন?'

কমল মল্লিক সোমনাথের চোখের দিকে তাকালেন। শান্ত গলায় বললেন, 'ঘটনা মিথ্যে আমি জানি। কিন্তু কেন মিথ্যে সেটা জানি না। দুনিয়ায় এত কিছু থাকতে একটা ছোটো মেয়ে সম্পর্কে এই গল্প রটল কেন? সত্যি কি ঝিলডাঙায় এরকম কেউ আছে? এটাও একটা কনসেপ্ট। তুমি যেমন ঝড়বৃষ্টির কথা আগাম বলার জন্য মোমকে ভেবেছ, কেউ একজন এই ছোটো মেয়েটাকে হয়তো বেছেছে। পার্থক্য একটাই। আমরা উপগ্রহের কথা মতো পুর্বাভাস জানাব, আর ওই মেয়ে বলবে নিজের ইচ্ছেমতো। এটা কনসেপ্টের যুগ। সবাই কনসেপ্ট বেচছে। হয়তো এই মেয়ের বাবা মা-ই মেয়েকে নিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। বসলে সেটাও খুব ইন্টারেস্টিং হবে। গিয়ে তুমি হয়তো একটা দৃশ্য পেয়ে গেলে— সত্যি সত্যি ওই ঝিলডাঙা গ্রামে ফুল নামে একটা মেয়ে আছে। তার বাড়ির সামনে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এসে লম্বা লাইন দিয়েছে। তারা রোদ বৃষ্টির খবর জানতে চাইছে। সেই অনুযায়ী তারা নিজের কাজকর্ম চাষবাসের প্ল্যান প্রোগ্রাম করছে।'

কমল মল্লিক আবার ঘোরের মধ্যে চলে গেছেন।

'স্যার, রটনার পিছনে যে সবসময় কারণ থাকে এমন নয়। কবিতাটা পুরোই বানানো।'

এবার কমল মল্লিকও উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে জয়ের হাসি। সোমনাথ বিষয়টা নিয়ে কথা বলছে। এর অর্থ সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে।

'আগেই তো বললাম, তাহলে সেটাই আমরা খুঁজে বের করব। টিভির দর্শকরা আজকাল মিথ্যের সঙ্গে সত্যি দেখতেও পছন্দ করছে। মিথ্যের সত্যি। ঠিকমতো যদি সাজাতে পারো সে-জিনিসও জমিয়ে দেওয়া যায়। প্রোগ্রামের বেশিটাই হবে আউটডোরে। গাছপালা, নদীনালাতেই আদ্দেকটা মেরে দেওয়া যায়।'

boierpathshala.blogspot.com

'তা যায়।' সোমনাথ খানিকটা অন্যমনস্কভাবেই বলে ফেলল।

কমল মল্লিক বসলেন। মুচকি হেসে বললেন, 'গুড। সোমনাথ, তুমি তাহলে তৈরি হও। আমি চাই, ইউনিট খুব ছোটো হোক। এ ধরনের কাজের সময় সঙ্গে লোক যত কম থাকে তত ভালো। তা ছাড়া এই প্রোগ্রামের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, সিক্রেসি। গোপনীয়তা। ঘটনা কোনোভাবে যেন ফাঁস না হয়। ওই পত্রিকা অন্য কেউ হাতে পেলে চিন্তার কিছু নেই। বুঝতে পারবে না। কিন্তু কেউ কাজটা করছে শুনলে অন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। কলকাতায় টিভি চ্যানেল, প্রোডাকশন হাউসের কোনো অভাব নেই। এমনকি মফস্বলেও ক্যামেরা হাতে লোক ঘুরছে। হয়তো ওই বানেরহাটেও আছে। জানাজানি হয়ে গেলে সবটাই জলে। সুতরাং মুখ খোলা চলবে না। অফিসে তো নয়ই, এমনকি টিমের বাকিদের ঘটনা পুরোটা বলবে না। বানিয়ে বানিয়ে যা খুশি বলো, কিন্তু কোথায় যাচ্ছ, কেন যাচ্ছ সেটা বলবে না। এমনকি মোমকেও নয়। একেবারে শেষ মুহূর্তে গিয়ে জানাবে। আমি টাকাপয়সার বিষয়টা দু-একদিনের মধ্যে সেটল করে ফেলতে চেষ্টা করছি। আজই প্রীতি শর্মার সঙ্গে কথা বলব।'

'প্রীতি শর্মা কে?'

'ওই যে ভদ্রমহিলার কথা তোমাকে বললাম। নাউ গেট রেডি। বেশি দেরি করা যাবে না।'

সোমনাথ বুঝতে পারছে, তার পালাবার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ শুধু কমল মল্লিক একা করেননি, একটা আশ্চর্য গল্পও করেছে। সে টেবিলের-ওপর রাখা কাগজটা নিয়ে বলল, 'স্যার, এটা আমি রাখতে পারি?'

কমল মল্লিক হেসে বললেন, 'না, আপাতত ওটা আমার ফাইলে থাকুক। যা খোঁজখবর নেওয়ার আমি নিচ্ছি। তুমি মানসিক ভাবে তৈরি হও।'

'মোমকে কি স্যার এখনই কিছু বলব?'

'না, সময় হলে আমি বলে দেব।'

'যদি রাজি না হয়? মনে হয় না হবে।'

কমল মল্লিক সোমনাথের চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন, 'আমার মনে হয় হবে। তোমাকে সে না বলতে পারবে না।'

বস্‌এর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সোমনাথ দেখল, সন্ধে হয়ে গেছে। রিসেপশন ফাঁকা। রিসেপশনে নন্দিনীদি নেই। শিউচরণ টুলে বসে ঝিমোচ্ছিল। সোমনাথকে দেখে এগিয়ে এসে একটা কাগজের টুকরো দিল।

'কথাকলি দিদি আপকে লিয়ে ভেজা।'

boierpathshala.blogspot.com

সোমনাথ খুলে দেখল, চিঠি। দেখেই বোঝা যাচ্ছে তাড়াহুড়োর মধ্যে লিখেছে কথাকলি।

'সোমনাথবাবু, আপনি এখনও বস্‌এর ঘরে। আর অপেক্ষা করতে পারছি না। বাড়ি ফেরার তাড়া আছে। অনেক সকালে এসেছি। বাবার শরীরটা এখনও খুব ভালো নেই। নইলে হয়তো আর একটু অপেক্ষা করে যেতাম। আপনি কী নিয়ে এত ব্যস্ত মশাই? অফিসে আসছেনই না! কোথায় শ্যুটিং? পাহাড় না সমুদ্র? কেউ দেখলাম জানে না। গোপন কিছু? যাই হোক, তাহলে এখনও কাজটা ছাড়তে পারলেন না তো? আমি জানতাম পারবেন না। যাই হোক, যেখানে আপনাকে নিয়ে যাব বলেছিলাম, সেটা ক-দিনের জন্য পিছিয়ে দিয়েছি। মনে পড়ছে? আচ্ছা বলে দিচ্ছি। পুলিশের কাছে। এবার মনে পড়েছে? আপনি শ্যুটিং সেরে ফিরে এলে কথা হবে। পারলে ফোন করবেন। শুনলাম লুকিয়ে মোম চ্যাটার্জির বাড়িতে গিয়েছিলেন। কী হল জানতে খুব ইচ্ছে করছে। পৃথা জানে? না জানলে বলবেন, বলে দেব।ভালো থাকবেন। শুভ গোপন কাজ। ইতি কথাকলি।'

সোমনাথ বুঝতে পারল গোটা চিঠির মধ্যে একটা চাপা আনন্দ রয়েছে। খুশিতে না থাকলে এরকম চিঠি লেখা কঠিন। কী একটা বলতে গিয়েও যেন কলম তুলে নিয়েছে মেয়েটা। আর একবার পড়লে কি বোঝা যাবে? থাক বোঝার দরকার নেই। যে যেটুকু বোঝাতে চায় সেটুকুই বুঝতে হয়। কথাকলি মেয়েটা অনেক কষ্টে থাকে। সে ভালো থাকলেই ভালো।

সোমনাথ কাচের দরজা ঠেলে বাইরে এল। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। মনে হয় ঝড় বৃষ্টি হবে। আর তখনই দুম্ করে মনে পড়ে গেল—

'ফুল, তুমি ঝড়ের খবর আগে জানো জলের খবর আগে জানো,/ শুনে সবাই অবাক হয়।/বাতাস জানো, আগুন জানো, মনের কথা কেন নয়?'

সোমনাথ অবাক হল। আশ্চর্য! কবিতাটা তার মনে রয়ে গেল কী করে!

boierpathshala.blogspot.com

উনচল্লিশ

মানা সরকার ভেতরে ভেতরে ছটফট করছেন।

তিনি আশা করেছিলেন, প্রসঙ্গটা মিটিঙের শুরুতেই উঠবে। শুরুতে না হলেও মাঝখানে উঠবে। নেতাকে ক্যান্ডিডেট করার দাবিতে ছেলেরা প্রোগ্রাম করছে এটা সহজ কোনো বিষয় নয়। তার ওপর আবার প্রোগ্রাম অন্য কোথাও হচ্ছে না, হচ্ছে খোদ নেতার বাড়ির সামনে। এটা নিয়ে মিটিঙে কথা হবে না? কিন্তু শুরু, মাঝ কোনোখানেই প্রসঙ্গটা উঠছে না কেন! এরা কি ঘটনাটা এখনও শোনেনি? নাকি ইচ্ছে করে এরকম করছে? হতে পারে। বিজয় সান্যাল নিশ্চয় চাইছে ঘটনাটা যেন গুরুত্ব না পায়। পালটা গ্রুপের নেতার জন্য দলের ছেলেরা খেপেছে এটা ওর কেন সহ্য হবে? হওয়ার কথা নয়। এই বদ লোকের কাছে দল বড়ো নয়, গ্রুপই আসল। মিটিং শুরুর আগে নিশ্চয় তপন গুছাইতকে ম্যানেজ করা হয়ে আছে। বিদ্যুৎ ছেলেটা তো বিজয়ের চেলা। কম বয়েসের ফড়ফড়ে রাম। এর মধ্যেই বিরাট মাতব্বর হয়েছে। ওর সম্পর্কে আরও কিছু কিছু কথা শোনা যাচ্ছে। মেয়েছেলের কেস দিয়ে কিছুদিনের জন্য থমকে দেওয়া গিয়েছিল। কিন্তু খুব একটা এফেক্ট করেছে বলে মনে হয় না। বিজয়ের মতো লোকের জন্যই এই ছেলে বেড়েছে। সে যে তার 'গুরু'র কথা শুনে চলবে এতে আর আশ্চর্য কী? 'গুরু' যদি চুপ বলে সে মুখে একটার বদলে দশটা কুলুপ লাগিয়ে নেবে। গুরু যদি বলতে বলে চোঙা হাতে বেরিয়ে পড়বে। বাকি রইল উজ্জ্বল মুখোটি। ওটা একটা ম্যাদামারা। সর্বক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকে। মানা সরকার সামান্য হতাশা অনুভব করলেন। এসব এলিমেন্ট নিয়ে দলের মধ্যে গ্রুপ করা যায়? করলেও পাকাপোক্তভাবে হয় না। স্বাভাবিক কারণেই বিজয় হারামজাদার জোর

boierpathshala.blogspot.com

বাড়ছে। এর থেকে 'একলা চলো' পলিসি অনেক ভালো। যা হবে নিজে সামলাও। মানা মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি একাই চলবেন।

মিটিং শেষ হওয়ার মুখে প্রসঙ্গটা তাই নিজেই তুললেন মানা সরকার।

'আমার একটা কথা আছে।'

সবাই মানা সরকারের মুখের দিকে তাকাল। বিজয় সান্যাল বললেন, 'কী কথা? এজেন্ডার বাইরে কিছু?'

মানা সরকার ঠোঁটের ফাঁকে বিদ্রুপের হাসি এনে বলল, 'কেন এজেন্ডার বাইরে কথা বলা নিষিদ্ধ নাকি? বিজয়বাবু, আপনি তো সব ক-টা কথাই আজ এজেন্ডার বাইরে বললেন দেখলাম।'

বিজয় ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আপনার তাই মনে হল?'

'মনে হওয়ার কী আছে? নিজের কানেই তো শুনলাম। তিনটে কমিটিতে নিজের লোক ঢোকানো নিয়ে আদ্দেকটা সময় কাটিয়ে দিলেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা কীভাবে কাজ করব, ক্যান্ডিডেট, অর্গানাইজেশন, প্রোপাগান্ডা কিছুই ঠিক হল না। হাতে তো সময় বেশি নেই।'

বিজয় সান্যাল উত্তেজিত গলায় বললেন, 'কমিটিতে নিজের লোক ঢুকিয়েছি মানে! দলের লোক বলুন।'

মানা মুখে চুকচুক ধরনের আওয়াজ করে বললেন, 'আহা খেপে যাচ্ছেন কেন? ওই একই হল। দল আর আপনি আলাদা নাকি?'

বিদ্রুপটা হজম না করে বিজয় সান্যাল ঠোঁট কামড়ে বললেন, 'না আলাদা নই। দুর্ভাগ্যের বিষয় আপনি আর আমিও এক। এক দল যখন করি তখন আলাদা বলি কী করে? বলতে খারাপ লাগে, কিন্তু বাধ্য হই। গতবার কমিটি-গুলোতে আপনার লোক ঢুকেছিল। সে-কথা বোধহয় ভুলে গেছেন। সেবার আপনি গোটা একটা মিটিং ওদের হয়ে সওয়াল করেছিলেন। সেই লোকদের টার্ম শেষ হয়েছে। তা ছাড়া কমিটিগুলোর অবস্থা কী হয়েছে সেটা তো সবাই দেখতেই পাচ্ছি। কাজকর্ম তো দূরের কথা বছরে একটা মিটিংও হয়েছে কিনা সন্দেহ।'

উজ্জ্বল মুখোটি ঝগড়া থামানোর জন্য হাত তুলে বললেন, 'আহা, বিষয়টা নিয়ে আলোচনা তো হয়ে গেল বিজয়বাবু।'

বিজয় সান্যাল মুখ ফিরিয়ে সালিশি মানার ঢঙে বললেন, 'তপন, এগুলো আজকের আলোচনায় থাকার কথা ছিল না? আমি কি এজেন্ডার বাইরে এতক্ষণ বলেছি?'

boierpathshala.blogspot.com

তপন গুছাইত খানিকটা মিনমিন করে বলেন, 'লিখিত ছিল না, তবে ঠিক হয়েছিল বিষয়গুলো সেট্‌ল করে ফেলা হবে।'

মানা সরকার খুশি হলেন। তিনি চেয়েছিলেন বিজয় সান্যাল চটে যাক। চটে-যাওয়া মানুষের ব্রেন ফাংশন ঠিক থাকে না। নিয়ন্ত্রণ আনতে সুবিধে হয়। তিনি খানিকটা 'ক্ষমা করে দিলাম' গোছের মুখভঙ্গি করে বললেন, 'যাক, ওসব ছাড়ুন। যা করার করেছেন। একবার আপনার পছন্দের লোক ঢুকবে, একবার আমার পছন্দের লোক আসবে এতে আর আপত্তির কী আছে? সবই দলের স্বার্থে। এবার আমার কথাটা বলি। যার শোনার ইচ্ছে শুনবেন, যার ইচ্ছে নেই কান বন্ধ করে থাকুন। আমার মনে হচ্ছে দলকে বিষয়টা রিপোর্ট করা উচিত তাই বলছি। আমার বাড়ির সামনে ছেলেরা ছোটোখাটো একটা বিক্ষোভের মতো করেছে।'

তপন গুছাইত ভুরু কুঁচকে বললেন, 'বিক্ষোভ করেছে মানে! কোন ছেলেরা?'

মানা সরকার তপনের মুখের দিকে তাকালেন। সত্যি জানে না! নাকি ভান করছে? ভান করছে বলে মনে হচ্ছে না। তিনি মৃদু হেসে আশ্বস্ত করলেন। বললেন, 'না সেরকম কিছু নয়, আমাদেরই ছেলেপিলে সব। ওরা চাইছে পঞ্চায়েতে আমি ক্যান্ডিডেট হই। দল আমাকে টিকিট দিক। ছেলেমানুষের দল। আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম; ওরা শোনেনি।'

বিজয় সান্যাল চেয়ারে হেলান দিয়ে বিদ্যুতের মুখের দিকে তাকালেন। মানা সরকারের মনে হল চোখে চোখে ইশারা হল দুজনের। হোক। যত খুশি ইশারা হোক। এখন রাজনীতির অনেকটাই ইশারা ইঙ্গিতে চলে। সেই দিন আর নেই যে কথায় কথায় বজ্রমুষ্টি তুলে পথে বেরিয়ে পড়তে হবে। ইশারাতেই কাজ হয়ে যায়। হিন্দিতে বলে না ইশারা কাফি হ্যায়?

বিজয় বললেন, 'ঘটনাটা কি একটু ডিটেইলসে শুনতে পারি?'

মানা নির্লিপ্ত গলায় বললেন, 'সময় থাকলে শুনতে পারেন। না থাকলে নয়। ঘটনা এমন কিছু বড়ো নয়। আমার মতো ছোটো নেতার জন্য বড়ো ঘটনা হবে এমন আশা করাও অনুচিত। আপনাদের কথা হলে অন্য ছিল।'

তপন গুছাইত বললেন, 'আহা, তুমি বলবে তো।'

ছোটো একটা হাই মতো তুলে এমনভাবে ঘটনা বলতে শুরু করলেন মানা যেন বললেও হয়, না বললেও হয়।

'ক-দিন ধরেই ছেলেরা বলছিল, দাদা এবার আপনি দাঁড়িয়ে পড়ুন। ধমক

boierpathshala.blogspot.com

ধামক দিলাম। বললাম ভোটে দাঁড়িয়ে গাড়িঘোড়া চড়ার জন্য আমি রাজনীতি করতে আসেনি। তা ছাড়া আমাদের একটা দল আছে। তার কতগুলো নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে। ইচ্ছে করলেই কেউ নিজে থেকে ভোটে দাঁড়াতে পারে না।'

বিদ্যুৎ এতক্ষণ পরে মুখ খুলল। শান্ত গলায় বলল, 'আপনার কি ইচ্ছে আছে?'

চকিতে মাথা ঘোরালেন মানা। ধমক দেবেন? না থাক। খবর আছে, ছেলেটা ধমক খাওয়ার থেকে আরও একটু বেশি এগিয়েছে। মানা নিজেকে সামলে বললেন, 'আমার ইচ্ছে আছে না নেই সেটা বড়ো কথা নয় বিদ্যুৎ। দলের কী ইচ্ছে সেটাই বড়ো কথা। দল চায় না আমি ভোটে দাঁড়াই। যদি চাইত তাহলে ইচ্ছে না থাকলেও আমাকে দাঁড়াতে হত। তোমার মতো ছেলেছোকরারা দু-পাতা বই পড়ে যখন রাজনীতিতে এসেছে, তখন নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছের দাম তৈরি হয়েছে। আগে ছিল না।'

'আমাদের কোন ইচ্ছেটার দাম আছে? আমার তো খুব ইচ্ছে করে বাজে লোকগুলোকে তাড়িয়ে দলটাকে পরিষ্কার করি। কে দাম দেবে?' বিদ্যুৎ শান্ত অথচ কড়াভাবে বলল।

মুহূর্তখানেক ভাবলেন মানা। এই কথা যে তাকে উদ্দেশ্য করে বলা বুঝতে অসুবিধে হয় না। দু-পাতা লেখাপড়ার কথায় খোঁচা লেগেছে। তিনি শান্ত গলায় বললেন, 'এই প্রসঙ্গটা এখন আলোচনা না করলেই ভালো। এই মিটিং সেই প্ল্যাটফর্মও নয়।'

উজ্জ্বল মুখোটি তাড়াতাড়ি বললেন, 'আমরা কিন্তু আসল ঘটনাটা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি।'

মানা বললেন, 'ছেলেরা আমার কথা শুনল না। আমার বাড়িতে চিত্তশুদ্ধির প্রোগ্রাম ছিল। আলোচনার বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীনকালে নারী শিক্ষা। কি বিদ্যুৎ, বিষয় ভালো না? তুমি তো আবার দলে মহিলা ফ্রন্ট দেখছ। নারীদের ব্যাপারটা ভালো বুঝবে।'

কথাটা বলে সামান্য হাসলেন মানা। খোঁচার উত্তর খোঁচায় ফেরত। বিদ্যুৎ চুপ করে রইল।

'সকালে উঠে দেখি বাড়ির সামনে হইচই কাণ্ড। স্টেজ-ফেজ বানিয়ে ছেলেরা ঝামেলা শুরু করেছে। মাইকে লেকচার মারছে। পোস্টার-টোস্টারও টাঙিয়ে দিয়েছে। বোঝো কাণ্ড? লিখেছে, মানা সরকারকে ভোটে দাঁড়াতে হবে। মানা সরকার জিন্দাবাদ...।'

boierpathshala.blogspot.com

মানা শূন্যে হাত দিয়ে পোস্টার লিখে দেখালেন। লাজুক ধরনের হেসে বললেন, 'আমি তখনই থামিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু থামালাম না। ভিড় হয়েছিল। এই সময় মাথা গরম করে কিছু করলে বাইরের লোক ভুল বুঝবে।'

বিজয় সান্যাল মাথা নামিয়ে নখ দিয়ে টেবিল খুঁটছিলেন। চোখ তুলে বললেন, 'বাইরের লোক!'

মানা সরকার উদাসীন গলায় বললেন, 'সেটাই তো আশ্চর্যের ব্যাপার। দেখলাম, এপাশ ওপাশের গ্রাম থেকেও লোক হাজির হয়েছে! আমাকে ভোটে দাঁড় করাতে যে তারাও এত আগ্রহী হয়ে পড়বে আমার জানা ছিল না! ইনফ্যাক্ট তাদের অনেককে আমি চিনিও না।'

পর পর দুটো মিথ্যে বলে মানা থামলেন। 'বাইরের লোক' বলতে অনেকে আসেনি, এসেছিল শুধু ঝিলডাঙার কাদু। এখানে যে এরকম ধরনের কিছু হচ্ছে তা-ও সে জানত না। তা ছাড়া কাদুকে মানা চেনেন না এটাও মিথ্যে। শুধু চেনেন নয়, বেশিরকম চেনেন। সেই চেনা প্রতিদিনই বাড়ছে। আজও বেড়েছে। খবর পেয়ে বিক্ষোভ মঞ্চ থেকেই কাদুকে আলাদা করে ডেকে নিয়েছিলেন তিনি। চিত্তশুদ্ধি কর্মসূচি তখন সবে শেষ হয়েছে। লোকজন সরে গেছে।

দরজা-বন্ধ-করা ঘরে বসে কাদু দম ফেলল। স্লোগান দিয়ে হাঁপিয়ে পড়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল, 'দাদা, এ তো দারুণ ব্যাপার!'

মানা সরকার বুঝেও না বোঝার গলায় বললেন, 'কোনটা?'

দাঁত বের করে গদ্গদ গলায় কাদু বলল, 'এই যে আপনাকে ভোটে দাঁড় করানোর জন্য হুড়ুম তাল হচ্চে।'

মানা গর্ব অনুভব করলেও, সেই অনুভব গোপন করলেন। রাজনীতিতে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময়মতো বিভিন্ন ধরনের অনুভূতিকে তুচ্ছ করতে হয়। সেই অনুভূতি গর্বেরও হতে পারে, লজ্জারও হতে পারে। স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'ছেলেছোকরাদের কাণ্ড।'

'সে যা-ই বলুন দাদা, চেলে চোকরাই বলুন আর বুড়ো হাবড়াই বলুন, ভোটে আপনাকে দাঁড়াতেই হবে।'

মানা মুহূর্তের জন্য ভাবলেন। ব্যাটা তেল দিচ্ছে। আর দেরি করে লাভ কী? হারামজাদার সঙ্গে ঝিলডাঙা সিটটা নিয়ে একটা ফয়সালা করে ফেললেই হয় এবার। আজকাল ভালো জিনিস পড়ে থাকে, খারাপ জিনিস পড়ে থাকে না। খারাপ জিনিসের কদর বেশি। কেউ না কেউ ঠিক আস্তাকুঁড় থেকে তুলে নেবে। কাদু নামের এই অতি 'খারাপ'টিও বেশিদিন পড়ে থাকবে না। এখনই ফাইনাল

boierpathshala.blogspot.com

না হোক একটা ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে। তারপর রিঅ্যাকশন বুঝে দরদাম করা যাবে।

মানা মিটিমিটি হেসে বললেন, 'খেপেছ? তোমাদের মতো ইয়াং ব্লাড থাকতে, আমরা ভোটে লড়ব?'

'তোমাদের মতো' শুনে চোখ দুটো চকচক করে উঠল কাদুর। হারামজাদা বলে কী! প্রার্থী হওয়ার লাইনে তাকেও রেখেছে নাকি? তাই তো মনে হচ্ছে। সাবধানে এগোতে হবে। এই সময় তড়বড় করলে চলবে না। যে যত সাবধানী তার তত লাভ।

'কী যে বলেন দাদা? আমি কে?'

মানা ভুরু কুঁচকে বলল, 'কে মানে? তোমরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ নও? আমরা মরে হেজে গেলে মানুষের পাশে তোমরাই তো থাকবে। মানুষের বিপদে ছুটে যাবে। আপদে হুমড়ি খেয়ে পড়বে।'

কাদু মনে মনে আরও সতর্ক হল। শালা জাল ফেলছে। ভান করতে হবে জালে পড়েছি। জাল পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। তারপর সুযোগ বুঝে জাল ধরে টান মারলেই জাল সুদ্ধু জলে পড়বে। সে আরও গলে যাওয়ার ঢঙে বলল, 'আপনি বললে সব পারব দাদা। বিপদ-আপদের পাছায় লাথি কষাব। কিন্তু আমি তো দাদা আপনার দলের লোক নই। আমি কী করে ইলেকশনের টিকিট পাব!'

মানা সরকার বানানো বিরক্ত গলায় বলল, 'আহা, তুমিই যে দাঁড়াবে এমনটা এখনই বলছি না। অনেক ঝামেলা আছে। ক্যান্ডিডেট ঠিক করা কি সহজ ব্যাপার? আমি রাজি হলেই তো হল না, দলকে রাজি করাতে হয়। খরচাপাতি লাগে। সে অনেক ব্যাপার। তাও ধর, দাঁড়ালে, দলের কেউ নয় তো কী হল? মানুষের মঙ্গলের জন্য সবসময় দল দেখলে চলে না কাদু। আমি দেখিও না। আমার হাতে যে ক-টা ক্যান্ডিডেট বাছাইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমি ঠিক লোকদেরই বাছব। দল খুঁজব না, মানুষ খুঁজব। তোমাদের মতো মানুষ।'

কাদু নড়ে বসল। এ তো ক্লিয়ার সিগন্যাল! সে ভেবেছিল নিজেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথাটা পাড়বে। এখানে নয়, ঝিলডাঙাতে নিয়ে গিয়ে শান্তিকে হারামিটার কোলে বসিয়ে পাড়বে। শুয়ারের বাচ্চা তো নিজেই বলে ফেলছে! একেই বলে কপাল। ভাগ্যিস আজ এসেছিল। এসেছিল বলেই এমন একটা ঘটনা পেল। একেবারে স্টেজে উঠে স্লোগান পর্যন্ত দিতে পারল। সেই চিল্লানি নিশ্চয় শালার কান পর্যন্ত পৌঁছেছে।

মিথ্যে বিরক্তির ভান সরিয়ে হাসলেন মানা সরকার। ছোকরার জন্য টোপ

boierpathshala.blogspot.com

ফেলেছেন। এবার দেখার ছোকরা টোপ গেলে কেমন করে। একটা পরীক্ষা মতো হয়ে যাবে। তারপর বাকিটা এগোনো।

'আমার সঙ্গে মিশলে তুমি ব্যাপারটা আরও ভালো করে বুঝতে পারবে কাদু। আমি আমাদের দলের আর পাঁচটা চোয়াল-চাপা লিডারের মতো নই। চোয়াল চাপা লিডার বোঝ? চোয়ালে লক মেরে রাখে। বড়ো করে হাঁ করতে পারে না। ফলে হাসিও নেই, কান্নাও নেই। আরে বাবা হাসি কান্না ছাড়া মানুষের কথা ভাবা যায় নাকি? না বাপু আমার ওসব চলে না। আমার নেচারটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। বাইরে আমি হলাম গিয়ে লৌহকঠিন, ভেতরে... ভেতরে.. ভেতরে তুমি বলতে পারো ফুলের একটা বাগান, বাগান কেন? গোটা একটা বন নিয়ে ঘুরছি। সেখানে যে কতরকম ফুল ফুটে আছে! লাল, নীল, হলুদ, সবুজ। সেই ফুল আমি মানুষকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিলোই। আমার সঙ্গে আরও কিছুদিন কাটালে তুমি হয়তো আমাকে নিয়েই স্লোগান বানিয়ে ফেলবে—মানা সরকারের মন/ রঙিন ফুলের বন। মানা সরকারের মন/ রঙিন ফুলের বন....হা হা। '

নিজের নিম্নমানের রসিকতায় নিজেই শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগলেন মানা। কাদুও তার বিশ্রী দাঁত নিয়ে সেই হাসিতে যোগ দিল। বলল, 'বড়ো ভালো বলেচেন দাদা, বড়ো ভালো বলেচেন। মানা সরকারের মন/ রঙিন ফুলের বন। মানা সরকারের... আহা!'

মানা হাসি থামিয়ে গম্ভীর হলেন। টোপ ফেলার কাজ শেষ। আর তাড়াহুড়ো নয়। এই দুদিন মিশে এবং খোঁজখবর নিয়ে এই ছোকরা সম্পর্কে তাঁর ধারণা মোটামুটি পরিষ্কার হয়েছে। টিকিটের জন্য খরচাপাতি করতে পারবে। কতটা পারবে সেটাই এখন দেখার। ফাতনার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। ঠিক সময় টেনে তুললেই হল।

'থাক ওসব রসিকতা, তুমি আজ কেন এসেছ কাদু? তাড়াতাড়ি বলো। আমার সময় কম। জেলায় মিটিং আছে। দেখছ তো বাইরে কেমন গোল পাকিয়েছে শুয়ারগুলো।'

কাদু বড়ো করে শ্বাস নিল। বড়ো মাছ ধরতে জলে বড়ো করে ডুব দিতে হবে। বড়ো করে শ্বাস না নিয়ে রাখলে চলবে কী করে?

'দাদা, এবার তো একটা টাইম দিতে হয়।'

'কীসের টাইম?' মানা তাকালেন।

'বাঃ ভুলে গেলেন! ঝিলডাঙায় যাবেন কথা দিয়েচিলেন।'

'দিয়েছিলাম নাকি!'

boierpathshala.blogspot.com

অন্য কেউ এ ধরনের কথা বললে কাদু ছেড়ে কথা বলত না। বলত, 'উঠে দাঁড়া হারামজাদা। এবার পিছন ফের। একটা লাথি খেলেই মনে পড়ে যাবে কী কথা দিয়েছিলি আর কী দিস নি।' কিন্তু সামনে বসা মানুষটা 'অন্য কেউ' নয়। সামনে বসা মানুষটার নাম মানা সরকার। হাতের তালু দিয়ে কপালের ঘাম মুছল কাদু। নরম গলায় বলল, 'আপনি ব্যস্ত মানুষ, ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক দাদা। আমি কিন্তু সব ব্যবস্থা করে ফেলেচি। এখন না বললে শুনব না। আজ ডেট পাকা করে এখান থেকে উঠব।'

মানা সরকার উঠতে উঠতে বললেন, 'আরে বাবা হবে হবে, যাব'খন।'

কাদুও তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠল। নাছোড়বান্দা ধরনের মুখ করে বলল, 'হবে না দাদা, এখনই হতে হবে।'

মানা সরকার মুচকি হেসে বললেন, 'তোমার ওই কে যেন মেয়েটি? ভালো রান্না করে বলছিলে?'

মনে মনে দাঁতে দাঁত পিষল কাদু। এই তো শালা, সব মনে আছে। মেয়েছেলের কথা মনে না রেখে যাবে কোথায়?

'শান্তি দাদা, আপনার মতো বড়ো মানুষকে রেঁধে খাওয়াবে বলে এখন থেকেই লাফাচ্চে। আপনি এখন দিনটা বললেই লাফাতে লাফাতে চলে আসবে। ছেলেমানুষ বেচারি, এই উপলক্ষে নতুন ডেস-মেসও কিনে ফেলেচে শুনলাম।'

'খ্যাক খ্যাক' আওয়াজ করে হাসল কাদু।

মানা সরকার ভুরু কুঁচকে বলল, 'একেবারে নতুন পোশাক! বাপরে! ঠিক আছে, সামনের সপ্তাহে একটা দিন ঠিক করে ফেল। শনিবারও করতে পারো। দুপুরের দিকে। তোমার ঝিলডাঙার সাম্রাজ্যও দেখে আসব, ওই শান্তি মেয়েটার হাতের রান্নাও খেয়ে আসব। বাপু, রান্না যেন লাইট হয়। বেশি বয়েসের শরীর, বোঝোই তো।'

কাদু ঝুঁকে হাতজোড় করে কপালে ঠেকাল। আর তখনই দেখা গেল তার হাতে আজও একটা মিষ্টির বাক্স। তবে আগের দিনের মতো বড়ো নয়। সাইজে একটু ছোটো। এতক্ষণ পিছনে লুকিয়ে রেখেছিল।

মানা সরকার রাগ দেখিয়ে বললেন, 'এ আবার কী কাদু? আজও আবার মিষ্টি নিয়ে এসেছ কেন? প্রথম দিন এসেছিলে ঠিক আছে।'

কাদু লজ্জা লজ্জা মুখে বলল, 'দাদা, এটা মিষ্টি নয়।'

মানা সরকার কৌতুক করে বললেন, 'তাহলে কী, নোনতা?'

কাদু জিভ বের করে ঠোঁট চাটল। বলল, 'ঝিলডাঙার মানুষের প্রণাম। এটা

boierpathshala.blogspot.com

না করবেন না।'

কাদু চলে যাওয়ার পর মানা সরকার বাড়ির ভেতর ঢুকে সেই 'প্রণাম' দেখেছেন। দেখে অবাক হয়েছেন। 'শ্রী শ্রী কালিচরণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' লেখা ফ্যাতফ্যাতে কাগজের বাক্সে ছোকরা কীভাবে যে এতগুলো নোট গুঁজল! হাজার আর পাঁচশো টাকার নোট। মোট পাঁচ হাজার টাকা। একটাও ছেঁড়াফাটা নয়। ভালো, ছোকরা ঝিলডাঙায় যাতায়াতের খরচটা মাথায় রেখেছে। এটাই তো কেউ ভাবতে চায় না। তরজা, নৌটাঙ্কি, যাত্রা নিয়ে যাওয়ার খরচাপাতি থাকবে, নেতাদের নিয়ে যাওয়ার খরচা থাকবে না! পলিটিক্যাল পার্টিগুলো যুগযুগান্ত ধরে নিয়মটা মেনেও নিয়েছে! আরে বাবা, যুগ পালটাচ্ছে, তুমিও পালটাও। সবাই পয়সা নিয়ে যায়, তুমি ফ্রি যাবে কেন? তোমার প্রেস্টিজ থাকবে? যাক, এ ছেলে পারবে। বড়ো কাজ পারবে। ঝিলডাঙার টিকিটটা একে দেওয়াই মনে হচ্ছে ঠিক হবে। ওখানে গিয়ে আর একটু নেড়েচেড়ে নিতে হবে। আদর আপ্যয়নে বোঝা যায়, কতটা কন্ট্রোলে থাকবে। কতটা হাতের বাইরে। কাদুর মতো ছেলে দলে এলে শুধু মানুষের মঙ্গল নয়, দলেরও মঙ্গল। মানুষ হাওয়ায় চলে না, রাজনীতিও হাওয়ায় চলবে না। টাকাপয়সা লাগে। যে দিতে জানে, সে নিতে জানে। মনটা ফুরফুরে হয়ে গেল মানা সরকারের। আজ দিনটাই ভালো। ভেতরে চিত্তশুদ্ধি, বাইরে বিক্ষোভ, এরপরে জেলা। মাঝখানে দুম করে কিছু টাকা এসে গেল। বাথরুমে সাবান মেখে স্নানের সময় গুন গুন করে আওড়াতে লাগলেন— মানা সরকারের মন/ রঙিন ফুলের বন, মানা সরকারের মন/ রঙিন ফুলের মন...।

বিজয় সান্যাল দু-বার গলা খাকারি দিয়ে বললেন, 'তারপর?'

মানা সরকার চোখ তুলে বললেন, 'তারপর আর কী? কোনোরকমে বাবা-বাছা বলে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠান্ডা করে এলাম।'

বিদ্যুৎ ভুরু তুলে বলল, 'বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কেন?'

মানা মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'বুঝিয়ে-সুঝিয়ে করব না তো কী, ধমক দিয়ে করব?'

তপন গুছাইত ঠান্ডা গলায় বললেন, 'তাই করা উচিত ছিল। দলের নিয়ম শৃঙ্খলা ভাঙলে ধমকই দেওয়া দরকার।'

বিজয় অবাক গলায় বললেন, 'শুধু ধমক! একদল ছেলে রাউডিদের মতো আচরণ করবে, আর শুধু ধমকে ছেড়ে দিতে হবে? এভাবে দল চালানো হবে নাকি?'

boierpathshala.blogspot.com

মানা সরকার সোজা হয়ে বসলেন, 'রাউডি! এর মধ্যে গুন্ডা বদমাইশ কোথায় দেখলেন? ওরা তো গোলমাল কিছু করেনি, শান্তভাবেই ডেমনস্ট্রেট করছিল।'

বিজয় সান্যাল বললেন, 'গুণ্ডামি ছাড়া কী? কে ইলেকশনে দাঁড়াবে সেটা নিয়ে নিজেদের ইচ্ছেমতো প্রোগ্রাম করাটাই চরম ইনডিসিপ্লিন। গুন্ডামি।'

মানা সরকার ভেতরে ভেতরে নিজেকে দ্রুত তৈরি করার চেষ্টা করলেন। আক্রমণটা এভাবে আসবে তিনি ভাবতে পারেননি। তপনটাও মনে হচ্ছে ওদিকে ভিড়েছে; এর অর্থ গ্রুপবাজিতে বিজয়ের জোর বাড়ছে।

'আমি এটা মনে করি না বিজয়বাবু, একেবারেই মনে করি না। ওদের আমি দলের সম্পদ বলে মনে করি। অ্যাসেট। ওরা হয়তো ভালোর জন্যই এরকম ডিমান্ড করেছে।'

বিজয় সান্যাল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আপনি কী মনে করেন তা দিয়ে তো আর দল চলবে না। দল চলবে দলের নীতি আদর্শ দিয়ে।'

মানা সরকার এবার উত্তেজিত গলায় বললেন, 'এর মধ্যে আদর্শভঙ্গের মতো কী ঘটল? কিছু ছেলে আমাকে ভালোবেসে একটা কাজ করেছে সেটা আদর্শভঙ্গ হবে কেন?'

বিদ্যুৎ বলল, 'আপনাকে ভালোবেসে!'

মুখ ঘোরালেন মানা। চোখ মুখ কুঁচকে বললেন, 'কেন আমাকে ভালোবাসতে দলে বারণ আছে নাকি? যেদিন তোমরাই শুধু দল চালাবে, সেদিন এই নিয়মটা না হয় চালু কোরো বিদ্যুৎ। এখন ভালোবাসাটুকু নিতে দাও।'

বিদ্যুৎ মানা সরকারকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে তপন গুছাইতের দিকে তাকাল। বলল, 'তপনদা, আমার মনে হয় এ ব্যাপারে স্টেপ নেওয়া উচিত।'

উজ্জ্বল মুখোটি অবস্থা সামলানোর জন্য বললেন, 'মানাবাবু তো বললেন উনি ছেলেদের বুঝিয়ে বলেছেন।'

মানা সরকার দাঁত চেপে বললেন, 'বুঝিয়ে বলেছি মানে এই নয়, তাদের বকাঝকা করেছি। এই ভুলটা আপনারা করবেন না। আমার কাছ থেকে আশাও করবেন না।'

বিজয় সান্যাল চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'ভুল-ঠিকটা দলের ওপর ছেড়ে দিলেই ভালো হত না? আমি বিদ্যুতের সঙ্গে একমত। আমিও মনে করি, এ ধরনের কাজ যারা করেছে তাদের স্পট করে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আজ যদি এদের ছেড়ে দেওয়া হয়, কাল আরও বড়ো কিছু গোলমাল করবে।'

boierpathshala.blogspot.com

মানা সরকার উত্তেজিত গলায় বলেন, 'আমি মনে করি না, করতে দেবও না। আপনারা জেলাসি থেকে এসব বলছেন।'

বিজয় বললেন, 'কীসের জেলাসি?'

মানা সমান উত্তেজনায় বললেন, 'আমার পপুলারিটি নিয়ে জেলাসি।'

তপন গুছাইত ঝগড়া থামাতে চেষ্টা করলেন।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে যা হওয়ার হয়ে গেছে। ইলেকশনের মুখে এসব নিয়ে আর ঘাঁটাঘাটি করার দরকার নেই।'

মানা সরকার গলা ওপরে রেখেই বললেন, 'অবশ্যই আছে। ওরা যখন চাইছে ঘটনার এখনই একটা বিহিত হোক। আজ থেকে নিয়ম হয়ে যাক, কর্মীরা নেতাকে ভালোবাসতে পারবে না, নেতার জন্য ভাবতে পারবে না, নেতার কাছে কোনো দাবি-টাবিও জানাতে পারবে না।'

বিজয় শান্ত গলায় বললেন, 'আমরা-ওরার কোনো ব্যাপার নেই। সবার জন্যই সমান নিয়ম।'

তপন গুছাইত বললেন, 'অনেক হয়েছে, এনাফ ইজ এনাফ, আপনারা এবার ঝগড়া বন্ধ করুন।'

বিদ্যুৎ বলল, 'তপনদা এটা ঝগড়া নয়। আপনি কি তাহলে বলছেন, এবার থেকে আমরা এগুলো অ্যালাও করব? ভোটে দাঁড়ানোর জন্য ছেলেদের এনে হল্লা করাব?'

মানা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'হল্লা তো তোমার বাড়ির সামনে হয়নি বিদ্যুৎ, পার্টি অফিসেও হয়নি। তোমার এত চিন্তার কারণ তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তা ছাড়া, আমি না বললে ঘটনাটা তো তোমরা জানতেও পারতে না।'

বিদ্যুৎ চকিতে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'কে বলল জানতে পারতাম না? আপনি কি মনে করছেন, আমরা দল করি না? আমাদের সঙ্গে ছেলেরা নেই? দল শুধু আপনার মতো মানুষরাই করছে? তাহলে এতক্ষণ এই অফিসে তালা পড়ে যেত। ঝান্ডা গুটিয়ে পালাতে হত। অন্যদের এতটা আন্ডারএস্টিমেট করাটা কি ঠিক হচ্ছে মানাদা?'

মানা সামান্য চমকে উঠল। বিদ্যুতের গলায় জোর আছে। তাহলে এরা ব্যাপারটা জানত! এতক্ষণ চুপ করেছিল ইচ্ছে করে? বিদ্যুৎ ছেলেটা শুধু মিটিঙের মধ্যেই ফক্কড় নয়, বাইরেও যোগাযোগ আছে। সেই যোগাযোগ হেলাফেলা করার মতো নয়। বয়স অল্প। পাবলিকের কাছে ইমেজও ভালো। দলও পছন্দ করছে। ক-দিনের মধ্যে মহিলা ফ্রন্টটা চাঙা করে দিয়েছে।

boierpathshala.blogspot.com

কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে, ওপরতলার নেতাদের চোখেও পড়েছে। সেদিনই উজ্জ্বল মুখোটি বলছিল। অফিসে নয়, বানেরহাটে এক শ্রাদ্ধবাড়িতে দেখা হয়েছিল উজ্জ্বলের সঙ্গে।

'মানাবাবু, ওই ছেলে কিন্তু দলের নজরে পড়েছে বলে শুনছি।'

'পড়বে না? তোমরা মাথায় তুলেছ।'

'সে মাথায় তোলা, আর পায়ে নামানো যা-ই বলুন, দেখবেন বিদ্যুৎ তড়্তড় করে উঠবে।'

'উঠলে আর কী করব? আমাদের মাথায় বসে এবার ছেলেছোকরারা নেত্য করবে। তুমি কোথা থেকে খবর পেলে?'

'ডেফিনিট খবর কিছু পাইনি, শুনেছি। স্টেট লেভেলের নেতারা বিভিন্ন জেলা থেকে ভালো ছেলেদের সামনে আনার একটা প্রোগ্রাম নিয়েছে। এখনও বিষয়টা খুব সিক্রেট। এমনকি যাদের স্পট করা হচ্ছে, তারাও জানে না।'

'ভালো ছেলে! বিদ্যুৎকে ভালো ছেলে বলছে নাকি? দু-দিনও তো হয়নি জেলায় ঢুকেছে। এরমধ্যে ভালোমন্দ বোঝা হয়ে গেল? তাও যদি নিজের ক্রেডিটে আসত একটা কথা ছিল, এসেছে তো বিজয়দের গ্রুপবাজিতে।'

উজ্জ্বল মুখোটি বলল, 'সে যেভাবেই আসুক, ছেলেটা কিন্তু খারাপ নয়। লোকজন পছন্দ করছে। ব্যবহার সুন্দর। নিয়মিত পড়াশোনা করে। জেলায় ধীরে ধীরে গ্রিপ বাড়াচ্ছে।'

'আপনারা বাড়তে দিচ্ছেন তাই বাড়ছে। কমিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেই হয়।'

উজ্জ্বল ঠোঁটের ফাঁকে হেসে বলল, 'দলে ভালো লোকেরা এলে তো ভালোই।'

সেদিন খুব কিছু গা করেননি মানা। আজ বিদ্যুতের মুখে সরাসরি 'আন্ডারএস্টিমেট' শব্দটা শুনে মনে হচ্ছে, শোনা কথাটা খুব ভুল নয়। এই ছেলে বাড়ছে শুধু নয়, বেড়েছেও। কতটা বেড়েছে দেখা যাক।

মানা খানিকটা ঠান্ডা গলায় বললেন, 'কী জানো তুমি?'

বিদ্যুৎ চুপ করে রইল। বিজয় সান্যাল চেয়ারে গা এলিয়ে বলল, 'চুপ করে আছো কেন বিদ্যুৎ? ইনসিডেন্টটা সম্পর্কে কী জানো বল।'

মানা সরকার ঢোঁক গিলে হেসে বলল, 'ও কী জানবে? আমার বাড়ির সামনে ঘটল, আমিই কিছু জানতাম না। একেবারে স্পনটিনিয়াস ঘটনা। সকালে উঠে দেখি স্টেজ বেঁধে ফেলেছে। নইলে আটকে দিতাম।'

'তাই কী?' বিদ্যুৎ ভুরু কোঁচকাল।

boierpathshala.blogspot.com

মানা সরকার সরাসরি চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা ছাড়া আবার কী?'

বিদ্যুৎ মাথা নামিয়ে বলল, 'আপনি সিনিয়র লিডার মানাদা, ভেবেছিলাম চুপ করে থাকব, এখন আপনি যখন চাপ দিচ্ছেন...আগের রাতে আপনি আপনার ছেলেদের নিয়ে বসে প্রোগ্রামটা ঠিক করেন। সেই মতো রাতেই সব অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়। পোস্টার, ব্যানার থেকে শুরু করে স্টেজ বাঁধা পর্যন্ত সব। কীভাবে প্রোগ্রাম হবে, কে বলবে তাও ঠিক করে দেন। টাইমিংটা এমনভাবে করেন যাতে আপনার ওই চিত্তশুদ্ধি না কী যেন হয়, তার সঙ্গে মিলে যায়। লোকজন এসে দেখতে পায়, আপনাকে ক্যান্ডিডেট হিসেবে পেতে দলের ছেলেরা কেমন আগ্রহী... অথচ আপনি রাজি নন। সস্তা ধরনের গিমিক।'

মানা সরকার দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিসিয়ে ওঠেন, 'বাজে কথা, অল বোগাস।'

বিদ্যুৎ অল্প হেসে বলল, 'আমারও তাই মনে হয়। অল বোগাস। এতদিন দল করা একজন মানুষ, নিজেকে জনপ্রিয় দেখাতে হঠাৎ এই ধরনের ছোটো কাজ করবে কেন?'

মানা স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন। উজ্জ্বল তাহলে ভুল বলেনি। ছেলেটা বাড়ছে। মানা সরকারের ঘরেও লোক ঢুকিয়েছে! হেঁজিপেঁজি লোক নয়। মানা সরকারের ঘরের মিটিং কোনো হেঁজিপেঁজি লোক জানতে পারবে না। সে শুধু জানেই না, ঠিকমতো রিপোর্টও করেছে। স্পাইটা কে বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হল আর কী কী রিপোর্ট করেছে? কতটা করেছে?

মানা বিড়বিড় করে বললেন, 'সব মিথ্যে কথা। কন্সপিরেসি।'

বিদ্যুৎ হেসে বলল, 'তাই হবে চক্রান্তই হবে। না হলে স্টেজটা অমন নড়বড়ে বানায়? ভাগ্যিস ভেঙে-টেঙে পড়েনি। একটা কেলেংকারি হত।'

বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল মানা সরকারের। এতদূর পর্যন্ত জেনে ফেলেছে!

ফেরার সময় গাড়িতে গোটা পথটা চোখ বুজে রইলেন মানা। স্পাই খুঁজে বের করা খুব কঠিন হবে না। তাকে উচিত শিক্ষা দেওয়াটাও সমস্যার নয়। কিন্তু তাতে লাভ নেই। এরা যেভাবে বাড়ছে তাতে একজন গেলে আর একজন স্পাই হবে। তখন সে খবর পাচার করবে। যা করার দ্রুত করে ফেলতে হবে। গুটিয়ে আনতে হবে। হয় তাকে দল থেকে সরতে হবে, নয়তো বিদ্যুতের মতো ছেলেদের দল থেকে সরাতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

boierpathshala.blogspot.com

চল্লিশ

'মনোবিজ্ঞানী কার্ট লিউয়িন বলেছেন, বয়ঃসন্ধির সময়টা হল 'মারজিনাল ম্যান' বা 'সীমানার মানুষ' হয়ে থাকার সময়। সে তখন এদিকেও নয় আবার ওদিকেও নয়। শরীর এবং মন উভয়তই বিভ্রান্ত। আবেগের বিচারে সময়টাও মিশ্র। কষ্ট এবং আনন্দ দুটি একই সঙ্গে অনুভূত হয়। কখনও কষ্টকে আনন্দ বলে ভ্রম হয়, কখনও আনন্দে কষ্ট বোধ হয়। এই মিশ্র সময়ে ছেলেমেয়ের মনে প্রশ্ন জাগে, আমি তাহলে কোনদিকে? কোথায় আমার অবস্থান? আমার পথ কোনটা? কোনটা ঠিক, কোনটাই-বা ভুল? আদৌ ঠিক, ভুল বলে কি কিছু আছে? মনোবিদ এরিকসন সাহেবের এই বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আছে। তিনি মনে করেছিলেন, জীবনের এই পর্যায়ে মানুষ প্রথম তার আইডেনটিটি খুঁজতে শুরু করে। ইগো আইডেনটিটি। সহজ বাংলায় যাকে বলা যেতে পারে আত্মানুসন্ধান। আমি কে? কোথা থেকে এলাম? কোথায় যাব? এ শুধু জন্ম-মৃত্যুর বায়োলজিক্যাল সন্ধান নয়, তার থেকে আরও খানিকটা বেশি। মনস্তাত্ত্বিক সন্ধানও। সংকোচে দ্বিধায় সে এই প্রশ্নের উত্তর কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারে না। না তার অভিভাবক, না তার শিক্ষক শিক্ষিকা। নিজেই উত্তর খুঁজে পেতে চায়। অপরিণত মন, যুক্তি, বিদ্যায় সেই উত্তর বেশিরভাগ সময়েই হয় অস্পষ্ট, বিভ্রান্তিকর। যদিও অধিকাংশ মনোবিদ মনে করছেন, এই আত্মানুসন্ধান আসলে একধরনের চেতনার বীজ। সেই বীজ থেকে খুব দ্রুত স্বাধীন মতপ্রকাশের ডালপালা জন্মায়। মানুষ 'না' বলতে শেখে। 'না' শব্দটি মূলত কঠিন। 'হ্যাঁ' আমরা যতটা সহজভাবে নিতে পারি, 'না' আমাদের ঠিক ততটাই কঠিনভাবে সামনে আসে। তথাকথিত 'গুরুজনকুল' এই 'না' শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

boierpathshala.blogspot.com

যে-ছেলে বা মেয়েটি এতদিন সবকিছুতেই মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আসছিল, সে হঠাৎ আপত্তি করছে! কেন করছে? তার কী হল? আদৌ কি কিছু হল? ওদিকে 'না' বাড়তে থাকে। মানব না, শুনব না, করব না। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে মানুষের প্রথম আত্মানুসন্ধান কি আসলে নেতিবাচক? বিশিষ্ট জার্মান মনোবিদ স্প্রেঞ্জার বয়ঃসন্ধির প্রকৃতিকে মোটামুটি তিন পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যার মধ্যে প্রথম পর্যায়টি জটিল। শরীরী পরিবর্তনে যে নতুন চাহিদা, আবেগ তৈরি হয় তার সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংঘাত ঘটে এতবছরের শেখানো, গড়ে ওঠা পুরোনো ধ্যানধারণা, মূল্যবোধের। হাইপোথ্যালামাস, পিটুইটারি গ্ল্যান্ড, অ্যাড্রেনাল, সেক্স স্টেরয়েড, টেস্টোস্টেরন, ইস্ট্রাডিওল শরীরের ভেতর নিজেদের প্রক্রিয়া শুরু করে প্রবল বিক্রমে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয় প্রাথমিক এবং গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যগুলি। তৈরি হয় যৌন ইচ্ছা। আমাদের দেশের বেশিরভাগ কিশোর কিশোরী এই ইচ্ছাকে এক ধরনের অপরাধ হিসেবে ভাবতে শুরু করে। সিগ্‌মণ্ড ফ্রয়েডের কন্যা আনা ফ্রয়েড বলেছেন, যৌন ইচ্ছে আর অপরাধবোধ কাটাতে ছেলেমেয়েরা তখন নানা ধরনের প্রতিরোধ ব্যবহার করতে শুরু করে। কেউ নিয়মকানুন, রীতিনীতি, শিক্ষা দিয়ে একে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, কেউ নতুন কোনো পরিকল্পনা বা কাজের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করার কথা ভাবে। নৃতত্ত্ববিদ মার্গারেট রিড অবশ্য সামান্য অন্যপথে হেঁটেছেন। তাঁর মত—জীবনের এই সময়টিকে বুঝতে হলে শুধু জৈবিক বিষয়গুলিই নয়, গুরুত্ব দিতে হবে সমাজসংস্কৃতিকেও। মনোবিদ জ্যাঁ পিয়াজ আবার ঢুকেছেন সরাসরি মনের গভীরে। তাঁর কথায় বয়ঃসন্ধি হল সেই সময় যখন মানুষ বস্তুজগৎ থেকে বিমূর্ত জগতে পা ফেলে। এতদিন জানা ছিল দুই আর দুই যোগ করলে শুধু চার-ই হয়। এবার বোঝা গেল, এটাই শেষ কথা নয়। দুই আর দুইয়ে কোনো কোনো সময় তিন বা পাঁচও হতে পারে। সেই হিসেব আসে চোখে দেখা, কানে শোনার জগতের বাইরে থেকে। এক এক করে খুলতে থাকে কল্পনার জানলা...।'

এই পর্যন্ত লিখে পেন নামিয়ে রাখলেন সুদর্শন রায়। প্যাডের পাতা উলটে দিলেন। কেন জানি আজ আর লিখতে ভালো লাগছে না। আজকাল মাঝে মাঝেই এরকম হয়। মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। শুধু লেখা বলে নয়, একটানা কিছু করতে গেলে যে ধরনের মনঃসংযোগ প্রয়োজন সেটা যেন কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ কিছুদিন আগেও এরকম ছিল না। জোর করে কিছু করতে হত না। আপনাআপনিই মন বসে যেত। শুধু 'বসে যেত' বললে কম বলা হবে, একেবারে গভীরে ডুব দিত। একটা কিছু নিয়ে বসলে শেষ না করে ওঠার কথা

boierpathshala.blogspot.com

ভাবতেই পারতেন না। বিয়ের পর পর সুনন্দা কম রাগারাগি করেনি। অবশ্য তিনি কাজও করেছেন রাগারাগি করার মতো। এক রাতে তো ঘটনা বাড়াবাড়ি রকমের হল। স্ত্রীকে বেডরুমে অপেক্ষা করতে বলে চলে এসেছিলেন স্টাডিতে। তারপর ভুলেই গেলেন। তবে সেদিন রাগারাগির শুরুটা একরকমভাবে হলেও শেষটা ছিল অন্যরকম। সুনন্দা অন্যরকম মেয়ে ছিল বলেই সেটা সম্ভব হয়েছে।

'রাত কত হয়েছে তুমি কি জানো?'

স্টাডির দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন সুনন্দা। স্ত্রী-র গলা শুনতে পাননি সুদর্শন রায়। টেবিলের ওপর খোলা বইতে যেমন মুখ ডুবিয়ে ছিলেন, তেমনই রইলেন। সুনন্দা এবার দরজায় নক করলেন। সুদর্শন চমকে ফিরে তাকান।

'তুমি!'

সুনন্দা থমথমে মুখে বললেন, 'কত রাত হয়েছে?'

সুদর্শন রায় থতমত ভাব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। টেবিলের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা খাতা-বই হাতড়াতে হাতড়াতে বললেন, 'কটা বাজে? আরে, ঘড়িটা যে কোথায় রাখলাম... কোথায় রাখলাম বলো তো নন্দা! কী আশ্চর্য কাণ্ড! আসলে কী হয়েছে জানো...বইটা পড়তে পড়তে...দাঁড়াও দেখছি ক-টা বাজে... আহা, তুমি ঘুম থেকে উঠে এলে কেন... ছি ছি অনেক রাত করে ফেললাম তো...কী হয়েছে জানো নন্দা, সেদিন একজন পেশেন্ট... ঘড়িটা কোথায় রাখলাম বলো তো...নিশ্চয় অনেক রাত হয়ে গেল...।'

কথা বলতে বলতেই সুদর্শন রায় হাসলেন। অপরাধের হাসি। সামনে খোলা বই বন্ধ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। সুনন্দা গম্ভীর গলায় বললেন, 'উঠলে কেন? পড়া শেষ করো।'

সুদর্শন এগিয়ে এসে হাসলেন। বললেন, 'নাও চলো। শুতে যাই।'

সুনন্দা দরজায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'না, আগে তোমাকে বলতে হবে এখন রাত ক-টা।'

সুদর্শন রায় বুঝলেন, স্ত্রী সত্যি খুব রেগে আছে। রেগে থাকাটাই স্বাভাবিক। 'এখুনি আসছি' বলে স্বামী যদি বেডরুমে ছেড়ে চলে আসে এবং বই মুখে বসে যায় তাহলে রাগ ছাড়া আর কী হবে? তাও একদিন দু-দিন নয়, সপ্তাহে তিন-চারদিন এরকম হয়ে যাচ্ছে। আবার করারও তো কিছু নেই। এমন সব কেস আসে, নিয়মিত পড়াশোনা না করলে চিকিৎসা তো দূরের কথা, ডায়াগনোস-ই অসম্ভব। বিয়ের এই ক'বছরে সুনন্দা এই অত্যাচার অনেকটা মেনেও নিয়েছে। আজ মনে হয়, দেরিটা একটু বেশিই হয়ে গেছে। সুদর্শন রায়

boierpathshala.blogspot.com

লজ্জা পেলেন। তিনি হাত বাড়িয়ে স্ত্রী-র কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'নাও, চলো।'

সুনন্দা শান্তভাবে কাঁধ থেকে স্বামীর হাত নামিয়ে বললেন, 'না যাব না। আগে বলো রাত ক-টা হল?'

সুদর্শন রায় একটু বিরক্ত হলেন। সেই বিরক্তি লুকিয়ে হেসে বললেন, 'কী ছেলেমানুষি করছ নন্দা?'

'আমি ছেলেমানুষ আর তুমি খুব বড়োমানুষ তাই তো?'

'আহা, আমি সে-কথা বলিনি।'

'তাহলে কী বলছ?'

'আমার নেচারটাই তো এরকম নন্দা।'

'কীরকম নেচার? বউকে আসছি বলে ভুলে যাওয়া।'

'বাপ রে, তুমি দেখ্‌ছি রাতদুপুরে বিরাট ঝগড়া শুরু করলে।'

'রাত দুপুর!' কথাটা বলে ঠোঁটের কোণে অল্প হাসলেন সুনন্দা।

সুদর্শন রায় ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কেন? কত রাত?'

'এই নাও, দ্যাখো কত রাত।'

সুনন্দার বাড়ানো হাতের দিকে তাকিয়ে সুদর্শনবাবু দেখলেন, তার ছোট্ট সোনালি ব্যান্ডের রিস্টওয়াচটা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। যুদ্ধের জন্য একেবারে তৈরি হয়ে আসা যাকে বলে। সত্যি ছেলেমানুষ। মনে মনে মজাই পেলেন সুদর্শন। কিন্তু মজা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। হাত বাড়িয়ে ঘড়ি নিয়েই তাঁকে চমকে উঠতে হল। রাত কোথায়? এ তো সকাল! প্রায় চারটে বাজতে চলল! কেলেঙ্কারি। পড়তে পড়তে গোটা রাত কাবার করে ফেলেছেন!

স্ত্রী-র হাত ধরে সুদর্শন রায় কাঁচুমাচু মুখে বলে উঠলেন, 'সরি, ভেরি সরি নন্দা, একেবারে বুঝতে পারিনি। আসলে ঘড়িটা...।'

সুনন্দা হাই তুলে বললেন, 'থাক, অত ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই। বড়ো মানুষের এরকমই হয়। দিন রাত গুলিয়ে যায়। ব্যস, এইটুকু তোমাকে বোঝানোর জন্য বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছিলাম।'

সুদর্শন রায় খানিকটা অপরাধীর মতোই সুইচ বোর্ডের দিকে হাত বাড়ালেন। বললেন, 'চলো, আলো নিভিয়ে শুতে যাই।'

সুনন্দা আড়মোড়া ভেঙে বললেন, 'তুমি যাও। আমি এখন শোব না। আর একটু পরেই তো ভোর হবে। আমি বরং এক কাপ চা খাই।'

আলো নেভাতে গিয়ে হাত তুলেই থমকে গেলেন সুদর্শন। এক মুখ হেসে

boierpathshala.blogspot.com

বললেন, 'বাঃ, তাহলে আমিও এক কাপ খাব।'

সুনন্দা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'খেতে খেতে আবার বই নিয়ে বসবে তো?'

সুদর্শন স্ত্রী-র গালে আলতো হাত দিয়ে বললেন, 'না, তোমার সঙ্গে গল্প করব।'

সুনন্দা মুখ সরিয়ে বললেন, 'বয়ে গেছে।'

মুখে 'বয়ে গেছে' বললেও চায়ের কাপ নিয়ে সেদিন স্বামীর পাশে এসে বসেছিলেন সুনন্দা। চায়ে চুমুক দিয়ে সুদর্শন বলেছিলে, 'চমৎকার।' সুনন্দা ঠোঁট বেঁকালেন। সুদর্শন হেসে বললেন, 'একেবারে তোমার রাগের মতো চমৎকার নন্দা।'

'ঢং। গোটা রাত বসিয়ে রেখে এখন প্রেম দেখাচ্ছে।'

'এবার কিন্তু তোমার রাগ থামানো উচিত। একটু পরেই আলো ফুটবে। উষা। একেবারে মাহেন্দ্রক্ষণ। শাস্ত্রে এই সময় ক্রোধ নাস্তি।'

'রাগ করতে বয়ে গেছে। আমার রাগ দেখার সময় কোথায় তোমার? চিনি ঠিক হয়েছে?'

সুদর্শন হেসে বললেন, 'না, হয়নি। তুমি একটু হাসলে ঠিক হবে। আসলে কী জানো নন্দা, মানুষের মন নিয়ে কারবার একটা জটিল ব্যাপার।'

সুনন্দা উদাসীন ধরনের মুখ করে বললেন, 'এই ক-বছরে সেটা আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। মানুষের মন নিয়ে পড়ে থাকতে হলে আর যাই হোক, বউয়ের মন মনে রাখা সম্ভব নয়।'

'এ তোমার রাগের কথা। আসলে বইটা বললাম না খুব ইন্টারেস্টিং। তুমি নিয়ে বসলে তোমারও এই ঘটনা ঘটত। শেষ না করে উঠতে পারতে না।'

'থাক, আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। বইটা কী?'

সুদর্শন রায় উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'স্যার আলেকজার মরিশন নামে এক ভদ্রলোকের লেখা। তিনি ইরোটোম্যানিয়া নিয়ে দারুণ কাজ করেছেন।'

'কী ম্যানিয়া?' সুনন্দা ভুরু কোঁচকালেন।

'ইরোটো, ইরোটোম্যানিয়া।'

'সেটা আবার কী!'

সুদর্শন রায় কাপে তৃপ্তির চুমুক দিলেন,তারপর স্ত্রী-র দিকে ঘুরে বললেন, 'এক ধরনের স্কিৎজোফ্রেনিয়াই বলতে পার। এই অসুখে রোগীর মনে হয় বিখ্যাত কেউ তার প্রেমে পড়ে গেছে।'

'সে আবার কী!'

boierpathshala.blogspot.com

সুদর্শন সামান্য হেসে বললে, 'সেটাই তো সমস্যা। মরিশন সাহেব যা বলেছেন তাতে মনে হচ্ছে, এটা সাহেডিল্যুসনাল ডিসঅর্ডারের একটা অন্য চেহারা।'

'ওসব ডাক্তারি বুলি বাদ দিয়ে সহজ করে বলো তো। সেলিব্রেটিদের প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া তো কমন ব্যাপার। এ আবার অসুখ কী? চারপাশেই দেখছি। ঝরনা মাসির ছেলে তো ফিল্মস্টার...'

'না না এটা ঠিক সেরকম নয়। অপরিণত বয়েসের ব্যাপার নয়। ইরোটোম্যানিয়ায় উলটোটাই হয়। পেশেন্ট বিশ্বাস করতে শুরু করে নামকরা কেউ তার প্রেমে পড়েছে। এই বিশ্বাসটা বাড়তে থাকে। দু-দিন আগেই একজন মহিলাকে নিয়ে তার স্বামী চেম্বারে এসেছিল। প্রথমে আমি অসুখটা বুঝতে পারছিলাম না। শুধু বুঝতে পারছিলাম মহিলা একধরনের ইলিউশনের মধ্যে ঢুকে গেছেন। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে ইলিউশনটা ঠিক কোন ক্যাটাগরির বুঝতে পারিনি।'

'মহিলা কার কথা বলছিল? কে তার প্রেমে পড়েছে?'

সুদর্শন রায় হেসে ফেললেন। বললেন, 'ওরে বাবা! সে খুব বিখ্যাত একজন মানুষ। একেবারে বিশ্বখ্যাত।'

চায়ের কাপ নামিয়ে সুনন্দা চোখ বড়ো করে বললেন, 'এত বড়ো! কে তিনি?'

'স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।'

'অ্যাঁ!'

সুদর্শন রায় মুচকি হেসে বললেন, 'ইয়েস ম্যাডাম। পুরুষ নারী নির্বিশেষ আমরা সবাই যার প্রেমে হাবুডুবু খাই, তিনিই নাকি মৃত্যুর এত বছর পরে ওই মহিলার প্রেমে পড়েছেন!'

সুনন্দা সোজা হয়ে বসলেন।

'বলো কী!'

'এটাই তো মনের জটিলতা প্রিয়তমা। অসুখ করলে সে সবরকম সম্ভব অসম্ভব, বাস্তব অবাস্তবের বেড়া টপকে যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলে গেছেন না, নিবিড় মেঘের ছায়ায় মন দিয়েছি মেলে, ওগো প্রবাসিনী, স্বপনে তব তাহার বারতা কি পেলে? সেই বারতা যে কীভাবে কখন আসে তার ঠিক নেই। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ বলেই স্বামী বেচারির খুব দ্রুত সন্দেহ হয়েছে, অন্য কেউ হলে বুঝতে হয়তো আরও খানিকটা সময় লাগত। ভাবত ঘটনা সত্যি হলেও হতে পারে। ভদ্রলোক দেরি না করে বউকে নিয়ে সটান আমার কাছে হাজির।

boierpathshala.blogspot.com

পেশেন্টও খুব কনফিডেন্ট। আমাকে রাগ রাগ গলায় বলল, দেখুন তো কী কাণ্ড! ভদ্রলোক কী জ্বালাতন শুরু করছেন। আমি একজন হাউস ওয়াইফ। স্বামী-পুত্র নিয়ে সংসার করি। উনি কত বড়ো মানুষ, মাথায় কি এটুকু বুদ্ধিও নেই? আমার সঙ্গে প্রেম করছেন! আমি বললাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনাকে ঠিক কীভাবে জ্বালাতন করছেন? উনি তো বহু বছর আগেই মারা গেছেন। সেই ১৯৪১ সালে। পেশেন্ট বলল, সেটাই তো ভয়ের। রাতে ঘুমোতে পারি না। আমাকে কয়েকটা চিঠি লিখেছেন। আমি বললাম, সে-চিঠি কি আপনার কাছে আছে? তখন মহিলা ব্যাগ হাতড়ে কয়েকটা কাগজ বের করে আমার সামনে রাখলেন।'

সুনন্দা হেসে ফেললেন। বললেন, 'রবীন্দ্রনাথের প্রেমপত্র!'

'ঘটনা হাসির হলেও অসুখটা হাসির নয় নন্দা। কোনো অসুখই হাসির নয়। বাইরের অসুখ যেমন মানুষকে বাইরে থেকে কষ্ট দেয়, মনের অসুখ ভেতরে যন্ত্রণা তৈরি করে। আমরা পা ভাঙা, হাত ভাঙা দেখতে পাই, মন ভাঙা দেখতে পাই না। তাই যন্ত্রণাটাও বুঝতে পারি না।'

সুনন্দা লজ্জা পেয়ে বললেন, 'আমি ঠাট্টা করিনি। তবে একজন মহিলাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বর্গ থেকে চিঠি পাঠাচ্ছেন এটা যে কৌতুকের এটা তো মানবে?'

'ইটস ওকে নন্দা। অসুখটাই এরকম। আমি জানতাম জীবিত বিখ্যাত মানুষদের ঘিরেই শুধু এই রোগ দানা বাঁধে, এখন দেখি মৃতরাও...যাই হোক, আমি মহিলার দেওয়া সেই কাগজগুলো উলটে দেখলাম।'

'কী দেখলে?'

'দেখলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতের লেখা বিচ্ছিরিভাবে নকলের চেষ্টা করে মহিলা নিজেকে কতগুলো চিঠি লিখেছেন। এমনকি কাটাকুটি করে একই রকম ভাবে ফুল পাতা এঁকেছেন। তারপর নিজেই নিজের নামে সেগুলো পোস্ট করেছেন এবং বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন...। বিছানার তলায় ওই চিঠি দেখেই মহিলার স্বামীর সন্দেহ হয়।'

'কী করলে?'

'এখনও কিছু করিনি। প্রাইমারি কতগুলো ওষুধ দিয়েছি। তারপর অসুখটা সম্পর্কে ঠিকমতো জানার জন্য রাত জেগে বই পড়ছি। তুমি তো রেগে আগুন।'

কথাটা বলে সুন্দর করে হাসলেন সুদর্শন। সুনন্দা একটু চুপ করে রইলেন। তারপর উঠতে উঠতে বললেন, 'সরি। নাও তুমি বইটা শেষ করো।'

boierpathshala.blogspot.com

সুদর্শন রায় হাত বাড়িয়ে স্ত্রী-র হাত ধরলেন। সুনন্দা ঝুঁকে পড়ে হাত দিয়ে স্বামীর কপালে পড়া চুলের গোছা সরিয়ে বললেন, 'না, যখন জেগেই আছো কাজ শেষ করে নাও। ওষুধ বের করে রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে বেচারিকে রক্ষা করো।'

'সে না হয় করব, তবে আমার হাত থেকে তোমার রক্ষা নেই।'

সুনন্দা ভুরু কোঁচকালেন। বললেন, 'মানে?'

সুদর্শন রায় আড়মোড়া ভেঙে বললেন, 'মানে কিছুই নয়, তুমি একটা গান শোনাবে।'

সুনন্দা চোখ পাকিয়ে 'ঠাট্টা হচ্ছে? রাতদুপুরে গান? পাড়াপ্রতিবেশী মারতে আসবে।'

সুদর্শন রায় অবাক হওয়ার ভান করে বললেন, 'রাতদুপুর কোথায় নন্দা? ওই তো আলো ফুটছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রোদ-টোদ উঠে একাকার কাণ্ড হবে। তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে।'

সুনন্দা বললেন, 'আবার কী?'

সুদর্শন রায় স্ত্রী-র দিকে ঝুঁকে মিটিমিটি হেসে বললেন, 'গান গেয়ে একবার চেষ্টা করে দ্যাখো রবি ঠাকুর ভদ্রলোককে যদি নিজের দিকে টানতে পারো। যেভাবে উনি অন্য রমণীদের প্রেমে পড়ছেন...। হিংসে হচ্ছে না?'

সুনন্দ ঠোঁট উলটে বললেন, 'গান গাইতে হবে না, উনি আমার সঙ্গেই থাকেন।'

সুনন্দা উঠে পুবদিকের জানলাটা খুলে দিলেন। আকাশ নরম নীল। অন্ধকার আর আলো মিলেমিশে একটা মায়া রং তৈরি হয়েছে। একসময় সেই মায়া রঙের দিকে তাকিয়ে সুনন্দা নীচু গলায় গুনগুন করে উঠলেন—'আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি।/ আকাশেতে সোনার আলোয় ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী। / ওরে মন, খুলে দে মন, যা আছে তোর খুলে দে—/ অন্তরে যা ডুবে আছে আলোক-পানে তুলে দে...'

বুকের ভেতর আনন্দ হাহাকার করে উঠল সুদর্শন রায়ের। রাত জাগার যাবতীয় ক্লান্তি দু-হাতে মুছে নিতে নিতে সেই গান বয়ে যেতে লাগল অন্তর জুড়ে।

স্মৃতিতে বিক্ষিপ্ত-হয়ে-যাওয়া-মনকে ফিরিয়ে আনলেন সুদর্শন রায়। বয়ঃসন্ধির ওপর লেখাটা আজই শেষ করতে হবে। দরকার হলে রাত জেগে করতে হবে। সন্দীপরা বাকি সব লেখাই প্রেসে পাঠিয়ে দিয়েছে, শুধু তাঁরটাই

boierpathshala.blogspot.com

বাকি। অথচ এই পত্রিকাটি বের করার জন্য সন্দীপদের তিনিই উৎসাহ দিয়েছিলেন।

'শুধু ক্লিনিক করলে, আর ফ্রি তে চিকিৎসা করলে অসুখ সারে না, অসুখটা কী সেটা ভালো করে মানুষকে বুঝিয়ে বলতে হয়।'

'সেটা কী করে করব স্যার? সেমিনারের কথা বলছেন?'

'না সেমিনারে হবে না, সেমিনার আর ক-টা সাধারণ মানুষ শুনতে আসবে? দ্যাখো সন্দীপ, মন বিষয়টাই খুব গোলমেলে, মনের রোগ তো আরও বেশি গোলমেলে। অধিকাংশ মানুষেরই বিষয়টা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। কোনটা সুখ, কোনটা অসুখ আমাদের বুঝতে বুঝতেই সময় লেগে যায়। আচ্ছা, মাঝেমধ্যে পত্রিকা বের করলে কেমন হয়? দ্যাখো না যদি পারো। বাংলায় সহজ করে বিষয়গুলো লেখা থাকবে। তোমাদের এনজিও থেকে বিলি করলে, অথবা কম দামে বিক্রিও করতে পারো। প্রথমে কলকাতা দিয়ে শুরু করলে, পরে খানিকটা মফঃস্বল বা গ্রামের দিকে ছড়ালে।'

সন্দীপ উৎসাহ নিয়ে বলল, 'খুব ভালো হয় স্যার। ডানা, মন ফাউন্ডেশনের তো এরকম বই আছে। কৈশোরক নামে একটা ম্যাগাজিনও আছে।'

'হ্যাঁ আমি দেখেছি, ওরা খুব খেটে কাজ করে। ডানার বইগুলো তো চমৎকার। আরও কারও কারও নিশ্চয় আছে। এই চর্চা যত হয় তত ভালো। তবে তোমরা এখনই বই করতে যেও না। বরং দু-মাস বা তিনমাসে একটা করে পত্রিকা বের করো। এক-একবার এক-একটা বিষয় নিয়ে কাজ করলে। মানুষের উপকার হবে।'

'ডাক্তাররা কি এত লেখার সময় পাবেন?'

সুদর্শন রায় হেসে বললেন, 'শুধু ডাক্তার কেন? সবাই লিখবে। মন কি শুধু সাইকিয়াট্রিস্টদের? মন সবার। মন খারাপ, মন ভালো সবার হয়। রাজা-ভিখিরি, পণ্ডিত মূর্খ কেউ বাদ যায় না।'

সন্দীপ বলল, 'স্যার, আপনাকে কিন্তু রেগুলার লিখতে হবে।'

'রেগুলার পারব না। প্ল্যান দিলাম বলে, অমন চাপ দিও না। তবে মাঝে মধ্যে লিখব।'

সেই লেখাই তৈরি করছিলেন সুদর্শন রায়। বিষয়— বয়ঃসন্ধির মন। এত কিছু থাকতে এই বিষয়টা কেন বাছলেন চট করে বলতে পারবেন না তিনি। তবে মনে হয় মাথার মধ্যে এই বয়েসের ছেলেমেয়েদের কথা কোথাও ঘুরপাক খাচ্ছে।

boierpathshala.blogspot.com

সুদর্শন রায় টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন। বেলা বাড়ছে। স্নান সেরে নিতে হবে। খেতেও হবে। নইলে মেয়ে অফিস থেকে টেলিফোন করে বকাঝকা করবে। মা মারা যাওয়ার পর মেয়েটার এই এক হয়েছে। বাবার ওপর নজরদারি কিছুতেই কমাবে না। যে ক-দিন ব্রতীনের সঙ্গে ছিল তখনও চার বেলা করে ফোন করত। রুটিনের একটু এদিক-ওদিক হলে সোজা এসে হাজির। কড়া শাসন যাকে বলে। বেশ লাগে। সুনন্দার ফাঁক ভরার নয়। কোনোদিনই ভরবে না। কথা তবু চেষ্টা করে। কাছের শূন্যস্থানটাকে ছেড়ে রেখে দূর থেকে চেষ্টা করে। স্নানের জন্য তৈরি হলেন সুদর্শন রায়। মেয়েটার জন্য তার বড়ো মায়া হয়।

লাঞ্চের মাঝখানেই টেলিফোনটা এলো।

টেলিফোন পাশে নিয়ে খাওয়া ঘুমোনোর অভ্যেস সব ডাক্তারকেই করতে হয়। সুদর্শন রায়ও ব্যতিক্রম নন। তবে আগে ল্যান্ড ফোনের হ্যান্ডসেট কাছে রাখতেন, এখন রাখেন মোবাইল। মোবাইলেই বেশি কল আসে। সে পেশেন্টের বাড়ি থেকেই হোক, ক্লিনিক বা চেম্বার থেকেই হোক। যদিও এই ফোনটা এল ল্যান্ডলাইনে। খানিকটা বিরক্ত হয়েই সুদর্শন রায়কে টেবিল ছেড়ে উঠতে হল।

'আমি নিতাই।'

ভাঙা ভাঙা, ছেঁড়া ছেঁড়া গলা। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে।

সুদর্শন রায় ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কাকে চান?'

ওপাশের কণ্ঠস্বর আবার একই কথা বলল, 'আমি নিতাই।'

সুদর্শন রায় সামান্য গলা তুলে বললেন, 'শুনতে পেয়েছি, আপনি কাকে চাইছেন?'

'এটা ডাক্তারবাবুর বাড়ি?' ওপাশের গলা চিৎকার করে উঠল।

'হ্যাঁ, আপনি বলুন। আমি ডাক্তার রায় বলছি।'

কে নিতাই? হাতের ভাত শুকিয়ে যাচ্ছে। সুদর্শনবাবুর বিরক্তি বাড়ছে।

'আমার প্রণাম নেন ডাক্তারবাবু, আমি ঝিলডাঙার নিতাই বলছি। ঝিলডাঙার নিতাই, ফুলের বাবা ডাক্তারবাবু।'

সুদর্শন থমকে গেলেন। ঝিলডাঙা! ফুলের বাবা! তাই তো, লোকটার নাম তো নিতাই-ই ছিল। ইস নামটা মাথা থেকে একেবারেই বেরিয়ে গিয়েছিল। সুদর্শন রায় উঁচু গলায় বললেন, 'বলো নিতাই, কী খবর? মেয়ে কেমন আছে?'

দূরত্বের কারণে কথা আবার ছিঁড়ে যাচ্ছে।

'বানেরহাট থেকে বলছি ডাক্তারবাবু, আপনার ওই হাসপাতালের পাশ থেকে। গঙ্গাদা আপনার বাড়ির ফোন নম্বর দিলে।'

boierpathshala.blogspot.com

সুদর্শন রায় অধৈর্য হলেন, 'কী হয়েছে নিতাই? মেয়ে ভালো আছে তো?'

'ডাক্তারবাবু...ডাক্তারবাবু...।'

'হ্যালো নিতাই, হ্যালো হ্যালো, শুনতে পাচ্ছো? নিতাই শুনতে পাচ্ছো? মেয়ে কেমন আছে?'

'ক-দিন ভালো ছিল, কাল রাতে গোলমাল করেছে ডাক্তারবাবু।'

'গোলমাল! আবার কী গোলমাল?'

অর্ধেকটা জড়িয়ে, অর্ধেকটা অস্পষ্টভাবে মেয়ের গোলমালের বর্ণনা দিল নিতাই। টেলিফোনে কথার বলার অভ্যেস না থাকায় কথা গুছিয়ে বলতে পারছে না। মাঝখানে লাইন একবার কেটেও গেল। সুদর্শন রায় ভেবেছিলেন, আর করবে না। মিনিটখানেকের মধ্যেই ফের করল।

ফুল কাল শেষ রাতে ঘুম ভেঙে বাথরুমে যেতে চায়। তার মায়ের শরীরটা খারাপ থাকায় নিতাই মেয়েকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছিল। এখন এরকমই হচ্ছে। রাতে মেয়েকে নিয়ে মালতীকে ঘর ছেড়ে বেরোতে দিতে ভরসা পায় না নিতাই। পেটে বাচ্চা, তার ওপর ফুলকে সামলাতে গিয়ে অন্ধকারে কোথায় হোঁচট খেয়ে বসবে, ধাক্কা খাবে তার ঠিক কী? উঠোন পেরোলেই বাথরুম। আধো ঘুম নিয়েই ফুল তার বাবার সঙ্গে উঠোনের খানিকটা পার হল অন্যদিনের মতো। কিন্তু মাঝামাঝি গিয়েই অন্ধকারে থমকে দাঁড়ায় সে। চোখ খুলে দু-পাশে মাথা ঘোরাতে থাকে। নিতাই বলে, 'কী হল মা?' মেয়ে কিছু বলে না। বিড়বিড় করে। মাথা ঘোরানোর মধ্যে অস্থিরতা বাড়তে থাকে।

সুদর্শন রায় টেলিফোনের এপাশ থেকে উত্তেজিত গলায় বলেন, 'তারপর?'

'ডাক্তারবাবু, আমি ভয় পেয়ে যাই। মেয়ের হাত ধরে টান মারি। মেয়ে নড়ে না। সে খালি মাথা নাড়ে আর নাড়ে। আমি ঘাড় ধরে নাড়া দিই। বলি, ফুল, অ্যাই হারামজাদি রাতদুপুরে কী শুরু করিস? সে বিড়বিড় করে বলে, আওয়াজ আসে। আমি কান পাতি। বলি কীসের আওয়াজ! ও তো পাখির ডানা ঝাপটানি। ফুল বলে, না, ওই আওয়াজ নয়। আমি বলি প্যাঁচার ডাক? ভয় কী মা? আয়, আমার সঙ্গে আয় দেখি।'

কথা অস্পষ্ট হয়ে যায়। সুদর্শন রায় জোর গলায় বলেন, 'হ্যালো, হ্যালো তখন কী হয়? কী হয় তখন? ফুল যায়?'

'না ডাক্তারবাবু, যায় না। মাটির সঙ্গে নিজেকে যেন গেঁথে ফেলে মেয়েটা! আঁকড়ে ধরে। আমি বলি, কোথায় আওয়াজ পাস? তোর মায়েরে ডাকব? আমি

boierpathshala.blogspot.com

তো কিছু শুনি না! ফুল বলে, আওয়াজ পাই না বাবা, আওয়াজের গন্ধ পাই। কষটা ধরনের গন্ধ। তুমি পাও না? আওয়াজের গন্ধ পাও না? আমি আর নিজেকে সামলাতে পারি না ডাক্তারবাবু...আপনেই বলেন ডাক্তারবাবু মেয়ে যদি রাতবিরেতে ঘুম ভেঙে বলে আওয়াজের গন্ধ পাই তাহলে নিজেকে সামলানো যায়? আপনে বলেন। পিঠে জোর থাবড়া লাগাই। মেয়েটা উঠোনে ছিটকে পড়ে...।'

আরও বলে যেতে থাকে নিতাই। কিন্তু সেসব এতই অস্পষ্ট সুদর্শন রায় কিছুই শুনতে পান না। তিনি 'হ্যালো, হ্যালো নিতাই, হ্যালো' বলে যেতে থাকেন।

একসময় নিঃশব্দে টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন হয়।

ডাইনিং টেবিলে দীর্ঘক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকেন সৌম্যদর্শন মানুষটি। সামনে, প্লেটে ভাত পড়ে থাকে। সেই প্লেটের চারপাশে একটা দুটো করে পিঁপড়ে ঘুরে যায়। সেদিকে তাকিয়ে কপালে গভীর মানুষটা একসময় ফিসফিস করে ওঠেন, 'ফেরোমেন.. ফেরোমেন...।'

সুদর্শন রায় টেবিলে বসেই সিদ্ধান্ত নেন, ঝিলডাঙা যাবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তত তাড়াতাড়িই যাবেন।

এর কিছুদিনের মধ্যেই এক শান্ত সন্ধের মুখে ঝিলডাঙার মানুষ বিকট আওয়াজ শুনতে পায়। পর পর তিনবারে সচকিত করে দেয় চারপাশ। আওয়াজ আসে গ্রামের মুখে বাঁশের সাঁকোর কাছ থেকে। চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়ার হত্যাকাণ্ডের পর থেকে পুলিশের যে-জিপটি সেখানে মাঝেমাঝে টহলদারিতে থাকত, সেটি লক্ষ করে কেউ বা কারা বোমা ছুড়েছে। ভীত সন্ত্রস্ত গ্রামের মানুষ পরে জানতে পারল, আওয়াজ বেশি হলেও বোমা শক্তিশালী ছিল না। ফলে বড়ো ধরনের কোনো ক্ষতি হয়নি। শুধু পুলিশের জিপ পালিয়েছে।

boierpathshala.blogspot.com

একচল্লিশ

ক্যামেরা, আলো সব রেডি। কিন্তু শ্যুটিং শুরু করা যাচ্ছে না।

ঝামেলা হচ্ছে। মোম চ্যাটার্জি ঝামেলা করেছে। ঝামেলা মোম চ্যাটার্জি একা করছে না, মোবাইল ফোনে মেয়েকে ঝামেলার পয়েন্ট জোগাচ্ছে তার মা, শ্রীমতী আলো চ্যাটার্জি। ঠিক ছিল, শ্যুটিং-এর সময় তিনি নিজেও থাকবেন। কিন্তু বাতের ব্যথা বেড়ে যাওয়ার কারণে আসতে পারেননি। আগে একবেলা ঠান্ডা জল-গরম জল ট্রিটমেন্ট নিতেন, এখন তিনবেলা নিচ্ছেন। তাতেও কাজ হচ্ছে না। এতে ইউনিটের সবাই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। ভেবেছিল, যাক ফাঁড়া কাটল। বাত-দেবতা মুখ তুলে তাকিয়েছেন।

ফাঁড়া যে কাটেনি এখন বোঝা যাচ্ছে। মহিলা মেয়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রাখছে।

শুদ্ধনাথ মনে মনে নিজের গালে চড় মারল। নিজের ওপর রাগ হলে মানুষ সাধারণত নিজের একগালে চড় মারে। শুদ্ধনাথ দু-গালেই মারল। একবার ডান গালে, একবার বাঁ গালে। কেন সে এই ভুল করল? কী করে করল? দিনে দিনে এই মেয়ে গোলমাল পাকানোয় যে কত বড়ো ওস্তাদ হয়ে উঠছে সে কথা তার ভালো করেই জানা আছে। একদিকে নাম বাড়ছে অন্যদিকে বদনাম বাড়ছে। তবু কেন তাকে এই কাজটায় নিল? ইন্ডাস্ট্রিতে ভদ্রভাবে কাজ করার মতো যোগ্য মেয়ের অভাব নেই। বরং রোজই নতুন করে কেউ না কেউ আসছে। তাদের কাজও সুন্দর, আচার-ব্যবহারও সুন্দর। তাহলে কেন মোমকেই নিতে হবে? খুব বড়ো ভুল হয়ে গেছে। এই ভুল কতদূর গড়াবে কে জানে।

বিজ্ঞাপনের কাজ হাবিজাবি সিরিয়াল তৈরির মতো সহজ কাজ নয়।

boierpathshala.blogspot.com

স্ক্রিপ্ট বগলে নিয়ে যা খুশি একটা করে দিলেই হয় না। শুধু শাশুড়ি, বউমার মুখের সামনে নট নড়ন-চড়ন কায়দায় ক্যামেরা ধরে রাখলাম আর হয়ে গেল এমন নয়। বিজ্ঞাপন তৈরির সময় ফাঁকিবাজি চলে না। এক দেড় মিনিটের মধ্যে স্কিল অনেক বেশি দেখাতে হয়। নইলে জিনিস খারাপ হবে, পরের অর্ডারটা পাওয়া যাবে না। টিভি হোক আর সিনেমা হোক কম বেশি আজকাল সব ডিরেক্টরই মূল কাজের পাশাপাশি বিজ্ঞাপনের কাজ খোঁজে। নইলে সারাবছর পেট চালানো মুশকিল। আর এই কারণে কাজের সময় কোনো ধরনের গোলমাল থাকাই ঠিক নয়। সব চলবে হিসেব মতো।

এখন মনে হচ্ছে, মোম চ্যাটার্জিকে নিয়ে 'গোলমাল' সে-ই ডেকে আনল। খাল কেটে কুমির আনার মতো। খাল কেটে মোমকে এনে কাজের সর্বনাশ করা হল।

যদিও কথাটা ঠিক নয়। এখানে মোমকে নেওয়ার পিছনে শুদ্ধনাথের একার হাত ছিল না। বরং উলটোটাই। সে চেয়েছিল অন্য কেউ আসুক। এই কারণে অর্ডারটা পাওয়ার পর সে তার দক্ষিণ ভারতীয় পার্টিকে অনেক নায়িকারই ফটো পাঠিয়েছিল। প্রায় দু-মাস ঝাড়াই বাছাইয়ের প্রক্রিয়া চলে। পার্টিকে ফটো মেল করা হয় দু-পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে আটটা, পরের পর্যায়ে আরও চারটে। মোট একডজন মেয়ের মধ্যে পার্টি মোমের ফটোতে 'টিক' মেরে পাঠিয়েছে। শুধু 'টিক' নয়, কোনো অলটারনেটিভও রাখেনি। এই অবস্থায় শুদ্ধনাথের কী করার ছিল? তখনই তার হাত-পা বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। পার্টি যাকে চেয়েছে তাকেই নিতে হবে। পয়সা যার পছন্দ তার। ঝামেলা শুধু পরিচালকের।

ঝামেলার খবর পাওয়ার পর থেকে শুদ্ধনাথের সন্দেহ হচ্ছে, মোম কোনো সূত্র থেকে পার্টির পছন্দের কথা জানতে পেরেছে। এক-দুজন নয়, একেবারে বারোজনের মধ্যে থেকে সিলেক্ট হওয়ার খবর জানতে পারলে যে-কোনো এলেবেলে আর্টিস্টেরই মাথা ঘুরে যাওয়ার কথা। মোমের তো যাবেই। আর কোনো খবর পায়নি তো? শুদ্ধনাথ যে তাকে বাদ দেওয়ার চেষ্টায় ছিল সেই খবর? পেলে আরও বড়ো কেলেঙ্কারি হবে। এই মেয়ে তুর্কি নাচ নাচাবে।

ঝামেলার বিষয় জানার পর শুদ্ধনাথ জানতে পারল কেলেঙ্কারিই হয়েছে।

বিজ্ঞাপনের সাবজেক্ট বিস্কুট। শ্যুটিং-এর সময় সমস্যা যদি কিছু হয় তাহলে সেটা হওয়ার কথা বিস্কুট নিয়ে। কিন্তু সমস্যা তা নিয়ে হচ্ছে না, হচ্ছে প্যান্ট নিয়ে। মোম চ্যাটার্জির প্যান্ট। কাজ শুরুর ঠিক মুখে মোম আপত্তি তুলেছে। এত খাটো ঝুলের শর্টস সে পরবে না। এই জিনিস নাকি পরাও যা, না-পরাও তাই।

boierpathshala.blogspot.com

কাজের সময় এমন কোনো চুক্তি তার সঙ্গে হয়নি যে কিছু না পরে ক্যামেরার সামনে তাকে দাঁড়াতে হবে। অতএব সে কাজ করবে না।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়, একেবারে সত্যিও নয়। শর্টসের মাপ তাকে ইঞ্চি সেন্টিমিটার মেপে বলা না হলেও শুদ্ধনাথ তাকে কিছুটা জানিয়েছিল।

শুদ্ধনাথ বলেছিল, 'কাজ হবে দুটো ভাগে। শহর আর গ্রামের পটভূমিকায়। আরবান এবং রুরাল।'

মোম বলল, 'আলাদা আলাদা বিস্কুট?'

'না, একই বিস্কুট। শহরের মেয়েও খাচ্ছে, গ্রামের মহিলাও খাচ্ছে।'

মোম ন্যাকা গলায় বলে, 'সে আবার কী শুদ্ধদা? শহর আর গ্রামের মানুষ একই জিনিস খায় বলে তো শুনিনি কখনও।'

'আহা, তোমার আমার শোনাশুনিতে কী আসে যায়? ক্লায়েন্ট যা চাইছে তাই তো করতে হবে। ক্লায়েন্ট বলেছে, এই প্রোডাক্টের মূল জোরটা থাকবে এনার্জির ওপর। এনার্জি রিগেইন। পরিশ্রম করার পর এই গ্লুকোজ-ঠাসা-বিস্কুটে কামড় দিলেই ক্লান্তি দূর হয়। শহরেও দূর হয়, গ্রামেও দূর হয়। এরপরই আমি স্ক্রিপ্ট তৈরি করি।'

'বিস্কুটের নাম কী?'

'বাংলায় নাম হচ্ছে শক্তি। সাউথ ইন্ডিয়ায় অন্য নামে চলে। ওখানে অবশ্য প্রোমোশন হয়েছিল, মেল আর্টিস্ট দিয়ে। সে-কাজও আমি দেখেছি। রেসলার নিয়ে কাজ। বক্সার লড়তে লড়তে হেরে যাচ্ছে। রিঙের পাশে গিয়ে শক্তি বিস্কুটে দুটো কামড় মারল, ব্যস সঙ্গে সঙ্গে শরীরে হাতির বল ফিরে এল। অপনেন্টকে এক ঘুসিতে কুপোকাত।'

মোম নাক সিঁটকে বলেছিল, 'ওরে. বাবা, বিস্কুট খেয়ে বক্সিং! ইস বিজ্ঞাপনের কী ছিরি।'

শুদ্ধনাথ বলেছিল, 'অসুবিধের কী? সফট্ ড্রিঙ্কস খেয়ে ফিল্মস্টার যদি ছাদ থেকে ছাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, বিস্কুট খেয়ে বক্সিং হবে না কেন? আমি এই শক্তির সঙ্গে নারীশক্তির ব্যাপারটা মেশাতে চেয়েছি। সেইমতো পার্টিকে স্ক্রিপ্ট পাঠাই। বলি, বাংলায় মেয়েদের ব্যাপারটা বেশি অ্যাক্সেপটেড হবে। ওরা রাজি হয়ে গেল।'

মোম ঠোঁট উলটে বলে, 'নারীশক্তি না কচু শুদ্ধদা, তোমার ওই পার্টি সেক্সের কারণে রাজি হয়ে গেছে। মেয়ে হলে শরীর দেখানো যাবে। অবশ্য সেটাও একরকম নারী-শক্তি তো বটে। তাই না?'

boierpathshala.blogspot.com

কথা শেষ করে মোম হাসতে থাকে। শুদ্ধনাথ খানিকটা অস্বস্তিতে পড়ে। কথাটা মিথ্যে নয়। তবে মোমকে পুরোটা বলা যাবে না। বললেই টাকাপয়সা বেশি হাঁকবে। কস্টিউমের কথা যা ভাবা হয়েছে, তাতে মোমের শরীরের অনেকটাই এক্সপোজড্ থাকবে। শুদ্ধনাথ সাবধানে এই প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলল, 'শহরে তুমি একজন আধুনিকা। মডার্ন মেয়ে। সকালে পার্কে জগিং করতে করতে হাঁপিয়ে পড়লে। গাছের তলায় দাঁড়ালে। প্যাকেট ছিঁড়ে 'শক্তি' বিস্কুটে ছোট্ট একটা কামড় দিলে, ব্যস আবার চার্জড। ফের জগিং শুরু করলে।'

মোম ভুরু কুঁচকে বলল, 'আর গ্রামে? গ্রামেও জগিং করব? নাকি বক্সিং?'

'দূর, গ্রামের মেয়েরা আবার ওসব করে নাকি? সেখানে ভাবা হয়েছে, ধানখেতে কাজ হবে।'

'ধানখেতে!'

'হ্যাঁ, সেখানে তুমি গ্রাম্য বধূ। হেঁসো দিয়ে ধান কাটবে। কাটতে কাটতে ক্লান্ত হবে, ঘাম মুছবে। শাড়ির কোঁচ থেকে 'শক্তি' বিস্কুট বের করে খাবে। ফের হাসিমুখে ধান কাটা শুরু হবে। পিছনে একটা টিউন রাখছি। হেই সামাল হো, হেই সামাল হো, হেই সামাল হো ধান হো / কাস্তেটা দাও শান হো... কেমন হবে?'

শুদ্ধনাথ তৃপ্তিতে হাসল। মোম অবাক গলায় বলে, 'হেঁসোটা কী?'

'দা'য়ের মতো, ধান কাটতে লাগে। গ্রাম সম্পর্কে কিছুই জানো না দেখছি মোম। এটা ঠিক নয়। দিস ইজ নট কারেক্ট। অভিনয় করতে গেলে শহর, গ্রাম নগর, বন্দর সব জানতে হবে। যদি ধানখেত না চাও তাহলে ঢেঁকিতেও দাঁড়াতে পারো। ধরো ঢেঁকিতে ধান ভান্‌তে ভান্‌তে টায়ার্ড হয়ে গেলে। শক্তিতে কামড় দিয়ে সেই ক্লান্তি কাটল। সেক্ষেত্রে অবশ্য গানের টিউন বদলাতে হবে।'

'মনে হচ্ছে, সেটা বেশি ইন্টারেস্টিং হবে।'

'সে দেখা যাবে। আগে তো আরবান অংশটা শ্যুট করে নিই। নাও ডেট বলো মোম।'

মোম নিজের দু-হাতের নখের দিকে তাকিয়ে আদুরে গলায় বলে, 'তোমার কাছে আবার ডেট কী শুদ্ধদা? যেদিন বলবে, সেদিনই মেকআপ নিয়ে ক্যামেরার সামনে হাজির হব। পেমেন্ট কিন্তু সবটাই আগে করতে হবে। বাইরের প্রোডিউসার। ধারবাকি রাখা যাবে না। কেটে গেলে আর ধরতেই পারব না। তুমি বরং একটা কাজ করো, কতদিনের কাজ হিসেব করে আরবান, রুরাল মিলিয়ে একটা প্যাকেজ করো। করে পেমেন্টটা দিয়ে দাও। মা নইলে আবার রাগারাগি

boierpathshala.blogspot.com

করবে। আমার মাকে তো চেনো, রাগ করলে কমতেই চায় না।'

শুদ্ধনাথ বিরক্ত গলায় বলল, 'টাকা টাকা করছ কেন? কোনদিন তুমি আমার কাজে পেমেন্ট ঠিকমতো পাওনি? তা ছাড়া অ্যাডের কাজে কত মাইলেজ সেটা তো দেখবে। পার্টি বড়ো করে নামতে চাইছে। ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট, আউটডোর হোডিং পোস্টার সব হবে।'

মোম ফিক করে হেসে বলল, 'সেইজন্যই অন্য সবার ডেট ফেলে রাজি হচ্ছি। আচ্ছা, ওই জগিং-এর কস্টিউম্‌টা কী?'

শুদ্ধনাথ ঢোঁক গিলল। খানিকটা দায়সারাভাবে বলে, 'কী আর হবে, জগিং করতে যে পোশাক লাগে সেটাই হবে। জগিং তো আর শাড়ি বা শালোয়ার পরে করবে না। এই ধরো একটা শর্টস আর টি শার্ট পরলে। আমি সাদাই চাইব। একেবারে মিল্ক হোয়াইট। ভোরের নরম ভাবটা থাকবে। মাথায় একটা ডার্ক ব্লু ব্যান্ড দিতে পারো। রিস্টেও একটা ব্যান্ড লাগালে। সেখানে আই পড্ প্লাগ করা। আজকাল তো সবাই গানবাজনা শুনতে শুনতে জগিং, এক্সারসাইজ করে। মনে হয় সেটাই ঠিক হবে।'

সবই ঠিক ছিল। বালিগঞ্জ ক্লাবের একটা দিক ভাড়া করে আলো, ক্যামেরা, ক্রেন রাখা হয়েছে। এমনি ক্রেন নয়, জিমিজিপ ক্রেন। এই ক্রেনের মাথায় ক্যামেরা বন বন করে চারপাশে ঘুরতে পারে। শট ভাবা আছে শুদ্ধনাথের। গাছের তলার লাল মোরামের রাস্তা ধরে মোম ছুটে আসবে। জিমিজিপ নামবে ডালপাতার ফাঁক ফোঁকর দিয়ে। ডামি দিয়ে আলোও মাপা-টাপা হয়ে গেছে। ন্যাচারাল আলো দিয়ে কাজ হচ্ছে না। সবটাই অ্যারেঞ্জ করতে হয়েছে। যেটুকু রোদ থাকছে থাকুক, বাকিটুকু কেটে নিতে হবে।

এবার আর্টিস্টকে ডাকা হবে, ঠিক এরকম সময় ঝামেলা শুরু।

মোমের অ্যাসিস্টেন্ট কাম পরিচারিকা কাম ম্যানেজার বুলু নামের অতি পাকা মেয়েটি গম্ভীর মুখে শুদ্ধনাথের পাশে এসে দাঁড়াল। গলা নামিয়ে বলল, 'দিদি আপনেরে ডাকে।'

শুদ্ধনাথ চমকে উঠে বলল, 'আমারে ডাকে মানে! সব রেডি, আমরাই তো তাকে ডাকছি। শট শুরু হবে।'

'সে জানি না আপনে চলেন। দিদি তার মায়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে।'

প্রমাদ গুনল শুদ্ধনাথ। মোম তার মায়ের সঙ্গে কথা বলে তাকে ডেকে পাঠানোর অর্থ নিশ্চয় কোনো গোলমাল। মহিলা কখনও কোনো ঘটনার মধ্যে

boierpathshala.blogspot.com

এমনি ঢোকে না, যখন ঢোকে গোলমাল নিয়ে ঢোকে।

ক্লাবের একটা এসি ঘরে মোমের মেকআপ এবং পোশাক বদলানোর জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে ঢুকতেই শুদ্ধনাথ জানতে পারল, তার আশঙ্কাই সত্যি। কানে মোবাইল লাগিয়ে ওইটুকু ঘরেই উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করছে মোম। উত্তেজিত হলেও তাকে দেখাচ্ছে দারুণ। টি শার্ট আর শর্টসে ঝলমল করছে। ঠিক যেমনটা শুদ্ধনাথ চেয়েছিল। ফর্সা, ছিপছিপে দুটো পায়ের প্রায় পুরোটাই উন্মুক্ত। উরুর খানিকটা ওপরেই প্যান্ট শেষ হয়ে গেছে। দীর্ঘ উজ্জ্বল নগ্নতার শেষে পায়ের পাতায় স্নিকার। তার রংও সাদা। শুধু ফিতেটুকু নীল। টি শার্টের ঝুলেও টানাটানি রাখা আছে। ইচ্ছে করেই রাখা আছে। দৌড়োনোর সময় হালকাভাবে পেট, পিঠ দুটোই যাতে বেরিয়ে পড়ে। হালকাই ভালো। শার্টের আড়ালে থাকা বুক দুটো নিখুঁত এবং স্পষ্ট হচ্ছে। দুশ্চিন্তার মধ্যেও শুদ্ধনাথ দ্রুত ভেবে নিল, ক্রেন দিয়ে ওপর থেকে নয়, আগে এই মেয়ের পা দুটোকে ফ্রেমে রাখতে হবে। নগ্ন পা ছুটে আসছে। তারপর ধীরে ধীরে ক্যামেরা উঠবে। একবার এই বিজ্ঞাপন যে দেখবে, সে বারবার দেখার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। 'নারীশক্তি' কাকে বলে দেখে ছাড়বে একেবারে।

মোম মোবাইলে কথা চালাচ্ছে—

'কী যে বলো মা, কত ইঞ্চি আমি কি মেপেছি?... আমি কি টেপ ফিতে নিয়ে শ্যুটিঙে আসি?... বলছি তো কম, একেবারে এইটুকু। জাস্ট কোমর থেকে নেমে ঢেকে রেখেছে ... না না এরকম কোনো কথা হয়নি...শুধু ঝুলে কম না মা, ইটস মোর অর লেস স্কিন ফিটিংস... পেছনটা পুরো বোঝা যাচ্ছে। আরে, আমি কী করে আগে দেখব.. ইট্স ইমপসিবল মা...তুমি বুঝতে পারছ না..শর্টস পরতে হবে এটা জানতাম, কিন্তু তার যে হাল এই হবে আমি কী করে বুঝব?...পেমেন্ট অনুযায়ী...আসলে শুদ্ধদার সঙ্গে তো আমার কাজ অনেকদিনের, আমি বিশ্বাস করেই রাজি হয়েছিলাম...হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি, ওই তো শুদ্ধদা এসেছে...এখন রাখছি মা...ডোন্ট ওয়ারি...।'

মোবাইল কেটে মোম শুদ্ধনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা কী হল শুদ্ধদা?'

শুদ্ধনাথ মনে মনে সতর্ক হল। সাবধানে কথা বলতে হবে। ঝামেলা ঠান্ডা মাথায় মেটাতে হয়। এই মেয়ের শেষ মুহূর্তে ব্ল্যাকমেল করার স্বভাব। ক্যামেরা অন করার আগে বেঁকে বসে। ফট করে নাম করার অসুখ। কারও কারও হয়। মোমের অসুখ একটু বেশি ট্যাড়াবাঁকা। তবে ঠিকমতো হ্যান্ডেল করতে পারলে

boierpathshala.blogspot.com

সামলানোও যায়। 'ঝরনার মতো জীবন' সিরিয়ালে কাজ করার সময় সামান্য একটা চড় নিয়ে এই মেয়ে কম বিপদে ফেলেনি। বিদিশার হাতে নাকি চড় খাবে না। প্রফেশনাল জেলাসি। আরে বাবা, ক্যামেরার পিছনে বিদিশা, সামনে তো কাহিনির চরিত্র। মোম কিছুতেই শুনবে না। শেষ পর্যন্ত চড় মারার মেয়ে বদলে কাজ করতে হয়েছিল।

'কী হয়েছে মোম?' শুদ্ধনাথ এমনভাবে কথাটা বলল যেন কিছুই বুঝতে পারছে না।

মোম ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'কী হয়েছে মানে? বুঝতে পারছ না কী হয়েছে? হোয়াট ইজ দিস?'

কথাটা বলে নিজের দুটো পায়ের দিকে তাকাল মোম। দু-পাশে হাত ছড়িয়ে বলল, 'এই কস্টিউমে আমাকে কাজ করতে হবে!'

'কেন! অসুবিধেটা কী?'

'অসুবিধে কী!'

'সকালে জগিং করতে তো এরকম কস্টিউমই সবাই পরে। একজন মডার্ন মেয়ে তুমি। পোশাকে সেই ব্যাপারটা তো ধরতে হবে। ইউ আর লুকিং বিউটিফুল। বিউটিফুল বললে কম বলা হয়। ভেরি বিউটিফুল অ্যান্ড গ্ল্যামারাস। অ্যাড একবার রান করতে শুরু করলে কী কাণ্ডটা হয় দেখবে।'

কথাটা বলে হাসির অভিনয় করল শুদ্ধনাথ।

মোম গলায় উত্তেজনা এলে বলল, 'আমার দেখার কোনো দরকার নেই। তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল, ইউ আর এক্সপেকটিং সামথিং মোর। এই প্যান্ট পরাও যা, কিছু না পরাও তাই। কোন আধুনিক মেয়ে সকালবেলা ন্যুড হয়ে পার্কে দৌড়াদৌড়ি করে জানতে পারি?'

শুদ্ধনাথ জিভ কেটে বলল, 'আহা, তোমার মুখে কিছু আটকায় না মোম। আমি কি সে-কথা বললাম? বিজ্ঞাপনে কস্টিউম একটু চড়ার দিকে না রাখলে চলে না।'

বুলুর এগিয়ে দেওয়া তোয়ালে কোমরে জড়িয়ে নিল মোম।

'আমাকে আগে বলা উচিত ছিল।'

'আগে তো বলেইছিলাম। শর্টস আর টি শার্টের কথা বলিনি?'

'তা বলে সেটার লেংথ এরকম হবে! এইটুকু! এ তো জাস্ট লাইক আ প্যান্টি! তার থেকেও কম। ছি ছি। ইস আগে খেয়াল করিনি। পরবার পর বুলু নজর করল।'

boierpathshala.blogspot.com

শুদ্ধনাথ কড়া চোখে বুলুর দিকে তাকাল। এই ফিচকে মেয়েটাও তাহলে এর মধ্যে আছে। বুলুও পালটা চোখ পাকাল। যেন সে সিনেমার পরিচালক নয়, সিনেমার ভিলেন। তার মালকিনকে প্রকাশ্য দিবালোকে বেইজ্জত করতে যাচ্ছে। শুধু চোখ পাকানো নয়, বুলু মুখ পাকিয়ে বলল, 'দিদিকে তো বললাম, এমা! তোমায় যে নেংটা দেখায়!'

শুদ্ধনাথ বুলুকে ধমক লাগায়, 'অ্যাই তুমি থামো দেখি।' তারপর মোমের দিকে ফিরে বলে, 'তুমি বুঝতে পারছ না ইউ আর লুকিং সো গর্জাস। এই কাজটা হয়ে গেলেই অ্যাডওয়ার্ল্ডে একটা দারুণ সাড়া ফেলে দেবে।'

মোম ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'ওসব ভুজং ভাজুং বন্ধ করো শুদ্ধদা। তোমাকে বিশ্বাস করি বলে তুমি এই কাণ্ড করবে আমি ভাবতে পারিনি! বুলুর কথা শুনে মাকে ফোন করলাম। মা তো খেপে আগুন। বলছে, তুই এখুনি প্যাক করে চলে আয়। ওই দ্যাখো আবার ফোন করছে।'

সত্যি সত্যি মোমের হাতের মোবাইল বেজে উঠল। মোম কানে তুলে বলল, 'বলো,...আরে না না এখনও কিছু সেট্‌ল হয়নি...কথা বলছি তো...তুমি এখন ছাড়ো...।'

শুদ্ধনাথের মাথায় আগুন চড়ে গেল। কিন্তু আগুন নিয়ে কোনো কাজ হবে না। এখন লাগবে জল। জল দিয়ে মোম চ্যাটার্জিকে শান্ত করতে হবে।

শুদ্ধনাথ মোমের দিকে এক পা এগিয়ে এসে শান্ত গলায় বলল, 'সামান্য একটা জিনিস নিয়ে কেন এত চিন্তা করছ? তোমার সুন্দর পা দুটো যদি আমরা কয়েকটা শটে কাজে লাগাই তোমার সমস্যাটা কোথায়?'

মোম তেড়ে ফুঁড়ে উঠল। বলল, 'অবশ্যই সমস্যা। শুধু পা কেন, আমার শরীরের আরও অনেক কিছু সুন্দর। তা বলে সেগুলোকেও কাজে লাগাতে হবে? তা ছাড়া তোমাদের অ্যাড বিসকিট্ নিয়ে না মেয়েমানুষের পা নিয়ে? পা নিয়ে তোমরাই-বা এত ভাবছ কেন?'

শুদ্ধনাথ শুকনো হাসল। হাসতে হাসতেই চিন্তা করতে লাগল। মেয়েটা এত জোর দেখাচ্ছে কেন!

'এটা একটা আনপ্রফেশনাল কথা হয়ে গেল না মোম? আজকাল বিজ্ঞাপনের প্যাটার্নটাই বদলে গেছে। তিরিশ-চল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে প্রোডাক্ট প্রায় থাকে না বললেই চলে। থাকলেও অনেক দূর থেকে আবছাভাবে থাকে। ডাইরেক্ট প্রোডাক্ট দেখালে এখন মার্কেটিং হয় না।'

মোমের উরুর একটু নীচ পর্যন্ত তোয়ালে ঝুলছে। সেই অবস্থায় চেয়ারে

boierpathshala.blogspot.com

পা তুলে দিয়ে মোম বলল, 'অত লেকচার শুনে আমার কাজ নেই। প্রথম যখন কনসেপ্টটা শুনেছিলাম, তখনই বুঝেছিলাম, ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। ঠিক আছে আমার ফিগার ভালো, তোমরা তো একটু ইউজ করবেই, কিন্তু এতখানি আমি ভাবতে পারিনি। দ্যাখো, শুদ্ধদা অন্য কেউ হলে এতক্ষণ অপেক্ষা করতাম না। কস্টিউম খুলে, মেকআপ তুলে বাড়ির পথে রওনা হতাম। তুমি বলেই সেটা পারছি না। আমি অপেক্ষা করছি, তুমি একটা কিছু ভেবেচিন্তে ওয়েআউট বের করো। সরি, এতখানি শরীর আমি দেখাতে পারছি না।'

শুদ্ধনাথ কাতর গলায় বলে, 'শরীর কোথায়? এ তো পা!'

মোম এবার হেসে ফেলল। বলল, 'এটা ভালো বলেছ, এরপর তোমরা বলবে, তোমার শরীর কোথায়, ও তো তোমার বুক!'

বুলু মুখে হাত চাপা দিয়ে 'খিক খিক' ধরনের আওয়াজ করে হাসল। শুদ্ধনাথ কড়া চোখে তাকায়। মেয়েটাকে একটা থাবড়া মারলে শান্তি হবে। কিন্তু শান্তির থেকেও আগে দরকার ব্যবসা। শহুরে মেয়ের জামাকাপড় নিয়ে মোম যখন এত ঝামেলা শুরু করেছে, গ্রামের বেলায় আরও তো অনেক বেশি গোলমাল পাকাবে। যে-মেয়েটি দিয়ে ধান কাটানোর কথা ভাবা হয়েছে তার কস্টিউম তো আরও খোলামেলা ভাবা হয়েছে। শাড়ির নীচে কাঁচুলি ধরনের কিছু পরানো হবে। পিঠ, কাঁধ এবং বুকের অনেকটা খালি রাখতে হবে। সেই কস্টিউম পার্টিই পছন্দ করে পাঠিয়েছে।

শুদ্ধনাথ কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'তুমি কী চাইছ?'

মোম নীচু গলায় কেটে কেটে বলল, 'আমি কিছু চাইছি না। তোমাকেও কিছু চাইতে হবে না। তুমি হায়দরাবাদে তোমার ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলো। এগারোজনকে বাদ দিয়ে তিনি যখন আমাকে বেছেছেন তাঁর চাওয়াটাই আসল। তুমি তো আমার জন্য আলাদা করে কিছু করোনি, অন্যদের জন্যও ট্রাই করেছিলে। এমনকি বিদিশার ফটোও ওনার কাছে পাঠিয়েছিলে। বলো, পাঠাও নি?'

শুদ্ধনাথ বড়ো করে নিশ্বাস ফেলল। সে যে-আশঙ্কা করছিল, সেটাই তাহলে সত্যি হল। এগারোজনকে বাদ দেওয়ার কথাটা মোম জেনে গেছে। শুধু তাই নয়, পার্টি যে হায়দরাবাদে তা-ও জেনেছে! এটা হওয়ারই কথা ছিল। ইন্ডাস্ট্রিতে আজকাল কথা গোপন রাখা কঠিন। মুম্বাই বা সাউথ ইন্ডিয়া হলে কথা ছিল। এখানকার জগৎ তো এইটুকু।

'তুমি এতসব কী করে জানলে?'

boierpathshala.blogspot.com

মোম কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'কী করে জানলাম সেটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা ঘটনাটা সত্যি কিনা।'

'হ্যাঁ সত্যি। পার্টি অনেকেরই ফটোই দেখতে চেয়েছিল। আর সেটা কোনো অন্যায় নয়। তার প্রোডাক্টে কোন্ ধরনের মুখ স্যুট করবে সেটা দেখার অধিকার তার নিশ্চয় আছে।'

'মুখ কেন বলছ শুদ্ধদা? ফিগার বলো। তুমি ইচ্ছে করলে বিদিশাকে বাদ দিতে পারতে। ওই মেয়ে ইতিমধ্যে আমাকে দুটো কাজ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। যদিও আমি বদার করি না। ওর মতো যখনতখন কাপড় খুলে যার তার খাটে উঠতে পারব না।'

কথার মাঝখানেই পাশে-দাঁড়িয়ে-থাকা বুলু হেসে উঠল আবার। মোম চোখের ইশারা করল। অসন্তুষ্ট মুখে ঘর ছাড়ল বুলু।

শুদ্ধনাথ বলল, 'সবার সম্পর্কে এ ধরনের কমেন্ট করা কি ঠিক হচ্ছে মোম?'

'আমি তো সবার সম্পর্কে বলছি না, বলছি পার্টিকুলার একজনের সম্পর্কে। তমা বা বাঁধন বা ঐন্দ্রিলাকে জড়িয়ে এরকম আমাকে কখনও বলতে শুনেছ?'

'যাই হোক, এসব আলোচনা এখন করার সময় নয়। লাইট-টাইট সব রেডি হয়ে গেছে, এখন যদি তুমি না বলো সেটা খুব বাজে হবে।'

মোম সামান্য হেসে বলল, 'তুমি এত টেনশন নিচ্ছো কেন? তোমার সঙ্গে তো আমার কোনো সমস্যা নেই। আমার শর্টসের লেংথ কতটা বাড়ালে পার্টি তোমার কাজটা নিতে পারবেন জেনে নাও। জগিং মানে তো আর থাই পর্যন্ত পা দেখানো নয়, ক্যাপরি বা জগিং স্যুটেও কাজ চলতে পারে। সাউথ সিটি মল থেকে চট করে একটা কিনে আনলেই হবে। আর যদি তোমার ওই পার্টি বলেন, না, বিসকিটে গ্লুকোজের সঙ্গে উনি আমার পা, পেট আর বুকও চাইছেন তাহলে অন্য কথা। জগিং-এর যা রেট, উরু বা পেট তো আর সেই পয়সায় বেচা যায় না। নাকি সেটা উচিত? তুমিই বলো না? কেনাবেচার মধ্যে সারাক্ষণ থাকো, মুড়ি মিছরির আলাদা আলাদা দামের ব্যাপারটা তোমরাই তো সবথেকে ভালো বুঝবে। এই পা দুটো কি বেচার মতো সেক্সি নয়? নাকি ফ্রি-তে বিলিয়ে দেওয়ার মতো বিশ্রী?'

কথাটা বলে শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগল মোম।

শুদ্ধনাথ ঢোঁক গিলল। দুনিয়াটাই এরকম। একই বিষয়ে কখনও পুরুষ

boierpathshala.blogspot.com

শাসন করে, কখনও ছড়ি চলে যায় মেয়েদের হাতে। কাজটা করার সময় ভেবেই রেখেছিল, মোমের শরীরটা যতখানি পারা যায় ক্যামেরায় ধরে নেবে। খুব কিছু একটা না বলেই নেবে। মোম বুঝতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যেতে হল। কিছু করার নেই, মোম অনেকদূর জেনে ফেলেছে। এবার তো চাপ দেবেই। এটাও সত্যি, তাকে কস্টিউমের ব্যাপারটা সবটা খুলে বলা হয়নি। নতুন আলটপকা কেউ হলে কথা ছিল, মোম চ্যাটার্জির মতো গোলমেলে মেয়েকে নিয়ে এটা করা বোকামিই হয়ে গেছে। শুদ্ধনাথ শান্ত গলায় বলল, 'মোম, তুমি ঠিক কী চাইছ সেটা স্পষ্ট করে বলো তো।'

বাঁ-হাতে চুলে বাঁধা রিবনটা খুলতে খুলতে মোম বলল, 'বিদিশাকে কাজটা করে দেওয়ার জন্য বলতে পারো। ধরো সে বাথটাবে শুয়ে শুয়ে বিসকিট চিবোল। গলা পর্যন্ত সাবানের ফেনায় শরীর ডোবানো। বুদবুদের ফাঁকে ফাঁকে তার বুক দেখা যাবে। তোমার বিসকিটও হল, আবার শরীরও হল।'

'এটা কি একটা ব্ল্যাকমেলের মতো হয়ে যাচ্ছে না মোম? একেবারে লাস্ট মোমেন্টে তুমি বেঁকে বসছ। ট্রেডে কি এটা চলে? নর্মস্ বলে একটা কথা আছে। তুমি কন্ট্রাক্ট সাইন করেছ। ডেট দিয়েছ।'

মোম ঘাড় কাত করে চোখ বড়ো বড় করল।

'তাই নাকি? কন্ট্রাক্টের কোথায় লেখা আছে আমাকে ন্যুড হয়ে দৌড়োতে হবে? তা ছাড়া আমি আগে বলব কী করে? আমি কি জানতাম তুমি আমাকে ছাড়াও আরও এগারোজনের জন্য চেষ্টা করেছিলে। খবরটা এই তো একটু আগে শুনলাম। মেকআপ নিয়ে, কস্টিউম পরে মোবাইলে গল্প করছিলাম তখন।'

'কে বলল?' শুদ্ধনাথ ভুরু কোঁচকাল।

'সেটা আর নাই-বা শুনলে। তোমার মন খারাপ হয়ে যাবে। বিশ্বাস-ঘাতকের নাম শুনলে মন খারাপ হয়ে যায়।' কথা বলতে বলতেই মাথা ঝাঁকিয়ে সুন্দর চুলগুলো এলোমেলো করে দিল মোম। এর অর্থ সে সত্যি সত্যি চলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে।

শুদ্ধনাথ এবার একটু কড়া গলায় বলল, 'ও তাহলে এসব শর্টস, টি শার্ট বাজে কথা বলো, আসলে তুমি আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছ। তাই তো?'

মোম এবার আওয়াজ করে হাসল। হাসির তালে তালে ফর্সা নরম পায়ের ওপর অন্য পা-টা চাপিয়ে নাড়াল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'ধরে ফেললে? তা তো কিছুটা চাইছি শুদ্ধদা। তবে তুমি কিন্তু মাইরি মিছিমিছি আমার সঙ্গে রিলেশন খারাপ করছ। সামান্য বিস্কিটের জন্য এটা করা কি তোমার উচিত হচ্ছে? তার

boierpathshala.blogspot.com

থেকে তোমার ওই পার্টিকে একটা কল করো না বাপু। এই দ্যাখো মা আবার ফোন করেছে, নিশ্চয় চলে যেতে বলছে। উফ মহিলা কিছু জ্বালাতে পারে বটে? বলো মা... আরে বলছি তো আমি জামা প্যান্ট খুলতে পারব না... বলো?'

কথার মাঝখানেই ডান হাতের একটা আঙুল তুলে শুদ্ধনাথকে দেখাল মোম। এর অর্থ এক মিনিটের জন্য ঘরের বাইরে যেতে হবে। শুদ্ধনাথ উঠে এল। তাকে বাইরে আসতে দেখেই প্রোডাকশনের অন্তু হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, 'কী হল দাদা?'

শুদ্ধনাথ থমথমে মুখে গলা নামিয়ে বলল, 'কিছু হয়নি, একটু ওয়েট করো, কাজ শুরু হবে।'

'কোনো গড়বড়ো?'

শুদ্ধনাথ ভুরু কুঁচকে বলল, 'না না, বলছি তো কিছু নয়। কিছুক্ষণের মধ্যে শট নেব। তোমরা আর একবার সব চেক করে নাও। সুদীপ্তকে বল ট্রলিটা একটু সরিয়ে নিতে। প্রথমে গাছের পাতার ভেতর দিয়ে ক্যামেরা মুভ করবে। তারপর আমরা মোমের পা দুটো ধরব।'

শুদ্ধনাথ বুঝে গেছে তাকে কী করতে হবে। মোম চ্যাটার্জিকে সামলানোর একটাই পথ। টাকা বাড়িয়ে দেওয়া। বোকামির জরিমানা বলা যেতে পারে। ফটো পাঠানোর ব্যাপারে আরও গোপনীয়তা রক্ষা করা উচিত ছিল। টেলিফোনের ওপাশ থেকে ওর মা আসলে সেই পরামর্শই দিচ্ছে। সেটা কত এখন সেটাই হচ্ছে কথা। দেখা যাক কতটা কমানো যায়।

লাঞ্চের ঘন্টা দুই পরেই কাজ শেষ হয়ে গেল। যতটা সম্ভব কম এন. জি. হয়েছে। অর্থাৎ ক্যামেরা চালানোর পর শট বাতিল প্রায় করতে হয়নি বললেই চলে। মোম চ্যাটার্জি তুখোড় অভিনেত্রী বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। সকালে দরদামের জন্য যতটা দেরি করেছিল, পরে পুষিয়ে দিল। ওভারটাইমের খরচটা বেঁচে গেল। মেয়েটা কাজও করেছে মারাত্মক। শুধু চাপা ছোটো শর্টস পরে দৌড়োয়নি, দৌড়োতে দৌড়োতে হাত ছড়িয়ে এক্সারসাইজ করেছে, লাফ দিয়ে গাছের পাতা ছুঁয়েছে। গাছের পাতা ছোঁয়ার দৃশ্যটা শুদ্ধনাথের একেবারেই ভাবা ছিল না। মোম নিজে থেকেই ইমপ্রোভাইজ করল। হাত উঁচু করে লাফ দেওয়ার সময় বেতের মতো লিকলিকে শরীরটা একেবারে ঝকমক করে উঠল। বুক থেকে শুরু করে, পেট, নিতম্ব, পায়ের গোছ পর্যন্ত শূন্যে চকিতে ঢেউ তুলল যেন ! শুদ্ধনাথের কথা শুনে বাধ্য মেয়ের মতো তিনদিক থেকে এই লাফের দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী করাল মোম। প্রত্যেকটা শটই পারফেক্ট। শুদ্ধনাথ মনিটরে বসেই

boierpathshala.blogspot.com

চিৎকার করে উঠল, 'বিউটিফুল। প্যাক আপ।'

ট্যাক্সিতে ওঠবার সময় শুদ্ধনাথের কাছে এসে দাঁড়ায় মোম। মুচকি হেসে বলল, 'কী কাজ ঠিক আছে তো।'

শুদ্ধনাথ গদগদ গলায় বলল, 'সেন্ট পার্সেন্টেরও বেশি।'

'ডোন্ট মাইন্ড শুদ্ধদা। সরি, আজ বোধহয় ব্যবহারটা একটু বেশি হার্ড হয়ে গিয়েছিল। আসলে ফট করে যখন শুনলাম, তুমি আমাকে ছাড়াও অনেকের নাম পাঠিয়েছিলে মাথাটা ঠান্ডা রাখতে পারিনি।'

শুদ্ধনাথ ক্লান্ত হেসে বলল, 'না ঠিকই আছে। তোমার কাজ তুমি করেছ । তোমার মার্কেট এখন হাই।'

মোম শুদ্ধনাথের হাতটা ধরে নীচু গলায় বলল, 'কী করব বল শুদ্ধদা? এক সময় ফ্রিতে জামা খুলেও কাজ পেতাম না। তোমরা পাত্তা দিতে না। ঘাঁটাঘাটি করে তাড়িয়ে দিতে। এখন একটু দেখাতে গেলেও পাইপয়সা বুঝে নিই। খারাপ করি? দাদা, তুমিও বেচো, তোমার পার্টিও বেচে, আমি কেন বেচবো না বল?'

প্রাণহীন হাসল মোম।

শুদ্ধনাথ তাড়াতাড়ি বলল, 'বললাম তো ইট্‌স ওকে। আমি নিজেও বুঝেছি, আমার দিক থেকে একটা ভুল হয়েছিল। আগেই সবটা বলে রাখা উচিত ছিল। আমি সেটা বুঝেছি বলেই তো হায়দরাবাদে ফোন করে টাকাটা বাড়িয়ে নিলাম।'

মোম ঘাড়টাকে একপাশে কাত করে ঠোঁটের ফাঁকে হাসল। বলল, 'তাই? ফোন করেছিলে? নাকি নিজেই বাড়িয়ে দিলে? যাক, আমি পেয়েছি সেটাই যথেষ্ট। থ্যাঙ্ক ইউ।'

মোম ভেবেছিল, বাড়িতে পৌঁছেই লম্বা সময় ধরে একটা স্নান সারবে, তারপর কোনো কথা না বলে বিছানায় এলিয়ে পড়বে। কিন্তু তা হল না। বাড়িতে ঢুকেই দেখল, ড্রইংরুমের বেতের চেয়ারে বসে আছে এক সুদর্শন যুবক! একা একাই বসে আছে। অন্যমনস্ক ভাবে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছে। যুবকের নাম সোমনাথ।

'তুমি! আপনি সোমনাথদা?' মোমের মুখ জ্বল জ্বল করে উঠল।

সোমনাথ ফিরে তাকাল। উঠে দাঁড়িয়ে বোকার হাসি হেসে বলল, 'একটা জরুরি কথা বলতে দুম করে চলে এসেছি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই এলাম।'

উল্‌টোদিকের চেয়ারে কাঁধের ব্যাগটা ছুড়ে দিতে দিতে দিতে মোম চোখে

boierpathshala.blogspot.com

মুখে কৌতুক এনে বলল, 'জরুরি কথা? আমার সঙ্গে? মোবাইলে ধরলে না কেন?'

'ট্রাই করেছিলাম, সুইচড অফ ছিল। শ্যুটিং-এ ছিলে বোধহয়। তোমার মা বললেন, সন্ধের আগেই ফিরে আসবে।'

মোম দ্রুত হাতে ব্যাগ থেকে ফোন বের করল। সত্যি মোবাইল অন করতে ভুলে গেছে। ইস।

সোমনাথ বলল, 'একটা রিকোয়েস্ট করব মোম, না বলবে না বলো।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল মোম। সোমনাথের চোখের দিকে মুহূর্তখানেক স্থিরভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, 'ঠিক আছে বলব না।'

'আমার সঙ্গে দু-তিনদিনের জন্য তোমাকে কলকাতার বাইরে যেতে হবে।'

'বাইরে! তোমার সঙ্গে? কোথায়?'

মোম একটু অবাকই হল। সোমনাথকে আচমকা দেখে সে কি এতটাই খুশি যে তুমি, আপনি গুলিয়ে ফেলছে।

সোমনাথ বলল, 'ঝিলডাঙা।'

নামটা বলেই সোমনাথ একটু লজ্জা পেল। ঝিলডাঙা এমন কোনো জায়গা নয় যে বিশ্বসুদ্ধু সবাই তার নাম জেনে বসে আছে।

'আসলে কাজটা হল...।'

মোম হাত তুলে বলল, 'থাক, কাজ জেনে আমার দরকার নেই, আমি যাব। কী যেন নাম বললে জায়গাটার? কী ডাঙা?'

মেয়েটা এককথায় রাজি হয়ে যাবে ভাবতেও পারেনি সোমনাথ। সে খানিকটা বিড়বিড় করেই বলে, 'ঝিলডাঙা।'

'হ্যাঁ, ঝিলডাঙা। বাঃ খুব সুন্দর নাম তো।'

মোম আরও সুন্দর করে হাসল। হেসেই বুঝতে পারল, বহুদিন পর সে স্ক্রিপ্টের বাইরে সত্যিকারের হাসল। ভেতর থেকে।

boierpathshala.blogspot.com

বিয়াল্লিশ

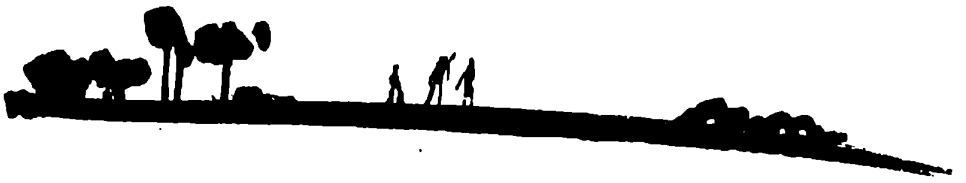

মানোনিয় দারোগাবাবু,

আমারে আপনে চিনিবেন না। আমি ঝিলডাঙা গ্রামের এক দরিদ্র বাসিনদা। একটা জরুরি কথা জানাইতে আপনের কাছে এই পত্র লিখিতেছি। আমাদের গ্রামের কাটাখালি প্রাথমিক বিদ্দালয়ের মাস্টার শ্রীচিত্তরঞ্জন খুঁটিয়াকে কিছুদিন আগে নিশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে। মাস্টার আমাদের গাঁয়ের খুবই শদ্ধার একজন মানুষ ছিলেন। আমরা সবাই তাকে ভালবাসিতাম। উনিও আমাদের সকলকে ভালবাসিতেন। আপনি খুনিদের ধরিবার জন্য খুবই চেস্টা করিতেছেন বলিয়া সংবাদ পাইয়াছি। সেই বিষয়ে আপনেকে একটি কথা যানাইতে চাই। এই হত্যার পিছনে আমাদের গাঁয়ের গুন্ডা কাদু আর তাহার দলবল রহিয়াছে। কাদুর লোকরাই খুনিদের গাঁয়ে লইয়া আসিয়াছিল। সেই ঘটনার সাখ্যি আমাদের গাঁয়েই রহিয়াছে। সে নিজ চোখে মাস্টারকে হত্তা করিতে দেখিয়াছে। লোহার রড দিয়া পিটাইয়া মানুষটিকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে। যদি অনুমতি দেন আপনের সংগে এই সাখ্যি গোপনে দেখা করিতে পারে। গোপনে দেখা করা ছাড়া উপায় নাহি। কাদু আর তাহার চ্যালারা এক একটি আস্ত সয়তান। জানিতে পারিলে তাহারা খুঁটিয়া মাস্টারে মতন আমাকেও হত্তা করিতে পিছপা হইবে না। বাড়িতে অসুস্থ মেয়ে, পোয়াতি বউ নিয়ে থাকি। সবদিক বিবেচনা করেই গোপনে চিঠি পাঠাইলাম। পরনাম নিবেন। ইতি ঝিলডাঙা গ্রামের এক বাসিনদা।

অজস্র ভুল বানানে নামহীন চিঠিটা থানায় এসেছে দুপুরের ডাকে। খামের ওপরে বানেরহাট পোস্টাপিসের ছাপ। তারিখটা একটু অস্পষ্ট। যেটুকু বোঝা

boierpathshala.blogspot.com

যাচ্ছে তাতে মনে হয় চিঠি ফেলা হয়েছে দিন দুই আগে। চিঠিটা প্রথম আসে মেজোবাবুর হাতে। তিনি পড়ার পর দেরি না করে ওসির ঘরে চলে এসেছেন। ওসি শশাঙ্কশেখর জ্বর সারিয়ে সবে ডিউটিতে ফিরেছেন আজ। ম্যালেরিয়া বা ডেঙ্গু নয়, তাঁর ভাইরাল ফিভার হয়েছিল। চোখমুখ এখনও শুকনো, শরীর দুর্বল। স্ত্রী অলকা ছাড়তে চাইছিলেন না।

'আরও দুটো দিন বাড়িতে শুয়ে থাকো।'

শশাঙ্কশেখর বলেন, 'শুয়ে থাকো বললেই শুয়ে থাকা যায় না অলকা।'

'অবশ্যই যায়। থানায় তোমার কী এমন রাজকার্য রয়েছে যে অসুস্থ শরীরেও ছুটতে হবে?'

'রাজকার্য তো রয়েছেই। দেশের রাজা মহারাজাদের দেখ্‌ভালের দায়িত্ব আমাদের হাতে।'

'রাজা না কচু। চোর ডাকাতের দল সব।'

'চোর ডাকাতরাই তো রাজা মহারাজা হয়। আর আমরা তাদের পাইক বরকন্দাজ।'

'ঠাট্টা ছাড়ো। আর দুটো দিন শুয়ে থাকো দেখি, খেয়েদেয়ে শরীরে জোর এনে তারপর জয়েন করলেই হবে।'

'আরে না রে বাপু, হবে না। সামনে পঞ্চায়েত ইলেকশন, চারপাশে গোলমাল শুরু হয়ে গেছে।'

অলকা বিরক্ত হয়ে বলে, 'পুলিশ কি তুমি একা? থানায় আর লোক নেই?'

শশাঙ্কশেখর উর্দির বোতাম লাগাতে লাগাতে বললেন, 'থাকবে না কেন? উজ্জ্বল তো আছে। দেখল তো ক-টা দিন। ওর হাতে সবটা ছেড়ে রাখা যায় না। ছেলেটার কিছু কিছু সমস্যা আছে।'

'কী সমস্যা? মেজোবাবুরও আবার জ্বরজারি হল নাকি?' অলকা সরল ভঙ্গিতে জানতে চায়।

শশাঙ্কশেখর হেসে বললেন, 'না, সেসব নয়। ছেলেটা এখনও একটা থানা রান করানোর মতো পাকাপোক্ত হয়নি। গা থেকে দুধের গন্ধ যায়নি।'

অলকা অবাক হয়ে বলল, 'দুধের গন্ধ! অত বড়ো লোকের গায়ে দুধের গন্ধ আবার কী!'

শশাঙ্কশেখর মুখ ঘুরিয়ে হেসে বললেন, 'এই দুধ সেই দুধ নয় অলকা, অনেস্টির দুধ। মিল্ক অফ অনেস্টি। থানা হল চোর-ছ্যাঁচোড়দের জায়গা। সেখানে

boierpathshala.blogspot.com

দুধে চলে না, দুধে জল ঢালতে হয়, চোনা ফেলতে হয়। কথায় আছে একবালতি দুধে এক ফোঁটা চোনা ফেললে গোটাটাই নষ্ট। আমাদের বেলায় ঘটনা উলটো। চোনা না ফেললে সব গোলমাল হয়ে যাবে। পাছায় এক লাথি খেয়ে ট্রান্সফার। একেবারে সোজা সুন্দরবন। তখন শালা মানুষেও মারবে, বাঘেও মারবে।'

'কী যে আবোল-তাবোল বকো। যা ভালো বোঝো করো গে যাও।'

শশাঙ্কশেখর কোমরে বেল্ট আটকাতে আটকাতে খানিকটা আপনমনেই বললেন, 'ভালো কিছুই বুঝতে পারছি না অলকা। বললাম তো গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। ঝিলডাঙায় খুন হল, পুলিশ-জিপ লক্ষ করে বোমা পড়ল, এরপর আরও কী হবে কে জানে। উজ্জ্বল ট্যাকল করতে পারছে না। আমাকে জয়েন করতেই হবে।'

অলকা এবার আরও বিরক্ত হয়ে বলল, 'যাও, ধুঁকতে ধুঁকতে ছোটো তাহলে। কিন্তু আবার জ্বর নিয়ে যদি বাড়ি এসে কোঁ কোঁ কর, তাহলে ফিরেও দেখব না, এই বলে রাখলাম হ্যাঁ।'

শশাঙ্কশেখর চিঠিটা তিনবার পড়লেন। দু-বার শুরু থেকে একবার মাঝখান থেকে। পড়তেই পড়তেই কোথায় যেন একটা খটকা লাগল। কিন্তু খটকাটা যে ঠিক কী ধরতে পারছেন না।

'কী মনে হচ্ছে উজ্জ্বল?'

মেজোবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার। ছোটো ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খাতা থেকে পাতা ছিঁড়ে লেখা। লোকটার নিজের পড়াশোনা নেই।'

'সে তো হবেই। গাঁয়ের মুখ্যু মানুষ। বানান ভুল, গুরুচণ্ডালি দোষ এসব তো থাকবেই। সেটা ইমপর্টান্ট নয়। ইমপর্টান্ট হল, চিঠিটা ফল্‌স না ট্রু?'

'ফল্‌স কেন বলছেন?'

'কাদু নামের লোকটাকে ফাঁসানোর জন্য কেউ করতে পারে।'

'আবার নাও তো করতে পারে।'

শশাঙ্কশেখর মুখ তুলে তাকালেন। তার এই অফিসারটি যে কাদুকে পছন্দ করে না সে খবর তার জানা হয়ে গেছে। তার অনুপস্থিতিতে একদিন কাদু থানায় এসেছিল। কড়া কথা শুনে গেছে। কাদু কিছু বলেনি, তবে খবর কানে এসেছে। এটা একদিক থেকে ভালো। খারাপ লোককে পুলিশ কেন পছন্দ করবে? খারাপ লোককে অপছন্দ করাটাই পুলিশের ডিউটি। কিন্তু মুশকিল হল, পুলিশের পছন্দ-অপছন্দ মানুষের চারিত্রিক ভালোমন্দের ওপর নির্ভর করলে চলে না। মানুষটার

boierpathshala.blogspot.com

ক্ষমতা, টাকাপয়সা, ওপরতলার যোগাযোগ, নীচের তলায় দেওয়াথোওয়া ইত্যাদি নানা ধরনের ফ্যাক্টর কাজ করে। উজ্জ্বল কি এখনও বুঝতে পারে না! নাকি পেরেও ভান করে 'বুঝি না'? হতে পারে। অলকাকে যতই সে এই ছেলে সম্পর্কে 'দুধে ভাতে' বলে আসুক, অতটা ভাবা বোকামি। এই ছেলে আগে ছিল নর্থ বেঙ্গলের কোন্ চুলোয়। সেখানেও নাকি ট্যাড়াবাঁকা করেছিল। কাঠ, ড্রাগস, মালপত্র চোরাচালান নিয়ে ফালতু হুজ্জুতি যাকে বলে। পলিটিক্যাল প্রেশারে শুধু সে বদলি হয়নি, সবসুদ্ধু বদলি করিয়ে ছেড়েছে। মায় ওসি পর্যন্ত। এখানেও হয়তো সেরকম কিছু করবে ভাবছে। ঝিলডাঙার কেসটা দিয়ে শুরু করতে চায় নাকি!

শশাঙ্কশেখর মুখ নামিয়ে আবার চিঠির দিকে তাকালেন। কাদু লোকটাকে তার নাড়াচাড়া করা হয়ে গেছে। ঝিলডাঙার মার্ডারটার জন্যই হয়েছে। লোকটা একটু খারাপ নয়, অতিরিক্ত খারাপ। নরকে যাওয়ার যতরকম পথ আছে, নির্ভয়ে সেখান দিয়ে হাঁটতে পারবে। অ্যাম্বিশনও অনেক। তার কাছে খবর আছে, এই লোক পলিটিক্যাল কানেকশন তৈরি করতে শুরু করেছে। এইসব লোকের রাজনীতিতে ঢুকতে অসুবিধে হয় না। সব দলই নেওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকে। একেও নিয়ে নেবে। এতদিন যে কেন নেয়নি, সেটাই অবাক হওয়ার! রিমোট গ্রাম বলেই হয়তো 'দাদা', 'দিদি'দের নজর পড়েনি। শহরের কাছাকাছি হলে এতক্ষণে বড়ো লিডার। অনেক হিসেব-টিসেব করেই কাদুকে কনফিডেন্সে নিতে হয়েছে। থানা পুলিশ চালানো অত সহজ কাজ নয়। সঙ্গে লোক লাগে। কাদুকে তার সঙ্গে নেওয়ার খবর কি উজ্জ্বল জেনে গেছে?

শশাঙ্কশেখর মুখ তুলে বললেন, 'আমি বলছি না সত্যি হতে পারে না। এই চিঠির কথাটা হয়তো সত্যি, কিন্তু সত্যিটাকে তো জাস্টিফাই করতে হবে।'

'স্যার, কাদু লোকটাকে কিন্তু আমার একেবারেই ভালো লাগছে না। মাস্টারের মার্ডারারকে ধরবার জন্য রোজ থানায় আসছিল চাপ দিতে।'

'হ্যাঁ সে তো আসছিলই। তোমার কাছেও এসেছিল নাকি? আমি যখন ছিলাম না?'

ভুরু কোঁচকালেন বড়োবাবু। উজ্জ্বল গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার। গ্রামের একটা হাতুড়েকে ধরে এনেছিল। বলছিল ডাক্তার। আমি কিন্তু একটু থ্রেট করেছি।'

মুখ দিয়ে চকাস্ ধরনের আওয়াজ করে শশাঙ্কশেখর বললেন, 'সে তো বুঝতেই পারছি।'

boierpathshala.blogspot.com

উজ্জ্বল নড়েচড়ে বলল, 'কাদু কি আপনাকে ফোন করেছিল?'

'না তা করেনি, তবে সেদিন আমাদের জিপ লক্ষ করে বোম ছুড়ে দিল। থ্রেটের জবাব।'

উজ্জ্বল খানিকটা থমকে গেল। বড়োবাবু এমনভাবে 'জবাব' কথাটা বললেন, যেন এটাই ঠিক! হুমকির জবাব হুমকি দিয়ে হওয়াটাই স্বাভাবিক!

'আপনি শিওর স্যার?'

উজ্জ্বলের চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে শশাঙ্কশেখর মাথা নাড়ালেন। বললেন, 'আমি ওই কাদু লোকটাকে যতটা বুঝেছি, তাতে শিওর বইকী।'

উজ্জ্বল নড়েচড়ে বসে বলল, 'তাহলে তো স্যার আজই লোকটাকে তুলে আনা উচিত।'

শশাঙ্কশেখর অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'না উচিত নয়। উজ্জ্বল তোমাকে একটা কথা বলি, পুলিশের কাজ কিন্তু এত সহজ অঙ্ক নয়। বরং উলটোটাই। দুই আর দুইয়ে বেশিরভাগ সময়েই চার হয় না। ঝিলডাঙা মোটামুটি একটা পিসফুল জায়গা বলেই আমাদের খাতায় দেখানো আছে। মে বি সেটা কাদু-টাদুর মতো দু-পাঁচটা হাফ বা কোয়ার্টার গুন্ডা বদমাইশের জন্যই সম্ভব হয়েছে। লোকে ভয় পায়। সব জায়গায় গিয়ে তো আর পুলিশ পিস মেইনটেইন করতে পারে না। অন্যের ওপরও আমাদের ডিপেন্ড করতে হবে। ব্যালান্স করে চলতে হয়। নাকি হয় না? এখন যদি ছুটকো ঝুটঝামেলায় সেই ব্যালান্সটা নিজেরাই গোলমাল করে ফেলি, তাহলে কীভাবে চলবে?'

'একটা মার্ডারকে আপনি খুচরো ঝুটঝামেলা বলছেন!'

শশাঙ্কশেখর চেয়ারে হেলান দিয়ে হাসলেন। টেবিলের ওপর রাখা ঘন্টিতে চাপড় মারলেন। পিওন ঢুকলে বললেন, 'একটা ডাব দাও। উজ্জ্বল ডাব খাবে? খাও। পটাশিয়াম আছে। উইকনেস কাটবে।'

উজ্জ্বল বিরক্তভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'না স্যার আপনি খান। আমার শরীর ঠিক আছে।'

'আরে বাপু খাও খাও। শরীর ঠিক আছে, খারাপ হতে কতক্ষণ? উজ্জ্বল একটা মার্ডার কেন, দশটা মার্ডারও খুচরো ঝামেলা হতে পারে। এটা ডিপেন্ড করছে ঘটনাটা তুমি কীভাবে দেখছ। আবার খুন-টুন কিছু নয়, শুধু হুমকিতেও অ্যাটেম্প্ট টু মার্ডার কেস দিয়ে দেওয়া যায়। দশ বছর ঘানি ঘুরিয়ে ফিরবে।'

উজ্জ্বল ভুরু কুঁচকে বলল, 'আপনি স্যার কী বলছেন ঠিক ধরতে পারছি না।'

boierpathshala.blogspot.com

'না ধরার তো কোনো কারণ নেই। খুবই সিম্পল। ধরো, একটা উড়ো চিঠির ভিত্তিতে তুমি কাদু লোকটাকে তুলে নিয়ে এলে, ধোলাই দিলে। তারপর দেখা গেল কিছুই পেলে না। ওই গ্রামের লোকগুলো গেল খেপে। পলিটিক্যাল পার্টি ইনভলভ্‌ড হল। থানায় এসে বেমক্কা হুজ্জুতি শুরু করল। একটা পারমানেন্ট ডিসটার্বেন্স। তখন? তখন আর কিছুই নয়, নতুন করে একটা গোলমালের ফ্রন্ট ওপেন করা।'

'তাহলে কী স্যার হাত গুটিয়ে বসে থাকতে বলছেন?' উজ্জ্বল আরও বিরক্ত গলায় বলল।

ডাব এল। ওসি সাহেব দু-হাতে সেই ডাব উঁচু করে ধরে জল খেলেন। হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছলেন। বললেন, 'তা কেন? ইনভেস্টিগেশন যেমন চলছে তেমনভাবেই চলবে। সব দিকে আঁটোসাঁটো করে বেঁধে তবেই আসামিকে ধরব। সে কাদুই হোক আর যেই হোক। আমাদের তো সুবিধেই হল। এই চিঠিটা কাজে লাগবে। আমরা আগে লোকটাকে আইডেনটিফাই করার চেষ্টা করব। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করব, সাক্ষী দিলে তার কোনো ক্ষতি হবে না, ভয়ের কিছু নেই।'

'কীভাবে করব? আগে তো জানতে হবে লোকটা কে?'

চকিতে মুখ তুললেন শশাঙ্কশেখর। ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসলেন। বললেন, 'সেটাই তো পুলিশের আসল কাজ উজ্জ্বল। মাথা ঠান্ডা করে খুনের মোটিভ, আসামি, সাক্ষী, খুনের উইপন্‌ খুঁজে বের করা। শুধু নিজের পছন্দ অপছন্দ বিচার করে ধরে এনে পেটালাম আর কোর্টে চালান করে দিলাম সেটা তো কাজ নয়। দু-দিন পরে বেল পেয়ে ড্যাঙ ড্যাঙ করে চলে যাবে। সে ঠিক আছে, দেখা যাবে'খন। মাছ যদি বড়ো হয় খেলিয়ে তুলতে হয়। ছোটো হলে নিজে থেকেই ধরা দেবে।'

কথা শেষ করে শশাঙ্কশেখর হাই তুললেন। দুর্বল শরীরের এই একটা লক্ষণ। ঘন ঘন হাই ওঠে।

'তাহলে এই পর্যন্তই কথা রইল উজ্জ্বল। শরীরটা ঠিক জুত পাচ্ছি না। রেস্টরুমে গিয়ে ঘণ্টাখানেক গড়িয়ে নেব ভাবছি। তুমি একটু ম্যানেজ করে দাও। ঝিলডাঙার এই খুনের ব্যাপারটা তোমার হাতেই থাকল। আসামিকে তুমিই ধরবে। শুধু একটাই অ্যাডভাইস। কোনো কিছু মাথা গরম করে কোরো না। সময় ভালো না। প্রতিটা স্টেপ ফেলতে হবে মাথা ঠান্ডা করে।'

উজ্জ্বল উঠে যাওয়ার পর, শশাঙ্কশেখর দুটো সিদ্ধান্ত নিলেন। এক নম্বর,

boierpathshala.blogspot.com

ঝিলডাঙার হত্যাকাণ্ড মামলাটি তিনি নিজেই দেখবেন। দু-নম্বর, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাদুকে ডেকে পাঠাবেন। এই লোককে হাতে রাখতে হবে। এমনি এমনি হাতে রাখা নয়, পিছনে কারণ আছে। এই লোকের সম্ভাবনা অনেক দূর। আপদে, বিপদে, দরকারে, অদরকারে কাজে লাগবে। শশাঙ্কশেখর উড়ো চিঠি ভাঁজ করে ড্রয়ারে রাখলেন। এই চিঠি কে লিখেছে খুঁজে বের করতে সময় লাগবে না। উত্তেজিত না হয়ে উজ্জ্বল যদি মাথা ঠান্ডা করে চিঠিটা আরও কয়েকবার পড়ত তাহলে সে-ও বুঝতে পারত। নীতিবাগীশদের নিয়ে এই হল সমস্যা। বুদ্ধির একটা অংশ ইনঅ্যাকটিভ করে রাখে। আরে বাপু, যে চিঠিটা লিখেছে, খুনটা হওয়ার সময় ঘটনাস্থলে সে-ই ছিল। অর্থাৎ সেই সাক্ষী। সেই কারণেই লিখেছে— 'জানিতে পারিলে তাহারা খুঁটিয়া মাস্টারে মতন আমাকেও হত্তা করিতে পিছপা হইবে না।' পত্রলেখক আরও একটা সুতো ফেলেছে। মেয়ে অসুস্থ, স্ত্রী প্রেগন্যান্ট। ঝিলডাঙা এমন কোনো বড়ো জায়গা নয় যে এই লোককে খুঁজে বের করতে সময় লাগবে। বড়োবাবু হাই তুললেন। না, এবার সত্যি সত্যি একটু গড়িয়ে না নিলেই নয়। দুর্বল শরীরে একসঙ্গে এতটা ধকল নেওয়া ঠিক হবে না। অফিস ঘর ছেড়ে রেস্টরুমের দিকে পা বাড়ালেন শশাঙ্কশেখর। থানার রেস্টরুম খুবই সামান্য। একটা ছোটো ঘরে কোনোরকমে একটা খাট রাখা। পায়ের কাছে একটা বড়ো টেবিল ফ্যান ঘুরছে। জানলার পর্দা টেনে, গায়ের জামা খুলে শশাঙ্কশেখর শুয়ে পড়লেন ঠিকই, কিন্তু ঘুমোনো হল না। এপাশ ওপাশ ছটফট করে তিনি উঠে পড়লেন। ন-পাড়ার ডাকাতির কেসটা অনেকদিন নাড়াচাড়া করা হয়নি। জায়গাটা অনেক দূরে বলেই হয়নি। ইনভেস্টিগেশনে অত দূর যাওয়া কঠিন। কিন্তু ফেলে রাখাটাও ঠিক হচ্ছে না। ওপর থেকে যে-কোনো সময় তাগাদা চলে আসবে। আছা, উজ্জ্বলকে কেসটা ছেড়ে দিলে কেমন হয়? ক-দিন ঘুরে আসুক না? মিনিট কুড়ির মধ্যে তিনি ফের জামা গায়ে দিয়ে ফিরে এলেন নিজের ঘরে।

'উজ্জ্বল, ন'পাড়ার ক্রাইমটা দেখতে সহজ মনে হলেও অতটা সহজ নয়। ডাকাতির সঙ্গে রেপও আছে। যে-বাড়িতে ইনসিডেন্টটা হয়েছিল, সে-বাড়ির মেয়েরা বলতে সাহস পায়নি। লজ্জা থেকেও হতে পারে। এলাকাটাই চোর-ডাকাতের আস্তানা। তুমি কেসটা দ্যাখো। কয়েকটা নটোরিয়াস ডাকাতকে মানুষ ভয় পাবে এটা ঠিক নয়। তুমি পারলে আজই রওনা হও। দুটো দিন ওখানে পড়ে থাকো। আমার তো মনে হয় হুট করে যাওয়াটাই বেটার। ক্রিমিনালগুলো আনপ্রিপেয়ার্ড থাকবে। তুমি কী বল?'

boierpathshala.blogspot.com

উজ্জ্বল বলল, 'আপনি যেরকম বলবেন স্যার।'

'গুড। তাহলে আর দেরি করার দরকার নেই। তুমি চার-পাঁচজনের ফোর্স নিয়ে এখনই বেরিয়ে যাও। দ্যাখো জানাজানি যেন না হয়।'

'ঠিক আছে স্যার।'

বিকেলে মেজোবাবু জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, আর কাদু থানায় এল সন্ধের মুখে। সঙ্গে এক ঝুড়ি ফল।

বড়োবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, 'এসব আবার কী বাপু!'

কাদু হেঁ হেঁ ধরনের ভঙ্গি করে বলল, 'কিচু নয় স্যার। রোগভোগের পর ফুট খাওয়া ভালো। ভেবেছিলাম বাড়িতেই যাব। আপনি ডিউটিতে না এলে তাই যেতাম।'

শশাঙ্কশেখর হেসে বললেন, 'তা বলে এত! এ যে দশটা রোগীর ফল হে!'

'কী যে বলেন স্যার। রেকে খাবেন। জিনিস খারাপ হবে না। মিষ্টি হবে। মিষ্টি না হলে জানাবেন। সব ক-টা ফলওয়ালার পিচনে পুরবো।'

শশাঙ্কশেখর হাত বাড়িয়ে ঝুড়ি থেকে একটা আপেল তুললেন। চোখের সামনে নেড়ে বললেন, 'না, খারাপ হবে বলে মনে হয় না।'

কাদু হাত কচলে বলল, 'কাদুর জিনিস খারাপ হয় না স্যার। আগের দিন যে মাচটা এনেচিলাম, সেটা খারাপ চিল?'

শশাঙ্কশেখর মুখে চুকচুক ধরনের আওয়াজ করে বললেন, 'খারাপ! কী যে বল কাদু, তোমার বউদি তো বলছে, এরপর বাড়িতে অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠান হলে তোমার ওই লোকের কাছ থেকে মাছ আনতে হবে। আমি বললাম, বোঝো কাণ্ড, কাদু কি মাছের আড়তদার?'

কথাটা বলে হাসলেন শশাঙ্কশেখর।

কাদু বিনয়ে গলে যাওয়ার কায়দায় বলল, 'কী যে বলেন স্যার, সামান্য একটা কাতল মাচের জন্য...। বউদিকে বলবেন, শুধু এই ভাইটাকে যেন একবার মনে করেন।'

শশাঙ্কশেখর শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'এবার বলো দেখি কাদু, তুমি আছ কেমন? তোমার ঝিলডাঙা আছে কেমন?'

মুহূর্তখানেক ভেবে কানু কাঁচুমাচু গলায় বলল, 'ভালো নেই স্যার। একেবারে ভালো নেই। কী করে থাকব বলুন? খুঁটিয়া মাস্টারের খুনিকে যদি আপনারা না ধরেন তাহলে ঝিলডাঙার মানুষগুলো ভালো থাকে কী করে?'

'তোমরা যদি এই সব কাণ্ড করো তাহলে পুলিশ খুনি ধরবে কী করে

boierpathshala.blogspot.com

বাপু?'

অবাক হওয়ার ভান করে কাদু তার কোটর থেকে বেরিয়ে আসা বিশ্রী বড়ো বড়ো চোখ দুটো কপালে তুলে বলল, 'কোন কাণ্ড স্যার?'

'স্যার' ঠোঁটের ফাঁকে হাসলেন। বললেন, 'পুলিশের ওপর অ্যাটাক করলে পুলিশ খুনি ধরবে কী করে?'

'অ্যাটাক! আমরা আবার অ্যাটাক কখন করলাম স্যার। এ কেমন কতা! বরং আমরাই বারবার থানায় ছটে আসচি যাতে খুনি ধরা পড়ে। শাস্তি হয়। আমরাই পুলিশকে মারধর করব!'

শশাঙ্কশেখর মিটিমিটি হেসে বললেন, 'সেরকমই তো রিপোর্ট পেলাম কাদু।'

কাদু নড়েচড়ে বসল। লম্বা করে শ্বাস টেনে বলল, 'এ স্যার আপনার ওই মেজোবাবুর রিপোর্ট। কিচু মনে করবেন না, আপনার এই অফিসার লোকটার কিন্তু একটু বেশি ত্যান্ডাই-ম্যান্ডাই আচে স্যার। আমাকেও ধমকি দেয়।'

শশাঙ্কশেখর আবার ঠোঁটের ফাঁকে হাসলেন, 'ও-কথা রাখো, ঝিলডাঙার খুনের মামলা আমি নিজে দেখব।'

কথাটায় যতটা উল্লসিত হওয়া উচিত ততটা উল্লসিত হতে পারল না কাদু। পুলিশকে বিশ্বাস নেই। তবে এই লোকটা গোড়া থেকেই তার সঙ্গে রয়েসয়ে ব্যবহার করছে। নিশ্চয় তার ক্ষমতা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েই কবছে। এটা ভালো না মন্দ সেটা বড়ো কথা নয়, যতক্ষণ চলে ততক্ষণ স্বস্তি। তা ছাড়া দু-চারদিন নেড়েঘেঁটে বোঝা গেছে, হারামজাদার ডিমান্ড খুব বেশি নয়। সামান্য ফল-মাছেই সন্তুষ্ট। পরে কী হবে অবশ্য বলা যাচ্ছে না। যেভাবে সবদিক এগোচ্ছে তাতে কে কাকে হাতে রাখার চেষ্টা করে তারই-বা ঠিক কী? শেষ পর্যন্ত মানা সরকারকে ম্যানেজ করে যদি পঞ্চায়েতের টিকিটটা পাওয়া যায়, তাহলে এই বড়োবাবুই তার বাড়িতে ফলের ঝুড়ি নিয়ে হাজির হবে।

'স্যার, আপনি নিজে দেখলে তো খুবই ভালো। খুনি ঠিক ধরা পড়বে।'

'তোমরা সঙ্গে থাকলে তবেই ভালো।'

কাদু সোজা হয়ে বসে বলল, 'আলবাত থাকব স্যার। একশোবার থাকব, হাজারবার থাকব। ঝিলডাঙার সব শালাকে আপনার সামনে এনে দাঁড় করাব। যে আসবে না তার পাছায় লাথি মারব। ঝিলডাঙার মানুষ যে আমাকে কতটা ভালোবাসে স্যার আপনি না দেখলে বিশ্বেস করবেন না।'

শশাঙ্কশেখর মুচকি হেসে বললেন, 'দেখার দরকার নেই, তোমার ভাষা

boierpathshala.blogspot.com

শুনেই বুঝতে পারছি কাদু। আচ্ছা, আগে বলো দেখি তো সেদিন পুলিশ জিপে বোমা কে মারল?'

কাদু মাথা নামিয়ে একটু চুপ করে রইল। তারপর মাথা নামানো অবস্থাতেই বলল, 'আমার মনে হয় মাস্টারকে যারা খুন করেচে সেই পার্টি। বাইরের লোক।'

'বাইরের লোক! তুমি শিওর?'

কাদু মুখ তুলে ঠোঁট কামড়ে বলল, 'একদম। আমি যদি ধরতে পারি...।'

শশাঙ্কশেখর ধীর হাতে ড্রয়ার খুললেন। চিঠিটা বের করে এগিয়ে ধরলেন, 'দ্যাখো তো কাদু এই লোকটা কে বুঝতে পারো কিনা।'

মাত্র কয়েক লাইনের চিঠি পড়তে যতটা সময় লাগার কথা তার থেকেও বেশি সময় লাগল কাদুর। সেটাই স্বাভাবিক। লেখাপড়ার অভ্যেস তার কোনোকালেই নেই। যতক্ষণ ধরে সে চিঠিটা পড়ল পলকহীন চোখে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন শশাঙ্কশেখর। উদ্দেশ্য একটাই। লোকটার মুখের চেহারা, চোখের চাউনি, ঠোঁটের হাসির কতটা বদলায়? সে কি ঘাবড়ায়? ঘাবড়ালে কতটা ঘাবড়ায়? এটা পুলিশের একটা পুরোনো টেকনিক। মুখ দেখে আঁচ করা। অন্তত দোষী নির্দোষের প্রাথমিক একটা ধারণা তৈরি করা। তেমন কিছুই হল না। সামান্য কঠিন মুখে কাগজের টুকরোটা হাত থেকে নামিয়ে রাখল কাদু।

বড়োবাবু ভুরু নাচিয়ে বললেন, 'কী চিনতে পারছ?'

'চেনার দরকার নেই।'

'কেন? তোমার নামে এতবড়ো কমপ্লেইন, অথচ কে লিখেছে তোমার জানার দরকার নেই!'

জিব দিয়ে ওপর নীচের কালো কালো দাঁতগুলো মুছে কাদু ঠান্ডা গলায় বলল, 'এরকম যে একটা কিচু হবে আমি আঁচ করেচিলাম স্যার। আমাকে আর আমার ছেলেদের মিথ্যে ফাঁসানোর চেষ্টা হবে। আমি সেই কারণেই মেজোবাবুকে বলে গিয়েছিলাম, যাকে-তাকে ধরপাকড় করা চলবে না।'

'কেন? ঝিলডাঙায় এত লোক থাকতে তোমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা কেন হবে?'

থানার ওসির দিকে স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল কাদু। মনে মনে দ্রুত ভেবে নিল, বলা কি ঠিক হবে? হ্যাঁ, ঠিক হবে। এটাই সময়। সে সামান্য হেসে নীচু গলায় বলল, 'স্যার, কাউকে বলা বারণ, তবু আপনাকে না বলাটা পাপ। আপনি ঘরের লোক। আপনাদের আশীর্বাদে সবকিছু ঠিকঠাক চললে,

boierpathshala.blogspot.com

এবার পঞ্চায়েতে ঝিলডাঙার টিকিটটা আমিই পেতে চলেচি। কথাবাত্তা সব পাকা। এই সময় আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত হবে না তো কার বিরুদ্ধে হবে? অপনেন্ট পার্টি খেলতে শুরু করে দিয়েচে। শালার দলের মধ্যে এত গ্রুপবাজি।'

কথা শেষ করে বিশ্রীভাবে হাসল কাদু। শশাঙ্কশেখর পিঠ সোজা করলেন। মনে মনেই নিজের পিঠ চাপড়ালেন। ঠিকই বুঝেছিলেন। এই বদ-লোক অনেকদূর যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। তিনি এক গাল হেসে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'কনগ্র্যাচুলেশন, অভিনন্দন। পলিটিক্সে ইয়াং ফেস সবসময় জরুরি। কী খাবে বল? ডাব বলি?'

কাদু হাসিমুখে বলল, 'বলুন স্যার, কচি দেখে ডাব বলুন।'

কাদুর পিঠের ওপর নিজের বুকের ভার রেখে অকারণে হাসছিল শান্তি।

'কী গো কাদুদা, তোমার সেই ওষুধের পরীখ্যে হবে না? সেই যে ডাকতারবাবুর কাছ থেকে শিশি নিয়ে এলে, কবে খাবে? আমার যে আর তর সইছে না গা।'

'আঃ শান্তি, বিরক্ত করিস না।'

কাদুর খালি পিঠে আঙুল চালিয়ে শান্তি বলল, 'ওমা, আমি বিরক্ত কই করলাম! তুমিই তো বলেচিলে ওষুধ খেয়ে দোর দেবে। বলোনি?'

শান্তির খিলখিল আওয়াজের হাসির মধ্যে দরজায় উঁকি দিল শোল। কাদুর পিছনে নিজের শরীর লুকোল শান্তি। শোল চাপা গলায় জানাল গোপীনাথকে ডেকে আনা হয়েছে। কাদু হাতের ইশারা করায় শান্তিকে সরে যেতে বলল। শান্তি গদির ওপর পড়ে থাকা ব্লাউজ, অন্তর্বাস কুড়োতে গেলে কাদু বাধা দেয়।

'এগুলো এখানে থাক শান্তি। দরকার লাগবে। তুই এমনি যা।'

'ওমা খালি গায়ে বেরোব?'

কাদু দাঁত ঘষে বলে, 'শাড়ি জড়িয়ে বেরো শালী।'

শান্তি গায়ে শাড়ি ঢেকে দ্রুত ঘর ছাড়ল।

গোপীনাথ ঢুকতে কাদু ঠান্ডা গলায় বলল, 'বসো গোপী ডাক্তার। কাজের সময় দোকান থেকে তুলে আনলাম, অসুবিধে হল না তো?'

গোপীনাথের মুখে স্পষ্টতই আতঙ্ক। দুম্ করে কাদুর আস্তানায় ডাক পড়লে সেটাই স্বাভাবিক। তবু যতটা সম্ভব সহজ থাকার চেষ্টা করছে। পারল না। কাদুর পাশে অগোছালো পড়ে থাকা মেয়েমানুষের জামা, অন্তর্বাস দেখে বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। চোখ সরিয়ে নিল দ্রুত। এই দিনদুপুরে...। ছি ছি।

boierpathshala.blogspot.com

যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় গোপীনাথ বলল, 'না না ঠিক আছে, আবার কী হল কাদু? থানায় যেতে হবে নাকি?'

কাদু একবার মুখ তুলে গোপীনাথের দিকে তাকাল, তারপর মাথা নীচু করে কোলের ওপর পড়ে থাকা তাকিয়ায় হাত বোলাতে বোলাতে ঠান্ডা গলায় বলল, 'ডাক্তার, তোমারও সময় নেই, আমারও সময় কম। তুমি যাবে দোকানে, আর দেখতেই পাচ্চো আমার জন্য কাপড়-টাপড় খুলে শান্তি অপেক্ষা করচে। শান্তিকে চেনো? চিনলে বুঝতে পারতে মেয়ে কেমন। যাক, কাজের কতা বলি। যা জিজ্ঞেস করব তাড়াতাড়ি উত্তর দেবে। এককথায় উত্তর। যদি দাও তো মিটে গেল। নইলে আমি যাব তোমার দোকানে তোমার খোঁজে। আর তুমি এ-ঘরে থাকবে শান্তিকে নিয়ে। অসুবিধে কিছু নেই, কেউ জানতে পারবে না। মোহন আর শোল বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে রাখবে। বন্ধ করার আগে তোমার গায়ের সব জামাকাপড় খুলে নিয়ে যাবে। একা ঘরে শুয়ে বসে তুমি শান্তিকে ভালো করে চিনবে। বিকেলের পর আমি ঝিলডাঙার সবাইকে নিয়ে ফিরে আসব। সবার সামনে দরজা খুলে তোমাকে আর শান্তিকে বের করা হবে। দুজনের কারও গায়ে সুতোটাও নেই। সেইসঙ্গে ঘর থেকে বের করা হবে তোমারই তৈরি ওষুধের শিশি। ব্যাটাছেলের বল বাড়ানোর ওষুধ।'

গোপীনাথ ঢোঁক গিলল। সে ঘামতে শুরু করেছে। হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বলল, 'কী জিজ্ঞেস করবে?'

কাদু গোপীনাথের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঝিলডাঙায় পোয়াতি বউ কার ঘরে আচে ডাকতার?'

গোপীনাথ চুপ করে রইল।

কাদু হিমশীতল গলায় বলল, 'যার মেয়ে অসুস্থ?'

গোপীনাথ চোখ বুজল। তার মনে হচ্ছে যে মেঝের ওপর সে বসে আছে সেটা দুলছে। গোটা ঘরটাই দুলছে।

boierpathshala.blogspot.com

তেতাল্লিশ

'এটা কী?'

'এটা একটা কবিতা।'

'এটা কবিতা! ফুল, তুমি ঝড়ের খবর আগে জানো জলের খবর আগে জানো/শুনে সবাই অবাক হয়...এটা কবিতা! কী বলছ সোমনাথ! আমি তোমাদের মতো শিল্প সাহিত্য বুঝি না, কম্পিউটার কী বোর্ড, মাউস নিয়ে পড়ে থাকি, তা বলে কবিতা একদম পড়িনি বলে মনে করো?'

'ওই হল, ছড়ার মতো। মফঃস্বলের তরুণ কবি লিখেছে। তুমি যদি এখন সবাইকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গাঙ্গুলি ভাবো তাহলে তো মুশকিল পৃথা।'

'আমি কিছুই ভাবছি না, শুধু অবাক হয়ে যাচ্ছি।'

'আমিও অবাক হয়েছি। খুবই অবাক হয়েছি আর সেই কারণেই কাজটায় রাজি হয়ে গেলাম। টিভি কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দেওয়ার আগে এই আমার শেষ অ্যাসাইনমেন্ট।'

'আমি এই কারণেই অবাক হচ্ছি। একটা ছড়ার পিছনে তোমরা ক্যামেরা বাগিয়ে ধাওয়া করবে! সত্যিই যাচ্ছ? নাকি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ?'

'ঠাট্টা করব কেন পৃথা? তোমার সঙ্গে কি আমার ঠাট্টার সম্পর্ক? তোমার সঙ্গে আমার হল সিরিয়াস সম্পর্ক। আজ বাদে কাল তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে, আজ আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করব?'

কথাটা বলে হো হো করে হাসল সোমনাথ।

পৃথা ঠোঁট উলটে বলল, 'বয়ে গেছে তোমায় বিয়ে করতে। পাগলকে বিয়ে করার মতো খারাপ অবস্থা আমার হয়নি।'

পৃথা আর সোমনাথ বসে আছে সেক্টর ফাইভের এক কফি শপে। কফি

boierpathshala.blogspot.com

শপে বসার ব্যাপারে পৃথার ঘোরতর আপত্তি। আপত্তির কারণ কফি নয়, আপত্তির কারণ দেয়াল। এখনকার কফি শপগুলোতে দেয়াল কাঁচের। শুধু এখানে নয়, কলকাতায়ও আজকাল ছেলেমেয়েদের কফি খাওয়ার, আড্ডা দেওয়ার জায়গাগুলো সব এরকম হয়ে গেছে। রাস্তা থেকে দেখা যায় টেবিলে টেবিলে ছেলেমেয়েরা বসে আছে। পৃথার খুবই অপছন্দ। তার মতে এটা বিচ্ছিরি একটা জিনিস। মানুষগুলোকে মনে হয় অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছ। শো-কেসে রাখা শো পিস, সবাইকে দেখানোর জন্য রাখা হয়েছে। প্রাইভেসি বলে কিছু থাকে না। সে বলে, 'ছেলেমেয়েরা এসব জায়গায় বসতে রাজি হয় কী করে!'

সোমনাথ বলে, 'সময়টাই এইরকম। এই সময় অত প্রাইভেসিতে বিশ্বাস করলে চলে না। সভ্যতার অগ্রগতি। যা হবে সব ট্রান্সপারেন্ট। প্রেমে আজকাল আর লুকোচুরি নেই। নর্থ ক্যালকাটার অমুক কেবিন, তমুক কেবিনের পর্দা টানা ঘুপচি ঘরে বসে কাটলেট খাওয়ার যুগ শেষ পৃথা। নাউ এভরিথিং ইজ ওপেন।'

'সবাই যে প্রেম করে এমন তো নয়। বন্ধুরা কথা বলে, কাজের কথাও হতে পারে। সব লোক দেখিয়ে করতে হবে?'

সোমনাথ বলে, 'বাঃ, আর তুমি যে কফি স্যান্ডউইচ খেতে খেতে বাইরেটা দেখতে পাও। আকাশ দ্যাখো, ন্যাচারাল আলো দ্যাখো। ঝড়বৃষ্টি হলে ধুলো ওড়া দেখতে পাও।'

'তাহলে তো রাস্তায় এসে বসলেই হয়।'

'হয়ই তো। সেরকম জায়গাও আছে। আমরা শ্যুটিং করতে গিয়ে দেখেছি। লেকে বোটে বসে দিব্যি জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। কেউ ফিরেও দেখছে না।'

'নির্লজ্জ।'

'যাব্বাবা একটু-আধটু চুমু খাওয়ার মধ্যে লজ্জার কী হল?'

'কিচ্ছু হয়নি। তুমি থামবে?' পৃথা চোখ পাকিয়ে তাকায়।

এই কফি শপের দেয়াল কাচের নয়। সবটা ঢাকা ঘরের মধ্যে। দোকানের নাম 'ব্ল্যাক'। আশ্চর্যজনকভাবে এখানে ব্ল্যাক কফি ছাড়া সব পাওয়া যায়। পৃথা নিয়েছে আইস কফি। অতি কুৎসিত খেতে। আইসক্রিমের থেকে বেশি বরফের কুচি। তিনবার স্ট্র দিয়ে টানলে একবার কফির স্বাদ পাওয়া যায়। সোমনাথ যতবারই খাচ্ছে চোখমুখ কুঁচকে যাচ্ছে। বরফ ঢেলে কফি খাওয়ার মধ্যে কী মজা কে জানে বাবা। পৃথা কিন্তু আরাম পাচ্ছে। তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে। খেতে খেতেই বানেরহাটের গঙ্গাপদর ছড়া পড়ল। সে এইমাত্র সোমনাথের কাছে ঝিলডাঙায় গিয়ে কাজ করবার পরিকল্পনা শুনেছে। শুনে অবাক হয়েছে। একটু

boierpathshala.blogspot.com

অবাক নয়, একেবারে চোখ-কপালে-ওঠা অবাক।

'আচ্ছা, তোমরা কি পাগল? তোমার টিভি কোম্পানির মালিকের কী যেন নাম? কী মল্লিক যেন? হ্যাঁ, মনে পড়েছে কমল মল্লিক, ওকে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করো। মাথার ডাক্তার। তুমিও সঙ্গে দেখিয়ে নাও। দুজনে একসঙ্গে দেখালে খরচ কম হবে।'

সোমনাথ বলল, 'আমাদের মাথার ডাক্তার দেখাতে পয়সা লাগবে না। কথাকলির বাবাই একজন নাম করা সাইকিয়াট্রিস্ট। বিনা পয়সায় সবার মাথা পরীক্ষা করে দেবেন।'

'তাহলে আর দেরি কোরো না।'

সোমনাথ হেসে বলল, 'আর যদি ঘটনাটা সত্যি হয়?'

'কোন ঘটনাটা? ওই ফুল নামের মেয়েটার ভূতুড়ে ক্ষমতা?'

'ভূতুড়ে বলছ কেন? কত মানুষের কতরকম পাওয়ার থাকে আমরা তার কতটুকু জানি? সত্যি হয়তো এই মেয়েটা আগে থেকে বিপদের সিগন্যাল বুঝতে পারে। সবটা না পারুক কিছু কিছু পারে। বাবার কাছে গল্প শুনেছিলাম, ওঁর গ্রামে নাকি এমন একটা লোক ছিল। বুড়ো লোক। রাতবিরেতে শ্মশানের পাশে, কবরের ধারে বসে থাকত। মৃত মানুষরা তার কাছ থেকে বউ ছেলেমেয়ে, জমি বাড়ির খবর নিত।'

পৃথা কফি মগ তুলে স্ট্র-তে লম্বা টান দিল। বলল, 'গ্রামের মানুষরা সেই আজগুবি কথাগুলো বিশ্বাস করত?'

'না করত না। তবে খবরাখবর দিত। যেমন ধরো ছেলেটা কাজ পেয়েছে। মেয়ের বিয়ের কথা চলছে, পাত্রের বিঘে তিনেক জমি আছে। বাড়ির চালা মেরামত না করলে এবার ভেঙে পড়বে—এইসব খবর। একবার সেই লোকটা একটা কাণ্ড করল...।'

পৃথা হাত তুলে বলল, 'থাক। আমার শোনার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। ডেড ম্যানের খবর তোমরা নিয়ে থাকো গে যাও। পারলে তোমাদের টিভিতে একটা প্রোগ্রাম করো, ডেড নিউজ।'

সোমনাথ একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, 'আরে বাবা, খবরটা যে ঠিক নয়, ছড়াটা যে মিথ্যে, এটা নিয়েও তো কাজ করা যায়। এখনও পাড়াগাঁয়ে এসব বুজরুকি, কুসংস্কারের কারবার চলছে। করা যায় না?'

পৃথা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'যা খুশি করো। তোমাদের সেই ওয়েদার বুলেটিনের কী হল? মোম চ্যাটার্জির আকাশ?'

boierpathshala.blogspot.com

সোমনাথ চেয়ারে হেলান দিয়ে বেজার মুখের ভান করে বলল, 'আপাতত স্থগিত।'

'ইস, তোমার খুব মিস্ হল। বিকিনি পরা সুন্দরীর সঙ্গে থাকা হল না।'

মুখে চুকচুক করে আওয়াজ করল পৃথা।

সোমনাথ নিজের মাথার চুল এলোমেলো করতে করতে বলল, 'কোথায় আর মিস্ হল। নতুন কাজটাতেও তো মোমকে নেওয়া হচ্ছে।'

'মানে!'

'মানে আর কী? মোমও ঝিলডাঙায় যাবে। সে হবে অ্যাঙ্কর। অ্যাঙ্করও বলতে পারো আবার অ্যাক্টরও বলতে পারো। ঘটনা একটা গল্পের মতো করে সাজানো হয়েছে। মোমের চোখ দিয়েই গোটা ব্যাপারটা দেখানো হবে। এক আশ্চর্য মেয়েকে খুঁজতে যাওয়া হচ্ছে। খুঁজতে যাচ্ছে মোম। খানিকটা জার্নিও থাকবে। বেড়ানোর মতো।'

পৃথা ভুরু তুলে বলল, 'বাঃ, তাহলে তো বিরাট ট্যুর।'

'বিরাট না হোক কিছুদিন তো হবেই। ফুল নামের মেয়েটাকে নিয়ে কেমন ধরনের বুজরুকি চলছে সেটা বোঝাতে সময় লাগবে। ঠিক হয়েছে মেয়েটাকে দিয়ে একটা কিছু ফোরকাস্ট করানো হবে। বিপদের ভবিষ্যদ্‌বাণী। এই ধরো ঝড়জল, আগুন, বজ্রপাত ধরনের কিছু। দেন উই শ্যাল ওয়েট। দেখব তার কথাটা কীভাবে মিথ্যে হয়। সেটাও শুট করব। সময় তো কিছুটা লাগবেই।'

পৃথা ন্যাপকিন তুলে মুখ মুছল। বলল, 'ভালোই হল। মোমের সঙ্গে ক-টা দিন কাটাতে পারবে।'

খোঁচাটা গায়ে না মেখে সোমনাথ বলল, 'ওই মেয়েকে নিয়ে শ্যুটিঙের খরচ অনেক। বাকি সব কাজ ফেলে উনি এতদিন আউটডোরে থাকবেন, টাকাও তেমন নেবেন। তবে কমল মল্লিক এই প্রোডাকশনটায় টাকা খরচ করতে চাইছে। টাকা দেওয়ার লোকও পেয়ে গেছে।'

কথাটা সত্যি। কমল মল্লিকের টাকা জোগাড় হয়ে গেছে। প্রীতি শর্মার সঙ্গে এর মধ্যেই দুটো মিটিং করা হয়ে গেছে তার। কনসেপ্ট শুনে প্রীতি শর্মা প্রথম দিনই লাফিয়ে উঠেছেন।

'আই এগ্রি। আপনি বাজেট বলুন। সবটাই আমি দেব।'

কমল মল্লিক বলেছেন, 'শুধু আপনি কেন দেবেন! আমরা ফিফটি ফিফটি শেয়ার করব। আসুন জয়েন্ট প্রোডাকশন করি।'

প্রীতি শর্মা বলেছেন, 'কোনো দরকার নেই। আমি পুরোটা দিচ্ছি, আপনি

boierpathshala.blogspot.com

কাজটা করুন। সেটাই আপনার শেয়ার হবে। শুধু এখানে কেন? আমি বাইরেও এই ছবির মার্কেটিং করব। এখনও আমাদের দেশ কী ধরনের অশিক্ষা, কু-সংস্কারের মধ্যে পড়ে আছে সেটা সবাই দেখুক।'

কমল মল্লিক বললেন, 'আপনি প্রোডাকশনটার মধ্যে থাকুন মিসেস শর্মা। যদিও আমি ঠিক ডিসাইড করেছি, এই কাজটা সরাসরি ডিরেক্ট করবে অল্পবয়সি একটি ছেলে, সোমনাথ। সোমনাথ আমার এখানেই কাজ করে। ভালো ছেলে। ভালোর থেকেও বড়ো কথা হল মাথাটা খুব পরিষ্কার। ইমাজিনেটিভ। আগে কখনও ডিরেক্শনের কাজ করেনি। কিন্তু আমি জানি পারবে। ফ্রেশ মাথার সুবিধে এটাই। নতুনভাবে ভাবতে পারে। আপনি তার সঙ্গে থাকুন, আপনার ভালো লাগবে।'

'না মিস্টার মল্লিক। আপনার সঙ্গে প্রথমদিনই আমার কথা হয়েছিল, মল্লিক টিভির কাজে আমি কোনোরকম নাক গলাব না। প্রজেক্ট পছন্দ হলে পিছন থেকে ফাইনান্স করব শুধু। আপনাকে এখানে বিজনেস করে চলতে হবে। এখনই ঘোষণা করে প্রীতি শর্মার সঙ্গে কাজ করলে সেই বিজনেসের সমস্যা হতে পারে।'

'এটা কেন বলছেন? আমি তো ভেবেচিন্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'তার জন্য আপনাকে আমি আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

প্রীতি শর্মা একটু হাসলেন। এই মহিলার সঙ্গে কিছুক্ষণ বসলেই বোঝা যায়, মহিলার মাথা অসম্ভব ঠান্ডা। ইনি যে কাউকে চড় মারতে পারেন বিশ্বাসই হয় না। কে জানে হয়তো অতিরিক্ত ঠান্ডা মাথার এটাই সুবিধে। মাথা মান-অপমানের প্রশ্নে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ঠান্ডা মাথাকে দুর্বলতা ভাবা বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। সম্রাট দত্তর মতো কিছু লোক ঘুষ খেতে খেতে এই বোকামিতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কমল মল্লিক আবার বললেন, 'আপনি টাকা ঢালবেন অথচ আপনি প্রোডাকশনে থাকবেন না, সেটা কীরকম হবে?'

'ভালোই হবে। আপনার কনসেপ্ট শুনেই বুঝতে পারছি জিনিসটা ভালো হবে। আমি যে লাভক্ষতি নিয়ে এখনই ব্যস্ত হয়ে পড়েছি এটা ভাববেন না। বাংলা থেকে ভালো কাজ হোক এটাই আমার কাছে এখন সবথেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ। আমি নিজে মুম্বাইতে ফিরে যাচ্ছি এই সপ্তাহেই। আমার হাজব্যান্ডের একটা মাইনর অপারেশনের ব্যাপার আছে। সেখানে আমাকে থাকতে হবে। মাঝখানে ফোনে, মেলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে। আমি চাই না, মল্লিক টিভি প্রোডাকশনের পিছনে যে প্রীতি শর্মা রয়েছে সেটা এখনই এখানকার ইন্ডাস্ট্রি

boierpathshala.blogspot.com

জানতে পারুক। আপনারা স্বাধীনভাবে কাজ করুন। শুধু একটাই কন্ডিশন।'

'কীরকম কন্ডিশন?'

'এই কাজটা আপনি আলো চ্যানেলকে দেবেন না।'

কমল মল্লিক ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসলেন।

'বেশি দাম দিলে?'

'না, তাহলেও নয়। যদি বোঝেন কাজটা আপনার মনের মতো হয়েছে, আমাকে জানাবেন। আমি এটা নিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত যাব। এখানে চ্যানেলের অভাব নেই। সেরকম হলে আমরা একটা সিরিজ বানাতে পারি। এখনও গ্রামে গঞ্জে নানা ধরনের কুসংস্কার, অলৌকিক, বুজরুকি নিয়ে ব্যবসা হয়। তার সিরিজ। এই স্টেট থেকে বেরিয়ে অন্য প্রভিনসেও যাওয়া যাবে। সেখানে এরকম ঘটনা আরও বেশি। আমার ধারণা, কাজগুলো ক্লিক করলে তখন আমার নাম জানাজানি হলে অসুবিধে হবে না। মল্লিক টিভির ওপর কেউ রাগ করতে পারবে না। সেই পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

কমল মল্লিক মৃদু হেসে বললেন, 'আপনি বারবার বলছেন ঠিক আছে, আমি কিন্তু রাগারাগির ভয় পাচ্ছি না।'

প্রীতি শর্মা বললেন, 'সরি, আমি ওভাবে বলতে চাইনি। আসলে আমি আপনাকে কোনোরকম সমস্যায় ফেলতে চাই না। আমার অপ্‌শন্‌ আছে। এখানে কাজে বাধা পেলে আই ক্যান শিফ্‌ট টু মুম্বাই। কিন্তু আপনারা পারবেন না। আমি তো ঠিক জানি না সম্রাট দত্তর মতো স্কাউন্ড্রেলদের জোর এখানে কতটা। তবে আলো চ্যানেল পাওয়ারফুল। তাকে আপনি এখনই চটিয়ে দিন সেটা চাইছি না। প্রোডাকশন ভালো হলে ওরাই আপনার পায়ে এসে পড়বে। আমি সেটাই চাই। আপনি বারগেইনের জায়গায় চলে যান।'

কমল মল্লিক হেসে বললেন, 'কী হবে জানি না। তবে আপনি বোধহয় জেনে খুশি হবেন মিসেস শর্মা সম্প্রতি আমি আলো চ্যানেলের একটা কাজ রিফিউজ করেছি। করেছি কাজটার জন্য নয়, সম্রাট দত্ত-র জন্য। আমি কমিশন দিয়ে কাজ করি না এমন নয়, অবশ্যই করি, তবে নিজের মানসম্মান বজায় রেখে করতে চাই। বাজারে নেমেছি কেনাবেচা করতে, সবসময় পুরো সম্মান বজায় থাকবে এমন ভুল ধারণা আমার নেই। তবে খানিকটা তো রাখতে হবে। সব ছুড়ে ফেললে ব্যবসা বাঁচলেও নিজে বাঁচব কী নিয়ে? নিজেকেও বাঁচতে হবে। তাই না?'

কথা শেষ করে কমল মল্লিক গলা খুলে হেসে ওঠেন। প্রীতি শর্মা উজ্জ্বল

boierpathshala.blogspot.com

চোখে শুধু বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ। দেখেছেন তো তাহলে আমি ঠিকই ছিলাম। সবটা খারাপ নয়। মেঘের পিছনে কিছু সিলভার লাইন আছে।'

পরের মিটিঙেই বাজেট নিয়ে ফাইনাল কথা হয়ে যায়। প্রীতি শর্মা কোনো সীমানা রাখেননি। এই কাজে যেরকম প্রয়োজন হবে সবটাই খরচ করতে বলেছেন। কমল মল্লিক কোনো কিছুই কাউকে বলেননি। শুধু সোমনাথকে জানিয়েছেন। গোটা প্রোডাকশনটা সে দেখবে, সুতরাং তাকে তো জানতেই হবে।

'এত বড়ো সুযোগ মল্লিক টিভির হাতে কখনও আসেনি। আর আসবে বলে মনেও হয় না। কাজটা ঠিকমতো করতে পারলে যে-কোনো রিয়ালিটি শো-কে আমরা তুড়ি মেরে ফেলে দিতে পারব। সুতরাং বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল। কোনোরকম হইচই করা যাবে না সোমনাথ।'

'বুঝতে পারছি স্যার। কিন্তু ইউনিটকে তো বলতে হবে।'

'লোকলস্কর, ক্রেন, ট্রলি নিয়ে কাজ করতে যাবে তাও চলবে না। জানাজানি হয়ে গেলে দেখবে পরদিনই কোনো লোকাল কেব্‌লে স্টোরিটা দেখিয়ে দিয়েছে। ব্যস এভরিথিং ফিনিশ। গোটা প্রজেক্টটাই ফেলে দিয়ে চলে আসতে হবে। একটা কাজ করতে পারলে, এই কনসেপ্টটার ওপরই আমাদের একটা রাইট চলে আসবে। খবরও আসতে থাকবে। বুজরুকি, ভাঁওতাবাজির খবর।'

'কিন্তু অল্প কিছু জিনিসপত্র না হলে তো ছবির কোয়ালিটি খারাপ হবে। লাইট তো নিতেই হবে।'

'খেপেছ নাকি! ওই অজ পাড়াগাঁয়ে তুমি লাইট জ্বালাবে কী করে? জেনারেটর নিয়ে যাবে নাকি? সিনেমার শ্যুটিং ভেবে দশ-বারোটা গ্রাম ভেঙে পড়বে। সব কাজই করতে হবে অ্যাভেলেবল আলোয়। বাকিটা ব্যাটারি দিয়ে ম্যানেজ করতে হবে। আমার তো মনে হয় এই ধরনের কাজে কম আলো একটা এক্সট্রা মাত্রা যোগ করবে। সবটাই খুব ন্যাচরাল মনে হবে। যত এই সত্যি সত্যি ভাবটা দেখাতে পারবে তত প্রোগ্রামটা ইন্টারেস্টিং হবে সোমনাথ। সেরকম বুঝলে দু-একবার ক্যামেরার জার্ক বা আউট ফোকাসও ব্যবহার করতে পারো।'

সোমনাথ চোখ সরু করে কমল মল্লিকের দিকে তাকিয়ে রইল। বহুদিন পর সে কাজে এক ধরনের চাপা উত্তেজনা অনুভব করছে। বলল, 'এডিটিং-এর সময় আপনি তো থাকছেনই।'

'সে পরের কথা পরে দেখা যাবে। আর একটা জিনিস সোমনাথ, সেটা শুধু তুমি জানবে, এই প্রজেক্টে মল্লিক টিভির ফান্ডের কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু

boierpathshala.blogspot.com

তার মানে এই নয় আমরা অপ্রয়োজনে খরচ করব। যত কম লোক নেওয়া যায় তাই নেবে। খুব চালাকচতুর ছেলেপিলে নিতে যেও না। কন্ট্রোলের মধ্যে যারা থাকবে তাদেরই শুধু নেবে।'

সোমনাথ হেসে ফেলল। বলল, 'বোকা লোক খুঁজতে বলছেন?'

'তা নয়, আবার খুব ইন্‌কুইজিটিভ হলে নেওয়ার দরকার নেই। ছোটো টিম। কাউকেই আগে জায়গা বলবে না।'

পুরোটা শোনার পর পৃথা হেসে বলল, 'বিরাট গোপন কাজ করতে যাচ্ছ মনে হচ্ছে।'

সোমনাথ বলল, 'গোপন নয়, কমল মল্লিক এই কাজটার ওপর ডিপেন্ড করছে। ভাবছে এটা এম টি পি কে একটা বড়ো ব্রেক দেবে।'

'এম টি পি আবার কী!'

'মল্লিক টিভি প্রোডাকশন।'

'ও, কবে রওনা দিচ্ছ তোমরা?'

সোমনাথ বলল, 'এখনও শিডিউল হয়নি। ভেবেছিলাম, আগে গিয়ে একবার রেইকি করে আসব। জায়গা-টায়গাগুলো সব দেখে আসা আর কী। ঝিলডাঙা, বানেরহাট। বিশেষ করে গঙ্গাপদ নামের ওই কবি ছোকরার সঙ্গে কথা বলা দরকার। ফুল সম্পর্কে জানার ওই তো প্রাইমারি সোর্স। মল্লিকবাবু রাজি হলেন না। বলছেন, একবারে চলে যাও। আগে থেকে গিয়ে অ্যালার্ট করার দরকার নেই।'

পৃথা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'একটা ফল্‌স জিনিস নিয়ে তোমরা এত সিরিয়াস কেন হলে সেটাই মাথায় ঢুকছে না। যদিও টিভি মানেই তো এখন সব গাঁজাখুরি কাণ্ড। সিরিয়াল, মেগা সিরিয়াল, টেলিফিল্ম কোনোটাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। যত উদ্ভট তত বোধহয় তোমাদের ভিউয়ার বেশি।'

সোমনাথ হেসে বলল, 'এ-বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে পুরোটা একমত নই ডার্লিং। আজকাল এই মিডিয়ায় অনেক ভালো কাজও হচ্ছে। তবে দিস ইজ মাই লাস্ট প্রোগ্রাম। এরপর কেউই আর আমাকে এখানে ধরে রাখতে পারবে না। ঝিলডাঙা থেকে ফিরে এসে আমি সোজা পাহাড় কাটতে রাজস্থান চলে যাচ্ছি।'

'বিয়ে করে বউ নিয়ে যাবে তো?' কৌতুকভরা চোখে বলল পৃথা।

সোমনাথ হাত উল্‌টে বলল, 'অবভিয়াস। পাত্রী প্রায় ফাইনাল।'

'কে? আমি তো রাজি নই।'

boierpathshala.blogspot.com

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সোমনাথ বলল, 'তাহলে বাধ্য হয়ে অন্য কাউকে নিতে হবে।'

'তিনি কে? তোমার দিদি যাকে ঠিক করেছেন?'

'হতে পারে। দারুণ মেয়ে।'

'তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'দেখা হয়নি, তবে কথা হয়েছে। টেলিফোনে। তবে পাত্রী সম্পর্কে এখনই বেশি বলা যাবে না।'

পৃথা ঠোঁট উলটে বলল, 'বয়ে গেছে শুনতে।'

সোমনাথ মিটিমিটি হেসে বলল, 'খুব চাপাচাপি করলেও বলতে পারব না পৃথা। বিয়ের আগে পাত্রপাত্রীর ব্যাপারে বেশি পাঁচ কান করতে নেই, তাহলে বিয়ে ভেস্তে যাওয়ার একটা চান্স থাকে। আমার দিদির বেলায় এরকম হয়েছিল। যে ক-টা ছেলে নিয়ে মা বলে বেড়িয়েছে, সবকটা সম্বন্ধই ভেঙ্গে গিয়েছিল। শেষে দিদি বলল, একেবারে ফাইনাল হলে তবে লোককে জানানো হবে। তাই হল, দিদির বিয়েও দুর্দান্ত হল।'

'বিয়ে নিয়ে তুমি দেখছি চমৎকার সব থিয়োরি জানো! মেয়ে দেখতে কেমন?'

সোমনাথ বানানো লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল, 'খুবই সুন্দর।'

'ফটো দেখে বলছ?'

'না, কথা শুনেও বলছি। কথা শুনলে চেহারা বোঝা যায়।'

খেলাটায় পৃথা মজা পেল। ভুরু কুঁচকে বলল, 'আমার কথা শুনে কীরকম মনে হয় পরিচালক সাহেব? কেমন দেখতে আমায়?'

'বাকি সব ঠিক আছে, কিন্তু নাকটা খেঁদার দিকে।'

পৃথা, সোমনাথ দুজনেই আওয়াজ করে হেসে উঠল। তবে ওই মেয়ের সঙ্গে যে সোমনাথের কথা হয়েছে এটা সত্যি। সোমনাথের দিদিই ফোনে ধরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। ন্যাকা ধরনের গলা শুনে প্রথমটায় সোমনাথ বিরক্ত হয়।

'আমার নাম সোমদীপা।'

'ঠিক চিনতে পারলাম না।' সোমনাথ তখন অফিসে ঢুকছে।

ওপাশের মেয়েটি এক মুহূর্ত চুপ করে খানিকটা আমতা আমতা করে বলে, 'আপনার দিদি... বনানী...।'

'আমার দিদি! কী ব্যাপার বলুন তো?' সোমনাথ অবাক হয়।

boierpathshala.blogspot.com

'দিদি, আমাকে ফোন করতে বলেছিলেন, আপনার নম্বর উনিই দিয়েছেন।'

ফুটপাথেই থমকে দাঁড়ায় সোমনাথ। দিদি আবার কাকে তার ফোন নম্বর দিল! মেয়েটি ওপাশ থেকে সরু গলায় বলে, 'আমার মেজকাকা আপনার জামাইবাবুর অফিসে কাজ করেন।'

এবার সোমনাথের ঘটনা মনে পড়ে। এই সেই মেয়ে! এর সঙ্গেই দিদি তাকে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে? উরিবাব্বা, কী সাংঘাতিক! সোমনাথ ঢোঁক গিলে বলে, 'ও আচ্ছা আচ্ছা, এবার বুঝতে পেরেছি। আসলে জানেন, আমিই আপনার সঙ্গে কথা বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন তো আমি কাজে...।'

ওপাশের মেয়েটি চাপা গলায় বলে, 'না না, আমি আপনাকে এখন মোটেও বিরক্ত করতে চাইছি না। আপনি যখন ফাঁকা হবেন তখন না হয় কথা বলব। আচ্ছা, আপনার অফিসে গিয়ে কি একবার আপনার সঙ্গে দেখা করা যাবে সোমনাথবাবু?'

অফিস! মেয়েটি তো অত্যধিক স্মার্ট মনে হচ্ছে। হয় স্মার্ট, নয় নির্লজ্জ। বিয়ের পাত্রী একেবারে অফিসে হাজির হতে চাইছে! সোমনাথ ভেবে রেখেছিল, দিদি জামাইবাবুর মুখ রক্ষা করতে সত্যি সত্যি এই মেয়ের সঙ্গে সরাসরি একদিন কথা বলবে এবং ভদ্রভাবে জানিয়ে দেবে বিয়ে-টিয়ের মধ্যে সে নেই। কথা বলাও হল, আবার কাটানোও হল। কিন্তু পাত্রী যে একেবারে সশরীরে হাজির হতে চাইছে!

'দেখুন, আমি তো ক-দিনের জন্য কলকাতায় থাকছি না।'

'আসলে কী জানেন সোমনাথদা, আমার বহুদিনের শখ রেডিয়ো টিভিতে প্রোগ্রাম করি। সত্যি কথা বলতে কী যখন আপনার কথা শুনি তখনই আমি ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়ি। আমি নাচ-গান দুটোই ছোটোবেলা থেকে শিখছি, আবৃত্তিও পারি...দেখুন না যদি কিছু করা যায়...আপনি বাইরে থেকে ফিরে এলে যোগাযোগ করব?'

ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল সোমনাথ। ও তাহলে বিয়ে নয়, টিভি। দিদি জামাইবাবু এটাই ভুল করেছে। মেয়ের উৎসাহ দেখে ভেবেছিল, ছেলে পছন্দ হয়েছে। আসলে তা নয়। পছন্দ হয়েছে ছেলের কাজ। ওদের পক্ষে ভুল করাটা খুব একটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। তা ছাড়া নামি-দামি হওয়ার জন্য বিয়ে-থার ঘটনা হামেশাই ঘটে। বিদেশে সিটিজেনশিপ পাওয়ার জন্য যদি ছ-মাসের বিয়ে হতে পারে, এখানে ছোটোমোটো তারকা হতে বছর খানেক বউ সাজতে অসুবিধে কী? একটাই ভালো, এই মেয়েটা আগেই বলে ফেলল। বোঝাই যাচ্ছে

boierpathshala.blogspot.com

বোকা। তবে নিজেকে বিরাট ঝামেলামুক্ত বলে মনে হল সোমনাথের। সে একটু চুপ করে থেকে বলল, 'দেখুন ম্যাডাম কী যেন নাম আপনার?'

ও প্রান্তের গলা উৎসাহী হয়ে বলল, 'সোমদীপা, সোমদীপা রায়। জানেন তো আমি কলকাতার সব চ্যানেলগুলোতে অডিশন দিয়েছি, কিছুই হয়নি, আজকাল চেনাজানা ছাড়া কিছু হয় না।'

'দেখুন সোমদীপাদেবী, আমি বাইরে থেকে ফিরে এসে টিভির কাজ ছেড়ে দিচ্ছি।'

'এমা! তাই নাকি? আপনি কোথায় যাবেন? '

সোমনাথ হেসে বলল, 'রাজস্থানে পাহাড় ভাঙার একটা চাকরি পেয়েছি। সুতরাং এ-বিষয়ে আপনাকে আমি কোনো উপকার করতে পারছি না। দুঃখিত। ভালো থাকবেন।'

'ব্ল্যাক' কফি শপ থেকে বেরিয়ে পৃথা বলল, 'আমি অফিস চললাম। ইভনিং ডিউটি। তুমি?'

'তোমার বিরহে পথে পথে ঘুরে বেড়াব।' কাব্য করার ঢঙে বলল সোমনাথ।

'খুব ভালো। মোম চ্যাটার্জির কাছেও যেতে পারো। ভূতুড়ে ছবির রিহার্সালও হবে প্রেমও হবে।'

ঠোঁট টিপে হাসল পৃথা। সেক্টর ফাইভের বিশাল বিশাল বাড়ির ছায়া এসে পড়েছে পথে। সেই ছায়ার তলায় দাঁড়িয়ে সোমনাথ পৃথার হাত ধরে বলল, 'অ্যাই তুমি যাবে?'

পৃথা ভুরু কুঁচকে বলল, 'আমি! কোথায়? মোমের কাছে?'

'দূর, ঝিলডাঙায়? চলো না ক-দিন মজা হবে।'

পৃথা হেসে ফেলল। এই ছেলেমানুষির জন্যই ছেলেটাকে তার এত পছন্দ।

'পাগল, তোমাদের কাজের মধ্যে আমি গিয়ে কী করব? তা ছাড়া আমার একটা ছুটিও নেই। নতুন বস্ এসেছে। হেভি কড়া।'

'প্লিজ পৃথা।'

পৃথা মিথ্যে চোখ পাকিয়ে বলল, 'নো। না বলছি তো। তোমার কোনোরকম পাগলামির মধ্যে আমি নেই। থাকতে চাইও না।'

পৃথা তখনও জানত না মুখে সে যা-ই বলুক তাকেও ঝিলডাঙায় যেতে হবে এবং সেই যাত্রায় কোনো মজা থাকবে না। সেই যাত্রা হবে ভয়ংকর।

boierpathshala.blogspot.com

চুয়াল্লিশ

পাহাড়ি পথে একধরনের মজা থাকে।

সে যতক্ষণ চলে পাহাড়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে চলে। এই হয়তো চোখের সামনে ছিল হঠাৎ দুম করে বাঁক নিয়ে চলে গেল পাথরের আড়ালে। খানিকক্ষণ লুকিয়ে থেকে ফের ভেসে উঠল অল্প দূরে। কখনও-বা অন্য কোনো পাহাড়ে, ধরাছোঁয়ার বাইরে মুখ বাড়াল। কখনও আবার সেই পথ থাকে নীচে। সোজা হয়ে ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতে মাথার ওপর পাক মেরে এমনভাবে উঠবে যেন খানিকটা গেলেই আকাশে পৌঁছে যাবে। এইভাবে হুটোপাটি, লুকোচুরি চলতেই থাকে। পাহাড়ও এই খেলায় অংশ নেয়। কখনও পথের পাশ থেকে ঝরনাকে লুকিয়ে ফেলে, কখনও রুক্ষ পাথর সরিয়ে গাদা খানেক মেঘ আর কুয়াশায় ঢেকে দেয়। জঙ্গলি পথকে আড়াল করে খেলাচ্ছলে।

মানুষ যখন পাহাড়ে যায়, এই খেলায় অংশ নিতে চেষ্টা করে। খানিকটা পারে, বেশিটাই পারে না। প্রকৃতির এটাই নিয়ম। সে তার রহস্যময় খেলায় মানুষকে কখনওই পুরোটা নেয় না। বাইরে থেকে শুধু দেখতে দেয়। মানুষ তাতেই মুগ্ধ হয়। কোনো কোনো মানুষ আবার আপশোস করে। সংখ্যায় তারা খুবই সামান্য, কিন্তু করে। মনে মনে ভাবে, আহা রে! আমি যদি এখানে থেকে যেতে পারতাম বেশ হত। পাহাড়, জঙ্গল, ঝরনাদের একজন হয়ে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেওয়া যেত বড়ো আনন্দে।

এই মুহূর্তে ব্রতীন পড়েছে সমস্যায়। খানিক আগে কথাকলি তাকে জানিয়েছে, সে এই পাহাড় ছেড়ে আর ফিরবে না। ব্রতীন প্রথমে ভেবেছিল, এটা কোনো রসিকতা। এই মেয়ের রসিকতার স্বভাব আছে। কিন্তু যত সময় যাচ্ছে

boierpathshala.blogspot.com

তত বুঝতে পারছে, না, এটা রসিকতা নয়। কথাকলি সত্যি এই পাহাড়ে পাকাপাকিভাবে থেকে যেতে চায়। এই বিষয়ে সে সিরিয়াস। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে ব্রতীন। কথাকলি শুনছে না। পাতা বিছোনো ছায়া ছায়া গুঁড়ি পথের পাশে একটা পাথরের ওপর কথাকলি বসে পড়েছে। উঠতে চাইছে না। অথচ সন্ধে হতে বেশি দেরি নেই। ওদিকের পাহাড়ে সূর্য ডুবে গেছে। শিরশিরে একধরনের বাতাস বইছে। সেই বাতাসে বরফের গন্ধ আছে।

'তুমি কি খেপেছ কথা? এখানে তুমি থাকবে কী করে?'

কথাকলি অবাক চোখে বলল, 'কেন পারব না? এত বড়ো পাহাড়, এত জঙ্গল, এত নির্জনতা, এখানে আমার থাকার একটু জায়গা হবে না? ঠিক হবে।'

ব্রতীন জোর করে হেসে বলল, 'ছেলেমানুষি কোরো না। পাহাড়ে কি মানুষ থাকে?'

'আমি থাকব।' দূরে তাকিয়ে অতিরিক্ত শান্ত কণ্ঠে বলল কথাকলি।

ব্রতীনের দুশ্চিন্তা হচ্ছে। মেয়েদের অতিরিক্ত শান্ত গলার অর্থ ভালো নয়। এর অর্থ সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ব্রতীন ঠাট্টা করে বলল, 'দূর, তুমি কি সন্ন্যাসিনী? গুহায় চিমটে হাতে আগুন জ্বেলে বসে থাকবে?'

কথাকলি নীচু গলায় বলল, 'আমি জানি না, কিছুই জানি না ব্রতীন। আমি শুধু জানি এখানেই থাকব। এই আমার নিজের জায়গা।'

'বোঝো ঠেলা। এখানে থেকে তুমি কী করবে?'

কথাকলি ফিসফিস করে বলল, 'কিছুই করব না। শুধু এদের মতো হয়ে যাব।'

'এদের মতো মানে!'

'এই পাথর গাছপালা, কুয়াশার মতো।'

'মানুষ কি কখনও কুয়াশার মতো হতে পারে?'

কথাকলি কাতর গলায় বলে, 'এরা আমাকে ছাড়তে চাইছে না ব্রতীন। আমাকে সবাই মিলে টানছে।'

'ভালোই তো। পাহাড়ের টানে পাহাড়ের কাছে আসা হল। এবার ফিরে চলো।'

'টান ছিঁড়ে সবসময় ফিরে যাওয়া যায় না। কিছু আসা বোধহয় থেকে যাওয়ার জন্যই। ডেসটিনির মতো।'

গা ছমছম করে উঠল ব্রতীনের। কেন সে কথাকলিকে নিয়ে এই পাহাড়ে এসেছে? এই নির্জনতায়? সে কি বেড়াতে এসেছে? নাকি অন্য কোনো কারণ আছে? মনে পড়ছে না। কথাকলি মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল। সামান্য হেসে

boierpathshala.blogspot.com

বলল, 'কী ভাবছ?'

ব্রতীন খানিকটা বিরক্ত গলায় বলল, 'ভাবছি কেন মরতে তোমাকে নিয়ে এসেছিলাম? তুমি এই ঝামেলায় ফেলবে বুঝতে পারলে কিছুতেই আসতাম না।'

'আমাকে রেখে দিতে এসেছ তুমি। তুমিও নিজেও সে-কথা জানো না। তুমি আমাকে মুক্তি দিতে এসেছ। '

'কী যা-তা বলছ! সত্যি তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। লক্ষণ দেখা দিয়েছে।'

কথাকলি আবার মুচকি হাসল। বলল, 'এখন লক্ষণ দেখছ, এখানে কিছুদিন থাকতে পারলে দেখবে পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছি। এই পবিত্র অপার সৌন্দর্যের মধ্যে থাকলে মানুষ পাগল না হয়ে পারে? আমি পাগল হয়ে যেতে চাই। প্লিজ লিভ মি অ্যালোন। মিথ্যে সম্পর্ক, আবর্জনার ঘর সংসার, নিস্পৃহ প্রেম ভালোবাসার বদলে এই পাগলামি আজ আমার কাছে অনেক বেশি কাম্য।'

পাহাড়ে যেমন আলো ফোটে অনেকটা সময় নিয়ে, অন্ধকার হতেও সময় লাগে। একটার পর একটা পাহাড় টপকে সেই অন্ধকার আসে ছন্দ মেনে। এও বোধহয় পাহাড়ের আর একটা খেলা। অন্ধকার নিয়ে খেলা।

ব্রতীন গলা নামিয়ে বলল, 'এখানে থাকলে কি তুমি সুখ পাবে?'

'সুখ দুঃখ কিছুই পাব না। প্রকৃতি সুখ দুঃখের ঊর্ধ্বে। সেই কারণেই থাকতে চাইছি। তুমি চিন্তা কোরো না, ফিরে যাও লক্ষ্মীটি।'

ফিরে যাওয়ার বদলে ব্রতীন কথাকলির পাশে বসল। বাতাসে একধরনের ফিসফিসানি শুরু হয়েছে। সেই ফিসফিসানি মৃদু অথচ গম্ভীর। পাথরেরা কি কথা বলছে? হতে পারে। রাত হলে পাথরে পাথরে হয়তো কথা শুরু হয়।

'প্লিজ আমার কথা শোনো কথা। আজকের মতো ফিরে চলো। অনেকটা পথ যেতে হবে। অন্ধকার হয়ে গেলে আর পথ চিনতে পারব না।'

'তুমি পথ না চিনলেও ঠিক চলে যেতে পারবে। আমি কিন্তু চেনা পথ হেঁটেও ফিরতে পারব না।'

'আমি তোমায় ধরে নিয়ে যাব।' ব্রতীন হাত বাড়িয়ে কথাকলির হাত ধরল। সেই হাত বরফ-কুচির মতো ঠান্ডা! ভেতরে শিউরে উঠল ব্রতীন।

'কী করে যাব বলো? এরা যে আমায় ছাড়ছে না।'

ব্রতীন চমকে উঠল। এ কার গলা! কার কণ্ঠস্বরে কথা বলছে কথাকলি! এ কণ্ঠস্বর তো সে চেনে না! যেন অজানা, অচেনা কোনো জগতে এই কণ্ঠস্বরের জন্ম। নিজেকে সামলে ব্রতীন বলল, 'কারা তোমায় ছাড়বে না?'

boierpathshala.blogspot.com

'জানি না, তবে বুঝতে পারছি, ছাড়বে না। এই পাহাড় যেমন আমায় ডাকছে। ওই খাদও ডাকছে। তুমি শুনতে পাচ্ছ না?'

ব্রতীন বুঝতে পারল, এই ঠান্ডাতেও সে ঘামছে। কোনো কোনো জ্যোৎস্নারাতে মানুষ চন্দ্রাহত হয়। তখন মনে হয়, এই চাঁদের আলোটুকুই সত্যি। বাকি সব মিথ্যে, সব ভুল। সেই আলো যতক্ষণ ছড়িয়ে থাকে মানুষ অবশ হয়ে পড়ে। তার যুক্তি বুদ্ধি লোপ পায়। পাহাড়ও কি সেরকম? তারও কি কোনো ক্ষমতা আছে? সে-ও কি অজগর সাপের মতো শিকারীকে বশ করে? যদি না থাকে সে এমনভাবে কথাকলিকে সম্মোহিত করল কী করে! এখুনি চলে যেতে হবে। পালিয়ে যেতে হবে।

'ছি, এসব কথা বলে না কথা। আজ চল, আবার কোনো একটা সময় আমরা আসব। পাহাড় তো পালিয়ে যাচ্ছে না।'

কথাকলি ব্রতীনের হাত ছাড়িয়ে নিল। গায়ের চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে উঠে দাঁড়াল এবার। আবারও শান্ত অচেনা গলায় বলল, 'তুমি ফিরে যাও ব্রতীন। আমার চলে যাওয়ার সময় হয়েছে।'

ব্রতীন উঠে দাঁড়িয়ে অসহায় গলায় বলল, 'কোথায় যাবে?'

কথাকলি উত্তর দিল না। মুখ ঘুরিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া পথের দিকে তাকাল একবার, তারপর হাঁটতে শুরু করল ধীর পায়ে।

অন্ধকার নেমেছে। ওপাশের পাহাড়ের গায়ে প্রদীপের মতো আলো জ্বলে উঠেছে দু-চারটে করে। ব্রতীন বুঝতে পারছে না, কী করবে। তার শরীর এখন অনেক বেশি কাঁপছে। সে কি গিয়ে কথাকলিকে চেপে ধরবে? সে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। পারল না! কে যেন তাকে চেপে ধরে আছে। অসহায় ব্রতীন দেখতে পাচ্ছে, কথাকলি ছায়া হয়ে ছায়াপথে মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে অন্য কোনো জগতে। সেই জগৎ পাহাড়, গাছ আর কুয়াশার। সেই জগৎ আলো অন্ধকার নিয়ে খেলা করে। সেই জগৎ কখনও দেখা যায় কখনও হারিয়ে যায় লুকোচুরির ছলে। এই জগতে খুব কম মানুষই প্রবেশ করতে পারে। কথাকলি পারছে। সে দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে...। ব্রতীন চিৎকার করে ডাকতে গেল। গলা থেকে কোনো আওয়াজ বেরোল না তার।

তীব্র ভয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে একসময় কুয়াশা এসে ভিজিয়ে দিল।

ব্রতীনের ঘুম ভাঙল ভিজে হাতের স্পর্শে। চোখ খুলে দেখল কথাকলি তার কপালে হাত দিয়েছে। ধড়ফড় করে উঠে বসল ব্রতীন।

boierpathshala.blogspot.com

'তুমি! তুমি কোথা থেকে?'

কথাকলি ভুরু কুঁচকে বলল, 'কোথাও থেকে নয়। তোমার জ্বর কমেছে?'

প্রচণ্ড লজ্জা পেল ব্রতীন।

'দেখ কাণ্ড। আমার জ্বর হয়েছে তোমায় কে বলল?'

কথাকলি শান্ত গলায় বলল, 'কেউ বলেনি। জ্বর হলে কাউকে বলতে হয় না। শরীরই বলে দেয়।'

ব্রতীনের বিশ্বাস হল আবার বিশ্বাস হলও না। শিবুর মা কি খবর দিয়েছে? অসম্ভব নয়। জ্বরের মধ্যে ক-দিন ঘ্যানঘ্যান করছিল—'বউদিরে একটা খবর দিলে হয়।' আবার কথাকলির কথাও সত্যি হতে পারে। হয়তো হঠাৎ এসে পড়েছে।

'তুমি কখন এলে?'

গায়ের চাদর সরিয়ে বিছানা থেকে নামতে গেল ব্রতীন। কথাকলি হাত তুলে বলল, 'থাক, নামতে হবে না? ক-দিন থেকে ভুগছ? ডাক্তার দেখাও নি কেন?'

ব্রতীন খাট থেকে নেমে পড়ল। মাথাটা সামান্য টলমল করছে। সে তো করবেই। তিনদিন ধরে জ্বর চলছে। হাই টেম্পাচার ছিল কাল রাত পর্যন্ত। শরীরে দুর্বলতা থাকবে। তবে আজ সকাল থেকে জ্বর নেই। তার ওপর এই ঘুমটায় অনেকটা ফ্রেশ লাগছে। তবু কেন স্বপ্নটা দেখল! স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন। জ্বর আসার সময় যেমন মানুষ বেহুঁশ হয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে, জ্বর চলে যাওয়ার সময়ও কি দেখে? নিশ্চয় দেখে। নইলে সে কেন দেখবে। তবে মজার কথা হল, চোখ খুলে সেই কথাকলিকেই দেখল, যে পাহাড়ের পথে হেঁটে চলে গেছে। অবশ্যই এটা কোইনসিডেন্স ছাড়া আর কিছু নয়। কথাকলি নিশ্চয় এখানে হঠাৎই এসেছে। হয়তো তার বাবার আরও কোনো বই-টইয়ের ব্যাপারে। তবে কোইনসিডেন্স সবসময়ই চমকে দেয়। গায়ের পাঞ্জাবি ঠিক করতে করতে ব্রতীন কথাকলির দিকে তাকিয়ে শুকনোভাবে হাসল।

'চল, বাইরে সোফায় গিয়ে বসি।'

কথাকলি খানিকটা গার্জেনের গলাতেই বলল, 'বেশি বীরত্ব দেখাতে হবে না। তুমি শুয়ে পড়ো।'

ব্রতীন হাত তুলে উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'দূর। কিচ্ছু হয়নি। জ্বর-টর কিচ্ছু নেই। চলো তো গিয়ে বসি। তিনদিন খাটে শুয়ে থেকে পাগল পাগল লাগছে।'

'তুমি আগে গায়ের পাঞ্জাবিটা বদলাও। ঘামে ভিজে গেছে।'

boierpathshala.blogspot.com

'ঘামের সঙ্গেই জ্বর পালিয়েছে। সকালে হেভি ডোজ প্যারাসিটামল খেয়েছি।'

কথাকলি সামান্য রাগ দেখিয়ে বলল, 'বাজে কথা বলো না। দু-দিন ওষুধপত্র কিছু খাওনি।'

ব্রতীন হেসে বলল, 'বাপ রে, এত রিপোর্ট পেয়ে গেছ! কে দিল? শিবুর মা?'

কথাকলি চোখ সরিয়ে নিল। জ্বর ভাঙা পুরুষমানুষদের একটা অন্যরকম আকর্ষণ হয়। গালে খোঁচা দাড়ি। চোখমুখ বসা। এলোমেলো রুক্ষ চুল। চোখেমুখে অসুখের সঙ্গে লড়াই করার কারণে একধরনের ক্লান্তি। কথাকলি মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'না কেউ কিছু বলেনি। তুমি চেঞ্জ করে এসো। আমি তোমার জন্য খাবার করে দিচ্ছি।'

'আমি কিছু খাব না।'

'অবশ্যই খাবে। শিবুর মা বলল, আজ লাঞ্চ করোনি। না খেলে আরও দুর্বল লাগবে।'

'শিবুর মা কোথায়?'

'রান্নাঘরে। ওই তো দরজা খুলল।'

'তাহলে আমি ঠিকই ধরেছি।'

'অনেক হয়েছে, আর ওস্তাদি করতে হবে না। তুমি এসো আমি দেখি, কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। সকালের ডালভাত ছাড়া আর কিছু আছে বলে তো মনে হয় না।'

ব্রতীন আবারও লজ্জা পেয়ে বলল, 'তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমার খিদে নেই।'

কথাকলি বেডরুম থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'কথা না বাড়িয়ে চেঞ্জ করে নাও।'

পাঞ্জাবি, গেঞ্জি বদলাতে ব্রতীনের কেমন যেন সন্দেহ হল, এটাও স্বপ্ন নয় তো? কথাকলি হঠাৎ এল কোথা থেকে? ঘুমও ভাঙল তার মুখ দেখে! নিজের গায়ে একটা চিমটি কাটলে কেমন হয়?

যদিও ঘটনা অন্যরকম। কথাকলি হঠাৎ আসেনি। তাকে ফোন করেছিল শিবুর মা। সে তখন অফিসে। এডিট রুমে সিরিয়ালের কাজ চলছিল। কাজ চলছিল বললে ভুল বলা হয়, ঝগড়া চলছিল। 'আগুন লেগেছে বনে বনে' সিরিয়ালের সতেরো নম্বর এপিসোডের রাশে কিছু অংশ জ্বলে গেছে। দৃশ্যটায় ড্রামা বেশি। বাবা ছেলেকে বকছে। বকুনির কারণ পুত্রবধূর উদ্ধত আচরণ।

boierpathshala.blogspot.com

ছেলে মাথা নামিয়ে বকুনি শুনছে। ক্যামেরা একবার বাবাকে ধরছে, একবার ছেলেকে। সিকোয়েন্সে আরও একজন আছে। পুত্রবধূ। সে দাঁড়িয়ে আছে দরজার বাইরে। আড়াল থেকে পিতাপুত্রের কথা শুনছে। তবে তার সব শটই আলাদা করে তোলা। সমস্যা হয়েছে বাবা আর ছেলের মুখের আলো নিয়ে। অনেক বেশি হয়ে গেছে। চ্যানেল থেকে ক্যাসেট ফেরত এসেছে। ক্যাসেটে গোলমাল থাকা কোনো ব্যাপার নেই। ডিভিসি প্রো ক্যাসেট। বিটা ক্যাম হলেও একটা কথা ছিল। ডিভিসি প্রো-তে চট করে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। ক্যামেরার রণজয়কে ডেকে কথা বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, গোলমালটা সেই করেছে। হাজারের জায়গায়, দেড় বা দু-হাজার পর্যন্ত আলো দিয়ে ফেলেছিল শ্যুট করার সময়। রণজয় কথাটা মানতে রাজি নয়। সে বলছে, ঘটনার জন্য দায়ী মলয়। এডিটিং করার সময় সে ঝামেলা পাকিয়েছে। কালার সেট করতে পারেনি। মলয় এই যুক্তি মানতে রাজি নয়। সে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়।

'বাজে কথা বলবেন না রণজয়বাবু। আমার কাজে কোনো ভুল হয়নি।'

রণজয় রেগে বলল, 'ভুল না হলে এটা হল কী করে? আপনি ক্যাসেট ছাড়লেনই বা কেন?'

মলয় বলল, 'ক্যাসেট ছাড়ার দায়িত্ব আমার নয়। আপনারা যেমন কাজ করে আনবেন, তেমন ছাড়ব।'

'অবশ্যই নয়, মেশিনের সমস্যাও আমার দেখার কথা নয়। রাশ এনে ফেলে দিয়েছি, এবার আপনি বুঝবেন।'

মলয় তাচ্ছিল্যের হেসে বলে, 'এটাই তো মুশকিল। কাজ করছেন যন্ত্রপাতি নিয়ে, অথচ যন্ত্রপাতির কিছুই জানেন না। এখানে অক্টোপাস মেশিনে কাজ হয়। শুধু অক্টোপাস নয়, অক্টোপাস জিরো এইট।'

রণজয় ঝাঁঝিয়ে উঠে বলে, 'তাহলে মেশিনই তো আপনাকে ছবির ক্ল্যারিটি ইন্ডিকেট করেছিল। তখন কী করছিলেন? ঘুমোচ্ছিলেন?'

'মুখ সামলে কথা বলবেন।'

'কেন বলব?'

বাকিরা ঝগড়া থামাতে চেষ্টা করে। তার মাঝখানেই ক্যামেরাম্যান গজগজ করতে থাকে, 'সোমনাথদা থাকলে এসব হত না। যত সব আলটপকা লোকজন এনে বসানো হয়েছে।'

কথাটা সত্যি। সোমনাথ থাকলে টেকনিক্যাল ভুল হওয়া মুশকিল। শুধু টেকনিক্যাল নয়, শর্ট অ্যাঙ্গেলে গোলমাল হলেও সে বলে দেয়। অন্তত

boierpathshala.blogspot.com

এপিসোড ডিরেক্টরকে জিজ্ঞেস তো করে। এই কারণে সকলে তার ওপর নির্ভরও করে থাকে। এডিট শ্যুটে সোমনাথ বসেছে তো? ব্যস, ঠিক আছে। কিন্তু দু-দিন হল কমল মল্লিক তাকে এইসব কাজ থেকে সরিয়ে নিয়েছে। অফিসে এসে বস্‌এর ঘরে বসে মিটিং করা ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই। জিজ্ঞেস করলে কিছু বলে না। মিটিমিটি হাসে। সকলেই বুঝতে পারছে, বড়ো ধরনের কোনো প্রোগ্রামের পরিকল্পনা হচ্ছে। কানাঘুষোয় শোনা গেছে, প্রবাসী এক মহিলা নাকি সেই প্রোগ্রামের স্লিপিং পার্টনার। বাইরে থেকে টাকা সে-ই ঢালছে। মহিলার নাম প্রীতি শর্মা। তবে খবর কেউ কনফার্ম করতে পারেনি। না পারলেও ক্ষতি নেই। কম্পানিতে টাকা এলেই হল।

এইরকম ঝগড়াঝাঁটির সময়ে কথাকলির মোবাইলে ফোন আসে। ফোন তুলে শিবুর মায়ের গলা পেয়ে চমকে ওঠে কথাকলি। বাইরের বুথ থেকে ফোন করছে। এ-কাজ মহিলা আগেও করেছে। বাইরে গেলে ফোন করে রান্নার মেনু, দোকানবাজারের কথা জানতে চেয়েছে। তবে ওই বাড়ি ছেড়ে চলে আসার পরে কখনও করেনি। তাহলে! কথাকলির বুকটা ধড়াস করে ওঠে। ব্রতীনের কিছু হয়েছে?

'কী হল?' এডিট রুম থেকে বেরোতে বেরোতে চাপা গলায় বলে কথাকলি।

'বউদি, দাদাবাবুর অসুখ।'

'অসুখ! কী অসুখ?'

'জ্বর হয়েছে। তিনদিন হল, খাটে পড়ে আছে।'

'খাটে পড়ে আছে মানে! কী বলছ যা-তা? ডাক্তার দেখায়নি!'

যতটা প্রয়োজন তার থেকে অনেক বেশি চিৎকার করে শিবুর মা বলল, 'কথা শোনে না বউদি। আকাশপাতাল জ্বর নিয়ে শুয়ে থাকে। খেতে চায় না। কিছু বললে বকাঝকা লাগায়। দাদাবাবুর শরীরটা খুব খারাপ বউদি।'

থমকে গেল কথাকলি। সে চলে আসার পর ব্রতীনের শরীর নিশ্চয় এই প্রথম খারাপ হচ্ছে না। শিবুর মা কখনও যোগাযোগ করেনি। কেউই করেনি। আজ হঠাৎ করছে কেন? ব্রতীনই কি বলেছে? জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থমকে গেল কথাকলি। শিবুর মা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আপনে একবার আসেন বউদি।'

'এখন জ্বর কত?'

'জানি না। দাদাবাবুও জ্বর দেখে না। চাদর মুড়ি দিয়ে শুধু শুয়ে থাকে। এই

boierpathshala.blogspot.com

তো সকালে কাচাকুচি সেরে বেরোতে গিয়ে দেখি শুয়ে আছে। আমায় বললে, শিবুর মা তুমি দরজাটা টেনে দিয়ে যাও। নেমে এসে যে নিজে দরজাটা দেবে সে শক্তিও নাই। আপনে আসেন একবার।'

কথাকলির অস্বস্তি হচ্ছে। কী বলবে বুঝতে পারছে না। ফিসফিস করে বলল, 'ঠিক আছে আমি দেখছি।'

সেই 'দেখতে' গিয়েই অফিসফেরত এখানে চলে এসেছে কথাকলি। এসে বুঝছে, শিবুর মা যতটা বলেছে ঘটনা ততটা নয়। ব্রতীন অসুস্থ ঠিকই, কিন্তু বাড়াবাড়ি কিছু মনে হচ্ছে না। সবথেকে বড়ো কথা, ব্রতীনের বিস্ময় দেখে একটা জিনিস অন্তত পরিষ্কার, অসুখের খবর সে নিজে দিতে বলেনি। নিস্পৃহ, অলস এই মানুষটা আর যা-ই হোক নিজেকে লুকোতে পারে না। কথাকলি খানিকটা স্বস্তি পেল।

রান্নাঘরে ঢুকতেই শিবুর মা একগাল হেসে বলল, 'দেখলেন তো বউদি, আপনি আসতেই দাদাবাবু কেমন উঠে পড়ল?'

ধমক দিতে গিয়েও থমকে গেল কথাকলি। বেচারির কী দোষ? বহুদিন পর আবার এখানে তার আসা-যাওয়াই তাকে উৎসাহিত করেছে। এইসব গরিব, অশিক্ষিত, সহজ সরল মানুষ জীবনের জটিলতা বুঝতে পারে না। স্ত্রী-র জীবন যে শুধু নার্স বা যৌন পুতুলের নয়, সেটা বোঝার মতো ক্ষমতা বা বিশ্বাস এদের নেই। থাকার কথাও নয়। বহুদিন পরে 'বউদি'র এ-বাড়িতে আসাও তাকে ভুল সিগন্যাল দিয়েছে। ভেবেছে, এটাই শুরু। এরপর পাকাপাকি চলে আসবে কথাকলি। সেটা যে ঠিক নয় এ বোঝার বুদ্ধি তার নেই। থাকার দরকারও নেই। এটা তো ঠিকই সে ব্রতীনের ভালোর জন্যই কথাকলিকে ফোন করেছিল।

কথাকলি গ্যাসে চাটু বসাতে বসাতে বলল, 'আমি আসার জন্য তোমার দাদাবাবু উঠে বসেনি, তার জ্বর এমনিই কমে গেছে।'

'রাখো তো বউদি, অসুখবিসুখ হলে মেয়েমানুষের সেবাযত্ন লাগে।'

কথাকলি মুচকি হেসে বলল, 'কেন? মেয়েমানুষ ডাক্তার নাকি?'

শিবুর মা চোখ বড়ো করে বলল, 'ওমা ডাক্তার তো বটেই। ব্যাটাছেলের ডাক্তার।'

কথাকলি দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বলল, 'না গো শিবুর মা, সব অসুখ সে সারাতে পারে না।'

'রাখো দেকি তোমাদের বিদ্দে ফলানি। মিলেমিশে থাকার সময় অমন ঠোকাঠুকি হয়। থালা-বাসনেই হয় তো মানুষে মানুষে।'

boierpathshala.blogspot.com

চাটুর ওপর পাঁউরুটি বসিয়ে, প্রেশারে ডিম-আলু সিদ্ধর ব্যবস্থা করতে লাগল কথাকলি। করতে করতে সামান্য হেসে বলল, 'আর যদি ঠোকাঠুকি না হয়? তাহলেও কি থালা-বাসন একসঙ্গে থাকতে পারে?'

'কী যে বল বাপু, তোমাদের কথা কিছু বুঝি না।'

'বুঝে কাজ নেই। তবে সামান্য জ্বরজারিতে এভাবে আর কখনও ডেকে পাঠিও না শিবুর মা। আমার কোনো অসুবিধে নেই। তোমার দাদাবাবুই অস্বস্তিতে পড়ে।'

শিবুর মা তাকিয়ে থাকে ফ্যালফ্যাল করে।

স্যান্ডইচের প্লেট নিয়ে কথাকলি যখন ড্রইংরুমে এল, হালকা একটা চাদর গায়ে গুড়িসুড়ি মেরে বসে আছে ব্রতীন। অগোছালো টেবিলের বইপত্র সরিয়ে প্লেট নামিয়ে রাখল কথাকলি।

'নাও খেয়ে নাও। শিবুর মা চা দিচ্ছে।'

'তুমি কিছু খাবে না? অফিস থেকে আসছ মনে হচ্ছে।'

'খাব। চা খাব। তোমার কি আবার জ্বর আসছে? শীত করছে?'

ব্রতীন লজ্জা পাওয়া গলায় বলল, 'আরে না না। যাতে না আসে তার জন্য চাদরটা নিয়েছি।'

কথা শেষ করে চাদরটা গা থেকে সরাতে যায় ব্রতীন। কথাকলি বারণ করে।

'থাক। ফ্যান চলছে।'

'সরি কথাকলি।'

'কী কারণে? নাও খাও।'

স্যান্ডইচে বেশি কিছু নেই। ডিম আলুর সঙ্গে একটু মরিচ। ব্রতীনের একসময় এই খাবার খুব প্রিয় ছিল। এখনও কি প্রিয়? একটা তুলে কামড় দিল।

'ইস্, তুমি যে কী ঝামেলায় পড়লে কথা।'

কথাকলি শান্ত গলায় বলল, 'তা একটু পড়লাম।'

'কে খবর দিল? শিবুর মা নিশ্চয়?'

'ওসব থাক। ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন?'

মলিন হেসে ব্রতীন বলল, 'দুর সামান্য ঠান্ডা লেগে জ্বর। এর জন্য ডাক্তার কী করবে?'

কথাকলি নীচু গলায় বলল, 'তাহলেও একা থাকো। শরীরে বড়ো সমস্যা হলে তো ঝামেলায় নিজেই পড়বে।'

boierpathshala.blogspot.com

ব্রতীন খানিকটা সহজ হয়েছে। বলল, 'চমৎকার হয়েছে স্যান্ডউইচ। তুমি একটা খেলে পারতে।'

'আজই একবার বেরিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে নাও। নাকি বাবাকে জিজ্ঞেস করে ওষুধ বলে দেব?'

'ছি ছি, কী যে বল না কথা। স্যারকে দিয়ে সর্দি-জ্বরের ট্রিটমেন্ট করাবে?'

জোরে হেসে উঠল ব্রতীন। শিবুর মা চা রেখে ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় কথাকলিকে কিছু বলেও গেল না। কথাকলি জানে কেন বলল না। মহিলার মুখ থমথম করছে। নিশ্চয় আর কখনও না ডাকার কথা শুনে রাগ করেছে। করুক। সত্যিটা সবারই জেনে রাখা ভালো। খানিকক্ষণ চুপ করে চা খাওয়ার পর ব্রতীন বলল, 'জানো কথা, আজ একটা মজা হয়েছে।'

কথাকলি চোখ তুলল।

ব্রতীন হাসি হাসিমুখে বলল, 'তুমি আসার আগে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম।'

কথাকলি চাপা গলায় বলল, 'তুমি কি স্বপ্ন-টপ্ন নিয়েও ভাবনাচিন্তা শুরু করছ। ভালোই করেছ। একটা কিছু নিয়ে থাকা ভালো।'

'না না তা নয়।' সংকুচিত হয়ে বলল ব্রতীন।

কথাকলির মনে হল, খোঁচা দেওয়াটা ঠিক হল না। যতই হোক অসুস্থ। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'কী স্বপ্ন দেখলে?'

'না থাক। তেমন কিছু নয়।'

চা শেষ করে কাপ নামিয়ে রাখল কথাকলি।

'আমার এখানে বারবার আসাটা ঠিক হচ্ছে না ব্রতীন। ভুল ধারণা তৈরি হচ্ছে।'

ব্রতীন খানিকটা অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকাল।

'ভুল ধারণা! কী ভুল ধারণা?'

একটু হাসল কথাকলি। বলল, 'মনে হচ্ছে, আমি বোধহয় এবার পাকাপাকি থেকে যাব।'

ব্রতীন কিছু বলল না। শুধু তাকিয়ে রইল। কথাকলি বলল, 'আজ শিবুর মায়ের মনে হচ্ছে, এরপর...।'

মাথা নামাল ব্রতীন। কথাকলি ফিসফিস করে বলল, 'আমারই ভুল হচ্ছে।'

মাথা নামানো অবস্থাতেই ব্রতীন বলল, 'আজ এসব কথা না বললেই নয়?'

boierpathshala.blogspot.com

ব্যাগ হাতে কথাকলি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিকই। আবার জ্বর এলে ডাক্তার দেখানোটাই মনে হয় উচিত কাজ হবে।'

ব্রতীনও উঠে দাঁড়াল। প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য বলল, 'স্যার কেমন আছেন?'

কথাকলি দরজার সামনে গিয়ে সহজ হওয়ার চেষ্টায় বলল, 'এখন পর্যন্ত ভালো আছেন, কিন্তু কতদিন থাকবেন বুঝতে পারছি না।'

'সে কী! কী হল আবার?'

'এই অসুস্থ শরীর নিয়ে উনি আবার বাইরে যাওয়ার প্ল্যান করেছেন।'

'কোথায়? আবার সেই বানেরহাটের ক্লিনিকে?'

জুতো পায়ে গলিয়ে কথাকলি দরজা খুলল। মুখ ফিরিয়ে হেসে বলল, 'না, বানেরহাট নয়। এবার ওনার ট্যুর ঝিলডাঙা নামে কোন এক অজ গ্রামে।'

'ঝিলডাঙা!'

'হ্যাঁ, সেখানে উনি ওনার এক পেশেন্ট খুঁজে পেয়েছেন। পিঁপড়ে পেশেন্ট।'

ব্রতীন অবাক হয়ে বলল, 'পিঁপড়ে পেশেন্ট! সেটা কী?'

দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই কথাকলি হেসে বলল, 'বাঃ, তুমি পিঁপড়ের বই দিলে মনে নেই? তবে ব্যাপারটা ঠিক কী আমি এখনও জানি না। ভাবছি, বাবার সঙ্গে গেলে কেমন হয়। জুরো পেশেন্ট দেখে গেলাম, এবার পিঁপড়ে পেশেন্ট দেখে আসব।'

কথা শেষ করে আবার হাসল কথাকলি।

কথাকলি চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল ব্রতীন। কথাকলিকে সে মিথ্যে কথা বলেছে। তার আবার শীত শীত করছে। এর অর্থ জ্বর আসছে। চোখ বুজল ব্রতীন। ছেড়ে আসা স্বপ্ন কি আবার ফিরে আসবে? নাকি সেটা স্বপ্ন নয়, কথাকলির আজ আসাটাই স্বপ্ন? তাহলে কোনটা ফিরবে? সত্যিটা না স্বপ্ন? চাদর চাপা অবস্থাতেই কাঁপুনি দিল শরীরে। জ্বর আসছে।

গভীর রাতে প্রবল জ্বরের ঘোরে আবার স্বপ্ন দেখল ব্রতীন। সেই স্বপ্নে কথাকলি এবং পাহাড় দুজনেই ফিরে এল। এমনকি সে নিজেও! তবে মানুষ হিসেবে নয়। ফিরে এল পিঁপড়ে হয়ে।

দুটি পিঁপড়ে পাহাড় ভেঙে উঠছে। নিঃশব্দে। দুজনেই পাশাপাশি, তবু দুজনেই একা।

boierpathshala.blogspot.com

পঁয়তাল্লিশ

ঠিক ছিল, ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়েই ঝিলডাঙা থেকে ফিরে আসবেন মানা সরকার। কিন্তু ঘটনা ঘটল অন্যরকম। প্রায় গোটা দিনই তাঁকে থাকতে হল। কাদুর অনুরোধে সন্ধের মুখে মুখে এক শোকসভাতে উপস্থিত হলেন। 'শহিদ বেদি'তে মালা দিলেন। ভাষণও দিতে হয়েছে। শোকসভা খুন-হওয়া-মাস্টার চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়ার স্মরণে। ভাষণ দেওয়ার সময় মানা সরকার একটা মারাত্মক কাণ্ড করে বসলেন। তিনি দুম করে একটা ঘোষণা করে বসলেন।

দুপুরে খাওয়ার পর বাইরে ঝাপসা শিরিষ গাছের তলায় মোহন চেয়ার পেতে দিয়েছিল।

মানা সরকার সেখানে বসেননি। তিনি বসেছিলেন ঘরে। মেঝেতে পাতা গদির ওপর। কাদু সেরকমই চাইছিল। ইচ্ছে করেই সরাসরি বলেনি। ঘরে আসার পর নেতার পিঠের কাছে তাকিয়া এগিয়ে কাদু বলল, ´বসেন দাদা। আরাম করে বসেন। খাবার ঠিক চিল তো দাদা?'

মানা খুশি মনে চোখ পাকালেন, 'এই কাণ্ড করবে জানলে তো আসতামই না কাদু। এমনটা তো কথা ছিল না হে।'

কাদু গদগদ গলায় বলে, 'কী আর কাণ্ড করেচি।'

'একে বলছ কী করেছি! এ তো রাক্ষসের আয়োজন।'

কাদু মনে মনে বলল, শালা, তুমি তো রাক্ষসই। শুধু তো ভাত মাংস খাও না, মানুষও গেল। সামনে হাত কচলে 'হেঁ হেঁ' করল। আড়চোখে দেখল, আধশোয়া অবস্থাতেই মানার চোখ এদিক-ওদিক ঘুরছে। মনে মনে হাসে সে। হারামজাদার তর সইছে না। ঝোঝাই যাচ্ছে, ওই চোখ শান্তিকে খুঁজছে। এতক্ষণ

boierpathshala.blogspot.com

দূর থেকে দেখেছে, এবার কাছ থেকে দেখবে। দেখবে, দেখবে বাছাধন, দূর, কাছ সব দেখবে, কিন্তু তার আগে কিছু কথা অন্তত ফাইনাল হয়ে যাক। তুমি রাজি হয়ে যাও সোনার চাঁদ। তারপর ওই মেয়েকে এনে একেবারে কোলের ওপর বসিয়ে দেব। বসিয়ে বাকিটুকুও আদায় করে নেব। টাকা দিয়েছি, খাওয়া দিয়েছি, এবার মেয়েছেলেও দেব। কিন্তু কাজ তো হওয়া চাই।

কাদু বসেছে মানা সরকারের পায়ের কাছে। একটা পা তুলে টিপতেও শুরু করেছে। হাত তুলে মানা বাধা দিতে গিয়েছিল।

'আরে করো কী? করো কী?'

কাদু গলে-যাওয়া-গলায় বলে, 'আপনি দাদা আমাদের অতিথি। এতটা পথ কষ্ট করে এসেচেন। ঠিকমতো সেবাযত্ন না করলে হবে কী করে?'

'না হে বাপু, এসব আমাদের অভ্যেস নেই। রাজনীতি করি, গ্রামে গঞ্জে তো আমাদের কম ঘুরতে হয় না।'

কাদু পা টিপতে টিপতেই সাদা চকচকে দাঁতে হাসে। বলে, 'অব্যেস নেই তো কী হয়েচে? অব্যেস হয়ে যাবে।'

ঝিলডাঙা গ্রামে বসে কাদু কারও পা টিপছে ভাবা যায় না। কিন্তু এখন কোন অসুবিধে নেই। এখানে এ-দৃশ্য দেখার মতো ধারেকাছে কেউ নেই। ঘরের ঠিক বাইরে মোহন পাহারায় আছে। রাস্তায় আছে শোল। মানা সরকারের গাড়ি রাখা আছে অনেক দূরে, খালের ওপাশে। এই পথটুকু মোটরবাইকে চেপে যাতায়াতের ব্যবস্থা।

কাদু পা টিপতে টিপতেই বলল, 'দাদা, একটা পান খাবেন নাকি? শান্তি ভারি সুন্দর পান সাজে।'

মানা সরকার নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'আমার কোনো কিছুর নেশা নেই। পান, সিগারেট, মদ নাথিং। কিন্তু আজ একটু ছাড় দেওয়া যেতে পারে, কী বল? তোমার ওই মেয়ের রান্নার হাত ভালো। এবার দেখি পানের হাত কেমন।'

কাদু ঘাড় কাত করে বোকামুখে বলে, 'ভালো দাদা, পানের হাতও ভালো।' তারপর ভেতরের দরজার দিকে ফিরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'শান্তি, দাদার জন্য একটা পান দে দেখি।'

আগে থেকেই মেয়েটাকে শেখানো আছে। এটাই হবে সিগন্যাল। 'পান দে' বললেই সে রেডি হবে।

মানা সরকারের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসে কাদু। বলে, 'দাদা, অফিসবাড়ি কেমন দেখচেন?'

boierpathshala.blogspot.com

মানা সরকার মুখ তুলে ঘর দেখলেন। বললেন, 'ঘরদোর ভাঙাভুঙো হলে কী হবে, জায়গা তো অনেকটা। বাগানের জমিও কম নয় দেখলাম। পুকুরও আছে। বাড়ির মালিক কলকাতায় থাকে?'

কাদু লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল, 'থাকত? এখন থাকে না। বাড়িটা আমি কিনে নিয়েচি দাদা।'

মানা সরকার সোজা হয়ে বসেন। ধুতির কোঁচা ঠিক করেন। তাকিয়া টানে কোলের ওপর। নাকের-ওপর-নেমে-আসা চশমা তুলতে তুলতে বলেন, 'বল কী হে কাদু, এত বড়ো বাড়ি তুমি কিনে নিলে?'

কাদু আরও লজ্জার ভান করে। বলল, 'হ্যাঁ, দাদা। চৌধুরি সাহেব কলকাতা থেকে লোক পাঠিয়েচিলেন। তারা দাঁড়িয়ে থেকে পাকা কাজ করে গেচেন। তারপর সদরে রেজিটিরি আপিসে গিয়ে সইসাবুদ করে কাগজপত্র নিয়ে এলাম। দাঁড়ান দাদা, কাগজ দেখাই।' কথা শেষ করেই দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাঁক দিল, 'মোহন, অ্যাই মোহন, ফাইলটা দে।'

মানা হাত তুলে বললেন, 'আরে না না, আমি কি কাগজপত্র দেখতে চেয়েছি নাকি? তুমি বলছ এই যথেষ্ট।'

'না দাদা, তা হয় না, আপনাকে পাকা জিনিস না দেখালে মনে শান্তি পাব না।'

কথা বলতে বলতেই বারবার ভেতরের দরজার দিকে তাকাচ্ছেন মানা সরকার। কাদু মনে মনে হাসল। লোকটা আরও ছটফট করুক। যত ছটফট করবে, তত মজা জমবে।

'কত দিয়ে কিনলে হে কাদু?'

'দাদা, ভূতের বাড়ির আর দাম হবে? তবু আমি চাট্টি বেশিই দিলাম। সারিয়ে সুরিয়ে নিতেও খরচা আছে।'

মানা সরকার তাকিয়ায় ফের হেলান দিলেন। বললেন, 'তা তো হবেই । খরচা হবে না? কিন্তু এই হদ্দ গাঁয়ের মধ্যে বাড়ি কিনে করবেটা কী? তাও গাঁয়ের ভেতরে হলে কথা ছিল। এ তো দেখি খানিকটা বাইরে। একটা ঘরে না হয় তোমার ওই রাইসমিল না কীসের যেন অফিস হল, কিন্তু বাকিটা? বাকিটা নিয়ে কী হবে?'

মোহন ফাইল দিয়ে গেছে। হলুদ সস্তার ফাইল। কাদু দড়ি খুলে গাদাখানেক কাগজপত্র এগিয়ে ধরল। মানা সরকার হাত নাড়িয়ে সরিয়ে দিলেন। কাদু জানত এটাই হবে। মানা দেখবে না। দেখলে অসুবিধে ছিল। শকুনের চোখ। স্ট্যাম্প

boierpathshala.blogspot.com

পেপার থেকে শুরু করে টাকার রসিদ পর্যন্ত সবটাই যে জাল হারামজাদা ধরে ফেলত। আবার ফাইল-টাইল বানিয়ে কায়দা করে সামনে এনে না ধরলেও সমস্যা। ভাবত জোর করে দখল করেছে। মোহন ফাইল নিয়ে চলে যাওয়ার পর মানা সরকার নিজের সাদা পাঞ্জাবিতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'কই হে কাদু, তোমার পান গেল কই?'

কাদু বলল, 'আসচে দাদা, এখনই আসচে। বললাম না, মেয়েটার বয়স অল্প। একটা কথা যদি ঠিকমতো শোনে।' মুখ তুলে হাঁক দিল, 'আরে, দাদার পান গেল কই ?'

এটা হল দ্বিতীয় সিগন্যাল। হারামজাদি তৈরি হয়েছে তো?

মানা বললেন, 'হ্যাঁ, এবার কাজের কথা শুনি। এই জল-জঙ্গলের মধ্যে এত বড়ো বাড়ি নিয়ে তুমি করবেটা কী বললে না তো।'

কাদু খানিকটা সরে আসে। কোনো কারণ ছিল না, তবু পিছনে খোলা দরজার দিকে তাকায়। তারপর গলা নামিয়ে বলে, 'দাদা, একটা গানবাজনার জায়গা বানাতে চাই।'

'গানবাজনা!'

কাদু চকচকে চোখে তাকিয়ে আরও গলা নামায়। বলে, 'হ্যাঁ দাদা, গানবাজনা। আশেপাশে কয়েকমাইলের মধ্যে এ জিনিস নেই। খুব চলবে। পাঁড়াগাঁয়ের লোকের হাতে আজকাল পয়সা হয়েচে। একটু-আধটু ফুর্তিফার্তা পেতে বেচারিদের কত দূরেই না ছুটতে হয়। এটা কি ঠিক? আপনিই বলুন নিজের লোকজনকে যদি না দেখি তাহলে আর কাকে দেখব? খাটাখাটুনির পর একটু-আধটু গানবাজনা শুনলে মনও ভালো থাকে।'

মানা সরকার আবার সোজা হয়ে বসেছে। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে কাদুর দিকে। লোকটার মতলব কী? কী চায়?

'গান কে গাইবে?'

কাদু বিশ্রী ভঙ্গি করে 'খ্যাক খ্যাক' আওয়াজে হাসল। হারামজাদা প্রশ্ন করছে মানে কাজ হয়েছে। বলল, 'আমি নই দাদা।'

মানা নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'সে তো বুঝলাম।'

'শুধু গান নয়, ভেবেচি নাচেরও ব্যবস্থা করব। বাইরে থেকে আট্টিস আনব। অসুবিধে কী? ঠিকমতো পেমেন্ট দিলে কোনো অসুবিধে নেই। তবে গাঁয়ের মেয়েরাই ইসান্স পাবে আগে। আপনি তো জানেন দাদা, গাঁয়ের মেয়ে বউরা নাচগানে কত ভালো হয়। বেচারিরা সুয়োগ পায় না। আমি দেব। আমি

boierpathshala.blogspot.com

সুযোগ দেব। ঘরে বসে শুধু হেঁশেল না ঠেলে দুটো আয়ও হল, আবার ফুর্তি হল।'

কথা শেষ করে আবার 'খ্যা খ্যা' আওয়াজে হাসতে লাগল কাদু। এবার হাসির জোর বেশি।

মানা সরকার মুখের কাছে হাতের মুঠো তুলে দু-বার কাশলেন। পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল, গলা মুছলেন। মানুষটা কি সামান্য ঘাবড়েছে? হ্যাঁ, ঘাবড়েছে।

'দরজাটা বন্ধ করে কথা বললে হত না কাদু?'

কাদু যেন কথা শুনতে পেল না। মুখ নামিয়ে বলল, 'গাঁয়ের ভালো নাচগানের মেয়েদের শহরেও পাঠাতে পারি দাদা। সে-ব্যবস্থাও রাখব। এখানেই না হয় নেড়েঘেঁটে বাছাবুছি হল। শুনেছি বিহার, ইউ পি-তে নাচনি মেয়েছেলের খুব দর।'

মানা সরকার ঢোঁক গিললেন। ফিসফিস করে বললেন, 'মেয়েমানুষের বাজার বলছ?'

কাদু কানে হাত দিল। বলল, 'ছি ছি দাদা, বাজার কোথায়? সুযোগ বলুন দাদা, ইসান্স।' কথাটা বলে থামল কাদু। চোখ পিটপিট করে হাসল। গলা সামান্য বাড়িয়ে, জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, 'এখন তো দাদা বাজারেরই যুগ। যেদিকে তাকাবেন সেদিকেই বাজার। রকমারি সব বাজার। খোলা বাজার, ঢাকা বাজার, আস্ত বাজার, ভাঙা বাজার। কোনটা নেই? যেমনটি চাইবেন দাদা, যেটা পছন্দের। চোখের বাইরে যেমন আছে, তেমনি চোখের ভেতরেও বাজার। কেবল মাথাটা গলিয়ে ফুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ো। তারপর শুধু কেনো আর বেচো, বেচো আর কেনো। দুনিয়া দেখলে তাক লেগে যায়। মন হাঁকপাক করে দাদা। আহ্লাদে, আরামে বাঁচার পথ তো এখন ওই দুটোই। কেনা বেচা, বেচা কেনা। হ্যা হ্যা।'

এই পর্যন্ত বলে আবার বিরতি নিল কাদু। উত্তেজনায় চোখ দুটো চকচক করছে। কপালে বিড়বিড় করছে ঘাম। খানিকটা ঘোরের মধ্যেই চলে গেছে যেন।

'দাদা, খবর নিয়ে জেনেচি, এখন মেয়েমানুষের মার্কেট সবচেয়ে গরম। খরচা কম, আমদানি অনেক। খুচরো হ্যাপা সামলে একটা এদিক-ওদিক করতে পারলে মাল পিছু বিশ তিরিশ ঘরে তোলা কোনো ব্যাপার নয়। বচরে পাঁচটা কাজ করতে পারলেই ব্যস। পাড়াগাঁয়ে দাদা এই জিনিসের অভাব নেই। কপ্ করে ধরো আর ঝপ্ করে বেচো। একেবারে পুকুরের মাছের মতো। চকচকে

boierpathshala.blogspot.com

গা-গতর নিয়ে ওপর ওপর ভেসে বেড়ায়। ধরা দেওয়ার জন্য ভেসে বেড়ায়।'

হাতের মুঠো দেখিয়ে হাসতে লাগল কাদু। মানা স্থির চোখে বসে আছেন। মেয়েমানুষের এত দাম! রাজনীতি করতে গিয়ে অনেক কিছু জানা হয়েছে, টাকা আমদানির নানা ফন্দিফিকির। কই! এটা তো জানা ছিল না!

কাদু মানার হাঁটুতে হাত রাখল।

'দাদা, আপনি শুধু বলুন, সঙ্গে আছেন। আপনি সঙ্গে থাকলে থানা পুলিশ, পার্টি পলিটিক্সের হ্যাপা বলে কিচু থাকবে না। তা ছাড়া ভালো কাজে একজন বড়ো মানুষকে নিয়ে চলতে পারলে ভরসা জাগে। আপনি দাদা শুধু এই ভরসাটুকু দেবেন। বাকি সব লাফড়া আমি সালটে নেব। আমার লোক আচে। শুধু ঝিলডাঙা নয়, আশেপাশের দশটা গাঁয়ে আমার লোক আচে। তারাই জিনিস তুলে দেবে। এখানে এনে চেখেচুখে দেখা হবে। দরদাম হবে। ঝাড়াই বাছাই হবে। দাদা কাজ ঠিকমতো করতে পারলে অনেক লাভ। ভালো জিনিস পেলে সোজা মুম্বই হয়ে মিডল ইস্ট। ডলারে পেমেন্ট।'

কাদু হাত দিয়ে প্লেনের উড়ে যাওয়া দেখায়।

'কাদু, জানাজানি হবে না তো?'

কাদু পিঠ সোজা করে বসল। শালা টোপটা পুরোটাই গিলেছে। চোখের চকচকানি বলে দিচ্ছে।

'খেপেচেন দাদা? এ কী জানাজানির একটা জিনিস হল? ভূতের বাড়ি ভূতেরই থাকবে। একইরকম ভাঙাচোরা, দেয়ালের গায়ে বটগাছ। কেউ বুঝতেও পারবে না। ভেতরটা শুধু বদলে দেব। ও নিয়ে আপনি ভাববেন না।'

কথা শেষ করে কাদু মুখ বেঁকিয়ে হাসল। হারামজাদা টসকে গেছে। এবার একেবারে কুপোকাতের পালা।

'তবু...তা ছাড়া লোকজন তো লাগবে তোমার। ভাগাভাগি, কমিশন...।'

দাঁতে দাঁত ঘষে কাদু বলল, 'কমিশন নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনারটা হল গিয়ে ইসপেশাল। আপনাকে তো এদিকে ঘেঁষতেই হবে না দাদা। টাকা ঠিকমতো চলে যাবে।'

উত্তেজনায় নিজের থুতনিতে হাত বোলাতে লাগলেন মানা। ছোকরা যে এই ধরনের প্রস্তাব দেবে তিনি ভাবতেও পারেননি। এত টাকা!

কাদু এবার তার ফাইনাল সিগন্যাল পাঠাল। মুখ ঘুরিয়ে ডাক দিল, 'শান্তি, অ্যাই শান্তি, তোর পানের কী হল রে ছুঁড়ি। দেখিস বাবা, পানে আবার ঝাল মেরে দিসনি। হ্যা হ্যা।'

boierpathshala.blogspot.com

এই 'ঝাল' শব্দটাই হল ফাইনাল ইশারা। শান্তিকে আগে থেকে বলা আছে। শুধু ডাকাডাকিতে নয়, 'ঝাল' শুনলে তবে সে ঘরে আসবে।

কাদু তার হাসিমুখে বলল, 'দাদা, তাড়া নেই। কোনো তাড়া নেই। আপনি ভাবেন। এখানে বসে বিশ্রাম করতে করতে ভাবেন।'

ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল শান্তি। হাতে পানের সরঞ্জাম। কাদু তার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। বাহ্। মানা চোখ ফেরাতে পারলেন না।

চোখ না ফেরানোর মতোই কাণ্ড করেছে শান্তি। পোশাক উরুর একটু নীচ পর্যন্ত গিয়ে থমকে গেছে। জিনিস মাপে বড়ো হয়নি। আবার ছোটো হয়নি। এইটাই কাদু চেয়েছিল। বড়ো হলেও যেমন খেলতে অসুবিধে, ছোটো হলে তেমনি খেলাতে অসুবিধে। আসল ব্যাপার হল, ফিনফিনে জামার ভেতরে শান্তির ছিপছিপে শরীরটা দেখা যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু স্পষ্ট নয়। অস্পষ্ট, আবছা। দেখা যাচ্ছে, আবার দেখা যাচ্ছেও না। মনে হচ্ছে, মেয়েটার বুক, পেট, নাভি যেন কুয়াশা মাখা। ধোঁয়া ধোঁয়া। দোকানি প্যাকেট করার সময়েই চোখ টিপে বলেছিল, 'নিয়ে যান, রাতেরবেলায় গিন্নিকে পরালে মজা আছে।'

সত্যি মজা আছে। মানা হারামজাদা শান্তির গা থেকে এই কুয়াশা সরাতে চাইবে এটাই মজা।

কাদু আগে কখনও শান্তির পা দেখেনি এরকম নয়। অনেকবারই দেখেছে। কিন্তু আজ এই প্রথম বুঝতে পারছে, হারামজাদির পায়ে যত্ন আছে। কে জানে হয়তো আজকের জন্য বেশি করে নিয়েছে। উরু, হাঁটু, পায়ের গোছা চকচকা লাগে। বেশি করে তেল জল লাগিয়েছে। বিশেষ করে পায়ের পাতা দুটো। কে বলবে, এই পা গরিব মানুষের ফাটাফুটি পা? মাঠেঘাটে, আলপথে হাঁটে? বারবার হোঁচট খায়? নখে নেলপলিশও দিয়েছে। রং চড়া। ফলে কালোকুলো চকচকা পায়ে একটা ঝিম মারা আদিম ভাব এসেছে। হয়তো রং চড়া না হলে এটা হত না। কাদু মনে মনে তারিফ করল শান্তির। সে ঠিকই ভেবেছিল। এই মেয়েকে দিয়ে অনেক বড়ো কাজ হবে। এসবের ওপর শান্তি আজ তার চুল রেখেছে খুলে। লম্বা সেই চুল বাঁ-দিকের কাঁধের পাশ দিয়ে এসে বুকের ওপর পড়ে আছে। ভাবটা এমন সবটা না পারি অন্তত কিছুটা লজ্জা তো ঢেকেছি। কাদু খুশি। খুবই খুশি। 'তুরুপের তাস'টি যে তার এমন খোলতাই হবে সে নিজেও ভাবতে পারেনি। আড়চোখে দেখল, মানা সরকার হাঁ হয়ে আছে। চোখ রাখতে পারছে না, আবার সরাতেও পারছে না।

শান্তি মানার পাশে উবু হয়ে বসল। পানের সরঞ্জাম ফরাশের ওপর রেখে

boierpathshala.blogspot.com

কাঁধের চুল সরিয়ে দিল পিঠে। তার গোলাপি জামা পিছলে উঠে এল উরুর ওপর। চুলে-ঢেকে-রাখা শ্যামলা বুকের খানিকটা ছলকে পড়ল সামনে। কাদুর শরীরে শিরশিরানি দিল। ফ্যাকাশে পাউডার-মাখা-মুখে ঘাড় কাত করে শান্তি বলল, 'কাদুদা, পান সাজি?'

কাদু উঠে দাঁড়াল। ইঙ্গিতের হাসি হেসে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দে, সেজে দে। দাদা, যেমন বলবে তেমনভাবে সেজে দে। নিন দাদা, আপনি বলে বলে দিন। চিন্তা করবেন না, শান্তি মেয়ে ভালো। ওর হাত ভালো। রান্নার হাত, পানের হাত সব হাতই ভালো...নিন দাদা, আরাম করে বসুন। বিশ্রাম নেন। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম ভালো। আপনার খাটাখাটনি তো কম নয়। অ্যাই শান্তি হাঁ করে দেখচিস কী? তাকিয়াটা ঠিক করে দিতে পারিস না।'

মানা সরকার কিছু বলতে গেলেন। সম্ভবত বারণ করতে। করা হল না। শান্তি ঝুঁকে পড়ে নিজের শরীরের ছোঁয়া গায়ে লাগিয়ে এবং না লাগিয়ে তাকিয়া এগিয়ে দিল। এই খেলা সে খুব ভালোই জানে।

কাদু হাত কচলে বলল, 'যদি অনুমতি দেন, আমি একটু বাইরে বসে কাজকর্ম সারি দাদা। বড়ো প্রজেক্ট। হিসেবপত্র অনেক।' তারপর শান্তির দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, 'বিশ্রাম হলে আপনি একটা হাঁক দেবেন। তখন এসে না হয় জেনে নেব, আপনি সঙ্গে আছেন কিনা।'

মানা সরকার এখন আর শান্তির থেকে মুখ ফেরাতে পারছেন না। সেই অবস্থায় ফিসফিস করে বলল, 'আছি, সঙ্গে আছি...।'

কাদু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল নিশ্চিন্ত পায়ে। তার আর তাড়া নেই। কাজ হয়ে গেছে। শুধু মেয়েছেলে কেনাবেচার ব্যবসা নয়, পাঁচটা গাঁয়ের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মানা সরকার খুব ধীরে ধীরে চলে আসবে হাতের মুঠোয়। শুধু টাকা নয়, ভয় থাকবে হারামজাদার। তখন কাদু রবার বলের মতো কখনও আঙুলের চাপে তাকে চুপসোবে, কখনও ফোলাবে। তারপর? তারপর সময় হলে পাছায় লাথি দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে এঁদো পুকুরে। কাদু মনে মনে নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ালো। বলল, 'সাবাস কাদু। কিন্তু এখনই তোমার খুশি হওয়ার মতো সময় আসেনি হে। তোমার লক্ষ্য বড়ো। অনেক বড়ো। সামনের ইলেকশনে তোমাকে টিকিট পেতে হবে। জিততে হবে। গলায় ফুলের মালা নিয়ে হাতজোড় করে ঘুরতে হবে গাঁয়ে। সময় কম, খুবই কম। এই সময়ের মধ্যে তোমায় যেমন নরম হতে হবে, তেমন কঠিনও হতে হবে। মাথা ঠান্ডা রাখ হারামজাদা। মাথা খুব ঠান্ডা রাখ।'

boierpathshala.blogspot.com

বাইরে থেকে ঘরের দরজা টানতে টানতে কাদু নিজের মনে হাসল। এই হাসি মানুষের নয়।

ঘরের ভেতর তখন ফিসফিসানি শুরু হয়েছে।

'একটু চুন দিই দাদা?'

'দাও, অল্প দাও। তোমার নাম কী?'

'ওমা মানুষটা বলে কী গা! নাম তো জানেনই। শান্তি। হি হি।

'ও হ্যাঁ শান্তি। শান্তি তোমায় ভারি সুন্দর দেখতে।'

'হি হি। সুন্দরের কী দেখলেন? দাদা, খয়ের দেব? মুখ কিন্তু লাল হবে।'

'থাক তাহলে।'

'সুপারি দেব না? দিই কয়েক কুচি...অ্যাই কী করেন...কাতাকুতু লাগে।'

'ঠিক আছে, সরে এসো।'

'ইস মাগো...লজ্জা করে...এদিকে না..। দাঁড়ান পানটা সাজি।'

'সাজো। বোতাম কোনদিকে শান্তি?'

'বোতাম নেই দাদা...ফিতা..পিঠের কাছে ফিতা ইসিস্টেম...কোমরে না...পিঠে...মাইরি, ওখানে হাত দেন কেন...হি হি।'

'কই ফিতে? পাই না তো, বলো কই? তাড়াতাড়ি বলো শান্তি। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি।'

'কাদুদা এমন জিনিস আনছে না...এই তো ফিতা, নেন ধরেন...এসব শহরের জিনিসের কায়দাকানুন কি আমরা জানি?'

'এবার?'

'বোকা মানুষ, এবার কী জানে না। নেন টান মারেন...আস্তে টানেন ...গিঁট পড়লে আর এক কিত্তি হবে...আমাদের বাবা শাড়িই ভালো...টান মেরে...অ্যাই লজ্জা করে...হাত সরান...সরে আসেন...হাঁ করেন পানটা মুখে দিই।নিন আসেন, কাছে সরে আসেন।'

বন্ধ দরজা থেকে কান সরায় কাদু। মুখ ঘুরিয়ে মোহনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বিকেলে একটা শোকসভা হবে। একেবারে গ্রামের মাঝখানে, বাজারে।'

'শোকসভা! কার শোকসভা গুরু?'

'তোর শুয়ার। কার আবার খুঁটিয়া মাস্টারের শোকসভা। হাতে সময় কম, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর। শোকসভার প্রধান বক্তা মানা সরকার।'

মোহন অবাক হয়ে বলল, 'সে কী উনি তো চলে যাবেন।'

'না যাবে না। একটা শহিদ বেদি লাগবে। মালা লাগবে। ভালো হবে না?'

boierpathshala.blogspot.com

মোহন কিছু না বুঝেই মাথা নাড়ল। বলল, 'হ্যাঁ, ভালো হবে।'

শেষ দুপুরে ঝিলডাঙার বাতাস ঘন এবং ভারী হয়ে এসেছে। গাছের পাতা স্থির। মনে হচ্ছে, বিকেলের পর এদিকে ঝড়বৃষ্টি হলেও হতে পারে।

বাইরের আকাশে ঝড় হল না, ঝড় হল ভেতরে। সেই ঝড়ের পুরোটা আঁচ না করতে পারলেও ঝিলডাঙার মানুষ কিছুটা তো পারলই।

হঠাৎ-ডাকা-সভা কলেবরে যতটা বড়ো হওয়ার কথা, তার থেকে অনেক বেশি বড়ো হয়েছে। যারা গ্রামে ছিল তারা প্রায় সকলেই উপস্থিত। কারণ অনেকগুলো।

প্রধান কারণ হল, ঝিলডাঙার মানুষ অনেকরকম সভা দেখেছে, শোকসভা কখনও দেখেনি। তা ছাড়া সভা হচ্ছে খুঁটিয়া মাস্টারের নামে। খুঁটিয়া মাস্টারকে এখনও এখানকার মানুষ ভুলতে পারেনি। কাটাখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাড়িটা যাতায়াতের পথে চোখে পড়লে বুকটা খাঁ খাঁ করে ওঠে। শূন্য বাড়ি পড়ে আছে। পাশে আধখানা শেষ হওয়া পাকা বাথরুম। স্কুল বন্ধ। না বন্ধ হয়ে উপায় কী? মাস্টার নেই যে। শোনা যাচ্ছে, সরকারে নতুন লোকের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু কেউ আসতে রাজি নয়। এমনকি আশেপাশের গ্রামের কয়েকজনকেও বলা হয়েছিল। তারাও উৎসাহ দেখায়নি। কেনই-বা রাজি হবে? যেখানে ছেলে-মেয়েদের পাকা বাথরুম বানাতে গিয়ে মাস্টারকে খুন হতে হয়, সেখানে কে পড়াতে আসবে? তাও মাত্র ক-টা টাকার জন্য। এই শোকসভার প্রতি ঝিলডাঙার গ্রামবাসীর আরও একটা কৌতূহলের কারণ হল, সভায় বলতে এসেছেন মানা সরকার। মানা সরকারের নাম তেমন করে কেউ না জানলেও 'বাইরের থেকে আসা বড় নেতা' এই পরিচয়ে আগ্রহ হয়েছে খানিকটা। এত বড়ো একজন নেতা হঠাৎ এলেন কেন!

তবে সভায় আসার অন্যতম কারণ একটা হল ভয়। সভা ডেকেছে কাদু। খুনের ঘটনাটা নিয়ে গোড়া থেকেই অতিরিক্ত হইচই করছে এই বদ লোক। খুনি ধরার জন্য থানায় ছোটাছুটি করছে। খুঁটিয়া মাস্টারের বাড়িতেও যাতায়াত আছে। সবাই জানে শয়তানটার সবই লোক দেখানো ভান। কিন্তু তা বলে একেবারে সভা ডেকে ফেলবে! এটা ঝিলডাঙার কেউই ভাবতে পারেনি। কাদুর চ্যালারা সভায় থাকতে বলেছে। এই অবস্থায় সেখানে না যাওয়াটাও কতটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে গ্রামের অনেকেই বুঝতে পারেনি। ফলে যাদের কাজকর্ম ছিল তারাও কাজ ফেলে বিকেলে বাজারে হাজির হল।

বাজারের ঠিক মাঝখানে, শিরিষ গাছটার তলায় মিটিঙের ব্যবস্থা হয়েছে।

boierpathshala.blogspot.com

শোল মোহনরা ইঁট পাথর দিয়ে একটা ফুটখানেক উঁচু জিনিস বানিয়েছে। ওপরে সাদা চাদর। পাশে ফুলের মালা। এই জিনিসই নাকি শহিদ বেদি! ঝিলডাঙার মানুষ যেমন কখনও শোকসভা দেখেনি, তেমন শহিদ বেদিও দেখেনি।

সভাস্থলে পৌঁছে বেদি দেখে মানা সরকার ভুরু কোঁচকালেন। নীচু গলায় বলেন, 'এটা কি করেছ কাদু?'

'শহিদ বেদি দাদা।'

মানা সরকার বিরক্ত গলায় বললেন, 'এটা শহিদ বেদি! ছি ছি। আমাকে যদি আগে বলতে শহিদ বেদি আমি নিয়ে আসতাম।'

কাদুর মতোর লোকও এই কথায় ঘাবড়ে গেল।

'বেদি নিয়ে আসতেন মানে!'

'মানে আবার কী, আমাদের এসব রেডিমেড ব্যবস্থা থাকে। জেলা অফিসের কথা না হয় বাদই দিলাম, আমার বাড়িতেই খান দুয়েক... দুয়েক কেন...তিনটে রাখা আছে। গোডাউন খুঁজলেই পাওয়া যাবে। কাঠের জিনিস সব। দেখলে মনে হবে পাথরের। ছেলেদের বললেই ঝেড়েঝুড়ে গাড়ির ডিকিতে তুলে দেয়।'

কাদুর চোখ কপালে উঠে যাওয়ার মতো অবস্থা। বলে কী শালা! এ তো তার থেকেও বেশি সাংঘাতিক! গাড়িতে মরা মানুষের সভার জন্য বেদি নিয়ে ঘোরে!

'আপনি দাদা সহিদ বেদি গাড়িতে নিয়ে ঘুরে বেড়ান!'

মানা সরকার স্মিত হেসে বললেন, 'ঘুরে বেড়াব কেন? দরকার হলে নিয়ে যাই। চট করে করে এ ধরনের কোনো সভা-টভা যদি পড়ে যায়, গাড়িতে ছেলেরাই তুলে দেয়। রাজনীতিতে এই শহিদ বেদি ব্যাপারটা ভেরি ইমপর্টান্ট। সব দলের নেতাদেরই দু-তিনটে স্টকে রাখতে হয় রে ভাই।'

'ভাই' ডাক শুনে কাদু দাঁত বের করে হাসল। শোকসভায় হাসা উচিত নয়। কিন্তু উপায় কী? এই কথার পর না হাসলে খারাপ দেখায়। শ-খানেক গরিবগুব্বো, ফালতু মানুষের কাছে কেমন দেখাল সেটা আসল নয়, একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষের কাছে কেমন দেখাল সেটাই আসল। না, মানা হারামদাজার মেজাজ সত্যি ফুরফুরে হয়ে গেছে। এই না হলে শান্তি। অল্প সময়েই কুপোকাত করেছে বুড়োটাকে। কী কেরামতি দেখিয়েছে কে জানে বাবা। কথা হয়নি। তবে চোখের ইশারায় বুঝিয়েছে, কাজ হাসিল। শান্তি একেবারে ধুতি-টুতি পরিয়ে খুশি করে ঘর থেকে বের করিয়েছে। খুশি বলেই না এক-কথায় শোকসভায় আসতে

boierpathshala.blogspot.com

রাজি হয়ে গেল শুয়ারটা।

মানা সরকার কাদুর দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললেন, 'আসলে কী জানো কাদু, আমার লেভেলের মানুষ যেমন তেমন শহিদ বেদির সামনে বসতে পারি না। মালা দিতে পারি না। পলিটিক্সেও তো একটা নিয়ম আছে। ছোটো বড়ো ব্যাপার আছে। সেই কারণেই আগে থেকে জানলে একটা সঙ্গে নিয়ে নিই। অসুবিধে কী? অসুবিধে তো কিছু নেই। জিনিস পছন্দ না হলে সভার অর্গানাইজারদের বলি, বাপু বদলে দাও। তারা বদলে দেয়। অসুবিধে কী?'

নিমেষে হাসি মুছে কাঁচুমাচু মুখে কাদু বলল, 'না না, অসুবিধে কেন হবে? আসলে আমাদের তো আগে থেকে কিছু ঠিক ছিল না। দুপুরে হঠাৎ মনে হল, আপনাকে যখন হাতের কাচে পেয়ে গেলাম...তা ছাড়া খুঁটিয়া মাস্টার মানুষটা বড়ো ভালো চিল দাদা। একেবারে নির্ভেজাল শান্ত মানুষ।'

'না না সে ঠিকই করেছ, ভালোই করেছ। আমি তোমার শোকসভার পরিকল্পনায় খুশি হয়েছি। একেই বলে পলিটিক্যাল স্মেল। রাজনীতিতে আগে থেকে গন্ধ পেতে হয়। সবাই পায় না। পাকা রাঁধুনির মতো কেউ কেউ পায়। যারা পায় তারা অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। তোমার মধ্যে সেই গুণটাই আমি লক্ষ করছি। ভেরি গুড।'

'শহিদ বেদি'-তে রাখবার জন্য খুঁটিয়া মাস্টারের বাড়ি থেকে ফটো আনার চেষ্টা হয়েছিল। পাওয়া যায়নি। গরিব মাস্টারের আবার ফটো কী? ব্যাটারি লাগানো একটা মাইকের জন্য বিশুকে বলা হয়েছে। শোল নিজে এসে বলে গেছে। কাদুর ডাকা সভায় মাইক লাগাতে হবে শুনে বিশুর তো হাত-পা কেঁপে অস্থির। সে গোপীনাথের কাছে পরামর্শ চাইতে গেল। গোপী ডাক্তার ক-দিন ধরেই দোকান খুলছে না। ঘর ছেড়ে বেরও হচ্ছে না। তার নাকি শরীর খারাপ। যদিও ঘটনাটা তা নয়। আসলে সে মনের দিক থেকে খুব বড়ো আঘাত পেয়েছে। দু-দিন আগে কাদুর আখড়ায় গিয়ে নিতাই, মালতী, ফুলের কথা বলে আসার পর থেকে সে মানসিকভাবে বেসামাল অবস্থায় আছে। কাউকে মুখ দেখাতে ইচ্ছে করছে না। যদিও ওই পরিবারের নাম-ধাম জানার কারণ কিছুই তাকে বলেনি কাদু। কিন্তু যেভাবে নোংরা ভয় দেখিয়ে জেনে নিয়েছে তাতেই আঁচ করা যাচ্ছে, ঘটনাটা ভয়ংকর কিছুই হবে। সেই ভয়ংকরটা কী? যদিও নিতাইয়ের কথা বলবার পর গোপীনাথ সেদিন কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ঢোঁক গিলে বলেছিল, 'তুমি যার কথা জানতে চাইছ সে যে নিতাই-ই হবে তার তো কোনো মানে নেই কাদু।'

boierpathshala.blogspot.com

মুখের ভেতর নিজের জিভ ঘোরাতে ঘোরাতে কাদু বলেছিল, 'কেন? তুমি কি বলচ ডাক্তার ঝিলডাঙার ঘরে ঘরে পোয়াতি মেয়েছেলেতে ভরে আচে?'

গোপীনাথ আবার ঢোঁক গিলে বলল, 'না, তা নয়, তবে একজনই যে হবে এমনটাও তো নয়।'

এ-কথায় আমল না দিয়ে কাদু ঠোঁট দিয়ে আওয়াজ করে বলেছিল, 'নেতাইয়ের মেয়ের অসুখটা কী ডাক্তার?'

গোপীনাথ দ্রুত নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে।

'কিছুই নয়। মনে হয় পিলেটা একটু বড়ো হয়েছে। আমি বলিনি কিছু। বেচারি ঘাবড়ে যাবে।'

কাদু দুটো হাত তুলে আড়মোড়া ভেঙেছিল। বলেছিল, 'ভালোই করেচ। মানুষকে ঘাবড়ে দেওয়া ঠিক নয়। ওই মেয়ের বয়স কত?'

জিভ দিয়ে দু-বার ঠোঁট চেটে গোপীনাথ বলে, 'একেবারেই ছোটো। শিশুই বলা যায়।'

'আহারে, ওইটুকু মেয়ে। ঠিক আছে ডাক্তার তুমি এবার কেটে পড়ো। তোমার দোকান আবার খালি পড়ে আছে।'

গোপীনাথ উঠতে উঠতে শুকনো হেসে জিজ্ঞেস করে, 'কাদু, ব্যাপারটা কী? নিতাই কিছু ঘটিয়েছে নাকি? ও বেচারি আর করবেটা কী। একেবারেই ফালতু। জমিজমাও কিছু নেই।'

কাদু স্থির চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল গোপীনাথের দিকে। তার চাপা গলায় বলেছিল, 'বেশি বকবক কোরো না ডাক্তার। মেজাজ ঠিক নেই। তোমাকে ডেকে যে এসব জানতে চেয়েচি, এ-কথা যদি ফাঁস হয়, গাঁয়ের কেউ যদি জানতে পারে সর্বনাশ। আমার নয়, সর্বনাশ হবে তোমার।' কথা থামিয়ে পাশে পড়ে-থাকা ব্লাউজ তুলে চোখের সামনে দোলাতে থাকে কাদু। শীতল গলায় বলে, 'মেয়েমানুষের জামা গলায় পেঁচিয়ে মরতে ভালো লাগবে? পুকুর থেকে পচা গলা বডি তোলার পর গাঁয়ের সবাই দেখবে ডাক্তারের গলায় মেয়েমানুষের বেলাউজ। সেটা কি ঠিক? তার থেকে চুপচাপ থাকো। নিজের কাজ করো। ফুঁ চিকিচ্ছে দিয়ে লোক ঠকাও। কথা কয়ো না।'

কাদুর এই কথাগুলো যেন অন্ধকার রাতে সাপের হিসহিসানির মতো কানে রয়ে গেছে গোপীনাথের।

শারীরিকভাবে ঠিক থাকলেও এরপর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়াটা আশ্চর্যের কিছু নয়। তবে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে গোপীনাথ।

boierpathshala.blogspot.com

ঝিলডাঙা থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে পাকাপাকিভাবে সে চলেই যাবে। শুধু মৃত্যুভয় নয়, যত দিন যাচ্ছে, জায়গাটা ধীরে ধীরে নরক হয়ে উঠছে। মরতে যদি হয় তাহলে পৃথিবীতেই মরা ভালো, নরকে নয়। যতদিন না এখান থেকে পালাতে পারছে ততদিন পারলে নিজের ঘরে দোর দিয়েই বসে থাকবে। এর সঙ্গে রয়েছে দুশ্চিন্তা। নিতাইদের নিয়ে দুশ্চিন্তা। কাদু কি কোনোভাবে জেনে গেছে খুনের ঘটনাটা নিতাই দেখেছিল? কীভাবে সেটা সম্ভব? নিতাইকে তো সে বারবার বারণ করে এসেছে। নিতাই কি শোনেনি? কাউকে মুখ ফসকে বলে ফেলেছে? বিষয়টা নিতাইকেই জিজ্ঞেস করা উচিত। কিন্তু সে সাহস হচ্ছে না। কাদু যদি জানতে পারে আর এক বিপদ। এরকম একটা খারাপ সময় বিশু এসে শোকসভা এবং মাইকের কথা জানাল।

'কী করব গোপীদা?'

সভার কথা শুনে থমকে গেল গোপীনাথ।

'মিটিং! কে মিটিং করবে?'

'বাইরে থেকে লিডার এসেছে।'

'লিডার!'

'হ্যাঁ গোপীদা, কাদু শয়তানটা নিয়ে এসেছে। মানা না কী নাম যেন শুনলাম। কী করব?'

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে গোপীনাথ বলল, 'কী আবার করবি? তোকে কাজ দিয়েছে, তুই কাজ করবি।'

বিশু গোপীনাথের গায়ে হাত দিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলল। বলল, 'আমার ভালো লাগছে না। ওই লোকটার কাজ করতে আমার ভালো লাগছে না গোপীদা। মরা মাস্টারকে নিয়ে হারামিটার মাতামাতিতে কেমন সন্দেহ হয়।'

বিশুর হাত সরিয়ে দিয়ে গোপীনাথ খানিকটা নিজের মনেই বলে, 'দুনিয়াটাই এরকম হয়ে যাচ্ছে, তুই একা কী করবি? যা কাজটা করে দে।'

অনিচ্ছা নিয়ে কাজ করে দিয়েছে বিশু। চোঙায় গমগমে আওয়াজ দিচ্ছে। সেই চোঙা ফুঁকেই শোকসভায় প্রথমে ভাষণ দিল কাদু।

'...খুঁটিয়া মাস্টারের মিত্তু মানে ঝিলডাঙা গাঁয়ের সকলের মিত্তু। অমন শানতিপিয় মাটির মানুষকে যেভাবে হত্তা করা হল তা ভাবা যায় না। খুনিদের শাস্তি না হওয়া পজ্জন্ত গাঁয়ের মানুষের লড়াই চলবে। এতবড়ো দুঃখ-কস্টের মাঝখানেও আজ ঝিলডাঙার মানুষের কাছে আনন্দের কতা হল, এই ঘটনার পতিবাদে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েচেন আমাদের সবার পিয় নেতা মানাদা,

boierpathshala.blogspot.com

মানা সরকার..'

যে মানা সরকার খানিক আগেও কাদুর সঙ্গে হেসে কথা বলছিলেন, তিনি বলতে উঠে নিমেষের মধ্যে গলাটা ভেঙে ফেললেন। ভাবটা এমন যেন খানিকটা আগে পর্যন্ত চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া মাস্টারের শোকে বিভোর হয়ে ছিলেন। মন ভেঙে ছিল। সেই ভাঙাটাই এখন গলায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। ভাষণ সংক্ষিপ্ত। সেভাবে দেখতে গেলে দু-পর্যায়ের ভাষণ। প্রথম পর্যায়টি ছিল খুন হওয়া শিক্ষককে নিয়ে স্মৃতি-রোমন্থন। দ্বিতীয় পর্যায় কাদুকে নিয়ে। প্রথম পর্যায়ে শ্রোতারা যেমন মুগ্ধ হল, পরেরটায় শিউরে উঠল তার থেকে অনেক বেশি। কারণ এই সময়েই মানা সরকার তার সেই ঘোষণাটি করেন। আর এই ঘোষণাই ছিল ঝড়ের মতো তোলপাড় ফেলা।

মানা সরকারের কাছ থেকেই ঝিলডাঙার মানুষ প্রথম জানতে পারল, স্কুল-বাড়ির জন্য অর্থ সাহায্য চাইতে খুঁটিয়া মাস্টার তার কাছেও গিয়েছিল। মানা সরকার ব্যবস্থাও করে দেন।

'মানুষটাকে দেখেই বুঝেছিলাম খাঁটি মানুষ। দুটো কথা বলেই বুঝেছিলাম। আপনারা রাজনীতির লোকদের কতটা পছন্দ করেন জানি না, কিন্তু এইটুকু জেনে রাখবেন, মানুষ খাঁটি না ভেজাল বুঝতে আমাদের কখনও ভুল হয় না। চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়ার মৃত্যুতে আপনারা যেমন আপনাদের প্রিয়জনকে হারালেন, তেমন আমি হারালাম একজন সম্ভাব্য জনপ্রতিনিধিকে, যিনি মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতেন, জীবনের শেষ রক্তবিন্দুটুকু নিঙড়ে ফেলতেন। আজ রাজনীতিতে এই ধরনের মানুষের বড়ো অভাব। হ্যাঁ, মাস্টারমশাইকে দেখার পরই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম, এবার পঞ্চায়েত ভোটে আমাদের দলের পক্ষ থেকে তাকেই ঝিলডাঙার প্রার্থী করা হবে। তাঁকে টিকিট দেব। ঝিলডাঙার উন্নতির জন্য, ঝিলডাঙার মানুষের ভালোর জন্য তিনিই উপযুক্ত প্রতিনিধি হতে পারবেন। এটা আমি নিশ্চিত ছিলাম।'

শোকসভায় হাততালি দেওয়ার নিয়ম নেই। কিন্তু মানা সরকারের পাশে বসে কাদু সেই নিয়ম ভাঙল। উদ্ভাসিত মুখে সে হাততালি দিয়ে উঠল। তার চোখমুখ দেখে মনে হবে, খুঁটিয়া মাস্টার ভোটের টিকিট পেলে সে-ই খুশি হত সবথেকে বেশি। মানা পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখের কোণ মুছলেন।

'আমার বড়ো আপশোস রয়ে গেল। রাজনীতিতে এরকম মানুষই আমি খুঁজি। নিঃস্বার্থ, লোভহীন। গোটা বিশ্ব যখন ভোগবিলাসে গা ডুবিয়েছে তখন এমন দু-একজনকে লাগে যাঁরা সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করবেন। গরিব

boierpathshala.blogspot.com

মানুষের জন্য বেঁচে থাকবেন। প্রিয় ঝিলডাঙাবাসী, কিছুদিন আগে আমাকে যখন এই শোকসভায় যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয় তখন আমি এক কথায় রাজি হয়েছিলাম। বলেছিলাম, যত দরকারি কাজই থাকুক, আমি সব ফেলে ঝিলডাঙায় যাব। এমন দুঃখের দিনে যদি আমি আপনাদের পাশে এসে না দাঁড়াই নিজের কাছে কী জবাবদিহি করব? কী বলব? মনে রাখবেন বন্ধুরা, আজ চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া শরীরে বেঁচে নেই, কিন্তু তার অসমাপ্ত কাজ রয়ে গেছে। সেই কাজ আমাদের শেষ করতে হবে।'

মানা থামতেই কাদু ফের হাততালি দিয়ে উঠল। এবার তার সঙ্গে যোগ দিল সভায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সঙ্গীসাথীরাও।

মানা সরকার হাততালিতে যেন প্রসন্ন হলেন। গলা খাঁকারি দিয়ে বলতে শুরু করলেন আবার—

'আর সেই দায়িত্ব আমি দিতে চাই এমন একজন মানুষকে যে আপনাদের নিজেদেরই মানুষ। আপনাদের সুখে দুঃখে আপনাদের পাশে থেকেছে চিরকাল। থাকবে আরও অনেকদিন...এসো কাদু পাশে এসো।'

হতচকিত কাদু কী করবে বুঝতে পারে না। এরকম একটা ঘটনা যে ঘটবে ঝিলডাঙার মানুষ যেমন বুঝতে পারেনি, কাদুরও কল্পনার বাইরে ছিল। সে খানিকটা লাজুক ভঙ্গিতে মানা সরকারের পাশে এসে দাঁড়ায়। মানা তার কাঁধে হাত রেখে ফিসফিস করে বলেন, 'তোমার ভালো নাম কী?'

কাদু চমকে বলে, 'অ্যাঁ?'

মানা সরকার খানিকটা বিরক্তিতেই বলেন, 'ভালো নামটা বল শিগ্‌গিরি। একটা ইমপর্টান্ট অ্যানাউন্সমেন্টের ব্যাপার আছে।'

কাদুর মতো লোকও এই প্রশ্নে ঘাবড়ে যায়। সত্যি তো তার ভালো নাম কী? জন্মানোর পর থেকেই সে 'কাদু' শুনে এসেছে। বাপ-মা ডাকত কাদু, গাঁয়ের লোক ডাকত কাদু। এখনও সবাই তাই ডাকে। তার আবার ভালো নাম?

মানা সরকার আবার চাপা গলায় ধমক দেন।

'আরে! কী হল? বলবে তো?'

সাদা পাঞ্জাবির তলায় অল্প ঘামতে থাকে কাদু। এরকম সমস্যায় সে জীবনে কখনও পড়েনি। নামের ভালোমন্দ নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়নি কোনোদিন। নামে কী আসে যায়? এতগুলো লোকের সামনে মানা হারামজাদাটা এ আবার কি নতুন ফ্যাকড়া তুলল? কাদু নামেই তো ঝিলডাঙার মানুষ তাকে চেনে, তাকে ভয় পায়। ক-দিন পরে কাপড়ে-চোপড়ে করে ফেলবে। আর নাম দিয়ে কী হবে!

boierpathshala.blogspot.com

কিন্তু এখন কিছু একটা বলতে হবে যে। এটা কোনো ভয় পাওয়ার বিষয় নয়। ভদ্রলোকের কারবার। নেতা তার নাম ঘোষণা করবে।

'কী হল? বলবে তো।'

কাদুর গুলিয়ে যায়। সে বিড়বিড় করে বলে, 'মানা সরকার...'

মানা সরকার চোখ পাকিয়ে কাদুর কাঁধেই খামচি দেন। গলা একেবারে নীচে নিয়ে গিয়ে বলেন, 'কী যা তা বলছ? তোমার ভালো নাম মানা সরকার? থাক, বুঝতে পেরেছি নার্ভাস হয়ে পড়েছ।' এরপর গলা তুলে শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেন, 'কাদু বলছে, আপনারা তাকে সবাই কাদু নামেই চেনেন, কাদু নামেই ভালোবাসেন। ঠিক আছে এই নামেই হবে। আমি ঠিক করেছি, পঞ্চায়েত ভোটে ঝিলডাঙায় এবার আমাদের দলের প্রার্থী হবে শ্রীমান কাদু। চিত্তরঞ্জন মাস্টারের বাকি কাজ সে সম্পূর্ণ করবে। কী আপনারা খুশি তো?'

কাদুর সঙ্গীসাথীদের প্রবল আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে দুঃখের 'শোকসভা' শেষ হল। অন্ধকার নামছে। মানা সরকার ঝিলডাঙার মানুষের শিউরে-ওঠা চোখমুখের কিছুই দেখতে পেলেন না। দেখতে চাইলেনও না। শয়তানকে তার প্রাপ্য দেওয়ার পর আর কোনোদিকে ফিরে তাকাতে নেই। এই তত্ত্বে আর কেউ বিশ্বাস না করুক তিনি করেন।

ফেরার পথে মানা বললেন, 'কী খুশি তো?'

শোল সামনে বড়ো টর্চ ধরেছে। পাড়া গাঁয়ের মেঠো পথ। মানা সরকার অতিরিক্ত সতর্ক হয়ে হাঁটছেন। কাদু অবশ্য সবদিকেই সাবধান। সামনে যেমন আলো রয়েছে, পিছনে লোক হাঁটছে। মোহন রয়েছে। গাড়ি পর্যন্ত এইভাবেই এগিয়ে দেওয়া হবে।

কাদু মাথা চুলকে বলল, 'দাদা, নামটা নিয়ে একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার হল।'

মানা হেসে বললেন, 'হয়েছিল একটা কেলেঙ্কারি। তোমার ভালো নাম যদি মানা সরকার হয় তাহলে তো আমি গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস শ্রীমান্ শব্দটা মাথায় চলে এল। যাক, ও কিছু না। প্রথমবার ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছ তো, একটু নার্ভাস লাগবেই। তুমি খুশি কিনা বলো।'

'দাদা, আমি যে কী বলব... দেন আর একবার পায়ের ধুলো দেন।'

মানা সরকার চাপা গলায় বললেন, 'থাক, পায়ের ধুলো টুলো ছাড়ো। কাজকর্মের যেসব কথা বলছিলে সেগুলো কী ভেবেচিন্তে বলেছ?'

কাদু গলায় জেদ এনে বলল, 'কাদু ফালতু কথা বলে?'

মানা খানিকটা অন্যমনস্কভাবেই বললেন, 'মনে হয়নি। সেই কারণেই তো

boierpathshala.blogspot.com

দুম করে টিকিট দেওয়ার ডিসিশনটা নিয়ে বসলাম। জানো তো বাপু, আজকাল এসব প্রার্থী-টার্থী হওয়ার খরচাপাতি অনেক।'

'জানি দাদা, আমি দশ গুণ তুলে দেব। যে-বিজনেসের কথা বললুম সেটা যদি লেগে যায়, যদি কেন লেগে যাবেই, তাহলে টাকা আসা বন্ধ করা যাবে না।'

'তোমার কথা শুনে তো সেরকমই মনে হল। তবে দ্যাখো বাপু, আমাকে কোনোভাবে জড়িও না।'

'কী বলচেন দাদা! আপনি যা করলেন কলিজা দিয়ে আপনাকে রখ্যে করব।'

কাদুর কথায় মানা সরকার একেবারেই নিশ্চিন্ত হলেন না। হতে চানও না। ব্যবসাপাতিতে বিশ্বাস কোনো কথা নয়। এই বিজনেস আবার যে সে বিজনেস নয়। মেয়েমানুষ বেচার বিজনেস। নিজের গার্ড নিজেকেই নিয়ে রাখতে হবে। খানিকটা নেওয়াও হয়ে গেল। এই লোকটা ভোটে জিতলে নিজেই পুলিশ-টুলিশের ঝক্কিঝামেলা সামলাতে পারবে। ছোটোখাটো কেসে তাকে টানাহেঁচড়া করবে না। কালি যদি মাখতে হয় নিজেকেই মাখতে হবে। শুধু একটাই জিনিস, বেয়াদপটাকে কন্ট্রোলে রাখা দরকার। ব্যাটাকে এমন কোনো বড়ো গোলমালে জড়িয়ে ফেলতে হবে যাতে পায়ে বেড়ি পড়ে যায়। সেই বেড়ির শিকল থাকবে নিজের হাতে। তেড়াবেড়া করলেই টান দিতে হবে, হুমড়ি খেয়ে যাতে পড়ে।

বাঁশের সেতুর ওপাশে গাড়ি দেখা যাচ্ছে। মানা সরকার গতি ধীর করলেন।

'কাদু, একটা কথা ছিল।'

কাদু ঘাড়ের কাছে এসে বলল, 'কী দাদা?'

'এক ছোকরা বড্ড ঝামেলা পাকাচ্ছে।'

'সেকি! আপনার সঙ্গে ঝামেলা! কোতায় দাদা?'

'পার্টিতে।'

কাদু দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিসিয়ে বলল, 'নাম ঠিকানা বলুন ঝেড়ে দিয়ে আসি।'

অন্ধকারেই মৃদু হাসলেন মানা।

'এ তো পাড়াগাঁয়ের গুন্ডামি নয়, কেসটা বড়ো। পলিটিক্যাল প্রেশার আসবে।'

'ছোটো বড়ো আমি বুঝে নেব। আপনি শুধু দায়িত্ব দিয়ে দ্যাখেন। কাদুর পরীক্ষা হয়ে যাক।'

boierpathshala.blogspot.com

'ফেল করলে?'

'জুতো মেরে মুখ চিঁড়ে দেবেন দাদা। এই নেন, এখনই জুতো রেখে দেন।'

উত্তেজনায় নীচু হয়ে নিজের পায়ের জুতো খুলতে যায় কাদু। হাত তুলে বাধা দেন মানা সরকার। বলেন, 'অত দূরে গিয়ে কাজ করবে কী করে?'

'সে আমাদের ভাবনা। আপনে নাম বলেন।'

'তুমি কিন্তু নিজে যাবে না।'

কাদু দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'খেপেচেন? আমি তখন ঝিলডাঙা থানায় খুঁটিয়া মাস্টারের খুনি ধরবার দাবিতে বিক্ষোভ দেখাব।'

মানা সরকারের চোখ চকচক করে উঠল। নীচু গলায় বললেন, 'গুড। ছেলেটার নাম বিদ্যুৎ। একেবারে মারতে হবে না। পা দুটো ভেঙে দিলেই হবে। যদিও এসব ছোকরার পায়ের থেকে শিরদাঁড়া ভাঙাটাই বেশি জরুরি।'

'তাহলে সেটাই হবে দাদা। যেটা জরুরি সেটা করাই তো ভালো।'

'দ্যাখো, যদি পারো। কিন্তু সাবধান। বিদ্যুতের বাড়ির ঠিকানা হল...। না না বাড়ির দরকার নেই। বিদ্যুৎ জেলা অফিস থেকে বেরোয় অনেক রাত করে, তারপর ট্রেন ধরে...।'

গভীর রাত পর্যন্ত কাদুর ডেরায় উৎসব চলল। ন্যাড়া ছাদে বিজয়োৎসব। উৎসব বলতে আকণ্ঠ মদ্যপান। নেশা হয়ে যাওয়ার পর একসময় কাদু জড়ানো গলায় ক্রমাগত বলতে থাকে, 'কাদু তোমার ভালো নাম কী? গুড নেম? আমার ভালো নাম মানা সরকার। হা হা...। কাদু তোমার ভালো নাম কী? গুড নেম? আমার ভালো নাম হল মানা সরকার। হা হা। কাদু তোমার ভালো নাম কী? গুড নেম? হা হা...।'

মাথার ওপরেই ভারি সুন্দর তারা-ভরা-আকাশ। নির্মল, প্রশান্ত। ঝিলডাঙা নামের এই ছোট্ট, অকিঞ্চিৎকর গ্রামের এক ভয়ংকর ভবিতব্যের দিকে তাকিয়ে সেই আকাশ যেন থমকে আছে।

boierpathshala.blogspot.com

ছেচল্লিশ

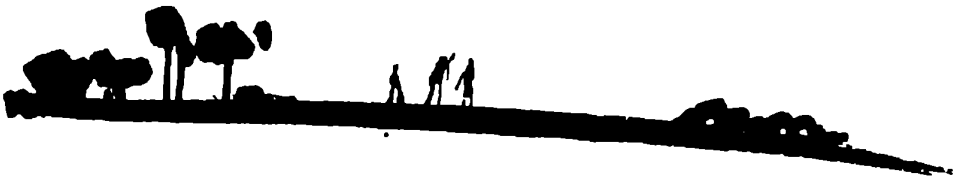

অতি সামান্য খাবারও তারা ভাগাভাগি করে খায় এবং শেষ গ্রাস নিয়ে কখনও মারামারি করে না।

পিঁপড়ে সম্পর্কে এই তথ্যটি জানবার পর ডাক্তার সুদর্শন রায় চমৎকৃত হলেন।

বই দিতে এসে ব্রতীন বিদেশি বইয়ের সঙ্গে একটা বাংলা বইও দিয়েছিল। বাইরের বইটার নাম 'অ্যান্ট দ্য স্ট্রাকচার, ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড বিহেভিয়ার'। হুইলাম ডব্লু. এমের লেখা এই বইয়ের প্রকাশক কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস। আর এখানকার বইটা হল— 'পিঁপড়ের জীবনদর্শন'। লেখক ড. তারকমোহন দাশ। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, তারকমোহন দাশদের মতো বাঙালি বিজ্ঞানীরা পোকামাকড় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন এমন খবর খানিকটা হালকাভাবে কানে এলেও সুদর্শন রায় কখনও তাঁদের লেখা পড়েননি। পড়বার কারণও ছিল না। বিষয়টা সম্পর্কে আলাদা করে কখনও উৎসাহও তৈরি হয়নি। শুধু উৎসাহ তৈরি হয়নি বললে কম বলা হবে, পিঁপড়ে সম্পর্কে যে কখনও এত কিছু জানতে হবে এমনটাই কল্পনা করেননি তিনি। ঝিলডাঙার ছোট্ট মেয়েটির ঘটনা তাঁকে আকস্মিকভাবে এদিকে ঠেলে দিয়েছে। অক্সফোর্ড প্রেসের বই, পোকামাকড় বিষয়ক ওয়েবসাইট, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে মেলে-পাঠানো-চিঠিপত্র ঘাঁটতে গিয়ে এই কৃশকায় বইটা ক-দিন চোখের আড়ালেই ছিল। দু-দিন আগে চোখে পড়তে চেম্বারে বেরোনোর সময় ব্যাগে পুরে নিলেন। আজ উলটে দেখে চমকে উঠেছেন। বুঝতে পারছেন, আকারে যাই হোক না কেন, বইটা আসলে খুবই মূলবান। দীর্ঘ পরিশ্রমের ফসল। বিজ্ঞানী তারকমোহন দাশ পিঁপড়ে নিয়ে কত

boierpathshala.blogspot.com

ধরনেরই না গবেষণা করেছেন! সেই সব গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে মারাত্মক সব তথ্য। পড়ে চমকে উঠতে হয়। বইটার নামও চমকে দেওয়ার মতো। পিঁপড়ের মতো এমন তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাণের জীবনচর্চার সঙ্গে দর্শনকে যুক্ত করে দেখার ক্ষমতা খুব কম মানুষের পক্ষেই সম্ভব। বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং মমতা থাকলেই এটা সম্ভব। এই বইয়ের পাতায় পাতায় সেই জ্ঞান আর মমতা মিশে আছে।

নিজের চেম্বারে বসেই 'পিঁপড়ের জীবনদর্শন' পড়ছিলেন সুদর্শন রায়। আজ কাজের চাপ কম। কোনো কোনোদিন এরকম হয়। তুমুল ব্যস্ততার মাঝখানে খানিকটা সময় ফাঁকা পাওয়া যায়। পেশেন্টের ভিড় থাকে না। সেই সময়টা বইপত্র পড়েই কাটান সুদর্শনবাবু। টেবিলে মনোরোগ বিষয়ের গাদা খানেক বই, জার্নালের সঙ্গে গীতবিতান, সঞ্চয়িতাও রাখা আছে। নতুন কোনো কিছু না পেলে সেগুলোই ঘুরে ফিরে পড়েন। এই বইদুটোর মজা হল যখনই পড়া যায় তখনই মনে হয়, প্রথম পড়ছি।

তবে 'পিঁপড়ের জীবনদর্শন' আজ তিনি সত্যি প্রথম পড়লেন।

পিঁপড়েরা তাদের চারপাশের পরিবেশের ওপর কখনোই কোনো চাপ তৈরি করে না। প্রকৃতির সম্পদ নষ্ট করার তো প্রশ্নই ওঠে না বরং সেই সম্পদকে আরও কতটা বাড়িয়ে দেওয়া যায় সেই কাজ করে চলে নিরন্তর। এর জন্য তারা কখনও ফুলে ফুলে পরাগ মিলন ঘটায়, কখনও চারপাশে বীজকে দেয় ছড়িয়ে। এরা মাটি ওলটপালট করে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়াতে জানে। গাছপালাকে নষ্ট করতে পারে এমন সব পোকামাকড় মারতে পারে পিঁপড়ের দল। সুশৃঙ্খল, সংঘবদ্ধ থাকার ক্ষমতাই এদের আসল শক্তি। শ্রমিক পিঁপড়েরা আশ্চর্য শৃঙ্খলা আর পারস্পরিক সহযোগিতায় নিজেদের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে চলে এক নাগাড়ে, বিরামহীনভাবে। মজার কথা হল, ভিন্ন প্রজাতির সঙ্গে গোলমাল হলেও এরা নিজের প্রজাতির মধ্যে কখনও লড়াইতে ব্যস্ত হয় না। ঝগড়া, মারামারি, পরস্পরকে হত্যা করার কোনোরকম ঘটনার উদাহরণ নেই। বাইরে থেকে প্ররোচিত করলেও ঘটে না। খুব সামান্য খাবার পেলে সকলে মিলে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়। যেটুকু বাঁচে সঞ্চয় করে রাখে পরম যত্নে। বেশি আশ্চর্যের কথা হল, যদি কখনও খাবার শেষ হয়ে যায়, খাদ্যের অভাবে মারা যেতেও তারা প্রস্তুত থাকে, কিন্তু শেষ গ্রাস নিয়ে খেয়োখেয়ি করে না।

বইটা আকারে ছোটো হলেও সুদর্শন রায় শেষ করতে সময় নিলেন। কোনো কোনো অংশ দু-বারও পড়লেন। বই বন্ধ করে ঘড়ি দেখে চমকে

boierpathshala.blogspot.com

উঠলেন। ন-টা বাজতে দেরি নেই। এই রে! এবার না উঠলে, মেয়ে ফোন করতে শুরু করবে। বাড়িতে ফিরলে বকাবকি তো আছেই। সুদর্শনবাবু ওঠবার জন্য কাগজপত্র গুছিয়ে তৈরি হন, আর ঠিক তখনই ইন্টারকম বেজে উঠল। রিনা ফোন করছে। রিনা চেম্বারের লাগোয়া ঘরে বসে রোগীদের ভিড় সামলায় সেই সন্ধে থেকে।

সুদর্শনবাবু ফোন তুলে বললেন, 'সরি রিনা, তোমার দেরি হয়ে গেল। এবার উঠছি।'

রিনা নীচু গলায় বলল, 'স্যার, একজন পেশেন্ট এসেছে।'

'এখন! এই রাতে?'

রিনা চুপ করে রইল। সুদর্শনবাবু বললেন, 'আজ আর নয় রিনা। শরীরটাও ভালো লাগছে না। তা ছাড়া এরপর আরও লেট করলে বাড়িতে বকুনি খেতে হবে।'

রিনা খুশি হওয়া গলায় বলল, 'চলে যেতে বলি স্যার?'

ডাঃ রায় খানিকটা থমকে থেকে বললেন, 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল?'

'ছিল না। নিজে থেকে চলে এসেছে।'

'সে কী! বুধ আর শুক্র তো আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া দেখি না। তুমি বলোনি?'

রিনা বলল, 'বলেছি। তবু শুনছে না। নো প্রবলেম, আমি চলে যেতে বলছি।'

রিনার পক্ষে এই উৎসাহ স্বাভাবিক। তাকে দমদম পর্যন্ত যেতে হবে। শেষ মেট্রোটা ধরতে না পারলে সমস্যা। সুদর্শনবাবুরও ভালো লাগছে না। কাজ কম থাকলেও বসে থাকারও একটা পরিশ্রম আছে। বানেরহাটে যাওয়া বন্ধ করে ভেবেছিলেন, কলকাতাতেও খানিকটা হালকাভাবেই কাজ করবেন। বয়স বাড়ছে। একটানা অনেকক্ষণ রোগী দেখলে অসুবিধেই হয়। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। শুধু যে রোগীর চাপেই সম্ভব হয়নি তা নয়, তিনি নিজেও পারেননি। ডাক্তার হওয়ার নানারকম ঝামেলার একটা ঝামেলা হল রেসপনসিবিলিটি । রোগীর প্রতি দায়। বাইরে যাওয়া ছেড়েছেন, এখন এই দায়টুকুও বাদ দিলে প্রফেশনটার সঙ্গে আর যুক্ত থাকারই কোনো মানে থাকে না। তা ছাড়া আরও একটা ইচ্ছে মনে মনে আছে। সপ্তাহে একদিন করে যদি কলকাতাতেই বিনা পয়সায় রোগী দেখা যেত বেশ হত। কাজটা কঠিন। ফ্রি রোগী দেখার দিন যে সত্যিকারের অভাবী মানুষই আসবেন এমন নয়।

boierpathshala.blogspot.com

পয়সাওলা লোকজনও সুযোগটা নেবে। তাদের ভিড়ে আসল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হবে। এই কাজের জন্য একটা অর্গানাইজেশন লাগে। তারা আগে থেকে ঠিক করে দিতে পারে, সত্যি সত্যি কার প্রয়োজন। কে চিকিৎসার জন্য টাকা দিতে পারবে না। কিছুদিন আগে 'সুমঙ্গলা'র ছেলেমেয়েদের কাছে প্রসঙ্গটা তুলেছিলেন। ওরা কলকাতায় কিছু করতে চাইছে না। পাড়াগাঁয়েই কনসেনট্রেট করবে। ওসব জায়গাতেই এই ধরনের কাজের প্রয়োজন বেশি। রিমোট-গ্রামের দিকে হলে বেশি ভালো হয়। ওখানে তো চিকিৎসার কিছুই নেই। ওদের যুক্তিটা ঠিক। বালিগঞ্জ, নিউআলিপুর বা সল্টলেকে বসে ফ্রি-ডিসপেনসারি করবার কোনো মানে হয় না। তবে রোগী ফিরিয়ে দিতে সবসময়ই বাধো বাধো ঠেকে সুদর্শন রায়ের। এখনও লাগল।

'তুমি বুঝিয়ে বলো রিনা। এমারজেন্সি কিছু?'

রিনা ফিসফিস করে বলল, 'বুঝতে পারছি না স্যার, বলছে আগুন খাওয়া নিয়ে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে।'

কানে ইন্টারকম ধরেই ভুরু কোঁচকালেন সুদর্শন রায়।

'কী! কী খাওয়া?'

'আগুন। আগুন বলছে স্যার। মেল পেশেন্ট। ওয়াইফ নিয়ে এসেছে। সে বলছে, পেশেন্ট নাকি ক-দিন ধরে আগুন খাওয়ার চেষ্টা করছিল। আজ দুপুরে মুখ পুড়িয়ে ফেলেছে। এমনিতে শান্ত, নরমাল ভাবে বসে আছে। এমারজেন্সি কিছু বলে তো মনে হচ্ছে না।'

কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, এবার খানিকটা আপনমনেই ফের চেয়ারে বসে পড়লেন ডাক্তার রায়। বললেন, 'ঠিক আছে, পাঠিয়ে দাও। চট করে ছেড়ে দিই। তুমি বরং একটা কাজ করো, পেশেন্ট পাঠিয়ে তুমি চলে যাও।'

রিনা তাড়াতাড়ি লজ্জা পেয়ে বলল, 'না না ঠিক আছে স্যার। আমি অপেক্ষা করছি।'

চট করে দেখে দিতে পারলেন না সুদর্শন রায়। কারণ রোগী এবং রোগ দুটোই ইন্টারেস্টিং।

রোগীর বয়স বেশি নয়। এক মুখ দাড়ি। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। কলেজ জীবনে দেখা 'কবি কবি' চেহারা। স্ত্রী সঙ্গে করে এনেছে। ডাক্তারের কাছে এসেছে বলে দুজনেই খানিকটা ধোপদুরস্ত হয়ে আসার চেষ্টা করলেও সুদর্শনবাবু এক ঝলক দেখেই বুঝলেন, এদের টাকাপয়সার অবস্থা ভালো নয়। মুখ পোড়ার ঘটনা অবশ্য সামান্য। ডান দিকের গালে ছোটো দাগ হয়েছে। স্ত্রীকে বাইরে

boierpathshala.blogspot.com

অপেক্ষা করতে বলে রোগীর সঙ্গে কথা শুরু করলেন সুদর্শনবাবু।

'আপনার নাম?'

রোগী লাজুক হেসে বলল, 'সলিল। সলিল বণিক।'

'কী করেন? চাকরিবাকরি? বিজনেস?'

মাথা চুলকে রোগী বলল, 'তেমন কিছু করি না।'

সুদর্শনবাবু নিশ্চিত হলেন, বাইরের চেহারা দেখে ঠিকই ধরেছিলেন। শুধু পোশাকে নয়, টেবিলের ওপর রাখা কাঁধের ব্যাগটার অবস্থাও শোচনীয়। সুদর্শনবাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে কথা শুরু করলেন।

অল্প কথা শুনে পেশেন্ট সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা তৈরি হল সুদর্শন রায়ের।

সলিল নামের লোকটি একেবারে কিছু করে না বললে ভুল হবে। সে একজন কালেক্টর। সংগ্রাহক। তবে এই শখের সঙ্গে রোজগারপাতির কোনো সম্পর্ক নেই। থাকার কথাও নয়। তালিকা শুনেই বোঝা গেল, সংগ্রহের বিষয় অর্থহীন এবং এলোমেলো। অতীতে কোনো একটা সময় হয়তো কিছু মানে ছিল, তারপর যতদিন গেছে হাবিজাবিতে সুটকেস ভরেছে। সুদর্শনবাবু দ্রুত বুঝতে পারলেন, 'কিছু না করা'কে যুক্তিপূর্ণ করবার জন্যই এই লোক শখটাকে আঁকড়ে ধরে আছে। ভাবটা এমন যেন ভবিষ্যৎ সভ্যতার জন্য বড়ো কোনো দায়িত্ব পালন করতে হয়। রুজি রোজগারের মতো সামান্য কাজের সময় কোথায়?

এতটা পর্যন্ত তাও ঠিক ছিল। সমস্যা শুরু হয়েছে গত কয়েকমাস ধরে। পেশেন্ট হঠাৎ করে ব্ল্যাক ম্যাজিকের দিকে ঝুঁকেছে। প্রাচীন জাদুবিদ্যার নানান ধরনের কায়দাকানুনের বইপত্র সংগ্রহ। সেসবেরই একটা হল অগ্নি-ভক্ষণ। আগুন খাওয়া। নিজের জীবনবৃত্তান্ত বলতে বলতে কাঁধের ঝোলানো ব্যাগ থেকে মলিন একটা ফাইলও বের করল সলিল। তাতে ছেঁড়া, ফাটা, পোকায় কাটা কিছু বইয়ের পাতা। সেখানে আগুন খাওয়ার কায়দা লেখা রয়েছে। অধিকাংশ লেখাই অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। তবে শুধু পাতা সংগ্রহেই থেমে থাকেনি রোগী, ইদানীং সেই আগুন খাওয়া-বিদ্যা নিজের ওপরও ফলাতে চেষ্টা করছে। সেখান থেকেই বিপদের শুরু। একদিন বিছানার চাদর ধরিয়ে ফেলেছিল। আজ মুখের একটা দিক খুব সামান্য হলেও পুড়িয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যে। স্ত্রী লোকাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। তিনি ঘটনা শুনে বলেছেন, গোলমাল মাথার। এখনই চিকিৎসা শুরু না করলে বড়ো ধরনের বিপদ হতে পারে। স্ত্রী আর দেরি করেনি। জোর করেই নিয়ে এসেছে। এটা একদিকে ভালো। মেয়েটা বুঝতে পেরেছে তার স্বামীর

boierpathshala.blogspot.com

সমস্যাটা মাথায়। অনেক শিক্ষিত মানুষেরও এটা বুঝতে সময় লেগে যায়। ডাক্তার বললেও মানতে চায় না। ততক্ষণে যা ঘটার ঘটে যায়।

রোগীর চোখ ঘোলাটে। মণির গতিও অস্বাভাবিক। সুদর্শন রায় সেই ঘোলাটে চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সলিলবাবু, আপনি হঠাৎ আগুন খেতে চাইছেন কেন?'

রোগী খানিকটা লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গিতেই হাসে। বলে, 'আসলে কী জানেন ডাক্তারবাবু, জীবনে বহুবছর ধরে সংগ্রহকর্ম চালাচ্ছি। এবার মনে হল, জিনিসগুলো তো শুধু বাক্সবন্দি করে রাখলেই চলবে না, অ্যাপ্লাই করা উচিত। সংগ্রহ বাক্সে না রেখে যদি আত্মস্থ করতে পারি তাহলে তৃপ্তি বেশি হবে। তা ছাড়া ভালো হয় যদি শখটাকে কাজে লাগাতে পারি।'

'বেছে বেছে, একেবারে আগুন দিয়েই কাজ শুরু করলেন! আপনার সংগ্রহে তো আরও অনেক কিছু ছিল।'

'আগুনটাই বেশি ইন্টারেস্টিং বলে মনে হল। ভাবলাম শুরুর জিনিস কঠিন দিয়ে করলে মন্দ কী?'

'শুধু কঠিন কেন? ভয়ংকরও তো। তাই না?'

'খুব কি ভয়ংকর?'

সুদর্শন রায় বুঝতে পারলেন, অসুখটা ধরতে পারছেন। মানুষটা ভুগছে ডিপ্রেশনে। এখন দেখতে হবে, অবসাদের তীব্রটা ঠিক কোন পর্যায়ে রয়েছে। তিনি হালকাভাবে বললেন, 'আপনার কি মনে হয়, আগুন খাওয়া ততটা ভয়ংকর নয়?'

রোগী কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় না খুব কিছু ভয়ংকর। বিদ্যেটা ঠিকমতো জানা থাকলে ভয়ংকর হবে কেন? প্রথম প্রথম একটু আধটু ভুল করছি। বাড়ির জিনিস পুড়িয়েছি, ইনজুরি হয়ে গেল। চন্দনা বেচারি ঘাবড়ে গেছে। কত করে বোঝালাম, প্র্যাকটিসের সময় অমন হতেই পারে। ট্রাপিজের খেলা দেখাতে গেলে দু-একবার পড়ে হাত-পা ভাঙাটা কি অস্বাভাবিক কিছু? তা বলে মানুষ কি ট্রাপিজে ওঠে না?'

সুদর্শন রায় আরও নিশ্চিন্ত হলেন। ডিপ্রেসন-ই। রোগী নিজের অস্বাভাবিকতায় লজিক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। বোঝানোর চেষ্টা করছে, সে যা করেছে তার মধ্যে যুক্তি আছে। অবসাদ অসুখটাই এরকম। যেমন স্মাইলিং ডিপ্রেশনে বিষণ্ণ মানুষ হাসিঠাট্টা করে অসুখ গোপন করতে চায়। অকারণে উৎফুল্ল ভাব দেখায়।

boierpathshala.blogspot.com

'চন্দনা কে?'

'আমার বউ, বাইরে বসে আছে। ওকে ডাকব?'

'না থাক। আগে আপনার থেকে শুনে নিই। আপনি বলুন হঠাৎ আপনার আগুন খেতে শখ হল কেন?'

রোগী ফ্যাকাশে ধরনের হাসল।

'ডাক্তারবাবু শখের কি কোনো কারণ থাকে? তবে একটা কথা আপনাকে বলতে পারি।'

'কী কথা?'

মানসিক চিকিৎসার প্রাথমিক শর্তই হল বেশি বেশি করে রোগীর কথা শোনা। এতে রোগ ধরতে সুবিধে হয়। ডাক্তার রায়ও সেই পথেই এগোচ্ছেন। সলিল নামের লোকটি টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

'আপনি কথা দিন কাউকে বলবেন না।'

সুদর্শন রায় সৌম্য হেসে বললেন, 'কেন বলতে যাব? আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন বলেই গোপন কথাটা বলবেন। তাই না?'

সলিল তার দাড়িতে হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আসলে আমি ভাবছিলাম, আগুন খাওয়ার ব্যাপারটা দিয়ে যদি কিছু রোজগার করতে পারি। ইফ আই ক্যান আর্ন সামথিং। মানুষ তো আসলে আগুন খেয়েই রোজগার করে।'

কথাটা বলে রোগী উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে।

ভেতরে সামান্য চমকে উঠলেও বাইরে একইরকম শান্ত মুখ রেখে সুদর্শনবাবু বললেন, 'রোজগার মানে? পারফর্ম করবেন বলছেন? ম্যাজিক শো?'

লাজুক হেসে সলিল বলল, 'ঠিকই ধরেছেন। অনেকটা তাই। একসময় তো মানুষ দড়ি বেয়ে উঠে, মাটিতে মাথা গুঁজে, আগুন খেয়ে মানুষকে মজা দিত। দু-চার পয়সা আয়ও হত। তাহলে আমি পারব না কেন? কাজ অনেকটা এগিয়েও রেখেছি। দেখবেন?'

অনুমতির অপেক্ষা না করেই সলিল হাতের ফাইল ঘেঁটে একটা কাগজের টুকরো বের করল। এগিয়ে ধরল সুদর্শনবাবুর দিকে। সাদা কাগজে হাতে লেখা কয়েকটা লাইন। পুরোনো দিনের হ্যান্ডবিলের মতো চারপাশে দাগ দেওয়া—

আসিতেছে আসিতেছে আসিতেছে
আগুনখেকো মানুষ

boierpathshala.blogspot.com

এই মানুষ ছোটো বড়ো মেজো সেজো সব ধরনের আগুন খেয়ে নিতে পারে চোখের পলকে।।
তারপর ছাই হয়ে যাওয়া দুনিয়ায় দাঁড়িয়ে থাকে অবিচল।।
যথাসাধ্য সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিন।

সলিল গদগদ গলায় বলল, 'ঠিক করেছি, ছাপিয়ে বিলি করব। খারাপ হবে?'

সুদর্শনবাবু কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে সহজ ভঙ্গিতে বললেন, 'না খারাপ হবে কেন? তবে কী জানেন সলিলবাবু, আগুন নিয়ে খেলা তো, ভয় করে। আপনার স্ত্রী-র ঘাবড়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

রোগী ঘোলাটে চোখ বড়ো করে বলল, 'কেন ডাক্তারবাবু, আমরা কি সর্বক্ষণ আগুন নিয়ে খেলছি না? আমি, আপনি, চন্দনা সবাই তো খেলছি।'

মানসিক রোগীর এই ধরনের আর্গুমেন্ট নতুন কিছু নয়। অনেক সময় তারা সুস্থ মানুষকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করে কনভিন্স করতে চেষ্টা করে। এদের সঙ্গে কথা বলতে হয় সাধারণ ভঙ্গিতেই। সুদর্শনবাবুও তাই করলেন। প্রেসক্রিপশনের প্যাড টেনে নিতে নিতে মুচকি হেসে বললেন, 'খেলি ঠিকই, তবে সে আগুন যে দেখা যায় না সলিলবাবু। এটাই মজার। যে আগুন দেখা যায় তার সঙ্গে খেলতে ভয় করে, অদৃশ্য আগুনের সঙ্গে খেলতে ভয় করে না। তা ছাড়া সবসময়েই যে জেনে বুঝে খেলি তাও তো নয়।'

রোগী ভুরু কোঁচকালো। তার ভঙ্গিতে সন্দেহ।

সুদর্শন রায় আবার শান্ত গলায় বললেন, 'আপনি জেনেশুনেই আগুন খেতে চান। অসুবিধে কিছু নেই। তবে তার আগে নিজেকে একটু তৈরি করে নিতে হবে। আগাম কিছু নিরাপত্তাও নিতে হবে। প্রিকশনারি মেজারের মতো। বড়ো বিপদের হাত থেকে বাঁচতে সব ব্যাপারেই তো একটা প্রিকশন নিতে হয়।'

'সেটা কীরকম?'

সুদর্শনবাবু সামান্য হাসিমুখে বললেন, 'আপনার স্ত্রীকে বরং সেটা বুঝিয়ে বলে দিই। আপাতত বেশি কিছু নয়, কয়েকটা ট্যাবলেট, ক্যাপসুল দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি।'

ভারসাম্যহীন উৎসাহে সলিল বলল, 'সেটাই ভালো হবে ডাক্তারবাবু। নামছি যখন আটঘাট বেঁধেই নামি। চন্দনাকে ডেকে আনি?'

ইন্টারকম তুলতে তুলতে সুদর্শন রায় বললেন, 'না, আমি ডেকে নিচ্ছি।

boierpathshala.blogspot.com

আপনি বরং অল্পক্ষণের জন্য বাইরে গিয়ে বসুন।'

সলিল বাধ্য ছেলের মতো মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল। তখনই তার চোখ পড়ল টেবিলে রাখা বইয়ের গাদার ওপর। কৌতুকভরা গলায় বলল, 'আপনি রবি ঠাকুরের লেখাও পড়েন!'

সুদর্শনবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'কেন অসুবিধে কী আছে? আপনি পড়েন না?'

'ডাক্তার মানুষ, ছুরি কাঁচির লোক...।'

'এ জিনিস সবাই পড়ে। আপনিও পড়বেন। ভালো লাগবে।'

মাথা চুলকে সলিল বলল, 'পড়তাম ডাক্তারবাবু। একসময় পড়তাম। তারপর কালেকশন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। দু-এক লাইন মনেও আছে।'

'বাঃ, খুব ভালো।'

কিছু বোঝার আগেই সলিল চাপা গলায় ডান হাত শূন্যে তুলে আবৃত্তি শুরু করল—

'জগৎ জুড়ে উদার সুরে/ আনন্দগান বাজে,/ সে গান কবে গভীর রবে/ বাজিবে হিয়া মাঝে/বাতাস জল আকাশ আলো...'

সুদর্শনবাবু মুহূর্তখানেক থমকে থেকে রোগীর দিকে গভীর মনোযোগে তাকালেন। না, অসুখ যতটা প্রাথমিক মনে হয়েছিল, ঘটনা তা নয়। মনে হয়েছিল, ডিসথাইমিয়া। এক ধরনের অল্পমাত্রার দীর্ঘমেয়াদি অবসাদ। এখন মনে হচ্ছে, রোগ তার থেকেও জটিল। এখনই ক্লিনিকে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু না করলে, এই রোগী খুব দ্রুত কোনো অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে।

রোগীর স্ত্রী-র নাম চন্দনা। সুদর্শন রায় যতক্ষণ ধরে তাকে অসুখের তীব্রতা বোঝালেন, ততক্ষণ সে জড়োসড়ো হয়ে বসে রইল মাথা নামিয়ে। প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ করে সুদর্শনবাবু মেয়েটির দিকে এগিয়ে বললেন, 'আশা করি আপনাকে অসুখটার গুরুত্ব বোঝাতে পেরেছি।'

চন্দনা মাথা নাড়ল। অস্ফুটে বলল, 'ভালো হবে ডাক্তারবাবু?'

সুদর্শন রায় স্মিত হাসলেন।

'কেন হবে না? নিশ্চয় হবে। আজকাল চিকিৎসার অনেক উন্নতি হয়েছে। দুটো ক্লিনিকের নাম লিখে দিয়েছি। যে-কোনো একটায় ভর্তি করতে পারেন। প্রথমটা একটু কস্টলি, দ্বিতীয়টায় খরচপাতি কিছুটা কম। আমার মতে আজই ভর্তি করা উচিত। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। আমি ঘুমের ওষুধ লিখে দিলাম। আজকের রাতটা কোনো সমস্যা হবে না। পারলে কাল সকালেই ভর্তির ব্যবস্থা

boierpathshala.blogspot.com

করবেন। ভর্তি করলে ওরা আমাকে খবর দেবে। আমি দেখে আসব।'

মেয়েটিকে বাইরে থেকে দেখে শক্ত বলেই মনে হল সুদর্শনবাবুর। ঠোঁট কামড়ে বলল, 'কেন এমন হল ডাক্তারবাবু?'

'দেখুন, এভাবে চট করে বলা যায় না। এই ধরনের অসুখের অনেক কারণ থাকে। ভেতরেও থাকে, বাইরেও থাকে। সবদিক থেকেই চিকিৎসা করতে হয়। আচ্ছা, আপনার স্বামীর এই কালেকশনের অভ্যেসটা কবে থেকে শুরু?'

চন্দনা একটু চুপ করে থেকে যেন সময় হিসেব করল। বলল, 'বিয়ের পর থেকেই দেখছি। মাঝখানে একটা ছোটো চাকরি করছিল। তখন ছাইভস্ম নিয়ে এত মাথা ঘামাতে দেখিনি। ছেলেটা হওয়ার পর দু-বছরের মাথায় চাকরিটা চলে গেল। তারপর একেবারে খেপে উঠল। সারাক্ষণ বাইরে বাইরে পড়ে থাকে। জিজ্ঞেস করলে বলে, কালেক্ট করছিলাম।'

অসুখের বাইরের কারণ অনেকটাই ধরা পড়ে যাচ্ছে। সুদর্শন রায় খানিকটা নিশ্চিন্তেই বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, আপনাদের সংসার চলে কীভাবে?'

চন্দনা মুখ তুলে ক্ষণিকের জন্য সুদর্শন রায়ের চোখের দিকে তাকাল।

'জানি না।'

সুদর্শন রায় মুখ নামিয়ে নীচু গলায় বললেন, 'আপনি খুব বেশি চিন্তা করবেন না। মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে।'

চন্দনা গায়ের আঁচলটা টেনে নিয়ে বলল, 'ডাক্তারবাবু, আপনার ফি?'

সুদর্শনবাবু রায় উঠতে উঠতে বললেন, 'আপনারা এবার আসুন, অনেক রাত হয়ে গেল।'

চন্দনা ধীর গলায় আবার বলল, 'আপনার ফি কত দেব?'

'থাক, আপনি আসুন। পেশেন্টের ওপর খেয়াল রাখবেন। একা ছাড়বেন না। আর শুনুন ওই যে দু-নম্বর ক্লিনিকটার নাম লিখলাম, কাল সকালেই ওখানে ভর্তি করে দিন। টাকাপয়সা নিয়ে এখন ভাবতে হবে না, আমার বলা থাকবে।'

চন্দনা অবাক গলায় বলল, 'বলা থাকবে মানে!'

এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সুদর্শন রায় অল্প হাসলেন। বললেন, 'আপনার স্বামী মানুষটি কিন্তু সুন্দর আবৃত্তি করতে পারে। ভারি সুন্দর। অমন একটা আনকমন কবিতা...তারও একটা রেমুনারেশন আছে তো। ডাক্তারের ফি থাকবে, আবৃত্তিকারের থাকবে না এ কেমন কথা? ধরে নিন চিকিৎসার প্রাথমিক খরচটা সেই রেমুনারেশন। আমি ব্যবস্থা করব।'

boierpathshala.blogspot.com

চন্দনা মেয়েটি এমন কথা আগে কখন শুনেছে বলে মনে হল না। সে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে রইল। সুদর্শন রায় বললেন, 'নিন, আসুন এবার। আমাকে উঠতে হবে। এরপর ওষুধের দোকানও বন্ধ হয়ে যাবে।'

সুদর্শনবাবু ভয়ে ভয়ে ছিলেন, বাড়িতে ফিরলে কথাকলি রাগারাগি করবে। কথাকলি কিছু বলল না। স্নান-টান সেরে রাতে খেতে বসে বলল, 'বাবা একটা কথা আছে। শুনতে হবে কিন্তু।'

প্রমাদ গুনলেন সুদর্শন রায়। এই রে! এবার কলকাতার প্র্যাকটিসটাও মেয়ে বন্ধ করতে বলবে নাকি? এ ব্যাপারে মেয়েটা একেবারে বসানো সুনন্দা হয়েছে। একবার বলে ফেললে না করা পর্যন্ত ঘ্যানঘ্যান করেই যাবে। সুদর্শনবাবু দ্রুত কথা ঘোরানোর জন্য বললেন, ' বুঝলি কথা, আজ একজন ইন্টারেস্টিং পেশেন্ট পেলাম। সেইজন্যই এত দেরি।'

বাটি থেকে বাবার প্লেটে চিকেন তুলে দিতে দিতে কথাকলি বলল, 'ওসব ছাড়ো। আগে বলো আমি যা বলব তুমি শুনবে?'

সুদর্শন রায় খানিকটা নার্ভাস হলেন। ঠিক এইভাবে সুনন্দা বলত। একবার ঝগড়া হয়েছিল খুব। তখন হাসপাতালেও যেতে হত। কথা জন্মায়নি। একদিন সকালে চা খেতে খেতে সুনন্দা বলল, 'আজ হাসপাতালে যেতে হবে না। আজ তোমার ছুটি।'

সুদর্শনবাবু আকাশ থেকে পড়লেন।

'খেপেছ নাকি ! আজ আমার আউটডোর।'

মিটিমিটি হেসে সুনন্দা বলল, 'হ্যাঁ খেপেছি, আজ সারাদিন তুমি বাড়িতে থেকে আমার ট্রিটমেন্ট করবে।'

'রসিকতা কোরো না নন্দা।'

সুনন্দা চায়ের কাপ নামিয়ে বলল, 'রসিকতা তো করছি না। আমি সিরিয়াসলি বলছি।'

সুদর্শনবাবু চায়ের কাপ নামিয়ে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বলেছিলেন, 'এরকম সিরিয়াস কথা না বললেই খুশি হব। আমি স্নানে গেলাম, তুমি খাবার দিতে বলো।'

সুনন্দা সেদিন আর কিছু বলেনি। রাতে বাড়ি ফিরে শোওয়ার ঘরে রজনী-গন্ধার ক-টা স্টিক দেখে সুদর্শনবাবু জেনেছিলেন, সেদিন তাঁদের বিবাহবার্ষিকী ছিল।তৃতীয় বছরের বিবাহবার্ষিকী।

সেই আপশোস অনেকদিন ছিল। আজ সুনন্দা নেই, কিন্তু আজও বিয়ের

boierpathshala.blogspot.com

দিন বাড়ি থেকে বের হন না। সুদর্শনবাবু গ্লাস থেকে জল খেয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা কী?'

কথাকলি সহজভাবে বললেন, 'তেমন কিছুই নয়, আমি ঠিক করেছি, তোমার সঙ্গে ঝিলডাঙায় যাব। ওই পিঁপড়ে কন্যাকে দেখব। তুমি বারণ করবে না।'

নিশ্চিন্ত হলেন সুদর্শনবাবু। হেসে বললেন, 'পিঁপড়ে কন্যা! বাঃ খারাপ বলিস নি তো! কিন্তু এখনই কি অতটা বলা যায়? আমি তো দূর থেকে একটা রিলেট করার চেষ্টা করছি মাত্র। গেলে বুঝতে পারব সত্যি পিঁপড়ের সঙ্গে কোনো যোগ আগে কিনা। মনে হয় না আছে।'

কথাকলি বলল, 'বাবা, তোমার ওই বানেরহাটের গঙ্গাপদ একটা ম্যাগাজিন পাঠিয়েছে। বিকেলের পোস্টে এসেছে। বাড়ি ফিরে এসে দেখলাম।'

খাওয়া থামিয়ে সুদর্শনবাবু বললেন, 'ম্যাগাজিন! হ্যাঁ, ছেলেটার লেখালেখির শখ ছিল। মাঝে মাঝে পড়তে দিত। হাস্যকর এফর্ট। তবে অনেস্ট। অনেস্টলি চুরি করার থেকে অনেস্টলি কবিতা লেখা ভালো।'

কথাকলিও হাসল। বলল, 'ফিরে এসে তোমার চিঠিপত্র চেক করতে গিয়ে ''বানেরহাট সংবাদ'' কাগজটা নজরে পড়ল।'

সুদর্শন রায় খাওয়ায় মন দিতে দিতে বললেন, 'বোঝো ঠ্যালা। এখানেও ওসব পাঠাচ্ছে!'

কথাকলি সকৌতুকে বলল, 'বাবা, গঙ্গাপদ তোমার ওই ফুলকে নিয়ে একটা থার্ড গ্রেডের কবিতা লিখে ফেলেছে দেখলাম।'

খাওয়া থামিয়ে সুদর্শন রায় বললেন, 'কবিতা!'

'হ্যাঁ, কী যেন সব লাইন, বাপরে! শুরুটা হল— ফুল, তুমি ঝড়ের খবর জানো, জলের খবর জানো...সবাই অবাক হয়...মনের খবর কী জানো...ঠিক মনে নেই তবে মজার।'

কথা শেষ করে কথাকলি হাসতে লাগল।

মেয়েকে হাসতে দেখলে সুদর্শনবাবু প্রাণে আরাম পান। এখন কিন্তু চোয়াল শক্ত করে বললেন, 'ম্যাগজিনটা কোথায়?'

'তুমি এমন বলছ বাবা যেন বিরাট কিছু। তোমার বেডরুমে রেখে দিয়েছি। শোওয়ার আগে দেখে নিও।'

ঘুমিয়ে পড়ার আগে সুদর্শন রায় সেই কবিতা পড়লেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন, আর দেরি নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঝিলডাঙায় যেতে হবে। ঘটনা

boierpathshala.blogspot.com

জানাজানি হয়ে যেতে শুরু করেছে। গঙ্গাপদ এই ধরনের একটা কেলেঙ্কারি করে বসবে ভাবা যায় না। মেয়েটাকে নিয়ে কবিতা লিখে ফেলল! শুধু লিখল না, ছাপিয়েও ফেলল! যতই সামান্য হোক, ছাপা জিনিস তো; একজন থেকে দশজনের মুখে এবার ঘটনা ছড়াতে পারে। মেয়েটা বড়ো ধরনের কোনো বিপদে জড়িয়ে পড়বার আগে সেখানে পৌঁছতে হবে।

গভীর দুশ্চিন্তা নিয়ে সুদর্শনবাবু ঘুমোতে গেলেন। তখনও তিনি জানতেন না, পরদিন কাকভোরে তাঁর ঘুম ভাঙবে টেলিফোনের আওয়াজে। কাঁদতে কাঁদতে একটি মেয়ে বলবে, 'ডাক্তারবাবু, কাল অনেক রাতে ও বাথরুমে ঢুকে নিজের গায়ে আগুন দিয়েছে।' সুদর্শনবাবু জড়ানো গলায় বলবেন, 'আপনি কে বলছেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি কে? এত সকালে কেন আপনি ফোন করেছেন?' মেয়েটি তখন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠবে। বলবে, 'আমার নাম চন্দনা ডাক্তারবাবু। প্রেসক্রিপশনের নম্বর দেখে হাসপাতাল থেকে বলছি। ওরা বলছে ওকে বাঁচানো খুব মুশকিল। শরীরের ওপরের অংশ পুরোটাই পুড়ে গেছে।'

ডাক্তার সুদর্শন রায় একটা মন খারাপ করা সকালের খবর না জেনেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

boierpathshala.blogspot.com

সাতচল্লিশ

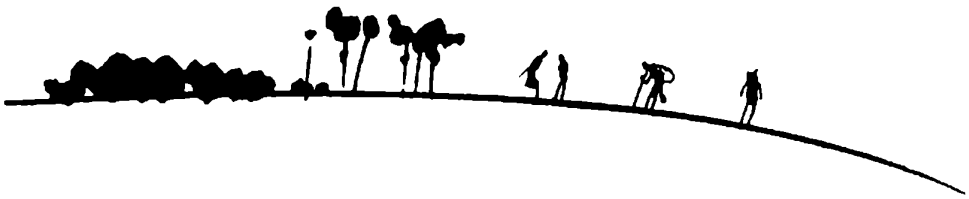

শ্রীমতী আলো চ্যাটার্জি ঘাড় নীচু করে বসে আছেন। বসে আছেন মোড়ার ওপর। বসার ভঙ্গিতে একটা 'গ্যাঁট' হয়ে থাকার কায়দা রয়েছে। হাতে একটা আয়না। ভাবটা এমন যেন পিছনে কোনো যুদ্ধ চলছে তিনি আয়না দিয়ে সেদিকে নজর রাখছেন।

তিনি অর্ধনগ্ন। অর্ধ কেন? তার থেকে একটু বেশিই বলা যেতে পারে। গায়ের ম্যাক্সিটা খুলে বুক থেকে জড়িয়ে রেখেছেন। গলা, কাঁধ, পিঠ, কোমর, দু-পায়ের গোছ সবই উন্মুক্ত। ঝুল অনুযায়ী এই ম্যাক্সি নামার কথা পায়ের পাতা পর্যন্ত, কিন্তু এক্ষেত্রে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত নিয়ে তিনি থামিয়ে দিয়েছেন। সেটুকুও যে সবসময় থাকছে এমন নয়। মাঝে মধ্যেই বেসামাল হয়ে পড়ছে।

আলো চ্যাটার্জির কাপড়-চোপড়ের দিকে খেয়াল নেই। তিনি প্রয়োজনও মনে করছেন না। আসলে এই মুহূর্তে শরীরের আব্রুর বদলে তাঁর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ নিজের মাথা। সত্যি সেখানে প্রায় যুদ্ধ চলছে। বালিকা পরিচারিকা তাঁর মাথার পিছনদিকের চুলে রং লাগাচ্ছে। চুলের পরিমাণ বেশি নয়। কয়েকগাছি মাত্র। আলো দেবী যদিও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে ঘাড় নীচু অবস্থাতেই তাকে নানাভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন। প্রতিটি নির্দেশের সঙ্গে থাকছে ধমক। প্রয়োজনে অল্প বিস্তর প্রহার। ঘাড় নীচু করে বসে থাকার কারণে তিনি সোজা হয়ে মারধর করতে পারছেন না। বালিকাকে কাজ থামিয়ে সামনে আসতে হচ্ছে।

'অ্যাই ছুঁড়ি ঘাড়ের কাছটায় ঠিকমতো দিয়েছিস... কানের পিছনটায় কী হল...মারব এক থাপ্পড়...ইস কানের ওপরে গোলমাল পাকালি...তোর কানদুটো

boierpathshala.blogspot.com

ছিঁড়ে দিতে পারলে...আরে আরে করিস কী...ওখানে যে বেশি হয়ে গেল...ইস চাঁদিটাই বাদ দিলি...চুলের মুঠি টেনে উপড়ে দেব হারামজাদি...আয় মাথাটা এদিকে বাড়া...।'

বালিকা কাজ থামিয়ে খুব সহজভাবেই মাথা বাড়াল। আলো চ্যাটার্জি চুল উপড়ে দেওয়ার বদলে ঘাড় নামানো অবস্থাতেই মেয়েটির ডান কান মুলে দেন। মাথা বাড়ানো অবস্থাতেই বালিকা বলল, 'কানমলা হয়েছে মায়েমা?'

শ্রীমতী চ্যাটার্জি বললেন, 'হ্যাঁ হয়েছে, নে এবার ঠিক করে কর।'

বালিকা এর আগে দু-বার চড় খেয়েছে। একবার গালে, একবার পিঠে। কিন্তু তারপরেও সে পুলকিত। অত্যধিক পুলকিত। মানুষের মাথায় তুলি দিয়ে রং লাগানোর মতো রোমাঞ্চকর কাজের কাছে কানমলা, কিল-চড় অতি তুচ্ছ জিনিস। এরকম একটা কাজের দায়িত্ব যে সে পাবে জীবনে কল্পনাও করতে পারেনি। এর জন্য সে আরও বড়ো ধরনের শাস্তি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত। শুধু মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে, কোনোভাবেই যেন এই কাজ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া না হয়।

চুলে রং করার এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আলো চ্যাটার্জি বাড়িতে করতেন না। বিউটি পার্লারে যেতেন। গতবার একটা কাণ্ড হওয়ার পর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আর পার্লারে যাবেন না। রংচং যা মাখবেন বাড়িতেই মাখবেন। নিজে করবেন। সেইমতো রং, ব্রাশ, গ্লাভস সবই কেনা হয়েছে। সমস্যা হচ্ছে, মাথার পিছনটা নিয়ে। সামনেটা সামলাতে পারলেও পিছনের অংশ গোলমাল করছে। যারা অনেকদিন ধরে এসব কাজে অভ্যস্ত তাদের কাছে সামনে পিছন কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু তিনি তো আর সাজগোজের মধ্যে বেশিদিন ঢোকেননি। পঞ্চাশ পেরিয়ে যাওয়ার পর ঢুকেছেন। মেয়ে স্টার হওয়ার পর। সমস্যাটা এটাই। যে-বয়েসে সাজগোজের শখ আহ্লাদ থাকার কথা সে-বয়সটা কেটেছে পরের বাড়ির হেঁশেল ঠেলতে। চুলে রং তো দূরের কথা, সামান্য পাউডার মাখারও সুযোগ ছিল না। ইচ্ছেও হয়নি। এখন হয়েছে। বেশি করেই হয়েছে। একসময় যা পারেননি এখন উসুল করে নিতে হবে। স্টারের মা বলে কথা। সব মায়েরা পারে, কিন্তু স্টারের মায়েরা কখনও শাঁকচুন্নির মতো থাকতে পারে না। বয়স বাড়লেও তাকে সাজতে হয়। বেশি করে সাজতে হয়।

বিউটি পার্লার ত্যাগ করে বাড়িতেই সাজসজ্জা শুরুর পিছনে কারণ আছে। যদিও বাড়িতে করতে গিয়ে প্রথমবার তিনি বড়ো ধাক্কা খেয়েছিলেন। পিছনের খানিকটা জায়গা জুড়ে রংই পড়েনি। শুধু পড়েনি নয়, তিনি জানতেও পারেননি।

boierpathshala.blogspot.com

রাতে মোম শ্যুটিং সেরে ফিরে আসার পর আঁতকে উঠল।

'একী মা! এ তুমি কী করেছ!'

আলো দেবী চোখমুখ কুঁচকে বললেন, 'কেন কী করেছি?'

'মাথার পিছনে সাদা চাকতি নিয়ে ঘুরছ কেন? এটা আবার কী স্টাইল! পার্লারে তোমাকে এইভাবে কালার করে দিল?'

আলো দেবী মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'পার্লারে নয়, আমি নিজেই রং করেছি।'

মোম চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'সেকি! কেন?'

'ওখানে আমি আর যাব না। ওসব আমার পোষায় না।'

মোম কৌতুকভরা গলায় বলল, 'কেন! সেখানে আবার তোমার কী ঘটল?'

আলো চ্যাটার্জি থমথমে গলায় বললেন, 'কিছু ঘটেনি। আমার ইচ্ছে তাই যাব না। অত কৈফিয়ত না চেয়ে পিছনে কী হয়েছে সেটা বল।'

কথা বলতে বলতে আলো দেবী মাথার পিছনে হাত দিলেন। মোম মুখে হাত দিয়ে খিল খিল আওয়াজে হেসে উঠল।

'হাত দিয়ে কী হবে? হাত দিলে কি রং ছোঁয়া যায়? সত্যি তুমি যা একেকটা কাণ্ড কর না মা! দাঁড়াও আমি ঘর থেকে আয়না এনে দেখাচ্ছি। ঠিক আছে তুমি আমার ঘরে এসো।'

মেয়ের ড্রেসিংটেবিলের সামনে দুরুদুরু বুকে দাঁড়ালেন আলো চ্যাটার্জি। মোম অন্য আয়না পিছনে ধরে যা দেখাল তা সত্যি আতঙ্কিত হওয়ার মতোই। খাবলা করে একটা অংশ একেবারে সাদা। রংই লাগেনি!

আলো দেবী কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'কী হবে এখন?'

মোম হাসতে হাসতে বলল, 'কী আর হবে? কালই পার্লারে গিয়ে ঠিক করবে।'

'বললাম তো ওখানে যাব না।'

'কী হয়েছে বলো দেখি।'

'কিছু হয়নি।'

মোম মিটিমিটি হেসে বলল, 'নিশ্চয় কিছু হয়েছে, চেপে যাচ্ছো।'

আলো দেবী ঝামটা দিয়ে বললেন, 'হলে হয়েছে। এখন কী করব সেটা বল্।'

'কী আর করবে? এভাবেই ঘুরে বেড়াও। তবে রাতের দিকে বাড়ি থেকে চট করে বেরিও না। বেরোলেও মাথায় ঘোমটা-ফোমটা কিছু দিও। রাস্তাঘাটে

boierpathshala.blogspot.com

ছোটো ছেলেমেয়েরা দেখলে ভয় পাবে।'

'ঠাট্টা করছিস?'

'তুমি ঠাট্টা করার মতো কাজ করেছ, ঠাট্টা করব না তো কী করব? গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসব?'

'তুই ঠিক করে দিতে পারবি?'

মোম চোখ কপালে তুলে বলল, 'তোমার মাথা কি পুরো গেছে মা? আমি কাজকর্ম ফেলে এখন থেকে তোমার মাথায় রং মাখাতে বসব!'

আলো দেবী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে রাগের গলায় বললেন, 'ঠিক আছে তোকে কিছু করতে হবে না। যা করার আমিই করব।'

মোম ফিক করে হেসে বলল, 'পার্লারে কী হয়েছে বললে না তো?'

আলো দেবী উত্তর না দিয়ে রান্নাঘরের দিকে রওনা হলেন। পার্লারে কী হয়েছে সেটা আর পাঁচজনকে বলার মতো নয়। নিজের মেয়েকেও নয়। গতবার সেখানে একটি মেয়ে তাঁকে 'দিদিমা' বলে ডেকেছে। তাও চুলে রং মাখার আগে নয়, রং মাখার পরে। নিজের গ্যাঁট থেকে গাদাখানেক পয়সা খরচ করে সাজগোজ করার পর যদি 'দিদিমা' ডাক শুনতে হয় তখন মাথার ঠিক থাকে? উচিত ছিল চড় মেরে হারামজাদি মেয়ের দাঁতগুলো ফেলে দেওয়া। নিজেকে অনেক কষ্টে সেদিন সামলেছিলেন। বিউটি পার্লারের মেয়ে বাড়ির কাজের লোক নয়। ইচ্ছে করলেই ঠাসিয়ে চড় দেওয়া যায় না। তা ছাড়া স্টারের মাকে অনেক মাথা ঠান্ডা রেখে চলতে হয়। তিনি চড় লাগালেন আর পরদিন কোনো পত্রিকা-টত্রিকায় ফট করে যদি খবর হয়ে যেত? খবরের হেডিং হত—'দিদিমা' ডাকায় চড়। লেখা হত, 'বিখ্যাত টিভি অভিনেত্রী মোম চ্যাটার্জির মা শ্রীমতী আলো চ্যাটার্জি গতকাল দুপুরে এক সজ্জাকর্মীকে চড় মেরেছেন। বিউটি পার্লারে কর্মরতা সেই মেয়েটির অপরাধ আলো দেবীকে তিনি "দিদিমা" বলে ডেকেছিলেন।' ব্যস, কেলেঙ্কারি হয়ে যেত। টি টি পড়ে যেত চারদিকে। আজ যে ফটরফটর করছে সেই মেয়েই তাঁকে ছেড়ে কথা বলত না। তাই অপমান লুকিয়ে রেখে তিনি পার্লারে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একবার ভেবেছিলেন, জায়গা বদলাবেন। কলকাতা শহরে আবর্জনা ফেলার জায়গার অভাব আছে, বিউটি পার্লারের অভাব নেই। কিন্তু দ্বিতীয়বারের চিন্তায়, ইংরেজিতে যাকে বলে 'সেকেন্ড থট', মনে হল সেখানেও যে এই কথা শুনতে হবে না তার কী গ্যারান্টি? কোনো গ্যারান্টি নেই। জায়গা বদলালেও মানুষ তো বদলাবে না। আলো চ্যাটার্জি তো ফিল্ম স্টার রত্না বা পল্লবী হয়ে যাবেন না। তার চেয়ে বাড়িই

boierpathshala.blogspot.com

ভালো। যা করবার বাড়িতেই করবেন। এমন তো নয় হাতে সময় নেই। যথেষ্ট সময় আছে। সত্যি কথা বলতে কী, নানা ধরনের রূপচর্চার মধ্যে তিনি আজকাল থাকতে পছন্দ করেন। কিন্তু কে জানত প্রথমবারেই এই কাণ্ড হবে?

এই কারণে তিনি কাজের মেয়েটিকে অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে নিয়েছেন। তার দায়িত্ব মাথার পিছনদিকটা। দায়িত্ব দিয়েও সতর্ক হয়ে আছেন, যাতে আবার কোনো গোলমাল না হয়ে যায়।

রং লাগানো শেষ হলে বালিকা উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'মায়েমা, আর এক পোঁচ দেব?'

ঘাড় ঘুরিয়ে কঠিন চোখে তাকালেন আলো দেবী।

মেয়েটি দাঁত বের করে বলল, 'দিই না। দুই পোঁচে রং ভালো থাকে। আমার বাবায়ে জানলায় যখন রং মারে দুই পোঁচ মারে।'

আলো দেবী অতিরিক্ত শীতল গলায় বললেন, 'জিনিসপত্রগুলো নিয়ে এখনই তুই আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা। নইলে কপালে দুঃখ আছে।'

রং মাখার পরে নিয়ম হল অপেক্ষা করা। মাথা যতক্ষণ না শুকোচ্ছে ততক্ষণ বসে থাকা। আলো দেবী ঠিক করলেন, অপেক্ষা তিনি করবেন, তবে বসে থেকে নয়। মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে করবেন। মোমের সঙ্গে তাঁর জরুরি কথা আছে। অন্যদিন এই সময় মেয়েকে বাড়িতে পাওয়ার কোনো প্রশ্নই থাকে না। আজ আছে। নিজের ঘরে শুয়ে মোবাইলে বকবক করছে। শুধু আজ নয়, কালও সে কাজে যায়নি। কেন যায়নি এই নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। মাথা ধরেনি, জ্বরজারি কিছু হয়নি তবু সে কেন কাজে যাবে না? সে কি নিজের ইচ্ছেতে শ্যুটিঙে যায়নি, নাকি অন্য কিছু ঘটেছে? প্রোডিউসার, ডিরেক্টরদের সঙ্গে ঝগড়া? মাঝে মাঝে ঝগড়া করা ভালো। এতে বড় আর্টিস্টের প্রেস্টিজ থাকে। কারণ না থাকলেও ঝগড়া করতে হয়। নইলে মনে হয় হ্যাংলা। হাতে কাজ নেই। তার মেয়ের বেলায় কি সেরকম কিছু ঘটেছে? হলে ঠিক আছে, না হলে ঝামেলা। এটা খোলসা করে না জানা পর্যন্ত মনটা খচখচ করছে।

মোম খাটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে টেলিফোনে গল্প শুনছে। টেলিফিল্মের গল্প। শোনাচ্ছে ঋত্বিক পাল। ছেলেটা ইতিমধ্যে টেলিফিল্মে নাম করেছে। আর পাঁচটা বোকা বোকা ধরনের কাজ নয়। ছবিতে একটা টানটান ভাব থাকে। দেখতে বসলে চট করে ওঠা মুশকিল। কাগজগুলোও প্রশংসা করছে। এই গল্পটাও তাই—

বিয়ের সতেরো দিনের মাথায় দুর্ঘটনায় স্ত্রী-র মৃত্যু হল। নায়ক আবার বিয়ে

boierpathshala.blogspot.com

করেছে। আবার বিয়ে করার জন্য নিজের যে খুব কিছু ইচ্ছে ছিল এমন নয়। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, অফিসের সহকর্মীদের চাপেই খানিকটা করতে বাধ্য হয়েছে। তারা বলেছে, বয়স যখন এত অল্প, আবার বিয়ে না করার কোনো মানেই হয় না। তা ছাড়া মাত্র সতেরো দিনে মেয়েটির সঙ্গে তার কী-ই বা সম্পর্ক হয়েছে। না মনের, না শরীরের। সুতরাং কোনো বাধাও নেই। কথাটা সত্যি। নায়ক শেষ পর্যন্ত বিয়ে করল। দ্বিতীয় স্ত্রীকে দেখতে ভালো। মেয়েটির স্বভাব-চরিত্রও ভালো। সহজ সরল। স্বামীকে সে গ্রহণ করলও গভীর আনন্দে। তবু সমস্যা শুরু হল। সেই সমস্যা ভয়ংকর। নায়ক যখনই তার নতুন স্ত্রী-র সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে যায়, প্রথম স্ত্রীকে দেখতে পায়! আলাদা করে বাইরে দেখতে পায় না, দেখতে পায় মেয়েটির মধ্যে। তার কথায়, শরীরে, শীৎকারে। সতেরো দিন ধরে দেখা মুখে সে হাসে। দু-হাত বাড়িয়ে ডাকে। মরা বউয়ের ভঙ্গিতে আদর করে। গোড়াতে নায়ক ঘটনাকে একধরনের কোইনসিডেন্স বলে ধরে নেয়। পরে যত সময় যেতে থাকে সে বুঝতে পারে, তা নয়। কোথাও একটা বড়োরকম মিল আছে। অন্য সময় আলাদা, শুধু শরীর কাছে এলেই মিলগুলো ভীষণভাবে দেখা দিচ্ছে। নায়ক ভয় পেতে শুরু করে। তার মনে হতে থাকে মরা বউ এইভাবে ফিরে এসেছে। সে মেয়েটিকে অ্যাভয়েড করতে শুরু করে। রাতে অন্য ঘরে শোয়। বারান্দায় পায়চারি করে। মেয়েটি প্রথম প্রথম অবাক হয়। তারপর বিরক্ত হয়, রাগ করে। শেষে স্বামীকে ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। নায়কের গভীর হতাশার মধ্যে দিয়ে গল্প শেষ হয়।

গল্প শোনা শেষ হলে মোম উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, 'বাহ্।'

ঋত্বিক টেলিফোনের ওপ্রান্তে হাসে। বলে 'থ্যাঙ্ক ইউ মোম।'

'ছবির নাম কী ভেবেছেন ঋত্বিকদা?'

'সতেরো দিন। খারাপ হবে?'

মোম মাথার তলার বালিশ ঠিক করতে করতে বলল, 'খারাপ কী বলছেন! ওয়ান্ডারফুল হবে।'

'শুধু প্রশংসা করলে চলবে না মোম, আপনাকে হ্যাঁ বলতে হবে। ''ইতি''র ক্যারেক্টরটা আপনাকে ভেবেই লেখা। সুজন সেইভাবে স্ক্রিপ্ট করছে।'

'এই রে! আমাকে একেবারে পেতনি বানিয়ে দিলেন?' হাসতে হাসতে বলল মোম।

ঋত্বিক হেসে বলল, 'ক্ষতি কী? অনেকদিন তো মানুষের পার্ট করলেন। আপনি রাজি কিনা বলুন। বাজেট আপনাকে ধরেই করা হয়েছে। আপনার যা

boierpathshala.blogspot.com

রেট তার থেকে খানিকটা বেশিই হবে।'

মোম হাই তুলে বলল, 'ইট্‌স মাই প্লেজার। আমি বাজেটের জন্য বলছি না। স্টোরিলাইনটা খুব ইন্টারেস্টিং করে ভাবা হয়েছে।'

ঋত্বিক উৎসাহ নিয়ে বলল, 'তাহলে সপ্তাহখানেক পরে কাজ শুরু করি?'

মোম একটু চুপ করে রইল। বলল, 'সরি, এইটা কথা দিতে পারছি না।'

'ও কে, তাহলে দশদিন?'

'সেটাও বলতে পারছি না যে ঋত্বিকদা।' আধো গলায় বলল মোম। কোন কথায় কোন ধরনের গলা ব্যবহার করতে হয় এই জগতে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

'মানে?'

মোম এবার শব্দ না করেই হাসল।

'আসলে কী জানেন, আমার আউটডোরে একটা কাজ পড়ে গেছে।'

ঋত্বিক উদ্‌বিগ্ন গলায় বলল, 'কতদিনের কাজ?'

'সেসব কিছুই জানি না। ইনফ্যাক্ট আমি শিডিউলের জন্য এখন ওয়েট করছি। আপনি বরং একটা কাজ করুন ঋত্বিকদা, এবারের মতো অন্য কাউকে নিয়ে নিন। যদিও আমার খুব খারাপ লাগবে। ভূত পেতনির রোল তো চট করে পাওয়া যায় না।'

'না না, তা কী করে হবে! আপনাকে ভেবেই সব ঠিক করা হয়েছে। চ্যানেলকে বলাও হয়েছে। মোম চ্যাটার্জি কাজ করবে বলায় তারা অনেকটা নিশ্চিন্ত। তা ছাড়া চরিত্রটা কমপ্লিকেটেড। সবাই পারবে না।'

মোম হেসে বলল, 'ভূত প্রেতের চরিত্র জটিল তো হবেই। আপনি অপেক্ষা করবেন না। বুঝতেই পারছেন, আমার ইন্টারেস্ট ছিল বলেই গল্পটা মন দিয়ে শুনলাম। ইনফ্যাক্ট কাজটা করতে পারব না ভেবে খানিকটা হতাশই লাগছে। কিন্তু আপনাকে ঝুলিয়ে তো রাখতে পারি না।'

ও-প্রান্তে ঋত্বিক খানিকটা চুপ করে রইল।

'একটা কাজ করা যায় না। আমি আরও দশদিন পিছিয়ে দিচ্ছি। তার মধ্যে ওরা যদি আপনাকে শিডিউল না দেয়, তাহলে ওদেরটা আপনি পিছিয়ে দেবেন।'

মোম পাশ ফিরল। পায়ের কাছে রাখা বালিশটা আঁকড়ে ধরে নিজের মনেই হাসল।

'না ঋত্বিকদা, সেটা সম্ভব নয়। ওদের আমি কথা দিয়ে ফেলেছি, কাজটা আমি করবই।'

'আমি কি কাজটা সম্পর্কে একটু জানতে পারি? যদিও প্রশ্নটা করা ঠিক

boierpathshala.blogspot.com

নয়, তবু মোম চ্যাটার্জির মতো অভিনেত্রী যখন এভাবে ইনভলভড্ হয়ে পড়েছে তখন জানতে খুব ইচ্ছে করছে। কোনো মেগা?'

মোম হেসে বলল, 'ইট্স ওকে। কিন্তু কাজটা আমিও এখন ঠিক জানি না। প্লিজ আপনি ওয়েট করার মধ্যে যাবেন না। আপনার গল্পটা এত ভালো যে কাস্টিং খুব একটা ম্যাটার করবে না। উইশ ইউ বেস্ট লাক। বাই।'

মোবাইল কেটে সোজা হয়ে বসল মোম এবং চমকে উঠল। খাটের পায়ের কাছে আলো দেবী দাঁড়িয়ে আছেন। তার ভুরু দুটো এতটাই কুঁচকে আছে, যে আলাদা করা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, একটাই। অর্ধনগ্ন শরীরে গায়ে ম্যাক্সি জড়ানো। চুল থেকে বাদামি রং গড়িয়ে পড়ছে কপালে, কানের পাশে, ঘাড়ের ওপর।

মোম আঁতকে উঠল।

'মা, এ কী!'

বিরক্ত গলায় আলো দেবী বললেন, 'কেন, অসুবিধে কী হয়েছে?'

'তোমাকে যে ভয়ংকর দেখাচ্ছে! ইস জামাটা ঠিক করে পরবে তো।'

'ভয়ংকর দেখালে তোমার কী সমস্যা? আমি তো টিভি সিরিয়ালের নায়িকা নই। তুমিও ডিরেক্টর নয়।'

মোম জোরে হেসে উঠল।

'সত্যি মাঝে মাঝে তুমি এমন ছেলেমানুষি কর না মা। চুলে রং করেছ বলে এভাবে ঘুরে বেড়াবে।'

আলো দেবী থমথমে গলায় বললেন, 'তুমিও কম ছেলেমানুষি করছ না। কাজটা নিলে না কেন? পয়সা কম দিচ্ছে?'

মোম খাটের ওপর আরাম করে বাবু হয়ে বসল। কোলের ওপর বালিশ টেনে হেসে বলল, 'বাবা, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার কথা শুনছিলে নাকি?'

'লুকিয়ে শুনিনি। ঘরের মধ্যে ঢুকেই শুনেছি। বাজে কথা রাখ। কাজটা নিলি না কেন? দু-দিন বাড়িতে বসে আছিসই-বা কী জন্য?'

মুহূর্তখানেক চুপ করে মনে মনে উত্তর ঠিক করল মোম। তারপর অভিনয়ের ঢঙে দু-হাত ছড়িয়ে বলল, 'অপেক্ষা করছি।'

আলো চ্যাটার্জি আবার বিস্মিত হলেন। জোড়া ভুরু খুলে গেল।

'অপেক্ষা! কীসের অপেক্ষা।'

'ডাকের অপেক্ষা।'

আলো দেবী বুকের ওপর রাখা ম্যাক্সি ঠিক করতে করতে বললেন, 'কী

boierpathshala.blogspot.com

এমন ডাক যে কাজকর্ম বন্ধ করে বাড়িতে বসে থাকতে হচ্ছে! মুম্বাই থেকে না হলিউড?'

মোম ঘাড় কাত করে কৌতুকভরা চোখে বলল, 'ডাকের জায়গা যেমন ইমপর্টান্ট, তেমন কখনও কখনও কে ডাকছে সেটা আরও বেশি ইমপর্টান্ট হয়ে যায়।'

'হেঁয়ালি বন্ধ রেখে ঠিক করে বল মোম, আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে। এসব কী কথা!'

'মা, তুমি কত বদলে গেলে। আগরপাড়ায় মাথায় ঘোমটা দিয়ে ঘুরতে। এখন যদি ওরা কেউ তোমাকে এই অবস্থায় দেখে?'

'কথা ঘোরানোর চেষ্টা করিস না। কী হয়েছে খুলে বল।' আলো দেবীর গলা এবার কাঁদো কাঁদো। কাঁদো কাঁদো হওয়াই স্বাভাবিক। মেয়ের কারণেই তাঁর যাবতীয় রমরমা। এই ঘরবাড়ি, বিলাস, চুলে রং, কাজের মেয়েকে চড়চাপড় — সব। সেই মেয়েই যদি কাজ-টাজ ফেলে বসে যায় তাহলে তো ভয়ংকর।

'এই রে! কেঁদে ফেলবে নাকি মা?'

'দরকার হলে তাই ফেলব। কী হয়েছে তোর?'

মোম বড়ো করে হেসে বলল, 'কিচ্ছু হয়নি। একজনকে কথা দিয়ে রেখেছি, তাই নতুন কাজ নিচ্ছি না।'

'কী কাজ?'

মোম আবার হাই তুলল। অতিরিক্ত বিশ্রামের এটাই মজা। বিশ্রামের পর আবার বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করে। আলো দেবী চোখ পাকিয়ে বললে, 'কী রে বললি না কী কাজ?'

'সেটা ঠিক জানি না। তবে আউটডোরে শ্যুটিং। স্ক্রিপ্ট এখনও শুনিনি।'

'স্ক্রিপ্ট না শুনেই রাজি হয়েছিস!'

মোম চকিতের জন্য মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল। আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'অনেক বছর তো স্ক্রিপ্ট শুনে রাজি হলাম, এবার একটা না শুনেই হ্যাঁ বলেছি।'

কথা শেষ করে হাসতে লাগল মোম।

'কবে যাচ্ছিস?'

ঠোঁট বেঁকিয়ে মোম হতাশ ভঙ্গিতে বলল, 'সেটাই তো জানি না। হাত পা বাঁধা অবস্থা। বলেছি, যখন ডাকবে চলে যাব। তাই অন্য কাজেও ঢুকতে পারছি না। শরীর খারাপ বলে ডুব মেরে বসে আছি।'

boierpathshala.blogspot.com

আলো দেবীর ভালো লাগছে না। মেয়ের লক্ষণ নরমাল নয়। তিনি চোখ সরু করে বললেন, 'টাকাপয়সা কেমন দেবে? এত কাজ যে ছাড়তে হচ্ছে পুষিয়ে দেবে তো?'

মোম নিজের পেটে হাত বোলাল। বেড়ে যাচ্ছে না তো? না, যাচ্ছে না। এই জীবনে শরীরই আসল।

'সেসব কিছু কথা হয়নি।'

খাটের দিকে আরও এক পা এগিয়ে এসে আলো দেবী বললেন, 'কী ব্যাপার বল তো, স্ক্রিপ্ট জানিস না, ডেট জানিস না, টাকা জানিস না তবু রাজি হয়ে গেলি!'

'এটাই তো সমস্যা মা। নিজেই বুঝতে পারছি না কেন রাজি হয়ে গেলাম।'

'ঠিক আছে যা হয়েছে হয়েছে, এবার না বলে দে।'

মোম নির্লিপ্ত মুখে বলল, 'খেপেছ?'

'ঠিক আছে তোকে করতে হবে না। আমাকে ফোন নম্বর দে। আমি বলে দিচ্ছি।'

'মা তুমি কি এই কালী মার্কা চেহারাটা নিয়ে এখন ঘর থেকে যাবে? দয়া করে তুমি যাও, গিয়ে বাথরুমে ঢোকো। আমি আরও একটু ঘুমোতে চাই।'

আলো চ্যাটার্জি মেয়ের কথায় পাত্তা দিলেন না।

'ওই লোকের নাম কী?'

'কোন লোকের?'

'ওই যে যার সঙ্গে কাজে বাইরে যাবি।'

মোম হেসে বলল, 'ও তাই বলো, সোমনাথদা।'

আলো দেবী অবাক হয়ে বলল, 'সোমনাথ মানে? ওই যে ছেলেটা সেদিন এসে বসে ছিল? মল্লিক টিভির ছোকরাটা? আমি ভেবেছিলাম অ্যাডভান্স করতে এসেছে।'

মোম আহ্লাদি গলায় বলল, 'জানো মা, সোমনাথদার কথা আমার সব মনে পড়ে গেছে। সম্পর্কে খুকুর কেমন যেন দাদা হয়। ওই যে আগরপাড়ায় আমার বন্ধু খুকু...মনে পড়ছে? নাকের পাশে একটা আঁচিল ছিল। এইটুকু আঁচিল। মনে পড়ছে না? কত আমাদের বাড়িতে আসত।'

আলো দেবী খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর থম্‌থমে গলায় বললেন, 'আমার মনে পড়ার দরকার নেই। কারও তিল আঁচিল মনে রাখার মতো সময় আমার নেই।'

boierpathshala.blogspot.com

আলো দেবী পায়ে রাগের আওয়াজ তুলে চলে গেলেন।

মা চলে যাওয়ার পর বেশ খানিকক্ষণ বিছানায় চুপ করে শুয়ে রইল মোম। একসময় নিজের অজান্তেই মোবাইলের ফোনবুক থেকে সোমনাথের নম্বর বের করে রিং করল।

একবার বাজতেই সোমনাথ ফোন ধরে এবং ধড়ফড় করে বলে—

'কে মোম? দ্যাখো কী কোইনসিডেন্স! আমি তোমাকেই ফোন করতে যাচ্ছিলাম। আমাদের ঝিলডাঙা যাওয়ার এভরিথিং ফাইনাল। শনিবার সকালেই বেরিয়ে পড়ব ঠিক করেছি। আর দেরি করা যাবে না। খুব নার্ভাস লাগছে। ডিরেক্টরের কাজ তো আগে কখনও করিনি। তবে তোমরা থাকলে চিন্তার কী আছে? যাক, তোমার কোনো অসুবিধে নেই তো?'

এই ধড়ফড়ানিতে মোম মজা পেল। ফিসফিস করে বলল, 'না, কোনো অসুবিধে নেই।'

সোমনাথ খুশির গলায় বলল, 'যাক বাবা বাঁচা গেল, আমি ভাবছিলাম অন্য কাজে যদি আটকে যাও...যাক, স্ক্রিপ্টটা মোটামুটি একটা ঠিক করে রেখেছি। যেতে যেতেই তোমাকে শুনিয়ে দেব। শুধু ঘটনাটা কি একটু শুনতে চাও?'

মোম ঘটনা শুনতে চায় না। সে সোমনাথের গলা শুনতে চায়। গাঢ় গলায় বলল, 'বলুন।'

'যদিও এটা টেলিফোনে বলা উচিত না।'

'তাহলে বলবেন না।'

'না তোমাকে বললে অসুবিধে নেই। আফটার অল বলতে তো হবে।'

মোম মুচকি হেসে বলল, 'তাহলে বলুন।'

সোমনাথ নীচু গলায় বলতে শুরু করল, 'একটা ছোট্ট মেয়ে। নাম ফুল। সেই মেয়ের নাকি অদ্ভুত একটা পাওয়ার আছে, ইনটিউশন যাকে বলে। সে বিপদ ফোরকাস্ট করতে পারে।'

'কী পারে!'

'বিপদ।'

'স্ট্রেঞ্জ! অ্যাসট্রোলজার? জ্যোতিষী?'

'ঠিক জানি না মোম। শুনেছি শুধু প্রকৃতির বিপদই সে ফিল করে। ঝড়, বৃষ্টি এইসব। অন্য কিছু পারে কিনা গিয়ে দেখতে হবে।'

'হাইলি ইন্টারেস্টিং।'

'আমরা তার কাছে...।'

boierpathshala.blogspot.com

কিছুক্ষণের মধ্যে মোমের মনে হল, সোমনাথের গলা স্পষ্ট করে সে শুনতে পাচ্ছে না। তার কথা জড়িয়ে আসছে। দমকা হাওয়ার মতো এসে চলে যাওয়া প্রেম যদি ভুল করে আবার ফিরে আসে তাহলে কি এরকমই হয়? কথা শোনা যায় না? মন ভারী হয়ে আসে?

মোমের মনে হল, সে-ও বিপদ আঁচ করতে পারছে। সেই বিপদ সুখের। সোমনাথের সঙ্গে কথা শেষ হওয়ার পর মোম নিজের মনেই খানিকটা হাসল। সুখের এই বিপদ নিয়ে খানিকটা খেললে কেমন হয়? চিত্রনাট্যের বাইরে কতদিন কিছু খেলা হয় না।

boierpathshala.blogspot.com

আটচল্লিশ

কাদুকে উঠোনে দেখে চমকে উঠল মালতী। এই লোক তার বাড়িতে কেন!

দ্রুত হাতে গায়ের এলোমেলো কাপড় ঠিক করতে করতে মাথায় আঁচল টানল মালতী।

কাদু কয়েক পা এগিয়ে এসে দাঁড়াল দাওয়ার সামনে, মালতীর মুখোমুখি। মুখে বিশ্রী হাসি। সাপের মতো নিষ্পলক চোখে নির্লজ্জের মতো মালতীর গোটা শরীরটা মাপতে লাগল। বুক থেকে কোমর পেট হয়ে পায়ের পাতা পর্যন্ত। শিউরে উঠল মালতী। গা ঘিন ঘিন করে উঠল।

বাড়িতে কেউ আসবে এ ব্যাপারে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না সে। গা খালি করে রান্না করছিল। বাচ্চার জন্মের সময় যত এগিয়ে আসছে গায়ে কাপড় রাখাই কঠিন হয়ে পড়ছে। বুক দুটো ভারী হয়ে উঠছে দিন দিন। গায়ে জামা রাখতে কষ্ট হয়। তার ওপর ভ্যাপসা গরম। শরীরের ভেতর বাইরে সর্বক্ষণ আনচান করে। লোকে বলে দ্বিতীয় সন্তানের সময় কষ্ট কম হয়। মেয়েরা খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে যায়। মালতীর বেলায় যেন উলটো হচ্ছে। ফুল যখন পেটে ছিল এমনটা হয়নি। কে জানে কেন? হয়তো মনটা খারাপ বলেই হচ্ছে। তার ওপর ফুলের শরীর, ঘর সংসার সামলানোর পরিশ্রম, সঙ্গে অর্থকষ্ট। এর ওপর সবসময় মনে একটা চাপা আতঙ্ক থাবা গেড়ে বসে আছে। ঝিলডাঙার অবস্থা আগের মতো নেই। দিন দিন খারাপ হচ্ছে। সন্ধের পর ঘর থেকে বেরোতে ভয় করে। যে এখনও জন্মায়নি তাকে নিয়েও দুশ্চিন্তা। ফুলের মতো গোলমালের কিছু হবে না তো? সব মিলিয়ে মালতী কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। বেশিরভাগ সময় মনে হয় শরীর এলিয়ে শুয়ে থাকতে পারলে বেশ হত। গরিব ঘরের পোয়াতি মেয়ের সে

boierpathshala.blogspot.com

সুবিধে নেই। যন্ত্রের মতো ঘরের কাজ সারে মালতী। আজও সারছিল। রান্না করছিল। রান্না বলতে কুমড়ো ফুলের বড়া। ফুল সকাল থেকে বায়না ধরেছে, বড়া খাবে। বাড়িতে বেসন ছিল না। মেয়ের বাবাকে বলতে সে বিরক্ত হল।

'এত আবদার করতে বারণ করো।'

'আবদারের কী দেখলে! সামান্য বড়া বই তো বেশি কিছু নয়।'

'আমার কাছে এটাই বেশি। এই বলছ বেসন নেই, এরপর বলবে তেল নেই। আমি কোথা থেকে জোগাই ভেবে দেখেছ? গোপীদার দোকান থেকে যে ধারবাকিতে আনব তার উপায় নাই। সে তো আদ্দেক দিন ঝাঁপই তোলে না।'

মালতী মুখ নীচু করে বলে, 'কুমড়ো ফুলের বড়া ক-টা ভেজে দেব বলেছি। ও তো আর তোমায় পয়সা দিয়ে কিনতে হবে না।'

নিতাই চাপা গলায় ধমক দেয়।

'কাঁচা কাঁচা চিবিয়ে খেতে বলো। বাপের রোজগারপাতি দিন দিন পড়ে যাচ্ছে, আর মেয়ে বড়া খাওয়ার বায়না ধরেছেন।'

মালতী মুখ তুলে বলে, 'বাপের রোজগার নেই তো মেয়ে কী করবে? ওকে দুষছ কেন? ছেড়ে দাও আনতে হবে না। অশান্তি ভাল লাগে না আর।'

নিতাই কাজে চলে যাওয়ার আগে বেসন এনে দিয়ে গেছে। যতটা লাগবে তার থেকে বেশিই এনে দিয়েছে। তেল ছিল, তবু তাও এনেছে। সেই বেসন কুমড়ো ফুলে মাখিয়ে বড়া ভাজছিল মালতী। গায়ের কাপড় আলগা করে হাতের কাছে ভাঙা হাতপাখাটা নিয়ে বসেছে। খানিক পর পর বাঁ-হাতে তুলে নিজের শরীরে বাতাস দিচ্ছিল। ফুল দাওয়ায় বসে পুতুল আর রাজ্যের হাবিজাবি নিয়ে খেলছিল। পাশে বইখাতা পড়ে ছিল বটে কিন্তু সেদিকে মন নেই। স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর লেখাপড়ায় ভাঁটা পড়েছে। ঝিলডাঙায় পড়ে থাকলে কোনো ছেলেমেয়েরই আর পড়াশোনা হবে না। যদিও দু-দিন আগে বাইরের কোন নেতা এসে নাকি বলে গেছে, স্কুল আবার খুলবে। বাজারের কাছে মাইক লাগিয়ে মিটিংও করেছে। সেই মিটিঙে মালতী যায়নি। তার যাওয়ার প্রশ্নও ওঠে না। নিতাই গিয়েছিল। সন্ধের পর নেতার ভাষণ শুনে, গাদাখানেক গিলে বাড়ি এল। মালতী জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী হল গো?'

জড়ানো গলায় নিতাই বলেছিল, 'কী আর হবে? হারামজাদার দল সব।'

'গাল দাও কেন?'

'না গাল দেব না, রসগোল্লা খাওয়াব।'

মালতী বলে, 'আহা, লোকটা কী বললে সেটা তো বলবে।'

boierpathshala.blogspot.com

'খুনিটাকে পাশে বসিয়ে বললে এখানে আবার ইস্কুল হবে।'

মালতী ভয় পেয়ে চাপা গলায় বলল, 'তুমি এখনও মাথা থেকে ওসব ফেলতে পারোনি? ওই শয়তানটাকে তোমার খুনি বলার কী আছে? বাড়িসুদ্ধু সবাইকে একটা বিপদে না ফেলে থামবে না দেখছি।'

'কোনো চিন্তা নেই মালতী। আমি বিপদে পড়ব না, ওই শুয়ারের বাচ্চাকে বিপদে ফেলে তবে আমি মরব। এই তোমাকে বলে রাখলাম হ্যাঁ।'

মালতী দ্রুত গিয়ে ঘরের দরজা আটকায়। এ-কথা বাইরের কেউ শুনতে পেলে সর্বনাশ।

গায়ের জামা খুলে মেঝেতেই টান টান হয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে নিতাই বলে, 'দ্যাখো না ওই শালা কাদুর কী করি আমি। জেলের ঘানি যদি না ঘুরিয়েচি তবে আমার নাম নিতাই নয়।'

'আঃ থামবে তুমি? ছাইভস্ম গিলে এসে কী যে বল। দোহাই তোমার।'

নেশার ঘোরেই নিতাইয়ের গলা থিতিয়ে আসে। সে ফিসফিস করে বলে, 'একটা চিটি দিয়েচি, এরপর একশোটা চিটি দেব, হাজারটা চিটি দেব।'

মালতী অবাক হয়। কীসের চিঠির কথা বলছে মানুষটা! উদ্‌বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কাকে চিটি দিয়েছ?'

পাশ ফিরে শুয়ে ঠোঁটের ফাঁকে হাসে নিতাই।

'ও কিছু নয়। ঘুমোতে দাও দিকি।'

অনেক রাত পর্যন্ত গভীর দুশ্চিন্তা নিয়ে জেগে থাকে মালতী। লোকটা সত্যি সত্যি কোনো ঘটনা ঘটাল নাকি? পরদিন অবশ্য এ-প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বলেনি নিতাই। মাতাল মানুষের এটাই হয়। রাতের কথা দিনের আলোয় মনে থাকে না। মালতীও বিষয়টা নিয়ে জোরাজুরি কিছু করেনি। তবে কদিন ধরেই ফুলের বাবা কেমন যেন হয়ে রয়েছে। হয় চুপ করে থাকে, নয় ছোটোখাটো কারণে রেগে যায়।

কাদু বাড়িতে ঢোকার পর ফুলই খেলা থামিয়ে রান্নাঘরে ছুটে এসে খবর দিল।

'মা কে যেন আসে?'

উনুন থেকে মুখ ঘুরিয়ে মালতী বলে, 'কে?'

'চিনি না। লম্বা মতো একটা লোক গেট সরিয়ে ঢোকে।' ফুলের চোখে চাপা ভয়।

এ-বাড়িতে লোক আসা আশ্চর্য হওয়ার মতো ঘটনা কিছু নয়। ঘরদোরের

boierpathshala.blogspot.com

ছাউনি দিতে, বেড়া বাঁধতে, পাকা গাঁথনি দিতে অনেকেই এসে নিতাইয়ের খোঁজ করে। না থাকলে মালতীকে বলে যায়। সেদিক থেকে লোক আসা ভালো। উনুন থেকে কড়াই নামিয়ে গায়ের ওপর শাড়িটাকে ভালো করে জড়িয়ে দাওয়ায় বেরিয়ে এল মালতী। দেখতে পেল কাদু ঢুকছে।

কাদুর নোংরা চাউনি থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য মালতী খুঁটির আড়ালে একটু সরে যায়। পাশে বড়ো বড়ো চোখে দাঁড়ানো ফুলকে টেনে নেয় কাছে। উঁচু হয়ে থাকা পেটের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে কাদু হাসল। যেন অনেকটা নিশ্চিত হল। হাসিমুখে বলল, 'নেতাই কই গো?'

মালতী ঢোঁক গিলে বলল, 'কাজে গেছে।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে কাদু বলল, 'সে তো যাবেই, কাজের লোক কাজে যাবে না তো কি ঘরে বসে থাকবে?'

'বিকেলের আগেই ফিরবে।'

নিতাই মোটেই বিকেলে কোনোদিন ফেরে না। ফিরতে রোজই রাত গড়িয়ে যায়, তবু ইচ্ছে করেই সময় অনেকটা এগিয়ে এনে বলল মালতী। রাত পর্যন্ত বাড়িতে পুরুষমানুষ থাকে না এ-কথা খারাপ লোকদের জানাতে নেই।

কাদু মুখ দিয়ে 'চুক চুক' আওয়াজ করে বলল, 'একেবারে বিকেলে! কেন দুপুরে খেতে আসে না?'

মালতী চমকে উঠল। এত হাঁড়ির খবরে শয়তানটার দরকার কী?

'কোনোদিন আসে, কোনোদিন আসে না। কাজ থাকলে আসতে পারে না।'

কাদু মাথা নাড়িয়ে বলল, 'সে তো ঠিক কতা। কাজ থাকলে আসবে কী করে? কাজ আগে না বাড়ি ফিরে বউয়ের আদর যত্ন খাওয়া আগে?'

কথাটা বলেই ফ্যাঁসফ্যাঁসে আওয়াজ করে হাসল কাদু। শরীর ঘিনঘিন করে ওঠে মালতীর। কথার মধ্যে বদ ইঙ্গিত আছে। সে ফুলকে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরল।

'যদি আজ আগে ফেরে তাহলে না হয় বলব।'

'নেতাই গেচেটা কোতায়?'

'জানি না। বলে যায়নি কিছু।'

কাদু চোখ দুটো সরু করে বলল, 'তাও তো ঠিক, তুমিই-বা জানবে কী করে। কোথায় কাজ পাবে আগে থেকে কি সবসময় বলা যায়? শুনেচি নেতাইয়ের হাত খুব ভালো। ছাউনি বাঁধতে ওর মতো ঝিলডাঙায় আর কেউ নাকি পারে না। ভাবলাম এবার একটা পরীখ্যে নিয়ে দেকি। নিজের গাঁয়ের মানুষ

boierpathshala.blogspot.com

কাজ ভালো করলে তো ভালোই।'

লোকটার চাউনি, কথা বলার ভঙ্গি শুধু খারাপ, কথাগুলোও খারাপ। মালতী জোর করে সহজ হবার চেষ্টা করল।

'কোনোদিন ঝিলডাঙায় কাজ করে, কখনও আবার বানেরহাট পর্যন্ত যেতে হয়।'

'তাই তো হবে। যে-লোক কাজ ভালো করে তার তো সব জায়গা থেকেই ডাক পড়বে। আমিও কি আর শুধু-মুদু তোমার বাড়ি এসে হাজির হলাম? নেতাই ভালো কাজ করেচে বলেই না তাকে খুঁজচি।'

বুকটা ধক করে উঠল মালতীর। ফুলের বাবায় ভালো কাজ করেছে! কী ভালো কাজ করেছে? এই শয়তানের বাড়ি মেরামতির কাজ কোনোদিন সে করেছে বলে তো শোনেনি। তবে? লোকটা কী বলতে চাইছে?

কাদু আবার দাঁত বের করে হাসল। হাসির মধ্যে একটা খুশির ভাব। খুশি হওয়ারই কথা। সে যা নিজের চোখে দেখতে এসেছিল তার অনেকটাই মিলে গেছে। গোপীডাক্তার তাকে ভুল খবর দেয়নি। নিতাইয়ের বউয়ের সত্যি বাচ্চা হবে। খবর সে অন্য কাউকে দিয়েও মিলিয়ে নিতে পারত। কিন্তু তা করেনি। তার নামে থানায় চিঠি লেখার মতো সাহস ঝিলডাঙায় যার আছে তার বাড়িতে নিজেই আসবে বলে ঠিক করেছিল। নিতাই যে সময় থাকবে না, সেই সময়ে আসবে। প্রথমে প্রমাণ মিলিয়ে দেখবে, তারপর ব্যবস্থা। সেইমতো কালই ছেলেপিলেদের বলে রেখেছিল। আজ নিতাই বেরিয়ে যাওয়ার পর শোল খবর দেয়। আর দেরি করেনি। শোলের মোটরবাইকের পিছনে চেপে চলে এসেছে। শোল বলেছিল, 'সঙ্গে আসব দাদা?' কাদু বলেছিল, 'না, দূরে থাকবি, আমি একাই যাব।' দলবল এনে ঘাবড়ে দেওয়া চলবে না। যে পরিবারের মানুষ ঝিলডাঙায় থেকে কাদুর পিছনে লাগে সেই পরিবারের শাস্তি ঘাবড়ে দেওয়া নয়, তার থেকে অনেক বেশি। কত বেশি ঠিক করেনি। মাথা ঠান্ডা করে ঠিক করতে হবে। কিন্তু তার আগে পাকাপাকি প্রমাণ চাই। একটা প্রমাণ মিলে গেল। এখনও আর একটা বাকি। সে মালতীর থেকে চোখ সরালো ফুলের দিকে। বাঃ, নিতাইয়ের মেয়েটাকে দেখতে তো বেশ সুন্দর! একমাথা চুল উশকোখুশকো হয়ে আছে। চোখ দুটোও বড়ো বড়ো। মুখের গড়নে একটা টলটলে ভাব। তবে শরীরটা রোগা। বেশি রোগা। তার মানে এটাও গোপীনাথ মিথ্যে বলেনি। মেয়েটার অসুখবিসুখ আছে। কাদুর চোখ চকচক করে উঠল। বয়স কত? সে দু-পা এগিয়ে এসে বলল, 'হ্যাঁগো, এই তোমার মেয়ে নাকি?'

boierpathshala.blogspot.com

মালতী মেয়ের কাঁধ খামচে ধরে মাথা নাড়ল। তার বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গেল কয়েকগুণ।

'বা রে, নেতাইয়ের মেয়েকে তো ভারি মিষ্টি দেকতে। ঝিলডাঙায় এমন ফুটফুটে মেয়ে আচে আমায় তো কেউ বলেনি কখনও! দ্যাকো কাণ্ড।'

কথাটা বলে বিশ্রী আওয়াজে হাসল কাদু। মালতীর শরীরের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে উঠল।

'তোমার নাম কী খুকি?'

ফুল চুপ করে রইল। গোড়া থেকেই চুপ করে আছে সে। শুধু চুপ করে নেই, নড়াচড়াও করছে না। মায়ের গা ঘেঁষে স্ট্যাচুর মতো থমকে আছে।

কাদু মুখে আওয়াজ করে বলল, 'কী হল? নাম কী তোমার সোনামণি?'

মালতী বলল, 'ফুল।'

'কী বললে?' ফুলের থেকে চোখ না সরিয়েই বলল কাদু।

মালতীর শরীরের ভেতরটা কুলকুল করে ঘামছে। সে আমতা আমতা করে আবার বলল, 'ফুল।'

'ফুল! বাঃ, কী ফুল? গোলাপ না গাঁদা?'

কাদু হাত বাড়িয়ে ফুলের থুতনিতে হাত রাখার চেষ্টা করল। ফুল ছিটকে সরে এল। হাসতে হাসতে কাদু বলল, 'দ্যাকো দিকি, মামাকে ভয় পায়। কী ফুল বললে না খুকি?'

ফুল থমথমে মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল। মনে মনে ভগবানের নাম জপছে মালতী। আর যাই হোক, এই লোক যেন ফুলের অসুখের কথা কিছুই বুঝতে না পারে। তাকে স্বাভাবিক থাকতে হবে। শুধু তাকে নয়, ফুলকেও স্বাভাবিক থাকতে হবে। ঠাকুর, মেয়েটা যেন এখন কিছু না করে বসে। কিছু না...।

ফুল কিছু করল না। কাদুর দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'জানি না।'

কাদু গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল।

'বাপ রে, নেতাইয়ের মেয়ে যে আমায় ধমক লাগায় গো। ইস, আগে থেকে জানা থাকলে গোপীর দোকান থেকে ক-টা লজেনচুস নিয়ে আসতাম। ঠিক আচে বিকেলে পাঠিয়ে দেব। কী, হবে তো খুকি? না খুকি তো নয়, ফুল।'

ফুল চুপ করে রইল। মালতী তাকিয়ে দেখল মেয়ের চোখের মণি নড়ছে না। সে ফিসফিস করে মাথা নামিয়ে বলল, 'যাও ফুল, ভেতরে যাও তোমার

boierpathshala.blogspot.com

চানের সময় হয়েছে।'

কাদু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। স্নান খাওয়ার কথা বলে নিতাইয়ের বউ তাকে চলে যেতে বলছে। চলে সে যাবে। যে-কাজের জন্য সে এসেছিল তার প্রায় পুরোটাই সারা হয়ে গেছে। ফুল যে অসুস্থ তা চেহারা দেখেই আঁচ করা যাচ্ছে। মেয়েটার হয় পেটের ব্যামো আছে না হয় জ্বরজারিতে ভোগে। নিশ্চয় ম্যালেরিয়া মাঝে-মধ্যে মাথা চাড়া দেয়। টাইফয়েড-ফাইফয়েডও হতে পারে। তবে তেল জল ঠিকমতো পড়লে এই মেয়ে যে সুন্দরী হত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বেচারি! গরিব ঘরের এই মুশকিল। সুন্দরও ঠিকমতো সুন্দর থাকতে পারে না।

'আমি এবার যাব নেতাইয়ের বউ। বেলা হল। তুমি বরং তোমার স্বামী ফিরলে বোলো আমি খোঁজ করেচিলুম...কাজটা বড়ো কাজ। আমার দুটো ঘরেরই অবস্তা খারাপ। বর্ষার আগে সারিয়ে ফেলব।'

কথা বলতে বলতেই থেমে গেল কাদু। চোখ পড়ল দাওয়ার ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পুতুল আর ছেঁড়া খোঁড়া খাতা বইয়ের ওপর। খাতা! ক্ষণিকের মধ্যে ভেবে নিল কাদু। মালতীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চট করে এক গ্লাস জল আনো দেকি। সকাল থেকে বকে গলা শুকিয়ে গেচে। জল খেয়ে পালাই।'

ফুল আগেই ঘরে ঢুকে গেছে। তাতে মালতী খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। আর যাই হোক, মেয়েটা তো আর শয়তানটার চোখের সামনে নেই। রান্নার জায়গায় এসে বাড়ির একমাত্র কাঁসার গ্লাসটায় জল ভরতে ভরতে মালতী আঁচল দিয়ে কপাল, গলা, মুখের ঘাম মুছল। নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে দিতে ভাবল, শুধু খারাপটাই-বা সে ভাবছে কেন? ঘর মেরামতের ঘটনাটা তো সত্যি হতে পারে। শয়তান বলে কি লোকটার ঘর সারানোর দরকার হতে পারে না? কে জানে হয়তো মিছিমিছিই ভয় পাচ্ছে।

জল হাতে ফিরে এসে মালতী দেখল কাদু দাওয়ার পাশে দাঁড়িয়ে এক মনে ফুলের ফেলে রাখা খাতার পাতা ওলটাচ্ছে। মালতীর পায়ের আওয়াজ পেয়ে খাতা নামিয়ে রেখে মুখ তুলে তাকাল। এই কয়েক মিনিটে দৃষ্টি বদলে গেছে লোকটার! এতক্ষণ যা ছিল নোংরা, এখন তাতে আরও কিছু এসে যোগ দিয়েছে। রাগ? না অন্যরকম কিছু। সেটা কি পুরোপুরি না বুঝেই গা ছমছম করে উঠল মালতীর। কোনোরকমে গ্লাস এগিয়ে ধরল সে। কাদু গ্লাস না নিয়ে নীচু গলায় বলল, 'থাক, তেষ্টা মিটে গেচে আমি চললাম। তুমি নেতাইকে খবর দিও।' গেটের দিকে দু-পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে তাকাল কাদু। দৃষ্টি ততক্ষণে

boierpathshala.blogspot.com

আবার বদলে ফেলেছে, ফিরিয়ে নিয়েছে আগের জায়গায়। মালতীর পেটের দিকে ইঙ্গিত করে চেবানো হাসি হেসে বলল, 'সাবধানে থেকো। রাত বিরেতে ব্যতা উঠলে নেতাইকে খবর দিতে বলবে। লজ্জা পাবে না। ঝিলডাঙায় আমি থাকতে কারও অসুবিধে হতে দেব না।'

কাদু বেরিয়ে গেলে কপালে জোড় হাত ঠেকাল মালতী। তার মনে হল ঠাকুর অন্তত আজকের মতো তাদের রক্ষা করছেন। ফুলের বাবা ফিরলে পরামর্শ করে বাকিটা বুঝতে হবে। সত্যি শয়তানটা কাজের জন্য এসেছিল, না অন্য কোনো মতলবে? থাকলে সেটাই-বা কী?

'মতলব' যা ছিল তা মিটেছে কাদুর। নিতাই-ই যে থানায় চিঠি পাঠিয়েছে সেটা বুঝতে আর কোনো ফাঁক নেই। পোয়াতি বউ, অসুস্থ মেয়ে তো বটেই এমনকী লোকটা যে মেয়ের খাতা থেকে পাতা ছিঁড়ে চিঠি লিখেছে তাও দিনের আলোর মতো এখন স্পষ্ট। ছেলেমানুষের লাইন-টানা-খাতার-পাতা থানায়-পাঠানো চিঠির-কাগজের সঙ্গে মিলে গেছে। ফলে 'মতলব' এখন দ্রুত ডালপালা মেলে বড়ো হচ্ছে কাদুর মাথার ভেতর। কী ধরনের শাস্তিতে এই লোককে মানাবে? হাত পা ভেঙে জলে চুবিয়ে রাখা? নাকি একেবারে খতম? গাছে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলে কেমন হয়? এখন আর সেদিন নেই। লোক দেখিয়ে ভয় পাওয়ানো যাবে না। ক-দিন পরেই ভালো মানুষ সেজে ভোট চাইতে হবে। তার আগে বদনাম রটে গেলে সমস্যা। সমস্যা ঝিলডাঙাতে নয়, যে-দলের হয়ে ভোটে লড়বে সেই দলের সমস্যা। মানা সরকারকে যতই কবজা করা যাক না কেন, শালাদের কোনো বিশ্বাস নেই। ভোটে জিতে যে কাজ করা যায়, আগে করা যায় না। শেষ মূহূর্তে শালা বেঁকে বসলে কী হবে? বলবে তোমার নামে লোকাল লোকের অভিযোগ আছে। কিন্তু তা বলে তো হাত গুটিয়ে বসে থাকা যাবে না। এই লোক আজ একটা চিঠি লিখেছে, কাল আর একটা চিঠি লিখবে। নিতাই না লিখলে, অন্য কেউ সাহস পাবে। সেই সাহসেরই গলা ছিঁড়তে হবে। এমনভাবে ছিঁড়তে হবে যাতে আর কেউ কোনোদিন ট্যাঁ-ফোঁ না করতে পারে। তার থেকেও বড়ো কথা নিজের রাগ মেটাতে হবে। লোভ আহ্লাদের মতো নিজের রাগও মেটাতে হয়। কিন্তু কীভাবে?

রাস্তার বাঁকটা পেরিয়ে শোল মোটরবাইক নিয়ে অপেক্ষা করছিল। কাদু পাশে এসে দাঁড়াতে সে বলল, 'কাজ হল দাদা?'

কাদু প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চিন্তিত গলায় বলল, 'বাড়ির চারপাশটা ভালো করে দেকে নিয়েচিস তো?'

boierpathshala.blogspot.com

'দেখার কী আছে? আমরা তো দাদা রোজ দশবার করে এদিক দিয়ে যাই।'

'গাধার মতো কতা বলিস না। এই দ্যাকা সেই দ্যাকা নয়। ঝোপঝাড়, আড়াল এইসব দেকে রাকবি।'

'বাড়িতে ঢুকতে হবে নাকি?'

'একনও ঠিক করিনি। হতে পারে।'

শোল উৎসাহ নিয়ে বলল, 'অত ভাবনাচিন্তার কী আছে? অর্ডার করো, আজ রাতেই কেরোসিন ঢেলে আগুন মেরে দিচ্চি।'

মোটরবাইকে ঠেস দিয়ে কাদু বলল, 'কতাটা খারাপ নয়। বউ বাচ্চা সুদ্ধু যদি ঘরে বেঁধে আগুন...ওই নেতাই হারামজাদা যা করেছে তাতে জ্যান্ত পোড়ালেও কম করা হবে।'

'তাহলে তাই করি?'

কপালে টোকা মারতে মারতে কাদু বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে, পুড়িয়েও তেমন আরাম পাব না। আরও বড়ো কিছু আছে কিনা ভাবছি।'

শোল বিড়ি ধরিয়ে বলল, 'থাকবে না কেন? আছে বই কী।'

কাদু ঘাড় ফেরাল। ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী?'

'ভালো দিন দেখে বউটাকে আস্তানায় নিয়ে গিয়ে তুলি। তোমার আরামও হল আবার বদলাও হল।'

গালের ভেতর নিজের জিভটাকে খেলাতে খেলাতে কাদু বলল, 'এই বুদ্ধিটা খারাপ নয়। মাগি এখন পোয়াতি। টেস্ট অন্যরকম হত। গোপী শালার ওষুধটা এর ওপর দিয়েও পরিখ্যে করতাম এই সময়...মন্দ হত না...তবে কী জানিস রেপ মার্ডারের থেকেও ভয়ংকর কিছু হলে ভালো লাগত।'

শোল অবাক হল। রেপ, মার্ডারের থেকেও ভয়ংকর! ওস্তাদ কী বলছে! অবশ্য এই লোকের মাথা দুরন্ত। ভয়ংকরের থেকেও ভয়ংকর কিছু একটা ঠিক ভেবে ফেলবে। গোটা ঝিলডাঙা যে ঠান্ডা করে রাখতে পারে, সে নিতাইয়ের মতো একটা ফালতুকে নিয়ে সবকিছু করতে পারে।

খুব অল্পক্ষণের মধ্যেই কাদু কপাল থেকে হাত সরিয়ে মুখ ফেরাল। চাপা গলায় বলল, 'শোল, ওই লোকের সঙ্গে কতা হয়েছে?'

লোকের নাম না বললেও এক ইঙ্গিতেই শোল বুঝতে পারল। সে বলল, 'আমার হয়নি। মোহন যোগাযোগ করেছে। বলেছে ফাইনাল হলে তোমার সঙ্গে বসিয়ে দেবে।'

'না, বসানো-টসানোর মধ্যে যাব না। যা হবে সব ভায়া। ইলেকশন পর্যন্ত

boierpathshala.blogspot.com

আমি সামনে যাব না।'

শোল ঘাড় কাত করে বলল, 'তাই হবে। মোহনকে বলে দেব।'

'ঠিক আচে। নে একন চল।'

শোল বাইকের হাতল ধরে বলল, 'আর নেতাই? হারামজাদার কথা কিছু ঠিক করলে?'

কাদু উত্তর না দিয়ে বাইকের পিছনে বসতে বসতে বলল, 'তুই মোহনকে বলবি, আজই যেন সে ওই লোককে বলে, আমি বিজনেস শুরু করতে চাই কচি মাল দিয়ে।'

গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার আগে শোল মুখ ফিরিয়ে বলল, 'মানে!'

কাদু হাসল। বলল, 'যা মানে তাই তো বললাম। আমাদের প্রথম সাপ্লাই হবে ছোটো মেয়ে। খবর আছে আজকাল কমবয়সি মেয়েদেরই দাম সবথেকে বেশি। পাচার করতেও সুবিধে, ডিমান্ডও অনেক। ওগুলো বহুৎদিন ধরে কাজে লাগে। তাই যত বয়স কম দামও তত বেশি।'

স্টার্ট দিয়ে গাড়ির মুখ ঘোরাল শোল।

'ঠিক আছে, মোহনকে সেরকমই কথা চালাতে বলব। কিন্তু কত ছোটো মাল যদি জানতে চায়?'

কাদু চলন্ত গাড়ির ঝাঁকুনি সামলে বলল, 'এইটুকু।' বলে হাত ছড়িয়ে মেয়ের উচ্চতা দেখাল। সেই উচ্চতা ফুলের।

গাড়ি চালাতে ব্যস্ত থাকায় শোল কিছু দেখতে পেল না। শুধু তার ওস্তাদের বিশ্রী হাসি শুনতে পেল।

কুমড়ো ফুলের বড়ায় কামড় দিতেই দিতেই তলপেটে তীব্র ব্যথা অনুভব করল ফুল। ককিয়ে উঠল সে। মালতী মেয়ের কাছে ছুটে এসে বলল, 'কী হল? কী হয়েছে সোনা?'

'বুঝতে পারছি না মা। ব্যথা করে।'

'কীরকম ব্যথা? কামড়ায়?'

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই যন্ত্রণায় চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার জোগাড় হল ফুলের। সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'জানি না মা, আমি জানি না...।'

সে ঠিকই বলছে। নিষ্পাপ বালিকার এই ব্যথা চেনবার কথা নয়। সে বয়স তার হয়নি। এখনও দেরি আছে। নারীজীবনে এই ব্যথা দু-ভাবে আসে। হয় তীব্র সুখ নিয়ে, নয় বীভৎস যন্ত্রণা, অপমানে।

boierpathshala.blogspot.com

ফুলের ব্যথা কমতে রাত গড়িয়ে গেল। মালতী তার স্বামীকে ফিসফিস করে বলল, 'চলো, আমরা ঝিলডাঙা ছেড়ে পালিয়ে যাই।'

নিতাই বলল, 'ক-টা দিন, আর ক-টা দিন আমাকে একটু গুছিয়ে নিতে দাও। তোমার বাচ্চাটা হয়ে যাক।

মালতী বলল, 'না, তার আগেই ব্যবস্থা করো। ফুলের জন্য আমার ভয় করছে।'

boierpathshala.blogspot.com

ঊনপঞ্চাশ

মোমের গালে টোল আছে নাকি! কই এতদিন নজরে পড়েনি তো! সোমনাথ অবাক হল।

এই মেয়ের টোল আবার আর পাঁচজনের মতো নয়। সকলের হাসির সময় টোল দেখা যায়। মোমের টোল দেখার জন্য হাসি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে না, কথা বলার সময়েই ডান গালে টোল আসছে। এটাও একটা আশ্চর্য ঘটনা। সোমনাথ কিশোরী মোমকে মনে করবার চেষ্টা করল। চোখ, মুখ, নাক হালকা হালকা মনে পড়ল। টোল মনে পড়ছে না। মাত্র একদিন দেখা মুখে এতটা মনে থাকার কথাও নয়।

আসলে মেয়েরা শরীরের অনেক সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখতে জানে। সবাইকে দেখায় না, অথবা সময় হলে দেখায়। কে জানে, মোমও হয়তো সেইভাবে তার টোল লুকিয়ে রেখেছিল। ঘটনা যাই হোক, নীল জিনস আর সাদা টপে মোমকে আজ বাড়াবাড়ি ধরনের সুন্দর লাগছে। একটু দূরে একটা ঝাপসা ছাতিম গাছের তলায় বসে আছে সে। বসে আছে মোড়ার ওপর। কানে মোবাইল ফোন। কথা বলছে। কখনও মুখ নামিয়ে, কখনও মুখ তুলে।

সোমনাথ মুখ ফিরিয়ে নিল। কী অদ্ভুত! দু-দিন আগে এই সময়ে ছিল গড়িয়াহাটের মোড়ে। আজ একেবারে হাইওয়ের ধারে! ঝুপড়ি ধরনের একটা চায়ের দোকানের নড়বড়ে বেঞ্চে আধশোয়া অবস্থায় আছে। মাথার নীচে একটা হাত। ডান পা-টা তোলা বাঁ-পায়ের হাঁটুতে। চারপাশে গাছপালা, ঝোপঝাড়। জঙ্গল নয়, তবু কেমন একটা জঙ্গলি জঙ্গলি ভাব। আশেপাশে কোনো মানুষজনও চোখে পড়ছে না। দোকানের পিছনেই একটা ডোবা। রাস্তার

boierpathshala.blogspot.com

উলটোদিকে তাদের খারাপ-হয়ে-যাওয়া গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। বড়ো গাড়ি। শ্যুটিং পার্টির যেমন হয়।

সোমনাথ চোখ বুজল। তার পা-ও অল্প অল্প নড়ছে। তবে আরামে নয়, নড়ছে রাগে। দু-দিন আগের ঝড়বৃষ্টির কারণে আজ রোদ নরম। তবু তার গা চিড়বিড় করছে। ইচ্ছে করছে, এই অবস্থাতেই একটা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দেয় কমল মল্লিকের কাছে। কাজ ছাড়বার চিঠি।

সোমনাথ মনে মনেই চিঠির খসড়া করে ফেলেছে। প্রথমে ঠিক করেছিল, চিঠি ছোটো হবে, দু-লাইনের। খানিক পরে বোঝা গেল, ইচ্ছে না থাকলেও চিঠি বড়ো হয়ে যাচ্ছে।

'স্যার, এত চেষ্টা করেও মল্লিক টিভি থেকে পালাতে পারলাম না। আপনি জড়িয়ে ফেললেন, আমিও নিজে জড়িয়ে পড়লাম। আপনি জড়ালেন বুদ্ধিমানের মতো, কাজ হাসিল করতে। আমি জড়িয়েছি গাধার মতো। একটা গাঁজাখুরি গুজবে নেচে। সঙ্গে খানিকটা লোভও। গাঁজা গল্পের গাঁজা ডিরেক্টর হওয়ার লোভ। এই জড়ানোর কাজে আপনি একটা সুতো ব্যবহার করেছেন। সেই সুতোর নাম মোম। মোম চ্যাটার্জি। স্যার, এটা আপনার আর একটা নতুন চাল। তখন বুঝিনি, প্রস্তাব শুনে উত্তেজিত হই এবং রাজি হয়ে যাই। এখন বুঝতে পারছি, এই কাজের দায়িত্ব নেওয়াটা বোকামি হয়ে গেছে।একটা গেঁয়ো কবিতায় কী দু-লাইন লেখা হয়েছে, তাই দেখে উত্তেজিত হওয়াটা ঠিক হয়নি।

স্যার, পরিকল্পনা মতো আশ্চর্য মেয়ের ওপর প্রোগ্রাম তৈরি করতে দলবল নিয়ে ঝিলডাঙা রওনা হয়েছি এবং কী ধরনের বিপদে পড়েছি আপনি সবটা জানেন না। জেনে লাভও নেই। কারণ মনে হচ্ছে, সামনে আরও বিপদ আসছে। অথচ এই বিপদে আমার পড়ার কোনো কারণ ছিল না। আপনার পাল্লায় না পড়লেই হত। এর জন্য পৃথাও খানিকটা দায়ী। আমি কাজ ছেড়ে দেব ভেবে ডুব মেরে ছিলাম। মিথ্যে জ্বরের গল্প ফেঁদে বাড়িতে শুয়ে ছিলাম চাদর মুড়ি দিয়ে। আপনি বাড়িতে লোক পাঠালেন। আমি গাধার মতো পরামর্শ চাইছিলাম পৃথার কাছে। আমার উচিত ছিল কারও কাছে পরামর্শ না চাওয়া এবং নিজের সিদ্ধান্তের ওপর চাদরটা আর শক্তভাবে চাপা দিয়ে শুয়ে থাকা। পৃথা আমাকে জোর করে সেদিন আপনার কাছে পাঠিয়েছিল। আপনি প্রথমে ওয়েদার বুলেটিনের কাজটা করতে বললেন। মোমকে ম্যানেজ করার জন্য রিকোয়েস্ট করলেন, পরে সেই প্রোগ্রাম বাতিল করে এই উদ্ভট কাজে জড়িয়ে ফেললেন। মোমকে যে আমি অনেকদিন আগে অল্প অল্প চিনতাম এই গল্প নিশ্চয় আমিই

boierpathshala.blogspot.com

আপনাকে কোনো একটা সময় করেছিলাম। নইলে আমাকেই-বা আপনি এই মেয়ের মান ভাঙানোর জন্য অনুরোধ করবেন কেন? এখন বুঝতে পারছি, সেটাও আমার পক্ষে বিরাট একটা বোকামি হয়েছিল। কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে এই গল্প আমি করেছিলাম আজ আর মনে নেই।

যাই হোক, কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার আগে ভেবেছিলাম ফিরে গিয়ে মল্লিক টিভি থেকে বিদায় নেব। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ফিরে যাওয়া পর্যন্ত দেরি করা ঠিক হবে না। তাই এই হাইওয়ের পাশ থেকেই রেজিগনেশনের চিঠি পাঠাচ্ছি। কিছু মনে করবেন না। আশা করি, আমার পাওনাগণ্ডা দ্রুত মিটিয়ে দেওয়া হবে। এ-মাসে টাকাপয়সার টানাটানি চলছে। রাজস্থানের যাতায়াতের খরচ আছে। পাহাড়ওলারা যে খাতির করে আমাকে ট্রেনের ভাড়া পাঠিয়ে দেবে এমন মনে হচ্ছে না। ভালো থাকবেন। মল্লিক টিভি প্রোডাকশনের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।'

মনে মনে চিঠি লেখার পর সোমনাথ উঠে বসল। আড়মোড়া ভাঙল। ডোবার জলে কটর কটর করে কী যেন ডাকছে। কী ডাকছে? ব্যাঙ? এই ফটফটে আলোয় ব্যাঙ আসবে কোথা থেকে? আসতেও পারে। পাড়াগাঁয়ে সাপ ব্যাঙের কোনো সময়জ্ঞান থাকে না। অর্জুন আর বেটু-ই কতদূর গেল?

সোমনাথের আবার চোখ পড়ল মোমের দিকে।

মেয়েটা এখনও বকর বকর চালাচ্ছে! মাথার রক্ত চড়াত করে উঠল সোমনাথের। ইচ্ছে করল, মোবাইলটা কেড়ে নিয়ে পচা ডোবার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে। এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলতে যাতে ডুবুরি নামিয়েও খুঁজে না পাওয়া যায়।

সোমনাথের এই ইচ্ছে হওয়াটা অপরাধের কিছু নয়। মোম সেই কলকাতা থেকে মোবাইলে কথা বলা শুরু করেছে। গাড়িতে ওঠার পর থেকেই কথা চলছে নানা ভঙ্গিতে। কখনও হাসি মুখে, কখনও কাঁদো কাঁদো ভঙ্গিতে। কখনও চুল ঝাঁকিয়ে, কখনও শান্ত হয়ে। ফিসফিসে সেই কথার ছেঁড়া ছেঁড়া যেটুকু ভেসে আসছে তার কোনোটাই সম্পূর্ণ নয়। আজকাল নায়িকাদের এটা একটা কায়দা হয়েছে। নিজেকে ঘিরে কুয়াশা তৈরির কায়দা। তাচ্ছিল্যের কুয়াশা। ভানটা হল, কাজ করতে এসেছি বটে কিন্তু তোমাদের সঙ্গে নেই। শোনা যায়, প্রাচীনকালেও এই ঘটনা ঘটত। শ্যুটিঙে এসে স্টারেরা মুখের সামনে বই নিয়ে বসে থাকত। প্যারি ম্যাসন, মিলস অ্যান্ড বুনস, হ্যাডলি চেজ ধরনের সব বই। মলাট দেওয়া সেই বই পড়ার ঘটা দেখলে মনে হত শ্যুটিং শেষ হলেই মেয়ে ইউনিভার্সিটির

boierpathshala.blogspot.com

হল্‌এ গিয়ে দর্শনশাস্ত্র নিয়ে পরীক্ষা দিতে বসবে। কাজের সময়টুকুতে খালি মুখ ব্যাজার করে উঠে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াত। এখন বইয়ের বদলে মোবাইল।

মোমের যে টুকরো টুকরো কথা কানে এসেছে তা অনেকটা এরকম—

'না, না হতে পারে না...যাওয়া যাবে...কী যে বলো...অ্যাই, সেদিন কী হল... বলো না প্লিজ...হি হি... ভেরি ব্যাড...ভীষণ খারাপ লাগছে...।'

কথা শুধু অসম্পূর্ণ নয়, অসংলগ্নও। 'হি হি' করে হাসির সঙ্গে 'ভীষণ খারাপ লাগছে' হয় না। প্রায় সাড়ে তিনঘণ্টাব্যাপী একটা মানুষ চোখের সামনে অর্থহীন বকবক করে গেলে মোবাইল কেড়ে ফেলে দেওয়ার ইচ্ছে অপরাধ কিছু নয়। তবে একটা বড়ো বাঁচোয়া মোমের মা আসেনি। এটা নিয়ে একটা টেনশনের মধ্যে ছিল সোমনাথ। কমল মল্লিককে বলতে তিনি বললেন, 'সেইজন্যই তো তোমাকে দায়িত্ব দিলাম।'

'আমাকে দায়িত্ব দিলেন মানে! আমি প্রোগ্রামটা তৈরির দায়িত্ব নিতে পারি, কিন্তু মোমের মায়ের দায়িত্ব নেব কীভাবে?'

'আহা, আমি কী সে-কথা বলেছি? আমি বলেছি ওই মহিলাকে ম্যানেজ করার দায়িত্ব। যে করেই হোক ওকে বাদ দিতে হবে। ওকে ঝিলডাঙায় নিয়ে যাওয়া চলবে না। ওই অসভ্য মহিলা নাকি মেয়ের শ্যুটিং-এর সময় খুব গোলমাল করে। ''রঙিন মন'' টেলিফিল্মের শ্যুটিঙের ঘটনা শুনলে তুমি আঁতকে উঠবে সোমনাথ। নায়কের সঙ্গে মোমের গানের সিকোয়েন্স ছিল। শট টেক করবার আগে সেটের মাঝখানে নায়ককে ওই মহিলা দুম করে বলল, দ্যাখো বাপু, সুযোগ বুঝে তুমি আবার আমার মেয়ের বুকে হাত দিয়ে বোসো না। আজকাল ছোকরা আর্টিস্টদের এসব খুব হয়েছে। নাচগান হলেই নায়করা ইস্ক্রিপ্টে র বাইরে গিয়ে নায়িকার গায়ে হাত দেয়। রবীন্দ্রসংগীত -টংগীত হলে তো কথাই নেই, ভাবে সাত খুন মাপ। আমি কিন্তু ছাড়ব না। কাণ্ডটা একবার বোঝো সোমনাথ । ''রঙিন মনে''র ছেলেটা নতুন। বয়স অল্প, লেখাপড়া জানা শিক্ষিত ভালো ছেলে। এখন তো ভালো ছেলেপিলেরা এই লাইনে আসছে। সে এই কথা শুনে একেবারে ফায়ার। বেঁকে বসল। বলল, আর কাজই করবে না। দরকার হলে অভিনয় করাই ছেড়ে দেব। ছবি এদিকে.অর্ধেক তোলা হয়ে গেছে। টাকা ঢুকে গেছে। পরিচালকের তো মাথায় হাত। সুতরাং ওই মহিলাকে বাদ দিতে হবে। সব গুবলেট করে দেবে। বোঝাতে হবে এটা সিরিয়াল বা গানের শ্যুটিং নয়, মেয়ের গায়ে হাত দেওয়ার কেউ নেই, সুতরাং মাকে পাহারাও দিতে হবে না।'

boierpathshala.blogspot.com

সোমনাথ গম্ভীর মুখে বলে, 'আমি জানি না কী হবে। চিন্তা হচ্ছে।'

চিন্তা হওয়ারই কথা। ঝামেলা অনেকগুলো। প্রথম ঝামেলা ছিল, মোমকে বুঝিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া। পাঁচতারা হোটেলের সুইমিং পুলের বদলে ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোবিন্দপুরে। তার ওপর সত্যি ঘটনা বলা যাবে না, বানিয়ে বলতে হবে। সোমনাথের দৃঢ় বিশ্বাস কোনো রহস্যময় কারণে মোম সেই প্রস্তাব এককথায় মেনে নিয়েছে। সম্ভবত মুডের কারণেই মেনেছে। তারপরেই আরও বড়ো ঝামেলা এলো। আলো চ্যাটার্জিকে এই ট্যুর থেকে বাদ দেওয়ার ঝামেলা।

তবে সেই ঝামেলা থেকে রেহাই পেতে মোমই তাকে সাহায্য করেছে। সে-ই তাকে 'স্ক্রিপ্ট' তৈরি করে দেয়। মাকে বাদ দেওয়ার স্ক্রিপ্ট।

'মা জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু ওই ভূতে পাওয়া মেয়ের গল্প বলবে না সোমনাথদা। কেলেঙ্কারি হবে। আমাকে কিছুতেই কাজটা করতে দেবে না।'

'তোমার মা জিজ্ঞেস করবেন নাকি!'

মোম টেলিফোনেই হাই তুলতে তুলতে বলেছিল, 'আগে মনে হয়েছিল করবে না, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে করবে। তোমার ভূত দেখব বলে তিনটে কাজ রিফিউজ করেছি। মা তাতে খেপচুরিয়াস। যখন-তখন তোমাকে অ্যাটাক করতে পারে। ফোন নম্বর খুঁজছিল।'

সোমনাথ উদ্‌বিগ্ন গলায় বলে, 'তুমি কী বলেছ?'

'কিছু বলিনি। তুমি বানিয়ে বানিয়ে যা হোক বলে দেবে। ভালো হয় যদি বলো, ওই ওয়েদারের ব্যাপারটাই গ্রাম-টামের দিকে শুট করা হবে।'

সোমনাথ নার্ভাস গলায় বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

মোম ফিক করে হেসে বলল, 'বোঝার তো কিছু নেই। আমি যে তোমার সঙ্গে যাচ্ছি সেটা তো বুঝেছ?'

'থ্যাঙ্কইউ মোম। তোমার চেকটা কালই পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'দ্যাটস ফাইন। আইস-ব্যাগের মতো মাকে বলব চেক মাথায় দিয়ে বসে থাকতে। তাতে যদি শান্ত হয়।'

খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে সোমনাথ বলল, 'অ্যামাউন্টটা আড়াই করা হয়েছে।'

মোম বলল, 'ও গ্রেট। তাহলে মনে হয় না মা আর ফোন করবে।'

আলো চ্যাটার্জি ফোন করেছিলেন। সোমনাথের মোবাইলে নয়, অফিসে। ওয়েদার বুলেটিনের শ্যুটিং গ্রামে হবে শুনে মহিলা টেলিফোনের ওপাশে খানিকটা চুপ করে রইলেন। তারপর চিন্তিত গলায় বললেন, 'গ্রামে! কেন? গ্রামে কেন? সুইমিংপুলে হওয়ার কথা ছিল না? এতটা আউটডোরের তো কথা ছিল

boierpathshala.blogspot.com

না বাপু।'

সোমনাথ তাড়াতাড়ি বলে, 'সুইমিংপুলেই আসলটা হবে ম্যাডাম, সঙ্গে গ্রামের একটা সিকোয়েন্স থাকছে।'

'কেন? গ্রামের সিকোয়েন্সের কারণটা কী? বৃষ্টিবাদলা কি ধানখেতে বেশি হয়?'

সোমনাথ বিরক্ত হতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। সে চুপ করে থাকে। আলো চ্যাটার্জি বলেন, 'দ্যাখো ছেলে, তুমি হয়তো ভাবছ, নায়িকার মা এত প্রশ্ন কেন করছে? তাই তো?'

'না, আমি সেরকম কিছু ভাবছি না।'

'অবশ্যই ভাবছ। মুখে বলছ না। সবাই ভাবে। আসলে আমি মোম চ্যাটার্জির শুধু মা নই, তার সেক্রেটারিও বটে। তার ভালোমন্দ, কেরিয়ার সবই আমাকে ভাবতে হয়। মেয়ে চালাক হলে ভাবতে হত না, বোকা বলেই ভাবতে হয়। তার ওপর ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষ নায়িকার মা হওয়া বিপদের। খারাপ লোকেরা সর্বক্ষণ ছুঁকছুঁক করে। আড়াল আবডাল পেলে লোভ দেখায়। মেয়ে পা হড়কালেই কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।'

সোমনাথ লজ্জা পেয়ে বলল, 'না না মোম সেরকম মেয়েই নয়। ছোটোবেলা থেকেই তাকে তো দেখছি।'

'না দ্যাখোনি। একবার কোথায় পিসি না মাসির বাড়িতে দেখা হওয়াকে দেখা বলে না। তা ছাড়া সে তখন খুবই ছোটো ছিল। খুবই বোকা ছিল। এখন আরও বোকা হয়েছে।'

কী বলবে সোমনাথ বুঝতে পারছে না। কথা ঘোরানো জন্য বলল, 'গ্রামের সিকোয়েন্সে পিছনে ফোক সং থাকবে।'

'ফোক সং! ওয়েদার বুলেটিনে ফোক সং! ঘটনা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

সোমনাথ গলায় বানানো উৎসাহ এনে বলে, 'বুঝতে পারবেন, অবশ্যই বুঝতে পারবেন। সবাই দেখে যখন হইহই করবে তখনই ঘটনা বুঝতে পারবেন। সন্ধের পর থেকে ভিউয়াররা চ্যানেল ঘুরিয়ে বসে অপেক্ষা করবে মোমের আকাশ কখন হবে। ওয়েদার বুলেটিন দেখবার জন্য এই ক্রেজ টিভি প্রোগ্রামের ইতিহাসে একটা মাইলস্টোনের মতো হয়ে থাকবে আপনি দেখবেন।'

আলো চ্যাটার্জি বললেন, 'তোমার ওই সুইমিংপুলের স্ক্রিপ্টে সেটা হবে না বলছ?'

'হবে, তাও হবে। তবে কিনা সঙ্গে একটা কনট্রাস্ট তো চাই। সাদার সঙ্গে

boierpathshala.blogspot.com

কালো। ভালোর পাশে খারাপের মতো শহরের সঙ্গে গ্রামের একটা মিক্সচার হলে প্রোগ্রাম আরও জমবে। সেই কারণেই এই আউটডোর। সিকোয়েন্সটা হবে সিনেমার মতো। মোম কখনও গ্রামের গাছগাছালি ঢাকা পথে হাঁটছে, কখনও কুঁড়েঘরের দাওয়ায় বসে আছে, কখনও আছে মাঠ, খেতের মাঝখানে। পিছনে গান হবে, আল্লা ম্যাঘ দে, পানি দে...। কেমন হবে ? দৃশ্যটা অনেক ভেবেচিন্তে করা হয়েছে। এরপরেই কাট করে মোমকে দেখা যাবে ঝাঁ চকচকে সুইমিং পুলের পাশে। গায়ে তোয়ালে। প্রথমদিন তোয়ালে নীল রাখব ঠিক করেছি। ঘন নীল নয়, হালকা নীল। আকাশের রং হালকা নীল বলে তোয়ালেও হালকা নীল। আইডিয়াটা কেমন?'

'কেমন বুঝতে পারছি না। মনে তো হচ্ছে ভালো।'

সোমনাথ প্রায় খড়কুটো হাতে পাওয়ার মতো করে উৎসাহ ডবল করল।

'আমার তো গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

টেলিফোনের ও-প্রান্তে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে আলো চ্যাটার্জি বললেন, 'সেটাই তো ভয়ের। কাজ করতে গিয়ে যদি আমার মেয়ের গায়ে কাঁটা দেয় আর সেই কাঁটা দেখার জন্য কেউ যদি বলে, হাত দেখি কাঁটা কেমন তাহলেই সর্বনাশ। যাক, বাপু ম্যাঘ দে-টা আবার কী গান!'

থতমত-খাওয়া-সোমনাথ কষ্ট করে হাসল।

'ফোক। লোকসংগীত। ও আর একটা কথা মাসিমা, কথাটা অবশ্য বড়ো কিছু নয়, মল্লিক টিভি স্ক্রিপ্টের এই অদলবদলের জন্য টাকাটা আড়াই করে দিয়েছে। টু অ্যান্ড হাফ। বাইরে যেতে হচ্ছে তাই আড়াই গুণ বেশি।'

মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে শ্রীমতী চ্যাটার্জি বললেন, 'সে তো দিতেই হবে। এক নম্বর টিভি স্টার কাদায় হাঁটবে আর টাকা দেবে না তা তো হয় না। আরও বেশি দেওয়া উচিত ছিল।'

সোমনাথ আবার কথা ঘোরাল।

'ইস, আপনার শরীরের খরবই নেওয়া হয়নি। আপনি আছেন কেমন? পায়ের ব্যথা কমেছে?'

পায়ের ব্যথার খবর নিজের মুখে না দিলেও পরদিন মোম টেলিফোনে খবর জানাল।

'ব্যথা কমেনি। উলটে বেড়েছে। পাতা থেকে ব্যথা এখন হাঁটু পর্যন্ত উঠেছে।'

সোমনাথ মনে মনে লাফিয়ে উঠল। দারুণ খবর। এর থেকে ভালো খবর

boierpathshala.blogspot.com

হয় না। মুখে চুক চুক ধরনের আওয়াজ করে বলল, 'ইস, ব্যথা বেড়েছে!'

পরদিন মোম জানাল, 'ডাক্তার বলেছে মায়ের ব্যথা আরও বাড়বে। হাঁটু থেকেও উঠবে। কাল রাত থেকে নড়তে চড়তে পারছে না, তখন যে কী হবে কে জানে।'

সোমনাথ গলা নামিয়ে বলল, 'তোমার মাকে কাল সবটা বলেছি। উনি কিছু জানিয়েছেন?'

মোম হেসে বলল, 'না কিছু জানায়নি, দাঁড়ান জেনে আসি।'

'এখনই, থাক না পরে জেনে নিও বরং।' নার্ভাস গলায় বলল সোমনাথ। ব্যথার কারণে যদি বেঁকে বসে তাহলে চিত্তির।

'না, আপনি ধরে থাকুন, এখনই জানব।' হাসতে হাসতে বলল মোম।

সোমনাথ কানে ফোন ধরে এক দুই তিন করে সময় গুনতে লাগল। এটা ছেলেবেলার একটা খেলা। দশের মধ্যে হলে খবর ভালো হয়, নইলে ডুবতে হবে।

খবর এল পনেরো গোনার পর এবং সেটা ভালো খবর।

মেয়ের আউটডোর শুটিঙে নায়িকার মা শুধু রাজি হননি, খুবই রাজি হয়েছেন। তিনি শয্যাশায়ী থাকার কারণে নিজে ফোন ধরতে পারছেন না, কিন্তু এই ধরনের 'মিক্সচার' পরিকল্পনার জন্য তিনি সোমনাথকে বারবার ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বলেছেন, এরকম মাথা যদি টিভির জগতে আর কয়েকটা থাকত তাহলেই আর দেখতে হত না। আমাদের দেশ টিভিতে সব দেশকে ছাড়িয়ে যেত। ভারতবর্ষ হত টিভি সম্রাট। পায়ের কারণে তিনি নিজে গ্রামের শুটিঙে যেতে পারবেন না বলে খুবই আপশোস করেছেন। নিজের মেয়ের একটা বড়ো কাজের সাক্ষী হতে না পারাটা আপশোসের ছাড়া আর কী?

সোমনাথ কানে ফোন ধরেই লাফিয়ে উঠল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ মোম।'

মোম ন্যাকা ন্যাকা গলায় বলল, 'একদিন মাকে দেখতে আসবে কিন্তু। নইলে আমি খুব রাগ করব হ্যাঁ। পারলে আজই সন্ধের পর এসো না।'

মোমের অনুরোধ মতো তার মাকে দেখতে যাওয়ার সাহস পায়নি সোমনাথ। ওই মহিলা পায়ের পাতার ব্যথার জন্য হাঁটু পযন্ত শাড়ি তুলে বসেছিলেন। হাঁটুর ব্যথার জন্য কতটা তুলবেন কে জানে। এই ঝুঁকি নেওয়া যায় না। ওই মহিলাকে যত অ্যাভয়েড করা যায় তত মঙ্গল। কে জানে পরিচালককে চোখের সামনে দেখে হয়তো ব্যথা-ট্যথা ভুলে মেয়ের সঙ্গে যাওয়ার জন্য বেঁকে বসবে। সন্ধের পর পোশাকের লোককে মোমের বাড়িতে একাই পাঠিয়ে দিয়েছিল

boierpathshala.blogspot.com

সোমনাথ। জায়গার নাম বলেনি, শুধু বলেছে, 'অর্ণব, গ্রামের দৃশ্য বুঝে ড্রেস কালার ঠিক করবে। চড়া রং চলবে না। মেয়ের মা যদি কিছু বলে, মনে হয় বলবে, মুখের ওপর কথা বলার দরকার নেই। পরে আমি ব্যবস্থা করব।'

মল্লিক টিভির ছোটো টিমের সঙ্গে মোম এখন ঝিলডাঙার পথে চলেছে। কানে মোবাইল নিয়ে একটানা বকে যাচ্ছে।

সোমনাথ মনে মনে ভাবল, বকুক। যত খুশি বকুক। নিজের মোবাইলে কথা বলার থেকে সে যে বেশি কিছু করছে না এটাই যথেষ্ট। করলে সেটাও মেনে নিতে হবে। এসি গাড়ির বদলে জলাজঙ্গল, খেত, মাঠ ভেঙে হাঁটার জন্য মোমের মতো 'সেক্স অ্যাপিলে হাই রেটিং' মেয়েরা যা খুশি করতে পারে। সবথেকে বড়ো কেলেঙ্কারি হবে 'কলকাতায় ফিরে যাব' বলে বেঁকে বসলে। শ্যুটিং বাতিল করে জিনিসপত্র গুটিয়ে ফিরে যাওয়া ছাড়া তখন আর অন্য কোনো পথ থাকবে না। এই মেয়েকে এখন চটানো চলবে না। তোয়াজে রাখতে হবে। মোবাইল কাড়া তো তো দূরের কথা, এ যদি অন্য কারও মোবাইল ছুঁড়ে ফেলতে চায় সে-ব্যবস্থাও দরকার হলে করতে হবে।

সোমনাথ মোমের দিকে চেয়ে বানিয়ে বানিয়ে হাসল। হাত নাড়ল। এ হাসির নাম হতে পারত 'নায়িকা খুশি করা' হাসি। মোম হাত তুলে আবার মোবাইলে কথা চালাতে লাগল।

'সেটা তো হবেই...কী যে কাণ্ড... আহা...বলোই না...দেখতে পেলাম...অ্যাই দুষ্টু ...হি হি...ভীষণ খারাপ...।'

কথা বলতে বলতেই মোম তার জিনসের পকেট থেকে সিগারেট, লাইটার বের করল। কলকাতা ছাড়ার পর থেকে মোবাইলে কথা বলা ছাড়া এই আর এক কাণ্ড শুরু করেছে। মোবাইল-বকবকানির সঙ্গে সিগারেট টানছে ফসফস করে। এসি গাড়ির কাচ নামিয়ে সিগারেট খাওয়া যে কী বিরক্তিকর!

ঠিক এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট আগে গাড়ি খারাপ হয়েছে। গোঁ গোঁ আওয়াজ করে থমকে দাঁড়িয়েছে। বানেরহাট থেকে রওনা দিতে কিছুটা দেরি হয়েছে। আরও আগে দেওয়া যেত। কিন্তু জল নিয়ে একটা সমস্যা হল। বানেরহাট গেস্ট হাউসে গিজার নেই। মোমের স্নানের জল গরম করতে আনাতে হল রান্নাঘর থেকে। টেম্পারেচর পছন্দ না হওয়ার কারণে জল বদলাতে হয়েছে তিনবার।

ড্রাইভার আবদুল গাড়ি চেক করে নিয়েছিল। সোমনাথ সেই ফাঁকে এদিক-ওদিক ঘুরে ঝিলডাঙা গ্রাম এবং ফুল নামের মেয়েটির খোঁজখবর নিতে চেষ্টা করে। সতর্কভাবেই চেষ্টা করে। কিছুই পাওয়া যায় না। একবার ভাবল, ঠিকানা

boierpathshala.blogspot.com

খুঁজে 'বানেরহাট সংবাদ' পত্রিকার অফিসে যাবে। তরুণ কবি গঙ্গাপদকে বের করবে। কিন্তু কমল মল্লিক পই পই করে বারণ করে দিয়েছে। বলেছে, ওই ছোকরার ইন্টারভিউ নেওয়া হবে সবার পরে। কাজ পুরো গুটিয়ে নেওয়ার পর। নইলে ফাঁস হয়ে যাওয়ার চান্স রয়েছে। শ্যুটিং টিম দেখলেই এরা মাইক লাগিয়ে বলে বেড়াবে।

বানেরহাট ছাড়ার ঘণ্টা খানেক পর গাড়ি আটকালো। জায়গাটার নাম মল্লিকপুর। আবদুল দু-বার চাবি ঘুরিয়ে হাল ছেড়ে সুন্দর করে হাসল। গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ার পর এইরকম সুন্দর হাসি খুব কম ড্রাইভারই হাসতে পারে।

'চলবে না। মেকানিক লাগবে। বানেরহাটের মেকানিক না, কলকাতার মেকানিক।'

সোমনাথ রেগে গিয়ে বলল, 'চলবে না মানে? ইঞ্জিন-টিঞ্জিন না খুলেই বলে দিলে চলবে না! আগে একটু নেমে দেখ। ঠেলেঠুলেও তো হতে পারে। কিছু না দেখেই বলে দিলে চলবে না?'

আবদুল হাই তুলে বলল, 'বেকার চেঁচায়েন না। গরম দেখায়া কোনো লাভ নাই। এ-জিনিস ঠেলে চলার জিনিস নয়। জাপানি কোলাবরেশনের জিনিস। গাড়ির ভেতর বসা মানুষ আর ভাঙাভুঙা রাস্তা ছাড়া এর কোনোটাই দেশের নয়, সবটাই বিদেশের। কথা না কয়ে মেকানিক ডাকেন। বানেরহাট, কলকাতা দু-জায়গা থেকেই ডাকেন। যে আগে সারাতে পারে। তবে মনে হয় না রাতের আগে লোক আসবে, কাল ভোরের আগে গাড়ি সারানোর চেনস দেখি না। দেখি, আপনারা নামেন দেখি।'

অর্জুন চোখ পাকিয়ে বলল, 'নামব! নামব মানে? মজা নাকি? আমরা নামব কেন? আবদুল তুমি কী বলতে চাইছ?'

অর্জুন ক্যামেরা চালায়। ছবি সুন্দর তোলে। অর্জুন সঙ্গে থাকলে আলো নিয়ে চিন্তা থাকে না। কম আলোতে ছোকরা খেলতে জানে। দর্শক তো কোন ছার, এডিটিং-এ যে বসে সে-ও খুঁত ধরতে পারবে না। ছোকরা ফ্রেমও টাইট ধরে। জায়গার জন্য ঘ্যান ঘ্যান করে না। ছোটো ইউনিট হলে অর্জুনকে অবশ্যই লাগে। এবারও সোমনাথ নিজে তাকে বেছে নিয়েছে। তবে মানুষটা বোকা। হুটপাট রেগে যায়। সেটাও ভালো। বোকা লোকের কৌতূহল কম।

আবদুল তার দিকে চেয়ে ফের হাসল। হেসে বলল, 'কিছুই বলতে চাই না অর্জুন ভাই। আমি এখন ঘুমোতে চাই। আপনারা নামলে সিটে গামছাটা পেতে বিছানা করব। এই কারণেই নামতে বলি। শুধু-মুদু রাগ করেন কেন?'

boierpathshala.blogspot.com

গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার একপাশে সরে কমল মল্লিককে মোবাইলে ধরল সোমনাথ । গাড়ি খারাপের কথা জানিয়ে বলল, 'ফিরে আসি স্যার?'

'খেপেছ? এত অ্যারেঞ্জমেন্ট আর করা যাবে? তা ছাড়া শুনছি, কলকাতায় একটু-আধটু করে খবর লিক হচ্ছে।'

সোমনাথ অবাক হল। খবর ফাঁস হওয়ার কোনো কারণ নেই। কমল মল্লিক একেবারে কঠিন ব্যবস্থা করেছে। এমনকি ক্যাশ সেকশন, ক্যামেরা ডিপার্টমেন্টকে পর্যন্ত কিছু বলা হয়নি। গাড়ির ব্যবস্থাও হয়েছে গোপনে। আবদুলকে জায়গার নাম বলা হয়েছে বেরোনোর মুখে। তাহলে? সোমনাথ মনে করার চেষ্টা করল সে বে-খেয়ালে কাউকে বলে ফেলেছে কি? কই না তো, কাউকে বলেনি। বাড়ির কাউকেও নয়। শুধু পৃথা জানে। তাহলে? মল্লিক মিথ্যে বলে চাপ দিচ্ছে নিশ্চয়।

কমল মল্লিক মোবাইলেই ফিসফিস করে উঠলেন।

'ওখান থেকে ঝিলডাঙা যাওয়ার বাস নেই? খোঁজ নিয়েছ?'

'নিয়েছি, বাস আছে। তবে আজ নেই। ড্রাইভার না কন্ডাক্টর কে মারা গেছে। লাইনে সব গাড়ি বন্ধ। বন্ধ না থাকলেও কোনো সুবিধে হত না। এই রুটে দিনে মাত্র দুটো বাস। শুনেছি একটা ট্রেকার চলছে। সন্ধের পর আসবে। তাও শিওর নয়। তা ছাড়া বাস চললেই-বা কী লাভ হত? মোম বাস্এ করে যেত বলে আপনার মনে হচ্ছে?'

ওদিকে কমল মল্লিক কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। সিগন্যালে সমস্যা হচ্ছে। মোবাইলে শুধু শোঁ শোঁ করে বাতাসের শব্দ হতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই গলা ভেসে এল আবার।

'তোমরা যেভাবেই হোক ঝিলডাঙার দিকে রওনা দাও সোমনাথ। অন্য কেউ আগে পৌঁছে গেলে সর্বনাশ হবে। একটা গাইড-টাইড ধরে নাও।'

মানুষটা বলছে কী! কীভাবে রওনা হবে!

'কীভাবে রওনা হব? হেঁটে?'

'দরকার হলে তাই করবে।'

সোমনাথ আকাশ থেকে পড়ল। বলল, 'মোম হাঁটতে রাজি হবে?'

'কেন হবে না? মিষ্টি করে বলো। তুমি বললে সব হবে। কথায় না হলে টাকায় হবে। অ্যামাউন্ট বাড়াবে। সোমনাথ, তীরে এসে তরী যেন না ডোবে। তরী যদি ডোবাতেই হয় মাঝনদীতে ডোবাবে। বুঝেছ?

মোমকে মিষ্টি নোনতা কিছু করেই বলতে হল না। সে নিজে থেকেই

boierpathshala.blogspot.com

বলল, 'অ্যাই সোমনাথদা, চলুন না হাঁটি। প্লিজ চলুন। আমি কখনও গ্রামে হাঁটিনি। ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড। এখান থেকে আপনার ওই ডাঙা না জল কতদূর?'

'তুমি পারবে?'

'মনে হয় না। তবু চেষ্টা করে দেখি।'

সোমনাথ বেঞ্চের ওপর ধড়ফড় করে উঠে বসল। সে শুধু অবাক হল না, অবাকের চোটে কথা বন্ধ হয়ে গেল। এই মেয়ে বলে কী! হাঁটবে! সত্যি বলছে তো? ঠাট্টা নয় তো?

মোম ততক্ষণে মোবাইল কানে ফের বকবক শুরু করেছে।

সোমনাথের নির্দেশে গাড়ি রেখে মল্লিক টিভি প্রোডাকশনের ইউনিট হাঁটা শুরু করেছে।

হাইওয়ে ছেড়ে মাঠ, খেত, গ্রামের পথ, পুকুর পাড়, ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটা। কমল মল্লিক খবর পাঠিয়েছেন, 'বেটু পথ চেনে।'

সোমনাথ বলল, 'আপনি শিওর?'

মোবাইলের ভাঙা তরঙ্গ বয়ে উড়ে আসা ছেঁড়া ছেঁড়া কথায় কমল মল্লিক বললেন, 'সিওর মানে! হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর। তুমি কথা বলো। ট্রিট অ্যাজ ইওর গাইড।'

সোমনাথ এই তথ্য জানত না। কমল মল্লিক যখন এত জোর দিয়ে বলছেন, তখন ঘটনা নিশ্চয় সত্যি হবে। তলে তলে নিশ্চয় ব্যবস্থা করা আছে।

না, ঘটনা সত্যি নয়। বেটু পথ চেনে না। বানেরহাট পর্যন্ত চেনে। একসময় তার মামা না কাকা থাকত। তাও অনেকদিন আগে। অগত্যা পথ চেনানোর জন্য সোমনাথ মল্লিকপুর থেকেই একজনকে ঠিক করেছে। রোগা পাকানো চেহারা। বিচ্ছিরিরকম ঠেলে বেরিয়ে আসা দুটো চোখ। রাস্তার পাশের ঝুপড়িটায় বসে দিনের আলোতেই মদ খাচ্ছিল চায়ের গেলাসে। লোক দেখে হাতের গেলাস বেঞ্চের নীচে লুকোল।

সোমনাথ এগিয়ে কথা বলতে গেলে লাল চোখ তুলে বলল, 'ঝিলডাঙায় কী ব্যাপার? শ্যুটিং মনে হচ্ছে।'

সোমনাথ হেসে বলে, 'ঠিকই বলেছেন ভাই শ্যুটিং। তবে বড়ো কিছু নয়, গভর্নমেন্টের জন্য ছবি তুলব। ধান গাছের পোকা নিয়ে ডকুমেন্টারি। ডকুমেন্টারি জানেন তো? তথ্যচিত্র।'

লোকটা কঠিন গলায় বলল, 'ধানের পোকা দেখতে ঝিলডাঙা কেন?

boierpathshala.blogspot.com

পোকা কি শুধু ঝিলডাঙায় পাওয়া যায়? অন্য কোথাও নেই?'

সোমনাথ সতর্ক হল। লোকটা বেশি প্রশ্ন করে।

'না তা কেন? পোকা শুধু ঝিলডাঙায় থাকবে কেন? পোকা সব জায়গাতেই আছে। আমরা সব জায়গাতেই ঘুরে ঘুরে ছবি তুলছি। ঝিলডাঙাতেও তুলব। দুর্গম এলাকা তাই লিস্টে রয়েছে। ভাই, ওই দেখুন আমাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। বানেরহাটে খবর দেওয়া হয়েছে। মিস্ত্রি এসে সারাতে অনেকক্ষণ। শুনেছি এখানে মাঠ-টাঠের মধ্যে দিয়ে ঝিলডাঙা যাবার একটা শর্টকাট পথ আছে। কথাটা কি সত্যি?'

লোকটা একটা বিড়ি ধরিয়ে লম্বা টান দিল। তারপর নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'সত্যি হবে না কেন? শুধু শর্টকাট নয়, শর্টকাটেরও শর্টকাট আছে।'

সোমনাথ উৎসাহিত হয়ে বলল, 'সে আবার কী?'

'আছে। আরও কুড়ি, বাইশ মিনিট কম লাগে। তবে পথটা ঝামেলার।'

কথা শেষ করে সেই রোগা পাকানো লোক ঝুপড়ির বাইরে উঁকি দিল। মোমকে দেখতে পেল। সোমনাথের দিকে ফিরে বলল, 'সঙ্গে মেয়েছেলে নাকি দাদা?'

সোমনাথ বানিয়ে হেসে বলল, 'নায়িকা। ভাই, ওসব ছাড়ুন। আপনি আমাদের পথটা চিনিয়ে দিন। গাইডের মতো, আমরা পেমেন্ট দেব।'

লোকটা বেঞ্চের তলা থেকে হাত বাড়িয়ে লুকোনো গেলাস বের করল। লম্বা চুমুক দিয়ে শেষ করে উঠে দাঁড়াল লাল চোখ আরও লাল করে।

'কত পয়সা দেবেন?'

'কত নেবেন বলুন।'

খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরল সোমনাথ। লোকটাকে ধরে শুধু ঝিলডাঙায় পৌঁছোনো নয়, ওখানে দরকার পড়লে একটা রাত থাকতেও হবে। গাড়ির যা অবস্থা তাতে আজই ঠিক হবে কিনা সন্দেহ। সেক্ষেত্রে ঝিলডাঙায় থাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই। সেটাও একটা সমস্যা। ঠিক ছিল, ক-টা দিন বানেরহাট থেকেই যাতায়াত করা হবে। এখন তো মনে হচ্ছে, পরিকল্পনা অনেকটাই ভেস্তে গেল। বড়ো শ্যুটিং হলে প্রোডাকশন ম্যানেজার বলে একটা ব্যাপার থাকে। থাকা খাওয়া যাতায়াত সবই তার দায়িত্ব। এখানে তো সেসব কিছুই নেই। ছোটো ইউনিট নিয়ে প্রায় লুকিয়ে আসতে হয়েছে। সেই ম্যানেজার, সেই ডিরেক্টর। কুৎসিত।

টাকার পরিমাণ কিছু না বলে লালচোখে লোকটা বলল, 'ঠিক আছে চলুন।

boierpathshala.blogspot.com

আমার সঙ্গে সাইকেল আছে। সাইকেল নিয়ে আগে আগে হাঁটব। আপনারা পিছনে আসবেন। তবে সবটা থাকব না। সাঁবুই গ্রামের ঠিক আগে একটা পুকুর পড়বে। নাম ভাঙা পুকুর। আমি ভাঙা পুকুর পর্যন্ত থাকব। তারপর কাটব। আপনারা সোজা চলে যাবেন। সোজা গেলেই ঝিলডাঙা। পুরো একটা নোট লাগবে।'

মাত্র একশো টাকা! সোমনাথ খানিকটা অবাকই হল। সম্ভবত এই লোক দেশি মদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে টাকার হিসেব করে।

সেই লোক হাঁটা শুরু করেছে। সাইকেলের হাতল ধরে পিচ রাস্তা থেকে নেমে পড়েছে মাঠে। নাম বলছে 'শোল'। অদ্ভুত নাম। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। নিশ্চিন্তের কথা হল, এই লোক ঝিলডাঙা গ্রামেরই বাসিন্দা। পথঘাট হাতের মুঠোয়। হাঁটছেও জোর পায়ে। কে বলবে মদ খেয়ে নিয়েছে। দশ মিনিটের মধ্যে বাকিরা পিছিয়ে পড়ল। সোমনাথ কোনো ঝুঁকি নিতে চায়নি। খানিকটা গিয়েই একটা একশো টাকার নোট বের করেছে। এক হাতে সাইকেলের হাতল ধরে অন্য হাতেই আলোতে নোট তুলে দেখল শোল।

'ভাই, ঝিলডাঙায়, ফুল নামে কাউকে চেনো নাকি?'

ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্যই 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নামল সোমনাথ। শোলের এতে কিছু এসে গেল বলে মনে হল না। আগের মতোই নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে হনহন করে চলতে লাগল। মুখ না ঘুরিয়ে বলল, 'কী ফুল?'

সোমনাথ হেসে বলল, 'না না ওই ফুল নয়। ফুল একটা ছোটো মেয়ের নাম। বয়েস কত বলতে পারছি না। চেনো নাকি?'

'কেন চিনব?'

সোমনাথ একটু থমকাল। এই লোককে কথাটা কি বলা ঠিক হবে? কেন নয়? কাউকে না কাউকে তো বলতেই হবে। তা ছাড়া ইনফরমেশন কিছু জানা গেলে সেটাও ভালো। সোমনাথ পিছনে তাকাল। মোমেরা দূরে আছে। ওরা শুনতে পাবে না।

'ভাই, শুনেছি, তোমাদের গ্রামের ওই মেয়ে সবার আগে নাকি ঝড় বৃষ্টির খবর পায়।'

শোল মুখ ফিরিয়ে তাকাল। বিকৃত করে বলল, 'মানে!'

'মানে সে আগেই বলতে পারে প্রলয়কাণ্ড কিছু ঘটবে কিনা।'

'আপনি এসব জানলেন কী করে?' কঠিন গলায় বলল শোল।

সোমনাথ নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'না, না জানি না, শুনেছি। শুনেছি,

boierpathshala.blogspot.com

মেয়ের আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। একটা গোটা আবহাওয়া অফিস মাথায় নিয়ে ঘোরে। ঝড়, বৃষ্টি, শীত, গরম সব জানতে পারে। অন্য কিছু নয়।'

শোল লাল চোখে আবার তাকাল। ধমক দিয়ে বলল, 'সাইকেল থেকে হাত সরান। হাঁটতে অসুবিধা হয়। আর শুনুন, আমার সঙ্গে তামাশা করবেন না। ঠাট্টাতামাশা আমি পছন্দ করি না। যান পিছনে যান। আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবেন না।'

সোমনাথ কথা না বাড়িয়ে পিছিয়ে আসে। এ-লোককে এখন রাগালে বিপদ। ফুল নামে মেয়ের ব্যাপারটা তাহলে পুরোই গাঁজখুরি? সেটাই স্বাভাবিক। যাক, তাহলে কাল সকালেই কলকাতা ব্যাক। উফ বাঁচা যাবে।

বেটু এই দলের মালবাহক। ছবি তোলার নানান সাজসরঞ্জাম ছাড়াও তার হাতে রয়েছে একটা মোড়া। বিশ্রামের জন্য মোম কোথাও বসতে চাইলে ছায়া দেখে সেই মোড়া পেতে দেওয়া হচ্ছে। মোবাইলে কথা বলতে বলতেই মোম মোড়ায় বসছে। বসে আবার কথা বলছে।

বেটু গোড়া থেকেই মোমের ওপর বিরক্ত। মোড়া বইতে হচ্ছে বলে সেই বিরক্তি অনেক বেড়ে গেছে। তার মনে হচ্ছে, এটা শুধু পরিশ্রম নয়, মেয়েমানুষের মোড়া বওয়া একটা বড়ো অপমানের জিনিস। মুখে কিছু না বললেও এই মেয়ের জন্য বেটু মনে মনে শাস্তির কথা ভাবছে।

অর্জুনের বেলায় ঘটনা আবার অন্যরকম। মোমের প্রতি তার একটা ছোঁকছোঁকানি হয়েছে। মোম সেটা বুঝতে পারছে। পারছে বলেই সে তার মেরুন রঙের মেকআপ বক্স এবং পোশাকের ভারী ব্যাগটা অর্জুনকে বইতে দিয়েছে। এক হাতে ক্যামেরা, স্ট্যান্ড, আলো নেওয়ার পরও এই ভারী দুটো জিনিস সামলানো কঠিন। কষ্ট হচ্ছে। অর্জুন সেই কষ্ট বুঝতে দিচ্ছে না। মুখটা হাসি হাসি করে রেখেছে। এমনকি খানিক আগে গদগদ গলায় সে মোমকে বলেছে, 'আর কিছু আছে নাকি ম্যাডাম? লজ্জা করবেন না। থাকলে দিয়ে দিন। কোনো অসুবিধে নেই। একটা কাঁধ তো ফাঁকাই রয়েছে। সেখানে ফেলে হাঁটা দেব!'

মোম বোকা বোকা মুখ করে বলে, 'ইস, আর তো কিছু নেই অর্জুন ভাই। খুব খারাপ লাগছে। আপনি এত করে বলছেন। তবে একটা কাজ করা যেতে পারে।'

অর্জুন উৎসাহের সঙ্গে বলে, 'কী কাজ ম্যাডাম?'

মোম সুন্দর হেসে বলে, 'আপনি আপনার ফাঁকা কাঁধে আমাকে তুলে নিতে পারেন। কেমন হবে? দারুণ হবে না? আমি আপনার কাঁধে ঝুলতে ঝুলতে

boierpathshala.blogspot.com

যাব। যেতে যেতে মোবাইলে কথাও বলব। কাঁধে ঝুলতে ঝুলতে আমি কখনও মোবাইলে কথা বলিনি। একটা দারুণ এক্সিপিরিয়েন্স হবে।'

কথাটা বলেই 'হি হি' আওয়াজে হাসতে শুরু করল মোম।

অপমানিত অর্জুন গম্ভীর মুখে বেটুর পাশে সরে আসে। বেটু ফিসফিস করে বলে, 'মেয়েটার বেটারি বেশি হয়ে গেছে।'

অর্জুন চোখ পাকিয়ে বলে, 'ছি বেটু, মহিলাদের সম্পর্কে ওরকম বলে না।'

বেটু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, 'বলে কিনা একটু পরেই বুঝতে পারবে। আমার কাছে একটা খবর আছে।'

অর্জুন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী খবর?'

বেটু মিচকে ধরনের হাসে। বলে, 'ওই মেয়ের মোবাইলে বেটারিও নাই, সিগন্যালও নাই। মিছিমিছি কথা বলে। লোক দেখানো কথা।'

'মানে!' অর্জুন থমকে দাঁড়ায়, 'মিছিমিছি কথা বলে মানে!'

'মানের আমি কী জানি। এবার মাগির নিজের বেটারি ফুরিয়ে ছাড়ব।'

ঘণ্টাখানেকের আগেই প্রথম পর্যায়ের চলা শেষ হল। ভাঙা পুকুর এসে গেছে। সত্যি শর্টকাট। চুক্তি অনুযায়ী পুকুরপাড়ে পৌঁছেই শোল তার সাইকেলে উঠে পড়ল। সোমনাথকে বলে, 'এই হল ভাঙা পুকুর। এরপর সোজা পথে সাঁবুই। সেখান থেকে একটু গেলেই খাল পড়বে। খালের ওপর পুল আছে। বাঁশের পুল। পেরোলে ঝিলডাঙা। আমি চললাম।' বলে মোমের দিকে গভীর মনোযোগ সহকারে তাকায়। তারপর সাইকেল চালিয়ে উলটোদিকের গাছপালার মধ্যে উধাও হল। উধাও হওয়ার আগে একবার ঘণ্টি বাজায় জোরে। নির্জন জঙ্গুলে পথে সেই আওয়াজ রহস্যময় লাগে।

সোমনাথ পুকুরপাড় থেকে এগিয়ে এসে হাঁক দিল, 'এই যে সবাই উঠে পড়। গেট আপ। গেট আপ।'

সবাই উঠলেও মোম উঠল না। সে বসেই রইল। কান থেকে ফোন সরিয়ে আদুরে গলায় বলল, 'সোমনাথদা, অ্যাই সোমনাথদা, আমি ডাব খাব। আমার এখন ডাব খেতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। প্লিজ ব্যবস্থা করো।'

সোমনাথ চমকে উঠে বলল, 'ডাব! এখানে ডাব কোথা থেকে পাওয়া যাবে? বেটুর ব্যাগে বিয়ার আছে। খাবে?'

মোম হাত তুলে সোমনাথকে থামায়। বলে, 'কী যে বলো সোমনাথদা, গ্রামে ডাব পাওয়া যাবে না? আমি ডাবই খাব। ন্যাচারাল জায়গায় ন্যাচারাল জিনিস। ইস কী বিউটিফুল! কেমন জঙ্গল জঙ্গল। সোমনাথদা, শাঁসওলা ডাব

boierpathshala.blogspot.com

নেবে কিন্তু। প্রথমে জলটা খেয়ে ফেলব, তারপর শাঁস। ডাব না খেয়ে আমি আর এক পা-ও হাঁটব না। দরকার হলে এখানেই ঘর বেঁধে বসবাস শুরু করব। জঙ্গলের ফল পাকুড় খাব, পুকুরে মাছ ধরব। হি হি।'

সোমনাথ প্রমাদ গুনল। মেয়েটা গোলমাল শুরু করেছে। এই ভয়টাই সে পাচ্ছিল। গোলমাল শুরু হয়েছে ডাব দিয়ে। পাড়াগাঁয়ে ডাব সমস্যা হবে না। কিন্তু মনে হচ্ছে, ঘটনা আরও গড়াবে। এই মেয়ে ডাব পর্যন্ত গিয়ে থেমে যাওয়ার মেয়ে নয়। সে বেটুকে হাতছানিতে কাছে ডাকে। চাপা গলায় বলে, 'বেটু, ডাব পাওয়া যাবে?'

বেটু গম্ভীর গলায় বলল, 'জানি না।'

'জানো না কেন?'

বেটু আরও গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি কি ডাবের চাষ করি? এটা হল গিয়ে আপনার আদাড় বাদাড়। আদাড়-বাদাড়ে সাপখোপ পাওয়া যায়, ডাব-নারকোল পাওয়া যায় না।'

সোমনাথের বিরক্ত লাগছে। শুধু মোম নয়, প্রথম পরিচালকের কেরিয়ারে তার কপালে সব ক-টাই বিরক্তিকর লোক জুটেছে। সে দাঁতে দাঁত চিপে বলল, 'আদাড়-বাদাড়টা আবার কী জিনিস?'

হাঁটবে বলে বেটু মালপত্র তুলেছিল। এখন মনে হচ্ছে, হাঁটার প্রোগ্রাম অনেকক্ষণের জন্য পিছিয়েছে। মালপত্র মাটিতে নামাতে নামাতে হাই তুলল বেটু। বলল, 'আদাড়-বাদাড় হল দুই গ্রামের মাঝখান। আদাড়-বাদাড়ে যেমন ক্ষেত খামার, ঝোপঝাড় থাকে, তেমনি আবার খালবিলও থাকতে পারে।'

সোমনাথ রাগে হিসহিস ধরনের আওয়াজ করে বলল, 'চুপ। বাজে কথা বলো না। সামনের গ্রামটা নাকি কাছে। মাতালটা বলে গেল না? কী যেন নাম বলল সাঁপুই না সাঁবুই?'

বেটু দাঁত বের করে হাসল।

সোমনাথ রাগী গলায় বলল, 'হাসছ কেন? হাসি বন্ধ করো। এটা হাসির সময় নয়। সামনের গ্রামে ডাব পাওয়া যাবে?'

বেটু নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'জানি না। তবে কচুরি পাওয়া যেতে পারে। শুনেছি, পাড়াগাঁয়ে দুপুরবেলা কচুরি ভাজে। ছোটো ছোটো কচুরি।'

সোমনাথ কিছুক্ষণের জন্য থুম মেরে রইল। সমস্যা থেকে বেরোতে গেলে মাথা ঠান্ডা রাখা প্রয়োজন। কিন্তু মাথা ঠান্ডা থাকছে না। গরম হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে, শালার চাকরি।নিজের গালেই দুটো চড় লাগাতে ইচ্ছে করছে। দূর থেকে

boierpathshala.blogspot.com

বোধহয় কচুরির কথা শুনতে পেয়েছে মোম। কানে মোবাইল ধরেই বলল, 'খুব ভালো হবে সোমনাথদা। ডাবের সঙ্গে কচুরিও খাব। গাছের তলায় বসে ডাব আর কচুরি খাওয়া খুব ন্যাচারাল হবে। তুমি এখনই সামনের গ্রামে অর্জুন ভাই আর বেটুকে পাঠিয়ে দিন। একজন ঠান্ডা শাঁসওলা ডাব আসবে, আরেকজন গরম কচুরি। এমন গরম আনতে বলবে যেন জিভ পুড়ে যায়। অ্যাই মনে করে সঙ্গে স্ট্র আনবে। স্ট্র ছাড়া আমি ডাব খেতে পারি না। দুজনকেই পাঠাও সোমনাথদা। একজন গেলে কিন্তু ঠান্ডা গরম গুলিয়ে ফেলবে। গরম ডাব, আর ঠান্ডা কচুরি নিয়ে এসে হাজির হবে।'

এই মেয়ে এখন যা বলবে শুনতে হবে। সামনের গ্রামে কি এসব পাওয়া যাবে? ডাব পাওয়া যেতে পারে, কচুরি পাওয়া যাবে না। পাওয়া গেলেও সে-জিনিস মুখে তোলা যাবে না। উপায় নেই। মোম এতটা হেঁটে এসেছে এটাই বিরাট একটা ঘটনা। সেই ঘটনার পর এইসব বায়নাক্কা তো অতি সামান্য। সোমনাথ সরে গিয়ে মোবাইলে কমল মল্লিককে ধরবার চেষ্টা করল। লাভ হল না। সিগন্যাল নেই।

সোমনাথ টাকা বের করে বেটু আর অর্জুনকে দিল।

বেটু অর্জুনকে ফিসফিস করে বলল, 'এই মেয়েকে আমি এতক্ষণে বাগে পেয়েছি। মোড়া বওয়ানোর বদলা নেব। অন্ধকার নামা পর্যন্ত এখানে বসিয়ে রাখব। মোড়ায় বসে বসে ঝোপজঙ্গলের মশার কামড় খাবে। সাপও কামড়াতে পারে। হারামজাদির হিরোইনগিরি বের করছি। '

অর্জুন বলল, 'ছি বেটু, মহিলাদের সম্পর্কে ওরকম বলে না।'

বেটুরা চলে যেতে ফের পুকুরপাড়ে এসে বসে পড়েছে সোমনাথ। মোবাইল নিয়ে পৃথার নম্বর টিপল। না, এবারও সিগন্যাল নেই। নিশ্চয় টাওয়ার নেই। কিন্তু মোম কথা বলছে কী করে! সোমনাথ মুখ ফিরিয়ে তাকাল। খানিকটা দূরে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে মেয়েটা এমন কায়দা করে বসে আছে যে দেখে মনে হচ্ছে, না, এটা কোনো অজ পাড়াগাঁয়ের পুকুরপাড় নয়, পাঁচতারা হোটেলে সুইমিং পুল। সেই পুলের পাশে বসে আছে। একটু পরেই সুইমিং কস্টিউম পরে জলে নেমে পড়বে। শুরু হবে ওয়েদার বুলেটিন। আবহাওয়ার পূর্বাভাস।

একটু পরে ঘটনা তাই ঘটল। জলে নামল মোম! পুকুরের জলে!

বেটুরা চলে যাওয়ার খানিক পরেই কান থেকে ফোন সরিয়ে উঠে পড়ল মোম। পুকুরঘাটের দিকে দু-পা এগিয়ে এসে বলল, 'অ্যাই সোমনাথদা, তোমার কাছে তোয়ালে হবে?'

boierpathshala.blogspot.com

সোমনাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তোয়ালে! তোয়ালে দিয়ে কী হবে?'

গালে টোল নিয়ে হেসে মোম বলল, 'আমি পুকুরে স্নান করব। আমি কখনও পুকুরে স্নান করিনি। খুব ন্যাচারাল স্নান হবে। হি হি।'

সোমনাথ উঠে দাঁড়াল। বলছে কী মেয়েটা! মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! সবকিছুর একটা সীমা আছে। ডাব, কচুরি পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু পুকুরে স্নান! ডুবে-টুবে গেলে সে এক বিরাট কেলেঙ্কারি হবে। সোমনাথ আর্তনাদ করে উঠল।

'প্লিজ এসবের মধ্যে যেও না মোম। একটা বিপদ হয়ে গেলে মুশকিলে পড়ব।'

মোম হাসল। সুন্দর হাসি। তারপর ঘাটের লাল সিঁড়ি দিয়ে একধাপ নেমে পিছনে ফিরে দাঁড়াল। সাদা টপের বোতাম খুলতে খুলতে বলল, 'দূর, কিস্যু হবে না। আমি সাঁতার জানি। তুমি বরং আমার মোবাইলটা নিয়ে বসে থাকো। বসে বসে আমার শার্টপ্যান্ট পাহারা দাও। আর আমার সঙ্গে গল্প করো।'

সোমনাথ কথা বলতে পারছে না। মেয়েটা সত্যি সত্যি গায়ের জামা খুলে ফেলছে যে! দাঁড়িয়ে আছে সাদা ব্রা পরে। সে বিড়বিড় করে বলে, 'গল্প করব! গল্প করব কেন?'

মোম পিছন ফিরে বলল, 'বাঃ করবেন না! মনে আছে, বহু বছর আগে এক কিশোরীকে কথা দিয়েছিলে, জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে রাখবে? মনে পড়ে? থাক মনে পড়ে কাজ নেই। আমার পড়ে। বহু বছর আশায় আশায় ছিলাম, কবে এসে হাত ধরে বলবে, চলো। এলে না। একটা সহজ সরল কিশোরীকে মিথ্যে আশা দেওয়া কত বড়ো অন্যায় তোমার কি জানা আছে সোমনাথদা?'

সোমনাথ অবাক হয়ে বলল, 'তুমি কী বলছ আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না মোম।'

'এটাই পুরুষমানুষের সমস্যা। বেশিরভাগ সময়েই তারা মেয়েদের কথা বুঝতে পারে না। তখন কী করতে হয় জানো?' মোম মুখ ফিরিয়ে হাসল। বলল, 'তখন মাথায় গজাল মেরে বোঝাতে হয়। আমি যে সব কাজ ফেলে তোমার সঙ্গে এতদূর ছুটে এলাম সে কি শুধু অভিনয় করতে? মোটেই নয়। তোমার অন্যায়ের শাস্তি দিতে। ভেবেছিলাম পরে কোনো একটা সময় সুযোগ বুঝে দেব। কিন্তু এমন একটা চমৎকার জায়গা দেখে লোভ সামলাতে পারছি না। অর্জুন, বেটুদের কায়দা করে সরিয়েই দিলাম।'

সোমনাথ প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'সত্যি মোম আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

boierpathshala.blogspot.com

'বললাম তো বুঝে দরকার নেই। তোমার সাজা হল, আমি পুকুরে সাঁতার কাটব আর তুমি পাড়ে বসে আমার সঙ্গে গল্প করবে। প্রথমে ভেবেছিলাম, স্নান করতে করতে মোবাইলে কথা বলব। সেটাও খুব ইন্টারেস্টিং হত। চ্যাটিং ফ্রম ওয়াটার। পরে ভেবে দেখলাম, জল ঢুকে ফোন খারাপ হয়ে যেতে পারে। তাই ঠিক করেছি শুধু গল্প করব। কি খারাপ হবে?'

সোমনাথ চারপাশে তাকাল। নির্জন জংলি জায়গায় ভাঙা বিকেলের আলো ম্লান হয়ে আছে। পাখির ডাক, বাতাসের সর সর আওয়াজ ছাড়া সবটাই নিঃশব্দ। কী করবে সে বুঝতে পারছে না। মেয়েটাকে কীভাবে থামানো যায়?

মোম হাসতে হাসতে বলল, 'পিছন ফিরে গল্প করতে হবে কিন্তু সোমনাথদা, খবরদার জলের দিকে তাকাবে না। আমি জামাকাপড় সব খুলে একেবারে ন্যাচারাল ড্রেসে নামছি। স্নান শেষ হলে তোয়ালেটা চাইব, মুখ না ফিরিয়ে ছুঁড়ে দেবে। আচ্ছা, ঠিক আছে একবার তাকাবে। ওনলি ওয়ান টাইম। জঙ্গলে আমাকে কেমন লাগছে মনে রাখতে হবে না? কেমন হবে?'

'মোম, প্লিজ মোম পাগলামি কোরো না। এটা একটা পাবলিক প্লেস। কে দেখে ফেলবে...।'

'দুর, এই জঙ্গলে কে দেখবে? দেখলেও ক্ষতি নেই। ভাববে জলে পরি নেমেছে। ন্যুড পরি। হি হি।'

সোমনাথ ঘামছে, কিন্তু হাত তুলে সেই ঘাম মুছতে পারছে না। ভয়ংকর বিপদের এটাই নিয়ম। চাইলেও হাত পা নাড়ানো যায় না। তার ঠিক পাশেই অগোছালোভাবে পড়ে আছে মোমের জিনস, সাদা টপ। পড়ে আছে অন্তর্বাস। হাতে মোমের মোবাইল ফোন। পেছনে পুকুরের জলে আওয়াজ হচ্ছে। মোমের সাঁতার কাটার আওয়াজ।

খলবল...খলবল...খলবল...।

মোমের মোবাইল ফোনটার দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠল সোমনাথ। আরে, এটাতেও তো সিগন্যাল নেই! ব্যাটারিও শেষ! তবে? তবে কি এতক্ষণ মিথ্যে কথার ভান করছিল মেয়েটা! এই মেয়ে কি পাগল?

সোমনাথ মুখ ঘোরাল।

গাছের-ছায়া-ভরা জলে গোলাপি শরীর নিয়ে মোম ভেসে ডুবে, বেঁকে চুরে সাঁতার কাটছে। খেলা করছে। অচেনা জলে মেয়েটার অচেনা শরীর সত্যি যেন এক পরি! পোশাকের ডানা খুলে রেখে নেমেছে সে নগ্ন হয়ে।

সোমনাথ তাকিয়ে আছে। পলকহীন চোখে। তার বিশ্বাস হচ্ছে না।

কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, রূপকথা।

একসময় মোম চিৎকার করে উঠল, 'অ্যাই ডিরেক্টর সাহেব আর নয়। মুখ ফেরান। মুখ ফেরান বলছি। হি হি।'

উলটোদিকের ঝোপের আড়াল থেকে এই রূপকথার স্নান-দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে ছিল আরও একজন। তার চোখগুলো বড়ো আর লাল। সেই চোখের পাতা পড়ছে না।

ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে নিঃশব্দে সাইকেলে উঠল শোল।

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

পঞ্চাশ

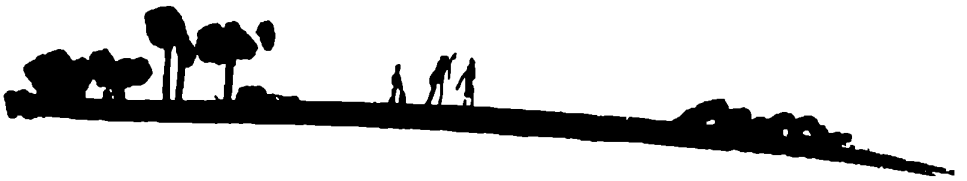

কথা ছিল, সকাল দশটার মধ্যে গাড়ি ছাড়বে। গাড়ি ছাড়ল দুপুর দুটোর কিছু পরে। দেরি হওয়ার কারণ গাড়িতে যাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে। তিন থেকে হয়েছে চার।

গঙ্গাকে কাল সকালেই সুদর্শন রায় ফোন করেছিলেন। সে ঝিলডাঙা সফরের কথা শুনে এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে প্রথম চোটে বেশ কিছুটা সময় কথা বলতে পারেনি।

ডাক্তার রায় বলেন, 'হ্যালো, হ্যালো গঙ্গা শুনতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি ডাক্তারবাবু।'

'তাহলে চুপ করে আছ কেন?'

গঙ্গা ঢোঁক গিলে বলল, 'চুপ করে নেই, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না।'

সুদর্শন রায় অবাক হয়ে বললেন, 'মানে!'

গঙ্গা নিজেকে দ্রুত সামলে নেয়। ডাক্তারবাবুর কথা বিশ্বাস হচ্ছে বলাটা ঠিক হয়নি।

'মাপ করবেন ডাক্তারবাবু, আমি ওভাবে বলতে চাইনি। আসলে আপনি যে সত্যি সত্যি ঝিলডাঙা যেতে চাইছেন এটা বুঝতে...।'

এ-প্রান্তে সুদর্শন রায় হেসে ফেললেন।

'ওই মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তো ঝিলডাঙাতেই যেতে হবে। অন্য কোথাও তাকে পাব কী করে?'

গঙ্গা বিড়বিড় করে বলে, 'সে তো ঠিকই। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব।'

'শোনো গঙ্গা, ব্যবস্থা করার কিছু নেই। আমরা গাড়ি নিয়ে সোজা চলে

boierpathshala.blogspot.com

যাব। তুমি শুধু পথ-টথগুলো জেনে রাখবে।'

'অবশ্যই ডাক্তারবাবু, অবশ্যই রাখব। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, আমি নিজে আপনার সঙ্গে থাকব।'

সুদর্শন রায় এ-প্রান্তে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তুমি কি এর মধ্যে ওখানে গিয়েছিলে নাকি ?'

গঙ্গা টেলিফোনেই লাজুক হাসল। সেই হাসি এদিক পর্যন্ত শোনা গেল না, তবে গলার স্বরে কিছুটা আভাস তৈরি করল।

'না তা যাইনি, তবে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল খুব। ফুলকে কথা দিয়েছিলাম, একবার ওর গ্রামে ঘুরে আসব।'

'বাপ রে, তুমি একেবারে কথা দিয়ে ফেলেছ!'

'মেয়েটা শুধু অদ্ভুত নয়, খুব মিষ্টিও। সেদিন ক্লিনিকে এলে ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছি। আপনার খোঁজেই ওর বাবা নিয়ে এসেছিল।'

সুদর্শন রায় বললেন, 'সে জানি। নিতাই নামের ওই লোক আমাকে ফোন করেছিল। তুমি তো ফুলকে নিয়ে ছড়া-টড়া লিখে একাকার কাণ্ড করেছ।'

গঙ্গা উৎসাহভরে বলল, 'পড়েছেন ডাক্তারবাবু?'

'আরে পড়েছি মানে, কথা, আমার মেয়েরও খুব ভালো লেগেছে। ইনফ্যাক্ট তোমার ছড়া পড়েই তো সে আমার সঙ্গে ঝিলডাঙা পর্যন্ত যাবে বলে ঠিক করেছে।'

'ও দিদিও আসছে? খুব ভালো হবে।'

সুদর্শন রায় মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে বললেন, 'আশা করি ভালো হবে। গঙ্গা একটা কথা বলো তো, ওই কাগজ তুমি কতজনকে পাঠিয়েছ?'

'কোন কাগজ?'

'এই যে তোমার ছড়ার কাগজ।'

গঙ্গা সংকোচের সঙ্গে বলল, 'আমার ছড়ার কাগজ নয় ডাক্তারবাবু। বানেরহাট সংবাদ। এখান থেকে বেরোয়। ও আর ক-টা ছাপা হয়। ওরাই একটু-আধটু বিক্রিবাটা করে। সে খুবই অল্প। মফস্বলের পত্রিকা তো খুব চলে না। আমার লেখা ছাপা হলে আমি এদিক-ওদিক ক-টা পোস্ট করি। কলকাতাতেও পাঠাই। এবারও করেছি। তাও খুব বেশি নয়।'

কলকাতাতেও পাঠানো হয় শুনে সুদর্শন রায় চিন্তিত গলায় খানিকটা নিজের মনেই বললেন, 'বেশি না হলেই ভালো।'

'কিছু বললেন ডাক্তারবাবু?'

boierpathshala.blogspot.com

'না, তোমার সঙ্গে তাহলে ওই কথাই ফাইনাল রইল। কাল আমরা প্রথমে বানেরহাটে পৌঁছচ্ছি। সেখান থেকে তুমি আমাদের গাড়িতে উঠে পড়ছ।'

'নিশ্চয় ডাক্তারবাবু। আমি তৈরি হয়ে থাকব।'

এই পর্যন্ত কথা বলেই ফোন নামিয়ে রেখেছিলেন সুদর্শন রায়। রাতে শোবার আগে ভাবলেন, পোকামাকড় সম্পর্কে আরও খানিকক্ষণ পড়াশোনা করবেন। বই, পত্রপত্রিকা ছড়িয়ে বসেও ছিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই জানলা দিয়ে দমকা ঠান্ডা বাতাস ঢুকে জানান দিল, কোথাও বৃষ্টি নেমেছে। পড়তে ভালো লাগল না ডাক্তার রায়ের। তিনি বিছানা ছেড়ে জানলার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বৃষ্টি এখানেও নেমেছে। তবে খুব কম। হালকা গুঁড়োর মতো ছড়িয়ে পড়ছে অন্ধকারে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে সুদর্শন রায় বুঝতে পারলেন, মনটা শান্ত নেই। একেবারেই শান্ত নেই। অচেনা, অজানা কোন দূরের একটা ছোট্ট মেয়ে বড়ো সমস্যা তৈরি করেছে। হয়তো অকারণেই করেছে, তবু তাকে মন থেকে সরানো যাচ্ছে না। বারে বারে এসে উঁকি দিচ্ছে। হয়তো সরানোর জন্যই মেয়েটাকে কাছ থেকে একবার দেখতে চাইছেন। অথবা কে জানে হয়তো অন্য কিছু। এই 'অন্য কিছু' যখন বিদ্যাবুদ্ধি, যুক্তিকে পরাজিত করে, বড়ো অসহায় লাগে। সেই অসহায়তা দূর করতে ভেতরে ভেতরে এক ধরনের লড়াই শুরু হয়। সেও এক ধরনের কষ্ট। মনকে শান্ত করার জন্য তাক থেকে বই নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত কবিতা পড়লেন ডাক্তার রায়। এই অভ্যেস তাঁর অনেকদিনের।

'মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব
থেকে যায়; অতীত থেকে উঠে আসে আজকের মানুষের কাছে
প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।

আজকের আগে যেই ভিড় জমেছিলো
তারা ম'রে গেছে;
প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে
অন্ধকারে হারায়েছে....'

কবিতা পড়া শেষ হলে সুদর্শন রায়ের মন কিছুটা শান্ত হল। তিনি আলো নিভিয়ে শুতে গেলেন।

ওদিকে পাশের ঘরে তখন কথাকলি অনেকক্ষণ বিছানায় এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়ল। আলো জ্বালিয়ে ব্যাগ হাতড়ে কাগজ পেন বের করে চিঠি

boierpathshala.blogspot.com

লিখতে বসছে—

ব্রতীন,

অনেক রাতে তোমাকে লিখতে বসেছি। জানি আজ না লিখে কাল বা অন্য কোনো সময় এই চিঠি লিখলেও চলত। কিন্তু ভয় হল, কাল সকাল হলে ইচ্ছেটাই হয়তো হারিয়ে যাবে। জানি না, এই লেখা তোমার হাতে কবে দিতে পারব, আদৌ দিতে পারব কিনা তাও জানি না। তবু লিখে রাখছি। এই পর্যায়ে তোমার সঙ্গে নতুন করে দেখা হওয়ার পর থেকেই এক ধরনের সমস্যা তৈরি হয়েছে। এ-কথা আমি তোমাকে মুখে বেশ কয়েকবার বলেছি। প্রতিবারই বলার চেষ্টা করেছি, সমস্যাটা তৈরি হচ্ছে তোমার মধ্যে। তুমি আবার ঘর বাঁধার কথা ভাবছ। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে নিজে ফিরে আসার কথা ভাবছ। ইদানীং মনে হচ্ছে, সমস্যাটা শুধু তোমার নয়, আমারও। যদিও আমার সমস্যা উলটোরকম। আমি জানি না সেই সমস্যা আমি তোমাকে বোঝাতে পারব কিনা। মনে হয় না পারব। মুখে তো নয়ই। তাই লিখে চেষ্টা করছি। ব্রতীন, এই পর্যায়ে তুমি যখন আমার সঙ্গে প্রথম দেখা কর, তখন আমি বিরক্ত হয়েছিলাম। শুধু বিরক্ত বললে কম বলা হবে, রেগেও গিয়েছিলাম। সেই সময় রাগের পরিমাণ এতটাই বেশি ছিল যে ভেবেছিলাম, সেরকম হলে তোমার বিরুদ্ধে থানা পুলিশ পর্যন্ত করব। ছেলেমানুষি ভাবনা। এখন মনে পড়লে লজ্জা হয়। যাই হোক, পরে এই যোগাযোগ আরও একটু বাড়ে। রাগ বিরক্তি দুটোই কমতে থাকে। সম্ভবত নতুন করে একধরনের মায়া তৈরি হয়। এই মায়া থেকেই আমি বুঝতে পারি আমার সমস্যা তৈরি হচ্ছে। মুখে তোমার কাছে সে-কথা প্রকাশ করিনি। বরং বারবার ভেবেছি, তুমিই ভুল করছ। ভুল করছ আবার যোগাযোগ করে। সে-কথা তোমাকে আমি বলেওছি। বলেছি, যা হয় না সেই চেষ্টা করে লাভ নেই। পরে বুঝেছি, দুর্বলতা আমারও। না হলে কেন তোমার কথা ভেবে আবার কষ্ট পাই? কেন রাতে ঘুম আসে না? কেন চোখ ভিজে যায় জলে? সে কি ফেলে আসা ভুলে যাওয়া ভালোবাসার স্মৃতি? নাকি আবার তোমার কাছে ফিরে যাওয়ার টানে? হয়তো তাই, হয়তো তাই না। তবে যাই হোক ব্রতীন, আজ এই গভীর রাতে আমার মনে হচ্ছে, আমাদের দুজনের জীবনের সামনে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ এসে দাঁড়িয়েছে। পথের বাঁকের মতো। সেই মোড়ে দাঁড়িয়ে ঠিক করতে হবে কোনদিকে যাব। নিজেকে লুকিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি আমার পথ ঠিক করে ফেলেছি ব্রতীন। তোমাকে না পাই, তোমার জন্য আমি যে-চোখের জল, যে-নিদ্রাহীন রাত ফিরে পেয়েছি তা আমি আর হারাতে চাই

boierpathshala.blogspot.com

না। এই আমার সুখ, এই আমার দুঃখ। এই নিয়েই আমি বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব। তোমার জন্য জীবনের ক-টা দিন যেমন ভালোবাসার সুখ পেয়েছি, বাকি দিনগুলো না হয় দুঃখই পাব। সেটাও তো কম ভালোবাসা নয়...।'

এই পর্যন্ত লিখে কাগজকলম পাশেই রেখে ঘুমিয়ে পড়ল কথাকলি। বাকি রাত দুটো আলো জ্বলল ঘরে। প্রেমে আকুল এক নারীর দিকে তাকিয়ে সেই আলো হাসতে লাগল যেন।

সকাল আটটাও বাজেনি। ডাক্তার রায় দাড়ি কামাচ্ছিলেন। গঙ্গা টেলিফোন করল। আবদার দুপুরের খাওয়া বানেরহাটেই সারতে হবে। ডাক্তারবাবুর কোনো বারণই সে শুনবে না। দিদি এই প্রথম আসছে। আর হয়তো কোনোদিনই আসবে না। সুতরাং ডাল ভাত না খাইয়ে ছাড়তে পারবে না সে। তার বাড়িতেই ব্যবস্থা করে রাখবে। খুব সামান্য আয়োজন। 'না' বললে খুব দুঃখ পাবে। ডাক্তার রায় 'না' বলতে গিয়েও থমকে গেলেন। বেচারির গলায় কাতর অনুরোধ। সেই অনুরোধ অস্বীকার করা কঠিন। গঙ্গা জানিয়েছে, চিন্তার কোনো কারণ নেই। ঠিকমতো গাড়ি চললে বিকেল বিকেল ঝিলডাঙায় পৌঁছে যাওয়া যাবে। রোগী দেখে ফিরে আসতেও সময় লাগবে না। সে নিজে যখন সঙ্গে থাকছে অসুবিধে কিছু নেই। তার শুধু একটাই প্রশ্ন—

'ডাক্তারবাবু, আপনি কি ওই মেয়ের চিকিৎসা করবেন?'

একটু ভেবে সুদর্শন রায় নরম গলায় বললেন, 'আদৌ তার কোনো অসুখ করেছে কিনা সেটাই তো বুঝতে পারছি না গঙ্গা। আমি তাকে তার পরিবেশে একবার দেখতে চাই। মেয়েটির বাড়িঘর, তার মা কিছুই তো জানি না। দেখতে চাই একবার। ওর বাবা যখন ফোন করেছিল তখনই বলেছিলাম, পারলে একবার যাব। সেই কারণেই যাওয়া। তুমি চিন্তা কোরো না গঙ্গা। তোমার ছড়ার মতো সিরিয়াস কিছু না।'

কথা শেষ করে সামান্য হাসলেন সুদর্শন রায়।

ফোন ছাড়বার পর কথাকলি বলল, 'ছেলেটা মনে হচ্ছে সমস্যা করবে।'

ডাক্তার রায় বললেন, 'তা একটু করবে। বাইরের মানুষের আতিথেয়তা বেশি। ঝিলডাঙায় পৌঁছলে কী হয় সেটা আরও চিন্তার। ফুলের বাবা মা-ও আবার ভাতের থালা নিয়ে না আসে।'

boierpathshala.blogspot.com

কথাকলি হেসে বলল; 'এলে খাবে।'

কথাকলির মন আজ ভালো। ভালো হওয়ার কারণ দুটো। এক নম্বর হল, সামান্য হলেও বহুদিন পর আজ সে কলকাতার বাইরে যাচ্ছে। দু-নম্বর কারণটা অবশ্য সামান্য নয়। একটু গুরুত্বপূর্ণ। সে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঠিক করেছে, ঝিলডাঙা যাওয়ার পথে বাবাকে এই সিদ্ধান্তের কথা সে জানাবে। তারপর রাতে ফোনে ব্রতীনকে ধরবে। কাল রাতের অসমাপ্ত চিঠি সে শেষ করেনি। বরং সকালে বালিশের পাশে দেখে লজ্জা পেয়েছে। তখনই ভাবে, লিখে যে সিদ্ধান্তের কথা জানাবে ভেবেছিল তা ব্রতীনকে নিজের মুখেই বলবে। কথাটা বলতে লজ্জা করবে। করলে করবে। অনেকদিন পর ব্রতীনের কাছে লজ্জা পেতে খারাপ লাগবে না। কিন্তু তার আগে কথাটা সে তার বাবাকে জানাতে চায়।

ডাক্তার রায় স্নানে ঢোকার মুখে ফোন এল। নার্সিংহোম থেকে ফোন। এক রোগিণী আজ খুব ভোরে বাথরুমে ঢুকে একসঙ্গে দশদিনের ওষুধ খেয়ে ফেলেছে। নার্সরা ঘটনা জানতে পেরেছে একটু আগে। রোগীর অবস্থা খারাপ। এখনই যেতে হবে। ভাগ্যিস ড্রাইভার এসে গেছে। ডাক্তার রায় কোনোরকমে স্নান সেরে দ্রুত গাড়িতে গিয়ে বসলেন। রোগীর স্টমাক ওয়াশ করিয়ে ফিরলেন পাক্কা দু-ঘণ্টা পর।

কথাকলি ধরেই নিয়েছিল, ঝিলডাঙার প্রোগ্রাম বাতিল। আর যাবেই-বা কখন? পৌঁছতেই অন্ধকার হয়ে যাবে। তারপর ফুলকে দেখে কলকাতায় ফিরতে ফিরতে মাঝরাত। রাতে ওইসব পথে যাতায়াত ঠিক নয়।

কথাকলি কফি করে এনে বলল, 'নাও ধরো। বাবা, তুমি এখনই গঙ্গাকে একটা টেলিফোন করে দাও। বেচারি রান্নাবান্না করে রাখবে।'

ক্লান্ত সুদর্শনবাবু বললেন, 'আমি ওর বাড়ির নম্বর জানি না। বাড়িতে মনে হয় না ফোন আছে।'

'মোবাইল নেই?'

'খেয়াল হচ্ছে না। দেখি ক্লিনিকে পাই কিনা। মনে হয় না পাব। ইস, গোটা প্রোগ্রামটা বানচাল হয়ে গেল। কিন্তু কিছু উপায়ও ছিল না। এই পেশেন্টকে ছেড়ে যাওয়া যেত না। আমার রেসপনসিবিলিটির মধ্যে পড়ে।'

'সে আর কী করবে? আর একদিন যাওয়া যাবে। তবে আমি কি চট করে আর কামাই করতে পারব? তা ছাড়া...।'

'তা ছাড়া কী?'

কথাকলি বলল, 'না, থাক, পরে বলব।'

boierpathshala.blogspot.com

ক্লিনিকের নম্বর ধরাই গেল না। তবে কফি শেষ হওয়ার আগে গঙ্গা নিজেই আবার ফোন করল। সে ডাক্তারবাবুকে একটা খবর জানাতে চায়।

'কী খবর গঙ্গা?'

ফোনের ভেতর খ্যাস খ্যাস আওয়াজ। তার মধ্যেই গঙ্গা বলল, 'বানেরহাটে একটা শ্যুটিং পার্টি এসেছে ডাক্তারবাবু।'

লাইনের গোলমালে ঠিকমতো শুনতে পেলেন না ডাক্তার রায়।

'কী পার্টি!'

লাইনে আওয়াজ আরও বাড়ল। ডাক্তার রায় চিৎকার করলেন।

'হ্যালো, হ্যালো...গঙ্গা...।'

'হ্যালো, ডাক্তারবাবু শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, হ্যালো, শ্যুটিং পার্টি। আমার কাছে খবর এসেছে ওরা ঝিলডাঙার দিকে গেছে।'

'ঝিলডাঙার দিকে শ্যুটিং!'

রিসিভার কানে নিয়েই মেয়ের দিকে তাকালেন ডাক্তার রায়।

'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, ঝিলডাঙা...হ্যালো...আরও শুনলাম ওরাও নাকি একটা ছোটো মেয়ের খোঁজখবর করেছে। ওদের গাড়ির ড্রাইভার আবদুল না কী নাম যেন, সে গেস্ট হাউসের দারোয়ানকে বলেছে। ওদের সঙ্গে ক্যামেরা আছে।'

ডাক্তার রায় গলা তুললেন। তিনি উত্তেজিত। কথাকলি এগিয়ে এসে হাত থেকে কফির মগটা ধরল।

'হ্যালো, গঙ্গা শুনতে পাচ্ছ? ওরা ফুলের খোঁজ করেছে? তুমি ঠিক জানো?'

ওপাশ থেকে গঙ্গাও চেঁচাচ্ছে।

'ঠিক জানি না ডাক্তারবাবু, তবে মনে হচ্ছে। দু-একজনকে বাজারে জিজ্ঞেস করেছে। আপনি কখন আসছেন ডাক্তারবাবু?'

'আমি আসছি। একটু দেরি হবে। তোমার ওখানে পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে। তবু আমি আসছি গঙ্গা। হ্যালো..হ্যালো.. শুনতে পাচ্ছ?'

ফোন নামিয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন সুদর্শন রায়। কিছুক্ষণ থম মেরে বসে রইলেন সোফায়। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি শুরু করলেন।

'এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম। ওই মেয়ের খবর জানাজানি হয়ে গেছে।'

কথাকলি বলল, 'তুমি এত এক্সাইটেড হয়ে পড়ছ কেন বাবা? নাও তো হতে পারে।'

মেয়ের কথায় আমল না নিয়ে সুদর্শন রায় বললেন, 'গঙ্গার ছড়াটাই এই

boierpathshala.blogspot.com

সমস্যা তৈরি করল। আমার বিশ্বাস এখন শুধু মিডিয়া নয়, ওখানকার বদ লোকেরাও মেয়েটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভেলকি দেখিয়ে রোজগার হবে ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সত্যি মিথ্যে কিচ্ছু ভাববে না। যত মিথ্যে হবে তত ভালো। এদেশে গাছের গুঁড়ির গায়ে সিঁদুর লাগিয়ে ব্যবসা হয়। জ্যান্ত একটা ফুটফুটে মেয়ে পেলে তো কথাই নেই।'

কথাকলি তার বাবাকে শান্ত করতে বলল, 'এতটা মনে হয় বেশি ভাবা হয়ে যাচ্ছে।'

'বেশি হয়ে গেলে মেয়েটার পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু এই দেশটার খারাপ দিক সম্পর্কে তোর কোনো ধারণা নেই। যে-দেশে মানসিক রোগীকে মানুষ হাত পা বেঁধে রোদে জলে ফেলে রাখে সে দেশে সব হতে পারে। এই বাচ্চা মেয়েটার বেলায় সেরকম কিছু হলে খুবই দুঃখজনক একটা ঘটনা হবে। ইস, গোড়াতেই আমার গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। নিজেকে দায়ী মনে হচ্ছে।'

'তুমি কেন দায়ী হবে!'

'বাঃ, একজন রোগীকে চিকিৎসা না করে ফেলে চলে এসেছি, আমি দায়ী হব না? সে যদি আমার কাছে না আসত তাহলে একটা কথা ছিল। আমি তো তার রোগই ধরতে পারলাম না... এরপর বাবা-মাকে বুঝিয়ে মেয়েটাকে বের করে আনাও কঠিন হবে। ওরা টাকার গন্ধ পেলে মেয়েকে ছাড়বে না। এও একধরনের বিক্রি। তৈরি হয়ে নে কথা। সেরকম বুঝলে ফুলকে আমি আজই কলকাতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করব। সে যত রাতই হোক। ট্রাই করতেই হবে।'

কথাকলি আবার তৈরি হতে ছুটল। গোপালের মাকে বলল, খুব তাড়াতাড়ি ভাতে ভাত বসিয়ে দিতে। একটা চাপা উত্তেজনা হচ্ছে তার। মেয়েটাকে আনতেই হবে। ওখানে কারা শ্যুটিং করতে গেল? কোনো টিভি কোম্পানি? নাকি অন্য কেউ?

সব মিলিয়ে রওনা হতে অনেকটা দেরি হয়ে গেল।

ডাক্তার রায় আর কথাকলি পিছনে বসেছে। ব্রতীন বসেছে সামনে, ড্রাইভারের পাশে। ঠিক সময় গাড়ি ছাড়লে ব্রতীনের যাওয়া হত না। সে এই সফরের বিষয়ে কিছুই জানে না। কথাকলি বলেছে, 'চলো গিয়ে দেখবে।'

ব্রতীন এসেছিল কথাকলির সানগ্লাস ফেরত দিতে। কথাকলি সেদিন ফেলে এসেছে। সানগ্লাস এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় যে ছুটে ফেরত দিতে আসতে হবে। ব্রতীনও সেরকম ভেবেছিল। পরে হঠাৎ মনে পড়ে যায়, একসময় কথাকলির চোখে একধরনের অ্যালার্জি হয়েছিল। রোদে বেশিক্ষণ থাকলেই জল

boierpathshala.blogspot.com

পড়ত। তারপর থেকেই সানগ্লাসের অভ্যেস করতে হয় তাকে। সেই অসুখ কি এখনও আছে? না থাকলে ঠিক আছে, কিন্তু থাকলে সানগ্লাস না পরা ঠিক নয়। সেই কারণেই দুর্বল শরীর নিয়েও ব্রতীন এসেছে। ভেবেছিল, ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে দরজার বাইরে থেকে দিয়ে চলে যাবে। একবার ভাবল, নিজেও আসবে না, কাউকে দিয়ে পাঠাবে। কথাকলির ও-ভাবে বারণ করার পর এ-বাড়িতে তার আবার আসাটা উচিত নয়। পরে ভেবে দেখল, সেটা ঠিক না। তবে হিসেব করে দুপুরের এই সময়টা বেচেছে। এই সময় কথাকলি বা স্যারের বাড়ি থাকবার সময় নয়।

বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে চমকে গেল ব্রতীন।

গেটের মুখে গাড়ি দাঁড়িয়ে। শুধু গাড়ি নয়, কথাকলি নিজেও দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ রঙের শাড়ি। রং মিলিয়ে জামা। হালকা সাজেও ঝলমলে লাগছে তাকে। কাঁধে ব্যাগ, হাতে ফ্লাস্ক। ফ্লাস্ক কেন? অফিস যায়নি?

ব্রতীন দু-পা এগিয়ে এসে নার্ভাস গলায় বলল, 'তুমি এখানে!'

ট্যাক্সি থেকে ব্রতীনকে নামতে দেখে বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল কথাকলির। প্রিয় মানুষকে হঠাৎ দেখলে এমন হয়। শরীরের ভেতরে একটা কাঁপুনি আসে। দ্রুত নিজেকে সামলে মুখ কঠিন করে চাপা গলায় বলল, 'মানে? আমি আমার বাড়ির সামনে দাঁড়াব না?'

ব্রতীন আরও নার্ভাস হয়ে পড়ল। কথাটা বোকার মতো হয়ে গেছে। পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে হাসতে গেল ব্রতীন। সেই হাসিও বোকার মতো হল। বলল, 'না, না সে-কথা বলিনি। অফিসে যাওনি?'

বানানো বিরক্ত ভঙ্গিতে কথাকলি বলল, 'দেখতেই তো পাচ্ছ যাইনি। অফিসে গেলে কি আর বাড়ির সামনে হাতে ফ্লাস্ক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম?'

না এটাও বোকার মতো হয়ে গেল। ব্রতীন পরপর দু-বার কাশল। লাজুক হেসে বলল, 'আসলে জ্বরটা কমবার পর থেকে কাশিটা ডেভলপ করেছে।'

কথা শেষ করেই আবার কাশল। পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক মুছল। বোকার মতো হাসল।

রুমাল দিয়ে নাক মোছা কথাকলির দু-চোখের বিষ। সে নাক কুঁচকে বলল, 'বাবার সঙ্গে বাইরে যাচ্ছি।' এবার মুখ ঘুরিয়ে ড্রাইভারের দিকে তাকাল। বলল, 'অনন্তদা, ভেতরে গিয়ে একবার দ্যাখো তো বাবার হল কিনা।'

অনন্ত গ্রিলের গেট সরিয়ে ভেতরে গেল। ব্রতীন পকেট থেকে সানগ্লাস বের কথাকলির দিকে এগিয়ে বলল, 'এই নাও।'

boierpathshala.blogspot.com

কথাকলি চোখ তুলে বলল, 'কী এটা?'

'তোমার চশমা।'

কথাকলি ঠোঁটের কোণে মুচকি হেসে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'এর জন্য ছুটতে ছুটতে এলে! আমার কাছে আরও দুটো আছে। তুমি ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন?'

ব্রতীন শুকনো হেসে বলল, 'এখনই চলে যাব।'

কথাকলি খুব সহজ গলায় বলল, 'ও।'

'আমি তাহালে আসি কথা?'

উত্তর না দিয়ে কথাকলি শাড়ির আঁচল ঠিক করতে করতে বলল, 'ফ্লাস্কটা ধরো তো। সাবধানে ধরবে। চা আছে। যেতে যেতে খাব।'

ব্রতীন কাশতে গিয়ে সামলে নিল। হাত বাড়িয়ে ফ্লাস্কটা ধরেও ফেলল। কথাকলি অস্থিরভাবে হাত উলটে ঘড়ি দেখল। তারপর কাঁধের ব্যাগ খুলে দুটো একশো টাকার নোট বের করে এগিয়ে ধরল ব্রতীনের দিকে। বলল, 'ট্যাক্সি তুমি ছাড়বে? না আমি ভাড়া দিয়ে আসব?'

'সে কী ট্যাক্সি ছাড়ব কেন!'

কথাকলি শান্ত ভঙ্গিতে বলল, 'কারণ তুমি আমাদের সঙ্গে এখন একটা জায়গায় যাবে।'

ব্রতীন আকাশ থেকে পড়ল।

'তোমাদের সঙ্গে বাইরে! কোথায়?'

কথাকলি অর্ডার দেওয়ার গলায় বলল, 'ঝিলডাঙায়। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে আমার জরুরি দরকার আছে। নাও গাড়িতে ওঠো।'

এই অর্ডার অস্বীকার করার মতো ক্ষমতা ব্রতীনের নেই। সে কাশতে লাগল।

কথাকলি চাপা গলায় ধমক দিল।

'উফ, মুখে হাত দিয়ে কাশো। রুমাল নেই?'

ব্রতীন যাচ্ছে শুনে ডাঃ সুদর্শন রায় এতটাই খুশি হলেন যে তিনি অনেকটা পথ চুপ করে রইলেন।

boierpathshala.blogspot.com

শিডিউল মিটিং নয়, জরুরি খবর দিয়ে ডেকে আনা হয়েছে মানা সরকারকে।

মানা সরকার গোলমালের আঁচ করেছিলেন। কিন্তু গোলমাল কত বড়ো সেটা বুঝতে পারেননি। তবু তিনি যতটা পেরেছেন তৈরি হয়েই এসেছেন। মনে হচ্ছে, ইলেকশনের কমিটি তৈরি নিয়ে ঝুটঝামেলা হবে। বিজয় সান্যালরা দল ভারী করবার চেষ্টা করবে। মানা সরকার আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন এবার কমিটিতে তাঁর দিকের লোকজন বেশি ঢোকাতে হবে। বেশি না পারলেও সমানে সমানে তো বটেই। কোণঠাসা হয়ে থাকলে বিদ্যুতের মতো ছেলে-ছোকরারা আরও মাথা-চাড়া দেবে। ওপর থেকে যতই মাথায় তোলা হোক, নীচ থেকে চাপ রাখতে হবে। তা ছাড়া কমিটি হাতে থাকার অর্থ ওপরতলার সঙ্গে যোগাযোগ বেশি। ইলেকশনে কিছু না হলেও পরে কাজে লাগবে।

জেলা অফিসে পৌঁছে আবহাওয়া কেমন যেন থমথমে লাগল। মানা সরকার সতর্ক হলেন। অফিসের তলায় বাবলুর সঙ্গে দেখা। সে শুকনো হেসে এড়িয়ে যাচ্ছিল। ঘটনা কী? গোলমাল কি বেশি? মানা সরকার হেসে বললেন, 'কী হল, হঠাৎ তলব?'

বাবলু মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'আমি ঠিক জানি না। আপনি ওপরে যান। উজ্জ্বলদারা অপেক্ষা করছেন।'

'তুমি যাবে না?'

'না, আমাদের ডাকেনি।'

মানা সরকার মনে মনে প্রমাদ গুনলেন। বাবলুকে ডাকা হয়নি! তাহলে কারা রয়েছে? শুধুই বিজয় সান্যালের গ্রুপ? সমস্যা কি খুব জটিল?

boierpathshala.blogspot.com

হ্যাঁ জটিল। মানা যতটা ভেবেছিলেন সমস্যা তার থেকে জটিল।

ঘরে ঢুকে টেবিলের এপাশে শান্ত ভঙ্গিতে বসলেন মানা সরকার। ওপাশে মাত্র দুজন। বিদ্যুৎ আর উজ্জ্বল মুখোটি। বিদ্যুৎ অবশ্য ঠিক মুখোমুখি বসেনি। সে বসেছে খানিকটা পাশ করে। তার হাতে একটা ইংরেজি পত্রিকা। পাতা উলটোচ্ছে। ভাবটা এমন যেন এই মিটিঙে তার বসার কোনো ইচ্ছে ছিল না। নেহাত দল বলেছে তাই আসা। মানা আড়চোখে পত্রিকার নাম দেখলেন। বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা। কভারে বড়ো করে লেখা—দ্য আনভিজিবল ম্যান। মানুষ অদৃশ্য, তবু তার একটা ছবিও রয়েছে। মানা মনে মনে মুখ ব্যাকালেন। এই ছোকরার কায়দা অনেক। নিজেকে বিরাট পড়ুয়া দেখানোর চেষ্টা করে।

উজ্জল মুখোটির সামনে টেবিলে ওপর ফাইল। দড়ি-বাঁধা-ফাইলের ওপর লাল পেন দিয়ে বড়ো বড়ো করে লেখা—কনফিডেনশিয়াল।

মানা বললেন, 'কী ব্যাপার উজ্জ্বলবাবু? হঠাৎ মিটিং?'

উজ্জ্বল মুখোটি মাথা নামিয়ে বললেন, 'ঠিক মিটিং নয়, আপনার সঙ্গে কতগুলো কথা ছিল।'

মানা ভুরু কোঁচকালেন।

'আমার সঙ্গে! কী ব্যাপার বলুন তো?'

উজ্জ্বল মুখোটি নীচু গলায় বললেন, 'আপনার নামে কতগুলো...।'

এইটুকু বলে উজ্জ্বল মুখোটি চুপ করে গেলেন। মানা সরকার ভেতরে অস্বস্তি অনুভব করলেও বাইরে দেখালেন না। বরং উলটে হাসার চেষ্টা করলেন।

'আমার সম্পর্কে কী? অভিযোগ নাকি?'

বিদ্যুৎ মুখ তুলে আবার হাতের 'অদৃশ্য মানুষ' পত্রিকায় মনোযোগ দিল। সে নিজেও অদৃশ্য। ঘরে থেকেও না থাকার ভান করছে। উজ্জ্বল মুখোটি চুপ করে রইলেন। চুপ করে যেন বুঝিয়ে দিলেন, ঘটনাটা তাই। আজকের এই মিটিং আসলে মানা সরকারের-বিরুদ্ধে-আসা-অভিযোগ নিয়েই।

মানা সরকার নিজেকে শক্ত করলেন। নাক টেনে বললেন, 'নিন উজ্জ্বলবাবু, অভিযোগ কী আছে এক এক করে বলতে শুরু করুন। আমার আবার ফিরে গিয়ে অনেক কাজ। নিজেদের নিয়ে পড়ে থাকলেই তো হবে না, মানুষ নিয়ে চলতে হবে। জেলায় বসে খালি তত্ত্ব আওড়ালে আর যাই হোক মানুষের সঙ্গে থাকা যায় না।'

বিদ্যুৎ ফের মুখ তুলে একইভাবে চোখ নামিয়ে নিল। উজ্জ্বল মুখোটির চোখমুখে চাপা অস্বস্তি। তিনি নিজের গালে দু-বার হাত বুলিয়ে বললেন, 'বিষয়টা

boierpathshala.blogspot.com

এভাবে নেবেন না মানাবাবু। ওপর থেকে আমার কাছে নির্দেশ এসেছে বলেই আপনাকে ডাকতে বাধ্য হয়েছি।'

'নির্দেশটা কী?'

'আপনার সম্পর্কে কতগুলো বিষয় সম্পর্কে দল ক্লিয়ার হতে চাইছে।'

'সেগুলো কি কমপ্লেইন?'

'ইনফরমেশনও বলতে পারেন। সেটা বলাই ভালো।'

মানা সরকার ঠোঁটের ফাঁকে হেসে বললেন, 'ভালো কেন বলছেন? বলুন রেখেঢেকে ভদ্রতা করা।'

উজ্জ্বল মুখোটি বললেন, 'আপনি আমাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলছেন মানাবাবু। বিষয়টা তো আমার একার নয়, দলের।'

মানা সরকার টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে টোকা মারতে মারতে বললেন, 'আহা, আপনি অস্বস্তির মধ্যে পড়বেন কেন? আমি তো আপনাকে কোনো দোষ দিইনি। লিডাররা আপনাকে যা বলবে আপনি তাই করবেন। লিডাররা বলেছে, মানা ব্যাটাকে একটু সাইজ কর। ব্যাটা বেড়ে যাচ্ছে। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ছে। পপুলারিটি বাড়ছে। এবার কাটছাঁট করার প্রয়োজন। আপনিও হাতে কাঁচি নিয়ে নেমে পড়েছেন। সরি আপনি না, আপনারা।'

মানা সরকার ইচ্ছে করেই গোড়া থেকেই আক্রমণে যেতে শুরু করেছেন।

উজ্জ্বল মুখোটি বললেন, 'প্লিজ মানাবাবু, আপনি জিনিসটাকে কমপ্লিকেটেড করে দেবেন না।'

মানা সরকার মুখ দিয়ে 'ফুঃ' ধরনের একটা অবজ্ঞার আওয়াজ করে বললেন, 'কমপ্লিকেটেড কে করছে? আমি! বাঃ, ভালো মজা তো। দলের ভেতর গ্রুপবাজির শিকার হচ্ছি, আর আমাকেই বলছেন কমপ্লিকেটেড করে দেবেন না? কথা শুরুর আগে আমারও একটা প্রশ্ন আছে।'

বিদ্যুতের দিকে আড়চোখে তাকালেন মানা সরকার। ছোকরা মুখ নামিয়ে মনোযোগ সহকারে পত্রিকা পড়ে চলেছে।

উজ্জ্বল মুখোটি বললেন, 'বলুন।'

'এই জিজ্ঞাসাবাদের পর্বটি আমরা দুজনে সেরে ফেললে কী হত না?'

বিদ্যুৎ হাতের পত্রিকা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বলল, 'উজ্জ্বলদা, উনি ঠিকই বলেছেন আমি বরং বাইরে যাই।'

উজ্জ্বল মুখোটি হাত বাড়িয়ে বলল, 'সেটা কী করে হবে? আমাকে নির্দিষ্ট ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে, আলোচনার সময় তোমাকে রাখতে।'

boierpathshala.blogspot.com

মানা সরকার থমথমে গলায় বললেন, 'আর আমি যদি তাতে রাজি না হই?'

উজ্জ্বল মুখোটি দু-হাত উলটে বললেন, 'তাহলে আর কী? মিটিং বাতিল বলে ধরে নেব। সেইমতো ওপরে জানিয়ে দেব। কিন্তু বিদ্যুতের উপস্থিতি ছাড়া এই আলোচনা সম্ভব নয়। আমি করতে পারব না।'

মানা মুহূর্তখানেক ভাবলেন। এখন আলোচনা ভেস্তে উঠে যাওয়ার অর্থ দাঁড়াবে পালিয়ে যাওয়া। সেটা সবদিক থেকেই খারাপ। শান্ত মাথায় থাকতে হবে। শান্তভাবে পরিস্থিতি সামলাতে হবে। এখন রাজনীতি মানে শুধু বাইরের রাজনীতি নয়। রাজনীতি ভেতরেও। পলিটিক্স উইদিন পলিটিক্স। আর সেটাই বোধহয় এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ঠেলে উঠতে হবে। নীচে টান পড়বে। ঝাড়া দিয়ে উঠতে হবে। গাছ থেকে নেমে পালালে চলবে না।

মানা নীচু গলায় বললেন, 'বিষয়টা লিখিতভাবে হলেই কি ঠিক হত না উজ্জ্বলবাবু? দলে তো শো-কজের একটা নিয়মকানুন আছে।'

উজ্জ্বল বললেন, 'শো-কজের প্রশ্ন কোথা থেকে উঠছে? আপনি সিনিয়র লিডার। আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট।'

মানা মনে মনে বললেন, 'শুয়ারের বাচ্চা। একটা চার পয়সার ছোকরাকে বিচারকের আসনে বসিয়ে সিনিয়ারের মর্যাদা দেখাচ্ছ!'

বিদ্যুৎ বলল, 'উজ্জ্বলদা, আমাকে যদি থাকতেই হয়, তাহলে শুরু করে দিন। আমার পর পর প্রোগ্রাম আছে। দুটো মিটিং করতে হবে। সন্ধের পর ঘোষপাড়ায় একটা সভা আছে। ছাত্ররা ডেকেছে।'

মানা ব্যঙ্গের ঢঙে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ বিদ্যুৎকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা ঠিক হবে না। দলের ক্ষতি হয়ে যাবে। উজ্জ্বলবাবু জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হোক।'

উজ্জ্বল মুখোটি খানিকটা নড়েচড়ে বসলেন। ঘরের বন্ধ দরজার দিকে তাকালেন তারপর বললেন, 'মানাবাবু, পঞ্চায়েত ইলেকশনের যে সিটগুলোতে আপনার ক্যান্ডিডেট বাছাইয়ের কথা সেগুলো কতটা এগিয়েছে?'

মানা সরকার সহজ ভঙ্গিতে বললেন, 'প্রায় সব ক-টাই। শুধু আমার ওখানে একটা সমস্যা হয়েছিল। আপনারা তো জানেনই, আমাকে দাঁড় করানোর জন্য ছেলেরা একটা প্রেশার করেছিল। আমি রাজি হইনি। সে-কথাও আপনাদের সবটাই বলে গিয়েছিলাম। যদিও সেটা নিয়েও দলে বিরোধ হয়েছে। আমাকে শুনতে হয়েছিল, গোটাটাই নাকি নাটক ছিল। নিজেকে বড়ো করে দেখানোর জন্য আমি সাজিয়েছিলাম। এত বছর দল করার পরও আমাকে শুনতে

boierpathshala.blogspot.com

হয়েছিল।'

কথা শেষ করে আড়চোখে বিদ্যুতের দিকে তাকালেন। বিদ্যুৎ হাতের পত্রিকা বন্ধ করে টেবিলে আঁকিবুঁকি আঁকছে। মানা ঠোঁটের ফাঁকে হেসে বললেন, 'কী বিদ্যুৎ, তাই তো? নাটক-ই তো ছিল নাকি?'

উজ্জ্বল মুখোটি তাড়াতাড়ি বললেন, 'মানাবাবু এর মধ্যে একটা সিট নিয়ে কিছু প্রশ্ন উঠেছে।'

'কোন্ সিট?' ভুরু কোঁচকালেন মানা।

'ঝিলডাঙা।'

কোঁচকানো ভুরু আরও গভীর করলেন মানা সরকার।

বিদ্যুৎ বলল, 'চিনতে পারছেন না? ক-দিন আগেই আপনি যেখানে সারাদিন কাটিয়ে এলেন। এর মধ্যেই ভুলে গেলেন!'

ভেতরে সামান্য চমকে উঠলেন মানা সরকার। বাঃ, তাঁর ঝিলডাঙা সফরের খবর এদের কাছে পৌঁছে গেছে! কতটা পৌঁছেছে? বিদ্যুতের প্রশ্ন করার ধরনটাও উদ্ধত। না, ছোকরাকে দল অনেকটাই তোল্লাই দিয়েছে। নইলে একেবারে কমিশনে বসে গেল! কিন্তু ঝিলডাঙার খবর লিক হল কী করে? গ্রুপের যে-ছেলেটি জেলা নেতাদের খবর সাপ্লাই করে তাকে স্পট করা গেছে। চঞ্চল পাইক। শান্তশিষ্ট গুড বয় ধরনের এই ছেলে কয়েক বছর ধরে তাদের সঙ্গে আছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে ঘটনাটা মেনে নিতে কষ্ট হয়েছিল। ছেলেটা খারাপও নয়। চিত্তশুদ্ধি কর্মসূচির একটা বড়ো দায়িত্ব ওর হাতে দেওয়া হয়। ইচ্ছে করেই দেওয়া হয়েছিল। পাবলিকের সামনে একটা ভালো মুখ থাকা দরকার। অথচ বহুদিন ধরে খুব গোপনেই কাজ সারছিল চঞ্চল। শুধু টেলিফোনেই খবর চালান করত না, জেলা অফিসে নিয়মিত যাতায়াতও করত। বিজয় সান্যাল, তপন গুছাইতের সঙ্গে দেখা করত। গাব্বু একদিন নিজেই দেখে ফেলে। সেদিন বেশি রাতে চঞ্চল জেলা অফিস থেকে বেরোচ্ছিল। সে দলের কর্মী। জেলা অফিসে যেতেই পারে। সকলেরই কম বেশি যাতায়াত আছে। মানা সরকার নিজেই তো কত কাজে লোক পাঠান। কিন্তু চঞ্চলের যাওয়াটা ছিল অন্যরকম। সে যেত গোপনে। গাব্বু সেদিন তাকে দেখে ফেলায় নার্ভাস হয়ে পড়ল।

'তুই এখানে! এত রাতে?'

চঞ্চল আমতা আমতা করে বলে, 'এখানে এসেছিলাম একটা কাজে। অফিসে একবার ঘুরে গেলাম।'

boierpathshala.blogspot.com

'এত রাতে অফিসে কে আছে?'

চঞ্চল কপালের ঘাম মুছে বলে, 'কাউকে পেলাম না। ভাবলাম তপনদা যদি থাকে। চল ফিরবি তো।'

গাব্বুর সন্দেহ হয়। সন্দেহ চেপে রেখে বলে সে বলে, 'না, আজ ফিরব না। আমার দিদির বাড়িতে থাকব।'

'ঠিক আছে আমি এগোলাম। দেখি লাস্ট বাসটা যদি ধরা যায়। নইলে ট্রেকার-ফ্রেকার কিছু একটা ম্যানেজ করতে হবে।'

ঠিক তখনই অফিসের ভেতর থেকে বাবলু বেরিয়ে এসে বলে, 'চঞ্চলবাবু, বিজয়দা আপনাকে অপেক্ষা করতে বললেন। বললেন, গাড়িতে আপনাকে খানিকটা এগিয়ে দেবেন।'

পরদিন থেকে মানা সরকারের বাড়িতে আসাও বন্ধ করে দেয় চঞ্চল।

গাব্বু, খগেন বলেছিল, 'দাদা, আপনি শুধু একবার পারমিশান দিন। ইয়ের ছেলেটাকে মাটিতে পুঁতে দিই। হারামি তলে তলে বিজয়ের গ্রুপে নাম লিখিয়েছে! এত বড়ো বিট্রেয়ার!'

মানা সরকার ধাক্কা সামলে বলেছিলেন, 'মাটিতে পুঁতে কোনো লাভ হবে না গাব্বু। এক জায়গায় পুঁতলে বিষ গাছ অন্য জায়গা থেকে বেরোবে। বিষ গাছের ডালপালা ছেঁড়ে, শিকড় ভেতরেই থেকে যায়। ইচ্ছে করলে ওই শিকড় আমি এখনই ছিঁড়ে দিতে পারি। কিন্তু দেব না।'

মুখে এ-কথা বললেও, মানা সরকার বুঝে গিয়েছিলেন, শিকড় তিনি ছিঁড়ে দিতে পারবেন না। চঞ্চল দলের ক্ষমতাশালী গ্রুপের শেলটার পেয়ে গেছে। ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে আরও বড়ো ধরনের গোলমালে জড়িয়ে পড়তে হবে। পঞ্চায়েত ইলেকশনের আগে সেই জড়িয়ে পড়াটা রাজনৈতিকভাবে বোকামি হয়ে যাবে। অনেক টাকার কারবার। ইলেকশনের পাট চুকিয়ে বিজয় গ্রুপের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে যেতে হবে। তার মধ্যে যতটা পারা যায় নিজেকে গুছিয়ে নিতে হবে। দু-পয়সার স্পাইয়ের ওপর রাগ দেখিয়ে লাভের থেকে ক্ষতিই হবে বেশি।

চঞ্চলই কি ঝিলডাঙার খবরটা এদের দিয়েছে? কিন্তু তা কী করে হবে? সে তো আসা বন্ধ করে দিয়েছে। তাহলে অন্য কেউ? গ্রুপে কি আরও চঞ্চল তৈরি হচ্ছে। সামান্য নার্ভাস হলেন মানা। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম, কী হয়েছে? দলের কারও ঝিলডাঙা যাওয়া বারণ নাকি উজ্জ্বলবাবু?'

উজ্জ্বল মুখোটি বললেন, 'না না বারণ কেন হবে?'

boierpathshala.blogspot.com

'তবে? ওখানকার সিটে কে দাঁড়াবে সেটা তো আমাকে ঠিক করতে বলা হয়েছে। আমার বিশ্বাস ক্যান্ডিডেট সিলেকট করার আগে একবার এলাকায় ঘুরে মানুষের পাল্‌স বুঝে আসা উচিত। জেলা অফিসে বসে নিজেদের মধ্যে গ্রুপবাজি হয়। মানুষের মন বোঝা যায় না।'

বিদ্যুৎ শান্ত গলায় বলল, 'পাবলিকের মন কী বুঝলেন মানাদা? একটা ক্রিমিনালকেই ঝিলডাঙার মানুষ তাদের প্রতিনিধি হিসেবে চাইছে?'

এই ছোকরার মিটিঙে বসে থাকার কথা। প্রশ্ন করার কথা কি? মানা সরকারের একবার মনে হল উত্তর দেবেন না। পরক্ষণেই ভাবলেন, সেটা ভুল হবে। দলের ওপর মহল যখন তাকে এই জায়গায় এনেছে আপাতত মেনে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের। দীর্ঘ রাজনীতির জীবনে এতটা অপমানিত হওয়ার কথা মনে পড়ছে না। অবশ্য তাতে যে খুব একটা কিছু এসে যায় এমন নয়। রাজনীতিতে মান অপমান ধরে বসে থাকলে চলে না। আজ একটা গোষ্ঠী মাথা-চাড়া দিয়ে উঠছে, কাল আর একটা উঠবে।

'বিদ্যুৎ তুমি জানলে কী করে লোকটা বদ?'

বিদ্যুৎ গম্ভীর মুখে বলল, 'থানা থেকে। লোকটার নামে একটা মার্ডার কেস জড়িয়ে আছে।'

মানা সরকার হাসলেন। বললেন, 'ও তাই বলো। আমাদের দলে ওরকম হাজারজনের নামে মার্ডার কেস রয়েছে। হয়তো খুঁজলে আমার বা উজ্জ্বলবাবু অথবা তোমার ওই বিজয় সান্যালের নামেও পাওয়া যাবে। তুমি অল্প দিন হল এসেছ। ক-দিন যাক দেখবে তোমার নামেও কেস এসে যাবে। চিন্তা কোরো না। কেসে জড়িয়ে পড়ার জন্যই রাজনীতি। কেস এড়িয়ে থাকবে কী করে?'

খুব সামান্য শরীর দুলিয়ে হাসলেন মানা। আসলে তিনি ভান করার চেষ্টা করছেন। তাকে নিয়ে চলা এই মিটিংটা তার কাছে কতটা গুরুত্বহীন সেটা বোঝানোর ভান।

ব্যাঁকা কথাটা সহজেই বুঝতে পারল বিদ্যুৎ। পাত্তা না দিয়ে বলল, 'ঝিলডাঙার এক স্কুল-মাস্টারের খুনের পিছনে ওই লোকটা রয়েছে বলে পুলিশের কারও কারও সন্দেহ। আমাদের কাছে খবর এসেছে, লোকটা ইনফ্লুয়েন্স করে থানা থেকে এক অফিসারকে মামলাটা থেকে সরিয়ে দিয়েছে।'

মানা সরকার ভুরু তুলে বললেন, 'আজকাল পুলিশের কথায় দল চলছে নাকি? তা ভালো। লক্ষ করে দেখছি, আমাদের অনেকের মধ্যেও পুলিশ পুলিশ ভাব চলে এসেছে। তারা আর কিছু না পারুক পুলিশের স্টাইলে ইন্টারোগেশন

boierpathshala.blogspot.com

ভালো পারছে।' কথাটা বলে একটু নড়ে বসলেন মানা সরকার। তারপর শুরু করলেন আবার, 'শোনো বিদ্যুৎ, ঝিলডাঙার ওই কাদু ছেলেটাকে আমি চিনি, যে খুন হয়েছে, কী যেন নাম? মনে পড়েছে কী সাম খুঁটিয়া, হ্যাঁ চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া তাকেও চিনি। তুমি এদের কাউকেই চেনো না। দুজনেই আমার কাছে এসেছে।'

বিদ্যুৎ ঠোঁটের ফাঁকে হেসে বলল, 'বাঃ, নিহত এবং হত্যাকারী দুজনের সঙ্গেই আপনার পরিচয় আছে দেখা যাচ্ছে!'

উজ্জ্বল মুখোটি কিছু একটা বলতে গেলেন। মানা সরকার তাকে হাত দিয়ে থামিয়ে বললেন, 'কাদু লোকটা খুনি এটা তোমাকে কে বলল?'

'না, কেউ বলেনি। অভিযোগ আছে তো তাই বলছি।'

'দ্যাখো দলের কিছু লোকের মধ্যে স্পাই ঢুকিয়ে খবরাখবর সংগ্রহ করা, তাদের পিছন থেকে ছুরি মারার চেষ্টা কঠিন কিছু ব্যাপার নয়। এরকম আমরাও করি। কিন্তু এসব খুনখারাপির সঠিক খবর পাওয়া কঠিন। স্পাই দিয়ে হয় না। তাহলে শুনে রাখো, আমি ঝিলডাঙায় গিয়েছিলাম ওই স্কুল মাস্টারের শোকসভায় যোগ দিতে। আর সেই সভার ব্যবস্থা করেছিল স্বয়ং কাদু। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি লোকটার আবেগ কতখানি। দেখেছি, ঝিলডাঙার মানুষ কীভাবে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি নিশ্চিত, ওই লোকটাই গ্রামের সবথেকে পপুলার এবং জেনে রাখো বিদ্যুৎ এবার পঞ্চায়েত ইলেকশনের টিকিট ওকে আমি দেব।'

বিদ্যুৎ বলল, 'দেব বলছেন কেন? দিয়ে তো এসেছেন। ঘোষণাও করেছেন শুনলাম।'

ধমক দিতে গিয়েও থমকে গেলেন মানা সরকার। এরা সবদিক থেকে গুছিয়েই নেমেছে। ওই মেয়েটার খবর পায়নি তো? শান্তির? সেটা অবশ্য অসম্ভব। যা হয়েছে কাদুর আস্তানায় দরজা বন্ধ করেই হয়েছে। সেখানে চর আসবে কোথা থেকে? তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'আমাকে দল ক্যান্ডিডেট বাছাইয়ের ভার দিয়েছে বিদ্যুৎ। খুনি না ডাকাত কাকে দাঁড় করাব সেটা আমিই বুঝব। বিজয় সান্যাল বা তপন গুছাইত কাকে কোথায় টিকিট দিল, তারা ক-টা রেপ করেছে সে ব্যাপারে আমি কিন্তু খোঁজ নিতে যাইনি। তাই না?'

উজ্জ্বল মুখোটি বললেন, 'গোলমালটা তো সেখানেই হয়েছে মানাবাবু। দলের আপত্তি তো সেখানে। ক্যান্ডিডেট সিলেকশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মানে এই নয় যে ঘোষণা আমরা একা একা করে দেব। আগে তো বসে আলোচনা হবে।'

boierpathshala.blogspot.com

মানা সরকার থমকালেন। এই কথাটা ভুল নয়। তিনি নিজেও পরে কয়েকবার ভেবেছিলেন। ঝিলডাঙার সভায় দাঁড়িয়ে কাদুর নাম বলে দেওয়াটা ঠিক হয়নি। শুধু কাদুকে জানালেই হত। আসলে অত আদরযত্নের পর...। তা ছাড়া ছেলেটা অতবড়ো একটা বিজনেসের কথা বলে বসল। খানিকটা আপ্লুত হয়েই অ্যানাউন্সমেন্টটা করে বসেছিলেন। এখন মনে হচ্ছে কাজটা ভেবে করা উচিত ছিল। দল যে তাকে ধরেছে খুব ভুল জায়গায় ধরেনি। কাদুই যে ঝিলডাঙা থেকে ইলেকশনে লড়বে এটা একটা ইঙ্গিত দিলেই চলত। যাক, এখন পেছোনো যাবে না। তিনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ও তাই বলুন উজ্জ্বলবাবু, একটা টেকনিক্যাল মিসটেক হয়েছে। দাও বিদ্যুৎ, তোমার ওই একটা বিড়ি দাও দেখি।'

বিদ্যুৎ পকেট থেকে বিড়ি বের করে এগিয়ে দিল। মানা সরকার বিড়ি উলটেপালটে ফুঁ দিতে লাগলেন। এখন দেখতে হবে কোনোভাবেই যেন কাদুর টিকিট বাতিল না হয়ে যায়। দরকার হলে ওপরতলা পর্যন্ত গিয়ে ম্যানেজ করতে হবে। জিনিসটা প্রেস্টিজ ইস্যু করে ফেললে কেমন হয়?

বিদ্যুৎ নীচু গলায় বলল, 'মানাদা, আপনারা দলের এত ইমপর্টান্ট জায়গায় আছেন, আপনারাই যদি মিসটেক করে বসেন তাহলে অন্যরা কী করবে?'

মাথায় চড়াৎ করে রক্ত উঠে গেল। ছোকরা জ্ঞানও দিচ্ছে! হারামজাদা অনেক বেড়েছে তো! তবে এখন মাথা গরম করলে চলবে না। নরম হতে হবে।

মানা বিদ্যুতের লাইটার দিয়েই যত্ন করে বিড়ি ধরালেন। এক মুখ ঘন ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'যাক ওসব ছাড় বিদ্যুৎ। যা হবার হয়ে গেছে। আমি তো বললাম কাজটা ঠিক হয়নি। অ্যানাউন্সমেন্ট আলোচনা করেই হওয়া উচিত ছিল। আসলে কী মনে হল জানো, হাতের কাছে যোগ্য প্রার্থী পেয়ে গেছি, পাবলিকের মনের মতো মানুষ, এখানে আবার কবে আসব তার ঠিক নেই, সবার কাছে কথাটা বলেই ফেলি। কাদু ওই মাস্টারের খুনিকে ধরবার জন্য যে কী পরিশ্রম করছে তোমরা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না। পুলিশের একটা পার্ট কী বলল তাতে কিছু এসে যায় না। পুলিশের মধ্যে দলাদলি বেশি থাকে। গ্রামেগঞ্জে কত যে এমন সব ভালো লোকজন ছড়িয়ে আছে আমরা খোঁজও রাখি না। আমাদের উচিত অন্য কোনো পলিটিক্যাল পার্টি ধরার আগে এদের কাছে টেনে আনা। যাক, এসো আমরা সবাই মিলে কাল পরশুর মধ্যে ক্যান্ডিডেট লিস্ট টা ফাইনাল করে ফেলি।'

উজ্জ্বল মুখোটি বললেন, 'কাল পরশু না হোক, এই সপ্তাহেই করে ফেলতে হবে। হাতে আর সময় বেশি নেই।'

boierpathshala.blogspot.com

মানা সরকার মুখে বানানো হাসি নিয়ে বললেন, 'বেশ তাই করো। আরে বাবা, নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করে এইসব কাজ হয় নাকি? সামনে ইলেকশন, সব ঝগড়া ভুলে এখন কাজে নামতে হবে। আমার নামগুলো আমি না হয় এখনই লিখে দিয়ে যাচ্ছি।'

বিদ্যুৎ টেবিলে পড়ে থাকা পত্রিকাটা আবার টেনে নিয়ে ওলটাতে শুরু করল। স্পষ্টতই বুঝিয়ে দিল, মানা সরকারের কথা সে শুনছে না। শুনতে চাইছে না। উজ্জ্বল মুখোটি থমথমে গলায় বললেন, 'নাম লিখে দিন মানাদা, কিন্তু আলটিমেটলি কী হবে এখনই বলতে পারছি না।'

'মানে!' চকিতে মুখ ফেরালেন।

উজ্জ্বল মুখোটি টেবিলে রাখা ফাইলে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'ওপর থেকে এবার বলে দিয়েছে, এই এলাকার ক্যান্ডিডেট লিস্ট চূড়ান্ত করবে বিদ্যুৎ। প্রয়োজন মনে করলে সে সবার সঙ্গে আলাদা আলাদা করে কথা বলে নেবে।'

মানা সরকার শুকনো হেসে বললেন, 'আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

উজ্জ্বল মুখোটি ফাইলের দড়িতে হাত দিয়ে বললেন, 'কাল একটা সার্কুলার ইস্যু হয়েছে। যদি বলেন দেখাতে পারি।'

পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠল মানা সরকারের। এর একটাই অর্থ, তার দেওয়া নামগুলো বাদ দেওয়া।

'এটা কি শুধু আমার ক্ষেত্রেই।'

উজ্জ্বল মুখোটি বললেন, 'না না তা কেন? সবারটাই দেখবে বিদ্যুৎ।'

মানা সরকার আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। গলা তুলে বললেন, 'আমি এটা মানি না। আমাকে সরাসরি অপমান করার অধিকার আপনাদের নেই। হু ইজ হি? কালকের ছোকরা। সে আমার লিস্ট চেক করার কে? তার কাছে আমার পরীক্ষা দিতে হবে কেন?

উজ্জ্বল মুখোটি বললেন, 'দুঃখিত মানাবাবু। এটা ওপরের সিদ্ধান্ত।'

'আমি নিজে লিডারদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। তাদের কাছে জানতে চাইব, একটা গ্রুপের সঙ্গে কথা বলে কেন এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। আমরা কি দলের কেউ নই? এতদিন ধরে রাজনীতি করার এই পুরস্কার? তা ছাড়া জেনে রেখো উজ্জ্বল মুখোটি আমার কাছেও খবর আছে। দলের অনেকের খবরই আছে। কে কোথায় কী করে বেড়ায়, আমি তোমাদের থেকে কম কিছু

boierpathshala.blogspot.com

জানি না। বিজয় সান্যাল অ্যান্ড হিজ কম্পানির ঝুলি আমিও খুলতে পারি এবং সেটা এবার খুলবও। '

কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন মানা সরকার।

উজ্জ্বল মুখোটি বললেন, 'আপনি শান্ত হোন মানাবাবু। আপনি বসুন।'

মানা সরকার আরও জোরে চিৎকার করে উঠলেন, 'কীসের শান্ত হব? কেন শান্ত হব? আমি সব বুঝতে পারছি। সবটাই কনসপিরেসি। আমাকে দলে কোণঠাসা করার চেষ্টা। বিজয় সান্যালরা প্যাঁচ কষে এসব করেছে। আমি আর এক মুহূর্ত এই মিটিং-এ থাকতে চাই না। কাল আগে ওপরে কথা বলব তারপর..।'

উত্তেজিত মানা সরকার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কোনোদিকে না তাকিয়ে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তিনি বুঝতে পারলেন, ওয়াকআউট করা ছাড়া এই অবস্থায় তাঁর অন্য কোনো উপায় ছিল না। কাল সকালেই নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বিচার চাইতে হবে। ততক্ষণে তারা নিশ্চয় এই রাগারাগির খবর পেয়ে যাবে। যাক, কোনো কোনো পরিস্থিতি যেমন শান্ত মাথায় সামলাতে হয়, তেমন আবার কোনোটার জন্য রাগ লাগে।

কিন্তু তার আগে ওই ছোকরার একটা বিহিত করা দরকার। আগেই করা উচিত ছিল। দেরি হয়ে গেছে। হারামজাদার বোঝা দরকার মানা সরকারের ক্ষমতা কতটা।

মানা সরকার গাড়িতে উঠে মোবাইলে দ্রুত নম্বর টিপলেন। ওপাশে গাব্বু ফোন ধরে বলল, 'বলুন দাদা।'

ঘোষপাড়ার সভায় যোগ দিতে যাওয়ার আগেই বিদ্যুতের ওপর হামলা হল। খুব বড়ো কিছু ঘটল না যদিও। নির্জন পথের ধারে তাকে রিকশা থেকে নামিয়ে নিল কয়েকটি যুবক। তারা এসেছিল মারুতি ভ্যানে চেপে। মারধরের মাঝখানেই ভিড় জমে যায়। অচেনা যুবকেরা গাড়ি ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। গাড়িতে মানা সরকারের 'চিত্তশুদ্ধি' কর্মসূচির কিছু লিফলেট পাওয়া যায়।

এর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মানা সরকারকে দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল জেলা অফিসের জরুরি এবং সংক্ষিপ্ত বৈঠকে।

ঝিলডাঙায় বসে কাদু এ-খবর জানতেও পারল না।

boierpathshala.blogspot.com

দেশলাই কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে কাদু জিজ্ঞেস করল, 'সঙ্গে লোক ক-জন?'

'ওস্তাদ চার, না চার নয় তিন, তিন।'

কাদু ধমক দিয়ে বলল, 'ঠিক করে বল শুয়ার। চার না তিন?'

শোল হাঁপাচ্ছে। হাঁপানোই স্বাভাবিক। সে সাইকেল চালিয়েছে বাতাসের থেকেও আগে। ঝিলডাঙায় পৌঁছোতে যতটা সময় লাগার কথা, লেগেছে তার আদ্দেক। চিন্তা ছিল, কাদুকে পাবে কিনা। সে আজকাল বেশিরভাগ সময়েই রাস্তায় রাস্তায় থাকে। তার ভাষায় 'পাবলিকের সঙ্গে টাচে আছি। তোরা এসব বুঝবি না গো-মুখ্যুর দল।' এর মধ্যে একদিন কাটাখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কুলবাড়িতেও গিয়েছিল। শোল বলেছিল, 'ওখানে গিয়ে কী হবে ওস্তাদ।'

'ভিচিট দেব।'

'ভিচিট!'

'ধুস শালা, মাতায় গোবর ঠুসে রেখেচিস নাকি? ঝিলডাঙার মানুষ দেকবে, ভোটের আগেই ক্যান্ডিডেট স্কুলবাড়ি গেচে। স্কুলটা নিয়ে আমি যে সত্যি সত্যি ভাবনাচিন্তা করচি বুঝতে পারবে।'

মোহন বলল, 'সতি সত্যি ভাবচ নাকি ওস্তাদ!'

'নিচ্চয়। মানুষ আমাকে ভোটে জিতিয়ে আনবে, আর আমি গাঁয়ের ইস্কুলটা ফের খুলে দেব না?'

দাঁত বের করে, শরীর দুলিয়ে হাসতে থাকে কাদু।

'তবে নামটা একটু বদলে নেব ভাবচি।'

boierpathshala.blogspot.com

'কী নাম?'

'ঝিলডাঙার স্কুলের নাম কাটাখালি থাকবে কেন? খুঁটিয়া মাস্টারের নামে করে দেব।'

মোহন ঢোঁক গিলে বলে, 'খুঁটিয়া মাস্টার!'

কাদু মুখে নোংরা ধরনের আওয়াজ করে হাত তুলে শূন্যে দেখায়। বলে, 'ইস্কুলের মাথায় সাইনবোর্ড লাগবে। চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া বিদ্যালয়। ফাংশনের দিন মানা হারামিটাকে নিয়ে আসব। থানার বড়োবাবুও থাকবে। ছেলেমেয়েদের প্যাকেট দেব। প্যাকেটে সিঙাড়া, বোঁদে থাকবে। কেমন হবে?'

মোহন গদগদ গলায় বলে, 'বাপরে, একেবারে মেনু পজ্জন্ত ভেবে ফেলেছ! দারুণ হবে। দেরি করে লাভ কী ওস্তাদ? এখনই করে দাও।'

কাদু দুঃখ দুঃখ উদাসীন গলায় বলে, 'করতে তো মন চায় রে ব্যাটা, ভালো কাজে সবুর সয় না। কিন্তু পারি কই? কাদু এখন কে? কেউ নয়। ইলেকশনে জেতা তো দূরের কথা, ভোটের টিকিটও এল না। দেকি দুটো দিন অপেক্ষা করি। তার আগে নেতাই হারামজাদার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

আস্তানাতেই শোল তার 'ওস্তাদ'কে পেল। কাদু মোহনকে নিয়ে তার ভাঙা বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখছিল। নতুন কারবারের জন্য বাড়ি ঘষে মেজে নিতে হবে। তার মাঝখানেই শোল হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছয়। 'ফিলিমপার্টি' এবং মেয়েদের কথা জানায়।

কাদু চোখ সরু করে বলে, 'ক-টা মেয়ে?'

'দুটো।'

'দুটোই ওদের সঙ্গে আচে?'

'না, দুটো নেই।'

'নেই তো বলচিস কেন!' দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে কাদু।

শোল তখন বিস্তারিত জানায়। সত্যি দুটি মেয়ের সন্ধান পেয়েছে সে। একটা ধেড়ে, একটা ছোটো। ধেড়েটা শহরের। কলকাতা থেকে আসা 'ফিলিম প্যার্টি'র সঙ্গে রয়েছে। দারুণ চটক-মারা চেহারা। চোখ ফেরানো কঠিন। লজ্জাশরম বলে কিছু নেই। কাপড়-চোপড় খুলে উদোম হয়ে পুকুরে নেমে পড়েছিল। কখনও ডুব সাঁতার, কখনও চিত সাঁতার দিচ্ছিল। নিজের চোখে দেখে এসেছে শোল। ছোটোটা আরও মারাত্মক। তার বাড়ি নাকি এই ঝিলডাঙাতেই! 'ফিলিমপার্টি'র এক ছোকরার কাছে এই কথা শুনে তো শোল একেবারে থ'। শালা, বাইরের লোক ঝিলডাঙার খবর দেয়! ছোকরা দলের লিডার। সে-ই এক

boierpathshala.blogspot.com

ফাঁকে ঘটনা জানিয়েছে। ঝিলডাঙার ওই মেয়ের নাকি অদ্ভুত ক্ষমতা আছে।

কাদু ফিসফিস করে বলে, 'কীসের ক্ষমতা?'

শোল গলা নামিয়ে বলে, 'মেয়ে নাকি আগে থেকে ঝড়বাদলার খবর পায়। আমার তো ইচ্ছে করছিল, ছোকরার গালে থাবড়া লাগাই। শালা আমাদের গাঁয়ের মেয়ে, তুই বেশি জানিস?'

'বয়স কত?' কাদুর অন্যমনস্কভাবে জানতে চায়।

'কোনটার ওস্তাদ? ধেড়ে না ছোটোজনের?'

'দুটোরই বল।'

শোলের হাপাঁনো এখনও শেষ হয়নি। সে দম নিল। বলল, 'ধেড়েটার ওস্তাদ কুড়ি বাইশের বেশি নয়। কমও হতে পারে। পুকুরের জলে যখন ঝাপটা মারছিল, বুক পাছা... আর ঝিলডাঙার মেয়েটার বয়স বলতে পারেনি। শুধু বলেছে ছোটো।'

কাদুর চোখমুখ কঠিন হল। একটা মেয়ে বাইরের। চোখ ধাঁধানো দেখতে। উদোম হয়ে জলে নামে। অন্যটা এখানকার। ঝড়বাদলের খবর বলে। কোনটা সত্যি? নাকি দুটোই মিথ্যে? সত্যি মিথ্যে যাই হোক, দুটোর একটাকেও এড়িয়ে থাকা যাবে না। যাচাই করতে হবে। একটা ঝিলডাঙার, একটা ঝিলডাঙায় আসছে। মুখ ঘুরিয়ে থাকা ঠিক হবে না।

'যা তো মোহন, চট করে গাঁয়ের ভেতরে একটা পাক মেরে আয়। এই গল্পটা আবার কীরকম? সত্যি সত্যি এরকম কেউ আছে নাকি দ্যাখ দিকি? ঝিলডাঙায় এমন একটা চিজ আছে, অথচ আমরা জানি না? যাব্বাবা! শোল তো ঠিকই বলেচে, ঝিলডাঙার খবর বাইরের লোকের মুখে শুনতে হচ্ছে! ছ্যা। মেয়েটার নাম কী?'

শোল পুরো এক গেলাস জল এক চুমুকে খেল। নামটা মনে পড়ছে না। তবে এ-কথা ওস্তাদকে বলা যাবে না। বানিয়ে বলল, 'ফিলিমপার্টির ছোকরা নাম বলতে পারেনি।'

কাদু ভুরু কোঁচকাল। বলল, 'নাম যাই হোক, নিশ্চয় কেউ গপ্পো ছড়াচ্ছে। হারামজাদাটা কে? '

মোহন বলল, 'ছেড়ে দাও ওস্তাদ। ছোটো কেস।'

কাদু ঠান্ডা চোখে শোলের দিকে তাকাল। বলল, 'ঝিলডাঙার কোনো কেসই আর আমার কাচে ছোটো নয়। বিশেষ করে মেয়েমানুষের কেস। কাল বাদে পরশু এখান থেকে ইলেকশনে দাঁড়াব। অ্যাই মোহন, যা এখুনি যা। গ্রামে

boierpathshala.blogspot.com

কে এসব রটাচ্চে খোঁজ নিয়ে আয়। মেয়ের বাপ হলে পাছায় লাথি মারতে মারতে নিয়ে আসবি।'

মোহন চলে যেতে বড়ো মেয়েকে নিয়ে পড়ল কাদু।

'কী-রে ক-টা লোক ছিল?'

'তিনজন ওস্তাদ। তিনটেই ফালতু। দুজন তো সাঁবুইতে কচুরি না জিলিপি কিনতে চলে গেল। ছিল মাত্র একটা। দলের পাণ্ডাটা। ব্যাটার নাম সোমনাথ। মেয়েছেলেটা ওর সঙ্গে রয়ে গেল।'

কাদু চোখ কুঁচকে বলল, 'তুই কোথায় চিলি?'

'বললাম তো ভাঙা পুকুরের ওপাড়ে। ঝোপের গায়ে সেঁটে ছিলাম। ওখান থেকেই দেখলাম।'

কাদু মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'কী দেখলি?'

শোল জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। ঢোঁক গিলে বলল, 'বললাম তো।'

'আবার বল শুয়ার। দেখব আগেরটার সঙ্গে মেলে কিনা। না মিললে বুঝব মাল টেনে বাজে কথা বলছিস।'

শোলের চোখ চকচক করে উঠল। দৃশ্যটা আবার যেন দেখতে পেল।

'দেখলাম মেয়েটা জামা পেন্টু খুলে পুকুরের জলে নেমে পড়ল!'

কাদু মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'কী খেয়েছিস? নিশ্চয় ঘোলা ঝুপড়ির মাল? ঘোলা শালা মালে ধুতরো মেশায়। শুধু জামাকাপড় কেন, ওই মাল পেটে পড়লে হাত পা মুণ্ডু সব খুলিয়ে দেবে।'

শোল এই কথায় আমল না দিয়ে দু-পা এগিয়ে এল। কাদুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গলা নামিয়ে বলল, 'ওস্তাদ, জিনিস একেবারে টনটনে। মনে হচ্ছে শলীলে গোলাপি পাউডার মেখে জলে নেমেছে। শুধু রং নয়, বাকি জিনিস-পত্তরও দারুণ। দেখলে মাথা ঘুরে যাবে।'

'কী করে বুঝলি?'

'ওমা, দেখলাম তো। সবই দেখেছি। আগা মাথা, সামনে পিছন সব। চিত সাঁতার দেখে দম বন্ধ হয়ে গেল ওস্তাদ। পদ্মফুলের মতো ভেসে ভেসে যায়।'

কাদু দাঁত দেখিয়ে হাসল। বলল, 'খুব ডায়লক মারচিস।'

শোল লজ্জা পেল। জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, 'গুরু, তুমি দেখলে তুমিও ডায়লক দিতে। ডায়লক দেওয়ার মতোই মাল।'

কাদু মাথা তুলে ছাদের দিকে তাকাল। ছাদের পিছন দিয়ে একটা লোহার সিঁড়ি করলে কেমন হয়? দরকার হলে চট করে লুকোনো যাবে। বাইরেটা

boierpathshala.blogspot.com

ভাঙাচোরা রাখলেও ঘরগুলোতে কিছু মেরামতের দরকার। তবে বেশি ঘর নেবে না কাদু। ঘর বেশি হলে বেশি সমস্যা। পুলিশ-ফুলিশের ঝামেলা হলে ফট করে গোটানো যায় না। পিছনের একটা, খুব বেশি হলে দুটো ঘরেই কারবার চলবে। সামনে অফিস যেমন আছে তেমনই থাকুক। বারান্দায় থাকবে টেবিল চেয়ার, অন্নপূর্ণা চালকলের সাইনবোর্ড। আসল ব্যবস্থা থাকবে পিছনে। শান্তি বলেছে, মেঝেতে শুধু ফরাশ দিলে চলবে না, একটায় তক্তাপোশ সিস্টেম রাখতে হবে। কার কী পছন্দ বলা যায় না। তবে আসল হল ফিল্ড। ফিল্ড যত ভালো হবে ব্যবসা তত জমবে। মাঠঘাটে ঘুরে খবর আনতে হবে। জিনিস জোগাড় করতে হবে। এক একরকম জিনিসের জন্য এক-একটা ব্যবস্থা। কোথাও টোপ দিতে হবে, কোথাও লাগবে ভয়। এতে কাজ না হলে দু-একটা আলটপকা তুলে আনতেও হবে। এতে ব্যবসায় জোর বাড়ে। পাবলিসিটি হয়। গরিবগুব্বো সমীহ করে চলে। কেনাবেচার ফিল্ড তৈরি কি আর চাট্টিখানি ব্যাপার? সব মিলিয়ে ঝামেলা অনেক। তবে নিশ্চিন্তের কথা হল, আসল ঝামেলার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। বুধিয়া আর ইসমাইলের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। দু-জনেই মেয়েমানুষ কেনাবেচার লাইনে অনেকদিনের খেলুড়ে। সেরকম জিনিস পেলে ইসমাইল তো অনেকদূর পর্যন্ত যায়। একেবারে সাগর পার করে ছাড়ে। সেই তুলনায় বুধিয়া বয়েসে বুড়ো হলেও খেলোয়াড় ছোটো। তিন চার হাত ঘুরিয়ে বেশ্যাপাড়ার সাপ্লায়ার। সবাইকেই বলে 'ফ্রেশ মাল'। সে যাই হোক, কথা পাকা হয়েছে। কাদুকে জিনিস পৌঁছে দিতে হবে খালপুল পর্যন্ত। গ্রামের ভেতরের ক্যাওড়ার মধ্যে ওরা নেই। বাইরের পার্টি আজকাল খুচখাচ ধরা পড়ে যাচ্ছে। তখন পাবলিক একেবারে পিটিয়ে চামড়া তুলছে। গাঁয়ের লোক ভালো থাকলে ভালো, খেপে গেলে বিপদ। তার থেকে ভেতরে লোকাল এজেন্টই ঠিক আছে। বড়ো রাস্তায় গাড়ি থাকবে। গাড়ি ভাড়া জিনিসের দাম থেকে কাটা যাবে। জিনিস বুঝে গাড়ি, মোটরবাইক। অসুবিধে হল, এই কারবারে ধারবাকি যেমন নেই, অ্যাডভান্সও নেই।

কাদু ঠিক করেছিল সরাসরি কথায় যাবে না। তবু গতকাল রাতে বুধিয়া দেখা করেছে। কাদুর হাতে এক খামচা নোট ধরিয়ে দিয়ে গেছে।

'নাও রাখো। মেয়ে পাচারে অ্যাডভান্স নেই। তবু রাখো। তোমার নতুন কারবারে বউনি আমার। দেরি না করে এখনই শুরু করে দাও। পারলে কাল থেকেই। খবর আছে, এদিকে মাল ভালো, কাজ করার লোক নেই। মাল শুধু চেহারা ছবিতে ভালো নয়, গরিব হদ্দ। অল্প টাকায় ছেলেমেয়ে বেচেবুচে দেবে।'

টাকায় কাদু খুশি হল। বলল, 'দাঁড়াও, আগে একটু গুছিয়ে নিই।'

boierpathshala.blogspot.com

বুধিয়াকে দেখলে কে বলবে লোকটা মেয়ে পাচার করে? দেখতে সাদাসিধে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। কাঁধে ঝোলা। হাতে বই খাতাও রাখে। মনে হবে, গাঁয়ের স্কুলে ভূগোলের মাস্টার। সুন্দর করে হেসে বলল, 'এর মধ্যে আবার গোছানোর কী আছে? কিছু নেই। কাজ করতে করতে গোছানো, গোছাতে গোছাতেই কাজ। এ তো আর পিদিম জ্বেলে ব্যবসা শুরু নয়। নাও টাকা গুনে রাখ। প্রথমটা কিন্তু আমার। তবে ফ্রেশ চাই, হ্যাঁ।'

এতটা বলে থামল বুধিয়া। তারপর কাদুর ঘাড়ের কাছে ঝুঁকে চাপা গলায় বলল, 'বয়স অল্প খোঁজ। আমি যেদিকে মাল সাপ্লাই করি সেদিকে আবার বয়স অল্পেই সুবিধে। লাস্টিং বেশি।'

কাদু ভুরু কুঁচকে বলল, 'অল্প মানে?'

'দশ, বারো, চোদ্দ। যত কম তত দর বেশি। কাজেও সুবিধে। গরিব বাপ-মাকে বুঝিয়ে কাজের জন্য শহরে পাঠাবে বললেই চলবে। একটা নোট হাতে দিলে তো কথাই নেই। বলবে, মাইনের অ্যাডভান্স। তখন নিজেরাই এসে মেয়েকে কোলে তুলে দেবে। খেতে না পেলে হারামজাদারা করবে কী? বিষ দিয়ে তো আর মেয়ে মারতে পারবে না। এদেশে বিষের জন্যও টাকা লাগে।'

মাস্টারের মতোই বড়ো বড়ো কথা বলে লোকটা।

কাদু খুশি হল। তার হিসেব মিলে যাচ্ছে। নিতাইয়ের হিসেব। এই শাস্তির মতো আর কী আছে? ব্যাটা পাগল হয়ে ঝিলডাঙার পথে পথে ঘুরবে! মেয়েকে খুঁজে দেওয়ার জন্য কাদুর পা চেপে ধরবে। কাদু খুশির ভাব লুকিয়ে বলল, 'দেখি। হলে বলব।'

কাজ কবে শুরু হবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত এখনও পাকা হয়নি। তবে নিতে হবে। বউনির টাকা যখন পকেটে তখন সিদ্ধান্তও দ্রুত নিতে হবে।

কাদু আর শোল ঘুরতে ঘুরতে বাড়ির ন্যাড়া ছাদে এসে উঠেছে। ছাদের অবস্থা ভালো নয়। ছাদ থেকে বাড়ির পিছনের পুকুরটা পুরো দেখা যায়। পুকুর তো নয়, মজে যাওয়া ডোবার মতো হয়ে গেছে। সেই মজা পুকুরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন কাদুর কী হল! সে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল জলের দিকে!

আচ্ছা, ওই জলে যদি শোলের ফিল্মপার্টির চকচকা মেয়ে কাপড় খুলে সাঁতার কাটে? চারপাশ অন্ধকার। কেউ নেই। সে শুধু একা এই ছাদে বসে সাঁতার দেখবে। কেমন হবে? চাঁদের আলো পিছলে পিছলে পড়বে মেয়ের গায়ের ওপর। জলের ওপর। মেয়ে সাঁতার দেবে। গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে গাঁইয়া সাঁতার নয়, বুক, পেট, পাছা দেখিয়ে কায়দার সাঁতার। উরু তুলে জলে ঘাই

boierpathshala.blogspot.com

মারবে মাছের মতো। বোঝা যাবে, মেয়ে উদোম। শুধু আওয়াজ হবে ঝপাস ঝপাস। কেমন হবে?

ঘোর কাটিয়ে কাদু শোলের দিকে তাকাল।

'ফিল্ম পার্টি এখন কোথায়?'

'সাঁবুইয়ের আগে। ওই যে ঝোপঝাড়ের ভেতর ভাঙা পুকুর। ওই পুকুর পাড় দিয়েই তো নিয়ে পথ দেখিয়ে আসছিলাম।'

কাদু আপনমনে বলল, 'শোল, পুন্যিমে কবে?'

শোল বলল, 'মনে হচ্ছে কাল বা পরশু। খোঁজ নিয়ে বলব?'

'খোঁজ নিতে হবে না। চল, নীচে চল। তার মানে রাতে চাঁদের আলো থাকবে। থাকবে না?'

শোল মাথা নাড়ল। কিছু না বুঝেই বলল, 'হ্যাঁ, থাকবে।'

কাদু নামতে লাগল ভাঙা সিঁড়িতে সতর্ক পা ফেলতে ফেলতে।

'শোল, শহরের ওই মেয়েকে আমার চাই। আজ হলেই ভালো। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। সন্ধের পর এলেই হবে। চাঁদ ওঠবার পর। চাঁদের আলোয় ওই পুকুরে সাঁতার দেবে।'

শোলের চোখমুখ কঠিন হয়ে গেছে। ওস্তাদ বলে কী! মাথা-টাথা ঠিক আছে তো? এ তো আর দু-পয়সার শান্তি নয়। শখ করে কাপড় খুলে পুকুরে নামলে কী হবে, ভদ্রলোক সব। ছোটোলোকের মতো এই ডোবায় সাঁতার দেবে কেন? মানা সরকারের সঙ্গে সেদিনের দহরম-মহরমের পর থেকে ওস্তাদের এই অসুখটা হয়েছে। সাহস বেড়েছে। যা খুশি চাইছে।

'কী হল, চুপ করে আচিস কেন? কিছু বল। তুই ওদের পথ দেখিয়ে সেই বানেরহাট থেকে নিয়ে এলি। তুই না বললে কেমন করে হয়?' কাদুর মুখে শয়তানের হাসি।

বারান্দায় চেয়ার টেনে বসল কাদু।

শোল মাথা চুলকে বিড়বিড় করে বলল, 'না, মানে...'

কাদু শান্ত গলায় বলল, 'মানের কী আছে? যে-মেয়ে দিনের বেলায় কাপড় খুলে জলে নামতে পারে, তার রাতের বেলায় অসুবিধে কী? বরং সুবিধেই বলতে পারিস।'

কথা শেষ করে কাদু তার পরিচিত বিশ্রী আওয়াজে হাসতে থাকে।

শোল বলল, 'না, কোনো অসুবিধে নেই।'

'যা, তুই আবার ওর কাচে যা। ওই লিডারটাকে গিয়ে কথা বল । টাকা

boierpathshala.blogspot.com

পয়সা নিয়ে বেশি ভ্যাজর ভ্যাজর করিস না। যতই হোক রাতদুপুরে জলে নামার একটা ঝুঁকি আছে। শহরের মেয়ে, বেচারি ভয় তো পাবেই। সাপখোপ আছে। ঠান্ডার ধাত থাকলে মুশকিল।'

'ওস্তাদ, পার্টি যদি রাজি না হয়।'

কাদু শোলের দিকে তাকাল। ঠান্ডা গলায় বলল, 'কীভাবে রাজি করাতে হয় জানিস না? ঝিলডাঙায় কাদুর কথায় ভালোভাবে রাজি না হলে যা করতে হয় তাই করবি। পেটে ভোজালি ঠেকিয়ে তুলে আনবি। দেখবি রাজি হয়ে গেচে। তখন জলে নেবে শুধু সাঁতার দেবে না, সঙ্গে গুনগুন করে গানও গাইবে। নে আর দেরি করিস না। যা, মানুষগুলোর খোঁজ নে। কীভাবে আনবি জানি না। যেভাবে পারিস নিয়ে আয়। ভয় পাবি না। মনে রাখবি আমার কাচে ব্যবস্থা আছে।'

শোল চিন্তিত মুখে বারান্দা থেকে নেমে যাওয়ার পর কাদু টেবিলের ড্রয়ার টানল। এক কোণায় তার 'ব্যবস্থা' ঝকঝক করছে। ছোট নল, হাতলও ছোটো। ডিমের মতো পেট ভরা গুলি নিয়ে ট্রিগার গুটিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে আছে বেটা। গায়ে হাত দিলে ছ্যাঁৎ করে লাগে। বরফের মতো ঠান্ডা। ঝিলডাঙা তো কোন্ ছার, আশপাশের দশটা গাঁয়ে কারও কাছে এই অস্ত্র নেই। কাদুর বড়ো ইচ্ছে এর সঙ্গে একটা বন্দুকও রাখে। বন্দুক থাকলে প্রেস্টিজ বাড়ে। যে-কাজে নামছে সেটা ঠিকমতো হলে শুধু বন্দুক কেন, বন্দুক, কামান সবই হবে। কেনাবেচায় সব লাগে।

ড্রয়ারের কোণে আরও একটা জিনিস আছে। একটা শিশি। গোপী-ডাক্তারের তৈরি বলবর্ধক ওষুধ। এখনও পরীক্ষা হয়নি। শিশিতেও হাত বোলাল কাদু। ড্রয়ার বন্ধ করার পরপরই মোহনের মোটরবাইক এসে দাঁড়াল। স্টার্ট বন্ধ করে মোহন উঠে এলে বারান্দায়।

কাদু মুখ তুলে বলল, 'কীরে খবর হল? সত্যি সত্যি কেউ আছে নাকি?'

মোহন ঝুঁকে পড়ে চিন্তিত গলায় বলল, 'ওস্তাদ, সেই মেয়ে।'

'কোন্ মেয়ে?'

'নিতাইয়ের বেটি। যাকে তুমি দেকে এলে। ফুল।'

চমকে উঠল কাদু। সোজা হয়ে বসল চেয়ারে। নিজেকে সামলাতে সময় নিল খানিকটা। তারপর পায়ের ওপর পা তুলে নাড়তে লাগল। বলল, 'বাঃ, এত চেনাজানা। তা ওই মেয়ের ব্যাপার কী জানলি? সত্যি সত্যি মেয়ে ওসব পারে নাকি? ওই যে শোল শুনে এসেছে, ঝড়জলের কথা আগেই বলে দেয়?

boierpathshala.blogspot.com

কোন শুয়ার এসব রটাচ্ছে?'

মোহন মাথা চুলকে বলল, 'না, শুনলাম না।'

মোহন মাথা চুলকে বলল, 'ঝড়বৃষ্টির কথা শুনিনি, তবে একটা কথা কিন্তু শুনে এলাম কাদুদা। অন্য একটা কথা।'

কাদু হাসি থামিয়ে বলল, 'আবার কী কথা?'

'মন্দিরের ন্যাপা বলল, ওই মেয়ের মা নাকি দশ টাকার পুজো দিয়েছে। যে মানুষ চার আনার বেশি কোনোদিন দিতে পারেনি, তার দশ টাকার পুজো দেখে ন্যাপার সন্দেহ হয়। জিজ্ঞেস করতে বলে মেয়ের অসুখ।'

'কী অসুখ?' ভুরুই কুঁচকে তাকায় কাদু। নিতাইয়ের মেয়ে যে রোগাভোগা নিজেই দেখে এসেছে। কিন্তু অসুখটা কী?

'সেটা জানতে গোপীডাক্তারের কাছে গেলাম। শালা প্রথমে বলচিল না, ধমক দিতে বলল, কী অসুখ জানে না, তবে নিতাইয়ের মেয়ে নাকি শুকিয়ে যাচ্ছিল। তখন গোপী ওকে শহরে গিয়ে ডাক্তার দেখাতে বলে।'

কাদু পিঠ সোজা করে বসল। চোয়াল শক্ত করে বলল, 'শহরে গিয়েচিল?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিল। আরও জেনেছি। নিতাই হারামজাদা ফটো-বিশুর ওখানে গিয়ে মাল টানে শুনলাম, একদিন নাকি বেশি টেনে কান্নাকাটি লাগায়। মেয়ের অসুখের কথা বলেছে। তবে কী অসুখ বলেনি। মালের ঘোরে আবোল-তাবোল বলেচে।'

'আবোল-তাবোল! কী আবোল-তাবোল? ঝড়বাদলার আবোল-তাবোল?'

মোহন চিন্তিত মুখে বলল, 'না, ঝড়বাদলা নয়।ফালতু সব কথা। মাতলামি করেচে। বলেচে ওর মেয়ে নাকি আগুনের খবর পায়, মাইতিদের গোডাউনে আগুন লাগবে সে-কথা নাকি আগেই জানত। কবে বাড়ির সামনে গাছ ভেঙেছে, তাও নাকি বলে রেখেছিল আগাম।'

কাদু কিছুটা সময় চুপ করে থাকে, তারপর অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'নেতাই এবার তুমি মজা টের পাবে।'

এই ভূতের বাড়ির একটা সুবিধে আছে। গ্রামে যাওয়ার রাস্তা থেকে চট করে বাড়িটা দেখা যায় না। অথচ রাস্তা দেখা যায়। সামনের ছাতিম, গামার আর বুড়ো অশ্বথ গাছ একটা স্থায়ী পর্দা তৈরি করেছে। গুঁড়ি, ডালপালা দিয়ে সে বাড়ি আড়াল করে, কিন্তু পাতার ফাঁক দিয়ে পথ দেখায়। কাদু ঘুরে তাকাল মোহনের দিকে। তারপর গলা একেবারে নীচে নামিয়ে বলল, 'মোহন, ওই ফুল আমাদের প্রথম কারবার হবে। বুধিয়া ছোটোই চেয়েচে। ফেরেস মাল।'

মুখই বলছে মোহন ঘাবড়ে গেছে। আমতা আমতা করে বলল, 'প্রথমেই

boierpathshala.blogspot.com

নিজেদের গ্রাম দিয়ে শুরু করবে কাদুদা? গোলমাল লাগলে কিন্তু সমস্যা।'

'কীসের সমস্যা? নেতা পকেটে, পুলিশ পকেটে, টাকাও পকেটে। এই দ্যাখো টাকা। আর ওই টেবিল, টেবিলের ড্রয়ারে কী আছে তুই জানিস না? তাহলে? ঘাবড়াছিস কেন? আজই অপারেশন।'

'আজ রাতে?' মুহূর্তের জন্য মোহনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মেয়ে চুরির কাজ তার এই প্রথম।

'হ্যাঁ, আজ রাতে। আর দেরি নয়। টাকা নেওয়া হয়ে গেচে। তা ছাড়া কাল না পরশু পুন্যিমে শুভদিন। আজ রাত বারোটার পর জিনিস বুধিয়ার হাতে তুলে দেব। মন দিয়ে শোন মোহন, তুই বিকেলেই ওই মেয়ের বাপের সঙ্গে দেখা করবি। আমার নাম করে বলবি, এখন থেকে তোমার মেয়ের সব দায়িত্ব দাদার। কলকাতায় নিয়ে তার চিকিচ্ছে হবে। আমাদের লোক কাল কাকভোরে কলকাতায় যাবে। তুমি মেয়েকে রেডি করে রেখো, সন্ধের পর লোক এসে নিয়ে যাবে।'

মোহন ভুরু কুঁচকে বলল, 'এত সহজে রাজি হবে?'

কাদু শান্ত গলায় বলল, 'না, রাজি হবে না। তখন বলবি, আমরা জানতে পেরেচি তোমার মেয়েকে ভূতে পেয়েছে। সে ঝড়বাদলার খবর বলে, আগুনের কথা বলে। গাচ পড়বার আগে গাচ তাকে কানে কানে এসে বলে যায়, এবার আমি পড়ব। পাগলামির সব কথা আমরা জানতে পেরেচি। হয় মেয়েকে চিকিচ্ছের জন্য কলকাতায় যেতে দাও, নইলে কাল সকালেই কালিপদ ওঝাকে ডেকে এনে তোমার মেয়ের চিকিচ্ছে হবে। ঝিলডাঙার মানুষকে ভূতে ধরবে আর দাদা চুপ করে বসে থাকবে তা হবে না। সেইসঙ্গে হারাধনের কথাটা মনে করিয়ে দিবি। বলবি চিন্তার কিছু নেই তুমি যদি কলকাতার চিকিচ্ছে না চাও, তাহলে মেয়েকে ওঝার চিকিচ্ছেই করাবে। বাজারের মাঝখানে নেংটা চিকিচ্ছে। এখন দ্যাখো ভেবে কোনটা তোমার পছন্দ।'

একটু থামল কাদু। বলল, 'দেখবি, তোর ওই নেতাই হারামজাদা এবার রাজি হয়ে যাবে। তখন হেসে হাতে টাকা দিবি। পারবি না?

মোহন আমতা আমতা করে বলল, 'পারব।'

মোহন মোটরবাইক নিয়ে বেরিয়ে যেতে কাদু দেখল আকাশে ঘোলাটে রং ধরেছে। মেঘ জমল নাকি? এবার বুধিয়াকে একটা খবর দিতে হবে। এসে নিজের চোখে জিনিস দেখে যাক। ব্যবসার একটা নিয়ম আছে। পয়লা জিনিস খারাপ দিতে নেই।

boierpathshala.blogspot.com

তিপ্পান্ন

বানেরহাট ছাড়তেই সন্ধে হয়ে গেছে।

অনন্ত গাড়ি জোরেই চালাচ্ছে। তবে খুব জোরে চালাচ্ছে না। রাস্তা খুব জোরে গাড়ি চালানোর মতো নয়। বড়ো খানাখন্দ না থাকলেও, মসৃণও নয়। দু-পাশে যতখানি দেখা যায় মাঠ, খেত, কাছে দূরে এলোমেলো গাছপালা। কথাকলির হঠাৎ নজরে পড়ল, আকাশে মাঝেমধ্যে বিদ্যুতের ঝলক দিয়ে উঠছে। কোথাও বৃষ্টি পড়ছে কি? হয়তো তাই। হাওয়াটা ঠান্ডা।

কী অদ্ভুত ঘটনা! ক-দিন আগে যে-মানুষটার জন্য থানাপুলিশ করবে ভাবছিল, আজ তার সঙ্গেই এক গাড়িতে চলেছে! এরকমও হয়! ফুল নামের অচেনা, আশ্চর্য মেয়েটা নাকি প্রকৃতির কাছ থেকে বিপদের খবর আগাম জানতে পারে, মানুষের আনন্দের খবর কি জানতে পারে? কেউ কি পারে? মনে হয় না পারে। পারলে আনন্দ এত সুন্দর হত না। অনেকদিন পর ব্রতীনের সঙ্গে যাচ্ছে বলেই কি তার আনন্দ হচ্ছে? হচ্ছে, তবে সবটা তা নয়। সে তার সিদ্ধান্তের কথা ব্রতীনকে জানাবে বলেও নিজেকে অনেকটা নির্ভার মনে হচ্ছে।

কথাকলি জানলার কাচ খানিকটা তুলল। বাবার ঠান্ডা লেগে যাবে।

গঙ্গা বসেছে সামনে, ব্রতীনের পাশে। ব্রতীনকে ডাক্তার সুদর্শন রায় বানেরহাটের পর পিছনে চলে আসতে বলেছিলেন। ব্রতীন রাজি হয়নি। রাজি হয়নি মানে, জেদ দেখিয়েছে এমন নয়, দ্বিধাটুকু বুঝিয়েছে মাত্র। কথাকলি বলেছে, 'থাক বাবা ও যখন কমফর্ট ফিল করেছে, সামনেই বসুক। তা ছাড়া হাঁচি সর্দি ছোঁয়াচে অসুখ।'

ব্রতীন নার্ভাস গলায় বলে, 'আমার কমে গেছে।'

boierpathshala.blogspot.com

সুদর্শন রায় মেয়েকে বললেন, 'তুই আবার বাড়াবাড়ি করছিস কথা। কী এমন হয়েছে ওর?'

কথাকলি অন্যদিকে তাকিয়ে ব্রতীনকে উদ্দেশ করে বলল, 'যার ঠান্ডা লেগেছে, তার জানলার কাচ তুলে বসাই উচিত।'

ব্রতীন আরও নার্ভাস হয়ে যায়। কাচ তুলতে তুলতে বলে, 'না না, আমার কমে গেছে।'

কথাটা বলে পর-পর দু-বার হাঁচে ব্রতীন। কথাকলি গম্ভীর গলায় বলে, 'কমে যে গেছে সে তো বুঝতেই পারছি।'

ব্রতীন বোকার মতো হেসে বলে, 'আদা দেওয়া চা খেলে আরাম হত।'

কথাকলি মুখ টিপে হাসে। বলে, 'সরি, ফ্লাস্কের ভাঁড়ার শেষ। তা ছাড়া বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে সর্দিকাশির সংবাদ জানা থাকলে আদা চায়ের ব্যবস্থা করে রাখতাম।'

কথাকলির মনে হল, ব্রতীনকে সিদ্ধান্তের কথা জানানোর আগে সে ইচ্ছে করেই খানিকটা সহজ হতে চাইছে। হালকা কথা বলছে।

যতক্ষণ বাইরের আলো পেয়েছেন, ডাক্তার রায় বই উলটেছেন। এখন তাকিয়ে আছেন বাইরে। এদিকটায় রাস্তাঘাট ভালো না হলেও খেত, মাঠ, আকাশ ভালো। দেখতে চমৎকার লাগছে। তা ছাড়া কলকাতার ধুলো ময়লা ছাড়িয়ে বেরিয়ে এলেই মনটা ভালো হয়ে যায়। এর জন্য বড়ো ধরনের আয়োজন লাগে না। এই যে এতদিন তিনি বানেরহাটে ক্লিনিক করেছেন তার পিছনেও শহর ছেড়ে পালিয়ে আসার একটা টান কি ছিল না? নিশ্চয় ছিল। ব্রতীনকে ধরে আনায় মেয়ের ওপর খুশি হয়েছেন ডাক্তার রায়। কথা জোর না করলে ব্রতীন আসত না। এই ছেলের ওপর মেয়েটার এখনও জোর আছে এটা দেখে ভালো লাগছে। ব্রতীনের সঙ্গ ভালো। পড়াশোনা করা ছেলে। জামাই হিসেবে কেমন ছিল সেটা অন্য কথা, তবে ছাত্র হিসেবে যেটুকু দেখেছেন তাতেই পছন্দ করার মতো। কিন্তু তার থেকেও সুদর্শন রায় এই মুহূর্তে অনেক বেশি তৃপ্ত ব্রতীনের সঙ্গে মেয়ের সহজ ব্যবহারে। যদিও সেই খুশি প্রকাশ করার মতো সময় এখন নয়। তিনি একই সঙ্গে অন্যমনস্ক এবং চিন্তিত। তাঁর বারবার মনে হচ্ছে, কোথাও বড়ো কোনো গোলমাল ঘটে যাচ্ছে। বানেরহাট ছাড়ানোর আগে ফিল্ম পার্টির সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। যে-গেস্টহাউসে দলটা ছিল সেখানে গঙ্গাকে পাঠিয়েছিলেন। খুব লাভ হয়নি। কেউ তেমন কিছু বলতে পারেনি। গেস্টহাউসের দায়োয়ান জানিয়েছে, দলে একটা কমবয়সি সুন্দরী মেয়ে

boierpathshala.blogspot.com

আছে। বর্ণনা শুনে মনে হয়েছে, চটুল ধরনের মেয়ে। দারোয়ানকে একশো টাকার নোট দিয়ে দু-প্যাকেট সিগারেট কিনতে পাঠিয়েছিল। ফেরত টাকা নেয়নি। টিপ্‌স হিসেবে হাত নেড়ে দেয়। শুধুমাত্র এইটুকু তথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে কোনো কিছু ধারণা করা যায় না।

সুদর্শনবাবু সামনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গঙ্গা, আর কতটা?'

'মনে হচ্ছে, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে খালের ধারে পৌঁছে যাব ডাক্তারবাবু। তারপর গাড়ি রেখে বাঁশের সেতু পেরিয়ে মিনিট কুড়ির হাঁটা। তা ছাড়া দিনের বেলা হলে একটা কথা ছিল। রাতে সময় বেশি লাগবে।'

কথাকলি বলল, 'হাঁটতে হবে কেন? অন্য কিছু নেই? রিকশা-টিকশা?'

'শুনেছি ভ্যান রিকশা থাকে, তবে সবসময়ে পাওয়া যায় না। বাইরে লোকজনের তো যাতায়াত বেশি নেই ওখানে। অজ গাঁয়ে কে যাবে বলুন দিদি?'

ডাক্তার রায় বললেন, 'একটু আগে রাস্তার পাশে যে-গাড়িটা খারাপ হয়ে পড়ে আছে দেখলাম, ওটা কি সেই শ্যুটিং পার্টির?'

গঙ্গা বলল, 'হতে পারে। বানেরহাটে আমি নিজে গাড়ি দেখিনি। তবে শুনেছি বড়ো গাড়ি, কালো কাঁচ। এটাও তাই দেখলাম। তখন একবার নেমে জিজ্ঞেস করলে হত। কিন্তু গাড়ি খারাপ হলে অতগুলো লোক গেলই-বা কোথায়?'

ডাক্তার রায় খানিকটা নিজের মনেই বললেন, 'যেখানেই যাক ঝিলডাঙায় যেতে না পারলেই ভালো। ওরা গেলে একটা হইচই পড়ে যাবে। হেঁটে যায়নি তো? ওই মেয়ের বাবা যেন বলেছিল, ঝোপজঙ্গলের ভেতর একটা শর্টকাট আছে।'

গঙ্গা বলল, 'থাকতে পারে, আমি জানি না।'

শ্যুটিং পার্টির কথা সকালে শোনবার পর থেকেই কথাকলির কেমন একটা ক্ষীণ সন্দেহ হচ্ছিল। সোমনাথ নয় তো? এই সন্দেহের কোনো অর্থ নেই। বহু শ্যুটিং টিম প্রতিদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাই যে টিভির হবে এমনটাও নয়। সিনেমারও হতে পারে। তা ছাড়া সরকারি -বেসরকারি কত ডকুমেন্টারির কাজ হচ্ছে। তার এক পরিচিত ছেলে কিছুদিন ওই কাজ করেছে। সরকারের কাজ। একইসঙ্গে প্রোডাকশন অ্যাসিসটেন্ট-কাম-রিসার্চার ছিল। পরিবার-পরিকল্পনা থেকে শুরু করে পানীয় জল, ফুলের চাষ, যৌন রোগ, মাদক প্রতিরোধ, মাদুর শিল্প—কী না করতে হত। হাতে ফাইল, কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে বছরে তিনবার করে ছুটত লোকলস্কর নিয়ে। বিস্তর খাটাখাটনি করে ছবি তোলা হত। তবে

boierpathshala.blogspot.com

শেষপর্যন্ত কাজের কাজ কিছু হত না। যত্ন করে বানানো সেইসব ডকুমেন্টারি কেউ কোনোদিন দেখেছে বলে শোনা যায়নি। ডাঁই করে সল্টলেকের সাজানো গোছানো অফিসে পড়ে আছে। যে-গোডাউনে থাকে সেখানে নাকি বৃষ্টির জলও ঢোকে। মনে হয় ছবি ধুয়ে ফেলার জন্যই এই ব্যবস্থা। কথাকলি অবাক হয়ে গিয়েছিল। এত পরিশ্রম, এত টাকাপয়সা সব জলে! ছেলেটি বলেছিল, 'দুর, ওসব কি আর মানুষকে দেখানোর জন্য করা হয় কথাকলিদি? চেনাজানা লোককে পয়সা পাইয়ে দেওয়ার ছক। বড়ো র‍্যাকেট কাজ করে। কমিশন দিয়ে কাজ পেতে হয়। আমাদের কী? পকেট ভরলেই হল।'

কথাকলি বলেছিল, 'তাহলে এত যত্ন করে কাজ কর কেন?'

'যত্ন আর করি কই। দশদিনের জিনিস তিনদিনে তুলতে হয়। কস্টিং থেকে পয়সা বাঁচাতে হবে না?'

এই ফিল্ম পার্টিও সেরকম কিছু নয় তো? হলে ভালো। আশ্চর্য মেয়েকে নিয়েই কাজ করুক আর সেচের জল নিয়েই করুক, থাকবে তো সেই বস্তাবন্দি হয়েই। অন্য কিছু হলেই চিন্তা। সেই চিন্তা থেকেই সোমনাথের কথা মনে এসেছিল। বাবাকে কিছু বলেনি কথাকলি। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছে। এই গাড়ি মল্লিক টিভির নয়। ইচ্ছে করলে সোমনাথকে মোবাইলে ধরতে পারে। ধরবে না। ওরা যখন জায়গাটা বলতে চায় না নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। কর্মক্ষেত্রে অনধিকার কৌতূহল চলে না। তা ছাড়া অন্য চ্যানেলের সঙ্গে এখন হাড্ডাহাড্ডি কম্পিটশন। গেম শো-ই হোক আর সিরিয়াল, টেলিফিল্মই হোক, কনসেপ্ট গোপন রাখা এখন একটা জরুরি ব্যাপার। কেউ কারুরটা জানতে পারবে না।

গাড়ি ছুটছে। মোটামুটি সবাই চুপ। সুদর্শন রায় একসময় বললেন, 'ব্রতীন, তুমি কি জানো বেশিরভাগ পিঁপড়ের কামড়েই বিষ থাকে?'

ব্রতীন প্রথমটায় এই প্রশ্ন শুনতে পায় না। পাওয়ার কথাও নয়। সে খানিকটা হতভম্বের মতোই হয়ে রয়েছে। এখনও এই যাত্রার বিষয়টা তার পুরো বিশ্বাস হচ্ছে না। সত্যি সে কথাকলিদের সঙ্গে যাচ্ছে তো? তার কোনো দোষ নেই। সামান্য সানগ্লাস দিতে এসে এরকম বড়ো একটা ঘটনা ঘটলে পুরোটা বিশ্বাস করাও কঠিন। যে-কথাকলি তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিল, সে-ই আবার গাড়িতে তুলেছে! তোলবার আগে চাপা গলায় বলছে, 'ওই যে বাবা আসছে, নাও তাড়াতাড়ি গাড়িতে ওঠো দেখি। তোমার সঙ্গে জরুরি একটা কথা আছে।' কলকাতা থেকে এতদূর চলে আসা হয়েছে, কিন্তু সেই জরুরি কথা

boierpathshala.blogspot.com

এখনও হয়নি। গাড়িতে উঠতে গিয়ে ডাক্তার রায় ব্রতীনকে দেখে প্রথমটায় চমকে ওঠেন। তারপরই মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বড় করে হাসেন। মেয়ের খুশিতে বাবার থেকে খুশি বোধহয় আর কেউ হয় না। কিন্তু মেয়ে কি সত্যি খুশি হয়েছে? কথাকলির জরুরি কথা সম্পর্কে ব্রতীন অল্প অল্প আঁচ করতে পারছে। সমস্যা হল, বাস্তব ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই সে যা ভাবে তা ঘটে না। তবু আজ কেন জানি মনে হচ্ছে, সে যা ভাবছে তাই বলবে কলি। তবে সময় লাগবে। অন্তত সাতটা দিন তো দরকার। ঘরদোরের যা অবস্থা তাতে লোক লাগিয়ে ঝাড়পোঁচ করতে হবে। বাইরে চলে যাওয়ার অফারটা এখনও রয়েছে। মনে হয় সেটাই অ্যাকসেপ্ট করা উচিত। নতুন ভাবে শুরু করতে গেলে সবটাই পালটে ফেলা ভালো। জীবনযাপন যেমন মনের ওপর প্রভাব ফেলে, জায়গাও ফেলে। কলি কি কাজ ছাড়তে রাজি হবে?

ডাক্তার রায় আবার বিষের কথা তুললেন।

'পিঁপড়েদের বিষের প্রধান কেমিক্যাল হল ফর্মিক অ্যাসিড। মারাত্মক জিনিস।'

ব্রতীন খানিকটা চমকেই সম্বিত ফেরাল। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'পিঁপড়ের বিষে মানুষ কি মারা যায়?'

খানিকটা খানিকটা মনে মনেই বললেন, 'মারা যায় কিনা জানি না, তবে হাসপাতাল পর্যন্ত যেতে হয় তো বটেই। অস্ট্রেলিয়ায় এক ধরনের ভয়ংকর পিঁপড়ে আছে। জ্যাক জাম্পার। নাম শুনেছ? জ্যাক জাম্পারের কামড়ে প্রতি বছর বহু মানুষকে চিকিৎসা করাতে হয়। সাউথ আমেরিকার বুলেট পিঁপড়েরা সবথেকে পয়েজনাস। মানুষ এদের এড়িয়ে চলে। শুধু বিষ নয়, কোনো কোনো পিঁপড়ের কামড়াবার কায়দাও ভয়ংকর। আমাজনের জঙ্গলে বুরচেল্লি বলে এক ধরনের পিঁপড়েদের স্টিং বড়শির মতো বাঁকানো। একবার কামড়ালে সেই হুল এরা আর বের করতে পারে না। তখন এদের মেরে ফেলে বের করতে হয়।'

কথাকলি চোখমুখ কুঁচকে বলল, 'ইস, মাগো, বাবা তুমি থামবে?'

'অদ্ভুত কথা কী জানিস কলি, পিঁপড়ে তার অসহায় অবস্থার কথা অন্য পিঁপড়েদের জানাতে পারে। ভাব বিনিময়ের মতো এই সময়ও তারা নিজেদের শরীর থেকে ফেরোমেন বের করে। ক্ষুধার্ত, আহত, মুমূর্ষুদের জন্য আলাদা আলাদা ফেরোমেন। আলাদা আলাদা গন্ধ। সেই গন্ধ শুঁকে অন্যরা বুঝতে পারে।'

ব্রতীন বলল, 'মানুষ সেই গন্ধ পায় না?'

boierpathshala.blogspot.com

ডাক্তার রায় হাসলেন। কথাকলি এই বোকার মতো প্রশ্নে খুবই বিরক্ত হল। বলল, 'হ্যাঁ পায়, গোপালের মা পায় আর তুমি পাও। তবে এখন পাবে না। কারণ এখন তোমার সর্দি হয়েছে।'

সুদর্শন রায় খানিকটা গাঢ় গলায় বললেন, 'সত্যি যদি মানুষের এরকম ক্ষমতা থাকত তাহলে হয়তো ভালোই হত। একজন বিপদে পড়লে বাকিরা সবাই জানতে পারত।'

কথাকলি হেসে বলল, 'জেনে কী হত? সবাই ছুটত?'

সুদর্শন রায় গলা নামিয়ে বললেন, 'সবাই ছুটত কিনা জানি না, কেউ কেউ তো যেত। অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—আরও এক বিপন্ন বিস্ময়ও তো আমাদের কারও কারও রক্তের ভিতর এখনও খেলা করে। সেই খেলার অমোঘ টানকে সব মানুষ অবজ্ঞা করতে পারে না রে কলি।'

'তুমিও কি পারছ না বাবা?'

'কে জানে হয়তো পারছি না। ওই মেয়েটা আমাকে টানছে।'

গঙ্গা মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'ডাক্তারবাবু আপনি কি মনে করছেন ফুল কোনো বিপদে পড়েছে?'

সুদর্শন রায় বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ভারী গলায় বললেন, 'জানি না। পড়লে আশ্চর্য হব না। পৃথিবীটাই এরকমই। জীবজগৎ তার নির্দিষ্ট, অভ্যস্ত গণ্ডি পছন্দ করে। গণ্ডির বাইরে কাউকে দেখলে প্রকৃতি তাকে নিজের পরিমণ্ডল থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চায়। সেই প্রকৃতি কখনও পাহাড়, জঙ্গল, নদীনালা হয়ে আসে, কখনও সমাজ, সংসার, রাষ্ট্রর চেহারা নিয়ে দেখা দেয়। গণ্ডির বাইরে চলে যাওয়ার কষ্ট অনেক। যে যায় সে-ই কেবল এই কষ্ট বুঝতে পারে। বেচারি নিজের দোষ বুঝতে পারে না। শুধু ভাবে, আমি কেন অন্যদের মতো নই? আমি কেন আলাদা? পরগাছার মতো সে সবাইকে জড়িয়ে মিনতি করে, দোহাই তোমাদের, দোহাই আমাকে একটু জায়গা দাও। সকলের মাঝখানে আমাকে একটু থাকতে দাও। তার মধ্যে আমরা, মানুষরা হলাম সবথেকে বেশি নিষ্ঠুর। আমরা গণ্ডির বাইরে কাউকে জায়গা দিই না। রাজার কথা না মানার অপরাধে বিদ্রোহীকে শূলে চড়াতে আমাদের হাত কাঁপে না, সত্য প্রকাশের কারণে বৈজ্ঞানিককে গিলোটিনে পাঠাই, কবিকে মরতে হয় ট্রামের তলায়, উন্মাদকে বেঁধে রাখি শিকল দিয়ে। তার অপরাধ একটাই, সে কেন আমাদের মতো নয়।'

কথাকলি বাবার হাতের ওপর হাত রাখে। সুদর্শন রায় চুপ করেন। ব্রতীন নীচু গলায় বলে, 'ওই ফুল মেয়েটিও কি এরকমই কেউ? গণ্ডির বাইরের

boierpathshala.blogspot.com

মানুষ?'

সুদর্শন রায় ফিসফিস করে বলেন, 'আমি জানি না। আমি জানতে চাই।'

গঙ্গা অপরাধীর গলায় বলে, 'আমার খুব খারাপ লাগছে। আমার কবিতার জন্যই মেয়েটা বিপদে পড়ল। জানাজানি হয়ে গেল। মনে হচ্ছে, ছড়াটা না লিখলেই হত।'

সুদশর্নবাবু সামান্য হেসে বললেন, 'বিপদে পড়েছেই এমনটা বলা যায় না গঙ্গা। তবে তুমি না জানালেও এই মেয়ে বিপদ এড়াতে পারত না। প্রকৃতির নিয়মেই তাকে সমস্যায় পড়তে হত। একটা না একটা সময়ে প্রকৃতি তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করতই। আসলে কী জানো ব্রতীন, এক ভয়ংকর বিপজ্জনক সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা সকলেই চলেছি। কেউ সেটা বুঝতে পারছি, কেউ পারছি না, কেউ আবার বুঝেও এড়িয়ে থাকছি। ভাবছি, উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে কাটিয়ে দেব। আমি খুব নিঃসন্দিহান নই, তবু মনে হয় অর্থনীতির জটিল আবর্ত থেকে এই বিপদ উঠে আসছে। প্রকৃতি এ-জিনিসও সহ্য করবে না। আমাদেরও ঠেলে সরিয়ে দেবে।'

কথাকলি তার বাবার পুরো কথাটা বুঝতে পারল না। বরং একটু অবাকই হল। হালকা গলায় বলল, 'বাবা, তুমি দেখছি মানুষের মন ছেড়ে এবার টাকা-পয়সার মধ্যে ঢুকে গেছ!'

ডাক্তার রায় মৃদু বললেন, 'আগে বুঝতাম না, এখন বুঝি সবটাই রিলেটেড। একে অপরকে জড়িয়ে রাখে।'

ইঞ্জিনে জল দিতে রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়েছে অনন্ত। গাড়িটা একটু ঠান্ডা করাও প্রয়োজন। এত লম্বা ড্রাইভে এই গাড়ি অভ্যস্ত নয়। ডাক্তার রায় ছাড়া সবাই নেমেছে। গঙ্গা নেমে দাঁড়িয়েছে অনন্তর পাশে। টুকটাক সাহায্য করছে। কথাকলি ডাক্তার রায়কে বলেছিল, 'বাবা, একটু নামবে?'

সুদর্শনবাবু গাড়ির ভেতরের আলো জ্বেলে ফের বই খুলে বসলেন। বললেন, 'না, থাক। আমি ঠিক আছি।'

আলোর রেশ সরিয়ে দিয়ে অন্ধকার নেমেছে পিচের রাস্তায়। দু-একটা করে গাড়ি, লরি হেডলাইট জ্বালিয়ে ছুটে যাচ্ছে। সংখ্যায় কম। এ-পথে গাড়ি চলাচল সামান্য। অনেকক্ষণ একইভাবে বসে থাকার পর পা ছাড়ানোর জন্য কয়েক পা সরে এসেছে কথাকলি। খানিকটা দূরে, রাস্তার ওপাশে একটা দোকানে টিমটিম করে আলো জ্বলছে। কথাকলি ব্রতীনের দিকে ফিরে বলল, 'চলো, ওখানে চা পাওয়া যায় কিনা দেখি। আদা পেলে তো খুব ভালো। তোমার সর্দি-

boierpathshala.blogspot.com

কাশির একটা ট্রিটমেন্ট হবে।'

রাস্তার পাশ ধরে কয়েক পা হেঁটে যাওয়ার পর ব্রতীন নীচু গলায় বলল, 'স্যারের জন্য খারাপ লাগছে। উনি মেয়েটার জন্য চিন্তা করছেন খুব।'

কথাকলি আনমনে বলল, 'প্রথমটায় আমি বাবার বাড়াবাড়ি ভাবতাম। গ্রামে কতরকমের কুসংস্কার, অলৌকিক কাণ্ড হয়। যতটা না হয় তার থেকে বেশি গুজবও ছড়ায়। কিন্তু পরে মনে হয়েছে, বাবার দুশ্চিন্তার নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। একজন ডাক্তার একটা অলৌকিক ঘটনাকে এতটা গুরুত্ব দেবেনই-বা কেন? তাঁর লজিকাল সেন্স তো নষ্ট হয়ে যায়নি। হয়তো ঘটনাটা পুরো অলৌকিকও নয়। বাচ্চা মেয়েটার সত্যিই হয়তো কিছু ক্ষমতা আছে। শি ক্যান স্মেল সামথিং। আর এখন আমি নিজেই ফুল নামের ওই মেয়েটার সঙ্গে ইনভল্‌ভ্‌ড হয়ে পড়েছি। মিথ্যে হলেও মেয়েটাকে ভালোবেসে ফেলেছি। বাবার কথার মতো, সে আমাকেও টানছে।'

ব্রতীন মাথা নামিয়ে বলল, 'ভাগ্যিস তুমি আমাকে নিয়ে এলে কথা। মনে হচ্ছে, ওই মেয়েটার কাছে আমাদের সকলেরই পৌঁছনো দরকার। সত্যি মিথ্যে যা-ই হোক।'

খানিকটা চুপ করে হাঁটল দুজনে। রাস্তা পার হল। কথাকলি বলল, 'এবার তোমাকে কথাটা বলব?'

ব্রতীন চমকে উঠে বলল, 'কোন কথা?'

অন্ধকারেই ঠোঁটের ফাঁকে হাসল কথাকলি। এই মানুষটাও আসলে বাবার সেই গণ্ডির বাইরের মানুষ। সমাজসংসার একে রাখতে চায় না। সেই কারণেই একদিন গভীর মায়ায় পড়ে গিয়েছিল সে। বিয়ে করেছিল। সংসার বেঁধেছিল।

কথাকলি মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে মনকে শক্ত করল যেন। বলল, 'কথাগুলো কলকাতাতেই বলা যেত। চিঠি লিখে বা টেলিফোন করেও বলতে পারতম। আসলে তোমার সঙ্গে খানিকটা পথ চলার লোভ সামলাতে পারলাম না।'

ব্রতীন কিছু একটা বলতে যায়। কথাকলি হাত তুলে থামায়। বলে, 'সময় অল্প। কথাটাও ছোটো। আমাকে শেষ করতে দাও।'

'বলো।'

বড়ো করে শ্বাস নিয়ে কথাকলি বলল, 'তোমার সঙ্গে এই দ্বিতীয় পর্যায়ে যোগাযোগের পর আমি একটা জিনিস নতুন করে আবিষ্কার করেছি ব্রতীন। আমি দেখেছি, ছেড়ে চলে এলেও আসলে আমি তোমাকে ভালোইবাসি। সেই

boierpathshala.blogspot.com

ভালোবাসা একটু-আধটু নয়, সেই ভালোবাসা বেশ তীব্র। হয়তো তীব্র রাগ বা ঘৃণা থেকেই এবার তা জন্ম নিয়েছে। যাই হোক, সেই ভালোবাসা মাঝরাতে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। দিনের বেলায় মন কেমন করায়। বিচ্ছেদের পরও যদি একটা মেয়ে কোনো পুরুষ সম্পর্কে নতুন করে এই উপলব্ধিতে পৌঁছতে পারে তাহলে সেটা সহজ কথা নয়। একে রক্ষা করতে আমি বাধ্য। তাই না?'

ব্রতীন ফিসফিস করে বলে, 'কথা...কথা...আমি জানতাম, বিশ্বাস করো, গত কয়েকটা দিন ধরে আমি এটাই তোমাকে বলবার চেষ্টা করেছি। এসো আমরা আবার শুরু করি।'

কথাকলি দাঁড়িয়ে পড়ে। ব্রতীনের অন্ধকার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'না ব্রতীন। আমরা আর শুরু করব না। যে-ভালোবাসার স্বাদ আমি নতুন করে পেয়েছি, প্লিজ তাকে আর হারাতে বোলো না। আমি হারাতে দেব না। এই ভালো। মাঝে মাঝে যদি দেখা হয় ভালো, না হলেও কোনো অসুবিধে নেই। বরং এসো দূরে দূরে থাকি আমরা। দূরে থেকে কাছে আসার ইচ্ছেটাকে আরও জোরালো ভাবে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করি। তুমি যদি পারো কলকাতা থেকে অন্য কোথাও গিয়ে কাজকর্ম নাও। দু-একদিনের ছুটিছাটায় আমি চলে যাব সেখানে। পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকব সারাদিন, তুমি যত্ন করবে। গাদাখানেক চিনি দিয়ে চা করে আনবে, রান্নায় নুন দিতে ভুলে যাবে। সে ভারি মজার হবে। দু-দিন হইচই এবং চুপ করে থেকে আমি যখন দেখব ফিরতে ইচ্ছে করছে না তখন এক ছুটে পালিয়ে আসব। তোমার জন্য মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াব। কেমন হবে? ভালো না?'

ব্রতীন কিছু একটা বলতে চাইল। কথাকলি দীর্ঘশ্বাস গোপন করে হেসে বলে, 'চলো ফিরে যাই, বাবা চিন্তা করবে।'

boierpathshala.blogspot.com

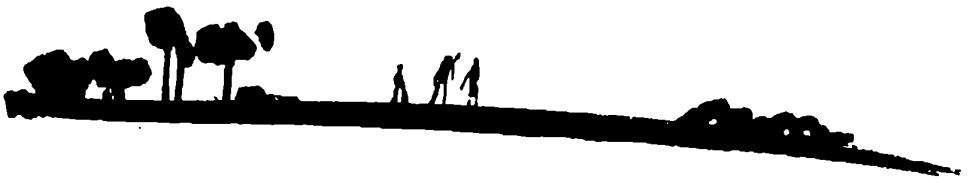

সাঁবুইতে এসে ওদের দেখতে পেল শোল।

গ্রামে ঢোকার ঠিক মুখের চায়ের দোকানে পুরো দলটাই বসে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

সোমনাথের হাতে চায়ের কাপ। মুখে বিরক্তি আর উদ্‌বেগ। বিরক্তি, উদ্‌বেগের অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে মূল কারণ হল সময়। সময়ের যেভাবে গোলমাল হয়ে গেল তাতে আজ আর কোনো কাজ হবে না। একটু আগে অর্জুন জিজ্ঞেস করে, 'কাজটা কী?'

সোমনাথ তাকে কিছু না ভেবেই বলেছে, 'একটা ছোটো মেয়ের ইন্টারভিউ।'

'ছোটো মেয়ের ইন্টারভিউ! কীসের ওপর? চাইল্ড লেবার? নাকি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে? এখন নতুন স্টাইল হয়েছে গরিব ঘরে ছেলেমেয়েরা ফার্স্ট-টার্স্ট হলেই ফটাফট ইন্টারভিউ। যেন আগে গরিব ছেলেমেয়েরা সব পরীক্ষায় ফেল মারত।'

সোমনাথ বিরক্ত গলায় বলে, 'তোমার জেনে কী হবে? তোমার ক্যামেরা কি বিষয় বুঝে ছবি তোলে? যেখানে বুঝতে হবে আমি বলে দেব। সে ফার্স্টই হোক আর লাস্টই হোক।'

'সোমনাথদা, আপনি আমার ওপর মিছিমিছি রাগ করছেন। ডাব আর কচুরি কিনতে গিয়ে দেরি আমি করিনি। দেরি করেছে বেটু। ব্যাটা তখন কোথায় যে ভ্যানিশ হয়ে গেল। হারামজাদা বলল কচুরির দোকান খুঁজতে গিয়েছিল। আমি বললাম, ওরা মালপত্র নিয়ে বসে আছে। পাত্তা দিল না।'

boierpathshala.blogspot.com

মুখে যতই রাগ দেখায়, দেরি করায় সোমনাথ খুশি হয়েছে। অর্জুন আর বেটু ফিরে গিয়ে মোমের স্নান দৃশ্য দেখতে পেলে বড়ো ধরনের কেলেঙ্কারি হত। কলকাতা ছেড়ে পালাতে হত সোমনাথকে।

পুকুর থেকে জল-ঝরা-গায়ে উঠতে উঠতে মোম বলেছিল, 'সোমনাথদা, চোখ বোজ। চোখ বোজ। ওয়ান, টু থ্রি...হি হি।'

সোমনাথ চোখ বোজার আগেই সেই মেয়ে জল ছেড়ে বুক পর্যন্ত উঠে আসে। হাত দুটো কোণাকুণিভাবে দুই কাঁধে রাখা। বুক ঢাকার মিথ্যে চেষ্টা। মোমের এই কাণ্ডে সোমনাথ যতটা না রাগ করেছে তার থেকে অনেক বেশি হতভম্ব হয়েছে। তোয়ালে জড়িয়ে মোম গাছের আড়ালে চলে যায় ধীর পায়ে। ফিরে এসে খুব স্বাভাবিক গলায় বলে, 'রাগ করলে সোমনাথদা?'

সোমনাথ মুখ নামিয়ে বিরক্ত গলায় বলে, 'এটা ঠিক করলে না মোম। তুমি নিশ্চয় জানো আমি এখনকার অনেক প্রোডিউসার, ডিরেক্টরের মতো নই।'

মোম হাসে। ব্যাগ থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে ঝোলায়। হাত বাড়িয়ে বলে, 'দেশলাইটা দাও তো। লাইটারটা পাচ্ছি না।'

সোমনাথ মুখ না ফিরিয়েই পকেট থেকে দেশলাই বের করে এগিয়ে দেয়। এই মেয়ে যতই ভান করুক কিছু ঘটেনি, স্বাভাবিক হতে তার সময় লাগবে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মোম বলল, 'আসলে কী জানো সোমনাথদা, আমি জানি তুমি কেমন মানুষ। আজ জানি না, আগে থেকেই জানি। তখন আমি অনেক ছোটো। তবে ওই বয়েসেই মেয়েরা চট করে পুরুষমানুষকে পড়ে নিতে পারে। পুরোটা পারে না, কিছুটা পারে। সেদিন তুমিও ঠিক কাজ করোনি।'

সোমনাথ অবাক হয়ে বলে, 'মানে!'

'মানে খুব সহজ। এক কিশোরীর চোখে সেদিন খানিকটা স্বপ্ন মাখিয়ে পালিয়ে যাওয়াটা মোটেই ঠিক কাজ ছিল না। তোমার কি সেই ঘটনা এখন মনে পড়ছে? আশা করি পড়েছে। সেই কারণেই একটা শকের মতো দিলাম।''

সোমনাথ সামান্য বিচলিত বোধ করে। সে ভুরু কুঁচকে তাকায় মোমের চোখের দিকে।

'বাঃ, মনে পড়ছে না! আশ্চর্য যে পরিচয়ের জোরে মল্লিক টিভি প্রোডাকশনের কাজে আমাকে জড়িয়ে নিলে সেটাই এখন মনে পড়ছে না!'

সোমনাথ ঢোঁক গিলে বলে, 'পুরোনো পরিচয়ের কথা বলছ? সে তো ছিলই।'

জলন্ত সিগারেট দূরে ছুড়ে ফেলে মোম।

boierpathshala.blogspot.com

'গুড। এই তো মনে পড়েছে। শক-থেরাপি কাজ করছে।'

'সে তো সামান্য একদিনের আলাপ হয়েছিল।'

মুচকি হেসে মোম বলে, 'সামান্যই বটে। এতই সামান্য যে অভাগা এক গরিব কিশোরী গোটা রাত ঘুমোতে পারেনি। বান্ধবীর বাড়ি গিয়ে ঘুর ঘুর করত যদি আর একবার দেখা হয়।'

সোমনাথ অবাক হয়। ঘটনা এতদূর গড়িয়ে ছিল! সে ভাবতেই পারছে না। বিড়বিড় করে বলে, 'কই, খুকু তো কখনও আমাকে কিছু বলেনি।'

'খুকুকে কি আমি বলেছিলাম নাকি? পাগল হয়েছ? প্রেমের কথা বলার মতো তখন বয়স হয়েছিল না সাহস ছিল? আমি কে তখন? পরের আশ্রয়ে কোনোরকমে আছি। মনের খবর জেনে ফেললে খুকুই হয়তো আমাকে আর কোনোদিন ওর বাড়িতে ঢুকতে দিত না। অবশ্য ওটা যে প্রেম সেটাই ভালো করে বুঝতে পারিনি। তবে পরে বুঝতে পারলাম। তুমি যখন কাজের জন্য আবার ডাকলে।'

কী বলবে সোমনাথ ভালো করে বুঝতে পারল না। নীচু গলায় বলল, 'সরি।'

আওয়াজ করে হেসে উঠল মোম।

'দূর, সরির কী আছে? এরকম তো কতই হয়। কী যেন বলে? ইন-ফ্যাচুয়েশন? অপরিণত বয়েসের আবেগ? নাকি ছোটোবেলার খেলা? তোমার সঙ্গে যোগাযোগের পর আমি ঠিক করেছিলাম, সুযোগ পেলে এই খেলাটা আমি আরও একবার খেলব। তখন মনে মনে নিজেকে তোমার কাছে মেলে ধরে-ছিলাম, এবার সত্যিকারের মেলব।'

সোমনাথ অস্বস্তি নিয়েই বলল, 'এ তোমার বাড়াবাড়ি মোম।'

মোম এ-কথার জবাব দিল না। বলল, 'দু-দিন কথা বলেই বুঝলাম, তুমি এমন একটা মানুষ যাকে শত অনুরোধ উপরোধ করেও বিছানায় টেনে আনা যাবে না। আরও খুশি হলাম। না, সেদিনের ছোট্ট মেয়েটি তাহলে তোমাকে ভুল বোঝেনি। সে যার প্রেমে পড়েছিল সে একজন চমৎকার মানুষ। তাহলে উপায় কী? তোমার সামনে নিজেকে উন্মুক্ত করবার সুযোগ কোথায়? তোমার এই আউটডোর সেই সুযোগ এনে দিল।'

মোম আবার হেসে উঠল।

সোমনাথ দ্রুত নিজেকে বোঝার চেষ্টা করল। এই মেয়ের জন্য তার মনের কোথাও কি একটুও জায়গা ছিল? মনে পড়ছে না। একেবারেই মনে পড়ছে না।

boierpathshala.blogspot.com

তবে এখন যেন একটু খারাপই লাগছে। খারাপ না বলে মায়া বলাই ভালো। এই ধরনের আপাত-চটুল মেয়েও কি ভালোবাসার বিষয়ে এতটা সিরিয়াস হয়? হঠাৎ জামাকাপড় খুলে জলে নেমে যাওয়ায় যে রাগ, বিরক্তি তৈরি হয়েছিল তা যেন কিছুটা স্তিমিত হয়ে গেল সোমনাথের।

'অ্যাই সোমনাথদা, তুমি কি সিরিয়াস হয়ে গেলে নাকি? রাগ কোরো না প্লিজ। অনেকদিন ধরে প্ল্যান করেছিলাম, আমাকে ফেলে চলে যাওয়ার জন্য তোমাকে একটা কঠিন ধরনের শাস্তি দেব। আজ ঘাবড়ে দিয়ে সেই শাস্তি দেওয়া আমার হয়ে গেল। ব্যস, আবার আমি তোমাকে ভুলে যাব, তুমিও ভুলে যাবে। এরপর মল্লিক টিভি প্রোডাকশন আর কোনো প্রজেক্টেই আমাকে পাবে না। ডাবল টাকা দিলেও না।'

সোমনাথ নিজেকে সামলে নিতে নিতে অল্প হাসল। বলল, 'এটা কিন্তু আন্‌প্রফেশনাল কথা হয়ে গেল মোম।'

মোম চুল থেকে জল ঝাঁকিয়ে ফেলতে ফেলতে বলল, 'আন্‌প্রফেশনাল? জীবনের সবটাই কেনাবেচা দিয়ে হিসেব হয় না সোমনাথদা। হলে তোমার মতো একটা হাঁদাকে পৃথার মতো একটা সুন্দর মেয়ে পছন্দ করত?'

সোমনাথ আকাশ থেকে পড়ল। এই মেয়ে তো সত্যি ভয়ংকর!

'তুমি পৃথার খবর জানলে কী করে?'

মোম গলা খুলে হেসে উঠল।

'আজ তো দেখছি তোমার ঘাবড়ানো ডে। আমার কাছে একেবারে নাকানিচোবানি খাচ্ছ। আরে বাবা, শুধু নায়ক নায়িকাদের মিথ্যে ভাব ভালোবাসার খবর জানলেই চলে? ডিরেক্টর সাহেবের সত্যিকারের প্রেমের খবর জানব না? আমাদেরও তো কিছু জাল ছড়ানো থাকে। সেই জালে তোমার মতো মানুষদেরও খবরাখবর ধরা পড়ে । তা ছাড়া জীবনের প্রথম প্রেমিকের ভালোবাসার মানুষটি কেমন না জানলে চলবে কেন?'

সোমনাথ মুখ দিয়ে শ্বাস বের করে বলল, 'উফ্!'

মোম বলল, 'শুধু জানা নয়, পৃথাকে আমি চোখের দেখাও দেখে নিয়েছি। অবশ্যই আড়াল থেকে। আই অ্যাম জেলাস ফর হার। ওই মেয়ে আমাদের লাইনে এলে আমার ভাত মারত। তখন ওকে খুন করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় থাকত না। নো ওয়ে। যে-মেয়ে মনের মানুষকে কেড়েছে সে-ই যদি পেটের ভাত কাড়ত তাহলে খুন না করে উপায় কী বলো?'

গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগল মোম। সোমনাথ একইসঙ্গে বিভ্রান্ত এবং মুগ্ধ।

boierpathshala.blogspot.com

বিভ্রান্ত নিজের ওপর, মুগ্ধ মোমের আচরণে। কত সহজভাবে পৃথাকে মেনে নিয়েছে! মোমের মতো আপাত হালকা, চটুল, মূলত শরীর ও অর্থসর্বস্ব একজন মেয়ের কাছ থেকে এই আচরণ আশাই করা যায় না। পোশাক খোলার পর একজন অচেনা মায়াবী মানুষ হয়ে সে যেমন খানিক আগে সামনে দাঁড়িয়েছিল, এখন যেন সে তার এতদিনের লোভ-লালসার আস্তরণ ফেলে দিয়েছে। দূর থেকে বেটু আর অর্জুনকে আসতে দেখে সোমনাথ দ্রুত সংযত হল।

তারা চলে এসেছে আরও খানিকটা পথ। এগিয়ে এসেছে ঝিলডাঙার দিকে। পথের ধারের চায়ের দোকানে বসেছে দম নিতে।

সোমনাথ অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই আলোতে কী করে কাজ হবে?'

অর্জুন আকাশের দিকে উদাসীনভাবে তাকিয়ে বলল, 'হবে না।'

সোমনাথ নিজেও বুঝতে পারছে, হবে না। প্রথম কথা ওই মেয়েটা আদৌ আছে কী না তার ঠিক নেই। ঝিলডাঙায় পৌঁছে যদি দেখা যায় নেই, তাহলে তো ল্যাঠা চুকে গেল। আর যদি মেয়েটাকে পাওয়া যায় তাহলে আজই একটা চেষ্টা করতে হবে। অন্তত বাড়ির লোককে রাজি করানোর চেষ্টা। যাতে কাল শ্যুটিঙে কোনো অসুবিধে না করে। সেরকম বুঝলে হাতে টাকাও দিতে হবে।

পরের বিষয়টা হল, এখান থেকে ফেরা। তবে মনে হয় না, এটা খুব সমস্যার হবে। আবদুল নিশ্চয় এতক্ষণে বানেরহাটের মেকানিক এনে গাড়ি সারিয়ে ফেলবে। ফেললে এখানে সোজা চলে আসবে। অন্তত ঝিলডাঙার মুখটা পর্যন্ত আসবে।

তবে এই মুহূর্তে সোমনাথের বড়ো চিন্তা মোমকে নিয়ে। এখানে এসে অন্যরা চা খেলেও মোম খেয়েছে ডাব। এখন চায়ের দোকানের বেঞ্চে পায়ের ওপর পা তুলে বসে আবার সিগারেট খাচ্ছে। গায়ে কালো রঙের স্যান্ডো গেঞ্জি, হাঁটুর একটু নীচ পর্যন্ত গিয়ে থমকে গেছে কেপরি প্যান্ট। পুকুর স্নানের পর পোশাক বদলে এটাই পরেছে। গলা, কাঁধ, হাত, পা সবই অনেকটা করে দেখা যাচ্ছে। এমনকি বুকও। মাঝেমধ্যেই গেঞ্জির আশপাশ দিয়ে তারা ঝলসে ঝলসে উঠছে। মানুষ ঘুরে ঘুরে দেখছে। দাঁড়িয়েও পড়েছে। পড়াটাই স্বাভাবিক। পথের মাঝখানে এরকম সুন্দরীর শরীর দেখতে গ্রামের মানুষ এখনও অভ্যস্ত হয়নি। পরে নিশ্চয় হয়ে যাবে। মোম নির্বিকার। সম্ভবত শরীর দেখাতে তার ভালোই লাগছে। স্টারেরা ভিড় চায়। আরও ভিড়ের প্রতিশ্রুতি পেলে সে নিশ্চয় আরও সাহস দেখাবে। সেটা কতখানি? এটাই চিন্তার। একবার সোমনাথ ভেবেছিল,

boierpathshala.blogspot.com

গায়ে কিছু চাপিয়ে নিতে বলবে। শেষপর্যন্ত বলেনি। অনধিকারচর্চা হয়ে যেতে পারে। কে জানে হয়তো, অপমানিত হয়ে বসল। পুকুরঘাটের ঘটনার পর মোম এমন একটা ভান করছে, যেন কিছুই হয়নি। সোমনাথের সঙ্গে তার কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই। থাকলেও চুকেবুকে গেছে। সে একজন পেশাদার আর্টিস্ট। এটা খুবই ভালো। তবু কেন যেন কেউ মোমের শরীর দেখছে এটা ঠিক মেনে নিতে পারছে না সোমনাথ। কেন এমন হচ্ছে? আগে তো হত না! সোমনাথ মুখ ঘুরিয়ে নিল। খানিকটা সরে গিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। আর ঠিক তখনই শোল তার পাশে এসে সাইকেলে ব্রেক কষে।

সোমনাথ অবাক হয়ে তাকাতে বড়ো বড়ো লাল চোখ নিয়ে শোল হেসে বলল, 'দাদা, এখনও এখানে? পোকার ছবি তোলা শেষ?'

এতক্ষণ পরে একজন পরিচিত পেয়ে সোমনাথ ভরসা পেল। কিছু না পারুক, অন্তত ঝিলডাঙার মুখটা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পারবে। সে একগাল হেসে বলে, 'কোথায় ছিলে ভাই?'

'ভাই' শুনে শোল একটু চমকাল। ব্যাপার কী? নিশ্চয় প্যাঁচে পড়েছে। মেয়েছেলেটা কোথায়? বড়ো বড়ো চোখ ঘুরিয়ে শোল আবার হাসল। সাইকেল থেকে নেমে বলল, 'কোথাও যাইনি দাদা, আপনার খোঁজেই পাক মারছিলাম।'

'আমার খোঁজে!'

'হ্যাঁ, ভেবেছিলাম, এতক্ষণে ঝিলডাঙায় ঢুকে যাবেন। ঢোকেননি দেখে চিন্তায় পড়লাম। দিনকাল ভালো না। আগে গাঁয়ের লোকজনকে বিশ্বেস করা যেত, এখন শালারা হারামি হয়ে গেছে। শহরের লোক দেখলে সন্দেহ করে। যাক, আপনার নোটটা বদলে দিন দাদা। নোটে গোলমাল আছে। বড়ো কিছু নয়, তবে গাঁয়ের ব্যাপার তো হারামিগুলো নিতে চায় না।'

কথা শেষ করে শোল শিস দিতে দিতে নিজের প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকায়। মুঠোয় দলা পাকিয়ে গাদাখানেক নোট বের করে । তার মধ্যে থেকে একটা মলিন একশো টাকা বের করে এগিয়ে দেয় সোমনাথের দিকে। এক ঝলক তাকিয়েই সোমনাথ বুঝল, এ নোট তার নয়। সে দেয়নি। তবু এখন কিছু বলা যাবে না। বোকামি হয়ে যাবে। মানিব্যাগ বের করে সে টাকা বদলায়। আর তখনই শোল তার কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে। চাপা গলায় বলে, 'দাদা, পাওয়া গেচে।'

'কী পাওয়া গেছে?'

'ওই যে মেয়ের কথা বলছিলেন না? ওই যে ঝড়জল বলে দেয়? সেই

boierpathshala.blogspot.com

মেয়েকে পাওয়া গেচে।'

সোমনাথ ভুরু কুঁচকে বলল, 'বল কী? পাওয়া গেছে! সত্যি?'

শোল মোমকে দেখতে পেয়েছে। উরিব্বাস! মেয়েছেলেটা পরেছে কী? সবকিছু যে চলকে পড়ছে গো! ওস্তাদ দেখলে মাথা খারাপ করে ফেলবে। আজ মনে হচ্ছে, কেলেঙ্কারি একটা না বাধিয়ে ছাড়বে না। উলটেপালটে বিচ্ছিরি কাণ্ড করবে। যাই হোক, মাল ওস্তাদের হাতের কাছে নিয়ে যেতে পারলেই তার কাজ খতম। বাকিটা শালা নিজে বুঝে নিক। যে ফল খাবে সে ফল আঁকশি দিয়ে পেড়ে খাবে, না গাছে উঠে পাড়বে তার ব্যাপার।

সোমনাথ আবার বলল, 'কী হল? সত্যি পাওয়া গেছে?'

শোল বিরক্তির ভান করে। নোট পকেটে গুঁজতে গুঁজতে বলে, 'সত্যি মিথ্যে আমি জানি না। আমাকে তো আর সেই মেয়ে তার ঝড়জলের গপ্পো বলেনি। আপনি টেস্ট করে নেবেন। খোঁজ চেয়েছিলেন, বলে গেলাম, ব্যস। তবে কেস গড়বড়ের আছে। ঝিলডাঙার কেউ চট করে বলতে চাইবে না। বাইরের লোককে তো নয়ই।'

সোমনাথ এগিয়ে এসে সাইকেলের হাতল ধরে। গলা নামিয়ে বলে, 'আমাকে নিয়ে যেতে পারবে?'

শোল দাঁত বের করে হাসে। বলে, 'কেন? আপনার কী দরকার? ছবি?'

সোমনাথ উত্তেজনায় ঠোঁট চেটে বলে, 'না, এমনি। শুধু দেখব একবার।'

'পারব। তবে এমনি এমনি নয়।'

লোকটা ঠকাচ্ছে না তো? মনে হচ্ছে ঠকাচ্ছে। কিছু করার নেই। একটা ঝুঁকি নিতে হবে। অন্তত ঝিলডাঙায় ঢোকা যাক। সোমনাথ এবার বানিয়ে হাসল। বলল, 'সে নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। আমরা বিনি পয়সায় কাজ করাই না। বলো করাই?'

'না, তা করান না। তবে নোটটা মাইরি এবার দেখে দেবেন। অন্ধকারটা আর একটু জমুক। ঠিক এক ঘণ্টা পর খালপুলের সামনে চলে আসুন। বাঁশের সাঁকো পার হলেই ঝিলডাঙা। আমি ওখানেই থাকব।'

কথা শেষ করে শোল সাইকেলে পা রাখল। ঘণ্টি টিপল দু-বার। ভেবেছিল মেয়েটা তাকাবে। তাকাল না।

পৃথা বানেরহাট স্টেশনে পা রেখেই বুঝতে পারল, কাজটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। ঝোঁকের মাথায় এতদূর চলে আসাটা উচিত হয়নি। সোমনাথকে চমকে

boierpathshala.blogspot.com

দেওয়ার জন্য এই পরিকল্পনা বেশি হয়ে গেল। সোমনাথ খুব রাগারাগি করবে।

'তোমার মাথা খারাপ জানতাম, কিন্তু এতটা জানতাম না।'

'আমি জানতাম।'

'সাহস আর দুঃসাহস এক জিনিস নয় পৃথা।'

'তুমি কি লেকচার থামাবে?'

'সেদিন অত করে বললাম, আমার সঙ্গে চলে এলেই পারতে। এতটা পথ একা আসতে হত না।'

'কী এমন পথ? দিল্লি থেকে একা এসে কলকাতায় চাকরি করতে পারছি, এই ঘণ্টাকয়েকের পথে ভয় পাব কেন? মেয়েদের ভীতু ভাবার ভুলটা কবে কাটবে তোমাদের?'

'বোকার মতো ঝগড়া কোরো না। কম্পিউটার টিপে টিপে তোমাদের মাথাগুলোতে আর ঘিলু নেই, চিপস, সার্কিট আর প্রোগ্রামে ভর্তি হয়ে গেছে। যতই কম্পিউটার নিয়ে বড়াই করো, মনে রাখবে ঘিলু এগুলোর থেকে অনেক দামি। দিল্লি আর ঝিলডাঙা এক হল?'

'তা হল না, কিন্তু কীরকম সারপ্রাইজ হল সেটা বল। চলো গেস্টহাউসে আমার কোন ঘরটা দেখিয়ে দাও। নাকি এক ঘরেই ব্যবস্থা করছ?'

সোমনাথ এতে ঠান্ডা হবে? মনে হয় না হবে।

কিন্তু শুধু কি সোমনাথকে চমকে দেওয়ার জন্যই সে এসেছে? ওই অদ্ভুত মেয়েটাকে দেখার জন্য আসেনি? সোমনাথ ঠিকই বলেছে, যাকে ঘিরে এরকম একটা আজগুবি গল্প রটেছে সে নিজেও নিশ্চয় ইন্টারেস্টিং। শোনবার পর থেকেই মেয়েটা কেন জানি মাথার মধ্যে চেপে বসেছিল। সোমনাথ রওনা দেবার পর ছটফটানিটা বাড়ল।

ট্রেন চলে যেতেই পৃথা খেয়াল করল, স্টেশন খাঁ খাঁ করছে। তাই করারই কথা। ছোটো স্টেশন। দিনে ক-টা আর ট্রেন চলে? সল্টলেকের অফিস থেকে বেরিয়ে হাওড়া স্টেশনে যাবে বলে যখন ট্যাক্সি ধরে, তখনও নিশ্চিত ছিল না আসবে। ভেবেছিল, স্টেশনে গিয়ে ট্রেনের খোঁজখবর নেবে। বানেরহাটের ট্রেন দেরিতে শুনলে ফিরে যাবে। মাত্র সতেরো মিনিট পরে ট্রেন শুনে সব গোলমাল হয়ে গেল। মনে হল, আগে তো উঠে পড়ি তারপর দেখা যাবে। ট্রেনে বসেই প্রথমে রুমাকে এস এম এস পাঠাল—

'আজ ফিরতে অনেক রাত। নাও ফিরতে পারি। রাতে বৃষ্টি হলে প্লিজ বারান্দা থেকে আমার জামাগুলো তুলে রেখো। চিন্তা কোরো না, সোমনাথ

নামের একটি হ্যান্ডসাম তরুণের সন্ধানে বেরিয়েছি। সন্ধান পেলে তার সঙ্গেই নাইট স্টে করব। নইলে ব্যাক। ডোন্ট ওয়ারি, নট ইন দ্য সেম রুম।'

কলকাতায় একা মেয়েদের ঘর পাওয়া খুব কঠিন। ভাড়াবাড়িতে রুমার সঙ্গে ঘর শেয়ার করে থাকে পৃথা। রুমাও আই টি-তে কাজ করে। তবে অফিস আলাদা। ট্রেন ছাড়বার পর পৃথা একবার ভাবল, সোমনাথকে একটা ফোন করে দিই। পরক্ষণেই ভাবল, থাক। এতটা যখন হয়েছে, বাকিটুকুও হোক। একেবারে ঘটনাস্থলে দেখা হলে মানুষটার মুখ কেমন হয় দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। ঝিলডাঙায় যাবে কী করে? স্টেশন থেকে বাস আছে নিশ্চয়।

স্টেশনের বাইরে এসে পৃথা জানতে পারল, না, বাস নেই। কোন এক ড্রাইভারের মৃত্যুর কারণে আজ বাস বন্ধ। যেতে হবে ট্রেকারে। তিনগুণ ভাড়া তো বটেই, সঙ্গে ছাগল মুরগিও উঠবে। তারা নাকি ট্রেকারে টয়লেট কর্ম করতে বেশি ভালোবাসে এবং ঘন ঘন করে। তবে তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ঝিলডাঙা লাইনের জন্য বরাদ্দ মোটে একটা গাড়ি। সেটাই সকাল থেকে আপ ডাউন করছে। কিছুক্ষণ আগে সেই গাড়ি ঝিলডাঙার দিকে রওনা হয়েছে। সেই গাড়ি ফিরে যেতে যেতে বিকেলের আগে নয়।

এতক্ষণ পর পৃথা মোবাইল বের করে সোমনাথের নম্বর টিপল।

মোবাইল গম্ভীর গলায় জানায়, লাভ নেই। ডায়াল করা নম্বর এখন চলে গেছে সিগন্যালের বাইরে।

পৃথার গা ছমছম করে উঠল।

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

পঞ্চান্ন

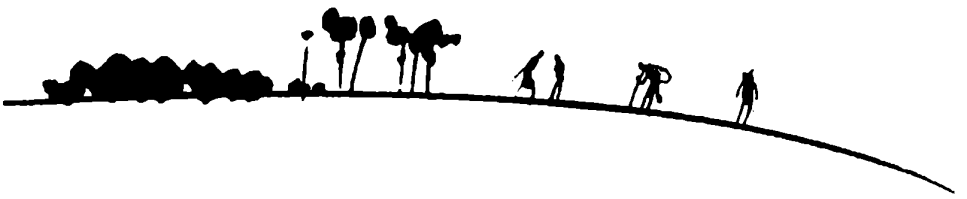

নিজের ঘরে থম মেরে বসে আছেন কমল মল্লিক। ক-টা বাজল? সাতটা পনেরো। কলকাতায় সন্ধে সাতটা পনেরো কোনো সময়েই নয়। বিকেল বললেও ভুল হয় না। কিন্তু ঝিলডাঙায়? ঝিলডাঙায় নিশ্চয় এখন অন্ধকার। ওরা কি ঝিলডাঙা পর্যন্ত যেতে পেরেছে? গত দু-ঘণ্টা সোমনাথের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। মোবাইলে ধরতে চেষ্টা করলে একটানা বলে যাচ্ছে—আউট অব রিচ। আউট অব রিচ...।

কমল মল্লিকের ভালো লাগছে না। সাধারণ বুদ্ধিতে এর কোনো কারণ নেই। একটা টিম আউটডোরে কাজ করতে গেছে, কোনো কোনো সময় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক। এটা এমন কী ঘটনা? এমন তো হামেশাই হয়। তা ছাড়া ক্যামেরা চালু হলে সকলেই মোবাইলের সুইচ অফ করে রাখে। আর এরা তো গেছে কোন্ গণ্ডগ্রামে। ওখানে নিশ্চয় ঠিকমতো টাওয়ার কানেকশন নেই। এতে চিন্তিত হওয়ার কী আছে? কিছু নেই। তবু কেন জানি কমল মল্লিকের ভালো লাগছে না। বিকেলের পর থেকেই ভেতরে একটা অস্বস্তি শুরু হয়েছে। অস্বস্তিটা বাড়ছেও। এর কারণ কি ছবিটার বিষয়? একটা প্রায় অলৌকিক বিষয় নিয়ে ওরা কাজ করতে গেছে বলে হয়তো এরকম হচ্ছে। অবশ্য অলৌকিক না গুজব সেটাও এখনই চূড়ান্ত করে বলা যাচ্ছে না। একটা বাচ্চা মেয়ে মানুষের বিপদ ফোরকাস্ট করতে পারে—এটা গুজব ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে? মনে হয়, দুশ্চিন্তার কারণ সেটাই। গুজবের সঙ্গে অনেকরকম টাকাপয়সার স্বার্থ জড়িয়ে থাকে। ক্যামেরায় ছবি তুলে সেটা ফাঁস করতে গেলে সেই স্বার্থে কারও আঘাত লাগতে পারে। তারা কোনো গোলমাল

boierpathshala.blogspot.com

পাকাবে না তো? এতক্ষণে কিছু করে বসেছে কিনা কে জানে। যত সময় যাচ্ছে তত এই চিন্তাটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে কমল মল্লিকের।

কমল মল্লিক তাঁর জল-টেবিলের ওপর ধীরে ধীরে হাত বোলালেন। মোবাইলটা তুলে সোমনাথের নম্বর টিপলেন। না, এখনও সাড়া নেই।

মল্লিক টিভির অফিস ফাঁকা। ডে-শিফটে কাজ শেষ করে সকলেই চলে গেছে। শুধু এডিট রুমে তিন চার জন ব্যস্ত। কালকের মধ্যে একটা সিরিয়াল চ্যানেলে জমা দিতে হবে। ওরা একসঙ্গে পাঁচটা এপিসোড চাইছে। যেভাবে কাজ চলছে, তাতে পাঁচটা হওয়া মুশকিল। খুব বেশি হলে চারটে পর্যন্ত টানা যেতে পারে। তাও হবে কিনা সন্দেহ। ওরিজিনাল কাজটা মল্লিক টিভির নয়। তারা শুধু মিক্সিং, এডিটিং-এর অর্ডারটুকু পেয়েছে। কাজ খুব নিম্নমানের। বহু জায়গায় লাইট জোনে গোলমাল হয়ে আছে। ক্যারেক্টরের মুখ দেখা যাচ্ছে তো হাত পা অন্ধকার। আবার হাত পায়ে আলো থাকলে ব্যাকগ্রাউন্ড বেশি আলোয় ঝলসেছে। বোঝাই যাচ্ছে প্রোডাকশন কস্ট কম। সেসব মেরামতি করতে অনেকটা সময় চলে যাচ্ছে। রাতুল নিজে মেশিনে বসেছে। সকাল থেকে একরকম যুদ্ধ চলছে। কমল মল্লিক কয়েকবার নিজে এডিট রুমে ঘুরে এসেছেন। সিরিয়ালের গল্পটাও এত একঘেয়ে যে বসে দু-তিন মিনিটের বেশি দেখা যায় না। সেই পুত্রবধূ আর শাশুড়ির গল্প। বেশিটাই মুম্বাইয়ের কাজগুলো থেকে টোকা, খানিকটা নিজেদের বানানো। বানানো অংশগুলো আরও কুৎসিত। চ্যানেল অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামায়নি। অর্ডার দেওয়ার সময়েই বলে পাঠিয়েছিল ফ্লাশ, স্পার্ক আর স্ট্যাকাটো এডিট দিয়ে ভরিয়ে দিতে হবে। এই আজকাল কায়দা হয়েছে। বিদ্‌ঘুটে 'সাট সাট' ধরনের আওয়াজ তুলে চরিত্রদের মুখ সরে সরে যাবে, একই শট বারবার রিপিট হবে। অভিনেতাদের এক্সপ্রেশনের বালাই নেই। দর্শকদের যেন কষ্ট করে চরিত্রের মনের অবস্থা বুঝতে না হয়। সাউন্ড ঢুকিয়ে মনের অবস্থা বোঝাতে হয়। রাগলে একরকম, দুঃখ পেলে আর একরকম। চোখ বুজলেও বোঝা যায়, পুত্রবধূ শাশুড়ির বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটছে। ফন্দিরও আলাদা মিউজিক তৈরি হয়ে গেছে। সবথেকে অসহায় অবস্থা হয়েছে পরিচালক বেচারির। সুনীল না অনিল নাম ভদ্রলোকের। এই কাজে নতুন। সম্ভবত এটাই তাঁর প্রথম সিরিয়াল। নামেই পরিচালক। তাঁর কথামতো কিছুই হচ্ছে না। ক্ষণে ক্ষণে এত আওয়াজ তিনি মেনে নিতে পারছেন না। তাতে কিছু এসে যায় না। চ্যানেলের এগজিকিউটিভ প্রোডিউসার যেরকম নির্দেশ লিখে পাঠিয়েছে কাজ হচ্ছে সেভাবে। রাতুল খানিক আগে ভদ্রলোককে বলেছে, 'আপনি দাদা চলে

boierpathshala.blogspot.com

যান। খামোকা বসে থেকে সময় নষ্ট করছেন কেন?'

ভদ্রলোক কাঁচুমাচু মুখে বলেছেন, 'যতই হোক নিজের কাজ।'

রাতুল হেসে বলেছে, 'কে বলল নিজের কাজ? আপনি ডিরেক্টর বলে নিজের কাজ ভাবছেন? লাইনে নতুন এসেছেন তো তাই এরকম হচ্ছে। সবই আসলে পরের কাজ। চিন্তা করবেন না, সিরিয়াল আপনার হিট করে যাবে। আজকাল টিভি পাবলিক শাশুড়ি বউমা একেবারে গপগপিয়ে গিলছে।'

এই কথায় ওই সুনীল না অনিল নামের ভদ্রলোক খানিকটা দুঃখিত হন। বলেন, 'হিট করতে গিয়ে গোটা ব্যাপারটাই তো নষ্ট হয়ে যাবে। আমি যেভাবে মাউনটিং করেছিলাম তার কিছুই থাকছে না।'

'নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কে বলল? টেলিকাস্ট হোক। পাবলিক আগে দেখুক। তারপর টিআরপি রিপোর্ট দেখে বলবেন, নষ্ট হল না স্পষ্ট হল।'

'টিআরপি-ই সব?'

'আলবাত সব। মাল বেচতে এসেছেন। পথের পাঁচালি বানাতে তো আসেননি। ভাগ্যিস সেই সময় টিআরপি, ট্যাম এসব ছিল না। কে জানে থাকলে সত্যাজিৎবাবুকেও হয়তো প্রথম প্রথম বিপদে পড়তে হত।'

'তাবলে অভিনয়ের কোনো দাম থাকবে না?'

রাতুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুদর্শন এমনিতেই রগচটা টাইপ। মাউস নাড়াতে নাড়াতে বিরক্ত গলায় বলল, 'রাখুন মশাই আপনার অভিনয়। অভিনয় দিয়ে কী হবে? সিরিয়ালে পাবলিক চায় গপ্পো। আপনি বরং বাইরে গিয়ে বসুন দেখি। অপারেশন দেখে টেনশন বাড়বে।'

এর কিছুক্ষণ পর পরিচালক ভদ্রলোক সত্যি সত্যি অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে থাকেন।

কমল মল্লিক বেল বাজিয়ে চা চাইলেন। অন্য পিওনরা চলে গেছে। শিউচরণই চা এনে দিল। ক্যান্টিনের চা নয়, বাইরের চা। গাদাখানেক চিনি। দু-চুমুক দিয়ে কাপ সরিয়ে রাখলেন। রাতের জন্য ক্যান্টিনের একটা চায়ের সার্ভিস খোলা রাখা উচিত। কালই ব্যবস্থা করতে হবে। ছটফটানিটা বাড়ছে। নরমাল হওয়ার জন্য টেবিলে রাখা ঝিলডাঙা ফাইলটা টেনে নিলেন কমল মল্লিক। এর একটা কপি সোমনাথরা নিয়ে গেছে। সবসময়েই একটা স্ক্রিপ্ট করা হয়। এই কাজে মোট দু-ধরনের খসড়া স্ক্রিপ্ট করা হয়েছে। একটা লেখা হয়েছে ফুল নামের মেয়েটার ক্ষমতাকে সত্যি ধরে। অন্যটা লেখা জিনিসটাকে গুজব ভেবে নিয়ে। দু-রকম স্ক্রিপ্ট বানানোর পরিকল্পনা কমল মল্লিকের। সোমনাথ অবাক

boierpathshala.blogspot.com

হয়েছিল—

'দুটো বানিয়ে কী হবে?'

'কোনো সিচ্যুয়েশনেই তাহলে অসুবিধে হবে না তোমাদের।'

'সে তো স্পটে গিয়েই বুঝতে পারব।'

'তা পারবে, কিন্তু মনে মনে তৈরি হয়ে থাকলে অনেক সুবিধে। আর কেউ তৈরি না থাকুক, তুমি তো থাকতে পারবে।'

কথাটা সোমনাথের শুধু মনে ধরেনি, মনে মনে কমল মল্লিকের বুদ্ধিরও প্রশংসা করে সে। লোকটা এই কারণে এত গোলমালের মধ্যেও লাইনে টিকে আছে। কিছু করা একটা জিনিস আর টিকে থাকা আরেকটা জিনিস। টিকে থাকতে গেলে শুধু পয়সা থাকলে হয় না। নিজের ভেতরে কিছু গুণ থাকা দরকার। কোটি কোটি টাকা বিলিয়ে এই লাইনে কতজন যে ধরাশায়ী হয়ে পড়ছে তার ঠিক নেই। আলো চ্যানেলের ঘুষখোর সম্রাট দত্ত-র সঙ্গে কমল মল্লিকের কমপ্রোমাইজ না করার গল্পটাও ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এটাও বড়ো ব্যাপার। অত টাকার অর্ডার ছেড়ে দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এরপরেই সোমনাথ দুটো স্ক্রিপ্ট লিখে ফেলে। নিয়মমতো সেখানে শুধু প্রশ্নগুলো লেখার কথা। কিন্তু সোমনাথ কাল্পনিক উত্তরের প্রথম দিকের কিছুটা করে অংশও লিখে রেখেছে। এতে মোমের ইন্টারভিউ নিতে সুবিধে হবে। সে দু-ভাবেই তৈরি থাকবে।

কমল মল্লিক ফাইল খুলে প্রথম স্ক্রিপ্টের পাতা দুটো বের করলেন।

খসড়া ১

মাটির ঘর। নিকোনো দাওয়া। দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে মোম চ্যাটার্জি। ক্যামেরা তাকে লঙ শটে ধরে এবং এগিয়ে আসে। পিছনে অফ ফোকাসে একটা বালিকাকে দেখা যায়। পুতুল বা অন্য কিছু নিয়ে নিজের মনে খেলছে। মেয়েটি অস্পষ্ট। ছায়া ছায়া। ক্যামেরা মোমকে ক্লোজআপে ধরে।

মোম ঃ নমস্কার দর্শকবৃন্দ। মল্লিক টিভি প্রোডাকশনের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই স্বাগত। আজ আমরা আপনাদের নিয়ে এসেছি বাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে। গ্রামের নামটা ভারি সুন্দর। ঝিলডাঙা। নাম সুন্দর হলেও ঝিলডাঙা গ্রামে মানুষকে জীবনধারণ করতে হয় কঠিনভাবে। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে। সঙ্গে আছে খরা, বন্যার মতো প্রকৃতির অভিশাপ। (এই সময়ে গ্রামের ছবি। সঙ্গে মোমের ভয়েস ওভার)। তবে দুঃখকষ্টের মধ্যেও গ্রামে শান্তি আছে। সুখ দুঃখে সবাই মিলেমিশে থাকতে জানে। একে অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মোটের ওপর নিস্তরঙ্গ একটা ছিমছাম জীবনের ছবি। (আবার ক্যামেরার ফ্রেমে মোম

boierpathshala.blogspot.com

ফিরে এল)। এই ঝিলডাঙা গ্রামেই রয়েছে এক আশ্চর্য বালিকা। নাম তার ফুল। আমরা ফুলের খবর পেয়েছিও ভারি অদ্ভুতভাবে। মফস্বলের অনামী এক পত্রিকায় তরুণ এক কবি তাকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছেন। আসুন আমরা ছড়াটা একবার শুনে নিই। (পত্রিকার ছবি। ফ্রেমে ছড়াটা দেখা যাছে। ভয়েস ওভারে মোম ছড়াটা পড়ছে।) 'ফুল, তুমি ঝড়ের খবর আগে জানো জলের খবর আগে জানো,/শুনে সবাই অবাক হয়।/বাতাস জানো, আগুন জানো, মনের কথা কেন নয়?/ কেউ কি বোঝে, কেউ কি জানে কেন তোমার এমন হয়? /খবর শুনে সবাই কেন চমকে উঠি— কীসের ভয়!'

কাট টু মোম।

মোম ঃ কী, ছড়াটা ভারি অদ্ভুত না? আসুন ঝিলডাঙার এই কন্যার সঙ্গে আমরা এবার কথা বলি।

(ক্যামেরা মোমের কাঁধ টপকে ফুলকে ধরবে। ফুলের ক্লোজ আপ।)

কাট টু মোম

মোম ঃ তুমি কি জানো তোমাকে নিয়ে একটা কবিতা লেখা হয়েছে?

ফুল ঃ না, জানি না। (কাল্পনিক সংলাপ। কারণ মেয়েটি কী উত্তর দেবে জানা নেই।)

মোম ঃ আচ্ছা, তুমি কি সত্যি ঝড়জলের খবর আগে থেকে জানতে পারো?

ফুল ঃ হ্যাঁ পারি। মেঘ জমার আগেই বুঝতে পারি এবার জল হবে। (কাল্পনিক)

মোম ঃ কীভাবে পারো।

ফুল ঃ জানি না। হঠাৎ একদিন দেখলাম... (কাল্পনিক)।

এরপর নিজের মতো চলতে থাকবে।

কমল মল্লিক এবার ফাইল থেকে দ্বিতীয় স্ক্রিপ্টের পাতা টানলেন। সেখানে প্রথম অংশটা একইরকম রেখেছে সোমনাথ। তারপর লিখেছে—

মোম ঃ তুমি কি জানও তোমাকে নিয়ে একটা ছড়া লেখা হয়েছে?

ফুল ঃ না, জানি না। (কাল্পনিক)

মোম ঃ আচ্ছা, তুমি কি সত্যি ঝড়জলের খবর আগে থেকে জানতে পারো?

ফুল ঃ না পারি না। আকাশে মেঘ জমলে সবার মতো বুঝতে পারি এবার ঝড়জল হবে। (কাল্পনিক)

boierpathshala.blogspot.com

মোম ঃ তাহলে তোমাকে নিয়ে এরকম লেখা হয়েছে কেন?

ফুল ঃ জানি না। হঠাৎ একদিন দেখলাম... (কাল্পনিক)।

এরপর নিজের মতো চলতে থাকবে।

কমল মল্লিক কাগজগুলো হাতে নিয়ে বসে রইলেন। এই দুটোর কোনো একটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সোমনাথের সঙ্গে কথা হয়ে আছে যেটা হবে সেটা ধরেই পরবর্তী কাজ ঠিক হবে। যদি ঘটনা সত্যি হয়, যার চান্স প্রায় নেই বললেই চলে, তাহলে ঝড়বৃষ্টি, আগুন ধরনের কোনো একটা বিপদ ওই মেয়েকে দিয়ে ফোরকাস্ট করাতে হবে। সেটা মেলে কিনা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আর যদি তা নয় হয় তাহলে স্টোরিটা অন্যদিকে টার্ন নেবে। আজও কেন গ্রামেগঞ্জে এইভাবে অশিক্ষা, কুসংস্কার ছড়িয়ে আছে তার খোঁজ। দেখা হবে এর পিছনে কোনো ধরনের মতলব কাজ করছে কিনা। মেয়ের বাবা-মা কি তাকে দিয়ে জ্যোতিষ ধরনের কোনো ব্যবসা ফাঁদার মতলব করেছে? নাকি সবটাই নিছক কল্পনা মাত্র? একটা অন্তর্তদন্ত গোছের ছবি। দুটো ক্ষেত্রেই মেয়ের ফ্যামিলি মেম্বার, গ্রামবাসী, সেখানকার পলিটিক্যাল লোকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া যাবে। ফেরার সময় বানেরহাটে গিয়ে সেই কবিকে ধরা হবে। সে কেন এই ধরনের গুজবকে অবলম্বন করে কবিতা লিখল জিজ্ঞেস করা হবে।

সবদিক আঁটোসাঁটোভাবে বেঁধেই কাজ হওয়ার কথা। কিন্তু এখন কমল মল্লিকের মনে হচ্ছে, ঘটনা এই দুই স্ক্রিপ্টের বাইরে কিছু হবে। তিন নম্বর কিছু। সেটা কী? সেটা কি গোলমালের কিছু? সোমনাথদের পক্ষে বিপদের নয় তো? বিপদ হলে কী ধরনের বিপদ?

হঠাৎ এরকম মনে হচ্ছে কেন?

কমল মল্লিক আবার মোবাইলটা তুলতে গেলেন, আর তখনই সেটা বেজে উঠল। পর্দায় নাম ভেসে উঠল— প্রীতি শর্মা।

কমল মল্লিক দ্রুত 'আনসার' সুইচ টিপলেন।

'আপনি! মুম্বাই থেকে?'

'না, ক-দিনের জন্য কলকাতায় এসেছি। হাউ আর ইউ মিস্টার মল্লিক?'

'ফাইন' বলতে গিয়েও থমকে গেলেন কমল মল্লিক। বললেন, 'ভালো হয়েছে, আপনি এসেছেন। আপনার সঙ্গে একবার বসা দরকার।'

'অবশ্যই বসব। যে ক-টা কাজ নিয়ে এসেছি, তার মধ্যে এটাও রয়েছে। আমাদের কাজ কেমন চলছে?'

কমল মল্লিক আবার ঢোঁক গিললেন, 'কেমন চলছে বলতে পারব না।

boierpathshala.blogspot.com

তবে সোমনাথরা তো টিম নিয়ে বেরিয়ে গেছে।'

'ভেরি গুড। কাজটা শেষ হতে ক-দিন লাগবে মনে হচ্ছে আপনার।'

কমল মল্লিক খানিকটা অন্যমনস্ক গলায় বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারছি না মিসেস শর্মা। জিনিসটা কমপ্লিকেটেড। অনেকগুলো ইফ্‌স অ্যান্ড বাট্‌স আছে। স্রেফ একটা ছড়ার ওপর ডিপেন্ড করে বেরিয়ে পড়া হয়েছে তো।'

ওপাশ থেকে প্রীতি শর্মা হালকা গলায় বললেন, 'সেই কারণেই প্রোগ্রামটা ইন্টারেস্টিং হবে বলে আমার বিশ্বাস। আর এটা যদি ক্লিক করে তাহলে নেকস্ট ভেঞ্চারগুলো আমরা অনেক বড়ো করে করব। ওই মোম নামের মেয়েটির তো বেশ ভালোই নাম হয়েছে এখানে। ও যদি আমাদের সঙ্গে পরের প্রজেক্টগুলোতে কাজ করতে রাজি হয় তাহলে ন্যাশনাল লেবেলে একটা পপুলারিটি গেইন করবে। আমি অলরেডি একটা রিসার্চ ইউনিট তৈরি করবার কথা ভেবে ফেলেছি। নিউজপেপার, ম্যাগাজিনস থেকে তারা এই ধরনের ঘটনার ক্লিপিংস বের করবে। ইভেন্টস হুইচ ক্যান নট হ্যাপেনড। যে-ঘটনা কখনও ঘটতে পারে না তার লিস্ট তৈরি করবে। এই টিম অবশ্যই মল্লিক টিভির আন্ডারে কাজ করবে। কেমন হবে?'

কমল মল্লিক খুব একটা উৎসাহ না দেখিয়েই বললেন, 'মনে হয়, ভালোই হবে।'

'একটা মজার খবর আছে মিস্টার মল্লিক।'

'কী?'

'ওই স্কাউন্ড্রেলটা আমাকে ফোন করেছিল।'

'কে?'

প্রীতি শর্মা হালকা হেসে বললেন, 'ওই যে আলো চ্যানেলের সম্রাট দত্ত।'

কমল মল্লিক খানিকটা নড়েচড়ে বসে বললেন, 'কী চায়?'

'আমার ক্ষমা।' আওয়াজ করে হেসে উঠলেন প্রীতি শর্মা। হাসি থামিয়ে বললেন, 'একেবারে নির্লজ্জ। চড় মারলাম আমি আর ও চাইছে ক্ষমা। ভেবে দেখুন একবার। আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইল,আমি বললাম, ইমপসিব্‌ল। তখন টেলিফোনেই পায়ে ধরে আর কী। আসলে কী জানেন মিস্টার মল্লিক, এই ধরনের লোকগুলো এরকমই। কোথাও থেকে বোধহয় খবর পেয়েছে আমি বড়ো প্রোডাকশনে হাত দিতে চলেছি। আমার সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে ফেলতে চাইছে। গোটা কালচারাল ওয়ার্ল্ডটা এই ধরনের দত্ত অ্যান্ড কোম্পানির জন্য পলিউটেড হয়ে গেল। নিজেরা কালি মাখছে, চ্যানেলগুলোকেও ডোবাচ্ছে। যাক লিভ ইট,

boierpathshala.blogspot.com

আপনার সঙ্গে কবে বসব বলুন। কাল পারব না, ডে আফটার টু মরো। ইন দ্য মিন টাইম আপনার টিমও ওদিকে এগিয়ে যাবে।'

কমল মল্লিক এপাশে চুপ করে রইলেন।

প্রীতি শর্মা এবার বললেন, 'এনি প্রবলেম মিস্টার মল্লিক?'

কমল মল্লিক মুহূর্তখানেক ভাবলেন। তারপর বললেন, 'ভেবেছিলাম, সমস্যাটা বলব না, কিন্তু যেহেতু আপনি এই প্রোডাকশনটার সঙ্গে যুক্ত তাই...।'

'প্লিজ হেজিটেট করবেন না। আজ ফ্রম ভেরি বিগিনিং মনে হচ্ছে, আপনি কোনো একটা সমস্যার মধ্যে আছেন। সমস্যাটা আমি কি জানতে পারি?'

কমল মল্লিক জল-টেবিলে হাত বোলাতে বোলাতে খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে বললেন, 'সমস্যাটা কী এখনও জানি না। কিন্তু আজ খানিক আগে থেকে কেমন যেন মনে হচ্ছে, আমাদের ইউনিট ঝিলডাঙায় গিয়ে কোনো একটা প্রবলেমে পড়েছে।'

'ঝিলডাঙা!'

'ওই যে যেখানে ফুল নামের মেয়েটির খোঁজে সোমনাথরা গেছে। গ্রামটার নাম তো ঝিলডাঙা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। ঝিলডাঙা। কী হয়েছে সেখানে?' প্রীতি শর্মার গলায় উদ্‌বেগ।

কমল মল্লিক সামান্য হেসে বললেন, 'কী হয়েছে সেটাই তো বুঝতে পারছি না। সোমনাথদের গাড়ি মাঝপথে খারাপ হয়ে যায়। তারপর ওরা হেঁটে রওনা হয়েছে। ইনফ্যাক্ট আমিই ওদের হেঁটে যাওয়ার জন্য ইনসিস্ট করি। কিছু সময় পর্যন্ত মোবাইলে কথা হয়েছে, তারপর সিগন্যালের বাইরে চলে গেছে।'

'দেন?'

কমল মল্লিক বললেন, 'দেন কী সেটাই তো জানতে পারছি না। এখন মনে হচ্ছে, কাজটা ঠিক হয়নি, ওদের বানেরহাটে ফিরে আসতে বলা উচিত ছিল। এই ধরনের রিমোট জায়গাগুলো সবসময় তো ভালো হয় না। নানা ধরনের এলিমেন্টস থাকে। তার ওপর ওদের সঙ্গে ক্যামেরা আছে। হুইচ ইজ কস্টলি। তার ওপর মোম চ্যাটার্জির মতো একজন মেয়ে...।'

প্রীতি শর্মা বললেন, 'আপনার কি মনে হচ্ছে, ওরা কোনো ঝামেলায় পড়তে পারে?'

'যেখানে বাচ্চা মেয়ে ঝড়জল, আগুনের ফোরকাস্ট করতে পারে বলে রটনা হয় সেই জায়গা যে খুব একটা নিরাপদ নয় সেটা তো বুঝতেই পারছি।

boierpathshala.blogspot.com

দিনের বেলা হলে নো প্রবলেম। রাতে বলেই ভয় করছে। নিজেকে খানিকটা ইরেসপনবিসল বলেও মনে হচ্ছে। তখন ঝোঁকের মাথায় চলে যেতে বললাম। এখন মনে হচ্ছে কাজটা ঠিক হয়নি। একেবারেই ঠিক হয়নি। কথাটা কাউকে বলতেও পারছি না।'

প্রীতি শর্মা সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, 'এখন আমাদের কী করা উচিত?'

'আমাদের' শুনে কমল মল্লিকের ভালো লাগল। এই মহিলা সত্যি খাঁটি। শুধু দূর থেকে টাকাপয়সা দিয়ে প্রোডাকশনের ঝামেলা ঝেড়ে ফেলতে চাইছে না। এই কাজটাকে নিজের বলে মনে করছে। দায়িত্ব নিচ্ছে। তিনি সামান্য হেসে বললেন, 'কী করার আছে? আই হ্যাভ টু ওয়েট। যতক্ষণ সোমনাথ আমার সঙ্গে যোগাযোগ না করে আমাকে অপেক্ষা করতে হরে। মে বি আজ রাতে নাও করতে পারে।'

'ওই মেয়ের কোনো নম্বর নেই?'

'এই মুহূর্তে হাতে নেই, তবে পেতে অসুবিধে হবে না। ইচ্ছে করেই সে-চেষ্টা করিনি। কী লাভ? সোমনাথকেই যখন ধরতে পারছি না, ওকে ধরব কীভাবে?'

প্রীতি শর্মা বললেন, 'আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না? আমরা যদি আর একটা গাড়ি পাঠিয়ে দিই?'

কমল মল্লিক থমকে গেলেন। কথাটা একশোভাগ ঠিক। অবশ্যই একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। এতক্ষণে কেনই-বা পাঠাননি! ছি ছি। সামান্য এইটুকুও মাথায় এল না! সারাক্ষণ কেনাবেচার কথা ভাবতে ভাবতে মিনিমাম সেন্সগুলো নষ্ট হতে শুরু করেছে। এটা তো একটা সহজ বিষয় ছিল। সোমনাথ গাড়ি খারাপ হওয়ার ঘটনা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে রিঅ্যাকশনটা এরকমই হওয়া উচিত ছিল। সেই গাড়ি হয়তো তখনই গিয়ে ওদের ধরতে পারত না, তবে ঘণ্টা কয়েক পরে তো পারত। অন্তত ওরা নিশ্চিন্ত হত, তাদের জন্য একটা স্পেয়ার গাড়ি আসছে। মনে মনে খুবই লজ্জা পেলেন কমল মল্লিক। তিনি প্রীতি শর্মাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মোবাইল ছাড়তে গেলেন। প্রীতি শর্মা বললেন, 'জাস্ট আ মিনিট মিস্টার মল্লিক।'

'বলুন।'

'ওই গাড়িতে যদি আমরাও চলে যাই কেমন হবে?'

'মানে!' অবাক হলেন কমল মল্লিক। মহিলা কী বলছে! এখন ঝিলডাঙা

যাবে!

প্রীতি শর্মা বললেন, 'কোনো অসুবিধে তো নেই। গাড়ি তো যাচ্ছেই। তা ছাড়া আপনি বলার পর আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, ওখানে একবার যাওয়া উচিত। কেন মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি না, একটা টান ফিল করলাম হঠাৎ। হয়তো ফুল নামের মেয়েটার জন্যই হল। যাবেন?'

ঠিক দেড় ঘণ্টার মাথায় কলকাতা থেকে প্রীতি শর্মা এবং কমল মল্লিককে নিয়ে গাড়ি রওনা হল। কমল মল্লিক ঝিলডাঙার পথ চেনেন না। তবে তা নিয়ে তিনি চিন্তিত নন। তিনি জানেন, বেরিয়ে যখন পড়েছেন নিশ্চয় পৌঁছে যাবেন।

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

ছাপ্পান্ন

গোপীনাথ গোলাপ ফুলের দিকে রয়েছে।

আসল গোলাপ ফুল নয়, টিনের সুটকেসের ওপরে আঁকা গোলাপ ফুল। ফুলের তলায় লম্বা ডাঁটি। ডাঁটির দু-পাশে দুটো পাতা। সুটকেস বহু পুরোনো হওয়ার কারণে ফুলের লাল রং ফিকে হয়ে গেছে। তবে পাতা দুটো এখনও উজ্জ্বল সবুজ। আর সেই পাতার ওপর আঁকা রয়েছে টলটলে দুটো জলের ফোঁটা। গোপীনাথ সেদিকে তাকিয়ে বসে আছে। তার মন খারাপ।

গোপীনাথ ঝিলডাঙা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তবে কথাটা কেউ জানে না। মুখে বলেছে, দিন কুড়ির জন্য কলকাতা চলল। যাদবপুরে দূর সম্পর্কের দিদি থাকে। বুড়ি খবর পাঠিয়েছে, অসুস্থ। ভাইকে দেখতে চায়। কথাটা অল্প একটু সত্য, বাকিটুকু ঠিক নয়। গোপীনাথের এক দিদি কলকাতায় থাকে ঠিকই, তবে যোগাযোগ খুবই কম। ক-দিন হল তার অসুখের খবরও এসেছে। কিন্তু গোপীনাথকে দেখতে চেয়েছে এমনটা নয়। আসলে সুযোগটা নিয়েছে গোপীনাথ। ঝিলডাঙা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ। কলকাতায় ক-দিন ঘুরে কাজকর্ম, মাথা গোঁজার জায়গা গুছিয়ে নেবে। তারপর একবারের জন্য ফিরে এসে বাড়ি, দোকানটার একটা হিল্লে করে একেবারে পাকাপাকিভাবে চলে যাবে।

গোপীনাথ ঠিক করেছিল, আজ দুপুর দুপুর রওনা হবে। বানেরহাট থেকে রাতে গাড়ি আছে। কিন্তু সেটা হল না। বিশুকে দোকান বোঝাতে সময় লেগে গেল। বিশুর হাতে দোকান ছেড়ে বাইরে যাওয়া আজ নতুন নয়। আগেও কয়েকবার হয়েছে। দু-পাঁচদিন এদিক-ওদিক গেলে তাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। ঝিলডাঙায় মুদির দোকান বলতে এই একটাই। সেটা দুম করে বেশিদিন

boierpathshala.blogspot.com

বন্ধ রাখলে মানুষের অসুবিধে হয়। তবে এবারের ঘটনা অন্যরকম। এতদিনের দায়িত্ব বিশু নিতে চাইছিল না। তা ছাড়া সে তো জানেই না, গোপী আর ফিরবে না। সে কলকাতায় যাচ্ছে পাকা ব্যবস্থা করতে।

'উরি বাবা, এতদিন কী করে সামলাব গো গোপীদা?' বিশু আঁতকে ওঠে।

'ন্যাকামি করিসনি। এ যেন তুই নতুন করছিস?'

'সে দু-পাঁচদিন হয়, তা বলে এতদিন? আমার নিজের দোকানও রয়েছে।'

গোপীনাথ বানিয়ে হাসল। বলল, 'যন্ত্রপাতি নিয়ে চলে আসবি এখানেই। মুদির দোকানে বসে টর্চ, রেডিয়ো, ইলেকটিরিকের যন্তর সারাতে তো কোনো অসুবিধে নেই। আমি যদি তোর চাল ডাল বেচতে বেচতে চিকিচ্ছে করতে পারি, তুই রেডিয়ো মেরামত পারবি না কেন?'

কথাটা মনে ধরল বিশুর। তা ছাড়া 'গোপীদা' বেগার খাটায় না। যতদিন দোকানের দায়িত্ব ততদিন লাভের একটা অংশ তার। তবু এতদিনের খুঁতখুঁতানিটা মন থেকে গেল না।

'তা বলে এতদিন দিদিকে দেখতে যাওয়াটা তোমার বাড়াবাড়ি হচ্ছে গোপীদা। ওই বুড়ি যে তোমার এত কাছের মানুষ তা তো আগে জানতাম না।'

গোপীনাথ ভুরু নাচিয়ে নীচু গলায় বলল, 'শুধু কি দিদিকে দেখতে যাচ্ছি রে বিশু।'

'তাহলে!' বিশু অবাক হয়।

'ভাবছি কলকাতা থেকে ফুঁ চিকিচ্ছেটাও ভালো করে শিখে আসব। সেদিন আর খুব দূরে নয় রে বলাই যখন ঝিলডাঙার মানুষের আর ওষুধপত্রে কোনো কাজ হবে না। সব ওষুধ ফেল করবে। তখন তোর ওই ফুঁ চিকিচ্ছেই ভরসা হবে। হাওয়া খেয়ে থাকবে, হাওয়া দিয়েই রোগ সারাবে। দিনকাল ভালো আসছে না, মোটে ভালো আসছে না।'

বিশু চিন্তিত গলায় বলে, 'ঠিকই বলেছ দাদা। আজকাল আমার শুধু ভয় ভয় করে। কাদুর ছেলেপুলেগুলো যেভাবে টহল মারে...মনে হয় ব্যাটারা কোনো ফন্দি নিয়ে ঘুরছে।'

গোপীনাথ চাল ডাল, নুন, চিনির বয়ামগুলো হাতের কাছে সাজাতে থাকে। বিশুকে যেন বেশি খোঁজাখুঁজি করতে না হয়। নীচু গলায় বলে, 'সে তো ওই শয়তানটা ভোটে দাঁড়াবে বলে।'

বিশু ঝুঁকে পড়ে বলে, 'না দাদা, শুধু ভোটের ব্যাপার নয়। রমজান বলছিল ওর বউ নাকি কদিন আগে দুটো ছেলেকে বেড়ার বাইরে ঘুর ঘুর করতে

boierpathshala.blogspot.com

দেখেছে। ওই মেয়ে তখন কুয়োতলায় বসে বাসন ধুচ্ছিল। ছেলে দুটোর একটা নাকি কাদুর স্যাঙাত, শোল। অন্যটাকে চিনতে পারেনি। বাইরের লোক।'

গোপীনাথ শান্ত গলায় বলল, 'আরও হবে। এখন দূর থেকে দেখছে, এরপর মেয়েছেলের হাত ধরে টানবে।'

'আমার ভয় করে গোপীদা।'

গোপীনাথ মলিন হেসে বলল, 'তোর ভয়ের কী আছে? তুই তো আর মেয়েমানুষ নোস?'

'আমি নই বটে, তবে আমার ঘরে তো মেয়েমানুষ আছে। তবে আমি কিন্তু রমজান মোল্লা নই গোপীদা। চুপ করে থাকব না। এরকম কিছু ঘটলে ছুটে গিয়ে গলায় কাটারির কোপ দেব। যত বড়ো নেতাই হোক, কাদুর ধড় আর মুণ্ডু আলাদা করে দেব বাজারের মাঝখানে।'

গোপীনাথ হেসে বলল, 'এতবড়ো বীর!'

'দেখবে বীর কিনা। মেয়েমানুষ নিয়ে বজ্জাতি ঝিলডাঙার মানুষ কিছুতেই সহ্য করবে না।'

গোপীনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে, 'শুনতে ভালোই লাগছে, কিন্তু সত্যটা কী জানিস বিশু? এসব কিছুই হবে না। তুই কাটারি দিয়ে কোপ দিতেও পারবি না, আর দিলেও পাশে কাউকে পাবি না। মানুষ আর মানুষ নেই রে বিশু, সব অমানুষ, সব জন্তু হয়ে গেছে। খুঁটিয়া মাস্টারের ঘটনা দেখলি না? অমন মানুষটাকে কে খুন করল আমরা কি বুঝিনি? সবাই বুঝেছি। কিন্তু কেউ মুখ খুলল? যে-গাধাটা খুলল তার অবস্থা কী হয় দেখবি।'

কথাটা বলেই নিজেকে সামলাল গোপীনাথ। বিশু ছাড়ল না। বলল, 'কে মুখ খুলেছে গোপীদা?'

গোপীনাথ তাড়াতাড়ি বলল, 'ও-কথা বাদ দে।'

বিশু গোপীনাথের গায়ে হাত রেখে বলল, 'তুমি কিছু লুকোচ্ছ।'

গোপীনাথ কষ্ট করে হেসে বলল, 'কী লুকোব?'

বিশু চাপা গলায় বলল, 'আমি কী করে বলব? খুঁটিয়া মাস্টারের খুনীদের নাম কে ফাঁস করেছে?'

'ফাঁস করলেই-বা কী হবে? খুনিকে পুলিশ ধরবে ভেবেছিস? ধরলেই বা লাভ কী? একটা কাদুর ফাঁসি হলে আরও দশটা কাদু জন্ম নেবে। বললাম না, আমরা সব পশুরও অধম হয়ে গেছি। নখ দাঁত ফোঁসফোঁসানি হারিয়ে ভাগ্যের হাতে নিজেদের সঁপে দিয়েছি। ভাগ্য নয়, দুর্ভাগ্য।' প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য

boierpathshala.blogspot.com

গোপীনাথ বলল, 'থাক ও-কথা, জিনিসগুলো সব ঝুঝে নে বিশু। এই পাশে যে বস্তাগুলো রাখলাম...।'

বিশু খানিকটা বিভ্রান্ত। গোপী ডাক্তারের মুখে এরকম কথা শুনতে সে অভ্যস্ত নয়। সবটার মানেও বুঝতে পারছে না। তবে একটা কিছু যে গোলমাল হয়েছে এটা পবিষ্কার। সে গোপীনাথের হাত ধরে বলল, 'হ্যাঁ গো গোপীদা, তুমি এই সময় ঝিলডাঙা ছেড়ে চলে যাচ্ছ?'

গোপীনাথ বিশুর দিকে তাকিয়ে হাসল।

'যাচ্ছি কে বলল? ফিরে আসব তো।'

'আমার কেমন যেন লাগছে। ভালো লাগছে না।' বিড়বিড় করে বলল বিশু।

'নে, জিনিসগুলো বুঝে নে।'

বিশু বলল, 'এইবেলা পারব না গোপীদা। হাতে গাদাখানেক ঝামেলা। তুমি বরং বিকেলে সব বলে-কয়ে দিও। আমি কাল সকাল থেকেই না হয় বসে পড়ব।'

'সে কী রে আমি তো আজ বিকেলেই রওনা হব ভেবেছিলাম।'

'একটা বেলা পিছিয়ে দিলে ক্ষতি কিছু হবে না।'

গোপীনাথ মনে মনে চিন্তা করে নিল। উপায় কিছু নেই। দোকান বিশুকে না বুঝিয়ে যাওয়া যাবে না। তালা মেরে চলে গেলে, ওরা সন্দেহ করবে। কাদু শয়তানটাকে কোনো বিশ্বাস নেই। এমন কাজ নেই ও পারে না। একদিন রাতে হয়তো তালা ভেঙে জিনিস-টিনিস লুটপাট করে নিল। সবথেকে ভালো হত এখানে বসে থেকে দোকানটা বিক্রিবাটা করে যাওয়া। সেটা সম্ভব নয়। কলকাতায় নিজের একটা বন্দোবস্ত করতে হবে। ততক্ষণে ঝিলডাঙা খানিকটা থিতিয়ে যাক।

এই কারণেই গোপীনাথের যাওয়া একবেলা পিছিয়ে গেছে। গোছগাছ সব শেষ। টিনের সুটকেসে ওষুধের শিশিগুলো সব ভরেছে। একবার ভেবেছিল, থাকুক এগুলো। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কী হবে? সেখানে তো আর হাতুড়ে ডাক্তার সেজে পসার সাজিয়ে বসা যাবে না। দোকানও দেওয়া হবে না। সে-পয়সা তার নেই। কোনোরকমে ছোটোখাটো কাজ জুটিয়ে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই জোগাড় করতে হবে। তাও কি জুটবে? কে জানে হয়তো জুটবে না। হয়তো আত্মীয় পরিজন, চেনা অচেনার বাড়িতে ভিক্ষে করেই বাকি জীবনটা কাটাতে হবে। ভিটেমাটি ফেলে, শিকড় উপড়ে এভাবে আর কতজনকে ঝিলডাঙা থেকে

boierpathshala.blogspot.com

পালাতে হবে? কতজনকে?

চোখের জল মুছে শতরঞ্চি মুড়ে বিছানা বাঁধতে লাগল গোপীনাথ। আর দেরি করলে চলবে না। এবার রওনা হতে হবে। আর কেউ না জানুক সে জানে কী ভয়ংকর ঘটনা ঘটতে চলেছে ঝিলডাঙায়। নিতাইকে ওরা কী করবে? তাকেও কি খুন করবে? মনে হয় করবে। খুনি কখনও সাক্ষীকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় না। কাদু তো চাইবেই না। খুন তার কাছে এখন কিছুই নয়। কিছুদিন পর আরও সহজ হয়ে যাবে। তখন ওই শয়তান ভোটে জিতবে।

সকাল থেকে ফুল ভালো ছিল। নিজের মতো খেলছিল। দুপুরে স্নান-টান করে ভাতও খেল। রান্না বেশি কিছু ছিল না। ভাতের সঙ্গে ডাল আর একটা তরকারি। শেষে আমলকির চাটনি। তাও এমনি আমলকি নয়, বুনো আমলকি। সেই চাটনিই আঙুল চেটে খেয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পর বইখাতা নিয়ে তক্তাপোশের ওপর গিয়ে বসল। কোনো কোনোদিন মালতীই মেয়েকে পড়তে বলে। আজ ফুল নিজে থেকেই বসেছে।

গোলমাল শুরু হল দুপুরের পর থেকে।

মালতীর শরীরটা ক-দিন ধরে সুবিধের নেই। এই সময়টা এরকমই। ফুল হওয়ার সময়েও হয়েছে। আগের তুলনায় পেট অনেকটা বেড়ে গেছে। নড়তে-চড়তে চামড়ায় টান লাগে। বুক দুটো ভারী হয়ে নেমে এসেছে। সামান্য পরিশ্রমে শরীরের ভেতরটা হাঁসফাঁস লাগে। রাতে ঘুমও গেছে কমে। ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হয় না। তবু উঠতে হয়। রান্নাবান্না, ঘরের কাজ সবই করতে হয়। আজও হয়েছে। দুপুর গড়াতে কোনোরকমে দুটো নাকেমুখে গুঁজে দাওয়ার ঠান্ডা মেঝেতে শাড়ির আঁচল পেতে শুয়ে পড়েছিল মালতী। শুয়ে শুয়েই মেয়েকে দেখছিল। এই ক-দিনে শুকনো ভাবটা যেন একটু কেটেছে। নতুন ফ্রক পরেছে। নতুন হলেও ফ্রক খুবই অখাদ্য। হলুদের ওপর কালো বুটি। মেয়ের বাপ পছন্দ করে কিনেছে। ইস, মানুষটার কোনো পছন্দ নেই। হলুদের ওপর কালো বুটি যায় নাকি ? হলুদের ওপর যায় কমলা। মালতী অবশ্য ভালোই বলেছে। বেচারি শখ করে কিনেছে। আজ নতুন ফ্রক পরার মতো কিছু হয়নি, তবু সেই ফ্রক পরব বলে বায়না করল মেয়ে। ছোটো মানুষ কখন কী করে ঠিক নেই। হলুদ ফ্রকের ওপর টেনে দুটো বিনুনি করে দিয়েছে। ফ্রক অখাদ্য হলেও বেশ দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। রোগাভোগা মেয়ের চোখ সুন্দর। একটা মায়াকাড়া ভাব। কথায় আছে, গরিব ঘরের মেয়ের দুটো জিনিস লুকিয়ে থাকে। রূপ আর কথা। রূপ

boierpathshala.blogspot.com

লুকিয়ে থাকে চোখে। বুকের মধ্যে লুকোয় কথা। এই মেয়েরও তাই হয়েছে। চোখের মধ্যে রূপ লুকিয়ে রয়েছে। বয়স যত বাড়বে এই রূপ বাড়বে। বলতে নেই, মেয়েটা ক-দিন আছেও ভালো। উলটোপালটা কিছু হয়নি। বড়ো ডাক্তারবাবুর কাছে একবার নিয়ে যেতে পারলে ভালো হত। ফুলের বাবা একদিন টেলিফোন করেছিল। ডাক্তারবাবু বলেছেন, তিনি নিজেই যোগাযোগ করবেন। কীভাবে করবেন কে জানে? সে যাই হোক, বলেছেন যখন নিশ্চয় করবেন। ফুলের বাপের মুখে যতটুকু শুনেছে, তাতে বোঝা গেছে মানুষটা ভালো। বড়ো মানুষও যে ভালো হয় জানা ছিল না। তা ছাড়া কাল রাতে মেয়ের বাবা আশার কথা শুনিয়েছে। বলেছে, দরকার হলে মেয়েকে নিয়ে সে কলকাতা পর্যন্ত যাবে। সেখানে অনেক বড়ো চিকিচ্ছের ব্যবস্থা আছে। হাসপাতালে থেকে চিকিচ্ছে। মালতী চোখ কপালে তুলে বলল, 'কলকাতায় চিকিচ্ছে কী গো, সে তো অনেক টাকার ব্যাপার।' মেয়ের বাপে হেসে বলেছে, 'সে-ব্যবস্থা হয়ে যাবে। গোপীনাথ বলেছে, তার চেনা জানা আছে। বলে দেখবে, যদি কিছু দেয়। অনেক সময় নাকি চিকিচ্ছের জন্য টাকা পাওয়া যায়। গরমেন্টে দেয়, আবার এমনি লোকেও দেয়। তা ছাড়া বড়ো ডাক্তারবাবু তো আছেনই। তার কাছ পজ্জন্ত যেতে পারলে তিনি কি আর ফিরিয়ে দেবেন? শরীরের এই সময় বেশি দুশ্চিন্তা কোরো না মালতি।'

মালতী বলল, 'হ্যাঁগো তুমি ওই শয়তানটার কাছে যাবে না?'

নিতাই পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, 'কে?'

মালতী আঁচল তুলে নিজের গলায় বুকে বাতাস করতে করতে বলল, 'ওই যে কাদু শয়তানটা। বাড়ি পর্যন্ত এসে বলে গেল।'

নিতাই হাই তুলে বলল, 'খেপেছ? হারামজাদার কাছে গিয়ে মরি আর কী? কোন প্যাঁচে ফেলবে তার ঠিক আছে? আগে ব্যাটাকে পুলিশে কোমরে দড়ি পড়িয়ে নিয়ে যাবে তারপর আমার শান্তি।'

'শুধু তোমার কেন ঝিলডাঙার সবার শান্তি। কিন্তু তুমি বাপু আর ঝামেলায় যেও না। মেয়ে নিয়ে একা বাড়িতে থাকি গা ছমছম করে। সেদিন যখন এসেছিল, আমার তো হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল।'

'দূর কী করবে? শালার ঠ্যাঙ ভেঙে দিয়েছি না। পুলিশ ওই চিঠি পেয়ে ছাড়বে ভেবেছ? দ্যাখো না মাঝরাতে এসে রুলের গুঁতো দিয়ে তুলে নিয়ে যাবে।'

মালতী বলল, 'আমার বিশ্বেস হয় না। শয়তানটার সবাইকে হাত করা। গোপীদা ঠিকই বলে।'

নিতাই জড়ানো গলায় বলল, 'দ্যাখো না কী হয়। কিছু না হলে আবার...।'

boierpathshala.blogspot.com

'দোহাই তোমার, আর কিছু করতে যেও না। ভয় করে আবার যদি বাড়ি চলে আসে।'

'বলবে, বাইরে কাজে গেছি। কালই তো সাঁবুইতে যাব। বড়ো কাজ পেয়েছি। রাত হয়ে গেলে ফিরতেও না পারি।'

মালতী স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে বলে, 'সেকি! মেয়েকে নিয়ে একা থাকব? তার ওপর আমার এই অবস্থা। যদি ব্যথা ওঠে?'

ঘুমের মধ্যেই যেন হাসে নিতাই। বলে, 'খামোখা ভয় দেখিও না তো। এখনও দু-মাস দেরি। আর সেরকম কিছু হলে কাউকে দিয়ে গোপীডাক্তারকে খবর দিও। নাও, ঘুমোতে দাও এখন।'

কাল রাতে নিতাই ঘুমিয়ে পড়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ জেগে ছিল মালতী।

ফুলের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মালতী মনে মনে বলল, 'ঠাকুর, মেয়েটা যেন ভালো থাকে।' শুয়েই শুয়েই সে দু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল এবং একসময় ঘুমিয়েও পড়ল।

মালতীর ঘুম ভাঙল মেয়ের ছটফটানির আওয়াজে। চোখ খুলে দেখল, ঘরের আলো মরে এসেছে। বিকেল কি ফুরিয়ে গেল?

মালতী মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখল, তক্তাপোশের ওপরে বসেই ফুল এপাশ ওপাশ করছে। একবার খাটের মাথার দিকে যায়, একবার নীচে নামে। চাদর, বালিশ এপাশ-ওপাশ করে। মালতী প্রথমে ভেবেছিল, ও কিছু নয়। খেলছে। কিন্তু খানিকটা পরেও একই দৃশ্য দেখার পর মালতী উঠে বসল। ভুরু কুঁচকে বলে, 'কীরে কী হল ফুল? অমন করিস কেন?'

ফুল অবাক হয়ে বলে, 'কী করি মা?'

যেন নিজের সংশয় কাটাতেই মালতী ধমক লাগায়, 'বুঝিস না কী করিস? একটা জায়গায় বসে পড়তে পারিস না। পঞ্চাশবার এপাশ-ওপাশ করিস খালি।'

ফুল মায়ের ধমকে ভয় পায়। বলে, 'আর করব না মা।'

বলে বটে কিন্তু পারে না। খানিকটা সময় কাটতে না কাটতেই এক কাণ্ড শুরু হয়। এবার টান টান করে পাতা বিছানার চাদর খামচে ধরে মেয়েটা।

গায়ের আঁচল টেনে মালতী সোজা হয়ে বসে। চোখ পাকিয়ে ধমক দেয়, 'আবার করিস?'

'মা, বাবা কখন আসবে?'

'কেন, বাবাকে দিয়ে তোর কী?'

'কিছু না। এমনি বলি।'

boierpathshala.blogspot.com

মেয়ের গলার স্বর পছন্দ হয় না মালতীর। কেমন কাঁপা কাঁপা। কথা মাঝখানে ভেঙে যায়। যেন ফাঁকা! ভয় লাগে। নিজেকে সামলে সে গলা তুলে বলে, 'চুপ কর। এমনি কথা বলবি না।'

'আচ্ছা বলব না। মা পিপাসা লাগে।'

কথা বলতে বলতেই ফুল এবার তক্তাপোশ থেকে নামে। হেঁটে যায় উঠোনের দিকে। হাঁটার ভাবভঙ্গি ভালো না। অন্যরকম। দুর্বল মানুষের মতো টলটল করে।

মালতী চিৎকার করে ওঠে।

'পিপাসা লাগে তো উঠোনে যাস কেন? উঠোনে যাস কেন হারামজাদি? উঠোনে কি জলের কলসি আছে? আছে জলের কলসি?'

চিৎকারে চমকে ওঠে ফুল। ফিরে আসে। তড়িঘড়ি ফের উঠে পড়ে তক্তাপোশে। কাতর গলায় বলে, 'মা, জল খাব। জল খাব মা।'

'খাবি না। নেমেছিস কী পা ভেঙে রাখব। তোর বাবায় ঘরে ফেরা পর্যন্ত মাটিতে পা দিবি না তুই।'

এপাশ-ওপাশ করতে থাকে ফুল। করতেই থাকে। মালতীর বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। তবে কি আবার অসুখটা মাথা-চাড়া দিল? আবার বিপদের খবর পাচ্ছে ফুল? কোন বিপদ? ঝড়জল? নাকি আগুন? গাছ পড়বে? মালতীর কান্না পায়। গলা ছেড়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছে। এ কেমন মেয়ে সে পেটে ধরেছে? কেমন মেয়ে? নিজেকে কোনোরকমে সামলে রান্নাঘর থেকে গেলাস-ভরা-জল এনে মালতী যখন সামনে এসে দাঁড়াল তখন ফুলের চেহারা আরও পালটে গেছে। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে! মুখ টকটকে লাল। মাথার চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে মুখে। উঠে বসে দু-হাতে আঁকড়ে ধরে আছে তক্তাপোশের ধার। ছোট্ট কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম।

কাঁসার গেলাস মাটিতে রেখে পাশে বসে পড়ে মালতী। মেয়ের কপালে হাত দিল। জ্বর এল? কই? শরীর তো ঠান্ডা!

'কী হল? কী হল ফুল।'

আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছিয়ে দিয়ে মেয়েকে দু-হাতে ধরে জোর করে শুইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে মালতী। আর সামলাতে পারে না নিজেকে। ফুঁপিয়ে ওঠে।

'মা, ওমা, আমার ভয় করে। ভয় করে আমার।'

ফুল বিড়বিড় করে ওঠে।

boierpathshala.blogspot.com

শক্ত করে মেয়েকে জড়িয়ে মালতী কাঁদতে কাঁদতে বলে 'ভয় কী মা? কোনো ভয় নেই। এই তো আমি সোনা। তোমার কাছেই আছি।'

ফুলের চোখের মণি স্থির। স্থির চোখের পাতা। সে তার মায়ের কথা যেন শুনতে পায় না।

'বাবাকে ডাকো। ডেকে আনো বাবাকে।'

মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মালতী বলে ওঠে, 'আনছি মা, আনছি। তুই আগে শান্ত হ...তুই শান্ত হ।'

ফুল শান্ত হয়। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই নেতিয়ে পড়ে। মনে হয়, ছোট্ট এই শরীরের সব শক্তি ফুরিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে। মায়ের কাঁধে মাথা রেখে সে চোখ বোজে। তারপর ফিসফিস করে ওঠে।

'মা মাটি কাঁপে। মাটি কাঁপে মা। বাবাকে ডাকো, মাটি কাঁপে।'

মাটি কাঁপে! মাটি কাঁপে মানে কী? ভূমিকম্প? ফুল কি ভূমিকম্পের কথা বলছে?

মেয়েকে কোনোরকমে শুইয়ে দিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে মালতী। দাওয়া থেকে নেমে দরমার গেট খুলে বের হয় দ্রুত। ফুলের বাবাকে এখন কোথায় পাবে? কাজের জন্য সকালে বেরিয়েছে। ছাউনির কাজ থাকলে কোনো কোনোদিন সাঁবুই, মছিলপাড়া, মল্লিকপুর এমনকি বানেরহাট পর্যন্ত চলে যায়। আজ গেছে সাঁবুই। সে তো অনেকটা দূর। গোপীডাক্তারকে ডাকবে? তাকে কি পাওয়া যাবে এখন?

মালতী যখন গোপী ডাক্তারের বাড়ির দিকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটল তখন বিকেল শেষ হয়ে সন্ধের আলো আঁধারি শুরু হয়ে গেছে।

মোহন বাইকটা পাঁচিলের আড়ালে রেখে সিটে বসে সিগারেট টানছিল। আধঘণ্টারও বেশি সময় ধরে সে একইভাবে সিগারেট টানছে। নজর রাখছে নিতাইয়ের ঘরের ওপর। মালতীকে বেরিয়ে যেতে দেখে আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল। তারপর সিগারেট ফেলে, গেট খুলে ভেতরে ঢুকল স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। ঢোকার আগে চারপাশে সাবধানে তাকিয়ে নিল একবার।

এই সময়টার জন্যই মোহন এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। কখন বাড়িটা ফাঁকা হয়। মাটির দাওয়া টপকে ঘরের দিকে এগোতে এগোতে গোটা প্ল্যানটা একবার ঝালিয়ে নিল সে।

'এই যে মেয়ে, তোমার নামই তো ফুল? ফুল না? আমাকে চিনতে পারো? পারো না? আচ্ছা, না পারলেও চলবে। এখন চলো দেখি লক্ষ্মী মেয়ে।

boierpathshala.blogspot.com

চট করে আমার সঙ্গে চলো। তোমার বাবার একটা সমস্যা হয়েছে। অন্নপূর্ণা চালকল আপিসের ছাদ মেরামত করতে গিয়ে বেচারি বাঁশ থেকে পড়ে গেছে। না, না রক্ত-টক্ত বেরোয়নি, তবে বাঁ পা-টা ফুলে গেছে। মনে হয় হাড় ভেঙেছে। বরফ ঘসা চলছে। সে তোমাকে আর তোমার মাকে এখনই ডাকে। তোমার মা কই? তাড়াতাড়ি ডাকো দেখি। আমার হাতে সময় নেই। মা এখন বাড়িতে নেই? ঠিক আছে তাহলে তুমি একাই চলো। পরে এসে না হয় তোমার মাকে নিয়ে যাওয়া যাবে। আমি এখন তোমার বাবাকে নিয়ে হাসপাতালে যাব। এসো, দেরি কোরো না। আমার মোটরবাইক আছে। উড়ে চলে যাব তোমার বাবার কাছে।'

অন্ধকার ঘরে উঁকি দিতে দিতে মোহন মনকে শক্ত করল। এই মেয়ের বুদ্ধি কেমন? মোটরবাইকে যাওয়ার সময় চেঁচামেচি করে লোক ডেকে বসবে না তো? অবশ্য দিঘির পাড় দিয়ে গেলে এই ভরসন্ধেতে লোক কোথায়? ওদিক দিয়ে গিয়ে কাটাখালি স্কুলের রাস্তাটা ধরবে। খুঁটিয়া মাস্টারের খুনের পর থেকেই ওদিকটায় লোক চলাচল কমে গেছে।

আশ্চর্যের ঘটনা হল, বিস্ফারিত চোখ, ঘর্মাক্ত শরীর, আলুথালু চুলে বসে থাকা ফুল মোহনের কথায় কোনো আপত্তি করল না। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে।

যেন নিয়তির মতো এইরকম কোনো কিছুর জন্য সে অপেক্ষা করছিল! অপেক্ষা করছিল বহুদিন ধরে!

ঘরে ফিরে মেয়েকে দেখতে না পেয়ে ছুটে বেরিয়ে এল মালতী। উন্মাদের মতো আবার ছুটে গেল ঘরে। ফের বেরিয়ে এসে চিৎকার করে কেঁদে উঠল—

'ফুল, ফুল আমার। কই গেলি মা? তুই কই গেলি?'

অন্ধকার দাওয়ার এককোণে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গোপীনাথ। তার একহাতে সুটকেস, অন্যহাতে দড়ি বাঁধা শতরঞ্চির বিছানা। শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে যাচ্ছে তার। ফুল নেই!

ধীরে ধীরে হাতের সুটকেসটা নামিয়ে রাখল গোপীনাথ। মালতীর আর্তনাদের মধ্যেই নিজের মনকে শক্ত করল। ভেবেছিল, ফুলকে দেখেই রওনা হবে। এখন বুঝতে পারছে যাওয়া হবে না। থাক, না-ই বা যাওয়া হল। সবাই যেতে পারে না। সবার যাওয়া হয় না। সে এগিয়ে এসে মালতীর মাথায় হাত রাখল। মনে আরও জোর এনে চাপা গলায় বলল, 'শান্ত হও মালতী। চলো আমরা ফুলকে খুঁজতে যাই।'

boierpathshala.blogspot.com

সাতান্ন

সুদর্শন রায় ঘন ঘন হাত উলটে ঘড়ি দেখছেন।

'আর কতক্ষণ গঙ্গা?'

গঙ্গা গাড়ির জানলা দিয়ে ঝুঁকে বাইরে দেখার চেষ্টা করল। গাড়ির বাইরে অন্ধকার ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। বড়ো রাস্তা ছেড়ে গাড়ি ধরেছে কাঁচা পথ। পথের অবস্থা শোচনীয়। ভাঙা, এবড়ো-খেবড়ো। যেখানে-সেখানে ঘাপটি মেরে আছে ছোটো বড়ো গর্ত। গর্তে পড়ে গাড়ি লাফিয়ে উঠছে বারে বারে। দু-পাশে কালো ঝোপঝাড়, বাগান, পুকুর। মাঝেমধ্যে টিমটিমে-আলো-জ্বলা দোকানঘর, মাটির বাড়ি। পথ মূলত জনমানবহীন। সঙ্গে ঘড়ি না থাকলে মনে হত গভীর রাত। দু-একটা সাইকেল বা মোটরবাইক পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। টুকরো একটা বাজারের আলোকিত জায়গা পেরোতে আবার সব অন্ধকার।

কথাকলি সামনের সিট ধরে বসে আছে। গাড়ির ঝাঁকুনি সামলাচ্ছে। বলল, 'অনন্তদা সাবধানে চলুন। গাড়ির কিছু হলে সর্বনাশ হবে।'

সুদর্শন রায় আবার বললেন, 'আর কতদূর?'

'স্যার, মনে হচ্ছে এসে গেছি।'

বাবার মধ্যে একটা অস্থির ভাব লক্ষ করছে কথাকলি। তার অবাকই লাগছে। মানুষটা চট করে কখনও এতটা ব্যস্ত হয় না। ব্রতীন অনেকক্ষণ ধরেই চুপ করে আছে। কথাকলি বুঝতে পারছে, তার সিদ্ধান্তের কথা শোনার পর থেকেই বেচারির খারাপ লাগছে। কিছু করার নেই। একই ভুল দু-বার করা যায় না। করলে আরও বেশি খারাপ লাগত। আজ হয়তো লাগত না, দু-দিন পরে লাগত। যতই কঠিন হোক সে যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটাই ঠিক। এরপর সত্যি

boierpathshala.blogspot.com

সত্যি ব্রতীন যদি কাজকর্ম নিয়ে কলকাতা থেকে দূরে কোথাও চলে যায় আরও ভালো হবে। দুজনের পক্ষেই ভালো হবে। সমুদ্রের ভাঙা ঢেউয়ের মতো জেগে ওঠা ভালোবাসা ছুঁয়ে থাকতে হলে সমুদ্র থেকে সরে থাকতে হয়। গত কয়েকদিনে এই নির্মম সত্য সে বুঝতে পেরেছে। কথাটা ব্রতীনকে বলতে পেরে মনটা হালকা লাগছে। ফুল নামের অদেখা মেয়েটিকে ধন্যবাদ। তার জন্যই আজ একসঙ্গে এতটা পথ আসতে পারল তারা। এতদিন পরে আবার সত্যিকারের ভালোবাসার মানুষকে বলতে পারল—'ভালোবাসি'। সত্যিকারের ভালোবাসার মানুষকে 'ভালোবাসি' বলতে পারাটা সহজ কাজ নয়। অনেক মেয়ের গোটা জীবনেই বলে ওঠা হয় না। সেদিক থেকে নিজেকে আজ সৌভাগ্যবতী বলে মনে হচ্ছে।

'বাবা, তোমার কি টেনশন হচ্ছে?' নীচু গলায় বলল কথাকলি।

আনমনে ডাক্তার রায় উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ রে মা হচ্ছে। মেয়েটার জন্য দুশ্চিন্তা বাড়ছে।'

'দুশ্চিন্তার কী আছে? আমরা তো প্রায় চলেই এসেছি। যদি সেরকম বুঝি ফুলকে তো আমরা নিয়ে কলকাতায় ফিরব।'

সুদর্শন রায় বললেন, 'আমি সেরকম ব্যবস্থা করে এসেছি। ক্লিনিকে বেড পর্যন্ত রাখতে বলেছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না রে কলি...।'

ডাক্তার রায় চুপ করলেন। কথাকলি বলল, 'কী বুঝতে পারছ না?'

'অতটা সময় পাব কিনা বুঝতে পারছি না।'

এতক্ষণ পর ব্রতীন কথা বলল। মুখ ঘুরিয়ে তাকাল সুদর্শন রায়ের দিকে। বলল, 'আজই যে ফুলের কোনো বিপদ ঘটে যাবে এমনটা কেন ভাবছেন স্যার?'

'আমি যে ভাবছি এমন নয় ব্রতীন। আসলে কী জানো বিপদ ঠিক কখন ঘটবে তা কেউ বলতে পারে না। জানা যায় না নদীর বাঁধ ঠিক কখন ভেঙে পড়বে, মরা আগ্নেয়গিরি জেগে উঠবে কোন শেষরাতে। তাই বিপর্যয়ের আগে সবকটা মুহূর্তই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। কিছু ঘটলে তখন বড়ো আপশোস হয়। ভাবি, ইস একটু আগে যদি সতর্ক হতাম। এই মেয়ের বেলাতে কেন জানি আমার সেরকমই হচ্ছে। ভাবনার পিছনে যুক্তি কাজ করছে না। ওকে আর এক মুহূর্ত ঝিলডাঙায় ফেলে রাখতে মন চাইছে না। যদিও জানি না তাকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা বা অধিকার আমার আছে কিনা। তবু চেষ্টা করতে হবে। তার অসুখকে কেউ পণ্য করার আগেই চেষ্টা করতে হবে।'

ব্রতীন অবাক গলায় বলল, 'পণ্য! স্যার আপনি কি কমোডিটির কথা

boierpathshala.blogspot.com

বলছেন?'

শুকনো হেসে ডাক্তার রায় বললেন, 'তা ছাড়া, এখন সুখ-অসুখ সবই কমোডিটি। বাজারে বিকোয়।'

বাবার জন্য কথাকলির কষ্ট হচ্ছে। সে মানুষটার এই ছটফটানির কারণ জানে। ফুলের অসুখকে প্রথম থেকে গুরুত্ব না দেওয়ার অনুশোচনায় মানুষটা ভুগছে। গাঢ় স্বরে বলল, 'শান্ত হও বাবা। ফুল ঠিক হয়ে যাবে। তুমি তো কতজনকে সুস্থ করেছ।'

সুদর্শন রায় আবার ঘড়ি দেখলেন।

'আমরা কি এসে গেলাম গঙ্গা?'

'আর একটুখানি। ওই তো খালটা। সাঁকোটার সামনে এলেই গাড়ি দাঁড় করাব।'

সুদর্শন রায় সিটে হেলান দিলেন। এই অন্ধকার গাড়িতেও মানুষটাকে ভারি সুন্দর লাগছে। সামান্য এক গাঁয়ের আরও সামান্য একটা ছোটো মেয়ের জন্য এত বড়ো একজন চিকিৎসকের দুর্ভাবনাই তাঁকে বোধহয় আরও সুন্দর করে তুলেছে। তিনি চোখ থেকে চশমা খুলে হাতে নিলেন। ডাঁটিতে কামড় দিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'আসলে কী হয়েছে জানিস কলি, এই প্রথম একটা সাইকিক কেস আমাকে নানানভাবে নাড়া দিচ্ছে। পেশেন্ট আমার সামনে কখনও আসছে সাইকোলজিক্যালি, কখনও আসছে ফিলজফি নিয়ে। একবার ভাবছি শুধুই মন, একবার মনে হচ্ছে, না, শুধু মন নয়। অসুখটার মধ্যে কোথাও কোনো দর্শন লুকিয়ে রয়েছে। পেশেন্ট এই যে মাঝে মধ্যেই একটা হ্যালুসিনেশনের মধ্যে চলে যাচ্ছে, আর চলে গিয়ে মনে করছে, সে আগামী বিপদের খবর জানছে, সেটা কি শুধুই তার অসুখের লক্ষণ? নাকি আরও কিছু আছে? সে কি কোনো বিপদের কথা আমাদের বলতে চায়? কোনো ইঙ্গিত? পিঁপড়েরা যেমন ফেরোমেন দিয়ে পরস্পরকে সাবধান করে?'

ব্রতীন বলল, 'কী বিপদ? ঝড়? বৃষ্টি?'

ডাক্তার রায় ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসলেন। বললেন, 'সত্যি যদি আগামী দিনে কোনো প্রলয় পৃথিবীকে ধ্বংস করতে আসে সে কী আর ঝড় বৃষ্টি বা জলোচ্ছ্বাসের চেহারায় আসবে ব্রতীন? মনে হয় না আসবে। আমাদের বেঁচে থাকার প্রতিটা পদক্ষেপে কেনাবেচার যে জাল ছড়িয়ে পড়েছে সে নিজেই ক্রমশ হয়ে উঠছে ভয়ংকর। তোমাদের ভাষায় যাকে বলে শয়তান। আমাদের হাতে তৈরি ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের দুরাত্মা। তিল তিল করে গড়ে ওঠা সভ্যতা ধ্বংস করার

boierpathshala.blogspot.com

জন্য এই শয়তানই তখন যথেষ্ট হবে।' একটু থামলেন সুদর্শন রায়। ফের চাপা গলায় বললেন, 'ফুল নামের এই নিষ্পাপ বালিকাটি কি সে-কথাই বলতে চায়? আমরা বুঝতে পারি না। বুঝতে না পেরে হয় তাকে অবহেলা করি, নয়তো শুধুই অসুখ ভেবে চিকিৎসা করতে চাই। আমি ঠিক জানি না...।'

অনন্ত গাড়ি থামিয়ে বলল, 'এসে গেছি।'

গঙ্গা গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বলল, 'আসুন, এবার হাঁটতে হবে।'

এতক্ষণ কেউ খেয়াল করেনি, এবার দেখা গেল গঙ্গার হাতে কাগজে-মোড়া একটা সস্তার পুতুল।

শান্তি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা দিয়েছে। তার হাতে ফ্রক। ফুলের নতুন ফ্রক। হলুদের ওপর কালো বুটি।

বারান্দার একপাশে চেয়ার টেনে অন্ধকারে বসে আছে কাদু। লণ্ঠনটা কমিয়ে রাখা আছে পায়ের কাছে। এই আলোও পছন্দ নয় তার। সাবধানের মার নেই। মোহনকে বাইক সমেত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্তত আজকের রাতটা গা ঢাকা দিয়ে থাক। হারামজাদা বলছে বটে কেউ দ্যাখেনি, কিন্তু যদি দ্যাখে? ঝুঁকির কাজ করেছে ছেলেটা। ঝিলডাঙার সকলেই মোহনের মোটরবাইক চেনে। অবশ্য ঝুঁকি হলেও একদিক থেকে ভালোই করেছে। নিতাই টাকাপয়সা খেতে রাজি না হলে সে আর এক সমস্যা হত। আসল কাজ কিছুই হত না, মাঝখান থেকে রটত। সেদিক থেকে এটাই বুদ্ধির। এখন 'মাল' সরিয়ে দিলেই নিশ্চিন্তি। আরও ব্যাপার আছে। ভোটের আগে গ্রামে একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা দরকার। যে সে ভয় নয়, বেশি ভয়। এমন ভয় যাতে গ্রামের লোকজন কাদুর বিরুদ্ধে এক পা যাওয়ার আগে দশবার ভাবে। এতে শুধু জেতার সুবিধে হবে তাই নয়, এলাকা কন্ট্রোলে রাখা যাবে।

বুধিয়াকে খবর দেওয়া হয়েছে। কাদু নিজে কথা বলতে পারল ভালো হত। সেটা সম্ভব হয়নি। এদিকটায় মোবাইল টাওয়ার কাজ করে না। সিগন্যাল ভেসে কেটে যায়। গা ঢাকা দেওয়ার আগে মোহন নিজে গিয়ে বলে এসেছে।

মেয়ের বয়স কম শুনে বুধিয়া নাকি বেজায় খুশি। গদগদ গলায় বলেছে, 'রং কেমন?'

'ফর্সা নয়, তবে কালোও নয়। মাঝামাঝি। তবে আরও ব্যাপার আচে দাদা।'

উত্তেজিত বুধিয়া বলে, 'আরও ব্যাপার!'

boierpathshala.blogspot.com

'হ্যাঁ, আরও ব্যাপার। শুনেচি, ওই মেয়ে নাকি ঝড়বাদলার খবর রাখে।'

'ঝড়বাদলের খবর! সে আবার কী হে!'

'সেটাই তো বলচি। একেবারে রেডিয়োর মতো। খদ্দেরের কোলে বসে আগে থেকে সব জানিয়ে দেবে। হ্যা হ্যা।' হেসে ওঠে মোহন। বলে, 'বউনির জিনিস কেমন হল বল।'

'টেস্ট করেছ?' বুধিয়ার গলায় সন্দেহ।

মোহন চোখ টিপে বলে, 'এখনও হয়নি, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই হবে। দাদা করবে। দাদার লোক সাচিয়ে গুচিয়ে ঘরে বন্ধ করে রেখেচে। দাদা গায়ের রং টেস্ট করবে, ঝড়বাদলা টেস্ট করবে। তারপর আপনার হাতে তুলে দেবে। আপনি গাড়ি পাঠান। জিনিস বেশিক্ষণ রাখা যাবে না। একটু পর থেকেই এখানে হইচই পরে যাবে।'

'মেয়ে জোগাড় হল কীভাবে? টাকা দিয়ে?'

মোহন সতর্ক হল। ব্যবসায় এত কথা বলতে নেই। তা ছাড়া কীভাবে জোগাড় হল তা জেনে এই লোকের কাজ কী? সে চুপ করে থেকে ভুরু নাচাল। ইশারায় নিজের মোটরবাইক দেখাল।

কাদু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ঘটনা সত্যি। গোলমাল হবে একটা। ফুলের মা-বাপ দুজনেই হুজ্জুতি পাকাবে। প্রথমে বাড়ি বাড়ি খোঁজা হবে। বড়ো হ্যাজাক নিয়ে ঘুরে দেখা হবে মাঠ, ঘাট, ঝোপজঙ্গল। শেষে পুকুরে জাল ফেলা হবে। পাড়াগাঁয়ে বাচ্চা হারিয়ে গেলে এটাই নিয়ম। বছর তিনেক আগে খয়রুলের ছেলে হারিয়েছিল। সে ছেলে অবিশ্যি বড়ো ছিল। চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স। সন্ধের পর দিঘির পাড়ে বসে চোলাই টানছিল হারামজাদা। রাত বাড়তে টুপ করে পড়ে গেল জলে। সকালে জাল ফেলে বডি তোলা হল। আচ্ছা, পুকুরে জাল ফেলার দায়িত্বটা নিলে কেমন হয়? কাল সকাল থেকে লোকজন নিয়ে ঝিলডাঙায় একটা হইচই বাঁধিয়ে দেওয়া যেতে পারে। পুকুরঘাটে চেয়ার টেনে নিজে বসে থাকতে হবে সকাল থেকে। শোল বা মোহন কেউ একটা মাথায় ছাতা ধরবে।

'অ্যাই শুয়ার, জাল ঠিক করে ফেলতে পারছ না? না না হয়নি, আবার ফ্যালো। চড় মেরে দাঁত ফেলে দেব। দরকার হলে একশোবার ফ্যালো। শালা খরচ তোমার বাপের? খরচ আমার। যতক্ষণ না গাঁয়ের মেয়েকে পাওয়া যায় আমি এই পুকুরপাড় ছেড়ে উঠচি না।'

কাদু নিজের বুদ্ধিতে নিজেই খুশি হল। খোলা বারান্দা দিয়ে আকাশের

boierpathshala.blogspot.com

দিকে তাকাল সে। চাঁদ ওঠেনি এখনও, তবে আকাশে তারা ফুটেছে। শোল কোথায়? এত কাণ্ড হয়ে গেল, তার কোনো খবর নেই কেন? ওই চকচকা মেয়ে কি ঝিলডাঙা পর্যন্ত এল? এলেও শোল কি তাকে ম্যানেজ করতে পারবে? পারা উচিত। টাকাপয়সা দিলে রাজি হবে না কেন? শান্তিকে এখন রাখার পরিকল্পনা ছিল না। ওই মেয়েটা এসে যাওয়ায় রাখতে হয়েছে। মোহন যখন তাকে ঘরে ঢোকাচ্ছে, মেয়েটা মোহনের হাত জাপটে ধরে। মোহন মাথায় হাত বুলিয়ে দাঁত বের করে হাসে। বলে, 'চিন্তা নাই। ভাঙা হাত পা নিয়ে তোমার বাপে এই এল বলে। তুমি ততক্ষণ বসো। জল-বিস্কুট খাও।'

বাচ্চা মেয়েটা সত্যি অদ্ভুত। একটা পাগল পাগল ভাব যেন। চোখ দেখলে মনে হয়, যা দেখছে তার থেকে আরও বেশি কিছু দেখতে পাচ্ছে। মেয়েটা ঘরে ঢোকার আগে আরও জোরে মোহনকে চেপে ধরে। শান্তি এসে হাত ছাড়িয়ে ঘরে নিয়ে যায়। সেই সময়টায় কাদু ইচ্ছে করেই নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল। যতই অন্ধকার হোক, ওই মেয়ে তাকে চিনে ফেলতে পারে। পরে তো চিনবেই, আগে ঝুঁকি না নেওয়া ভালো।

শান্তি ফ্রক হাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর কাদু ঠান্ডা গলায় বলল, 'তৈরি করেছিস?'

শান্তি হাতের জামা তুলে দেখাল। বলল, 'ঝামেলা করেনি। একবার বলতে নিজেই খুলে দিয়েছে।'

'ভালো। শান্ত মেয়ে হলে ভালো। ওরা জিনিস দেখে দাম দেয়।'

শান্তি মুখ ফিরিয়ে বলল, 'বড্ড ছোটো। একেবারে ছেলেমানুষ গো। গায়ে গতরে এখনও হয়নি কিছু।'

শান্তির গলায় হালকা একটা আপত্তি সুর না? খট করে কানে লাগল কাদুর। দাঁত ঘষে বলল, 'ব্যবসায় ছোটো বড়ো হয় না। যে যেরকম মাল চায় তাকে সেরকমই দিতে হবে।'

'তাহলেও...।' ভয়ে ভয়ে বলল শান্তি।

নিজের গালে হাত বোলাতে বোলাতে কাদু বলল, 'তাহলেও কী? খারাপ লাগছে?'

শান্তি বলল, 'না তা বলিনি। ওইটুকু মেয়ে তো...।'

'এমনভাবে বলছিস যেন ওইটুকু মেয়ে বিক্রিবাটা হয় না। আরে এদেরই এখন বেশি দাম। তা ছাড়া ওই মেয়ের বাপ কি ভুলে গিয়েছিল যে নিজের ঘরে বউ বাচ্চা আছে? আমার নামে যখন পুলিশের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিল ভুলে

boierpathshala.blogspot.com

গিয়েচিল তখন? হারামজাদা এবার শিখ্যে পাবে। এমন শিখ্যে যে বাকি জীবনটা পাগল হয়ে ঝিলডাঙার পথে পথে ঘুরে বেড়াবে। আজ না হোক, আমি চাই একটা সময় নিতাই জানতে পারুক, এই শাস্তি তাকে আমিই দিয়েচি। তার মেয়েকে কাদুই বেচে দিয়েচে। তখন আর পাগলার কতা লোকে বিশ্বেস করবে না।'

কথা শেষ করে 'খ্যা খ্যা' আওয়াজে হেসে ওঠে কাদু। প্রতিশোধ-চরিতার্থের হাসি।

কাদু বলে, 'বেশি ট্যাঁ ফোঁ করিস নে শান্তি, বেশি ট্যাঁ ফোঁ করিস নে। নইলে তোকে সুদ্ধু বেচে দেব।'

'তুমি যা-ই বলো, আমার কিন্তু ভয় করছে কাদুদা।'

ভয়ের কথা শুনে অজান্তে নিজের কোমরে হাত চলে গেল কাদুর। বেল্টে রাখা রিভলভারের ঠান্ডা নলে হাত লাগল। 'ব্যবস্থা' ঠিক জায়গাতেই আছে। খানিকটা আগে ড্রয়ার থেকে 'জিনিস' বের করে কোমরে রেখেছে। দরকার যে আছে এমন নয়। তবু কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। নতুন কাজ তো তাই অস্বস্তি। তারপর 'ফিলিম পার্টি'র ব্যাপারটা আছে। এটা সবসময় সঙ্গে থাকলে ভরসা হয়। মনে জোর বাড়ে। শরীরে জোর বাড়ানোর চেষ্টাও চলছে। খানিক আগে গোপী ডাক্তারের বলবর্ধক কয়েক চামচ খেয়ে নিয়েছে সে। ওই মেয়ের ওপর প্রথম পরীক্ষা হোক। রোগাভোগা ছোটো শরীর। বেশি জোর খাটাতে হবে না। মোহন ছাদে কি চেয়ার দিয়ে গেল?

শান্তি আবার বলল, 'ভয় করে।'

'মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না তো। ভয়ের কী আছে? আমি ঘরে ঢুকছি। তুই বাইরে থেকে তালা মার। টোকা দিলে খুলবি। দে টর্চ আর চাবিটা দে।'

শান্তি চাবি, টর্চ এগিয়ে দিল।

দরজা খুলেই নাকে হাত চাপা দিল কাদু।

তীব্র একটা গন্ধ। চেনা কোনো গন্ধ নয়, অচেনা গন্ধ। ঝাঁঝ আছে, আবার নেই। শুধু তাই নয়, গন্ধটা যেন কমছে বাড়ছে! ভেসে বেড়াচ্ছে বন্ধ ঘরের ভেতর। কীসের গন্ধ? শরীরের ভেতর কেমন একটা লাগছে। মনে মনে নিজেকে শক্ত করল কাদু। মেয়েটা বমি -টমি করল নাকি? আশ্চর্য নয়, করতে পারে। বেশি ভয়ে অনেক সময় ছোটোরা বমি করে। মনে মনে হালকা হওয়ার চেষ্টা করল কাদু। গোপী হারামজাদা এখানে থাকলে বেশ হত। তার হাবিজাবি ওষুধ কতটা কাজ দিচ্ছে নিজের চোখে দেখে নিত।

boierpathshala.blogspot.com

বাইরে থেকে শান্তি দরজা টেনে দিতেই ঘর অন্ধকার। টর্চটা জ্বালল কাদু। সেই টর্চের আলো এক পাক ঘোরাতেই ফুলকে দেখা গেল।

ঘরের কোণায় উলঙ্গ শরীরে উবু হয়ে বসে আছে মেয়েটা। মুখ দেখা যাচ্ছে না, এলোমেলো ঝাঁকড়া চুলে ঢাকা। দেখা যাচ্ছে শুধু রোগা লিকলিকে হাতদুটো। বুকের কাছে জড়োসড়ো করা। লজ্জায়, ভয়ে কুঁকড়ে আছে। কাঁপছে নাকি? হ্যাঁ, কাঁপছে।

কাদু এগিয়ে যায়। আওয়াজে ঘাড় ঘোরায় ফুল। এবার আলো পড়ল তার চোখে। আতঙ্কের সেই চোখ দেখে চমকে উঠল কাদু। এই দৃষ্টি মানুষের নয়। যেন শরীর ফুঁড়ে চলে যায়! মাথাটা সামান্য ঘুরে গেল কাদুর। মনে হচ্ছে, গন্ধটা বাড়ছে। গন্ধটা কীসের? মেয়েটার গা থেকে আসছে? নাকি অন্য কিছুর? মানুষের শরীরে তো এ-গন্ধ থাকে না! মেয়েটা কি নিজে কোনো গন্ধ ছড়াচ্ছে?

মনে জোর এনে কাদু আরও এগিয়ে এল কয়েক পা। ফুলের পাশে এসে বসল হাঁটু মুড়ে। পাশে টর্চ রাখল। না, বুধিয়াকে সে ঠিক বলেনি। রং ফর্সা। ফর্সা হলে কত দাম? এই জিনিসের দাম কত হয়? বুধিয়া হারামজাদা ঠকাবে না তো? উপায় কী, ঠকতে ঠকতে শিখতে হবে। সব ব্যবসাতেই তাই নিয়ম। ব্যবসা কেন, গোটা জীবনটাই শালার ঠকতে ঠকতে শেখা। বড়ো কথা মনে করতে পেরেছে ভেবে কাদু মনে মনে খুশি হল। হঠাৎ-তৈরি-হওয়া গা ছমছমে ভাবটা সামান্য কাটল যেন। সে হাত বাড়িয়ে ফুলের নগ্ন পিঠ ছুঁল।

উফ কী ঠান্ডা!

মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলে ছিটকে গেল ফুল। আরও অন্ধকারে সরে গেল। পালিয়ে গেল।

কাদু হাসল। মুখে 'চুক চুক' ধরনের আওয়াজ করে বলল, 'ভয় নেই। এদিক-ফেরো। লজ্জা কী? ফেরো এদিক। মুখটা দেখি তোমার। দাঁত দেখাও। ই ই করো সোনামণি।'

ফুল আরও সরে যেতে চেষ্টা করে। পারে না। দেয়ালে আটকে যায়। সর সর আওয়াজে ঘষটে ঘষটে চলতে থাকে দেয়াল বরাবর। কাদু আবার থমকে গেল। এই চলা মানুষের নয়! সরু হাতগুলো ঝুলে পড়েছে সামনে। পা দুটো চলছে টেনে টেনে। দেয়ালের আধো ছায়ায় মনে হচ্ছে, হাত নয়, মেয়েটার মুখ থেকে যেন শুঁড় বেরিয়েছে! পিঁপড়ের শুঁড়!

ছিঃ, একটা পুঁচকে মেয়ে তাকে ঘাবড়ে দেবে? কাদু দ্রুত ফুলের কাঁধ চেপে ধরে। টান মারে। কোলের ওপর বসাতে চায় হিঁচড়ে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে,

boierpathshala.blogspot.com

'এসো সোনা, এসো হীরের কণা। তুমি নাকি ঝড়ের কথা জানো, তুমি নাকি বাদলার কথা জানো ফুল? সত্যি? কই বলো, আমাকে বলো তো শুনি। কোলে বসে ঝড়বাদলার গল্প শোনাও। হ্যা হ্যা।'

গোপীডাক্তারের দাওয়াই মনে হচ্ছে কাজ দিয়েছে। জোর আসছে। কোমরের নীচে পুরুষমানুষের বল আসছে।

ফুলের দিকে কাদু মুখ এগোয়। তার হাঁটুতে লেগে জ্বলন্ত টর্চ গড়িয়ে যায় দূরে। গড়ানো টর্চের আলো-ছায়ারা উলটেপালটে, নেচেকুঁদে ঘুরতে থাকে ঘরের দেয়ালে, ছাদে। বীভৎস উল্লাসে নাচতে থাকে শিকার ও শিকারীর গা বেয়ে।

কাদুর এগিয়ে আসা মুখের দিকে প্রথমে ডান হাতটা ছুড়ল ফুল। হয়তো না বুঝেই ছুড়ল। সেই হাত লাগল'কাদুর বাঁ-চোখে। কাদু 'আহ্' বলে চোখ চেপে সরে যাওয়ার আগেই ফুল তার রোগা পলকা বাঁ হাত চালায় দিগবিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে। নখ বসে যায় কাদুর ডান চোখের তলায়। নাকি মণির ভেতর? রক্ত বেরোল কি? কাদু দু-চোখ বুঁজে যন্ত্রণায় চাপা আর্তনাদ করে ওঠে। দুর্বল ফুলের কোমর জড়িয়ে ধরে, নিয়ে আসে নিজের শরীরের ওপর। ফের ছিটকে যায় ফুল। শরীর বেঁকিয়ে মেঝেতে ঝাপটা মারে। প্রথমে একবার। তারপর আরও একবার, তারপর ঘরের কোণায় দলা পাকিয়ে, কুঁকড়ে পড়ে থাকে মাথা নামিয়ে। পরের প্রতিঘাতের জন্য মনে মনে তৈরি হতে থাকে।

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসে কাদু। আন্দাজ করে থাবা বসায় ফুলের কাঁধে। হিংস্র মানুষের সবল টানে গড়াতে গড়াতে এগিয়ে আসে ফুল। তারপরই দ্বিতীয় আঘাত হানে। প্রথম কামড় বসায় কাদুর পায়ের গোছে। তারপর তলপেটের নীচে, দু পায়ের সন্ধিস্থলে। খানিক আগে পর্যন্ত যা গোপীডাক্তারের টোটকায় উজ্জীবিত, উল্লসিত হয়ে উঠছিল, তীব্র কামড়ে সে তার যাবতীয় তেজ হারায়। যন্ত্রণায় ছটফট করে কাদু শরীরের সব শক্তি দিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে যায়। পারে না।

ফুল কামড়ে রাখে। রেখেই দেয়।

কী আশ্চর্য! এইটুকু মেয়ে তার রোগা শরীরে এত শক্তি পেল কোথা থেকে! যেন ক্ষুদ্র জীবনের সব শক্তি সে উজাড় করেছে আজ! উজাড় করে তুলে দিয়েছে নিজেরই ঝকঝকে দাঁতের সারিতে। সেই দাঁত জোর পেয়েছে। সেই দাঁত বিষ পেয়েছে!

অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও কাদু বুঝতে পারে, এ-কামড় ছাড়বার নয়। সে নিজের কোমর হাতড়াতে থাকে। কোথায় গেল? কোথায় গেল তার 'ব্যবস্থা?

boierpathshala.blogspot.com

তার অস্ত্র কই? এই তো। এই তো ঠান্ডা নল, এই তো আরও ঠান্ডা তার মুখ-লুকোনো ট্রিগার। টলমল হাতে আন্দাজ করে ট্রিগারে আঙুল রাখে কাদু।

বিকট আওয়াজ হয়।

এত কাছ থেকেও আন্দাজ ভুল করেছে কাদু। প্রথম গুলিটাই চাপা হুংকার দিয়ে তার ডান উরুর মাংস খাবলা মেরে তুলে নেয়। আর্তনাদ করে আবার ট্রিগারে চাপ দেয় কাদু। এবারও হয় না। গুলি ঘরের সিলিঙে লাগে।

আহত, রক্তাক্ত কাদু উঠতে চেষ্টা করে। পারে না। মনে হয় মাথা শূন্য। পা নেই। আর তখনই ঘটনা ঘটে।

মেঝে কেঁপে ওঠে। বেশি নয়, খুব সামান্য। কিন্তু কেঁপে ওঠে। দূরে কোথায় যেন বেজে ওঠে শাঁখ। কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!' কাদু মাথা তোলবার চেষ্টা করে। কে চেঁচাল? শান্তি? নাকি ভুল শুনল? অনেক সময় তীব্র যন্ত্রণায় এরকম হয়। মানুষ ভুল শোনে। পালাতে হবে। এখনই পালাতে হবে এই আস্তানা ছেড়ে, ঝিলডাঙা ছেড়ে। গ্রামের লোক কি গুলির আওয়াজ পেয়েছে? আওয়াজ না পাক, ফুলকে এখানে তো পাবে। দুমড়ে মুচড়ে অন্ধকার ঘরের কোন কোণায় গা ঢাকা দিয়েছে হারামজাদি? কাদু টলতে টলতে উঠে দাঁড়াতে যায় আবার। আবার ব্যর্থ হয়। কোমরের নীচে যেন আগুন জ্বলছে। সব পুড়ছে দাউ দাউ করে। মনে হয়, পড়ে যাবে, জ্ঞান হারাবে এখনই। তার আগেই পালাতে হবে, পালাতে হবে...। টর্চটা কই? জ্বলছে না কেন? নাকি জ্বললেও দেখতে পাচ্ছে না? সে কি মারা যাচ্ছে?

কাদুর চোখ বুজে আসে। সে দেখতে পায়, ঘরের অন্ধকার ফুঁড়ে সে এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। অন্ধকারের শরীর নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কে বাড়ায়? কে? ক্ষতবিক্ষত চোখ দিয়ে নয়, কাদু চিনতে পারে সেই হাত স্পর্শ করে। মরা মানুষের হাত! হারাধন! ঝিলডাঙার ভূতে পাওয়া সেই হারাধন। সেই হারাধন যাকে উন্মাদ হওয়ার দোষে উলঙ্গ করে গ্রামে ঘুরিয়েছিল সে। বেচারির গায়ে আজও কাপড় নেই! মরে যাওয়ার পরেও! গলায় শুধু দড়ি ঝোলে।

উলঙ্গ হারাধন হেসে বলে, 'ভালো আছেন? আপনে ভালো আছেন ভাই?'

কাদু জ্ঞান হারাচ্ছে। খুব দূর থেকে ভেসে আসছে দরজা ধাক্কানো আওয়াজ। শান্তি চিৎকার করছে, 'কাদুদা, কাদুদা...। পালাও পালাও...।'

boierpathshala.blogspot.com

আটান্ন

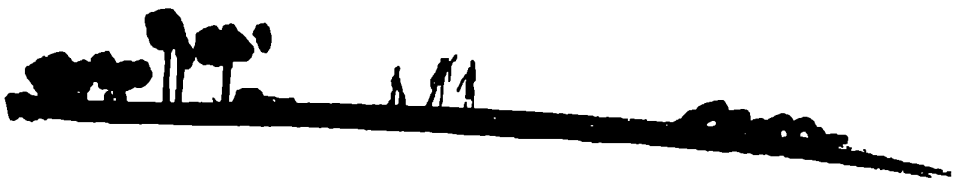

মাটির গভীরে কোথাও না কোথাও প্রতিনিয়ত কম্পন হয়ে চলেছে। তার মধ্যে বেশিরভাগই অতি সামান্য, অতি অকিঞ্চিৎকর। মানুষ তার খবর রাখে না, রাখতে চায়ও না। যন্ত্রে রুটিনমাফিক ধরা পড়ে, অথবা কে জানে কোনো সময় তা-ও পড়ে না। ভূমিকম্প আড়ালেই থেকে যায়।

ঝিলডাঙার এই ভুমিকম্প সম্ভবত সেরকম সামান্যই কিছু। কথাকলিরা বুঝতে পারেনি। তারা ছিল খালের ওপর, বাঁশের সাঁকোতে। সাঁকো অল্প দুলছিল। দুলুনি ভূমিকম্পের কারণে হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। এতগুলো মানুষ উঠেছে, হালকা পলকা জিনিস একটু তো দুলবে। ডাক্তার রায় ছিলেন সামনে। তিনি চিন্তিত। খুবই চিন্তিত। কেন জানি তাঁর মনে হচ্ছে, আসলে দেরিই হয়ে গেছে। কেন তাঁর এরকম মনে হচ্ছে, তিনি জানেন না। জীবনের অনেক রহস্যের মধ্যে এটাও একটা। অনেককিছু ঘটে যার পিছনে যুক্তি বুদ্ধি কাজ করে না। ডাক্তার রায়ের পিছনে গঙ্গা। মাঝখানে কথাকলি। সাঁকোর দুলুনিতে ভয় পেয়ে সে হাত ধরে ফেলে ব্রতীনের। ব্রতীন একটু চমকে ওঠে। বহু বছর পর কথাকলি তার হাত ধরল। কত বছর পর?

কথাকলি ফিসফিস করে বলে, 'একটা গন্ধ পাচ্ছ?'

ব্রতীন বড়ো করে শ্বাস টানল। তার ঠান্ডা লেগে আছে। চট করে কোনো গন্ধ নাকে আসার কথা নয়। তবু সে যেন একটা গন্ধ পাচ্ছে। কীরকম গন্ধ বুঝতে পারছে না। চেনা নয়। একধরনের কষটে গন্ধ।

'পাচ্ছি কথা। কিন্তু চিনতে পারছি না।'

কথাকলি মনে হয় নার্ভাস বোধ করছে। নইলে সে ব্রতীনের হাত আরও

boierpathshala.blogspot.com

শক্ত করে চেপে ধরবে কেন?

পৃথা কিন্তু এই দুলুনিটুকুও বোঝেনি। ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজ তুলে তার ট্রেকার ছুটছে অন্ধকার কেটে। ঝিলডাঙা পৌঁছতে দেরি নেই। তার বুক ধুকপুক করছে। কোলের ওপর রাখা ব্যাগটা সে বুকের ওপর চেপে ধরল। নিজের মনেই মুচকি হাসল। নার্ভাস ভাব কাটানোর চেষ্টা। ওখানে সোমনাথ আছে তো? না থাকলে সর্বনাশ। জীবনে অনেক ডাকাবুকো কাজ করেছে। কাজের জন্য নতুন নতুন জায়গায় গেছে অনেকবার। তবে সে সবই ছিল ঝলমলে বড়ো বড়ো শহর। এরকম অন্ধকার পাড়া-গাঁ নয়। বেশ লাগছে কিন্তু। হয়তো একটু ভয় ভয় করছে বলেই ভালো লাগছে। ফেরবার সময় এই ঝামেলা করতে হবে না। সোমনাথের সঙ্গে গাড়ি আছে। নাকি ট্রেকারেই ফিরতে হবে? সে যাই হোক ঝিলডাঙায় না পৌঁছে সে ফিরবে না কিছুতেই। সর্বনাশ হলেও নয়।

যত কাছে এগিয়ে আসছে পৃথার তত মনে হচ্ছে, ঝিলডাঙা তাকে টানছে! অবাক কাণ্ড। যে-জায়গায় সে কখনও আসেনি, চেনে না, সে তাকে টানবে কীসের জোরে? সোমনাথ? নাকি অন্য কিছু? অন্য কিছু হলে সেটা কী?

আর মোম? সে কি মাটি কাঁপা বুঝতে পেরেছে?

হ্যাঁ, পেরেছে। মোম হাঁটতে হাঁটতেই বোঝে, পায়ের তলায় মাটি নড়ছে। খুব অল্প, কিন্তু নড়ছে। নড়াটাই স্বাভাবিক। খানিক আগেই সে ক্যান খুলে পরপর দুটো বিয়ার গলায় ঢেলেছে। পায়ের তলার মাটি সামান্য কাঁপার পক্ষে দুটো বিয়ার তুচ্ছ নয়। কাজে বেরিয়ে বহুদিন পরে সে বিয়ার খেল। খানিকটা ঝিম ধরাবার জন্যই খেয়েছে। সোমনাথ দেখেছে। কিছু বলেনি। অবশ্য এখন আর কাজ কী? ওখানে গিয়ে একটা চক্কর মেরে আসা। একদম অন্যরকম অভিজ্ঞতা।

মোম মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে, সেরকম মনে হলে ওই গ্রামে সে আজ থেকে যাবে। সোমনাথরা রাজি না হলে জোর করে থাকবে। কারও বাড়ি-টাড়ি-একটা ম্যানেজ করা যাবে না? অবশ্যই যাবে। গ্রামের মানুষ শহুরেদের মতো খারাপ হয় না। ওই যে মেয়েটা, যাকে নিয়ে শ্যুটিং, ফুল না কী যেন, ওদের বাড়িতে ব্যবস্থা করতে পারলে কেমন হয়? আহা, খোলা আকাশের পাশে দাওয়ায় শুয়ে রাত কাটানোর মতো দুর্লভ অভিজ্ঞতা হবে। খানিকটা যেন বিয়ারের ঘোরেই মোম মনে মনে উত্তেজনা অনুভব করল।

ওদিকে কাছাকাছি পৌঁছে গেছে কমল মল্লিক আর প্রীতি শর্মার গাড়ি। আর খানিকটা যাওয়ার পরে তাদেরও নেমে হাঁটতে হবে। যদিও সে-কথা তারা জানে না।

boierpathshala.blogspot.com

দ্রুত পায়ে কাদুর আস্তানার দিকে আসছে মালতী আর গোপীনাথ। শু ' তারা নয়, গুলির আওয়াজ পেয়ে আসছে গোটা ঝিলডাঙার মানুষ।

সবাই হাঁটছে। সবাই দ্রুত হাঁটছে। এক আশ্চর্য মেয়ের কাছে চলেছে সবাই। এদের যেন আলাদা কোনো পরিচয় নেই, আলাদা অস্তিত্ব নেই। যে যার নিজস্বতা সরিয়ে রেখে চলেছে সারি বেঁধে। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে, মানুষ নয়, পিঁপড়ের দল। আহত, ক্ষতবিক্ষত আপনজনকে বাঁচাতে চলেছে।

———

boierpathshala.blogspot.com

For More Books >
CLICK HERE

---

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

প্রচেত গুপ্তের জন্ম ১৯৬২ সালের ১৪ অক্টোবর। বাবা ক্ষেত্র গুপ্ত, মা জ্যোৎস্না গুপ্ত দুজনেই শিক্ষা জগতের মানুষ। লেখালেখির পরিমণ্ডলে বড় হওয়া প্রচেত অর্থনীতিতে স্নাতক হওয়ার পর সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নেন। লেখক হিসাবে খুব অল্পদিনেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, ওড়িয়া সহ বিভিন্ন ভাষায় গল্প অনুবাদ হয়েছে। বিশিষ্ট পরিচালক তরুণ মজুমদার তাঁর লেখা *চাঁদের বাড়ি* উপন্যাসটি নিয়ে চলচ্চিত্র করেছেন। অসংখ্য নাটক, টেলিফিল্ম হয়েছে। বাংলা আকাদেমি প্রবর্তিত সুতপা রায়চৌধুরি স্মৃতি পুরস্কার, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার সহ বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন।

আলোকচিত্রী ঃ অমিত ধর

boierpathshala.blogspot.com

ঝিলডাঙা গ্রামের কন্যা ফুল এক আশ্চর্য বালিকা। ফুটফুটে এই মেয়ে নাকি বিপদের খবর আগাম বুঝতে পারে! বুঝতে পারে ঝড়জল হবে, আগুন লাগবে! আর কোন ভয়ংকর বিপদের সংকেত সে পায়? এই উপন্যাস কেনা বেচা নিয়ে মেতে থাকা এক কঠিন সময়ের দলিল। যেখানে ভয়, লোভ নিষ্ঠুরতার পাশে আছে গভীর, মমতামাখা ভালোবাসা।